॥ ১ ॥

মোটা বেতের লাঠিটা মুঠোর ভিতর শক্ত করে ধরে জগমোহন ঘর থেকে বেরোন। কিন্তু অন্যদিন যেমন তাঁর চটির প্রচণ্ড শব্দ হয়, হাঁচি কাশির শব্দ শোনা যায়, গেট খুলে দিতে চাকর দারোয়ানকে হাঁকডাক করতে আরম্ভ করেন--- আজ সেসব কিছুই শোনা গেল না।

কেমন যেন চুপিচুপি তিনি ঘর থেকে বেরোলেন।

অবশ্য দারোয়ান আগেই গেট খুলে রাখে। রাত চারটের সময় ওপরে কর্তাবাবুর ঘরে আলো জ্বলে উঠতে দেখলে চাবির ছড়া নিয়ে সে সদরের তালা খুলে দিতে ছুটে যায়। বুড়ো চাকর দীনদয়ালেরও তখন ঘুম ভেঙ্গে যায়। কর্তাবাবুর হাঁকডাক আরম্ভ হবার আগেই সে বাথরুমের দরজা খুলে আলো জ্বেলে দেয়, জগমোহন মুখহাত ধোন—দীনদয়াল ইতিমধ্যে বাবুর ধুতি, জামা, চটি, লাঠি সব ঠিক করে রাখে।

কিন্তু তা হলেও হাঁকডাক করা জগমোহনের স্বভাব। যেমন উঁচু লম্বা বিশাল দেহ, তেমনি দরাজ গম্ভীর তাঁর গলার স্বর। যখন কাউকে ডাকেন, কথা বলেন, বাড়ি গমগম করে ওঠে। তাঁর হাঁচি, কাশির শব্দ মোড়ের পানের দোকান থেকে শোনা যায়। পানের দোকানের কানাই কদিনই দীনদয়ালকে কথাটা বলেছে।

ষাটের ওপর বয়স হয়েছে জগমোহনের। তা হলেও তিনি যখন হাঁটেন সিঁড়ি, বারান্দা যেন কাঁপতে থাকে।

কিন্তু আজ তিনি বড়ো নীরব, তাঁর গতি মন্থর, পদক্ষেপ শিথিল। অন্যদিন চৌকাঠ পার হয়ে বারান্দায় এসে কোনোদিকে না তাকিয়ে হুড়মুড় করে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নামেন, রাস্তায় এসে পূব আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যুক্তকর কপালে ঠেকান, তারপর অস্পষ্ট অপরিচ্ছন্ন অন্ধকারের ওপারের মৃদু কোমল কম্পমান রক্তাভ আলোর ছটার দিকে পরিপূর্ণ প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে ধরেন। অর্থাৎ তখন তিনি বুঝতে পারেন তিনি জেগে উঠেছেন, তাঁর পূর্ণ চেতনা ফিরে এসেছে, আর একটা সুন্দর দিন আরম্ভ হল; পরমপিতার আশীর্বাদ নিয়ে আর একটা দিন তিনি বেঁচে থাকতে চলেছেন, উদ্যম, নিষ্ঠা ও যত্ন নিয়ে তাঁকে নতুন করে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অবশ্য তার আগে তিনি কতক্ষণ জোরে পা চালিয়ে হাঁটবেন: হাতের লাঠিটা শক্ত করে ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘাড়ে কাঁধে ঝাঁকুনি দিতে দিতে পুরো দু-মাইল রাস্তা ভ্রমণ শেষ করে রীতিমত ঘর্মাক্তকলেবর হয়ে তিনি বাড়ি ফিরবেন, দাড়ি কামাবেন, স্নান করবেন, তারপর প্রাতঃরাশ সেরে ধরাচূড়া পরে ধর্মতলায় নিজের চেম্বারে চলে যাবেন। তখন আর তিনি হেঁটে যান না। নিজের গাড়ি চড়ে যান। এবং তারপরেও এই গাড়ি করে সারাদিন তাঁর অনেক ভ্রমণ, অনেক ছুটোছুটি হয়। ডাক্তার মানুষ। অনেক জায়গায় যেতে হয় তাঁকে, অনেক রোগী দেখতে হয়। যাক সেকথা—

আজ. এখন প্রাতর্ভ্রমণ করবেন বলে ঘর থেকে বেরিয়ে জগমোহন যেন অন্যদিনের মতন বাইরে পূর্বাকাশের প্রথম রক্তচ্ছটা দেখবার জন্য অন্ধ উন্মাদনা নিয়ে তেমন করে সিঁড়ির দিকে ছুটে যেতে পারলেন না; বরং কোনদিন যা করেন না. বারন্দাটা পার হবার সময় একটা ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দীনদয়াল করিডোরের আলো জ্বেলে দিয়েছে। তাই জগমোহন বন্ধ দরজার কড়া দুটো পরিষ্কার দেখতে পেলেন। পর্দাটা ভালো করে না গুটিয়ে বুঝি কপাট ভেজানো হয়েছিল। পর্দার একটা নীল অংশ নীচের দিকে চৌকাঠের কাছে বেরিয়ে আছে। জগমোহন ক্লান্ত বিষণ্ণ একটা নিশ্বাস ফেললেন। সবুজ রঙের বন্ধ পাল্লা দুটো. পিতলের স্থির অনড় আংটা দুটো. পর্দার সেই ক্ষীণ অংশটুকু দেখতে দেখতে জগমোহনের দশ বছরের প্রতিটি চিন্তা ভাবনা, কল্পনা, সংশয়. আবার সেই সঙ্গে এই ক'বছরের প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের আশা আকাঙ্খা সাধ স্বপ্ন এক সঙ্গে, যেন একটা নির্দিষ্ট অবয়ব নিয়ে ঐ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। না, সামনে নয়, দরজার ওপারে, ঘরের ভিতর অপেক্ষা করছিল। একটু পরে যখন দরজা খোলা হবে জগমোহন তাঁর এতদিনের চিন্তা ভাবনা আশা দুরাশা স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের শারীর রূপটা পরিষ্কার দেখতে পাবেন।

আশ্চর্য, জগমোহন এই কতক্ষণের জন্য তাঁর সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের প্রাতর্ভ্রমণের নেশা ভুলে থাকতে পারলেন, প্রত্যূষের স্বর্ণমণ্ডিত পূর্ব দিগন্তের সেই নয়নাভিরাম ছবি একবারও তাঁর মনে পড়ল না। কেবল কাঠের দরজাটার ওপর চোখ রেখে মোহগ্রস্তের মতন দাঁড়িয়ে রইলেন।

মোহ ভাঙল রাস্তার কোনও ধাবমান মোটরের হর্নের শব্দ শুনে। এদিকটা ফাঁকা বলে গাড়ি চড়েও কেউ কেউ প্রাতর্ভ্রমণ করতে আসেন। জগমোহন আর দাঁড়লেন না। তাঁর চলার. তাঁর চটির এতটুকু শব্দ না হয়, শব্দ হলে কারোর ঘুম ভেঙ্গে যাবে, দরজা খুলে বেরিয়ে আসবে, এই আশঙ্কায় চোরের মতন পা টিপে টিপে তিনি বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ির কাছে চলে এলেন। তারপর তেমনি এক দুই করে অত্যন্ত সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে সিঁড়ির ধাপগুলি অতিক্রম করে নীচে নেমে এলেন। এতে তাঁর কষ্ট হল, পরিশ্রম হল। হওয়া স্বাভাবিক। যে মানুষ দুপদাপ করে সিঁড়ি ভাঙ্গতে অভ্যস্ত হঠাৎ তাঁকে অত্যন্ত সন্তর্পণে গুণে গুণে প্রতিবার পা ফেলে নীচে নামতে হলে সেটা একরকম শারীরিক কসরতের সামিল হয়ে দাঁড়ায়। এই জগমোহন যখন এক তলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তখন তিনি অনুভব করলেন তাঁর কপাল ঘামছে। অবশ্য রাস্তায় পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় ঘামটা শুকিয়ে গেল। কপালের শুকনো খসখসে চামড়া হাতে ঠেকল। হাত দিয়ে জগমোহন কপালের ঘাম পরীক্ষা করলেন বৈকি। আসলে এটা যে কিছু নয় তা তিনিও জানেন। এখানে ঘাম, দৈহিক শ্রম একটা কথার কথা শুধু। এবং শ্রমটা কীসের—ক্লান্তিটা কোথায় চিন্তা করে তিনি একটা গভীর নিশ্বাস ফেললেন। তাহলেও এখন বেড়াতে বেরিয়ে মুক্ত বায়ু সেবন করতে এসে তিনি আর এই নিয়ে মনকে অযথা ভারাক্রান্ত করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন না। নিজে চিকিৎসক। শরীরের সঙ্গে মনের কতটা সম্পর্ক তিনি জানেন। উদ্বেগ উৎকণ্ঠার চাপ সব সময় বইতে নেই। জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিতে হয়। জগমোহন তা করেন। করেন বলেই এই বয়সেও স্বাস্থ্যটি এমন সুন্দর আছে। না হলে অনেকদিন আগেই ভেঙ্গে পড়তেন. শয্যা

নিতেন। হাতের ছড়ি ধরিয়ে জগমোহন লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। পূব আকাশের গাঢ় লাল রঙটা আজ আর তিনি দেখতে পেলেন না। বেরোতে একটু দেরি হয়ে গেল। সিঁদুরে রঙের মধ্যেই পাতলা হয়ে একটা গোলাপী আভা ধরেছে। এই আকাশও সুন্দর, এই রঙও মনোমুগ্ধকর। জগমোহন আকাশের প্রান্ত থেকে চোখ তুলে মাথার ওপরের আকাশ দেখলেন। উজ্জ্বল ময়ূরকণ্ঠী রঙ ফুটে উঠেছে সেখানে। আবার পাখির পালকের মতন পাতলা ফিনফিনে সাদা একটুখানি মেঘও চোখে পড়ল। জগমোহনের মাথার ওপর দিয়ে একটা পানকৌড়ি উড়ে গেল।

মুক্ত বায়ুসেবন তো আছেই—নয়নের আনন্দ দিতে কত কিছু এখানে ছড়িয়ে আছে। গাছ পাখি বিশাল আকাশ বিস্তৃত প্রান্তর অফুরন্ত রৌদ্র সূর্যোদয় সূর্যাস্ত। আবার এদিকে আধুনিক নগর জীবনের সকল রকম সুযোগ সুবিধা এনে জড়ো করা হয়েছে। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের বাহাদুরি আছে। বস্তুত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবিকৃত রেখে শহরের এই পুব অঞ্চলটাকে গড়েপিটে এমন সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হবে ক'বছর আগেও মানুষ কল্পনা করতে পারত না। অগুণতি বস্তি আর পচা ডোবা ছাড়া এখানে কিছুই ছিল না যে। অবশ্য মেজ ছেলে পরিতোষের চেষ্টা ও আগ্রহেই এখানে জমি কিনে বাড়ি করা হয়েছে। না হলে জগমোহনের মনের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল! তবে এখানে বাড়ি করে জগমোহন দেখছেন লাভটা তাঁরই বেশি হয়েছে। নীল আকাশ মাথায় নিয়ে এমন একটানা দু মাইল রাস্তা—ইচ্ছা করলে আরও অনেকটা পথ হেঁটে বেড়াবার সুবিধা কৃষ্ণদাস পাল লেনে ছিল না। প্রাতর্ভ্রমণের অভ্যাস তাঁর বহুদিনের। এবং কৃষ্ণদাস পাল লেনের কাছাকাছি একটা ছোটোখাটো পার্কও ছিল। লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা লাল কাঁকরের সরু গোল পথটা ধরে জগমোহন চরকির মতন ঘুরেছেন। এখনও সেই পার্কে বেড়াবার কথা মনে হলে তাঁর হাসি পায়। এ যেন দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর অবস্থা। চারদিকে উঁচু উঁচু বাড়ির জটলা। মাঝখানে সাড়ে আট কাঠা জমি নিয়ে পার্ক। তাও কত মানুষের ভিড়। পাখির মধ্যে কতগুলি হতকুচ্ছিৎ কাক ছাড়া কিছু চোখে পড়ত না। মাথার ওপর চার আঙুলের মতন আকাশ। সেই আকাশ থেকে কতটা আলো ঝরত—কী পরিমাণ হাওয়া খেলত রেলিং ঘেরা ঐ একফালি জমির বুকে, আজ এখানে এই মুক্ত প্রশস্ত দীর্ঘ পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে, পথের পাশের সতেজ সুঠাম পত্রপুষ্প সমাচ্ছন্ন কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া গাছগুলি দেখতে দেখতে জগমোহন চিন্তা করেন। এখানে তাঁর মনে হয়, চিড়িয়াখানার বাঘটা যেমন খাঁচার ভিতর এমাথা ওমাথা পায়চারি করে, কৃষ্ণদাস পাল লেনের পার্কে তাঁর বেড়ানোটাও অবিকল সেরকম ছিল।

কৃষ্ণদাস পাল লেনের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে এখানে তাঁর নূতন বাড়িতে জগমোহন গত আশ্বিন মাসে চলে এসেছেন। আর এক আশ্বিন ঘুরে এসেছে। কিন্তু কৃষ্ণদাস পাল লেনে যে তিনি গোড়া থেকে ছিলেন তা নয়। তা হলেও গত ছ সাত বছর তাঁকে সেখানেই কাটাতে হয়েছে। দোতলায় তিনখানা কামরা। ছোটো ছোটো কামরা। তাও তো আলো পাখা বাড়ি ভাড়া নিয়ে দেড়শ টাকার বেশি পড়ে যেত। অসুবিধা হত। তবে পরিবারের লোকসংখ্যা কমে গিয়েছিল বলে তিনখানা ঘরে কুলিয়ে গেছে। একটা ঘর তিনি নিজে ব্যবহার করতেন। আর একটায় মেজ ছেলে পরিতোষ থাকত। পরিতোষ ও রমলা। বাকি ঘরখানা ভাঁড়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

হ্যাঁ, অসুবিধা হত, কিন্তু আর বাড়িও খোঁজা হয়নি। চিরকাল ভাড়া বাড়িতে থাকবেন এমন ইচ্ছা কি জগমোহনের ছিল। একডালিয়া রোডে থাকতে লেকের ধারে তিনি জমি কিনে রেখেছিলেন। কবে তাঁর বাড়ি হয়ে যেত। সরযূ---জগমোহনের স্ত্রী রাতদিন কানের কাছে গুণগুণ করত। জমি কেনা হয়েছে যখন বাড়ির কাজ আরম্ভ করে দাও। দেরি কোরো না। তোমারও তো বয়স হল। ছেলেরা বড়ো হচ্ছে। বিয়ে করে দুদিন পর তারা ঘরে বউ আনবে। তিন ছেলে। তিনখানা ঘরের দরকার। কাগজ পেন্সিল নিয়ে সরযূ বাড়ির নকশা আঁকত। দোতলা বাড়ি হবে। ওপরে তিন ছেলের তিনখানা ঘর। নীচে তিনখানা। একটা তোমার আমার। একটা ড্রয়িং রুম। একটা আত্মীয়স্বজন অতিথি এলে ব্যবহার করবে। বড়ো বড়ো ঘর হবে। বড়ো বড়ো জানালা থাকবে। সামনে পিছনে চওড়া বারান্দা। তেতলা করে লাভ নেই। বরং ওই টাকাটা দোতলার পিছনেই খরচ হবে। যাতে বাড়ির মতন বাড়ি হয়। লোকে দেখে বলুক, হ্যাঁ একখানা বাড়ি করেছে বটে জগমোহন ডাক্তার। সরযূর সেই উৎসাহমণ্ডিত বড়ো বড়ো চোখ দুটো আজও জগমোহনের চোখের সামনে ভাসে। জগমোহন বুঝি সে বছর বাড়ির কাজ আরম্ভ করে দিতেন। সিমেন্টও প্রায় জোগাড় করে ফেলেছিলেন। ইঁট সুরকির বায়না দিতে যাবেন। কিন্তু সব কেমন অন্যরকম হয়ে গেল। তাঁর মাথার ওপর যে এত বড়ো বিপদের খাঁড়া ঝুলছিল তিনি কি জানতেন, তিনি জানতেন না, সরযূ জানত না। তাঁরা কল্পনা করতে পারেননি তাঁদের উনিশ বছরের ছেলে পরিমল এমন একটা ভয়ংকর কাজ করে বসবে। পরিমল তাঁদের প্রথম সন্তান। তখন সে কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্র। পরিতোষও সে বছর স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে কলেজে ঢুকেছিল। কত আশা জগমোহনের মনে, কত বড়ো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি ও তাঁর স্ত্রী। তাঁদের দুই ছেলে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করল। মেজো ছেলে ইঞ্জিনীয়ার হবে, বড়ো ছেলে বি এস-সি পাশ করে ডাক্তারি পড়বে--জগমোহনের মতন ডাক্তার হবে। বাড়ি তৈরির প্ল্যান নিয়ে যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনার শেষ ছিল না, তেমনি ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়েও তাঁরা কত কথা বলতেন। জুলাই মাসের একটা সন্ধ্যা। তারিখটাও মনে আছে জগমোহনের। বাহিরে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। একটু সর্দি জ্বরের আক্রমণ হয়েছিল বলে জগমোহন সেদিন আর চেম্বারে যাননি। নিজের ঘরে বসে সরযূর সঙ্গে কথা বলছিলেন। ছেলেদের কথাই বলছিলেন। ছোটো ছেলে সুকোমল সেবার ফার্স্ট হয়ে স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছে। পরিমল এবং পরিতোষের চেয়েও সুকোমলের মাথা পরিষ্কার। ইংরেজী বাংলা অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল—সব বিষয়ে পরীক্ষায় রেকর্ড মার্ক পেয়ে সে নীচের ক্লাস থেকে ওপরের ক্লাসে উঠছিল। সুকোমল ইঞ্জিনীয়ার হবে, ডাক্তার হবে, অধ্যাপক হবে, নাকি আইন পড়ে উকিল ব্যারিস্টার হবে জগমোহন ও তাঁর স্ত্রী যেন ভেবে ঠিক করতে পারছিলেন না। তাঁদের আর দুটি সন্তানের মতন না সুকোমল। বেশ একটু ভিন্ন প্রকৃতির। খেলাধূলা কম ভালোবাসে, অন্য ছেলেদের সঙ্গে তেমন মিশতে চায় না। স্কুলের সময় ছাড়া অধিকাংশ সময় ঘরে থাকতে ভালোবাসে। সারাক্ষণ একটা বই নিয়ে বসে আছে। জগমোহন ভাবতেন ছেলে বুঝি তার ক্লাসে পড়ার বই-ই কেবল পড়ছে। কিন্তু একদিন তার হাতের বইটা দেখে তিনি অবাক হলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত। আর একদিন দেখলেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে সুকোমল

ভগবদ্গীতার বাংলা অনুবাদ পড়ছে। বাড়িতে এই ধরনের কিছু বই আলমারিতে তোলা ছিল। জগমোহন কোনোদিন এসব বই পড়ার সময় পাননি। সময় পাননি বললে ভুল হবে। ধর্মগ্রন্থ বা সাধুসন্তদের জীবন বা উপদেশামৃত নিয়ে লেখা কোনো বই পড়ার আগ্রহ তাঁর কোনোদিন হয়নি। কেন হয়নি তিনি তা নিয়েও মাথা ঘামাননি। তা ছাড়া নাটক নভেলও এই জীবনে তিনি বড়ো একটা পড়েননি। যতদিন ছাত্র ছিলেন পরীক্ষা পাশ করার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্য বইগুলি শুধু পড়েছেন। ডাক্তারি পড়ার সময়ও দাগ দিয়ে দিয়ে রাত জেগে মোটা মোটা বইগুলি মুখস্থ করেছেন। কিন্তু পাঠ্য পুস্তকের বাইরে আর কোনো বই পড়ার ধৈর্য তাঁর থাকত না। বরং তিনি খেলাধুলা করতে বেশি ভালোবাসতেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ভালো ফুটবল খেলতেন। ফুটবল খেলায় জগমোহনের যথেষ্ট নাম ছিল। পাশ করে বেরিয়েও তিনি মেডিকেল স্টুডেন্টস ক্লাবে অনেকদিন পর্যন্ত খেলেছেন। ক্রিকেটের দিকেও তাঁর ঝোঁক কম ছিল না। আজ বয়স হয়েছে। মাঠে নামবার শক্তি সামর্থ্য নেই। তা হলে হবে কী, সকাল বেলা খবরের কাগজ হাতে আসা মাত্র খেলার খবরের পৃষ্ঠাটি তিনি সকলের আগে মন দিয়ে পড়েন।

তা ছাড়া কলকাতার মাঠে ফুটবলের সিজনে যখন লীগ খেলা আরম্ভ হয়, কী শীতের দুপুরে ইডেনে উদ্যানে ক্রিকেট খেলার ধুম লেগে যায়, সময় ও সুযোগ করে জগমোহন প্রায়ই খেলা দেখতে ছুটে যান। যেদিন মাঠে যেতে পারেন না রেডিও খুলে দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে খেলার খবর শোনেন। এমন কী রুগী দেখতে গিয়েও জগমোহন কোনো কোনো বাড়িতে রিলে শুনতে বসে যান। এতে তিনি কোনোদিন লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন না। খেলা তাঁকে ভয়ানক আনন্দ দেয়। বই পড়ে তিনি সেই আনন্দ পান না। তবে এদিকে মাঝে মাঝে এক আধটা বই পড়তে চেষ্টা করেন। তাও বাংলা নাটক উপন্যাস বা ধর্মপুস্তক না। কাগজের মলাটের বিলাতী ক্রাইম নভেল। এসব বই ছেলে পরিতোষের কল্যাণে এ বাড়িতে প্রচুর আমদানি হয়। পরিতোষ ক্রাইম বইয়ের পোকা। রাত জেগে এক একটা বই শেষ করে ফেলে। তাই প্রায়ই পরিতোষের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলতে দেখা যায়। এই জন্য জগমোহন মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দেন। হয়তো রাত দেড়টার সময় জগমোহনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি বাথরুম যাবার তাগিদ অনুভব করলেন। দরজা খুলে দেখলেন ছেলের ঘরে আলো জ্বলছে। জগমোহন তৎক্ষণাৎ সেই ঘরের দরজার কাছে ছুটে গিয়ে বউমা অর্থাৎ রমলাকে ডাকতে আরম্ভ করেন। পরিতোষকে তিনি সরাসরি কিছু বলেন না। শ্বশুরমশায়ের হাঁকডাক শুনে রমলা হয়তো কপাট ফাঁক করে চৌকাঠের পাশে দাঁড়াল আর অমনি জগমোহনের সরোষ গর্জন আরম্ভ হল। চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি পরিতোষকে না, রমলাকে বকতে থাকেন : 'তোমার কি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই বউমা, রাত দুটো বাজতে চলল এখনো ঘরে আলো জ্বলছে।' যেন আলো জ্বেলে রাখার জন্য রমলা দায়ী, যেন সে-ই রাত জেগে বই পড়ছিল। আসলে রমলা দিব্যি তখন এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠে হাই তুলছে। তাই শ্বশুরমশায়ের কথা শুনে আড়চোখে সে পরিতোষের দিকে তাকিয়ে নীরবে ঠোঁট টিপে হাসে। পরিতোষও তখন টুঁ শব্দটি না করে হাতের বইটা বন্ধ করে সুইচ টিপে আলোটা নিবিয়ে দেয়। রমলাও আস্তে আস্তে কপাট বন্ধ করে দেয়। জগমোহন বাথরুমের

দিকে চলে যান। কিন্তু তখনও তিনি গজগজ করতে থাকেন। 'এত রাত জাগলে কখনো স্বাস্থ্য টেকে—তোমরা নিজেরা নিজেদের অসুখ ডেকে আন. কথায় কথায় যে তোমরা ভোগ তার নিশ্চয় একটা না একটা কারণ থাকে' ..... ইত্যাদি। হ্যাঁ. পরিতোষের বই পড়ার নেশা খুব বেশি। এমন কি বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজে যখন সে বাইরে বাইরে ঘোরে তখনও তার হাতে রঙিন কাগজের মলাটের একখানা ক্রাইম বই দেখতে পাওয়া যায়। রমলা বাংলা উপন্যাস গল্প কিছু কিছু পড়ে। পাড়ার লাইব্রেরী থেকে চাকর-দারোয়ানকে দিয়ে স্লিপ পাঠিয়ে এ বই সে-বই আনিয়ে নেয়। এ বাড়ির গীতা ভাগবত এবং অন্যান্য ধর্ম ও তত্ত্বমূলক বইগুলির একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন জগমোহনের স্বর্গীয় পিতা আনন্দমোহন। অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁরও পেশা ছিল ডাক্তারি। তবে তিনি ছিলেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এবং চিকিৎসায়ও তাঁর বেশ হাতযশ ছিল। কিন্তু থাকলে হবে কী: মনেপ্রাণে তিনি পেশাটাকে গ্রহণ করতে পারেননি। ধর্ম আলোচনা এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠে তাঁর উৎসাহ ছিল অনেক বেশি। আর সাধুসঙ্গ। কোথাও কোনো সাধুসন্ত এসেছেন শোনামাত্র তিনি মহাপুরুষকে দেখতে, তাঁর সঙ্গলাভ করতে পাগলের মতন ছুটে যেতেন। আর ছিল তীর্থভ্রমণের নেশা। হাতে কিছু পুঁজি জমলেই আনন্দমোহন কাশী গয়া মথুরা-বৃন্দাবনের টিকিট কাটতেন। দু মাস আড়াই মাস. কী কোনো কোনো বার আরও দীর্ঘ সময়, আরও দূরের তীর্থে তীর্থে কাটিয়ে পরে একরকম কপর্দকহীন হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন। অর্থ উপার্জনের দিকে মন ছিল না -যা ও কিছু উপার্জন করতেন ধর্মে-কর্মে তীর্থভ্রমণে সব শেষ করে দিতেন। কাজেই আনন্দমোহনের দারিদ্র্যদশা কোনোদিন ঘোচেনি। ইচ্ছা করেই যে আনন্দমোহন ঐ অবস্থা বরণ করেছিলেন. পরে বড়ো হয়ে জগমোহন বুঝেছিলেন। অত্যন্ত কষ্টের ভিতর তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে। মার চোখে জল দেখে শিশু জগমোহন কাঁদত। পেট ভরে খেতে পেত না, ছেঁড়া জামাকাপড় পরতে হত; বাবার নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে একটা নীরব অভিযোগ শিশুর বুকের ভিতরে সেদিন মাথা ঠুকে মরত। আনন্দমোহন শেষটায় লাল কাপড় পরতে আরম্ভ করেছিলেন; গলায় ঝুলিয়েছিলেন রুদ্রাক্ষের মালা। আনন্দমোহনের সেই বেশে তোলা একটা ফটো জগমোহনের শোবার ঘরে শিয়রের কাছে দেওয়ালে টাঙানো আছে। বড়ো ব্রোমাইড ফটো। সোনার জলে রঙ করা চওড়া ফ্রেমে বাঁধানো। জীবনে ঐ একটিমাত্র ফটো বুঝি আনন্দমোহন তুলিয়েছিলেন। আর কোনো ছবি নেই তাঁর। মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে আসার পর একদিন মার বাক্সের ভিতরে পাঁচরকম জিনিস ঘাঁটতে ঘাঁটতে জগমোহন বাবার ছবি- খানা আবিষ্কার করেছিলেন। তার ঠিক এক বছর আগে আনন্দমোহন নবদ্বীপে তাঁর গুরু-গৃহে দেহরক্ষা করেছিলেন। অসুস্থ গুরুদেবকে দেখতে গিয়ে আনন্দমোহন আর ফিরে এলেন না। জগমোহনের মা জগদ্ধাত্রী দেবী তারও দু বছর আগে মারা গিয়েছিলেন। মার কোনো ছবি নেই। এইজন্য জগমোহনের খুব অনুতাপ হয়। দুঃখকষ্টের মধ্যে সারাজীবন কাটিয়ে গেছেন মহিলা। নিজের একখানা ছবি করে রাখবার সুযোগ পাননি। বাবার ছবিও কি থাকত। তাঁর এক ভক্ত-শিষ্য ঐ ফটো তুলে রেখেছিল বলে এক কপি এ বাড়িতে এসেছিল। জগমোহন যত্ন করে ফটোখানা বাঁধিয়ে নিজের ঘরে রেখেছেন।

আজ জগমোহন রক্তাম্বর পরিহিত রুদ্রাক্ষের মালা গলায় আনন্দমোহনের সেই সৌম্য

প্রশান্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে কথাটা চিন্তা করেন। বিষয়বাসনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আনন্দমোহন কোন্ আনন্দ নিয়ে সারাজীবন মেতে ছিলেন? আর বিষয়সম্পদ জীবনের একমাত্র কাম্য একমাত্র লক্ষ্য ধরে নিয়ে সারাজীবন কেবল অর্থ উপার্জনে মত্ত থেকে জগমোহনই বা কতটা আনন্দ পেলেন এবং সেই আনন্দের রূপটাই বা কী। জগমোহনের মনে হয়, যেন জীবনখাতার পাতার একদিকে আনন্দমোহন একটা অঙ্ক করে রেখে গেছেন, পাতার অপর পৃষ্ঠায় জগমোহন আর একটা অঙ্ক কষছেন। কিন্তু দু'টো অঙ্কের ফল মেলাতে গিয়ে তিনি দেখছেন আনন্দমোহনের অঙ্ক নির্ভুল হয়েছে, জগমোহন কোথায় ভুল করে বসে আছেন। আদালতের বিচার শেষ হবার পর হাতকড়া পরানো দণ্ডিত আসামী পরিমলকে যেদিন তারা জেলখানায় নিয়ে গেল সেদিন বাড়ি ফিরে এসে আনন্দমোহনের ছবির সামনেই জগমোহন প্রথম দাঁড়িয়েছিলেন। আদালতের রায় শুনে জগমোহন কাঁদেননি। কিন্তু তখন তাঁর দুই চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছিল। সংসারের প্রতি প্রচণ্ড নিরাসক্ত ত্যাগী বৈরাগীর মুখখানা দেখতে দেখতে জগমোহনের মনে হয়েছিল, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা লোভ ও আসক্তি নিয়ে আমি সংসারধর্ম পালন করে চলেছিলাম, আজ তার পুরস্কার পেলাম। পরিমল তার দুষ্কৃতির জন্য দণ্ড লাভ করল, কিন্তু আমার জন্য সে যে দণ্ড রেখে গেল তা যে কত কঠিন কত দুর্বিষহ তার পরিমাপ করবে কে! জগমোহনের ইচ্ছা হয়েছিল ঘরসংসার ছেড়ে তিনিও কোনো দিকে চলে যাবেন. কিন্তু ইচ্ছা করলেই কি মানুষ বাসনা ছাড়তে পারে, বৈরাগী হতে পারে! পারে না। জগমোহনও পারলেন না। তার পরও তো কত দীর্ঘ বছর কেটে গেল. আজও তিনি এই সংসার কামড়ে পড়ে আছেন।

যে কথা হচ্ছিল, জুলাই মাসের বর্ষণমুখর সন্ধ্যা। সর্দিজ্বরে শরীরটা নরম হয়েছিল। জগমোহন বাড়ি থেকে বেরোননি। সরযূ কফি করে দিয়েছিল। গরম কফির পেয়ালার চুমুক দিতে দিতে জগমোহন স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। ছোটো ছেলে সুকোমলের মতিগতি বুঝতে তাদের কষ্ট হচ্ছিল। আর দুটি ছেলের মতন না সে। মেজো ছেলে পরিতোষকে বোঝা যায়— গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে, সিনেমা দেখতে ভালোবাসে; বন্ধুবান্ধব আছে. তাদের সঙ্গে আড্ডা দেয়, বেড়াতে যায়। তেমনি বড়ো ছেলে পরিমল। পরিমল তো জগমোহনেরই আর একটি সংস্করণ। নাক চোখ কপাল মাথার আকৃতি. হাঁটা-চলা কথা-বলা—সব জগমোহনের। জগমোহনের সঙ্গে এত বেশি মিল অন্য দুটি সন্তানের নেই। আবার জগমোহনের মতন খেলার দিকেও পরিমলের ভয়ানক ঝোঁক। ফুটবল ক্রিকেট দুটোর ওপরই তার সমান দখল। খেলায় কৃতিত্ব দেখিয়ে পরিমল অনেক কাপ মেডেল পেয়েছে। এককালে জগমোহন যেমন পেয়েছিলেন। জগমোহনের ট্রফিগুলির পাশে পরিমলের কাপ মেডেলগুলি আলমারীতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

কাজেই পরিমলকে সেদিন জগমোহন ও তাঁর স্ত্রী খুব ভালো বুঝতে পারতেন. মেজ ছেলে পরিতোষকেও বোঝা গিয়েছিল। পরিতোষ ইঞ্জিনীয়ার হবে—অঙ্কে তার মাথা পরিষ্কার. ড্রয়িং-এ হাত ভালো। কিন্তু পরিতোষের চেয়ে পরিমল শক্ত-সমর্থ বেশি। স্বাস্থ্যও ভালো। মনে সাহস রাখে বেশি। জগমোহনের সব কিছুই পেয়েছে যখন, তখন জগমোহনের পেশাটিও বড়ো ছেলে গ্রহণ করবে। পরিমল ডাক্তার হবে। কিন্তু সুকোমলকে নিয়ে যেন সমস্যা। এমন

ঘরকুনো হয়েছে ছেলে। কারোর সঙ্গে মেলামেশা করে না, খেলাধূলা ভালোবাসে না। কোণার দিকের আলমারীর পুরোনো বইয়ের গাদার ভিতর থেকে টেনে টেনে সেই বইগুলি বার করে যেগুলি একদিন কেবলমাত্র আনন্দমোহনের হাতেই দেখা যেত। কিন্তু আনন্দমোহন পরিণত বয়সে ঐ-সব ধর্মগ্রন্থ নিয়ে থাকতেন। কিছু বই তিনি জোগাড় করেছিলেন, কিছু কিনেছিলেন। ওপরের মলাট বিবর্ণ হয়েছে। ভিতরের পাতা হলদে রং ধরেছে। আজকাল যে-কোনো একখানা বাংলা বই হাতে নিলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তকতকে ঝকঝকে কাগজ, সুন্দর ছাপা, সুদৃশ্য রঙিন মলাট। আগে এত যত্ন নিয়ে বাংলা বই ছাপা হত না। নাটক নভেল তো নয়ই—পুরাণ ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থও যেমন তেমন করে ছাপা হত। অর্থাৎ কোনো রকমে হরফগুলি বোঝা গেলেই যেন পাঠক ক্রেতা সেদিন সন্তুষ্ট থাকত, ছাপা বাঁধাই গ্রাহ্য করত না। প্রবল তৃষ্ণার মুখে যে-কোনো একটি পাত্রে জল খেতে পেলেই মানুষ যেমন পরিতৃপ্ত হয়, পাত্রটি রূপোর কী কাচের কী মাটির তা লক্ষ্য করে না, তেমন আগের দিনের পাঠকও বই পেলেই খুশি হত, বই পড়ার তৃষ্ণাটাই তখন বড়ো ছিল—বইয়ের বহিরঙ্গ নিয়ে মাথা ঘামাত না। কিন্তু সুকোমল, এ-যুগের একটি ছেলে, সবে পনেরো বছর বয়স যার পূর্ণ হল, আনন্দমোহনের সেই জীর্ণ বিবর্ণ বইগুলি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছে দেখে জগমোহন স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। বড়ো ছেলে পরিমল অবিকল জগমোহনের মতন দেখতে, মেজ ছেলে পরিতোষ পেয়েছে সরযূর চেহারা—চেহারা স্বভাব দুইই। কিন্তু সুকোমল তাদের দুজনের কিছুই পেল না। পেয়েছে ঠাকুর্দার সেই আগুনের মতন তেজী গায়ের রং, তেমনি খড়্গের মতন প্রখর উন্নত নাক, প্রশস্ত ললাট। একডালিয়া রোডের বাড়িতে ছেলেদের পড়ার জায়গা ছিল একতলার পশ্চিমের একটা ঘরে। ঘরের সঙ্গে টানা বারান্দা ছিল। পশ্চিম দিকটা ফাঁকা ছিল। বারান্দায় দাঁড়ালে ক'টা নারকেল ও তাল গাছ চোখে পড়ত। সূর্যাস্তের দৃশ্যটি ভারী সুন্দর দেখাত সেখান থেকে। আজ নিশ্চয় ওই অঞ্চলে অনেক বাড়ি ঘর হয়েছে। ফাঁকা মাঠের ওপর তাল নারকেল গাছগুলিও হয়তো নেই। জগমোহন অবশ্য আর ওদিকে যাননি, ওই পাড়ায় যাবার মতন তাঁর মুখ নেই। তিনি অনুমান করছেন। কেননা বালিগঞ্জ টালিগঞ্জের সবটাই তো প্রায় এখন ঘিঞ্জি হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, একদিন বিকেলে সূর্যাস্তের লাল আলো ছড়িয়ে পড়েছিল পশ্চিমের বারান্দায়। স্কুল থেকে ফিরে এসে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে সুকোমল গীতা ভাগবত কী ঐ ধরনের একটা বই পড়ছিল। কেন জানি জগমোহন সেদিন, হ্যাঁ মনে আছে তাঁর, একটা ডিক্সনারী খুঁজতে ছেলেদের পড়ার ঘরে ঢুকেছিলেন। কিন্তু ঘরে কেউ ছিল না। জগমোহন বারান্দায় চলে গেলেন। সেখানে একজনকে দেখে তিনি চমকে উঠলেন, ভয় পেলেন, তাঁর হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে উঠল। তরুণ আনন্দমোহন ফিরে এসেছেন কি? ঐ তো ওখানে চেয়ারে বসে আছেন। উন্নত নাসিকা প্রশস্ত ললাট। অস্ত-সূর্যের রক্তরশ্মি লেগে আগুনের মতন গায়ের রঙ শতগুণ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। জগমোহনের চোখের পলক পড়ছিল না। বাবাকে দেখে সুকোমল হাতের বই বন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। যেন তখন জগমোহনের চমকের ভাবটা কাটল, আড়ষ্টতা দূর হল, তিনি স্বাভাবিক হতে পারলেন। না না, তুই বোস তুই বোস।

ডিক্সনারীর কথা ভুলে গেলেন। একটা বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে তিনি ওপরে চলে এলেন।

তার ক'দিন পরে, বাদলার সেই সন্ধ্যায় সরযূর সঙ্গে জগমোহন ছোটো ছেলের বিষয় নিয়েই বেশি আলোচনা করছিলেন। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে। এবং দুজন একটু হাসাহাসিও করেছিলেন। 'আনন্দমোহন দি সেকেণ্ড—' জগমোহন স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার শ্বশুরমশাই স্বর্গ থেকে ফিরে এসেছেন—তোমরা খুব বেশি বস্তুবাদী হয়ে উঠেছ কিনা—ভোগবিলাস নিয়ে মেতে আছে—ঠাকুর দেবতার নামটাম করছ না—তাই তোমাদের সাবধান করে দিতে তিনি আবার তোমাদের মধ্যে চলে এসেছেন।'

'তা যেন হল।' সরযূ কী ভেবে ঠোঁটের হাসিটা হঠাৎ মুছে ফেললেন। 'গীতা ভাগবত পড়ুক —ঠাকুর দেবতার নাম করুক—কিন্তু সত্যি যদি সুকু শেষ পর্যন্ত ঠাকুর্দার মতন স্বভাব পেয়ে বসে, তেমন মতিগতি—'

'দূর দূর—' যেন স্ত্রী মনের আশঙ্কাটা ঝেড়ে ফেলতে জগমোহন হাসিটাকে উঁচু পর্দায় তুলে দিয়েছিলেন। 'আজকালকার ছেলে—হয়তো একটু কৌতূহল হয়েছে—দাদুর বইগুলি নেড়েচেড়ে দেখছে—তা বলে কি আর সুকোমল আশ্রমে আশ্রমে ঘুরে সাধুসঙ্গ করবে—লাল কাপড় পরবে- রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ঝোলাবে? আমার তো মনে হয় না।'

'তা তুমি কিছু বলতে পার না।' তেমনি গম্ভীর থেকে সরযূ উত্তর করেছিলেন, 'মানুষের মন —কখন কোনদিকে ঝুঁকবে বলা মুশকিল। খুনে ডাকাত হতেও যেমন সময় লাগে না, তেমনি সাধুসন্ন্যেসী হয়ে ঘর-সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই বা কতক্ষণ—'

জগমোহন জিভ কেটেছিলেন। আর হাসেননি। গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'ছি ছি, খুনে ডাকাত হবে কেন আমার ছেলে। বংশের একটি ট্র্যাডিশন আছে তো। এই বংশে কেউ কোনোদিন খুন করেছে বা ডাকাতের দলে ভিড়ে ডাকাতি করেছে বলে জানা যায় না। তবে হ্যাঁ, সাধু সন্ন্যাসীর মতন জীবন-যাপন—কিন্তু তা-ও তোমার শ্বশুরমশায় যে ঠিক গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছিলেন তা তো নয়। শাস্ত্র চর্চা করতেন, সাধুসঙ্গ ভালোবাসতেন, তীর্থভ্রমণ করতেন -আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলতে পার।'

সরযূ আর কথা বলছিলেন না।

বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল।

জগমোহন বলছিলেন, 'তবে সেই যুগ আর এই যুগে অনেক তফাত। এটা যন্ত্রের যুগ, বিজ্ঞানের যুগ। ধর্ম নিয়ে মানুষ তেমন আর আলোচনা করে কোথায়। সাধুসন্তই বা তুমি ক'টি দেখতে পাও এখন। তোমার সুকুর একটু ঘরকুনো স্বভাব। তেমন করে সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে মিশতে পারে না। গীতা পড়ছে, পরমহংসদেবের কথামৃত পড়ছে, এটা তেমন কিছু না। হয়তো গল্পের বই তেমন পছন্দ করে না। একটু সিরিয়াস টাইপের ছেলে—পরিতোষ পরিমলের মতন না—বা এমনও হতে পারে, অবসর সময়ে আলমারীর পুরোনো পুঁথিপত্র কী আছে নেড়েচেড়ে দেখছে। স্কুল ফাইনালটা পাশ করুক, কলেজের হাওয়া গায়ে লাগলে ঘরকুনো স্বভাব আর থাকবে না।'

'আমার একটা ইচ্ছা—তোমার তাতে সায় আছে কিনা জানি না।' সরযূ এবার ঈষৎ হেসেছিলেন।

'কী বলো বলো।' কফির পেয়ালা নামিয়ে রেখে জগমোহন চুরুট ধরিয়েছিলেন। 'নিজের সন্তান সম্পর্কে মানুষ সদিচ্ছাই পোষণ করে। তুমি যদি সুকুর ব্যাপারে কিছু ভেবে থাক নিশ্চয় আমায় বলবে। যদি ক্ষমতায় কুলোয় তোমার ইচ্ছা আমি রাখব, রাখতেই হবে।'

'আমার ইচ্ছা সুকুকে ফরেন্ পাঠাই। বড়ো দু ছেলে তো দেশে থেকে লেখাপড়া শিখছে। সুকুকে না হয় বিলেত-টিলেত পাঠিয়ে—'

সরযূর কথা শেষ হবার আগে জগমোহন আবার শব্দ করে হেসে উঠলেন।

'একেই বলে intuition আশ্চর্য, পরশু রাত্রে আমিও ঠিক একথাই চিন্তা করছিলাম।' জগমোহন আরামকেদারায় শুয়ে ছিলেন। মাথা তুলে সোজা হয়ে বললেন, 'আমিও তাই ভাবছি। স্কুল ফাইন্যালটা দিক ও —তারপর আমি তাকে ইংলণ্ড, আমেরিকা—জার্মেনী-- খোঁজখবর নিয়ে দেখতে হবে কোথায় পাঠালে সুবিধা হবে –সেখানে পাঠিয়ে দেব। বিদেশের কোনো ইউনিভার্সিটিতে সুকু পড়বে—আর্টস, সায়েন্স—যা ওর ভালো লাগে। স্টুডিয়াস ছেলে—দেখছ না সারাদিন বই নিয়ে থাকতে ভালোবাসে—সুতরাং সুযোগ পেলে সে উন্নতি করবে। আর সে-সব দেশে বিদ্যাচর্চার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা এদেশের ছেলেরা এখন পাচ্ছে। কাজেই—'

সরযূর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আমি চাইছি এই পরিবেশ থেকে সরিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে অন্যরকম আবহাওয়ায় রেখে মানুষ করে তুলতে। আমার কেবল ভয়, কী জানি শেষটায় না শ্বশুরমশায়ের মতন—' একটু চুপ করে সরযূ বললেন, 'দেখছ না সারাদিন কেমন গম্ভীর হয়ে থাকে—যেন ওর মনে ও কী ভাবে। পরিতোষ পরিমলের সঙ্গেও ভালো করে কথা বলে না। তিনবার প্রশ্ন করলে তবে একটা কথার উত্তর দেয়। পরিতোষ তো এই জন্য সুকুর ওপর ভয়ানক চটা। বলে, ওটা জঙ্গল থেকে এসেছে। ভূতের মতন চুপ করে থাকে। আর ফাঁক পেলেই আলমারীর পুরোনো ছেঁড়াখোড়া বইগুলি ঘাঁটছে।'

'না না, আমার সুকোমল ভয়ানক পণ্ডিত লোক হবে। সাধু-সন্ন্যাসী হবার ভয় তুমি করছ—আমি সে ভয় করছি না। আমার কেবলই মনে হয় জ্ঞান আহরণের আকাঙ্খাটাই ওর প্রবল। সিরিয়াস টাইপের মানুষ। তাই এত চাপা, এমন চুপ চাপ থাকে। এই বয়সে যা হওয়া উচিত না। তাই মনে করছি জ্ঞানার্জনের পিপাসা যার এত বেশি তাকে এমন জায়গায় পাঠাতে হবে যেখানে জ্ঞানবিজ্ঞানের ছড়াছড়ি—অবশ্য বিদ্যাচর্চা এদেশে হচ্ছে না আমি বলব না—কিন্তু ইউরোপ আমেরিকার তুলনায় ইণ্ডিয়া অনেক পেছনে—গোটা এশিয়াটাই পেছনে পড়ে আছে। সায়েন্স বল আর্টস বল— তাদের তুলনায় আমরা শিশু— আমি আমার মেডিকেল সায়েন্স দিয়েই ব্যাপারটা বুঝতে পারছি—দিন দিন ওরা কতটা এগিয়ে যাচ্ছে—হা হা।'

'সেই ব্যবস্থাই কর।' সরযূ আবার গম্ভীর হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'এদিকে বাড়ির কাজে হাত দিচ্ছ—ছেলেকেও বিলেত পাঠাতে অনেক খরচ—দেখতে দেখতে ওর এখানের ইস্কুলের দুটো বছর কেটে যাবে—'

টাকার জন্যে তুমি ভেবো না।' জগমোহন ডাক্তার পূর্ববৎ মাথাটা এলিয়ে দিয়ে আরামকেদারায় শুয়ে পড়লেন। 'তোমার বাড়িও হবে—ছেলেও ফিরেন্ যাবে। দুটো কর্তব্যই আমি শেষ করব, তোমায় কথা দিচ্ছি।'

সরযূ পরিতৃপ্তির ঘন নিশ্বাস ফেলেছিলেন। চোখ দুটো আধখানা বুজে রেখে জগমোহন চুরুট টানছিলেন। বাইরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল। তাঁতী যেমন যত্ন করে কাপড় বোনে জেলে যেমন জাল বোনে তেমনি দুটি সুখী স্বামী স্ত্রী চুপ করে বসে থেকে তাদের আশা-আকাঙ্খা ও রঙিন কল্পনার সুতো টেনে এক উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য ভবিষ্যৎ বুনে চলছিল। আর তাদের অলক্ষ্যে একজন তখন ঠোঁট টিপে হাসছিল। কেননা সেই মুহূর্তে ডাক্তার জগমোহনের ঘরে বজ্রপাত হল। সেই ভয়ঙ্কর সংবাদ এসে পৌঁছল। কে খবরটা নিয়ে এসেছিল! পরিতোষ? সুকোমল? না না, তারা তো ভয় পেয়ে চোরের মতন পড়ার ঘরে ঢুকে আলো নিবিয়ে চুপ করে বসে ছিল। পরিমল, তাদের দাদা কী সাংঘাতিক কাজ করে বসেছে বাইরে থেকে দু'ভাই শুনে এসেছিল। কিন্তু দোতলায় উঠে এসে বাবা মাকে তা জানাবার মতন সাহস তাদের ছিল না। মধু দোকানের জিনিস কিনতে বাইরে গিয়েছিল। খবর শুনে সে আর জিনিস কিনতে পারেনি, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছিল বাড়িতে। মুখে বসন্তের দাগ, কালো রং, বেঁটে মতন দেখতে —মধুর চেহারা জগমোহন বুঝি কোনোদিন ভুলতে পারেন না। তারপরও এই দীর্ঘ দশ বছরের মধ্যে কত চাকর এসেছে কত চাকর কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু একডালিয়া রোডের বাড়িতে সেই বর্ষার সন্ধ্যায় দুর্মুখের মতন মধু সংবাদটা বয়ে এনেছিল বলে মধুর মুখের ছাপটা চিরকালের মতন জগমোহনের মনে দাগ কেটে বসে আছে। চাকরের কথা জগমোহন প্রথমে বিশ্বাস করেননি। আরামকেদারা থেকে লাফিয়ে উঠে মধুকে ধমক দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠেছিল। বালিগঞ্জ থানার ও সি জগমোহনকে খবরটা জানিয়ে দিলেন। সরযূ কাঁপছিলেন। কাগজের মতন সাদা হয়ে গিয়েছিল তাঁর মুখ। 'পরিমল কি রাত্রে বাড়ি ফিরবে না!' রুদ্ধস্বরে তিনি স্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন। জগমোহন মাথা নেড়েছিলেন। সংক্ষেপে বলেছিলেন, 'না, পুলিস কাস্টডিতে আছে।' সরযূ আর কথা বলতে পারেননি, দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি, মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, মূর্ছা গেলেন। সেদিন থেকে তাঁর ফিটের ব্যারামের সৃষ্টি। জগমোহন আচ্ছন্নের মতন কতক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে পরে আরামকেদারায় বসে পড়লেন। একটি মানুষ তাঁর পায়ের কাছে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে, তার শুশ্রূষা করা দরকার, চিকিৎসক হয়ে জগমোহন কথাটা ভুলে রইলেন। যেন তিনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না, দেখতে পাচ্ছিলেন না। বাইরে চতুর্গুণ শব্দ করে ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছিল, সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছিল, কোন দিকের একটা জানালার পাল্লা ধড়াস ধড়াস করে দেওয়ালের গায়ে বাড়ি খেয়ে গরাদের ওপর এসে আছড়ে পড়েছিল। কিন্তু সেসব কোনো শব্দই জগমোহন শুনতে পাচ্ছিলেন না। যেন তিনি বধির হয়ে গিয়েছিলেন। কেবল তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁর চোখের সামনে একটা কালো পর্দা ঝুলছে—সেই কালো কত গভীর এবং ব্যাপক এবং কতকাল তা স্থায়ী হবে উপলব্ধি করবার জন্য হাতের তেলো দিয়ে চোখ দুটো রগড়ে রগড়ে মাঝে মাঝে তিনি সেদিকে তাকাতে চেষ্টা করছিলেন।

॥ ২ ॥

সে বছরই জগমোহন একডালিয়া রোডের বাড়ি ছেড়ে দেন। কেননা এমন একটা সময় এসেছিল যখন তিনি রাস্তায় বেরোতে আর সাহস পেতেন না, কেমন খারাপ লাগত তাঁর, অস্বস্তিবোধ করতেন। যেন তাঁর মনে হত রাস্তায় বেরোলেই কেউ না কেউ তাঁকে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে, যেন কারা আঙ্গুল দিয়ে তাঁকে অস্ফুট চাপা গলায় বলাবলি করছিল, 'হ্যাঁ, ঐ যে যাচ্ছে, জগমোহন ডাক্তার--তার বড়ো ছেলের নামই পরিমল.........উঃ কী সাংঘাতিক ছেলে......'

এমন কী বালিগঞ্জে বাস করাই জগমোহনের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সবাই চেনে ডাক্তারকে। তাই সেখানে সব মানুষ যেন দিনের পর দিন কেবল একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল। একটি নাম সকলের মুখে মুখে ঘুরছিল।

একডালিয়া রোডের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে তিনি ঝামাপুকুর লেনে চলে এলেন। বালিগঞ্জ সেখান থেকে অনেক দূর। এমন কী সাউথ থেকে রুগী দেখার ডাক এলেও তিনি আর সেদিকে যেতেন না। কেস্ হাতে এলেও তা ছেড়ে দিতেন। লেকের ধারের জমিটাও তিনি বেচে দিয়েছিলেন। ঝামাপুকুর লেনের ভাড়া করা ছোটো দোতলা বাড়ির স্মৃতিও জগমোহন এ জীবনে ভুলতে পারবেন না। দুটো বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটেছিল সে বাড়িতে। সেখানে উঠে আসার পর দ্বিতীয় বছর সরযূ মারা যান। হার্টটা ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছিল তাঁর শেষ দিকে। খুব সাধারণ একটা অসুখের ধাক্কাও সামলাতে পারলেন না। প্যারাটাইফয়েড। জগমোহন বিস্মিত হননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সরযূর পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে। আলো নিভে যাবে। একডালিয়া রোডের বাড়িতে থাকতেই একটা বড়ো ধাক্কা সামলাতে গিয়ে তাঁর প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ঝামাপুকুর লেনের বাড়ির দ্বিতীয় বছর সরযূর মৃত্যু এবং তার পরের বছর সুকোমলের গৃহত্যাগ। জগৎবল্লভপুর চলে গেল ছেলে। সেখানে তার গুরুর আশ্রম। অবশ্য যাবার আগে জগমোহনের অনুমতি চেয়েছিল সুকোমল। জগমোহন অনুমতি দিয়েছিলেন। কেন দেবেন না। তিনি বাধা দেবার কে। তাঁর মনের অবস্থা তখন তাই দাঁড়িয়েছিল। কাকে তিনি ধরে রাখবেন। পরিমল যে এমন ভয়ংকর একটা কাজ করে জেলে চলে গেল তাকে তিনি ধরে রাখতে পেরেছিলেন? সরযূকে ধরে রাখতে পারলেন? সুকোমলকেও ধরে রাখলেন না। বিশেষ করে সে ঈশ্বরকে খুঁজছে। একটা বিশুদ্ধ পরিমণ্ডলের মধ্যে তার বাস করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করার কঠোর সঙ্কল্প নিয়ে গুরুর আশ্রয়ে চলে যেতে চাইছে সে। বুঝতে পেরে জগমোহন যেন ভিতরে ভিতরে পুলকিতই হলেন। হৃষ্টমনে তিনি সুকোমলকে আশ্রমে যাবার অনুমতি দিলেন। কিছুদিন ধরে, ঝামাপুকুর লেনের বাড়িতে থাকার পর থেকেই একটি ছেলে, সুকোমলের চেয়ে দু এক বছরের বড়ো হবে, পরিতোষের সমবয়সী হবে, ঘনঘন সুকোমলের কাছে আসতে আরম্ভ করেছিল। কবে কোথায় সুকোমলের সঙ্গে তার পরিচয় হল জগমোহন ছেলেকে প্রশ্ন করেননি। নাম চিত্তপ্রিয়। লম্বা ছিপছিপে রোগা মতন দেখতে। কালো মাজা রং। চোখ দুটো উজ্জ্বল, দাঁতগুলি পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে ঘনসন্নিবদ্ধ। হাসলে মনে হত মুখের ভিতর থেকে একটা আলোর আভা বেরিয়ে আসছে—চোখ তুলে তাকালে মনে হত চোখের ভিতর থেকে একটা জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে।

কিন্তু চোখ তুলে বড়ো একটা তাকাত না, খুব একটা হাসত না। শান্ত নিরীহ প্রকৃতি। মাথা নিচু করে থাকত। যুবকটিকে জগমোহনের ভালো লেগেছিল। সুকোমলের পড়ার ঘরে বসে দুজনে আনন্দমোহনের বইগুলি আলমারী থেকে নামিয়ে এক সঙ্গে বসে পড়ত এবং তারপর আলোচনা করত। গৈরিক বসন ছিল চিত্তপ্রিয়র। এই চিত্তপ্রিয়ই সুকোমলকে পরে জগৎবল্লভপুরের আশ্রমে নিয়ে যায়।

কিন্তু আশ্চর্য, ঝামাপুকুর লেনের বাড়িতে গেরুয়াবেশধারী একটি যুবক সুকোমলের সঙ্গে ঈশ্বর নিয়ে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করছে দেখতে পেয়েও জগমোহন এতটুকু ভয় পেলেন না, অস্বস্তিবোধ করলেন না। একডালিয়া রোডের বাড়িতে এমন জিনিস দেখলে তাঁর বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠত। তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। হয়তো চিত্তপ্রিয়কে তাড়িয়ে দিতেন। ভবিষ্যতে ঐ ছেলে যাতে বাড়িতে ঢুকতে না পায় তিনি সেরকম কিছু একটা ব্যবস্থাও করতেন। কিন্তু পরিমলের ঘটনার পর জগমোহন পৃথিবীটাকে অন্য চোখে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। অথবা বলা যায়, পৃথিবী একরকমই ছিল। আগে জগমোহনের দেখার মধ্যে ত্রুটি ছিল। পরিমল সেই ত্রুটি সংশোধন করে দিয়ে গেছে। তিনি পৃথিবীকে নূতন করে চিনতে আরম্ভ করেছিলেন, মানুষকে বুঝতে পারছিলেন। সরযূ তখনও বেঁচে ছিলেন। জগমোহন নিজের ভুলের কথা স্ত্রীকেও বুঝিয়েছিলেন। তাই বুঝতে পেরে অসুস্থ সরযূ বিছানায় শুয়ে থেকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখতেন বাড়িতে এক তরুণ সন্ন্যাসীর আসা-যাওয়া—দেখে চুপ করে থাকতেন। একডালিয়া রোডের বাড়িতে এমন কিছু ঘটলে কত হৈ-চৈ কান্নাকাটি অশান্তির ঝড় বয়ে যেত। অর্থাৎ জগমোহনের মতন তাঁর স্ত্রীও বুঝতে পেরেছিলেন নিজের মত করে সংসার সাজাব মনে করলেই তা সাজানো যায় না,নিজের মতন করে সন্তানকে গড়ব মনে করলেও গড়া যায় না। পরিমলকে দিয়ে তাঁদের সেই শিক্ষা হয়েছিল। ঝামাপুকুর লেনের বাড়িতে এসে সরযূ একদিনও ছোটো ছেলেকে 'ফরেন্'-এ পাঠাবার কথা উচ্চারণ করেছিলেন বলে জগমোহনের মনে পড়ে না।

বলতে কী আদালতের বিচারে যেদিন বড়ো ছেলের দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হয়ে গেল ঠিক সেদিন থেকে যেন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী কেমন একটু অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়লেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন, নিজের অধিকার সম্পর্কে খুব একটা সচেতন থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিছু কিছু অধিকার আর একজনের ওপর ছেড়ে দিতে হয়। তাতে শান্তি আছে তৃপ্তি আছে। আনন্দমোহন বুদ্ধিমান ছিলেন। তাই নিজের সবটুকু অধিকারই একজনের ওপর ছেড়ে দিয়ে শিশুর মতন স্বচ্ছন্দচিত্ত হয়ে আশ্রমে আশ্রমে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে পেরেছিলেন।

জগমোহন সুকোমলকে বাধা দিলেন না। সরযূ বেঁচে থাকলে তিনিও দিতেন না। সুকোমল আশ্রমে চলে গেল।

তারপর আর জগমোহন ঝামাপুকুর লেনের এত বড়ো দোতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকবার প্রয়োজনবোধ করলেন না। পরিবারে আর রইল কে। তিনি ও পরিতোষ। ঝামাপুকুরের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে তিনি কৃষ্ণদাস পাল লেনের ছোটো বাড়িতে চলে এলেন। কিন্তু বাড়ি যেমন হোক, বাড়ি থেকে বেরিয়ে মর্নিংওয়াক্ করার এত অসুবিধা ভোগ করেছেন তিনি ওই পাড়ায় ! আজ তাঁর সেই দুঃখ ঘুচেছে।

অবশ্য পরিতোষের চেষ্টা ও আগ্রহ না থাকলে কিছুতেই এই অঞ্চলে তাঁর জমি কেনা হত না, বাড়ি করা হত না। যেন বাবার বেড়াবার অসুবিধা হচ্ছে একমাত্র এই কারণে পরিতোষ উঠে পড়ে লেগেছিল এখানে চলে আসতে। এমন কী জমি কেনার পরেও জগমোহন দ বছর চুপচাপ বসে ছিলেন। মানসকি অবস্থার দরুণ কিছুতেই তিনি বাড়ি করার উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। বাড়ির কথা উঠলেই সরযূর কথা মনে পড়ত। বেচারা 'বাড়ি' 'বাড়ি' করে কত কান্নাকাটি না করে গেছে, কত মান অভিমান। শেষ পর্যন্ত অভিমান নিয়েই সে মরল। কথাগুলি মনে হলে আজও জগমোহনের চোখে জল আসে। কিন্তু তারপর জগমোহন যখন চিন্তা করে দেখলেন পরিতোষকে বিয়ে করাতে হবে—বৌ নিয়ে এমন একটা ছোটো ঘরে সে থাকবে কেমন করে, তখন তিনি বাড়ির কথা আর চিন্তা না করে পারলেন না। এদিকে বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কি জগমোহনকে কম যুদ্ধ করতে হয়েছে ছেলের সঙ্গে। কিছুতেই সে এখন বিয়ে করবে না। দাদা জেলে আছে—দাদার আজও বিয়ে হল না, এই অবস্থায় তার বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না। তখন জগমোহন ছেলেকে বুঝিয়েছেন, তিনি বুড়ো হয়েছেন, তাঁর সেবা শুশ্রূষা করার জন্য একটি বউয়ের দরকার। 'তোর মা নেই—অসুস্থ হয়ে সে বিছানায় শুয়ে থাকলেও আমার একটা সান্ত্বনা থাকত—কেন না অসুস্থ অবস্থায়ও সরযূ প্রতি মুহূর্তে আমার স্নান খাওয়া সময়মতো হল কিনা, বিশ্রাম করা হল কিনা, ধোপাবাড়ি থেকে জামাকাপড় ধুয়ে এল কিনা—এমন কী আমি কখন দাড়ি কামাব, টাইটা ঠিকমতো বাঁধা হল কিনা, খুঁটিনাটি জিনিসগুলিরও খোঁজখবর নিত। আজ আর কেউ নেই সে সব কথা জিজ্ঞেস করতে—কেউ নেই মাথাটা ধরেছে যখন আর একটু বিশ্রাম করে বাড়ি থেকে বেরোতে বলতে।' জগমোহনের কাতর চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে পরিতোষ আর কথা বলেনি। তা ছাড়া পরিমলের কাছে চিঠি লিখে তার মতামতও জগমোহন জেনে রেখেছিলেন। অবশ্য অন্য সব কথার সঙ্গে কৌশল করে জগমোহন চিঠিতে পরিতোষের বিয়ের প্রস্তাবটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।। কিন্তু চিঠির উত্তর দেবার সময় পরিমল সকলের আগে পরিতোষের বিয়ের কথাই উল্লেখ করেছিল। ভালো মেয়ে পেলে পরিতোষ যেন বিয়ে করে ফেলে। দাদা হয়ে সে অনুমতি দিচ্ছে। তার জন্য পরিতোষকে অপেক্ষা করতে হবে না। চিঠিতে পরিমল বাবার সেবাশুশ্রূষার কথাও উল্লেখ করেছিল। অন্তত বাবাকে এই বয়সে দেখাশোনা করার জন্য ঘরে একটি বউ আনা এখুনি দরকার। জেলের ছাপ মারা সেই চিঠি জগমোহন পরিতোষকে দেখিয়েছিলেন। তারপর পরিতোষ বিয়ের কথায় আর আপত্তি করেনি। পরিতোষ ও রমলার বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছে। জগমোহন এটা বেশ উপলব্ধি করতে পারেন। রমলার মতন মেয়ে হয় না। কেবল সুন্দরী শিক্ষিতা বলে নয়, তার প্রকৃতিটাই মধুর শান্ত। সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে জগমোহন এই জীবনে কম দেখেছেন কি। সেই সঙ্গে দেখেছেন অনেক চাপল্য উচ্ছৃঙ্খলতা অহংকার অসংযম। বলতে কী পুত্রবধূ রমলার জন্যই যেন জগমোহন এদিকের এই ক'টা বছর নানাবিধ দুশ্চিন্তা উদ্বেগ ও সেই সঙ্গে অন্তরের ক্ষোভ ক্ষত সন্তাপ ভুলে থাকতে পেরেছেন। রমলার শ্রদ্ধা ও যত্ন পেয়ে তিনি প্রাণ ফিরে পেয়ে উঠেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। দেখতে দেখতে পরিতোষ ও রমলার বিবাহের চার বছর পূর্ণ হতে চলল। সম্ভবত আগামী আটাশে আশ্বিন তাদের বিবাহবার্ষিকীর সেই শুভ দিনটি। এই তারিখ আরো



তিনবার এসেছে, কিন্তু কোনোরকম উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি। পরিতোষ করতে দেয়নি। দাদা জেলে—সুকোমল আশ্রমে- -কাজেই আনন্দ করার মতন তার মনের অবস্থা ছিল না। কিন্তু এবার যেন ছোটোখাটো একটু অনুষ্ঠান করার জন্য পরিতোষ ও রমলা তৈরি হচ্ছে---যেন রমলার উৎসাহই বেশি। জগমোহন কদিন ধরে লক্ষ করছেন। ভালো, তিনি তো চানই প্রতি বছর তারা বেশ ঘটা করে তাদের বিবাহবার্ষিকী পালন করুক। শুভ পরিণয়ের দিনটি দুজনের মনে চির নূতন চির উজ্জ্বল হয়ে থাকুক। দেখতে দেখতে জগমোহনের 'দাদু' অর্থাৎ নাতি শ্রীমান দীপঙ্কর ওরফে দীপু, তিনের ঘর পার হয়ে চার-এ পা দিল। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই রমলার এই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। কাজেই দীপুর বয়স নিয়ে জগমোহনের কোনোদিন গোলমাল হয় না।

হাঁটতে হাঁটতে জগমোহন আজ অনেক দূর এসে গেলেন। যেন ঝোঁকের মাথায় তিনি এতটা পথ হাঁটলেন। সামনে সেই সল্ট লেক—লবণ হ্রদ। কিন্তু এখন আর হ্রদের জল নেই ঢেউ নেই। জায়গায় জায়গায় নল হোগলার সেই বন আর নেই। ক বছর আগেও জগমোহন যখন পরিতোষকে নিয়ে জমি কিনবেন বলে ঘুরতে ঘুরতে এদিকে চলে এসেছিলেন তখন এসব ছিল। জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরছিল। বস্তুত মাছের চাষের জন্যই এই কৃত্রিম হ্রদ অর্থাৎ ভেড়ির সৃষ্টি হয়েছিল। এখন জগমোহন সল্ট লেকের আর এক রূপ দেখলেন। পাইপ দিয়ে গঙ্গা থেকে বালি টেনে এনে সব ভরাট করে ফেলা হয়েছে। যেন বিশ্বাস করা যায় না এত জল গেল কোথায়, সেই গভীর হোগলা নলের জঙ্গলের বা কী হল। যত দূর চোখ যায় বালি ধূ ধূ করছে। এখনও ঘাস জন্মায়নি। জমির সবুজ রং ধরেনি, আশ্বিনের সকালের হলদে রোদ লেগে সাদা বালি চিকচিক করছে। এখন তা হলে এটাকে লবণ হ্রদ না বলে লবণের মরুভূমি বলা যায়। কথাটা চিন্তা করে জগমোহন নিজের মনে হাসলেন। দূরে এক ঝাঁক কাদাখোঁচা কাদার বদলে শুকনো বালি খুঁড়ে খাদ্য খুঁজে হয়রান হচ্ছিল। অবশ্য এই রূপেরও পরিবর্তন হবে। দিগন্তপ্রসারী ধূ ধূ মরুভূমি থাকবে না। বাড়ি হবে রাস্তা হবে; দোকানপাট বাজার হাসপাতাল পার্ক সিনেমা হল, স্কুল শুঁড়িখানা কত কী হবে— হয়তো ট্রাম বাসও হুড়হুড় করে চলতে আরম্ভ করবে। কলকাতা শহরে মানুষ ধরছে না। তাই গঙ্গার তল থেকে বালু টেনে এনে এই বিশাল ভূখণ্ড সৃষ্টি। শহরের এত কাছে কেবল জল আর হোগলার বন আধুনিক সভ্যতা সহ্য করবে কেন।

রোদ চড়তে আরম্ভ করেছে।

জগমোহন এবার বাড়ির পথ ধরলেন।

কিন্তু হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন, মাথাটা একটু ধরেছে, কপালের দুপাশে রগ টিপ টিপ করছে।

জিভটাও তেতো তেতো ঠেকছে। এর সঙ্গে একটা অবসাদ, গা গুলানো ভাব। বাইল্ সিক্রিশন্ --পরিমিত পিত্তনিঃসরণের অভাব ঘটলে যা হয়। চোখ দুটো পর্যন্ত জ্বালা জ্বালা করছিল। রোদ চড়ছে। কিন্তু তেমন একটা বেলা হয়নি। জগমোহন হাতের ঘড়ি দেখলেন। পৌনে সাতটা। কাজেই এমন কিছু রৌদ্রে তিনি ঘোরেননি যে হঠাৎ এতটা ক্লান্তি, অস্বস্তি বোধ করবেন

ঠিক এমন হয়েছিল আর এক দিন।

কপালের রগ দুটো টিপ টিপ করছিল। জিভটা বিস্বাদ, তেতো ঠেকছিল। হাঁটতে পারছিলেন না। যেন কত টায়ার্ড তিনি, যেন কত শত মাইল সমানে হাঁটছেন। অথচ গাড়ি থেকে নেমে জেলের ফটক পর্যন্ত পৌঁছতে ক পা-ই তাঁকে হাঁটতে হয়েছিল। কিন্তু মনে হচ্ছিল তিনি আর এক পা এগোতে পারবেন না, পড়ে যাবেন। আর সেই বিশ্রী মাথার যন্ত্রণা।

তারিখটাও পরিষ্কার মনে আছে জগমোহনের। উনিশে জানুয়ারী। সোমবার বেলা একটার সময়ও কুয়াশার ভাব কাটছিল না। আকাশের ঘোলাটে মেঘলা চেহারা। তার ওপর থেকে থেকে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। জেলের ফটকের মুখে সেই প্রকাণ্ড বটগাছের ডালে একটা ছেঁড়া ঘুড়ি আটকে ছিল, হাওয়ায় ঘুড়িটা কেঁপে কেঁপে নড়ছিল, আর ঝুরঝুর করে বটের শুকনো পাতা ঝরছিল।

ছবিটা পরিষ্কার মনে পড়ল জগমোহনের।

জুতোর চাপে শুকনো পাতার মচমচ শব্দ হচ্ছিল।

হ্যাঁ, যেদিন পরিমলকে তিনি প্রথম দেখতে গিয়েছিলেন। কলেজের ছাত্র জেলহাজতে ছিল। বিচারাধীন খুনী আসামী।

ঠিক সেই সব লক্ষণ আজ আবার জগমোহনের দেখা দিচ্ছে। এমন সুন্দর সকাল। পরিচ্ছন্ন নীল আকাশ। শরতের ঝকঝকে রোদ। জগমোহন জেলের দিকে যাচ্ছেন না। প্রাতর্ভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরছেন। তবু। আর কুড়ি গজ অগ্রসর হলে সরযূধামের ছাদ দেখা যাবে। সেখানে পরিতোষ আছে, রমলা আছে, দীপু আছে, দারোয়ান আছে, চাকর দীনদয়াল আছে। অত্যন্ত কাছের মানুষ। প্রিয় পরিচিত ক'টি মুখ। তবু জগমোহন টের পাচ্ছিলেন, পা দুটো ভারি হয়ে আসছে, তাঁর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। অথচ অন্যদিন বাদাম গাছটার কাছে এলে তিনি ছুটতে আরম্ভ করেন। দৌড়াতে থাকেন। কতক্ষণে বাড়ি পৌঁছবেন। রমলা চা নিয়ে বসে থাকবে।

অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করেছে দুজন। চোর চোর খেলা। একবার রমলা চোর হয়েছে, দীপু চোরকে খুঁজে বার করেছে। একবার দীপু চোর হয়েছে, রমলা তাকে খুঁজে বার করেছে।

চোর কখনও সূর্যমুখীর ঝোপের ভিতর, কখনও গোলাপ গাছের পিছনে গা-ঢাকা দিয়েছে।

আরও কত ফুলের গাছ আছে, কত ঝোপঝাড় আছে বাগানে। রাস্তার মানুষ দুধের মতো ধবধবে সাদা নূতন বাড়িটা দেখে যেমন মুগ্ধ হয় তেমনি বাড়ির বাগান দেখেও কম লুব্ধ হয় না। আট কাঠা জমির চার কাঠা জুড়ে কেবল ফুল আর ফুল। দেশি বিলাতি কত জাতের ফুলগাছ লাগান হয়েছে। জগমোহনের অনেক দিনের শখ বাগানের।

পরিতোষ ইঞ্জিনীয়ার। বাড়ি তৈরি করাই তার কাজ। আবার এই কাজ যখন সাধ ও স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায় তখন তা আর্টের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তাই এ বাড়ির ডিজাইন, দরজা জানালার কাজ, সিঁড়ি, একতলার বারান্দা, দোতলার ব্যালকনি, রেলিং, ছাদের ধারগুলি— এমন কী নীচের গাড়ি রাখার ঘরখানাও এত সুন্দর। যেন সব মিলিয়ে একটা ছবি দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ দিক খোলা। ছোটো একটা পার্কের মতন করা হয়েছে। রেলিংঘেরা একটুকরো

সবুজ জমি। সেখানে কোনোদিনই বাড়ি হবে না। এবং পার্ক ঘেঁষা আট কাঠার এই প্লটটা জগমোহনকে বেশ চড়া দামে কিনতে হয়েছিল।

পূর্ব ও পশ্চিমের অনেকগুলি প্লট এখনও খালি পড়ে আছে। বাড়ি হয়নি। কবে হবে, পূর্ব দিকের জমিতে আগে বাড়ি উঠবে, কী পশ্চিমের জমিতে, বলা মুশকিল। সে যাই হোক, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত—দুবারই একটা আশ্চর্য ছটা বাড়ির গায়ে এসে লাগে। তাই সকালের দিকে দুধের মতো সাদা ধবধবে সরযূধাম স্থলপদ্মের মতন ঈষৎ লাল হয়ে ওঠে, বিকেলের দিকে রক্তকমলের গাঢ় রং ধরে। স্ত্রীর নামে বাড়ির নাম দিয়েছেন জগমোহন। সরযূর কথামতন দোতলা বাড়ি করেছেন। তিনতলা হয়নি। অন্তত তিনি জীবিত থাকতে হবে না, পরে যদি পরিতোষ করতে চায় করবে।

হ্যাঁ, ছবির মতন বাড়ি, তেমনি বাড়ির সামনের ফুলবাগান। বাগানের কৃতিত্ব জগমোহনের। সারাক্ষণ গজ ফুটের অঙ্ক কষে আর চুণ সিমেন্টের হিসাব মাথায় নিয়ে ঘোরে ইঞ্জিনীয়ার। সে যদি আর্টিস্ট হতে পারে, ইঁট সিমেন্ট দিয়ে এমন সুন্দর একটি কবিতা সৃষ্টি করতে পারে তো ডাক্তারের কবি হতে, শিল্পী হতে দোষ কী। ছুরি কাঁচি সূঁচ নিয়ে তাঁরও কারবার, ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা লিখে দিতে দিতে তাঁরও আঙুল অসাড় হয়ে আসে। কিন্তু তাতে কী, তিনি মুমূর্ষুর মুখে হাসির রামধনু ফুটিয়ে তোলেন, নীরক্ত পাণ্ডুটে গালে আপেলের রং ধরিয়ে দেন, জীর্ণ অসাড় দেহে জীবনের ছন্দ ফিরিয়ে আনেন। সুতরাং তিনিও আর্টিষ্ট, তিনিও কবি। সরযূধামের ফুলের বাগান দেখে লোকে তাই বলে। ওদিকে গোলাপ আর সূর্যমুখী, এদিকে ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা। আবার ওপাশে রজনীগন্ধা লিলি পপি, এপাশে যূঁই চামেলি বেল গন্ধরাজ। ঋতুতে ঋতুতে বাগানের রং পাল্টায়, বুঝি গন্ধও। এক এক ফুলের এক এক রং, এক এক গন্ধ। আবার সব রং সব গন্ধ মিলেমিশে এক হয়ে যায় এমন ঋতুও আসে। বসন্ত, শরৎ। এখন বাগানে শরতের লীলাখেলা আরম্ভ হয়েছে। শিউলি ফুলে সাদা হয়ে আছে পুব পাড়া—দক্ষিণ পাড়ায় রক্তকরবীর সমারোহ। তেমনি পশ্চিমে সূর্যমুখীর হলুদ—উত্তরে গোলাপের লাল। কুন্দকলিরাও দুদিন পরে চোখ খুলবে।

সূর্য ওঠার আগে দুজন নেমে এসেছে বাগানে। মা ও ছেলে। এত সকালে তাদের ঘুম ভাঙবার কথা নয় যদিও। জগমোহন কিন্তু রোজ বলেন, আগেও বলতেন, পরিতোষ পরিমল যখন ছোটো ছিল, সুকোমল যখন সরযূর কোলে ছিল, আর্লি টু বেড অ্যাণ্ড আর্লি টু রাইজ—সকাল সকাল ঘুমোবে—আবার কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করবে। অন্ধকার পাতলা হয়ে পূব দিকে যখন ফর্সা হতে থাকে, লাল হতে থাকে, তখন বাতাসে অধিক পরিমাণে ওজোন পাওয়া যায়। এই কারণে আমাদের দেশের প্রাচীন মুনিঋষিরাও ব্রাহ্ম-মুহূর্তে শয্যাত্যাগের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। স্বাস্থ্যটি ভালো থাকে। ভোরের বাতাস গায়ে লাগালে ধনবান এবং জ্ঞানবান হওয়া যায় কি না জগমোহন জানেন না, তবে চিকিৎসক হিসাবে তিনি বুঝতে পারেন, অধিক রাত্রি জাগরণের ফলে নার্ভগুলি ক্রমাগত শিথিল ও দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর হজমের গোলমাল দেখা দেয়, চোখ খারাপ হয়, কিডনী বিকল হয় এবং আরো অনেক কিছু হয়। আর এটা তো জানা কথা, দেরিতে ঘুমোলে সকালেও ওঠা যায় না, সকালে উঠতে হলে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়তে হবে। এই জন্যই কথা দুটো একসঙ্গে এসেছে, আর্লি টু বেড

অ্যাণ্ড আর্লি টু রাইজ়। জগমোহনের উপদেশ সেদিন ছেলেরা শুনত বলে তাঁর মনে পড়ে না। সরযূও না। এক কান দিয়ে কথাগুলি শুনেছে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তবে উপদেশের একটা দিক তারা মেনে চলত। অন্তত পরিমল পরিতোষরা তাই করত। বই বন্ধ করে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ত ঠিকই। সরযূও মাঝে মাঝে সন্ধ্যা সাতটা বাজতে, বিশেষ করে শীতকালে, লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ত—কিন্তু ঘুম ভাঙত তাদের সেই সকাল আটটায়। জগমোহন হাসতেন। অর্থাৎ তাঁর উপদেশ শুনতে গিয়ে সবাই ঘুমের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। আজও তিনি উপদেশ দিয়ে চলেছেন। জানেন যদিও, তাঁর উপদেশে কাজ হবে না। বলার তাই বলে যাচ্ছেন। ডাক্তার মানুষ। তিনি তো অনেক কিছুই বলবেন, পচা বাসি খাবে না, খাবার ঢেকে রাখবে, মাছি বসতে দেবে না, রোজ কিছু একটা কাঁচা ফলমূল খাবে, আনাজ তরকারি ঢাকা দিয়ে রান্না করবে, তার আগে বাজার থেকে এগুলি আসামাত্র একটু পটাস পারমাঙ্গানেট দিয়ে ধুয়ে নেবে—আরো কত কী উপদেশ। পরিতোষের ঘুম ভাঙে সেই আটটায়—রমলা অবশ্য আর একটু আগেই ওঠে। তাও রোদ উঠে যায়। জগমোহন বেড়ানো শেষ করে তখন বাড়ি ফেরেন।

কিন্তু আজ এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল।

এটা হয়েছে দীপুর জন্য।

শ্বশুরমশায়ের হাঁক-ডাক শুনে রমলার ঘুমটা ভেঙে যায় বটে। কিন্তু শয্যাত্যাগ করা হয় না। কিছুতেই আলস্য কাটে না। এদিকে দীপুও জেগে ওঠে। পরিতোষের নাক ডাকতে থাকে। যেন তখন দুপুর রাত। তা বেচারার দোষ নেই। হয়তো ক্রাইম নভেল শেষ করে সেই রাত দুটোয় আলো নিভিয়েছে। আড়াইটা যে বেজে যায়নি, তাই বা কে বলবে। রমলা তো জেগে থাকেনি। কাজেই এ সময় পরিতোষের যাতে ঘুম না ভাঙে, সেজন্য রমলাকে ভয়ানক সতর্ক থাকতে হয়। রমলা দীপুকে নিয়ে একটা খাটে শোয়। পরিতোষের বিছানা অন্য খাটে। কিন্তু দীপু জেগে উঠেই বাবার বিছানায় চলে যেতে চায়। ঐ খাট, ঐ মশারি তার কাছে এ সময়টায় একটা বড়ো রকমের আকর্ষণ। মশারির ভিতর ঢুকে বাবার নাক টানতে, চুল টানতে, পা টানতে তার কচি হাত দুটো ছটফট করে। রমলা ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছেলেকে নিজের কাছে শুইয়ে রাখে, বুকের কাছে চেপে ধরে আদর করে, ফিসফিসে গলায় গল্প বলে। দুয়োরানী-সুয়োরানীর গল্প, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প। দীপু তখন শান্ত হয়। বাবার বিছানা ভুলে যায়।

আজ দীপু আগে জেগে উঠেছে। রমলার ঘুম ভাঙতে চোখ খুলে দেখল, ছেলে পাশে শুয়ে নেই। ধড়মড় করে খাট থেকে নেমে পরিতোষের খাটের কাছে ছুটে গেল রমলা। মশারির ধার তুলে দেখল পরিতোষ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। দীপু সেখানে নেই। তবে কি টেবিলের তলায় ঢুকে ছেলে খেলা করতে বসে গেছে। মাঝে মাঝে দীপু এমন করে। রমলা সুইচ টিপে আলো জ্বালল। টেবিলের নীচে কেউ বসে নেই। তখন রমলা দরজার দিকে তাকাল। যা সে সন্দেহ করেছিল। একটু আগে রমলা উঠে বাথরুমে গিয়েছিল। ফিরে এসে আর কপাটে খিল দেয়নি বা ছিটকিনি লাগায়নি। এখনি ভোর হবে ভেবে পাল্লা দুটো শুধু ভেজিয়ে

রেখেছিল। আর একদিন এমন হয়েছিল। বাথরুম থেকে ফিরে এসে রমলা দরজার খিল না এঁটে পাল্লা দুটো ভেজিয়ে রেখেছিল। বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘুমে তার দু চোখ জুড়ে গিয়েছিল। দীপু ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা দাদুর ঘরে চলে গিয়েছিল। জগমোহন তখন জামাকাপড় পরে বেড়াতে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। হঠাৎ এ সময় নাতিকে দেখে তিনি আহ্লাদে নেচে উঠেছিলেন। 'বাঃ রে বাঃ! এই তো চাই! আর্লি রাইজার—হুঁ, আমার দাদু শেষ পর্যন্ত আমার উপদেশ মনে রাখল—'

নাতিকে কোলে তুলে নিয়ে জগমোহন রমলার ঘরের দরজায় ছুটে এসে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছিলেন। 'দাদুকে একটা জামা পরিয়ে দাও বৌমা—ঠাণ্ডা লাগবে যে।'

রমলা ভয়ানক লজ্জা পেয়েছিল সেদিন।

জগমোহন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পর ছেলের গালে ঠাস ঠাস দুটো চড় বসিয়ে দিয়েছিল। 'দুষ্টু ছেলে, অসভ্য ছেলে—উদোম গায়ে দাদুর সঙ্গে পীরিত করতে বেরিয়ে গেলেন তিনি।' এত খারাপ লাগছিল তার কথাটা চিন্তা করে। শ্বশুরমশায় যদি ধমক দিয়ে ছেলেকে তাড়িয়ে দিতেন। না, কোলে নিয়ে একেবারে দোরের কাছে ছুটে এলেন। যেন রমলা জানত, জেগে জেগে দেখছিল, হতভাগা ছেলে খালি গায়ে বেরিয়ে যাবে।

আজ যে ছেলে আবার চোরের মতন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে, কে জানে। আজ অবশ্য গায়ে একটা পাতলা জামা আছে। কিন্তু তা হলেও এমন সময় ওঘরে গিয়ে তাঁকে বিরক্ত করা কেন। সেদিনের এত মার ভুলে গেছে! রমলা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর কোনোদিন এভাবে দোর খুলে রাখবে না। কিন্তু এখন তো ওখান থেকে ওটাকে উদ্ধার করে আনতে হবে। রাগে রমলার কান্না পাচ্ছিল। আজ না জানি শ্বশুরমশায় আবার কী বলে বসেন। এমন ঠোঁটকাটা মানুষ! রমলা সব সময় কেমন ভয়ে ভয়ে থাকে। অতিরিক্ত ভালো মানুষ বলেই আরো বেশি ভয়। বড়ো বেশি সত্য কথা বলেন, বড়ো বেশি স্পষ্ট কথা বলেন তিনি। সব সময় সকলের ভালোটা চাইছেন, তাই মানুষটি এত কড়া, এত শাসন উপদেশ, এত সতর্ক দৃষ্টি তাঁর সকল দিকে।

শ্বশুরমশায়ের ঘরের দিকে যেতে যেতে রমলা থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ ওদিকের রেলিংয়ের দিকে তার চোখ গেল। লাল হয়ে গেছে আকাশ। রমলা নিশ্চিন্ত হল। জগমোহন এত বেলায় ঘরে বসে থাকবেন বিশ্বাস করা যায় না। নিশ্চয় তিনি বেরিয়ে গেছেন। দু-পা অগ্রসর হতে সে তাই দেখল। তাঁর ঘরের দরজা ভেজানো। রোজ যাবার আগে পাল্লা দুটো বাইরে থেকে টেনে দিয়ে যান। তা না হলে সেই রাত সাড়ে চারটার পর থেকে, তাঁর বাথরুমে ঢোকা, হাত-মুখ ধোওয়া, জামা-জুতো পরা পর্যন্ত ঘরের দরজার পাল্লা হাঁ করে থাকে - আলোটা জ্বলতে থাকে। বেরোবার সময় আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করে যেতে একদিনও তাঁর ভুল হয় না।

তাই তো! তা হলে ছেলেটা গেল কোথায়।

'দীপু!' যেহেতু জগমোহন বাড়ি নেই, রমলা চিৎকার করে ছেলেকে ডাকতে পারত. কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে তার গলার ভিতরটা কেমন যেন জমে শক্ত হয়ে গেল। জগমোহন বেরিয়ে যাবার পর দীনদয়াল বারান্দার আলো নিবিয়ে দিয়েছিল। তাই বাইরে

আকাশ ফর্সা হতে থাকলেও বারান্দার ভিতরে ঝাপসা অন্ধকারটা রমলার চোখের সামনে থিক-থিক করে কাঁপছিল। তেমন ভালো করে কিছুই ও দেখতে পাচ্ছিল না। দেওয়াল ও দরজার রং একাকার হয়ে যাচ্ছিল। ঐ অবস্থায় জগমোহনের ঘর পার হয়ে আর একটা ঘরের সামনে পৌঁছে রমলা কাঠের মতন শক্ত হয়ে গেল।

একটু আগে জগমোহনও ঐ ঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পা দুটো ভারি হয়ে গিয়েছিল। বেতের লাঠি সমেত হাতের মুঠোটা শিথিল হয়ে এসেছিল। যেন হৃৎপিণ্ডের নিয়মিত স্পন্দনটাও মন্দীভূত হতে চলেছিল। তারপর অবশ্য জোর করে তিনি সেখান থেকে সরে গেছেন। যাবার সময় বন্ধ দরজার ওপর শঙ্কিত বিমূঢ় দৃষ্টি বুলিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন।

কিন্তু রমলা এত সময় পেল না।

বন্ধ দরজার পাল্লা দুটোর দিকে তাকাবার আগে ছোঁ মেরে দীপুকে সেখান থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে এল।

কী সাহস ছেলের! কড়া ধরে নাড়ছিল। 'জেঠামণি, জেঠামণি' করে ডাকছিল। যেন কত পরিচয়—তিন বছরের জীবনে কত দেখেছে সে জেঠামণিকে!

আবার আজ ছেলের গালে ঠাস ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল রমলা। আর ঘরে ফিরে গেল না সে। কেননা, চড়চাপড় খাবার পর শ্রীমান দীপঙ্কর এত বেশি চেঁচাতে আরম্ভ করে যে, মনে হয়, তখন দেওয়ালের আস্তর-টাস্তর খসে পড়বে। পরিতোষের ঘুম ভেঙে যাবে। না, পরিতোষের চেয়েও আর একজনের ঘুম ভেঙে যাবার আশঙ্কায় রমলার হৃৎপিণ্ড হিম হয়ে যাচ্ছিল।

ছেলেকে কোলে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল। কিন্তু নীচে এসে বসবে কোথায়—বসবার ঘর তালাবন্ধ করে রেখেছে দারোয়ান। জগমোহন মর্নিংওয়াক্ থেকে ফিরে এলে তবে সে-ঘর খোলা হবে। অন্য ঘরগুলি অবশ্য এমনিও বন্ধ থাকে। একতলার ঘরে শোবার মতন যথেষ্ট মানুষ নেই এ-বাড়িতে।

রমলা বাগানে নেমে গেল।

হিমে ভেজা ঠাণ্ডা শিরশিরে একটা যুঁইলতা তার গালে লাগল। ঘাসের শিশিরে পায়ের পাতা ভিজে গেল। রমলার খুব ভালো লাগছিল বাগানে ঢুকে। দীপু আর কাঁদছিল না—হঠাৎ এত ভোরে মা তাকে কোলে নিয়ে বাগানে চলে আসবে—তার স্বপ্নের বাইরে। কান্না থামিয়ে সে খিলখিল করে হাসতে আরম্ভ করল। কোল থেকে নেমে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল। যুঁই পাতা ছিঁড়ল কিছু, একটা গোলাপের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে কাঁটার খোঁচা খেল। কিন্তু কাঁদল না।

যেন সময় কাটাতে রমলা ছেলের সঙ্গে বাগানে ঘুরে ঘুরে চোর-চোর খেলল। দোতলায় ফিরে যেতে পারছিল না সে। যাবে—যখন পরিতোষের ঘুম ভাঙবে, যখন শ্বশুরমশায় ফিরে আসবেন। তখন আর ভয় করবে না; অস্বাভাবিক, অস্বস্তিকর, থমথমে মনে হবে না ওপরটা। যে কারণে একটু আগে সে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে সেখান থেকে চলে এল, পালিয়ে এল।

ঠিক ভয়ও তো বলা চলে না একে।

রমলা এখন চিন্তা করতে লাগল। ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়েছে সে। শিউলিতলায় একটা মোটা শিকড়ের ওপর পা ছড়িয়ে বসেছে। দীপুর শ্রান্তিক্লান্তি নেই। একগাদা শিউলি ফুল কুড়িয়ে নিয়ে এখন ঘাসের ওপর বসে সেগুলি দিয়ে নিজের মনে খেলছে। হলদে রোদে গাছের মাথা চিকচিক করে উঠল বলে। এখনও সোনার থালা হয়ে সূর্য হাসছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাজে লেগে যাবে। রৌদ্র ও তাপ ছড়াতে আরম্ভ করবে। দীপুর মাথার কাছে অতসী ফুলের মতন ছোটো একটা প্রজাপতি ঘুরে ঘুরে উড়ছে। অতসী ফুলের মতন কোমল হলুদ রং। দীপুর চুলের লালচে ভাবটা কাটছে না। আর একটু বড়ো হলে চুল কালো হবে। না-ও হতে পারে। বড়ো হয়েও কারো কারো চুল লাল থেকে যায়। কী মেয়ে, কী পুরুষ। রমলার মাথার চুল কালো। যাকে বলে ভ্রমরকৃষ্ণ রঙ।

কিন্তু রমলা অন্য কিছু চিন্তা করছিল।

হাতের লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে এখনি জগমোহন আসবেন। এসে মা ও ছেলেকে বাগানের তাজা হাওয়া গায়ে লাগাতে দেখে ভয়ংকর খুশি হবেন। খুশি হবেন, কিন্তু তখনি আবার চোখ দুটো গোল করে ফেলবেন। হাসিও থাকবে না। সাদা ভুরু জোড়ার মাঝখানে কপালের চামড়া কুঁচকে উঠবে। কুঁচকানো জায়গাটা একটু কাঁপবে। চশমার ভিতর নিষ্প্রভ চোখের মণি ঈষৎ চকচকে হয়ে উঠবে, ধারালো হয়ে উঠবে। আর সেই চোখের দৃষ্টি যে দীপুর খালি পা ও পরমুহূর্তে রমলার খালি পায়ের দিকে কঠোরভাবে নিবদ্ধ হবে রমলা যেন এখনই সেই ছবি দেখতে পাচ্ছিল। 'ভেজা ঘাসের ওপর খালি পায়ে হাঁটা অন্যায় বউমা— অনেকদিন তোমায় বলা হয়েছে। তোমার চটি কোথায়—আমার দাদুর পায়ে জুতো নেই কেন—।'

জগমোহন এসে না পড়তেই রমলা তাঁর মুখের অপ্রিয় সত্য কথাগুলি শুনছিল। আশ্চর্য, রমলা আজ যেন তা গ্রাহ্য করছিল না। বলেন বলবেন—শুনতে হয়, সে শুনবে, এমন একটা মনের ভাব নিয়ে শক্ত হয়ে বসে রইল। কেননা, এর চেয়েও একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে সে চিন্তা করছে। বাগানে নেমে আসার পর থেকে ক্রমাগত কথাটা ভাবছে। ফুলগাছের এই ঝোপ থেকে সেই ঝোপের কাছে ছুটে ছুটে দীপুর সঙ্গে খেলা করতেও একটা কাঁটার খচখচ বুকের ভিতর সে অনুভব করেছে। এখনও করছে। সেই ঘরের বন্ধ দরজার কাছ থেকে এভাবে দীপুকে সরিয়ে নিয়ে আসার কারণ কী। কড়া নাড়ার শব্দে মানুষটার ঘুম ভেঙে যাবে, বিরক্ত হবে, শুধু এই আশঙ্কায়? না হয় ঘুম ভাঙত, বিরক্ত হত—কতভাবেই তো দীপু সারাক্ষণ বাড়ির মানুষগুলিকে বিরক্ত করছে—শ্বশুরমশায়কে বিরক্ত করছে, পরিতোষকে করছে; ঠাকুর, চাকর, দারোয়ান, হাতের কাছে যাকে পাচ্ছে জ্বালাতন করছে ছেলে, যা দুষ্টু হয়েছে, চঞ্চল হয়েছে—কিন্তু এই কি সব? না কি আর কিছু ভেবেছিল রমলা তখন? ব্যালকনির বাইরে উষার রক্তিম ছটা, ভিতরে থমথমে অন্ধকার। রমলার গা এমন কাঁটা দিয়ে উঠল কেন হঠাৎ? তবে কি সে মনে করেছিল, দরজা খুলে মানুষটা বেরিয়ে এসে দীপুকে খুন করবে, ছুরি মেরে পেট ফাঁসিয়ে দেবে? তাই ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে সেখান থেকে সে তাড়াতাড়ি সরে এল! তাই বা কেন হবে।

কাল দুপুরের ছবিটা রমলার মনে পড়ল।

॥ ৩ ॥

দুটো বেজে গিয়েছিল। কিন্তু তারা অপেক্ষা করছিল সেই বেলা সাড়ে বারোটা থেকে। খাওয়ার পর জগমোহন কাল আর বিশ্রাম করতে বিছানায় শোননি। বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে ছিলেন। মাঝে মাঝে উঠে পায়চারিও করছিলেন। তাঁর চোখে-মুখে উদ্বেগ ছিল, অস্থিরতা ছিল। দীপুকে নিয়ে রমলা কতক্ষণ পর পর শ্বশুরমশায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। জগমোহন হাতের ঘড়ি দেখছিলেন, বাড়ির সামনের রাস্তাটা দেখছিলেন। 'আমার ঘড়ি কি ফাস্ট্ যাচ্ছে— তুমি একবার টাইমপিসটা দেখে এসো তো বউমা—দেড়টা বেজে গেল দেখছি!' রমলা ওপরে এসে শ্বশুরের টেবিলের টাইমপিস দেখে আবার নীচে নেমে গেছে, 'আপনার ঘড়ি ঠিক আছে। একটা পঁয়ত্রিশ।'

'কিন্তু এখনও আসছে না কেন ওরা।' উৎকণ্ঠা নিয়ে জগমোহন আবার রাস্তার দিকে তাকিয়েছেন। দীপু দাদুর জামার হাত ধরে টানছিল, হাজারটা প্রশ্ন করছিল। কিন্তু নাতির দিকে জগমোহন ভালো করে মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। হয়তো যখন বেশি বিরক্ত করছিল তখন তিনি দীপুর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, 'চুপ চুপ—চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক, এখনি জ্যাঠামণি আসবেন—বাবা নিয়ে আসবে।' দীপুও তখন, কোনোদিন যা দেখেনি, সেই জ্যাঠামণি বস্তুটাকে দেখবার কৌতূহল নিয়ে রাস্তা দেখছিল। জগমোহন বিকেলে চেম্বারে যাবেন না জানিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। সকালেও অল্প সময় ছিলেন। ফিরে এসেই চাকরকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে গেছেন। বিয়ের পর এ বাড়ি এসে একদিন শ্বশুরকে বাজারে যেতে দেখেছিল রমলা। দীপুর মুখেভাতের দিন। আর কোনোদিন দেখেনি। মাছ মাংস দই মিষ্টি ফল—অনেক কিছু কাল বাজার করে এনেছিলেন তিনি। কিন্তু বাজার করে এনেই তিনি কিছু নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে থেকে ঠাকুরকে রমলাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, মাছটা কেমন করে রাঁধতে হবে, মাংসে কতটা ঝাল পেঁয়াজ দিতে হবে। কাল রমলাকেও অনেকক্ষণ রান্নাঘরে থাকতে হয়েছিল। খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল জগমোহনকে। উৎসাহেরও অন্ত ছিল না। পরিতোষকে কাজে বেরোতে দেননি। বার বার টেলিফোন আসছিল। জগমোহন সংক্ষেপে কথা সারছিলেন—অথবা কেস বুঝে 'কল' ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন: অসুস্থ, শরীর ভালো না বলে বিদায় করছিলেন সকলকে। কিন্তু কাল বুঝি তাঁর শরীর অন্য যে কোনো দিনের চেয়ে অনেক বেশি সুস্থ ছিল—সতেজ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। গত চার বছরের মধ্যে রমলা শ্বশুরমশায়কে এতটা সজীব সক্ষম হয়ে চলতে ফিরতে কথা বলতে কী হাসতে দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। অবশ্য গত সাত আট দিন ধরেই তাঁকে একটু অস্বাভাবিক রকম ব্যস্ত চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখা গেছে। রমলার চোখে এটা অস্বাভাবিক ঠেকেছে—কেননা এ বাড়ি আসার পর থেকে একটা চাপা বিষণ্ণতা নিয়ে জগমোহনকে সে চলাফেরা করতে, কাজকর্ম করতে, খেতে, বসতে দেখছিল। কিন্তু মনের ভার কাটিয়ে ওঠা বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলা, হাল্কা হয়ে লোকের সঙ্গে কথা বলা ও হাসা যে এখন তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, রমলা তা-ও চিন্তা করেছে। বড়ো ছেলে বাড়ি আসছে। তাঁর মনে তো আনন্দ হবেই। ওপরের সবচেয়ে যেটা সুন্দর ঘর, দক্ষিণমুখো, জগমোহনের শোবার ঘরের পাশের সেই ঘরখানা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে। নূতন বাড়ি, ঘর এমনিই পরিষ্কার ছিল, এই পর্যন্ত সেই

ঘর ব্যবহার করা হয়নি, তালাবন্ধ ছিল, তা হলেও লোক লাগিয়ে মেঝেটা নূতন করে ঘসেমেজে আয়নার মতন ঝকঝকে করে তোলা হয়েছে। নূতন খাট এসেছে সেই ঘরে—ড্রেসিং টেবিল চেয়ার আলনা, বই রাখার সেলফ, ছোটো একটা আলমারী, টেবিল-ল্যাম্প, পাখা—ছেলের যাতে কোনোরকম অসুবিধা না হয়, কোনো কিছুর অভাব না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে ফার্নিচারের দোকান থেকে কী কী আনতে হবে জগমোহন এর মধ্যেই করে জানি একদিন বসে একটা ফর্দ তৈরি করে ফেললেন। তারপর সেটা পরিতোষের হাতে তুলে দিলেন। পরিতোষই সব কেনাকাটা করেছে। ইঞ্জিনীয়ার মানুষ, বহু কাঠের দোকান ফার্নিচারের দোকানের সঙ্গেই তার জানাশোনা। তাই ভালো জিনিসই তারা পরিতোষকে দিয়েছে। সবই সেগুন কাঠের। খাট ড্রেসিং টেবিল আলমারী দেখে রমলার খুব পছন্দ হয়েছে। এসব কেনাকাটা নিয়ে দুদিন পরিতোষকেও কম ছুটোছুটি করতে হয়নি। দাদা বাড়ি আসছে, দাদার ঘরটা ভালো করে সাজাতে হবে। যেন জগমোহনের চেয়েও পরিতোষের উৎসাহ উদ্যম ব্যস্ততা বেশি, রমলা লক্ষ্য করেছে। হ্যাঁ, কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই পরিতোষ বাগানে নেমে গিয়েছিল। কোনোদিন পরিতোষকে বাগানে ঢুকতে দেখা যায় না। তা ছাড়া এত সকালে তার ঘুমও ভাঙে না। খুব কৌতূহল হয়েছিল রমলার। মানুষটা হঠাৎ আজ বাগানে গেল কেন দেখতে রমলা জগমোহনের ঘরের সামনের ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাজামা পরা গেঞ্জি গায়ে লম্বা ছিপছিপে মানুষটিকে ঝোপঝাড়ের ভিতর মন্দ দেখাচ্ছিল না। পরিতোষ অন্য কোন ফুল গাছের কাছে না গিয়ে সোজা গোলাপ ফুলের কাছে চলে গেছে। বোঝা গেল ঘর থেকে বেরোবার সময় পেন্সিল কাটার ছুরিটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। রমলা অবাক হয়ে দেখছিল ছুরি দিয়ে কেমন কটাস কটাস করে পরিতোষ ডালপাতা সমত বড়ো বড়ো গোলাপগুলি কেটে একত্র জড়ো করছিল, সেই সঙ্গে আধফোটা কিছু কলিও তুলে আনছিল। সবগুলি একসঙ্গে বেঁধে এতবড়ো একটা তোড়া তৈরি করে পরিতোষ যখন ওপরে উঠে এল রমলা প্রায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল আর কি। যদি সে সত্যি তা করত তো বিশ্রী লজ্জায় পড়ত। দাদার ঘরের টেবিলের ফুলদানীতে তোড়াটা রেখে দিয়েছিল পরিতোষ। 'কেমন লাগছে—ঘরের শোভা আরো বেড়ে গেল না?' রমলার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল পরিতোষ। রমলা কথা না বলে কেবল ঘাড়টা কাত করেছিল। 'গোলাপ ফুল দাদা ভীষণ ভালোবাসত।' পরিতোষ যেন নিজের মনে বলছিল।

ভালোবাসত—কথাটা খট্ করে কানে লেগেছিল রমলার।

তাই তো বলবে পরিতোষ—রমলা পরে চিন্তা করেছে। দশ বছর যে মানুষ জেলে কাটাল আজও সে গোলাপ ভালোবাসে কিনা কে জানে। হয়তো পরিতোষের মনে সেই মুহূর্তে সংশয় জেগেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ি এসে টেবিলে এতবড়ো গোলাপের তোড়া দেখে তার দাদা কতটা উৎফুল্ল হবে ঠিক অনুমান করতে না পেরে পরিতোষ হতাশ হয়েছিল। পরিতোষের চোখ দেখে রমলা বুঝতে পেরেছিল। না হলে যে মানুষ এতক্ষণ বাগানে ছুটোছুটি করে গোলাপ তুলছিল, ওপরে এসে সেগুলি টেবিলে সাজাবার সময় চোখে মুখে যার উৎসাহ ধরছিল না, এখন সাজিয়ে রাখার পর, ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে হঠাৎ বাইরে আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পরিতোষ এমন বিষণ্ণ গম্ভীর হয়ে থাকবে

কেন। অবশ্য সেটা খুব অল্প সময়ের জন্য। তৎক্ষণাৎ সে ঘুরে দাঁড়িয়ে রমলার মুখ দেখছিল। 'চা হয়েছে?'

এবারও রমলা নীরব থেকে ঘাড় কাত করেছিল।

জগমোহন আগেই জেগে বসে আছেন। আশ্চর্য, তিনি প্রাতর্ভ্রমণ করতে কাল ভুলে গিয়েছিলেন। বা বলা যায়, ইচ্ছা করে বাড়ি থেকে বেরোননি। প্রাতর্ভ্রমণের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁর সামনে অপেক্ষা করছিল। পরিমল বাড়ি আসবে। আজ তার মুক্তির দিন। বেলা দশটার সময় পরিতোষ গাড়ি নিয়ে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের গেট-এ অপেক্ষা করবে। পরিতোষের সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলার জন্য জগমোহন বেড়াতে বেরোননি। অথচ রাত্রেও দুজন এই একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। না, শুধু রাত্রে কেন, সাত দিন ধরে জগমোহন ও পরিতোষের মধ্যে একথা ছাড়া আর কোনো কথা হয়েছে রমলা শোনেনি। এ বাড়ি এসে রমলা কালই প্রথম শ্বশুরকে মর্নিং ওয়াক্ ফেলে রেখে ঘরে বসে থাকতে দেখল। পরিতোষ দশটার আগেই বাবার গাড়ি নিয়ে চলে গেল। জগমোহন এক ঘণ্টার কম সময় চেম্বারে থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছেন। এসেই আবার চাকরকে নিয়ে বাজারে ছুটে গেছেন।

রোজ এগারোটার মধ্যে জগমোহনের মধ্যাহ্ন আহার শেষ হয়। কিন্তু কাল তিনি কিছুতেই খাবেন না। পরিমল আসুক পরিতোষ আসুক। এক সঙ্গে বসে খাবেন। রমলা ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করছিল। পরিতোষ বার বার বলে গেছে—বাবাকে খাইয়ে দেবে। চিকিৎসক হলেও জগমোহন নিজে প্রেসারের রুগী। তা ছাড়া পরিতোষ বলছিল তাদের দেরি হওয়া অসম্ভব না। জেল থেকে আসামী যখন খালাস পায়, তখন, তাদের কী সব ফর্মালিটিজ আছে, গেট-এর অফিসেও যেন কতক্ষণ সেজন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়। সুতরাং—

রমলা কিছুক্ষণ পর পর এসে শ্বশুরকে খেতে ডাকছিল।

তাঁর স্নান হয়ে গিয়েছিল। ট্রাউজার পরে এবং ডোরাকাটা একটা সিল্কের ফতুয়া গায়ে চড়িয়ে নিচের ঘরে বসে মেডিকেল জার্নালের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। পড়ছিলেন না। ভয়ঙ্কর একটা অস্থিরতা উদ্বেগ ভিতরে পুষে তিনি যে বইটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন রমলার বুঝতে কষ্ট হয়নি। কিন্তু কিছুতেই জগমোহন খেতে রাজী হচ্ছেন না। তারা এখনি এসে যাবে—এক সঙ্গে বসে---

যেন তিনি শিশু হয়ে গিয়েছিলেন, অবুঝ হয়ে গিয়েছিলেন।

নারকেলডাঙ্গা থেকে আলিপুর যাওয়া, তারপর ফিরে আসা—আজকাল রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, ট্রাফিকের যা চাপ—তাতেই যে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগা উচিত তিনি ভুলে যাচ্ছিলেন।

বারোটা বেজে গেল।

তখন, রমলার পীড়াপীড়ির জন্যই হোক বা অভুক্ত অবস্থায় এতটা বেলা বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল বলে হোক, জগমোহন খেয়ে নিলেন। পরিতোষ আছে, রমলা রয়ে গেল। সুতরাং এই বয়সে তাঁর এমন অনিয়ম করা উচিত না। খেতে বসে পুত্রবধূর কথা শুনে জগমোহন সন্তুষ্ট হলেন। তিনি রমলার মাংস রান্নার সুখ্যাতি করলেন।

খাওয়ার পর জগমোহন আর ঘরে ঢুকলেন না। নীচে বারান্দায় নেমে গেলেন। সেখানে চেয়ার পেতে বসে ঘন ঘন হাতের ঘড়ি দেখা আর রাস্তা দেখা চলল কতক্ষণ। তারপর যখন দেড়টা বেজে গেল তিনি কেমন হতাশ হয়ে পড়লেন।

'ঠিক কী—শেষ পর্যন্ত যদি রিলিজ অর্ডারের তারিখ পাল্টে যায়—' রাস্তা থেকে চোখ তুলে জগমোহন এক সময় কাতর স্বরে রমলাকে প্রশ্ন করেছিলেন।

সত্যি তিনি ছেলেমানুষ হয়ে গেছেন, রমলা দেখছিল, সেরকম কথা বলছেন, সেভাবে চিন্তা করছেন। সান্ত্বনার সুরে সে বলল, 'তা হবে কেন, তা হতে পারে না—দেরি হচ্ছে, তার মানে দুজন একসঙ্গেই আসবে—সেরকম কিছু গোলমাল থাকলে ও কখন ফিরে আসত।' পরিতোষের কথা বলছিল রমলা।

'তাও বটে।' কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে জগমোহন পুনরায় রাস্তার দিকে চোখ ফেরালেন। আশ্বিনের দুপুর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। মৃদুমন্দ বাতাস-বইছিল। যেন পুবের বাতাস। রৌদ্রের তাপ মেশানো। আবার বাগানে ফোটা গোলাপের সৌরভও মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছিল। একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছিল। বোঝা গেল দমদম ঘাঁটি লক্ষ্য। গুমগুম শব্দটা মিলিয়ে যেতে হঠাৎ চারদিক বোবা স্তব্ধ মনে হচ্ছিল। কিন্তু এক সেকেণ্ডের মধ্যেই আর একটা গুণগুণ শব্দ মাথার ওপর শুনতে পেল রমলা। কালো কুচকুচে একটা ভোমরা উড়ে এসেছে। সম্ভবত বাগানের ওদিক থেকে উড়ে এসেছে। জগমোহনের মাথার ওপর পাক খেয়ে খেয়ে শব্দ করে ঘুরছে। জগমোহনের খেয়াল নেই। তাঁর দৃষ্টি অন্য দিকে, মন বিক্ষিপ্ত। সুন্দর ভোমরাটাকে ভালো করে দেখতে রমলা বুঝি ঘাড় বেঁকিয়ে ওপরের দিকে তাকাতে যাচ্ছিল, এমন সময় গাড়ির হর্ন শোনা গেল। রমলা ঘুরে দাঁড়াল। জগমোহন স্প্রিং-এর মতন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ছোটোখাটো একটা ধুলোর ঝড় দেখা গেল রাস্তায়। এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জগমোহনের কালো অ্যাম্বেসেডার গাড়ি গেট-এর সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

দারোয়ান ছুটে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

জগমোহন এক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দীপু ছুটে গেল গাড়ির কাছে।

জগমোহনের পরিত্যক্ত চেয়ারের হাতল ঘেঁষে রমলা দাঁড়িয়ে ছিল।

পরিতোষকে প্রথম সামনের দরজা দিয়ে গাড়ি থেকে নামতে দেখা গেল।

নেমেই দীপুকে কোলে তুলে নিল। রমলা আশা করেছিল দু ভাই পাশাপাশি সামনের সীটে বসবে। কিন্তু দেখা গেল পিছনের দরজা দিয়ে জগমোহনের বড়ো ছেলে বেরিয়ে এল। লম্বা চওড়া জোয়ান পুরুষ। অবিকল জগমোহনের মুখের ছাপ। রমলা এ বাড়ি এসে বৃদ্ধ জগমোহনকে দেখেছে। আজ যেন শক্ত সমর্থ যুবক জগমোহনকে দেখল। পরিতোষের সঙ্গে ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এল। গাড়ি থেকে নেমে একবারমাত্র আকাশের দিকে, অথবা যেন নিজেদের নূতন বাড়ি দেখতে চোখ তুলে তাকিয়ে পরিতোষের দাদা আবার চোখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকিয়েছে। যখন দুই ছেলে সিঁড়ির কাছে এল জগমোহন আরো এক ধাপ নীচে নেমে বড়োছেলের হাত ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। রমলা লক্ষ্য করছিল,

জগমোহনের হাত কাঁপছে। কিন্তু ছেলে তাঁর হাত ধরবার আগে নুয়ে পা ছুঁয়ে তাঁকে প্রণাম করল। তারপর যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল জগমোহন বাঁ হাতখানাও বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর দুটো হাতই কাঁপছিল। জগমোহনের এভাবে হাত কাঁপতে রমলা আর কোনোদিন দেখেনি। দীর্ঘদিন পর ছেলেকে কাছে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে এমন হচ্ছে, না কি তিনি ইতস্তত করছেন, বিব্রত হয়ে পড়েছেন, ভাবছেন এভাবে জেলফেরত ছেলেকে অভিনন্দন জানানো ঠিক হবে কি না—রমলা ঠিক বুঝতে পারল না। জগমোহন অবশ্য দু হাত দিয়েই ছেলেকে স্পর্শ করলেন। তার চওড়া কাঁধের ওপর হাত দুটো রেখে তিনি কী যেন বলতে গেলেন, কিন্তু পারলেন না, ঠোঁট দুটো সামান্য নড়ে উঠে আবার স্থির হয়ে গেল। বাবার চোখের দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে ছেলে তৎক্ষণাৎ আবার মাটির দিকে তাকাল। জগমোহন হাত নামিয়ে নিলেন।

তাঁরা বারান্দায় উঠে এলেন।

'তোমার ভাসুর, বউমা—পরিতোষের স্ত্রী।' জগমোহন পরিচয় করিয়ে দিলেন। রমলা নুয়ে ভাসুরকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। রমলা সোজা হয়ে দাঁড়াতে যেন তার মুখ দেখতে পরিতোষের দাদা আর একবার চোখ তুলেছিল। পরক্ষণে চোখ নামিয়ে নিয়েছে।

রমলা অবশ্য তখন বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। দীপুকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে পরিতোষ গাড়িটা গ্যারেজে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। গাছের ছায়া লম্বা হতে আরম্ভ করেছে। কনকচাঁপার পাতাগুলি জোরে নড়ছিল, শব্দ হচ্ছিল, হাওয়ার বেগ বেড়েছে বোঝা যাচ্ছিল। গোলাপের মোলায়েম মিষ্টি গন্ধটা আর পাওয়া গেল না, যেন হাওয়ায় কোনদিকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

একটু আগে যেমন মনে হচ্ছিল, হঠাৎ আরো বেশি মনে হতে লাগল রমলার, চারদিকটা বড়ো বেশি স্তব্ধ শূন্য নির্জীব। চোখ ফেরাতে দেখল বারান্দা ফাঁকা। জগমোহন বড়োছেলেকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেছেন।

ঠিক তখন রমলার কেমন একটু ভয় করছিল। তাড়াতাড়ি বারান্দা ছেড়ে ঘাসের ওপর নেমে গেল। ছুটে গিয়ে দীপুর হাত ধরল। গ্যারেজে গাড়ি তুলে রেখে পরিতোষ সেখান থেকে বেরিয়ে আসছিল। পরিতোষ রমলাকে দেখে হাসছিল। রমলার মনে হল যেন কত যুগ পরে সে পরিতোষকে হাসতে দেখল। এবার বুকটা হাল্কা লাগছিল তার।

তা হলেও বাড়ির আবহাওয়া তেমন কিছু অস্বাভাবিক ঠেকছিল না কাল রমলার কাছে।

দুভাই এক টেবিলে পাশাপাশি চেয়ারে বসে খাচ্ছিল। রমলা পরিবেশন করছিল।

জগমোহন উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসে তাদের খাওয়া দেখছিলেন। খাওয়ার সময় কথা বলা প্রাচীন যুগে অচল অশাস্ত্রীয় ছিল কিনা রমলার জানা নেই, কিন্তু এযুগে যে এটা সভ্যতার অঙ্গ বিশেষ রমলা শুনেছে এবং নিজের চোখেও তা দেখেছে। বাপের বাড়িতে দেখে এসেছে, এখানে এসেও দেখছে। দিনের বেলা এক সঙ্গে বসে জগমোহন ও পরিতোষের খাওয়া বড়ো একটা হয় না। জগমোহন বেলা এগারোটায় ভাত খান। পরিতোষের খেতে খেতে একটা দেড়টা বেজে যায়। দূরে কোথাও কনস্ট্রাকশনের কাজ থাকলে মধ্যাহ্ন আহারের জন্য আর বাড়ি ফেরাই হয়তো তার হয় না। বাইরে কোথাও খেয়েটেয়ে নেয়। তবে সকালে

চায়ের সময় মাঝে মাঝে পিতাপুত্রের মিলন ঘটে। কিন্তু তাও খুব অল্পসময়ের জন্য। কেননা তখন আবার জগমোহনের চেম্বারে যাওয়ার তাড়া থাকে। আটটার মধ্যে তিনি সেখানে উপস্থিত থাকবেনই। তিনি পরের চাকরি করছেন না, প্র্যাক্টিস করছেন। এখানে তাঁর দায়িত্ব বেশি। কেননা তিনিই তাঁর মনিব এবং কর্মচারী দুই-ই। একদিন যেন কী কথায় জগমোহন হেসে রমলাকে বলেছিলেন, পরিতোষও উপস্থিত ছিল। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীতে অন্য আরো অনেক কাজ আছে, কিন্তু চিকিৎসকদের কাজের গুরুত্ব সকলের চেয়ে বেশি। কারণ এখানে মানুষের জীবনমৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত। দেরি করে চেম্বারে গেলে জগমোহনকে কেউ কিছু বলবে না ঠিকই, কিন্তু হয়তো গিয়ে দেখবেন এমন কোনও রুগী সেখানে অপেক্ষা করছে যে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ওষুধ না খাওয়ালে কী ইনজেকশন না দিলে রোগের মাত্রা আরো বেড়ে যেত, কষ্ট পেত, এমন কী তার জীবনহানিরও আশঙ্কা ঘটত। সকাল সাড়ে সাতটায় তিনি বেরিয়ে যান। কাজেই পরিতোষের সঙ্গে তখন যদি কোনো জরুরী কথাও থাকে শেষ না করেই জগমোহনকে উঠে পড়তে হয়। তাও সব দিন কি আর বাবার সঙ্গে বসে চা খাওয়া কথা বলা পরিতোষের হয়ে ওঠে! রাত্রে দেরি করে ঘুমোনো এবং সকালে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা যার স্বভাব। হয়তো জগমোহনের চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। তিনি বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। এমন সময় মুখ হাত ধুয়ে পরিতোষ বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। তার চা জুড়িয়ে গিয়েছিল বলে রমলা ওটা গরম করতে গিয়ে একদিন শ্বশুরের কাছে ভয়ানক ধমক খেয়েছিল। ভবিষ্যতে এটি করবে না। জুড়োনো চা গরম করে খেলে দেহের ক্ষতি করে। আমাদের শরীরের যন্ত্রগুলো বড়ো সূক্ষ্ম, বড়ো মসৃণ, আবার তাদের মেজাজ মর্জিও তেমনি, একটু অনিয়ম তাদের সহ্য হয় না, সহজেই রাগ করে, অভিমান করে বসে। মেজোবাবুকে জল ফুটিয়ে আবার চা করে দাও। বাবুর যখন নিদ্রাভঙ্গের সময়ের কিছু স্থিরতা নেই তখন প্রথমবার চা করে সেটা ফ্লাস্কে ঢেলে রাখলেও পার। যখন খুশি উঠে খাবেন। চা গরম থাকবে। দেরি করে পরিতোষের ঘুম ভাঙলে জগমোহন এভাবে একটু খোঁচা দিয়ে 'মেজোবাবু' 'বাবু' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেন। রমলার বেদম হাসি পায়। শ্বশুরের সামনে হাসতে পারে না। ঘাড় গুঁজে থাকে। পরিতোষও বাবার সামনে তখন সরাসরি উপস্থিত হতে সঙ্কোচবোধ করে। আড়ালে থেকে কথাগুলি শোনে। জগমোহন বেরিয়ে গেলে তবে সে চায়ের টেবিলে এসে বসে। আর রমলা তখন চায়ের কাপটি পরিতোষের সামনে রেখে দিয়ে বলে, 'এই যে মেজোবাবু, চা।' হয়তো সবটা বলে শেষ করতে পারে না, তার আগেই খিলখিল করে হাসতে থাকে। পরিতোষও সেই হাসিতে যোগ দেয়। দেরি করে কারোর ঘুম ভাঙলে জগমোহন যে ভিতরে ভিতরে কী ভয়ানক চটে যান এবং কেমন চমৎকার খোঁচা দিয়ে কথা বলেন রমলা ও পরিতোষ হাসির মধ্য দিয়েও তা উপলব্ধি করে বৈকি। হয়তো তারপর দু-একদিন পরিতোষ বাবার সঙ্গে বসে চা খেতে একটু সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে চেষ্টা করে। কখনো সফল হয়, কখনো শোচনীয় ব্যর্থতা বরণ করে নিয়ে বেলা আটটা পর্যন্ত নিশ্চিন্তে নাক ডাকাতে থাকে। জগমোহন ততক্ষণে চেম্বারে বসে রুগী দেখতে আরম্ভ করেছেন।

কাজেই দুজনের বেশির ভাগ কথা রাত্রে খেতে বসে হয়। সংসারের দরকারী কথা তো

আছেই— দরকারের বাইরেও বহু বিষয় নিয়ে জগমোহন ও পরিতোষ কথা বলেন। হয়তো তার মধ্যে হাসির কথাও থাকে। বাবা হাসলে ছেলে সেই হাসিতে যোগ দেয়—ছেলে হাসলে বাবাও হাসে। তখন দুজনকে কেবলমাত্র পিতাপুত্র মনে হয় না, মনে হয় তার চেয়েও বেশি, তারা পরস্পরের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ কেউ। যেন দুই বন্ধু গল্প করছে হাসছে। স্বাভাবিক। তিন ছেলের মধ্যে এক ছেলে জেলে, একটি আশ্রমবাসী, পরিতোষই বাবার কাছে আছে, বাবার সুখ দুঃখ দেখছে। তা ছাড়াও জগমোহন এখন বিগতদার, সুখ দুঃখের কথা মানুষ স্ত্রীর কাছে বলে, স্ত্রী না থাকলে ছেলে মেয়ের কাছে বলে—জগমোহনের কন্যাসন্তান নেই—ছেলে বলতে একমাত্র পরিতোষকেই তিনি সর্বদা হাতের কাছে পাচ্ছেন। এবং পরিতোষ উপযুক্ত ছেলে। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছে। ভালো চাকরি করছে। স্বভাবটা নম্র। কোনোদিন জগমোহনের অবাধ্য হয়নি। জগমোহন মনে কষ্ট পাবেন এমন কোনও কাজ করেনি। তার সাংসারিক জ্ঞান-বুদ্ধিও সুন্দর। কাজেই কোনো বিষয়ে পরামর্শ করতে জগমোহন পরিতোষের সঙ্গে করেন। পরিতোষও বাবার সঙ্গে কথা না বলে কোনো কাজ করে না। পরিমল ও সুকোমল জগমোহনের কাছে নেই—কিন্তু পরিতোষ ছায়ার মতন জগমোহনের সঙ্গে আছে। আর দুটি ছেলের অভাব পরিতোষ একাই পূরণ করছে, সময় সময় জগমোহন চিন্তা করেন। আর তখন পিতা হয়েও পুত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন পূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি ভাবতেই পারেন না, পরিমল ও সুকোমলের মতন এই ছেলে যদি তাঁকে ছেড়ে চলে যায় তিনি কেমন করে বাঁচবেন—একদিনও তাঁর পক্ষে চলা মুশকিল হবে।

কিন্তু কাল দু-ভাই যখন খেতে বসে কথা বলছিল জগমোহন নীরব ছিলেন। বড়ো ছেলে বাড়ি আসবে বলে কদিন ধরে তাঁর মধ্যে চঞ্চলতা অস্থিরতা দেখা যাচ্ছিল। ছেলে এসে পড়ার পর সেটা যেন আর ছিল না। একটু বেশি গম্ভীর দেখাচ্ছিল তাঁকে।

যেন গম্ভীর থেকে তিনি দু-ভাইয়ের কথা শুনছিলেন না, খাওয়া দেখছিলেন। দুই ছেলেকে দেখছিলেন।

পরিতোষ ও পরিমল খুব একটা কথাও বলছিল না সত্য। পরিমল মাঝে মাঝে পাত থেকে মুখ তুলে একটা দুটো প্রশ্ন করছিল। মেজোছেলে সেসব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল।

এবং বেশির ভাগ কথাই জগমোহনের নূতন বাড়ি সম্পর্কে, জমি সম্পর্কে। রমলা একটু অবাক হচ্ছিল। পরিতোষ তার দাদাকে একটাও প্রশ্ন করছিল না। কত কিছু তো জিজ্ঞাসা করার ছিল, জানার ছিল। দশ বছর ঐ মানুষটি জেলে কাটিয়ে এসেছে। সেখানে সে কী খেত, কী পরত, সারাদিন কীভাবে কাটত, বাড়ির কথা মনে পড়ত কিনা, বাড়ির চিঠি না পেলে মন খারাপ হত কিনা, বাইরের বন্ধুরা কেউ চিঠিপত্র লিখেছিল কিনা—একগাদা প্রশ্ন তো রমলার মনেই জেগেছিল।

কিন্তু পরিতোষের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল সেসব কিছুই সে জানতে চায় না শুনতে চায় না। এমন কী দাদা যে জেলে ছিল কথাটাই যেন সে ভুলে গেছে। বরং অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এই অঞ্চলে সি আই টি রোডের লাগোয়া জমি ও ভিতরের দিকের জমির মূল্যের বৈষম্য, রাস্তার ধারের প্লটগুলি বেশির ভাগ অবাঙালী ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরা কিনে রাখছে, ভবিষ্যতে আরো যে সব জমি ডেভ্‌লপ করা হবে সেগুলি প্লট হিসাবে আর সাধারণের

কাছে বিক্রী না করে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীম অনুযায়ী বড়ো বড়ো ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরির কাজে লাগান হবে ইত্যাদি সবিস্তারে দাদাকে বোঝাতে আরম্ভ করেছিল। যেন পরিমলও আগ্রহের সঙ্গে সব শুনছিল। মনোযোগ দিয়ে কিছু শোনার সময় জগমোহন এই বয়সেও শিরদাঁড়া সোজা রেখে থুতনিটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দেন। পরিমলকেও সেভাবে বসে থেকে কথা শুনতে দেখা গেল। খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবু দু-ভাই বসে রইল।

জগমোহন আস্তে আস্তে উঠে পড়লেন।

তিনিও কিন্তু পরিমলকে কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। তিনি এত বেশি নীরব থাকবেন রমলা আশা করেনি। কিন্তু পরিমলও তো নিজের থেকে তার জেল জীবনের অভিজ্ঞতার দু-একটা কথা বলতে পারত। কিছুই বলল না।

না, কিছুই সে বলবে না। রমলা পরে বুঝতে পেরেছে। পরিতোষ এবং জগমোহনও কেন এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। কারণ জেলের এই দশ বছরের জীবন পরিমলের জীবনের এক কালো ঘৃণ্য অধ্যায়—কলঙ্কের ইতিহাস। তাই কেউ তা আজ আর উল্লেখ করবে না; জগমোহন না, পরিতোষ না। আর এই পরিচ্ছন্ন মার্জিত সুন্দর জীবনের মধ্যে ফিরে এসে পরিমলও মাত্র ক'ঘণ্টার আগের অন্ধকার অতীতের দিকে ঘাড় ফেরাতে ভয় পাচ্ছে। তাই কি? তাই হবে। দীর্ঘ দশ বছর এত অল্প সময়ের মধ্যে ভুলে যেতে পারে না কেউ। কিন্তু তবু তাকে ভুলে থাকতে হবে। ভুলে যাওয়ার ভান করতে হবে। কিন্তু পারবে কি? গভীর ক্ষতও একদিন শুকোয়, কিন্তু দাগ থেকে যায়। সেটা অস্বীকার করবে কেমন করে।

জগমোহন তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

মুখ হাত ধুয়ে পরিতোষ নিজের ঘরে চলে এল।

পরিমল একলা বারান্দার ওদিকে চলে গেল। বারান্দার বাইরে গলা বাড়িয়ে দিয়ে এদিক ওদিক দেখল একটু সময়—হয়তো নীচের সুন্দর ফুলের বাগানটাও দেখল।

তখন সূর্য ঢলে পড়েছে। এক ঝলক লাল রৌদ্র পরিমলের ঘাড়ে গলায় পড়ে চিকচিক করছিল।

শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রমলা মানুষটার পিছনটা আর একবার ভালো করে দেখল। যেন তখন নীচে বারান্দায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—কী একটু আগে ভাত পরিবেশন করার সময় রমলা পরিতোষের দাদাকে মোটেই ভালো করে দেখার সুযোগ পায়নি। তাই ঐভাবে পিছন থেকে চুপিচুপি দেখে নিচ্ছিল। চুরি করে একজনকে দেখার মধ্যে একটা ইতরতা আছে, লজ্জা আছে, রমলা বুঝতে পারছিল, কিন্তু তা হলেও যেন জগমোহনের বড়ো ছেলেকে দেখার লোভ সে সংবরণ করতে পারছিল না। এই ছেলে অন্য দুই ছেলের মতন না। অবশ্য আর দুটি ছেলেও দুই রকম। একজন গৃহী, একজন সন্ন্যাসী। পরিতোষের পরিমিত জীবন, সাধারণ জীবন। চাকরি করছে, বিয়ে করেছে, বুড়ো বাপকে দেখছে, স্ত্রী-পুত্রকে ভালোবাসছে। আর দশটি ছেলে যেমন করে। আশ্রমবাসী হয়ে সুকোমল ঈশ্বর লাভের সাধনায় মগ্ন। তাও যেন বোঝা যায়। সুকোমলকে বুঝতে কষ্ট হয় না রমলার। মাঝে মাঝে—ন-মাস ছ-মাস পর পর ব্রজদুর্লভপুর থেকে হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হয়। একবেলা কী একটা রাত এখানে থেকে আবার চলে যায়। বাবাকে দেখতে আসে। বাবা যতদিন জীবিত আছেন,

আমায় আসতে হবে বউদি। তারপর বাবা চোখ বুজলে আর হয়তো আসা হবে না। আর আসার দরকার পড়বে না। হেসে সুকোমল একদিন বলেছিল। কেন আমরা কি তোমার কেউ না ঠাকুরপো। তোমার দাদা, আমি, দীপু। রমলা দুঃখ করে বলেছিল। সুকোমল জিভ কেটেছিল, কেন কেউ হবে না, তোমরা আমার পরমাত্মীয়। তোমাদের দেখতে ইচ্ছা করবে না বললে মিথ্যা কথা বলা হবে। এই ইচ্ছাটাই মায়া। কিন্তু আমি যে মায়ার বন্ধন কাটাতে চাইছি, বউদি। তোমার এই ছোটো সংসারে এলে আমাকে বড়ো সংসারের কথা ভুলে থাকতে হবে। আমার ইচ্ছা করবে তোমার হাতের দুটি রান্না খাই, তোমার ছেলেটাকে কোলে নিয়ে আদর করি। আর তাই যখন করতে যাব তখন রাস্তার ঐ মানুষটাকে আমার পর মনে হবে, রাস্তার ছেলেটাকে পরের ছেলে মনে হবে। এই আপন পর জ্ঞান যতক্ষণ আছে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, তাঁকে দেখা যায় না। তাই আমার গুরু বলেন, তোর সংসার হবে জগৎজোড়া। জগতের সব মানুষ হবে তোর পরমাত্মীয়—সব জীব হবে তোর ভালোবাসার পাত্র। তখন দেখবি এই বড়ো সংসারে থাকার কত আনন্দ। তোদের নারকেলডাঙ্গার ছোটো সংসারটাকে তখন মনে হবে পুতুলের সংসার। খেলাঘর। হ্যাঁ, যদি বলো, বাবাকে কেন দেখতে ছুটে আসি—তুমি তো জান, পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম—তেমনি মা; বাপ মায়ের আশীর্বাদ পাওয়া ভাগ্যের কথা। মা নেই। তাই যতদিন বাবা বেঁচে, তাঁর আশীর্বাদ নিতে ছুটে আসব। গুরুর আশীর্বাদের মতো তাঁর আশীর্বাদেরও আমার দরকার। এঁদের আশীর্বাদ আমার সাধনপথের সহায়।

কথাগুলি শুনে রমলার ভালো লেগেছিল। সুকোমল যখন এবাড়ি আসে মুগ্ধ চোখে সে এক নবীন সন্ন্যাসীকে দেখে।

কত বড়ো আদর্শ তার সামনে।

॥ ৪ ॥

রমলা তারপর থেকে কথাটা প্রায়ই ভাবত। রক্তের সম্পর্ক আছে বলেই তোমরা আমার আত্মীয়—আর কেউ আত্মীয় না—তাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থেকে কেবল তোমাদের নিয়ে থাকব, আমার গুরু আমাকে এই শিক্ষা দেননি। সারা বিশ্ব আমার আত্মীয়। সুতরাং কেবল তিনটি কী চারটি মানুষকে না, লক্ষ কোটি মানুষকে ভালোবাসার মতন হৃদয়কে প্রশস্ত উদার করতে হবে।

সুকোমল যদি সেদিন শুধু ধর্মের কথা ঈশ্বরের কথা বলত রমলার নিশ্চয়ই ভালো লাগত না। তাদের আশ্রমের আদর্শও তা নয়। কেবল মন্দিরের শিবকে নিয়ে মত্ত থাকার পাগলামি তাদের নেই। তারা মনে করে যত জীব তত শিব। জীবসেবার ভিতর দিয়েই তাদের ঈশ্বর দর্শন হবে। এই বিশ্বাস নিয়ে তারা কাজ আরম্ভ করেছে। হোম যজ্ঞ পূজা অর্চনা শাস্ত্রপাঠ যেমন আছে তেমনি গাঁয়ের মানুষদের লেখাপড়া শেখানো, অসুখবিসুখ হলে তাদের চিকিৎসা করা, চাষবাসের কাজে সাহায্য করা, রাস্তা-ঘাট সংস্কার—আশ্রমকে অনেক কিছু করতে হয়, দেখতে হয়।

'একদিন এসো বউদি—কলকাতা থেকে খুব বেশি দূর না—তা হলেও ভ্রমণটি চমৎকার

হবে—দু ঘণ্টা ট্রেনের রাস্তা, তারপর পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাসে চড়ে যাওয়া—বাস থেকে নেমে গোরুর গাড়ি—ধানক্ষেত পাটক্ষেতের পাশ দিয়ে চলে যাবে। মাথার ওপর ধূ ধূ নীল আকাশ, ফুরফুরে মেঠো হাওয়া, পাখির ডাক—খুব ভালো লাগবে তোমার। আমাদের আশ্রম তোমার কেমন লাগবে আমি বলতে চাই না—বলতে পারবও না, এটা গৃহী বা গৃহিণীদের মেজাজের ওপর—দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু ব্রজদুর্লভপুর বেড়াতে যাওয়াটা তোমার নিশ্চয় ভালো লাগবে, উপভোগ করবে, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।'

সুকোমলের কথা শুনে রমলা হেসেছিল। একদিন সময় করে সেখানে বেড়াতে যাবে বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। পরিতোষকে বলতে পরিতোষও রাজী হয়েছিল। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। শনিবার যাবে কথাবার্তা ঠিক হয়ে রইল, কিন্তু দেখা গেল অন্যদিন যদি বেলা আটটায় তার ঘুম ভাঙে শনিবার ভোর ছ'টায় পরিতোষ লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে মুখ হাত ধুয়ে চা না খেয়ে বেরিয়ে গেল। কোথায় গেল—না ব্রজদুর্লভপুরের তিনগুণ রাস্তা—কোথায় কোন রাধাবল্লভপুর—সেখানে তাদের ফার্মের পক্ষ থেকে তাকে পাঠানো হচ্ছে—একটা ব্রীজ তৈরি হবে—ব্লু প্রিন্ট বগলে নিয়ে সে সাইট দেখতে ছুটে গেল, ফিরল রাত বারোটায়। যদি কথা হয়ে রইল রবিবার—সেদিন বাড়িতে থেকেও পরিতোষের নিশ্বাস ফেলার সময় রইল না। সকালবেলা অফিস থেকে পিওন এসেছে এত কাগজপত্র নিয়ে। কুড়িটা কনস্ট্রাকশনের কুড়িটা প্ল্যান। পরিতোষ সারাদিন কাগজের ওপর মুখ গুঁজে রইল।

তার অর্থ বেচারা কোনোদিনই সময় পাচ্ছে না স্ত্রীকে নিয়ে কোথাও একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে আসে। কাজেই ব্রজদুর্লভপুরের আশ্রম দেখা রমলার আজও হয়ে ওঠেনি। এই জন্য সে খুবই লজ্জিত। পরিতোষ না গেলে রমলা একলা সেখানে যেতে পারে না। এমন না যে, ট্রেনে বাসে সে সঙ্গী ছাড়া চলতে পারবে না, তা ছাড়া আগে থাকতে খবর দিয়ে রাখলে সুকোমল আশ্রম থেকে একটা গোরুর গাড়িও পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তা হলেও বাড়ির বউ সে, একা একটা আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হওয়া অশোভন দেখায়। সকলের আগে, বাড়ির যিনি কর্তা, সেই জগমোহনই আপত্তি তুলবেন। সুকোমলকে বললেও সে বউদিকে নিয়ে যায়। কিন্তু বলাটা অন্যায়। কেন সে নিয়ে যাবে। তারা যাবে নিজেদের গরজে, স্বেচ্ছায়। দুজনকে একসঙ্গে যেতে হবে। দেবস্থান, তীর্থক্ষেত্র, আশ্রম ইত্যাদি দর্শন করতে স্বামী-স্ত্রীর একত্র যাওয়াই বিধেয়—শাস্ত্রসম্মত—সেটাই সুন্দর। কাজেই পরিতোষ যদি সময় না পায়—ভেবে রমলার খুব খারাপ লাগে, বিশেষ সুকোমল যখন এখানে আসে। আগে আগে রমলা বলত, এ মাসে আর হল না ঠাকুরপো, আসছে মাসে নিশ্চয়ই যাব। এভাবে প্রায় দু বছর কেটে গেল। পরিতোষেরও সময় হল না রমলারও আশ্রম দেখা হল না।

অবশ্য এর মধ্যে একদিন কবে যেন সুকোমল বলেছিল, আমার মনে হয় দাদার আশ্রম-টাশ্রম ভালো লাগে না, তাই সেখানে যাবার সময় করতে পারছে না। ইচ্ছা থাকলে সময় করা যায়—দরকারী কাজ ফেলেও কত মানুষ রোজ আমাদের আশ্রম দেখতে আসে—তবে আমি বলছিলাম, দাদার কিছু অসুবিধা হত না, তাদের ফার্মের একটা গাড়ি জোগাড় করেও তোমায় নিয়ে একদিন ঘুরে আসতে পারত। বাবার গাড়ি অবশ্য পাওয়া যায় না। ডাক্তার মানুষ। সব সময় গাড়ির দরকার। গাড়ির কথা বলছি এই কারণে ট্রেন বাস বা গোরুর

গাড়িতে চড়ার হাঙ্গামা যদি তোমরা পছন্দ না কর। —রমলা ব্যস্ত হয়ে মাথা নেড়েছিল। না না, ঐ তো সুন্দর—একটু ট্রেন, একটু বাস—তারপর গোরুর গাড়ি—চমৎকার লাগত। আমরা শহরের মানুষ। গোরুর গাড়ি চড়ে কোথাও বেড়াতে যাবার মধ্যে একটা থ্রিল্ আছে বৈকি। যেমন নৌকোয় করে বেড়াতে আমাদের প্রায়ই ইচ্ছা করে। সে সব কিছু না—আসলে সত্যি তোমার দাদা সময় পায় না। তা না হলে ওর খুব ইচ্ছা আছে। আমায় ক'দিনই বলেছে।

একটু বাড়িয়েই বলেছিল রমলা। তার মধ্যে একটু মিথ্যার রঙও ছিল। — তোমাদের আশ্রম দেখতে যেতে আমাদের দুজনেরই খুব ইচ্ছে করে। আমার তো মনে হয় তোমার দাদার সেখানে খুবই ভালো লাগবে। আশ্রমে যাবার পথের যেমন বর্ণনা করলে সেদিন—রমলা আবার একটু হেসেছিল—পথটাই যদি এত সুন্দর হয় তো গন্তব্যস্থানটি যে সুন্দর হবে তা তো বোঝাই যায়।

সুকোমল আর কিছু বলেনি। স্বভাবটাই গম্ভীর। তায় আবার ব্রহ্মচারীর জীবন। রমলা ও পরিতোষের আশ্রম দেখতে যাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে দুদিন যা দুটি কথা বলেছিল। তা না হলে এখানে যতক্ষণ থাকে চুপ করে থাকে। জগমোহনের ঘরেই বেশি সময় কাটায়। গেরুয়া রঙের একটা কাপড়ের থলের ভিতর নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সঙ্গে একটা দুটো বইও নিয়ে আসে। অবশ্য একটা পকেট সংস্করণ শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা ও সুকোমলের গুরু স্বামী ঈশ্বরানন্দের লেখা বেদান্ত দর্শন বই দুটো সর্বদাই সে সঙ্গে রাখে। তা ছাড়া বেদ উপনিষদের ওপর লেখা অন্য সব বইও তাকে পড়তে দেখা যায়। ইংরেজী বাংলা দুরকম বইই। জগমোহনের খাটের কাছে মেঝেয় একটা আসন বিছিয়ে তার ওপর বসে সে পড়ে। আসনখানাও সে সঙ্গে নিয়ে আসে। ব্রহ্মচারীর অন্য আসনে বসতে নেই। তেমনি আশ্রমের বাইরে অন্য কারোর হাতের রান্না খেতে নেই। তাই রমলা ছোটো-ঠাকুরপোর ব্যবহারের জন্য আলাদা এক সেট বাসনকোসন উনুন কুঁজো ইত্যাদি রেখে দিয়েছে। আর খাওয়াও খুব সাধারণ। নিরামিষ তো বটেই। সাধু সন্ন্যাসীর মাছ মাংস স্পর্শ করতে নেই। শুধু ভাতে ভাত। কাঁচকলা পেঁপে উচ্ছে ঝিঙে। একটু দই বা দুধ। একটু মিষ্টি এক আধটা ফল। কলা কমলালেবু আম, যখনকার যেটা। ঘি থাকল তো থাকল—না থাকলেও ক্ষতি নেই। ভেজালের বাজারে ঘি জোগাড় করা ভয়ানক কঠিন। এত বড়ো ডাক্তার জগমোহন। তাঁর জানাশোনা কত মানুষ রয়েছে। শহরে—শহরের বাইরে দূর পল্লী অঞ্চলেও তাঁর রুগী আছে বা তাদের আত্মীয়স্বজনরা আছে। সবাই সব কিছু জোগাড় করে দিতে পারে। কিন্তু খাঁটি ঘি আজ পর্যন্ত কেউ এনে দিতে পারেনি। ফার্মের কাজে পরিতোষ তো কত জায়গায় যায়। কত তার পরিচিত মানুষ, কলকাতায়—কলকাতার বাইরে। এমন কী উত্তরপ্রদেশ বিহারের লোকদেরও সে বলে দেখেছে। খাঁটি ঘি কোথাও পাওয়া যায় না। ঘিয়ের নামে বাজারে যে সব জিনিস চলছে সবই বিষ। জগমোহন এই জিনিস বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁযতে দেন না। ছোটো-ঠাকুরপোর ঐ তো একটু আনাজ সিদ্ধ দিয়ে ভাত খাওয়া। একটু ঘি না হলে চলে! রমলার কথার উত্তরে সেদিন জগমোহন ঘিয়ের দুরবস্থার কথাটা বলেছিলেন। সুকোমল বলেছিল, তাদের আশ্রমে প্রায় সাত আটটা গোরু আছে। সব দুধই আশ্রমের লোকেরা কিন্তু খায় না। অনেকটা বেচে

দেওয়া হয়। কিছুটা ঠাকুরের জন্য রাখা হয়। সেই দুধের সর মেরে ঘি করা হয়। কারণ ঠাকুর মাত্র এক সন্ধ্যা আহার করেন। ঘৃতপক্ক অন্ন। তাও এক ছটাক চাউল মাত্র। শুনে জগমোহন হেসে বলেছিলেন, সাধু সন্ন্যাসীদের এই জিনিসগুলো আমার খুব ভালো লাগে। যেখানে সেখানে খাবেন না, যা তা জিনিস খাবেন না, পচা-বাসি-ভেজাল খাদ্য স্পর্শও করবেন না। অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠা খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে। তেমনি ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ যোগাভ্যাস। এই জন্য এক একটি সাধু দেড় শ—দু শ বছরও বাঁচেন শোনা যায়। কী করে স্বাস্থ্য রাখতে হয়, লন্‌জিভিটি বাড়াতে হয় তাঁরা জানেন। আমার বাবা আনন্দমোহনকে তোমরা যদি দেখতে—আশি বছর বয়সেও যুবকের মতো চলাফেরা করতেন। আর ঐ বয়সেও চোখের কী তেজ ছিল! সেই তুলনায় সিক্‌স্টি টুতেই আমি কত নরম হয়ে গেছি। চশমা ছাড়া পড়তে পারি না, দাঁত তো কয়েকটাই ইতিমধ্যে পড়ে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু নীরব থেকে পরে জগমোহন আবার বলেছিলেন, সুকোমল যখন এখানে আসে আমি তার নিয়মটিয়মগুলো লক্ষ্য করি। আমার চেয়েও আগে তার ঘুম ভাঙে, উঠেই পায়খানা দাঁত মাজা মুখহাত ধোয়া স্নান—তারপর যোগাসনে বসে ধ্যান। খুব সুন্দর জিনিস। আমাদের মেডিকেল সায়ান্সেও এখন সাধুদের এই যোগটোগগুলোর উপকারিতা স্বীকার করতে আরম্ভ করেছে। তারপর সুকোমল যেভাবে খায়। উচ্ছে সেদ্ধ পেঁপে সেদ্ধ। তেলমশলা না ভাজাভুজি না। শাকসব্জী আনাজ ভেজে খেলে ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। তোমাদের কতদিন বলেছি। বয়েল করে খাবে। কাঁচা খাবে।

শ্বশুরমশায়ের কথা শুনে রমলা ঘাড় গুঁজে হেসেছিল। কেননা তিনি সিদ্ধ করা আনাজ খাও. কাঁচা শাকসব্জী খাও, কথাটা উঠতে বসতে বলেন, আবার খেতে বসে ভাতের সঙ্গে গরম গরম বেগুন ভাজা পটল ভাজা পেলে যেন একটু খুশিই হন। বৌদির চোরা হাসি সুকোমল লক্ষ্য করেনি। বাবার কথা শেষ হতে মাথা গুঁজে হাতের বইখানা যেমন পড়ছিল আবার পড়তে আরম্ভ করেছিল। অত্যন্ত সাদাসিধা মন—ভিতরে এতটুকু প্যাঁচ নেই। কী করে থাকবে, রমলা মনে মনে বলেছিল. যে মানুষ সারাক্ষণ ঈশ্বরের চিন্তা করছে ধর্মচিন্তা, করছে, জগতের মানুষের মঙ্গলের কথা ভাবছে. তার মন রমলাদের মতন সংসারী মানুষের মনের মতন না।

হ্যাঁ, গৃহত্যাগী ব্রহ্মচারী সুকোমলকে রমলার বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু ঐ যে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নীচের বাগান দেখছে, দশ বছর জেলে কাটিয়ে একটু আগে বাড়ি ফিরে এল তাকে রমলা কেমন করে বুঝবে। কোনোদিন দেখেনি, এই প্রথম সে জগমোহনের বড়ো ছেলেকে দেখছে। দীর্ঘ দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। যখন গাড়ি থেকে নেমেছিল মুখে গোঁফ দাড়ি ছিল। এখন আর সেসব নেই। পরিবেশন করার সময় দু একবার চোখ তুলে রমলা ঐ মুখ দেখেছে। যৌবনে জগমোহন যে খুবই সুপুরুষ ছিলেন আজ এই বয়সেও তাঁকে দেখলে বোঝা যায়। জগমোহনের মুখের ছাপ নিয়ে পরিমল বুঝি আরো সুন্দর. আরো রূপবান। তাই কেমন হেঁয়ালীর মতন ঠেকছিল তার কাছে ঐ জেল-ফেরত খুনী আসামীকে। পরিতোষের মুখে রমলা অনেক কথা শুনেছে। অনেক কথার মধ্যে একটা কথাই বড়ো। সে কথা অন্য সব কথাকে ঢেকে রেখেছে। প্রথম শোনার পর সেই ভয়ংকর কথা রমলার মনে যে গভীর

ছাপ ফেলেছিল তার সঙ্গে মিশিয়ে একটি মুখ—একটি মানুষকে সে কতদিন কল্পনা করেছে। আরও তিন বছর আছে দাদার জেল জীবনের মেয়াদ—আর দুবছর, পরিতোষ বলত, আঙুলের কড় গুনে সে হিসাব করত—আর মাত্র এক বছর এত দিন—একটা বছর কিছুই না, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। রমলা শুনত, আর মনে মনে যে ছবি, যে মুখ সে আঁকত তার ওপর কল্পনার তুলি বুলিয়ে নানা রঙ লাগাত। সেই মুখ কখনো শয়তানের মুখের মতন নিষ্ঠুর ভয়ংকর রূপ নিত—কখনো দেবতার মতন দিব্যকান্তি প্রেমিক পুরুষ হয়ে উঠত। আবার কখনো নিতান্তই একটি আটপৌরে সাধারণ মানুষের মুখ কল্পনা করে রমলা জগমোহনের বড়ো ছেলেকে মনের সামনে দাঁড় করাত। অর্থাৎ মানুষটির চরিত্রের কিছুমাত্র বৈশিষ্ট্য নেই। সাময়িক উত্তেজনাবশত একটা গুরুতর অপরাধ করে এখন কয়েদীর জীবন কাটাচ্ছে। এর বেশি কিছু না।

কিন্তু রমলা সন্তুষ্ট হতে পারেনি; কিছুতেই সে ঠিক করতে পারছিল না পরিমলের আসল রূপটি কী—কেমন। এই সেপ্টেম্বরেই দাদা মুক্তি পাবে—এতদিনে তার দশ বছরের জেল-জীবন শেষ হল। দোসরা সেপ্টেম্বর বাড়ি আসছে। আঙুলের কড় গুনে পরিতোষ আবার হিসাব করত, আর উনিশ দিন, আর সতেরো দিন, দশ দিন—আর মোটে একটা সপ্তাহ। সপ্তাহটা সত্যি কেমন তাড়াহুড়োর ভিতর দিয়ে কেটে গেল। পরিতোষের মুখে দাদা আর জগমোহনের মুখে পরিমল ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না এই সাতদিন। পরিমলের ঘর, পরিমলের বিছানা তার টেবিল চেয়ার আলমারী পাখা—একটা বই রাখার সেলফ এবং কিছু বই; বই পড়ার অভ্যাস পরিমলের ছিল না—তা হলেও কে জানে, জেলে থেকে যদি একটু আধটু অভ্যাস হয়ে থাকে—বলা যায় না. এক সেট রবীন্দ্রনাথ, এক সেট শেক্সপীয়র—কী কিছু ক্রাইম নভেলও রাখা চলে—বলতে বলতে জগমোহন হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন, মুখের রঙও যেন কিঞ্চিৎ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল—পরিতোষ লক্ষ্য করেছিল কিনা কে জানে. পরিতোষের পিছনে দাঁড়িয়ে রমলা লক্ষ্য করেছিল—তাই যেন হুট করে বইয়ের প্রসঙ্গ থেকে জগমোহন পরিমলের জামা কাপড় জুতো, তারপর আয়না চিরুনি তেল সাবান স্নো জুতোর কালি অ্যাশট্রে ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিসগুলিতে চলে এসেছিলেন। হ্যাঁ, একটা সপ্তাহ ধরে পরিতোষ ছুটোছুটি করে সব কেনাকেটা করেছে, জেল থেকে পরিমলের গায়ের মাপ আনিয়ে দর্জি বাড়ি থেকে কোট প্যাণ্ট সার্ট তৈরি করে আনিয়েছে। প্যাণ্ট সার্টের কাপড় কিনতে রমলাও সেদিন পরিতোষের সঙ্গে দোকানে গিয়েছিল। কোন রংটা দাদার পছন্দ হবে? লাইট গ্রিন? ডার্ক ব্রাউন? না কি ক্রিম কালার? যেন পরিতোষ ঠিক করতে পারছিল না। রমলার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। —তাইতো, আমিও কিছু বুঝতে পারছি না, রমলা একটু ভেবে পরে বলেছিল, কলেজে যখন পড়ত তখন তোমার দাদা কোন্ রং ভালোবাসত? পরিতোষ হঠাৎ উত্তর দিতে পারেনি। চুপ করে থেকে পরে বিড় বিড় করে বলেছিল, তখনকার পছন্দ কি এখন আছে, সেই দশ বছর আগে—কথাটা শেষ করেনি সে। রমলা বুঝতে পেরেছিল, উনিশ বছর বয়সে যে রঙ চোখে ভালো লাগত উনত্রিশ বছরে এসে সেই ভালো লাগা না-ও বেঁচে থাকতে পারে। তা হলে আপাতত ক্রিম কালারই নাও, পরে দেখা যাবে। মনে সংশয় নিয়েও রমলা সাহস করে পরিমলের সুটের রং ঠিক করে দিয়েছিল। কাল সকালে

পরিমলের টেবিলে গোলাপ ফুল রাখতে গিয়েও পরিতোষ এমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। সেখানেও সংশয় ছিল—অনিশ্চয়তা ছিল। স্বাভাবিক। রমলা চিন্তা করল।

দোকান থেকে বেরিয়ে আসবার সময় পরিতোষ বলছিল, দাদা একটু মোটা হয়েছে। জামার মাপ দেখে কথাটা বলেছিল সে। রমলা বুঝতে পারল। রমলা কথা বলেনি।

তার কল্পনার ছবি রক্তমাংসের আকার নিয়ে কাল বিকালে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাগানের দৃশ্য দেখছিল। রমলা সেদিকে তাকিয়ে বড়ো বেশি হতাশ হয়েছিল। কল্পনার চেয়ে বাস্তব অনেক বেশি জটিল দুরূহ দুর্বোধ। কল্পনাকে তুমি খুশিমতো ভাঙতে পার গড়তে পার। কল্পনা তোমার মুঠোর ভিতর। বাস্তব যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে তুমি তাকে এক চুল নড়াতে পার না। ভাঙতে গেলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়—গড়তে গেলে অন্য আকার নেয়। তুমি যেমনটি চাও তা হয় না। তুমি তোমার মন নিয়ে তার ভিতর অনুপ্রবেশ করতে গেলে ধাক্কা খাবে। বাস্তবকে বিশ্লেষণ করা যায় না। বিভাজন চলে না। সে এতই কঠিন নিরেট জমাট ও জড়।

কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে রমলা পরিতোষের দাদাকে দেখছিল। একটা মানুষের মধ্যে তার কল্পনার সব ক'টা ছবি মূর্ত হয়ে আছে রমলা বিশ্বাস করতে পারছিল না। ভুল দেখতে পারে, হাত দিয়ে চোখ দুটো বগড়ে রমলা আবার পরিমলের দিকে তাকাল। যদি তুমি তাকে শয়তান মনে কর তবে সে তাই। তেমনি খল কপট ক্রূর কুৎসিত; যদি দেবতা মনে কর, হয়তো ঐ মানুষটি তাই—দেবতার মতন উদার সুন্দর মহৎ। প্রেমিক বলে ধরে নিলে ক্ষতি কী। ভেবে রমলা রীতিমতো ঘামতে আরম্ভ করল। আবার জগমোহনের বড়ো ছেলেকে একটি আটপৌরে সাধারণ শান্তশিষ্ট মানুষ মনে না করলেও যেন ভুল হবে। তেমনি লজ্জিত বিব্রত বিষণ্ণ অবনত। ভুল করে একটা অপরাধ করেছিল, আজও তার গ্লানি মন থেকে মুছতে পারেনি। হয়তো সেই জন্যই রমলার দিকে তাকাতে পারছিল না। নীচে বাগান দেখার ছল করে ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে রেখেছিল।

তবে কোনটা সত্য—পরিমলের আসল রূপ কী বুঝতে না পারার যন্ত্রণা নিয়ে রমলা ঘরে ফিরে এসেছিল। এসে ভাবতে বসেছিল। অবেলায় খেয়ে পরিতোষ ঘুমোচ্ছিল। দীপু টেবিলের নীচে বসে তার কাগজের বাক্সগুলি নিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করার খেলা করছিল। জগমোহনও যেন তাঁর ঘরে আরামকেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে তন্দ্রামগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। রমলা আন্দাজ করছিল। কেননা মানুষটার হাঁকডাক শোনা যাচ্ছিল না। তা না হলে অন্যদিন তিনি বাগানে নেমে গেছেন। চাকরকে বকছেন মালীকে তাড়া দিচ্ছেন। এখন ফুল গাছে জল দেওয়ার সময়। জগমোহন দাঁড়িয়ে থেকে চাকর ও মালীর কাজের তদারক করছেন। কিন্তু কাল তিনি এ সময়টায় ঘর থেকে বেরোলেন না। গাছে জল দেওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলেন? একটু বিসদৃশ ঠেকছিল রমলার কাছে। রমলা জানালার দিকে তাকিয়ে রইল। শেষ বেলার রোদ একটা পাল্লার কাচের গায়ে পড়ে আলতার মতন টুকটুক করছিল। রমলা তন্ময় হয়ে পরিতোষের দাদার কথা চিন্তা করছিল।

পরিতোষ তার দাদাকে ভালোবাসে। একটু বেশিই ভালোবাসে। পিঠাপিঠি ভাই। এক সঙ্গে বড়ো হয়েছে। এক সঙ্গে স্কুলে গেছে। স্কুলের পড়া শেষ করে দুজন একই কলেজে পড়েছে।

এক ঘরে শুয়েছে। একটা টেবিলে আলো জ্বেলে রাত জেগে দুজন এগজামিনের পড়া তৈরি করেছে। যেদিন পড়া ভালো লাগেনি সেদিন গল্প করেছে। উনিশ বছরের যুবকের কাছে তার সতেরো বছরের কিশোর ভাই, ভাইয়ের চেয়েও বেশি। বন্ধু। বন্ধুর কাছে বন্ধু মনের কথা বলে। তাই দাদাকে পরিতোষ যত চেনে যতখানি জানে এমন আর কে জানবে কে চিনবে। বাবা মা? একটা বয়স পর্যন্ত তাঁরা সন্তানকে চেনেন জানেন বোঝেন। তারপর আর বুঝতে পারেন না। প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বাপ মার কাছে যুবক ছেলে যুবতী মেয়ে অপরিচিত অনিশ্চিত দুর্বোধ—তারা তখন দূরের মানুষ। কুয়াশায় ঢাকা দূরের পথের আবছা ছায়ামূর্তি।

রমলার কাছে পরিতোষ এই চার বছর দাদার গল্প করেছে। কবে দাদার সঙ্গে পাখির ছানা চুরি করতে গিয়েছিল, কাদের বাগানে ঢুকে আম পেয়ারা লুট করে এনেছিল। সুইমিং ক্লাবে ভর্তি হয়ে দুভাই লেকের জলে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল। দাদার একদিন খুব জ্বর হয়েছিল। ওট্‌স আর বার্লি ছাড়া পথ্য নেই। দাদা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত। এটা ওটা খেতে চাইত। দাদার কান্না দেখে পরিতোষেরও কান্না পেত। দাদার বিছানার পাশে বসে থাকত। একদিন দুপুরবেলা বাবা ঘুমোচ্ছিল মা ঘুমোচ্ছিল। নীচে রাস্তায় ফেরিওয়ালা যাচ্ছিল। ফেরিওয়ালা কি নিয়ে যাচ্ছে হাঁক শুনে পরিমল বুঝতে পেরেছিল। চোখের ইশারায় পরিতোষকে কিছু একটা বলতে সে নীচে ছুটে গিয়েছিল। টিফিনের ক'টা পয়সা ছিল তার কাছে। তাই দিয়ে দাদার জন্য ঠোঙায় করে আলুকাবলি কিনে নিয়ে এসেছিল সে। অবশ্য দাদা সেটা খেতে আরম্ভ করার আগেই মার ঘুম ভেঙে যায়---ধরা পড়ে গিয়ে দাদা পরিতোষের ওপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়েছিল। পরিতোষ তাকে আলুকাবলি কিনে এনে খেতে দিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা বাবা পরিতোষকে কী মারটাই না মারলে। চুপ থেকে পরিতোষ মার সহ্য করল—তবু একবারও মুখ ফুটে বলল না যে দাদাই তাকে জিনিসটা আনতে নীচে পাঠিয়েছিল। গল্পটা শুনে রমলা খুব হেসেছিল; পরিতোষও হেসেছিল। কত দিনের কথা! পরিতোষ বুঝি তখন এগারো বছরের, পরিমল তেরোয় পা দিয়েছিল।

তারপর তারা আর একটু বড়ো হল। উঁচু ক্লাসে উঠল। বাইরের জগতের আর একটু কাছাকাছি এসে দাঁড়াল দুজন। অমুক ক্লাবে খেলা, অমুক ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করা। কোথায় কোন বেহালার মাঠে ম্যাচ খেলা হচ্ছে---একডালিয়া রোড থেকে সেখান পর্যন্ত ধাওয়া করা। তারপর বাড়ি ফিরে মার চোখরাঙানি বাবার দেত। কিন্তু তা বলে দুভাই ঘরে বসে থাকত নাকি। বাইরের মাঠ ঘাট সারাক্ষণ তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকত। কোথায় ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে, কোথায় সার্কাসের দল তাঁবু ফেলেছে—গঙ্গায় এই পূর্ণিমায় নাকি সাংঘাতিক বান আসবে কাগজে লিখেছে—ছুট ছুট। দুভাই ছুটে গেছে দেখতে। ট্রাম-বাসের পয়সা না থাকলে হেঁটেই রওনা হয়েছে; হাঁটু অবধি ধুলো, উস্কোখুস্কো চুল, সার্টের তিনটে বোতামের দুটোই কোথায় উড়ে গেছে--খেয়াল নেই, যেন সারাদিন কী এক নেশার ঘোরের মধ্য দিয়ে কাটছে দুটি কিশোরের। ফুটবল ম্যাচ, ক্রিকেট ম্যাচ, সার্কাস, গঙ্গার বান, রাসবিহারী এভিনিউর মোড়ে বাদামতলায় পিয়ারীলালের ম্যাজিক। চার পয়সা টিকিট। হাঁসের ডিম ফুটে ফল সমেত এতবড়ো আমের চারা গজিয়ে গেল। জ্যান্ত মুর্গির পেট চিরে বার করা হল টাকা আধুলি সিকি। আশ্চর্য সব খেলা! টিফিন না খেয়ে সেই পয়সা দিয়ে দুভাই পিয়ারীলালের একই

খেলা দেখল এক নাগাড়ে সাত দিন। কেবল কি খেলা দেখা উদ্দেশ্য—কোনো মতে যদি তারা খেলাগুলি শিখে নিতে পারে। বড়ো হয়ে ম্যাজিসিয়ান হয়ে তারা আমেরিকা যাবে, জাপান যাবে খেলা দেখাতে। কত স্বপ্ন!

কিন্তু সেসব স্বপ্ন দেখার দিন শেষ হল। ম্যাজিক সার্কাসের নেশা, ধুলো পায়ে গঙ্গার বান দেখতে ছুটে যাওয়ার ছেলেমানুষি তারা কাটিয়ে উঠল। ফুটবল ক্রিকেটের নেশাটা থেকে গেল পরিমলের। নিজেও ভালো খেলতে পারত। পরিতোষ তেমন ভালো খেলতে না পারলেও খেলার ঝোঁক ছিল—ভালো ম্যাচ খেলা হচ্ছে খবর পেলে মাঠে যাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারত না। কিন্তু তা হলেও বাইরের জগতটা হঠাৎ দুভাইয়ের চোখে কেমন যেন একটু রোমাণ্টিক হয়ে উঠল, রঙিন হয়ে উঠল। কলেজে পড়ছে দুজন। নিজেদের বেশভূষা সম্পর্কে বেশ সচেতন, মাথার চুল আর তেমন উস্কোখুস্কো করে রাখতে সঙ্কোচ বোধ করে। চলাফেরা কথাবার্তায় যথেষ্ট সংযম এসেছে, ভদ্রতার পালিশ লেগেছে চোখে মুখে। বন্ধুর সংখ্যা দুজনেরই বেড়েছে। কিন্তু ছেলেবেলায় পাড়ার হাবু কী পটলার সঙ্গে যেমন গলাগলি করে মাঠেঘাটে ছুটোছুটি করত, পাখির ছানা চুরি করত, নুন দিয়ে কাঁচা কুল খেয়ে দরকার হলে একটা পার্কের বেঞ্চিতে পাশাপাশি শুয়ে পড়ত, গল্প করত, তেমন বন্ধুতা যেন কলেজ জীবনে কারো সঙ্গে তারা জমাতে পারল না। কে জানে, হয়তো এটা বড়ো হওয়ার, বয়স বাড়ার অভিশাপ। এবং সেই অভিশাপ পটলা হাবুরও লেগেছিল। তারাও আর তেমন করে এগিয়ে আসত না। তারাও সঙ্কুচিত হয়ে গেছে, ভব্যসভ্য হয়ে গেছে। মানুষ যত সভ্য হয় তত তার বন্ধুপ্রীতি, মানবপ্রীতি কমে আসে, আত্মীয়তা হ্রাস পায়—আজ অভিজ্ঞ মানুষের চোখ দিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সময় সময় পরিতোষ কথাটা চিন্তা করে।

সার্কাস কী পিয়ারীলালের মজার ম্যাজিক দেখার, গঙ্গার বান দেখার উৎসাহ নিভে গিয়েছিল। তার পরিবর্তে সন্ধ্যার দিকে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে লেকের হাওয়া খেয়ে, কালো জলের ছলছল দেখতে তাদের ভালো লাগতে লাগল। এই ভালোলাগাটা খুব অল্প সময়ের জন্য থাকত, এবং এই অল্প একটু সময় গালগল্প করতে তাদের বন্ধুরাও সেখানে হাওয়া খেতে আসত। যেন সবটাই কেমন সাময়িক, পোশাকী। হয়তো তার কারণও ছিল। লেকের কালো জল, জল থেকে উঠে আসা মিষ্টি হাওয়া, সান্ধ্য আকাশের একটি দুটি তারা এবং দূরের অন্ধকারের মিটমিটে চোখের মতন আলোর ফুটকিগুলি যে-কোনো যুবকের মনে আবেশ সৃষ্টি করত--বুনো ফুলের মতন এক ঝাঁক মেয়েও সেখানে রোজ বেড়াতে এসেছে। হাওয়ায় তাদের বেণী দুলত, আঁচল উড়ত, তারা কলস্বনা; লেকের জলের ছলছল শব্দ সময় সময় চাপা পড়ে যেত। যুবতীদের কলরব যুবকদের কানে আসত। তারা উন্মনা হয়ে উঠত। লেক ভিউ রোড, যতীন দাস রোড, বালীগঞ্জ প্লেস, ডোভার লেন, ফার্ন রোড, রিচি রোড—কত জায়গার মতো মেয়ে। —সকলের নাম জানতাম না, পরিচয় ছিল না, মুখচেনা হয়ে গিয়েছিল, এই পর্যন্ত—রমলার কাছে পরিতোষ গল্প করত—কিন্তু একজনকে জানতাম, একটি মেয়েকে ভালো করে চিনে রেখেছিলাম--রিচি রোডের বিশাখা। আমাদের সঙ্গে কলেজ স্ট্রীট পাড়ার কলেজে পড়ত, অবশ্য আমাদের সঙ্গে এক ক্লাশে না; সেকেণ্ড ইয়ারের

মেয়ে। দাদার থার্ডইয়ার আরম্ভ হয়েছে। আমি ফাস্ট ইয়ারে সবে ঢুকেছি। দেখতে দেখতে সেই মেয়ে ভীষণভাবে দাদার প্রেমে পড়ে গেল। কিন্তু মজা, বিশাখা আমার সঙ্গে যত সহজভাবে কথা বলত হাসত, দাদার সঙ্গে পারত না। দাদার সামনে পড়ে গেলে মেয়ের চোখমুখ লাল হয়ে উঠত, দাদার দিকে তাকাতে গেলে তার চোখের পাতা কাঁপত। সূর্যের দিকে তাকাবার সময় মানুষের চোখের অবস্থা যেমন হয়। যেন বিশাখার চোখে পরিমল সেই জ্যোতিষ্মান ভাস্কর। অমিত তেজ প্রচণ্ড বিক্রম নিয়ে বিশাখার সামনে জ্বলছে। চোখ ঝলসে যায় দৃষ্টি অন্ধ হয়ে ফিরে আসে—তবু সে জেনে গেছে এই জ্বালার মধ্যে জীবন, এই দাহের মধ্যেই জীবনের স্বাস্থ্য প্রাণের আনন্দ মিশে আছে। দাদার সামনে পড়ে গেলে ওর লম্বা পালক ঘেরা চোখের পাতা যখন কাঁপত, দেখে আমার এত হাসি পেত। এটা তাদের প্রেমের প্রথম দিকের কথা বলছি। বিশাখার সূর্যবন্দনা চলল। চিঠির পর চিঠি আসতে লাগল পরিমলের কাছে। অবশ্য সবই হাত চিঠি। কখনো আমার হাত দিয়ে—আবার নিজের হাতেও সে দাদার হাতে চিঠি তুলে দিত। দাদার হাতে চিঠি দেবার সময় কিন্তু একটা বই কী খাতার ভিতর সেটা গুঁজে দিত—ঠিক চিঠির আকারে চিঠি দিতে সঙ্কোচবোধ করত বলে হয়তো। প্রেমে পড়লে মানুষের মনের জটিলতা কত বাড়ে বিশাখাকে দেখে বুঝতাম। অথচ আমার হাতে যখন দাদার কাছে লেখা চিঠিখানা তুলে দিত তখন ও হাসত, তার কথাবার্তায় তাকানোর মধ্যে একটু জড়তা থাকত না, সঙ্কোচ থাকত না। আমি যে কেবল পত্রবাহক—পত্রের মধু আত্মসাৎ করার অধিকারী নই—আমাকে সঙ্কোচ করার কারণ ছিল না। ডাকপিওনকে কে কবে সঙ্কোচ করে।

কথাটা বলার সময় পরিতোষ ঠোঁট টিপে হেসেছিল। রমলাও হেসেছিল। পরিতোষ বলেছিল, ডাকপিওনের কর্তব্য সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছে। কোনোদিন দাদার চিঠি সে খুলে পড়ত না। কেননা বিশাখার লেখা চিঠির প্রতি তার আগ্রহ লোভ কিছুই ছিল না। সত্যিই ঐ চিঠির মধু আত্মসাৎ করার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত ছিল। ঐ মধুর একটি ফোঁটা জিভের ডগায় ঠেকালেও সে বুঝত না সেটা মধু কী জল। অপরের প্রেমপত্র লুকিয়ে পড়ার কুঅভ্যাস কারো কারো আছে বইকি। পরিতোষ তাদের অনুকম্পা করে। কেননা পত্রই হোক আর প্রেমপত্রই হোক, কাগজের ওপর অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে কতগুলি কথা বলা ছাড়া ব্যাপারটা আর কিছুই না। তখন এই কথাগুলির মধ্যে যদি কেউ হৃদয়ের উত্তাপ প্রেমের সৌরভ ছড়িয়ে দেয় তো যার নামে চিঠি একমাত্র সেই তা টের পাবে—অপরের কাছে অক্ষর অক্ষরই থেকে যাবে। কোনো তাপ বা সৌরভ তাকে স্পর্শ করবে না। সুতরাং সেই চিঠি পড়ে লাভ কী।

॥ ৫ ॥

পড়ার ঘরে বসে পরিতোষের সামনেই পরিমল বিশাখার চিঠি খুলে পড়ত। চিঠি পড়ে পরিমল কখনো উৎফুল্ল হত কখনো বিষণ্ণ হত, কখনো উত্তেজিত হত, আবার কখনো অবসন্ন হয়ে পড়েছে দেখা যেত। দাদার চোখ মুখের অবস্থা দেখে পরিতোষ তার মনের ভাব টের পেত। চিঠি পড়া হয়ে গেলে পরিমল বিশাখার চিঠির জবাব লিখতে বসত। এক একদিন

অনেক রাত জেগে পরিমল চিঠি লিখত। পরিতোষ ঘুমিয়ে পড়ত। বিশাখার কাছে চিঠি পৌঁছে দিতে পরিমল কিন্তু কোনোদিন পরিতোষের সাহায্য নিত না। নিজের হাতেই সেটা বিশাখার হাতে তুলে দিত। কখন দিত পরিতোষ জানত না যদিও। এবং চিঠি দেবার সময় পরিমল যে খাতাপত্র কী বইয়ের আড়াল তৈরি করত না পরিতোষ এটা বেশ অনুমান করতে পারত। কারণ দাদাকে সে জানত। শক্ত ধাতের মানুষ। নির্ভীক স্পষ্ট প্রত্যক্ষ তার কার্যপদ্ধতি। ভান ছলচাতুরী বা কোনোরকম মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ তার প্রকৃতিতে ছিল না। প্রবল অপ্রতিরোধ্য গতিবেগ নিয়ে সে সকল কাজে অগ্রসর হয়েছে। কলেজের ডিবেটিং ক্লাবের আলোচনায় পরিমল যেদিন অংশ গ্রহণ করত সেদিন প্রতিপক্ষ তটস্থ থাকত। মিথ্যা কথার মায়াজাল সৃষ্টি করে কী মিথ্যার কুয়াশায় নিজেকে ঢেকে রেখে প্রথমে বিরোধী পক্ষের মনে ধাঁধা সৃষ্টি ও পরে তাকে পরাজিত করার হীন মনোবৃত্তি পরিমলের কোনোদিন ছিল না। প্রথমেই সরাসরি আক্রমণ করে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা সে পছন্দ করত। তেমনি খেলার মাঠে। ঘোরপ্যাঁচের কৌশল তার জানা ছিল না। সকল বাধা অতিক্রম করে দুর্বার বেগে বল নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে সে আনন্দ পেত বেশি। অর্থাৎ কৌশলের চেয়ে বলপ্রয়োগের নীতি সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রেও তাই। ভান ছিল না, ভণিতা ছিল না। শুধু আবেগ। বিচার-বিশ্লেষণ পিছনে পড়ে রয়েছে। হৃদয় আগে ছুটে গেছে। পরিমলের মতন প্রেমিক এ-যুগে বিরল। কথাটা বলে পরিতোষ একটু সময় চুপ ছিল। কী ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলেছিল। তারপর বলেছিল, এই ভয়ংকর হৃদয়াবেগ নিয়ে বিশাখাকে ভালোবাসতে গিয়েছিল বলে না দাদা এমন সাংঘাতিক কাজ করে বসল। মলয়কে খুন করল। কলেজে দাদার সঙ্গে পড়ত, দাদার বন্ধু। যতীন দাস রোডের অক্ষয় উকিলের ছেলে। রোগা লম্বা ফর্সা মতন ছিল দেখতে। একটু মেয়েলী ধাঁচের মুখ। দাদা ও মলয়ের অন্য বন্ধুরা ঠাট্টা করে প্রায়ই 'মলয়া' বলে ডাকত। লাজুক মুখচোরা, কিন্তু দেখলে মনে হত, মাথায় দুষ্ট বুদ্ধিতে ভরা। ভুরু দুটো সুন্দর ছিল, হয়তো পুরুষের এত সুন্দর সুছাঁদ ভুরু দেখেই অন্য ছেলেরা তার একটা মেয়েলী নাম আবিষ্কার করতে প্রলুব্ধ হয়েছিল। অবাক লাগে, আজ ভাবি, এমন মুখচোরা লাজুক ছেলে কী করে বিশাখার প্রেমে পড়েছিল। অবশ্য কে কার প্রেমে পড়বে বলা মুশকিল, কিন্তু তা হলেও তো মলয় জানত বিশাখা আর-একটি মানুষের হৃদয় জয় করার জন্য উন্মুখ। শৌর্যে বীর্যে সাহসে স্বাস্থ্যে যাকে সত্যিকারের পুরুষ বলা যায়। বিশাখা ও পরিমলের প্রণয়লীলার কথা এতদিনে প্রায় সবাই জেনে গিয়েছিল। একডালিয়া রোড ও রিচি রোডের দুটি ছেলেমেয়ে পরস্পরের প্রেমে পড়েছে, খবরটা শুধু একডালিয়া রোড ও রিচি রোডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, গোটা বালিগঞ্জের মানুষ টের পেয়েছিল, কলেজে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল—কলেজে তো হবেই, সেখানে সব তরুণ-তরুণী, প্রেমের ব্যাপারে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বেশি। এমন একটা রুচিকর খবর গরম কেকের মতন তারা লুফে নেবে, স্বাভাবিক। করিডোরে, কমনরুমে, লাইব্রেরী হলে—এমন কী কলেজ কম্পাউণ্ডের বাইরে, শিল্প সাহিত্য রাজনীতির আলোচনার সঙ্গে প্রেমঘটিত আলোচনাগুলিও যেখানে পত্রপুষ্পে সজ্জিত হয়ে মনোহরকান্তি বনস্পতির রূপ নেয়, সেই বিখ্যাত কফি হাউসের আড্ডায় সেকেণ্ড ইয়ারের নরম ফুটফুটে মেয়ে বিশাখা ও কলেজের নামকরা খেলোয়াড়, দীপ্তস্বাস্থ্য, দীর্ঘদেহ—পুরুষোচিত

রূপ লাবণ্য তেজ বিক্রম নিয়ে আর দশটি যুবকের মনে যে ঈর্ষার সৃষ্টি করত, সেই পরিমলকে নিয়ে আলোচনার শেষ ছিল না। স্বাভাবিক। ছেলেরা পরিমলের হয়ে কথা বলত, মেয়েরা বিশাখার হয়ে কথা বলত। যেন সকলেরই এই আলোচনায় অংশ গ্রহণের অধিকার ছিল। যেন তারা চাইছিল, পরিমল ও বিশাখার প্রেম কেবলমাত্র পত্রপুষ্প শোভিত হয়ে বসন্তের ঊর্ধ্বশির কিংশুকের মতন আকাশে লাবণ্য বিস্তার করে ক্ষান্ত থাকবে না, এই প্রেম ফলবতী হবে, সার্থক হবে। যেন তারা পরিমল ও বিশাখার প্রেমকে মনে মনে সেদিন অভিনন্দন জানিয়েছিল। আর এও সত্য, দুজনের প্রেম তখন অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল।

কিন্তু কে জানত, এই ভালোবাসার বৃক্ষমূলে এক গোপন কীট বাসা বাঁধতে আরম্ভ করেছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে মলয় বিশাখার কাছে প্রেম-নিবেদন করছিল, চিঠি লিখছিল। অথচ বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যেত না। পরিমলের সঙ্গে বসে সে গল্প করেছে, সন্ধ্যা হলে লেকের ধারে হাওয়া খেতে গেছে; ছুটির দিন অন্য বন্ধুদের মতন মলয়ও পরিমলকে নিয়ে দূরে বেড়াতে গেছে, পিকনিক করতে গেছে। হয়তো বিশাখাও তাদের সঙ্গে গেছে। কিন্তু কোনো সময় কোনো অবস্থায় বিশাখার সঙ্গে মলয়কে একলা হাঁটতে, কথা বলতে, কী কোথাও বসে গল্প করতে দেখা যায়নি। পরিমল ও বিশাখাকে মাঝে মাঝে দল থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে বসে গল্প করতে দেখা গেছে। বন্ধুরাই দুজনকে এই সুযোগ করে দিত। পরিমল ও বিশাখাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে বন্ধুর দল একটা গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর গোল হয়ে বসে তাস পিটত, মনের সুখে সিগারেট টানত। যেন প্রাণভরে সারাদিন সিগারেট খাবার জন্যই মাঝে মাঝে এ ধরনের এক-একটা পিকনিকের আয়োজন করা হত। আরো দু-চারটি মেয়ে সঙ্গে যেত। তারা বিশাখার বান্ধবী। কিন্তু বান্ধবীকে তারা তেমন করে পেত না। তাতে তাদের দুঃখ ছিল না। বিশাখা তার প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে, আড়ালে বসে দুজন কথা বলছে, এই আনন্দ ও উত্তেজনা নিয়ে সখীরা আর একটা গাছের ছায়ায় বসে জটলা করেছে অথবা তাস লুডো খেলে সময় কাটিয়েছে। বনভোজন করতে পরিতোষও দু-একবার ঐ দলের সঙ্গে গেছে। মলয়কে তখন দেখেছে। দাদার আর দশটি বন্ধুর সঙ্গে সে এমনভাবে মিশে থাকত, গল্প করত, হাসত, তাস খেলত—আর প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট খাওয়া; নূতন সিগারেট ধরেই এত সিগারেট খেতে আরম্ভ করেছিল মলয়। অথচ বছর দুই আগেও সে টি বি-তে ভুগছিল। এইজন্যই তো এমন রোগা ফ্যাকাশে চেহারা ছিল। কিন্তু তা হলে হবে কী, ভিতরটা ভয়ানক শক্ত ছিল। শক্ত কপট খল। বিশাখার জন্য ছটফট করছে, জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে—বাইরে থেকে দেখে তা বুঝবার উপায় ছিল না। পরিমলের হাত ধরে বিশাখা দল ছেড়ে বনের আড়ালে সরে গেল—চোখের ওপরে দেখেও মলয়ের চেহারা কী গলার স্বরের লেশমাত্র পরিবর্তন আমার চোখে পড়েনি। কারোরই পড়েনি। পড়তে দেয়নি সে, এত সতর্ক, এত ধূর্ত ছিল ঐ প্রেমিক।

অবাক হয়ে শুনছিল রমলা। পরিতোষ একটু উত্তেজিত হয়ে বলে চলেছিল, মানুষ দুভাবেই একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারে—প্রেমের জন্য প্রেম—আবার আর-একটা প্রেমকে ভেঙে চুরমার করে দিতে, একটা সুস্থ ভালোবাসার তরুমূলে বিষ ঢেলে দিতে প্রেমিক সেজে প্রেম করা। এটাকে প্রেমের অভিনয় বলা যায়। এখানে কেবল হিংসা, ঈর্ষার জ্বালা।

সত্যিকারের প্রেমিক কখনো হিংসা করে না, ঈর্ষা করে না। সে উদার মহৎ। তার মন সুন্দর, হৃদয় পবিত্র। বিশাখা ও পরিমল পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসে, দুটি হৃদয় প্রেমের সোনার শিকলে বাঁধা পড়েছে—প্রকৃত প্রেমিক এই সুন্দর প্রেম দেখে মুগ্ধ হবে—একে দূর থেকে অভিনন্দন জানাবে, প্রণতি জানাবে, প্রেমের সুঘ্রাণ নেবে—নিজের মধ্যে প্রেম অনুভব করবে; অথবা যদি সে মেয়েটিকে ভালোবাসে—একটি মেয়েকে একাধিক পুরুষ ভালোবাসতে পারে—তবে সে অস্থির হবে, উন্মনা হবে, কাঁদবে, অভিমান করবে, কিন্তু কিছুই সে নষ্ট করবে না, ভাঙবে না। হ্যাঁ, প্রেমিক কাঁদে অভিমান করে অস্থির হয়—উন্মাদ হওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব না। নির্বিকার থাকে শয়তান। স্থির নির্বিকার থেকে মলয় বিশাখাকে ভালোবাসতে গিয়েছিল, টুকটাক প্রেমপত্র লিখছিল। তার অর্থ—আর-একটা ভালোবাসা ভেঙে দেওয়া, নষ্ট করে দেওয়া। শয়তানের যা ধর্ম। হিংসেটাই এখানে প্রধান, ঈর্ষাই সব। পরিমল ও বিশাখার প্রেম সে সহ্য করতে পারছিল না। কিন্তু বুঝতে দেয়নি কাউকে। তাই সকলের সঙ্গে চড়ুইভাতি করতে গিয়ে সে এত হাসত, হৈ-হৈ করত, গল্প করত। ভিতরের খলটাকে ঢেকে রাখত। সত্যি যদি সে বিশাখাকে ভালোবাসত তো এত স্বাভাবিক এত স্থির থাকতে পারত না। তার চোখে-মুখে প্রেম ফুটে উঠত, কান্না ভেসে উঠত, অভিমান থমথম করত। হয় সে চুপ করে থাকত, গম্ভীর হয়ে থাকত, নয়তো পিকনিক পার্টির সঙ্গে যাওয়া ছেড়ে দিত। কিন্তু তা সে করেনি। দুষ্ট কীটের মতো বিশাখার পিছনে লেগে ছিল। তাকে জ্বালাতন করছিল। টোপ ফেলছিল। লোভ দেখাচ্ছিল। ওপরের ভালোবাসার ধরনটাই অশ্লীল ছিল। দাদা তাই মনে করত। বিশাখাকে সিডিউস করবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে ওই স্কাউন্ড্রেল। আমি ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব। ঘটনার আগে ক'দিন রাত্রে দাদা দুবার কথাটা বলেছিল। বজ্রমুষ্টি টেবিলের ওপর রেখে চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে যখন স্থির চোখে সামনের দেওয়ালটা দেখছিল, তখন তার কপালের রগটা দপদপ করে লাফাচ্ছিল। রক্তবর্ণ চক্ষু। আমি ভয় পেয়েছিলাম। ভয়ংকর একটা কিছু ঘটবে আশঙ্কা করেছিলাম। আমার আশঙ্কা মিথ্যা হয়নি।

—পরিমল কি সেদিন রাত্রে প্রথম টের পেয়েছিল, মলয় তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে? রমলা প্রশ্ন করেছিল। পরিতোষ মাথা নেড়েছিল। ক'দিন আগেই দাদা আমায় বলেছিল, মলয়টা ভয়ানক সিলি, বিশাখার কাছে প্রেমপত্র পাঠিয়েছে। বিশাখা নাকি হাসতে হাসতে পরিমলকে বলেছিল।

তারপর? রুদ্ধশ্বাস হয়ে রমলা শুনছিল। নিশ্চয় বিশাখা সেই চিঠির জবাব দেয়নি?

—তা হয়তো দেয়নি। পরিতোষ গম্ভীর হয়ে বলেছিল, বা দিতেও পারে। দাদা এই নিয়ে বিশাখাকে প্রশ্ন করেনি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তবে দাদা আশা করেছিল, যদি বিশাখা মলয়ের চিঠির জবাব দিয়েও থাকে তো এমনভাবেই সে চিঠি লিখবে, যাতে ভবিষ্যতে মলয় আর কোনোদিন তার কাছে ভালোবাসা-টাসার রঙচঙে কথা জানিয়ে চিঠি দিতে সাহস পাবে না।

—তারপর? রমলার ভয়ানক কৌতূহল হয়েছিল, যেন একটা কিছু সে অনুমানও করছিল। নিশ্চয় বিশাখা আর একদিনও তোমার দাদার কাছে বলে নি যে, মলয় তার কাছে আবার প্রেমপত্র পাঠিয়েছে? বলেছিল কি? আমার তো মনে হয় না।

—না, রমলার অনুমান দেখে পরিতোষ খুব অবাক হয়েছিল। —আর কোনোদিন দাদার কাছে বিশাখা মলয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করেনি। আজ বুঝতে পারছি, কেন করেনি। মেয়েরা তাদের প্রেমিক-পুরুষের কাছে, বুঝি স্বামীর কাছেও একবারই শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকের কথা বলে। তারপর চুপ করে থাকে। বিশাখাও চুপ করে ছিল।

—কিন্তু পুরুষের কি চুপ করে থাকা উচিত? অল্প হেসে রমলা বলেছিল। পরিতোষ কাতর চোখে রমলার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, চুপ করে থাকা উচিত বলেই তো আমি মনে করি—দাদাও তাই মনে করত। জানি না, আজ জেলে বসে দাদা এ সম্পর্কে কী ভাবছে। কিন্তু সেদিন চুপ ছিল। সব পুরুষই তা করবে বলে আমার মনে হয়। কেননা, এ-সব নিয়ে একবারের বেশি দুবার কথা বলতে গেলে কথাটা সেখানেই থেমে থাকে না, তারপর আবার কথা উঠবে, আজ উঠবে, কাল উঠবে—তারপর দুবেলা, এই নিয়ে প্রতি মুহূর্তে কথা হবে। তখন আর সেটা কথা থাকবে না। একটা কাদার পিণ্ড হয়ে দাঁড়াবে—আর বার বার সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করা মানে কাদা চটকানো—কেমন তাই নয় কি?

রমলা আর কিছু বলছিল না।

পরিতোষ চুপ ছিল না। — প্রতিদ্বন্দ্বী যদি সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন তাকে ঠেকাবার দায় পুরুষের। নিজের পৌরুষ দিয়ে, বাহুবল দিয়ে সে প্রতিদ্বন্দ্বীকে রুখবে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী যেখানে চোরের মতন খিড়কির দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে চায়, সেখানে পুরুষের কিছু করবার থাকে না। পুরুষের দৃষ্টি সামনের দিকে—সদরের দিকে—বাইরের জগৎ নিয়ে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। যে পুরুষ ঘাড় ঘুরিয়ে বার বার পিছন দেখে, ঘর দেখে, সেই পুরুষের ঘরনী বিরক্ত হয়, পুরুষের পৌরুষ সম্পর্কে তার মনে সন্দেহ জাগে। পুরুষের পিছনের দিকে তাকানো দুর্বলতার লক্ষণ—সন্দিগ্ধচিত্ততার লক্ষণ। দুর্বল সন্দিগ্ধচিত্ত পুরুষকে মেয়েরা কখনই ভালোবাসে না, শ্রদ্ধা করে না। স্ত্রীও না, প্রেমিকাও না। ঘর সামলাবার দায় মেয়েদের, খিড়কির দরজার চোর ঠেকাবার ভার তাদের ওপর ছেড়ে দিতে হয়।

এবার রমলার ঠোঁট নড়ে উঠেছিল। মানে এখানে মেয়েদের বিশ্বাস করতে হবে—এই তো?

—নিশ্চয়! পরিতোষের চোখ বড়ো হয়ে উঠেছিল। বিশ্বাস করে পুরুষ জিততে পারে, ঠকতেও পারে। কিন্তু একবারই ঠকবে। একবারই সে কাঁদবে। প্রতি মুহূর্তে অবিশ্বাস করে স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করা, কী প্রেমিকার সঙ্গে প্রেম করার যন্ত্রণা মৃত্যু-যন্ত্রণার চেয়েও করুণ মর্মান্তিক।

—বিশাখা কি—অস্ফুট গলায় রমলা একটা কিছু বলতে চেয়েছিল। পরিতোষ বাধা দিয়েছিল। আমায় শেষ করতে দাও। না, বিশাখা বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেনি। কিন্তু ট্রাজেডি এখানে না। মেয়েরা যখন বিশ্বাসের সুতো ছিঁড়ে ফেলে প্রেমিক বদল করে—স্বামী বর্জন করে তখন তাদের বোঝা যায়। পরিত্যক্ত পুরুষ কাঁদে রাগ করে মাথার চুল ছেঁড়ে—বিশ্বাসঘাতিনীকে দিবারাত্র অভিসম্পাত দিতে থাকে কেউ। পুরুষের এই বিক্ষোভ, এই হাহাকারের পিছনে যুক্তি থাকে। সেই জন্য এই কান্নার একটা মাধুর্য আছে। আবার ঘৃণায় বিদ্বেষেও তার মন পূর্ণ হতে পারে। তাও সঙ্গত। আবার সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে পুরুষ হাসতে

পারে। এমন পুরুষ আছে। এমন পুরুষ আছে, স্ত্রী বা প্রণয়িনীর বিচ্ছেদবেদনা ভুলতে আত্মহত্যা করবে বলে প্রতিনিয়ত যে পাঁয়তারা কষতে থাকে; ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার পর সত্যি সে তেমন কিছু করে না। বরং সংসারের আর পাঁচটা দুর্ঘটনার মতন এটাকেও ধরে নিয়ে চমৎকার সুস্থ স্বাভাবিক থাকতে পারে। শুধু তাই নয়, এবেলার দুর্ঘটনা ওবেলা ভুলে যেতেও তার কষ্ট হয় না। সেই পুরুষ ভাগ্যবান সন্দেহ কি। কিন্তু পরিমলের জীবনে অন্য কিছু ঘটল। তার চোখের সামনে বিশাখা বিশ্বাসের সূতো ছিঁড়তে দিল না। বা বলা যায়, সূতো ঠিকই ছিঁড়েছিল, কিন্তু ছলনা দিয়ে বিশাখা ছেঁড়া সূতো লুকোতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এটা আরও সাংঘাতিক। পুরুষ তখন কাঁদতে পারে না, হাসতে পারে না, অভিশাপ দিতে পারে না আত্মহত্যা করতে পারে না। একটা হেঁয়ালির মধ্যে থেকে তাকে দিন কাটাতে হয়। অসহায়বোধ করে সে। যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে সে পথ চলেছে. দু-পা এগিয়ে আবার থামতে হয়, সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে হয়। চেনা জিনিস অস্পষ্ট হয়ে ওঠে, অপরিচিত মনে হয়। তখন বার বার তাকে চোখ রগড়াতে হয়। নিজের দেখাটা ভুল, কী জিনিসটাই ভুল, বুঝতে না পেরে ক্লান্ত বিষণ্ণ নিস্তেজ হয়ে সে নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে আরম্ভ করে। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে মানুষ যত না হতাশ ম্রিয়মাণ হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি তাকে নিস্তেজ অবসন্ন করেছে ভালোবাসার ছলনা। তাই শেষ দিকে দেখতাম বিশাখার চিঠি পড়ে দাদা একদিন যদি উৎফুল্ল উত্তেজিত হয়েছে, আর একদিন একই হাতের লেখা পত্র পড়তে পড়তে কেমন যেন ভেঙে পড়েছে. বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; থমথমে মুখ. নিষ্প্রভ দৃষ্টি, আর মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস ফেলার সেই করুণ ছবি! এও মনে হত বিশাখার প্রেমে সন্দেহ করতে গিয়ে হঠাৎ যেন এক সময় বিদ্রোহী হয়ে উঠে পরিমল নিজেকেই সন্দেহ করতে আরম্ভ করত—তখন খুব ছটফট করত, চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করত। চুল ছেঁড়ার ভঙ্গিতে বার বার মাথার কাছে হাত তুলে ঠোঁট কামড়াত। যেন বিবেকের দংশন জ্বালায় মরছে। পরদিন ছুটে গেছে বিশাখার কাছে। ছুটে যাবার ধরন দেখে মনে হত আগের দিন রূঢ় ব্যবহার করে এসেছিল. সেই ক্ষতি পূরণ করতে চতুর্গুণ আবেগ নিয়ে প্রণয়িনীকে ভালোবাসতে পরিমল ছুটে গেল। কিন্তু দিনের শেষে যখন বাড়ি ফিরে এসেছে তখন আবার সেই মাস্তুলভাঙা জাহাজের চেহারা। তলার ফুটো দিয়ে হু-হু করে জল ঢুকছে—জাহাজ তলিয়ে যাচ্ছে। চেয়ারে বসে দু-হাতের ভিতর মাথা গুঁজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকত। টেবিলে আলোটা জ্বলত। ছলনার ভালোবাসা একটা সতেজ প্রফুল্ল প্রাণময় যৌবনকে ধীরে ধীরে কেমন নিঃস্ব, রিক্ত, পঙ্গু, হতম্লান করে দিচ্ছে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম। কদিন ধরে আমারও পড়াশোনা কিছুই হচ্ছিল না। আমিও একটা ভয়ংকর কিছুর প্রতীক্ষায় ছিলাম। কেননা, কেবল একটা ছলনা না. আর একটা ছলনার সঙ্গেও যে পরিমলকে লড়াই করতে হচ্ছিল। মলয় এত হাসে কেন, এত সুস্থ এত সজীব কেন সে? যদি তার প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে, যদি তার ভালোবাসার কান্না শুনেও বিশাখা নীরব উদাসীন হয়ে রইল তো সে এমন স্বাভাবিক থাকবে এ যে বিশ্বাস করাও কঠিন। শয়তান তার কাজ করে যাচ্ছে, পরিমল বেশ অনুমান করতে পারছিল, তা না হলে সে ক্রুদ্ধ হত, ক্ষুণ্ণ হত; পরাজয়ের লজ্জা নিয়ে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে না হোক, পরিমলের সঙ্গে, বিশাখার সঙ্গে মলয় মেলামেশা বন্ধ রাখত। অন্তত কিছুদিন বন্ধ রাখত।

কিন্তু প্রতিদিন সে আসছে, গল্প করছে, হাসছে—যেন কিছুই হয়নি; দলের আর পাঁচটি মেয়ে, যেমন মাধবী শিপ্রা সুজাতা এদের সঙ্গে তার যেমন একটা সাদামাটা ভাসা-ভাসা রকম বন্ধুতার সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নেই তেমনি যেন বিশাখার সঙ্গেও আগাগোড়া সেই সম্পর্ক সে বজায় রেখে চলেছে; একদিনের জন্যও তাকে দেখে তার লোভ জাগেনি, চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেনি। একি সম্ভব! ভান ভান। একটা ছলনা আর একটা ছলনাকে ঢেকে রেখেছিল।

॥ ৬ ॥

পরিমল সত্যিই একদিন মাথার চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করল। রাত্রে ঘুমোত না। চেয়ারে বসে থেকে সামনের দেওয়ালটা দেখত, পায়চারি করত কখনো। নিজের মনে বিড়বিড় করত। কথাগুলি বোঝা যেত না। পরিতোষ দাদাকে শান্ত হতে ধৈর্য ধরতে দু একদিন বলেছিল, তারপর আর কিছু বলত না, বলতে সাহস পেত না। যেন এই নিয়ে কিছু বলতে গেলে পরিমল রাগ করত। একটা চিঠি, মলয়ের একটা চিঠির কথা একবার বলে তারপর এমন সাংঘাতিক নীরব থেকে বিশাখা যে কুয়াশা সৃষ্টি করে রেখেছিল এটাই পরিমলের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এই কুয়াশার অন্তরালে অনেক কিছু ঘটছে সন্দেহ করছিল সে। সার্থক প্রেম বোঝা যায়, ব্যর্থ প্রেমের ভাষাও মানুষের চোখে লেখা থাকে, কিন্তু পুরুষ ও নারীর গোপন আসক্তি, বিকৃত প্রণয়লীলা, ব্যভিচার বাইরে থেকে বোঝা যায় না। ক্রোধের ভাষা আছে, হিংসারও ভাষা আছে, স্নেহ, প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য, উদারতা, রীতিমতো কথা বলে। এদের ভাষা পরিষ্কার, চেহারা স্বচ্ছ। কিন্তু ব্যভিচার রক্তের অন্ধকারে মিশে থাকে। মারাত্মক ব্যাসিলির মতন নীরব থেকে কাজ করে যায়। আর এদের শক্তি অসীম। পরিমল শেষটায় এই জিনিসই সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিল। প্রকাশ্যে প্রেম করার সাহস ছিল না মলয় ও বিশাখার। বিকৃত আসক্তির অন্ধকারে চোরের মতন তারা আনাগোনা করছিল। এই জন্য পরিমল 'সিডিউস' শব্দটা ব্যবহার করেছিল। শয়তান বিশাখাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। শয়তানকে বেঁচে থাকতে দেওয়া অপরাধ।

মাথা নিচু করে স্তব্ধ হয়ে শুনছিল রমলা। পরিতোষ চুপ করতে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলে কী একটু ভাবল সে। তারপর চোখ তুলল। —বিশাখা? বিশাখার কী হল, এখন সে কোথায়?

পরিতোষ অল্প হেসেছিল। —বিয়ে হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সে বছরই। যেন নিজেই গরজ করে তাড়াতাড়ি এক প্রফেসারকে বিয়ে করে ফেলল। আমাদের কলেজের না। অন্য একটা কলেজে ছিলেন ভদ্রলোক। বিশাখাকে বাড়িতে পড়াতেন। মেয়ে ভালো করে লেখাপড়া শিখবে বলে সেই ফার্স্টইয়ার থেকেই বিশাখার বাবা প্রাইভেট টিউটর রেখে দিয়েছিলেন যেন।

—লেখাপড়া আর হল না তা হলে।

—না, কী করে হবে। পরিতোষ মাথা নেড়েছিল। আমার মনে হয় বিশাখা খুব ভয় পেয়েছিল। স্বাভাবিক যদিও। একটা চায়ের দোকানে মলয়কে ডেকে নিয়ে গিয়ে পরিমল তাকে ছুরি মারল—হাসপাতালে সেই রাতটা, সন্ধ্যার দিকে ঘটনাটা ঘটেছিল, হ্যাঁ, একটা রাত এবং পরদিন বেলা দশটা পর্যন্ত মলয় হাসপাতালে থেকে পরে মারা যায়। জ্ঞান ছিল

না অবশ্য। মলয় এভাবে মারা গেল, পরিমলকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল, হঠাৎ এমন একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটবে কে জানত; আমরাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া পরিমল মলয়—দুজনের সঙ্গেই বিশাখার যথেষ্ট মেলামেশা মাখামাখি ছিল—মেয়ে হয়ে সে তো একটু বেশি ভয় পাবেই—আর একদিনও কলেজে এল না, বাড়ির বাইরেই আর তাকে দেখতাম না। হ্যাঁ, যখন তার বিয়ে হয় তখনও দাদা জেল হাজতে ছিল। তখনও কোর্টে মামলাটা চলছিল। বেশ কিছুদিন লেগেছিল মামলা শেষ হতে।

—বুদ্ধিমতী, চট করে বিয়ে করে বিশাখা ভালোই করেছিল। রমলা এবার অল্প হেসেছিল। কিন্তু পরিতোষ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। হাসেনি।

—হ্যাঁ, বুদ্ধিমতী সন্দেহ কী, একজনকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে, একজনকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে পাঠিয়ে দিয়ে আর একজনের গলায় মালা দিয়ে দিব্যি ঘরসংসার পেতে বসলেন তিনি। বুদ্ধি না থাকলে তো বাপের কাছে থেকে পরিমলের জন্য এই ক' বছর হাপুস নয়নে শুধু কাঁদত, কী পরিমল যেমন সন্দেহ করেছিল যদি মলয়ের সঙ্গে সে ধরনের বিশ্রী একটা সম্পর্ক থেকে থাকত তো মলয়ের জন্যই হয়তো কেঁদে কেঁদে চোখ অন্ধ করত।

—কোথায় থাকে ওরা, বিশাখা আর তার স্বামী? সাউথে? নাকি এদিকে কোথাও বাসা? রমলা প্রশ্ন করেছিল। পরিতোষ তেমনি গম্ভীর থেকে বলেছিল, সুন্দরী বুদ্ধিমতী মেয়েটিকে তোমার দেখতে ইচ্ছা করছে মনে হয়। যাদবপুর থাকত—আবার মাঝখানে কার কাছে যেন শুনেছিলাম ভদ্রলোক দিল্লীর একটা কলেজে চাকরি পেয়ে সপরিবারে সেখানে চলে গেছে। এখন আবার কলকাতায় ফিরে এসেছে কিনা জানি না। যদি আমরা বালিগঞ্জে থাকতাম তবে খোঁজ খবর পেতাম। স্বামীর সঙ্গে দিল্লি যাক কী বোম্বে যাক বাপ মাকে নিশ্চয় মাঝে মাঝে মেয়ে দেখতে আসে। বিশাখার বাবা এন কে চ্যাটার্জী এখনো রিচি রোডে আছেন এটা আমি শুনেছি। নিজের বাড়ি ছেড়ে যাবেন কোথায়। তা ছাড়া আমরা যেমন একডালিয়া রোডের আস্তানা গুটিয়ে অন্যত্র সরে এসেছি, দু-দুবার ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বাড়ি ভাড়া করে থেকেছি, তাঁর সেরকম কিছু করার দরকার পড়েনি। তুমি শুনলে অবাক হবে, এতবড়ো খুনের মামলায় বিশাখার নামটা একবারও ওঠেনি। পরিমলের সঙ্গে বিশাখার প্রণয় ছিল, অক্ষয় উকিলের ছেলে, পরিমলের বন্ধু মলয় তার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছিল—এত বড়ো একটা কথা কেমন করে যেন বেমালুম চাপা পড়ে গেল। বরং আমাদের পাড়ায় একটা লাইব্রেরী করার ব্যাপার নিয়ে ঘটনার আগের দিন মলয়ের সঙ্গে পরিমলের কথা-কাটাকাটি হয়েছিল, সেই সাধারণ বিষয়টাই ফলাও করে আমাদের পক্ষের উকিল আদালতে তুলে ধরেছিল। পরিমলকে আমরা লাইব্রেরীর সেক্রেটারী করেছিলাম। যতীন দাস রোডের ছেলে হলেও পরিমলের বন্ধু হিসাবে মলয় লাইব্রেরীটা গড়ে তোলার ব্যাপারে গোড়া থেকে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিল। তার এই উৎসাহের মূলে যে বিশাখা ছিল পরিমলের বুঝতে কষ্ট হয়নি। কেননা পরিমলদের লাইব্রেরীতে বিশাখাও আসা যাওয়া করবে, সুতরাং মলয়কে এখানে থাকতেই হবে। মলয় লাইব্রেরীর জন্য মোটা চাঁদা দিয়েছিল। তা ছাড়া ঘুরে ঘুরে সে আরো চাঁদা সংগ্রহ করছিল। ক্যাশ মলয়ের কাছেই থাকত। কিন্তু একদিন হিসাব দেখাতে গিয়ে মলয় নাকি কী গন্ডগোল করে। এই নিয়ে সেক্রেটারীর সঙ্গে তার বিরোধ সৃষ্টি। কদিন ধরেই দুজনের

মধ্যে একটা চাপা আক্রোশের ভাব চলছিল এবং বাক্যালাপও বন্ধ ছিল। ঘটনার আগের দিন সেই চাপা জিনিসটা বাহ্যিক রূপ নেয়, দুজনের মধ্যে বিশ্রী কথা কাটাকাটি হয়। আসলে দুজনের মধ্যে ঝগড়াটা কী নিয়ে তা একমাত্র আমিই অনুমান করতে পেরেছিলাম—আর যদি কেউ পেরে থাকে তো বিশাখা। বিশাখার সঙ্গে মলয়ের গোপন অন্তরঙ্গতার কথা বাইরের লোক জানত না। একমাত্র আমরা দু-ভাই জেনেছিলাম, জেনেছিলাম বা সন্দেহ করছিলাম। জানি না মলয়ের বাবা অক্ষয়বাবু এই প্রণয়ঘটিত প্রসঙ্গ জানতে পারলে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও জোরালো করবার জন্য আদালত পর্যন্ত তা টেনে নিতেন কিনা। কিন্তু এসব কিছুই তিনি জানতেন না। একেবারে অন্ধকারে ছিলেন। আর আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পরিমল যে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থাকবে এটা খুবই স্বাভাবিক। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যে-কথা আগের দিন রাত্রে পড়ার ঘরে আমার সামনে সে বলেছিল, জজ সাহেবের সামনেও পরিমল সেকথা বলতে পারত, তার প্রণয়িনীকে মলয় সিডিউস করেছিল। কিন্তু পরিমল বলেনি। ফাঁসিকাঠে ঝুলতে যাচ্ছে জেনেও সে বিশাখার নাম প্রকাশ করল না। এখানেই তার উদারতার, তার প্রেমের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। হয়তো হাজতে বসেও বিশাখার মুখ রাতদিন কল্পনা করছিল। পুষ্পে কীট প্রবেশ করবে স্বাভাবিক। তার জন্য তো পুষ্প দায়ী না, কীটের দোষ। সুতরাং দুষ্ট কীটকে ধ্বংস কর। মলয়কে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও। ফুল আবার সতেজ সুস্থ হয়ে উঠবে; রঙ ছড়াবে, সৌরভ বিলাবে, মধুময় হয়ে উঠবে। বিশাখা বিশাখা হয়ে উঠুক। এই খুনের মামলায় বিশাখাকে টেনে এনে তার গায়ে অপযশের কলঙ্ক লাগতে দিতে পরিমল কিছুতেই রাজী হল না। আমি বাবাকে সব ভেঙ্গে বলেছিলাম। বলতে হয়েছিল। কেননা দাদার ফাঁসি হবে কল্পনা করতেও যেন আমার গায়ে কাঁটা দিত। কাজেই আমি কিছু গোপন করলাম না। বিশাখার সঙ্গে দাদার প্রেম—মলয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দল বেঁধে আমাদের পিকনিক করতে যাওয়া, লাইব্রেরীর ব্যাপারে মলয়ের গায়ে পড়ে উৎসাহ দেখাবার উদ্দেশ্য, সব কিছুই আমি বাবাকে খুটিয়ে খুঁটিয়ে বলেছিলাম। কিন্তু উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করবার আগে জেলহাজতে দাদার সঙ্গে দেখা করে কথা বলে বাবা যখন ছেলের মনের ভাব জানতে পারলেন তখন তিনিও যেন ইচ্ছা করেই বিশাখার প্রসঙ্গটা চেপে রাখলেন। আমার মনে হয় দাদা খুব কাঁদাকাটা করেছিল। কাঁদাকাটা করেছিল কি? শক্ত ধাতের মানুষ। হয়তো না কেঁদে বাবাকে শাসিয়েছিল, সাবধান করে দিয়েছিল বিশাখার নাম যাতে প্রকাশ করা না হয়, দাদার সঙ্গে বিশাখার ভালোবাসা বা মলয়ের সঙ্গে বিশাখার গোপন সম্পর্ক—কিছুই যাতে উল্লেখ করা না হয়। তার ফাঁসি হয় হবে, তবু বিশাখা কলঙ্কমুক্ত থাকুক। বাবাকে এসব কথা বলার সময় দাদার চেহারা কেমন হয়েছিল আমি তাও কল্পনা করেছি। অবশ্য জেলে দাদার সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসে বাবা আমায় কিছুই বলেননি। তবু আমার মনে হয়েছিল, ফাঁসির আসামী জেদী হবে, একরোখা হবে। বিশাখার নাম প্রকাশ করা হলে দাদা একটা অঘটন সৃষ্টি করবে, মামলা শেষ হবার আগেই হাজতে থাকা অবস্থায় আত্মহত্যা করবে—এই ধরণের কথা কথা যে বাবাকে বলেনি তাই বা কে জানে। এগুলো অবশ্য সবই আমার অনুমান। কেননা খুনের ঘটনার পর থেকে আমার যেন কেবল মনে হচ্ছিল দাদার বয়স বেড়ে গেছে, মনটা আরো বেশি কঠিন হয়ে গেছে, কঠিন কর্কশ এবং নিষ্ঠুরও। এখন

শুধু নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে চাইছে—জিদ বজায় রাখতে চাইছে। এমনও হতে পারে, কাঁটা সরিয়ে ফেলার পর, মলয়কে মেরে ফেলার পর বিশাখাকে এখন পরিমল বুঝতে দিতে চাইছে সে কত মহৎ উদার। এই মামলায় বিশাখাকে সে জড়াল না; মলয় ও বিশাখাকে নিয়ে অনেক কুৎসা সে গাইতে পারত, সত্য মিথ্যায় মিশিয়ে নানা কলঙ্ক কাহিনী আদালতে প্রকাশ করতে পারত; বিখ্যাত জিয়োলজিস্ট রিচি রোডের নীলাদ্রি চ্যাটার্জির কলেজে পড়া ঝকঝকে মেয়ে বিশাখার নৈতিক চরিত্রের কথা জনসাধারণ জানতে পারত। কিন্তু কিছুই জানতে দিল না, প্রকাশ করতে দিল না একজন, যে বিশাখাকে সত্যি ভালোবেসেছিল, কিন্তু বিশাখা সেই সুন্দর পবিত্র ভালোবাসার মর্যাদা রাখল না, বিশ্বাসঘাতকতা করল; শয়তানের সঙ্গে মিশে নিজেকে নষ্ট হতে, কলুষিত হতে দিতে চেয়েছিল সে। পরিমল শয়তান না, সে প্রেমিক। তাই বিশাখাকে ক্ষমা করতে পারল। সে নিজে মরতে চলল—কিন্তু বিশাখাকে বাঁচিয়ে দিল। ভালোবাসা কাকে বলে, সত্যিকারের প্রেমিক কে—আমার সঙ্গে দাদা মাঝে মাঝে আলোচনা করত। বিশাখার আচরণে ক্ষুণ্ণ হয়ে মন খারাপ করে যেদিন বাড়ি ফিরত সেদিনই পরিমল এই সব গম্ভীর তত্ত্বঘেঁষা কথা বেশি বলত। কথাগুলি আমার মনে ছিল। তাই জেলে দাদার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরে বাবা যখন আর একবারও পরিমল ও বিশাখা বা বিশাখা ও মলয়ের মেলামেশা সম্পর্কে একটাও প্রশ্ন না করে বরং মনোযোগ সহকারে লাইব্রেরীর টাকাকড়ি সংক্রান্ত গোলমালের ইতিহাসটা নূতন করে শুনতে বসলেন, সেক্রেটারী পরিমলের সঙ্গে ক্যাশিয়ার মলয়ের মনোমালিন্য ও কলহ সম্পর্কে হাজারটা প্রশ্ন করলেন তখন আমি দাদার মনোভাব বুঝতে পারলাম। লাইব্রেরীর কাগজপত্র, হিসাবের খাতা ও চাঁদার বই নিয়ে বাবা উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসে গেলেন। খুনের মামলায় মানুষ দুই বন্ধুর এই বাহ্যিক বিরোধের কথাই শুধু জানতে পারল আর কিছু শুনল না। বিশাখা নামটাও কেউ উচ্চারণ করল না। ভগবানের ইচ্ছায় দাদা মৃত্যুদন্ডের হাত থেকে বেঁচে গেল, ফাঁসি না হয়ে দশ বছর জেল হল। সম্ভবত তার একটা প্রধান কারণ মলয়ের যে একবার টি বি হয়েছিল আদালতে এটা প্রমাণ করা হয়েছিল। এতবড়ো একটা অসুখে ভুগে ওঠার পর মানুষের হার্ট দুর্বল থাকা খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং আঘাত সাংঘাতিক হলেও একমাত্র পরিমলের ছুরিকাঘাতই মলয়ের মৃত্যুর কারণ ছিল কিনা এই সম্পর্কে জুরীদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল। তা ছাড়া আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে মলয় মারা যায়নি। হাসপাতালে বেশ কয়েক ঘন্টা বেঁচে ছিল, তোমায় বলেছি। মনে হয় এসব বিবেচনা করেই দাদার দন্ডের মাত্রা লাঘব করা হয়েছিল। আমি আইনজ্ঞ নই। কথাটা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারলাম না। আমরা এটাকে ভগবানের দয়া বলেই মেনে নিলাম। সুকোমলও তাই বলেছিল। আমাদের মাথার ওপর এমন একজন পুরুষ বসে আছেন যিনি প্রতিনিয়ত আমাদের আশীর্বাদ করছেন, আমাদের সকলের শুভকামনা করছেন। তাঁর আশীর্বাদ ব্যর্থ হবে না। আনন্দমোহন সাধক ছিলেন, প্রেমিক ছিলেন। তাঁর বংশের কোনো ছেলে খুনের জন্য খুন করবে, তারপর ফাঁসিকাঠে ঝুলবে এমনটা হতেই পারে না। দাদা যে এমন একটা কাজ করে জেলে গেল, আমার কেবলই মনে হয়, পরমেশ্বরের ইচ্ছা এর পিছনে কাজ করছে। মেজদা সংসারের দায়িত্ব মাথায় নিয়েছে, আমি আশ্রমবাসী হয়ে দশের সেবা করছি। দাদা চিরদিনই খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ

ভালোবাসত। কিন্তু আমোদ আহ্লাদের পথও যে সহজ না, এর জন্যও মানুষকে কঠিন পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে হয় দাদার অবস্থা দেখে আজ আমার তাই মনে হচ্ছে। এরপর নিশ্চয় ভগবান দাদাকে দিয়ে কোন মহৎ কাজ করাবেন। এখন তার প্রস্তুতিপর্ব চলছে। আগুনে পুড়ে সোনা উজ্জ্বল হয় খাঁটি হয়। দীর্ঘদিনের কারাবাস দাদার মনকে হৃদয়কে উজ্জ্বল করবে পবিত্র করবে। জেল থেকে বেরিয়ে এলে দাদা অন্য মানুষ হয়ে যাবে, তোমরা দেখো।

তাই রমলা কাল পিছন থেকে এমন খুঁটিয়ে জগমোহনের বড়ো ছেলেকে দেখছিল। এই সেই প্রেমিক! পরিতোষের কথা, সুকোমলের কথা ভাবতে গিয়ে রমলা তার নিজস্ব একটা চিন্তাও যেন সেই সঙ্গে মেশাতে চেষ্টা করছিল। ফলে সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল।

তার ভয় করছিল, আবার ভালোও লাগছিল পরিমলকে।

মুগ্ধ হচ্ছিল মানুষটিকে দেখে, পরমুহূর্তে একটা আতঙ্ক অনুভব করছিল ভিতরে ভিতরে।

প্রেমিক—খুনী, দুটো কথা এক সঙ্গে তার মনকে নাড়া দিচ্ছিল। রমলা ভাবছিল, পরিমল একবার প্রেম করেছিল, তার মূল্য সে পায়নি। তার ভালোবাসা ব্যর্থ হয়েছিল। তারপর দশ বছর কেটে গেছে। তখন তার বয়স উনিশ ছিল, কৈশোরের শেষ, যৌবনের আরম্ভ সেটা। আজ উনত্রিশ বছরের যুবক সে—যৌবনের মধ্যাহ্ন—না কি তার বেশি? প্রৌঢ়ত্বের দরজায় এসে গেছে! এই বয়সে কি প্রেমের পিপাসা, ভালোবাসার তীব্রতা কমে যায়! কিন্তু রমলার যেন মনে হচ্ছিল ঐ মানুষটির ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা কমেনি। গাড়ি থেকে নেমে কাল দুপুরে জগমোহনের সঙ্গে সে যখন নিচে বারান্দায় উঠে এসেছিল ও রমলার দিকে প্রথম তাকিয়েছিল, রমলা চমকে উঠেছিল পুরুষের আশ্চর্য চোখজোড়া দেখে। যেন সেই চোখে সে প্রেমের বহ্ন্যুৎসব দেখতে পেয়েছিল। সব পুরুষের চোখে প্রেমের আগুন দেখা যায় না, কোনো কোনো পুরুষের চোখে দেখা যায়। যেমন বসন্তের সব গাছেই কিছু রঙ লাগে না, কোনো কোনো গাছে রঙের আগুন জ্বলে ওঠে। রমলা তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিয়েছিল, ঘাসের ওপর দাঁড়ানো পরিতোষকে দেখছিল, দীপুকে দেখছিল। পরিমলের চোখের দিকে তাকাতে তার সাহস হয়নি।

তাই রমলা এখন বসে বসে ভাবছে, প্রেমিক পুরুষের হৃদয় বুঝি কখনো প্রেমহীন হয়ে পড়ে থাকে না, ঊষর মরুভূমি হয়ে থাকে না। প্রকৃতির মতন ঋতুতে ঋতুতে সেই হৃদয়ে ফুল ফোটে রঙ লাগে। বিশাখা গেছে, কিন্তু আর একটি কল্পনার বিশাখা যে পরিমলের মন পূর্ণ করে রাখেনি তাই বা কে জানে। ভয় সেখানে। যেখানে প্রেম, সেখানে ঈর্ষা আছে হিংসা আছে। একমাত্র ঈশ্বরের প্রেমে হিংসা নেই ঈর্ষার জ্বালা নেই। আনন্দমোহন প্রেম বলতে সেই রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষা, উত্তেজনাহীন বায়বীর অনুরাগ অনুভূতির কথা বলে গেছেন। সুকোমলও সেদিন ঈশ্বর-প্রেমের ব্যাখ্যা করে গেল। কিন্তু রক্তমাংসের প্রেম, নারীর প্রেম অন্য জিনিস। এই প্রেম চিরকাল প্রতিদ্বন্দ্বী ডেকে এনেছে, ঈর্ষা জাগিয়েছে, হিংসার আগুন ছড়িয়েছে।

॥ ৭ ॥

কারাবাসের মেয়াদ শেষ করে পরিমল বেরিয়ে এসেছে। যদি এতকাল কল্পনার বিশাখাকে নিয়ে হৃদয়চর্চা করে তার জেলের নীরস দিনগুলি কেটেছে তো এবার সে রক্তমাংসের নূতন

বিশাখাকে খুঁজবে। পুরোনো বিশাখাকে সে খুঁজতে যাবে না। রমলা এ যুগের মেয়ে। এ যুগের ছেলেদের সে চেনে। বিশাখারা হারিয়ে গেলে তারা তাদের খুঁজে বার করতে গ্রাহ্য করে না। এখানেই তাদের উদারতা। পুরোনো বিশাখাদের হারিয়ে যেতে দিয়ে তারা নূতন বিশাখাদের জন্য হৃদয়-মন্দিরে দীপ জ্বেলে দেয়। এবং এ-ও সত্য, কোনো একটি বিশাখা মন্দিরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীর ছায়া পেড়। ঢেউ ছাড়া যেমন সমুদ্রের ফেনা সৃষ্টি হয় না তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়া প্রেমের সফেন উজ্জ্বল উদ্বেল তরঙ্গ সৃষ্টি হয় না। কখনো ঈর্ষায় কখনো অভিমানে, কখনো হিংসায় কখনো হননের উন্মাদনায় হৃদয়সমুদ্র টলোমলো করতে থাকে। তাই প্রেমিককে ভয়—পরিমলকে ভয়। একবার প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুন করেছিল, আবার যে সে তেমন কিছু করে বসবে না কে জানে।

দীপু যখন একটু আগে পরিমলের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে 'জেঠু' 'জেঠু' করে ডাকছিল রমলার তখন একবারও মনে হয়নি ঐ ঘরে পরিতোষের দাদা—জগমোহনের বড়ো ছেলে ঘুমিয়ে আছে। একটা হিংস্র পশু শুয়ে আছে সেখানে, এক ভয়ংকর খুনী এসে আশ্রয় নিয়েছে—ভাবতে ভাবতে রমলা আবার পরক্ষণে চিন্তা করেছে, এক হৃদয়বান অভিমানী পুরুষ অথবা কোনো উন্মাদ প্রেমিক, অথবা এক অভিশপ্ত দেবশিশু নূতন খাটের বিছানায় অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

বস্তুত এমন প্রেমিককে কী আখ্যা দেওয়া যায়—এযুগে এমন প্রেমিক আছে কিনা—প্রতিদ্বন্দ্বীর বুকে ছুরি বসিয়ে দেওয়ার মতন প্রচন্ড প্রণয়বহ্নি আজ কোনো যুবকের হৃদয়ে জ্বলছে কিনা রমলা তাও চিন্তা করল। সে কলেজে পড়েছে। অনেক ছেলে মেয়ের প্রেম দেখেছে, প্রেমের গল্প শুনেছে। কোনো প্রেম হারিয়ে গেছে—কোনো প্রেম সফল হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে একটিও পরিমল ছিল কি? বিশাখা ছিল। বিশাখারা চিরকাল আছে। একজনকে ভালোবাসতে না বাসতে আর একজনকে ভালোবাসল, একটি প্রেম যদি কায়া হয়ে উঠল অমনি আর একটি প্রেমের ছায়া দেখে বিশাখার হৃদয় দুলে উঠল। সকল যুগের বিশাখার এক পরিচয় এক হৃদয়। কিন্তু পরিমলরা যেন ইতিহাসের ধূসর জগতে হারিয়ে গেছে। নাটকে উপন্যাসে আশ্রয় নিয়েছে। প্রিয়াকে জয় করার জন্য কথায় কথায় যারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করত। এযুগের পরিমলরা উদার—একটু বেশি উদার। প্রণয়িনীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে তারা অস্ত্র নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাড়া করে না, মাথা খুঁড়ে মরে না; আত্মহত্যা করতেও বড়ো একটা শোনা যায় না। বরং হেসে নূতন সিগারেট ধরানোর মতন আর একটি নূতন মেয়ের প্রেমে পড়ে। এতকাল পরিতোষের মুখে পরিমলের গল্প শুনেছিল রমলা। কাল তাকে সে প্রথম চোখে দেখল। দেখার পর থেকে বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে সে ভাবছে, এ বাড়ির পরিবেশ বড়ো বেশি আটপৌরে, ধরাবাঁধা জীবন; জগমোহন রুগী দেখে বেড়ান, পরিতোষ লোকের ঘর বাড়ি তৈরি করে দেয়; স্বামী শ্বশুরের সেবাযত্ন, ঘর গুছানো, ছেলে মানুষ করা, শুধু এই নিয়ে তো রমলা সারাক্ষণ ব্যস্ত—আর আছে কে—ঠাকুর, চাকর, দারোয়ান, বাগানের মালী—মাসের শেষে ক'টা টাকা পাবে, তাই সারাদিন যে যার কাজ করে যাচ্ছে। এখানে ঐ মানুষটি কী করে নিজেকে খাপ খাওয়াবে! যেন বিশ্বাস করতে বাধছে। আর তারাই কি তাকে আজ ঠিক আপনজন করে দেখতে পারবে?

কমলার কথা পরে—জগমোহন? পরিতোষ? ঠাকুর চাকর বা দারোয়ানের প্রশ্ন এখানে না-ই বা উঠল।

অত্যন্ত সাধারণ, খুবই আটপৌরে—তা হলেও এ বাড়ির জীবনে একটা সুর, একটা ছন্দ খুঁজে পেয়েছিল রমলা। আজ তার মনে হচ্ছিল সেই সুরটা কেটে গেছে, ছন্দটা নেই। একটা চাপা উদ্বেগ নিয়ে সরযূধাম থমথম করছে।

হয়তো তাই। পরিতোষের ঘুম ভাঙতে এমনি বেলা হয়। সেদিন যেন আরো দেরিতে তার ঘুম ভাঙল। না কি ঘুম ভাঙ্গার পরেও সে বিছানা আঁকড়ে পড়ে রইল—শয্যা ছেড়ে তখনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে তার ইচ্ছা করছিল না? যেমন ভ্রমণ শেষ করার পরেও বাড়ির কাছাকাছি কানাইয়ের পানের দোকানের সামনে এসে জগমোহন দাঁড়িয়ে পড়লেন। কোনোদিন যা করেন না, মানিব্যাগ খুলে একটা নোট বার করে জগমোহন সিগারেট কেনেন। কানাইও একটু অবাক হয়ে ডাক্তারবাবুকে দেখে। চাকর দারোয়ানে তাঁর সিগারেট নিয়ে যায়। তিনি নিজে কোনোদিন দোকানে আসেন না, দোকানের সামনে দাঁড়ান না। ঝাঁপ তুলে দিয়ে কানাই সবে দোকান সাজিয়ে বসেছে। ডাক্তারবাবুকে সে রোজই এসময় দেখে—ওদিক থেকে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছেন. সারাদিনে ঐ একবারই ডাক্তারবাবুকে পায়ে হেঁটে দোকানের সামনের রাস্তা দিয়ে চলতে দেখে কানাই। অন্য সময় গাড়ি করে তিনি চলাফেরা করেন কিন্তু আজ জগমোহন একেবারে সিগারেট কিনতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ব্যাপার কী! সম্ভবত দীনদয়াল রাত্রে বাবুর জন্য সিগারেট কিনে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল। —কানাই ভিতরে ভিতরে খুশি হল, গর্ববোধ করল, এত বড়ো একটা মানুষ তার দোকানে এসেছেন। জগমোহন কিন্তু সিগারেট কেনার পরেও দাঁড়িয়ে থাকেন, কানাইয়ের সঙ্গে আবহাওয়া বাজার দর ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেন।

হ্যাঁ, জগমোহন ইচ্ছা করে পথে বিলম্ব করছেন। তিনি কানাইয়ের চোখ দুটো মনোযোগ দিয়ে দেখছেন। আজ আবার বাইরের মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে তাদের চোখের ভাষা পড়বার সেই ভয়ংকর কৌতূহলটা তাঁর ফিরে এসেছে। মাঝখানে এটা ছিল না। একেবারে চলে গিয়েছিল। একডালিয়া রোডে থাকতে তাঁর এই কৌতূহল চরমে উঠেছিল। তখন পরিমলের মামলার শুনানী চলছিল। রাস্তাঘাটে চলতে জগমোহন আড়চোখে কেবল মানুষের দিকে তাকাতেন: তাদের চোখের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করতেন। অবশ্য সরাসরি তিনি সেদিন একটি মানুষের চোখের দিকেও তাকাতে পারতেন না। বরং যদি কেউ সরাসরি তাঁর দিকে তাকিয়েছে, জগমোহন তৎক্ষণাৎ অন্য দিকে চোখ সরিয়ে নিতেন, কী ঘাড় গুঁজে থাকতেন। এবং আশ্চর্য, ঐ অবস্থায়ও তিনি মানুষটার চোখে কী কথা লেখা রয়েছে পরিষ্কার বুঝে ফেলতেন। সেদিন পৃথিবীর মানুষের চোখের ভাষা বুঝবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছিলেন। একডালিয়া রোডের বাড়ি ছেড়ে ঝামাপুকুর লেনে চলে আসার পরেও কিছুদিন পর্যন্ত মানুষের চোখের ভাষা পড়বার কৌতূহলটা জগমোহনের পুরোপুরি বজায় ছিল। অবশ্য ভিন্ন পাড়ায় তাঁকে খুব কম মানুষই জানত—তিনি যে ডাক্তার এটা সবাই জেনে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি যে একডালিয়া রোডের সেই ডাক্তার, যার ছেলে একটা মানুষকে খুন করে জেলে গেছে অনেকেই তা জানত না। কাজেই অনেক মানুষের চোখ দেখে দেখে এটুকু বুঝতে

তাঁর যথেষ্ট সময় লেগেছিল। কৃষ্ণদাস পাল লেনে এসে তিনি পুরোপুরি নিঃশঙ্ক হতে পেরেছিলেন। না, আর তাঁকে কেউ চেনে না। জগমোহন ডাক্তারকে চেনে, কিন্তু একডালিয়া রোডের পরিমলের বাবাকে চেনে না—যাদের চিনবার কথা তারাও ততদিনে ভুলে গিয়েছিল পরিমল নামে তাঁর এক ছেলে ছিল। জগমোহন হাল্কা নিশ্বাস ফেলতে আরম্ভ করেছিলেন।

কিন্তু আজ আবার তাঁর এই কৌতূহল কেন! কানাইয়ের চোখ দুটো দেখছেন। পরক্ষণেই অবশ্য তাঁর ভুল ভাঙল। এই অঞ্চলে তিনি যে খুবই নতুন মানুষ। বড়ো ডাক্তার, গাড়ি বাড়ি আছে। তার বেশি আর একটি কথাও এখানে কারোর জানবার কথা নয়। বড়ো ছেলে বাড়ি আসছে, কেউ কেউ শুনে থাকবে, বা কাল ছেলে বাড়ি এসেছে, ইতিমধ্যে কিছু মানুষ জেনে গেছে হয়তো। পানের দোকানের এই মানুষটিও শুনে থাকবে। হয়তো দারোয়ান কী চাকরের মুখে শুনেছে। কিন্তু দশ বছর জেল খেটে বড়ো ছেলে বাড়ি এসেছে, বাড়ির চাকর দারোয়ানও তা জানে না। এরা নূতন মানুষ। দেড় দু বছরের বেশি কারোর চাকরি নয় এ বাড়িতে। বামুন ঠাকুরটি তো খুবই নূতন। মাস দুই হয় কাজে লেগেছে। সে যাই হোক, জগমোহন এদের কাছে অন্যভাবে কথাটা রাষ্ট্র করেছেন। এতকাল ছেলে বিদেশে থেকে চাকরি করত। চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে আসছে। সেখানে স্বাস্থ্য টেঁকে না।

প্রতিবেশী? এখানে আর প্রতিবেশী কী। ছাড়া ছাড়া প্লট। জমি কিনে পিলার পুঁতে কবে থেকে মানুষ ফেলে রেখেছে। কবে বাড়ি উঠবে তার ঠিক কী। এই এক বছরে জগমোহন তো দেখলেন, দূরের ঐ তালগাছটা ঘেঁষে একটা বাড়ি উঠেছে। তিন তলা। তা ভালো বাড়িই হয়েছে। পরিতোষ বাড়ি দেখে এসে সেদিন ইঞ্জিনীয়ারের কাজের প্রশংসা করছিল। এক বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ি। নাম বুঝি আদিত্য চ্যাটার্জি। খুব সম্ভব ব্যারিস্টার। জগমোহনের সঙ্গে আজও তেমন করে পরিচয়ই হল না। রাস্তায় দেখা হলে "কেমন আছেন" "কোথায় চললেন" ধরনের সংক্ষেপে দুটো একটা বাক্য বিনিময় হয়—তার বেশি কিছু না। আর উত্তরে রাস্তা ঘেঁষে—তা-ও সরযূধাম থেকে বেশ খানিকটা দূরে—প্রকাণ্ড দুটো চারতলা বাড়ি উঠছে। এখনও কাজ শেষ হয়নি। সিন্ধী কি গুজরাটী হবেন। হয়তো দুই ভাই। হয়তো দুই বন্ধু। এক জায়গায় বাড়ি করছেন। দুটো কালো গাড়ি চড়ে রোজ বিকেলের দিকে বাড়ির কাজ দেখতে আসেন। এই দুই অবাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে জগমোহনের কোনোদিন পরিচয় হবে কিনা চিন্তা করার বিষয়। তবে তিনি ডাক্তার—এটা জানার পর যদি বাড়িতে রুগী দেখার জন্য তাঁর ডাক পড়ে—তা এমন কলকাতা শহরে বাঙালী অবাঙালী কত পেশেন্ট তো জগমোহনের রয়েছে। পরিচয় বলতে, ওপর ওপর একটা মাখামাখি ঘনিষ্ঠতা। প্রতিবেশীদের মধ্যে যেমনটি থাকে। না, প্রতিবেশীদের নিয়ে তেমন একটা সমাজ এখানে এখনও গড়ে ওঠেনি। গড়ে উঠতে অনেক বিলম্ব। আদৌ তেমন কোনো সমাজ এখানে তৈরি হবে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। এটা একডালিয়া রোড বা ঝামাপুকুর কী কৃষ্ণদাস পাল লেন নয়। সে সব অঞ্চলে যে অবাঙালী নেই তা নয়। খুবই কম। বেশির ভাগই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী। উকিল মোক্তার ডাক্তার প্রফেসার কেরাণি। এ-বাড়ির ছেলেরা ও-বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে সারাক্ষণ খেলাধূলা করছে, ও-বাড়ির মেয়েরা এ-বাড়ি বেড়াতে আসছে। প্রবীণরা সন্ধ্যার পর দাবা তাসের আড্ডায় বসছে। খবর কাগজ হাতে নিয়ে রাজনীতির আলোচনায় পাড়া

গরম করছে। এখানে এমনটা আশা করা যায় কি। জগমোহন তো শুনছেন, তাঁর বাড়ির গায়ে পুবের প্লটটা যিনি কিনে রেখেছেন তাঁর আরো পাঁচখানা বাড়ি আছে কলকাতায়। গাড়ি আছে তিনটা। বড়োবাজারে তাঁর মশলার কারবার। ছেলেমেয়ে দুটি মিশনারী স্কুলে লেখাপড়া শিখছে। আর তিনি নিজের নামটাও লিখতে পারেন কিনা সন্দেহ আছে। শিক্ষা-দীক্ষা নেই—অথচ প্রচুর টাকার মালিক। এমন টাকাওলা মানুষ আরো ক' জন এখানে এসে বসবাস করবে তার ঠিক কী। আবার পশ্চিমের প্লটটা যিনি কিনে রেখেছেন তিনি নাকি ছেলেবেলা থেকে বিলাতে লেখাপড়া করেছেন। বাড়ির চালচলন বিলাতি ধরনের। উঁচুদরের মিলিটারী অফিসার। বাড়িতে মেমসাহেব রেখে ছেলেমেয়েদের ইংরেজী শেখানো হচ্ছে। কাজেই তিনি যদি বাড়ি করে সপরিবারে এখানে এসে বাস করেন তো তাঁর সঙ্গে কী তাঁর পরিবারের মানুষদের সঙ্গে জগমোহন কী তাঁর বাড়ির ছেলেমেয়েরা কতটা মেলামেশা করতে পারবে সেটা কি ভাববার কথা নয়।

না, একডালিয়া রোড, ঝামাপুকুর লেন বা কৃষ্ণদাস পাল লেনের সমাজ এখানে কোনোদিন গড়ে উঠবে না। কাজেই প্রতিবেশী সম্পর্কে জগমোহন নিশ্চিন্ত। এখন পানের দোকানের মানুষটির চোখ দেখে, তার সঙ্গে কথা বলে জগমোহন নিশ্চিন্ত হলেন। এই সরল অশিক্ষিত মানুষটি কোনোদিনই সন্দেহ করবে না জগমোহনের এক ছেলে খুন করেছিল, জেল খেটেছিল। বরং ডাক্তারবাবু তার সঙ্গে কথা বলছেন এই উত্তেজনা ও আনন্দ নিয়ে বড়ো বড়ো চোখ মেলে সে জগমোহনের বিশাল দেহ, তাঁর হাতের ঘড়ি, গায়ের জামা কাপড় এবং পায়ের চটিজোড়াটিও যেন পরম আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করল। একদিন জগমোহন তাঁর আশেপাশে সামনে-পিছনে এমন মানুষই দেখতে চাইতেন—এমন শান্ত নিরীহ অসন্দিগ্ধ চোখ।

কানাইয়ের চোখ দেখে হৃষ্টমনে তিনি দোকানের সামনের থেকে সরে এসে আবার হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

তা হলেও বাড়ির সদরের কাছে পৌঁছে জগমোহন তেমনি বিষণ্ণ হয়ে উঠলেন। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতন মুখটা থমথম করতে লাগল। কিন্তু গেট পার হয়ে ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন তাঁর বুকের মধ্যে দপ করে একটা আলো জ্বলে উঠল। মনে মনে তিনি তাই চেয়েছিলেন। একটা আলোর অপেক্ষা করছিলেন—সেই কাল দুপুর থেকে। তা না হলে তিনি যে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিলেন। সুকোমলের গলার শব্দ শোনা যাচ্ছে না! তা হলে সে এসে গেছে। কাল বিকেলে আসবার কথা ছিল। জগমোহন সেভাবেই ব্রজদুর্লভপুর আশ্রমের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিলেন। সম্ভবত কাল আশ্রম থেকে ছুটি পায়নি—এখন বাবাকে দেখতে বাড়ি আসতে হলেও সুকোমলকে তার ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে আসতে হয়। ঠাকুরের অনুমতি ছাড়া আশ্রমের বাইরে এক পা বাড়াবার উপায় নাই। যত দিন যাচ্ছে তত কড়া নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে ছেলে আটকা পড়ে যাচ্ছে। হয়তো এমন দিন আসবে যখন ইচ্ছে হলেই বাবাকে দেখতে কলকাতা ছুটে আসা সুকোমলের আর হয়ে উঠবে না। অবশ্য তেমন একটা গুরুতর অসুখবিসুখের সংবাদ পেলে বাবাকে এসে দেখবার জন্য যে-কোনো সময় সুকোমলকে ছুটি দেওয়া হবে। সেদিন ছেলের কথা শুনে জগমোহন হেসেছিলেন—গুরুতর অসুখ, তার অর্থ জগমোহনের যখন অন্তিম দশা উপস্থিত হবে—

তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত—কেবলমাত্র এই সংবাদ পৌঁছলেই আশ্রমের ঠাকুর সুকোমলকে বাড়ি আসবার অনুমতি দেবেন, অন্য কোনো কারণে নয়। মানুষ বলে, সংসারের বন্ধন—কিন্তু আশ্রম জীবনের বন্ধনও তো কম কঠিন নয়।

যাক, ছেলে যে আজ বাড়ি এসেছে। সুকোমলকে আজ তাঁর বড়ো বেশি প্রয়োজন। জগমোহন লম্বা পা বাড়িয়ে বারান্দায় উঠে গেলেন।

ঘুম ভাঙতে চোখ খুলেই প্রথম জানালাটা দেখল সে। কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। বালিশে মাথা রেখে জানালার গরাদের ফাঁকে পরিচ্ছন্ন রৌদ্র ও আকাশের নীল দেখল। নির্জন নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল পৃথিবীটাকে। যেন কোথাও কোনো শব্দ নেই, প্রাণ নেই। কেবল আলো আর অন্তহীন নীরবতা। দেখতে দেখতে কেমন যেন কান্না পায়, অসহায় মনে হয় নিজেকে। এত দীপ্তি, এত পরিচ্ছন্নতা চোখে সহ্য হয় না।

তাই একটু সময় চোখ বুজে থাকল পরিমল।

তখন পরিচিত দৃশ্যগুলি সে দেখতে পেল, পরিচিত শব্দগুলি তার কানে এল। অস্পষ্ট, দূর থেকে দেখছে এখন, দূর থেকে শুনছে সে—তা হলেও তার মনে হল, প্রত্যেকটা শব্দ ও দৃশ্য তার নিজের জিনিস। সেগুলির ওপর তার একটা অধিকার ছিল। দশ বছরের পরিচিত অভ্যস্ত জগৎ। ভাবতে অবাক লাগে, চব্বিশ ঘণ্টা ভালো করে পার হয়নি, এর মধ্যেই সেই জগৎ কত দূরে চলে গেল। অস্পষ্ট হতে চলল।

মেট সেপাইদের হৈ-হল্লা—হাঁকাহাঁকি, বুটের শব্দ, কয়েদিদের চেঁচামেচি. শিকলের ঝনঝন, গেট খোলার শব্দ, অ্যালুমিনিয়মের থালা বাটি হাতে করে হুড়মুড় করে সেল থেকে বেরিয়ে সার বেঁধে ইয়ার্ডে দাঁড়ানো. সরকার সেলাম—জেলার বাবুর মাথার ওপর নাড়া। বেলগাছের ডালে ডালে সারি সারি কাক। যত তারা সংখ্যায় বাড়ছে তত জোরে চিৎকার করছে। আর জেলার বাবু তত বেশি খুশি হচ্ছেন কয়েদিদের সেলাম পেয়ে। জেল বদল হয়েছে. কিন্তু সর্বত্র সেই এক জগৎ, একরকম শব্দ—শব্দ গন্ধ চেহারা। আলিপুর দমদম বহরমপুর—এখানে ইয়াসিন হরদয়াল গুরুবচন সিং—ওখানে কাশেম আলী গোপীনাথ মথুরাপ্রসাদ টমাস। একরকম চোখ নাক চুল পোশাক হাঁটা। তেমনি এক ধরনের হাসি—হাসি এবং কান্না। জেলের দিন ফুরিয়ে এল, এবার ছাড়া পাবে. তাই ইয়াসিন কাঁদছে। তেমনি জেলে এসেছে, পরদিন থেকে গুরুবচন সিং চোখের জল ফেলছে। খুন করে এসে ফাঁসীর আসামী কাশেম আলি হাসছে, নারী ধর্ষণ করে এসে গোপীনাথও হাসছে। হাসি অথচ কান্না। যে হাসেও না কাঁদেও না, সে পাগল হয়ে গেছে। টমাস পাগল হয়ে গিয়েছিল। সিরাজুদ্দিন পাগল হয়েছিল। টমাস পাগল হয়ে জেলের ভিতর একটা খুন করেছিল। সিরাজুদ্দিন গলায় দড়ি দিয়েছিল। টমাস বলত, রেপ্ করার এক মজা, মার্ডার করার আর এক মজা। সিরাজুদ্দিন বলত, পরের জান নেওয়ার এক আনন্দ, আবার নিজের হাতে নিজেকে খতম করার আর এক আহ্লাদ। সে আহ্লাদ দুজনেই পেয়ে গিয়েছিল।

সেই মুখগুলি। একটা দিন, একটা রাত মাঝখানে পার হয়েছে। মনে হয় কত যুগ পিছনে ফেলে এসেছে সে. সেই কান্নাহাসির জগৎ পাগলামির জগৎ। হাসি কান্না পাগলামির মধ্যেও

কত রসিকতা। দ্যাখ্ দ্যাখ্ ভাই তোরা, দেওয়ালে কেমন করে মাথা ঠুকতে হয়, বটুক চক্কোত্তির কাছে তোরা শিখে রাখ। উঁহু, মামলায় হেরে গিয়ে সম্পত্তি বেদখল হলে মাথা ঠোকা নয়, ছেলে মরে গেলে মাথা ঠোকা নয়, ঘরের বউ পালিয়ে গেলে মাথা ঠোকা নয়—মাথার যন্ত্রণা সারাবার জন্যে মাথা ঠোকা—হা হা হা। এই মাথা ঠোকার জাত আলাদা। আগেভাগে বক্তৃতাটা সেরে নিত বটুক, সার্কাসের খেলা দেখাবার আগে খোলোয়াড় যেমন সংক্ষেপে বক্তৃতা সেরে নয়। তারপর দুমদুম শব্দ হত দেওয়ালে। কংক্রিটের শক্ত দেওয়াল কাঁপছে। বটুক চক্কোত্তি মাথা ঠুকছে। কেমন করে মাথা ঠুকতে হয় মানুষকে শেখাচ্ছে। মাথার যন্ত্রণা সারাবার জন্য মাথা ঠোকা। এই মাথা ঠোকার জাত আলাদা। থাক থাক, আর না ভাই, আমরা শিখে গেছি। একজন কেউ ছুটে এসে বটুককে জড়িয়ে ধরত। গরম নিশ্বাস পড়ছে বটুকের। জবার মতন লাল চোখ দুটো। বাধা পেয়ে শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। হতাশ ভাঙা গলায় বটুককে তখন বলতে শোনা গেছে ঃ অত চট করে কি আর শেখা হয়—চট করে শেখার জিনিস না এটা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, আর দুবার দ্যাখ—তোদেরও শেখা হবে, আমারও মাথার যন্ত্রণা কমবে। বটুক ধস্তাধস্তি করত, কাটা ছাগলের মতন ছটফট করত আর একবার ছুটে গিয়ে দেওয়ালের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে। একদিন কিন্তু বটুককে ধরে রাখা গেল না। দুমদুম শব্দ হচ্ছে, দেওয়াল কাঁপছে, ক্রমাগত মাথা ঠুকে চলেছে বটুক। ধরতে গেলে পা ছুঁড়ছে, ষাঁড়ের মতন গর্জন করে উঠছে। কয়েদিরা হই হই করছে। বটুকের মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে। চোখ কপাল লাল হয়ে গেছে—রক্তের ধারা গল গল করে গলা বেয়ে বুকে পিঠে নেমে আসছে। মেট জমাদার চিৎকার করে উঠল। সেপাইরা ছুটে এল। পাগলা ঘণ্টি পড়ল। অনেক চেষ্টার পর বটুককে ধরে বেঁধে হাতকড়া পরিয়ে সেপাইরা যখন নিয়ে যায়, বটুক তখন হি হি করে হাসছে। যন্ত্রণাটা কমেছে ভাই—আজ যেন মাথার যন্ত্রণা একেবারে সেরেই গেল। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে একুশদিন জেলের হাসপাতালের বিছানায় বটুক চক্কোত্তিকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। তারপর কোথায় যেন তাকে চালান দেওয়া হল। পুরোনো বন্ধুদের কাছে আর সে ফিরে এল না। কেউ বলত চক্কোত্তি রাঁচী আছে, কেউ বলত ডাল্টনগঞ্জের জেলে।

যেখানেই থাকুক রসিক বটুককে কেউ ভুলতে পারেনি। বটুক হেসে হেসে সকলের কাছে গল্পটা করত। বউ তাকে দামি অসুখ উপহার দিয়েছিল। সেই থেকে তার মাথার যন্ত্রণা। তা না হলে বটুক চক্কোত্তির চৌদ্দ পুরুষের কারো এই ব্যাধি ছিল না। বাসর ঘরে বটুক টের পায়নি। টের পেয়েছিল সাত দিন পরে। বটুকের বগলের বীচি ফুলে উঠেছিল, উরুর কুঁচকি ফুলে উঠেছিল। বার্নপুরের একটা কারখানার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ফোরম্যান বটুক দেখে শুনে সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করেছিল। সে যাই হোক, বউয়ের কাছ থেকে এমন দামি জিনিস উপহার পেয়ে বটুক কিছু অখুশি ছিল না। বরং একদিন কারখানা থেকে বাড়ি ফিরে মহা উৎসাহের সঙ্গে বউকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে তাকেও একটা উত্তম জিনিস উপহার দিয়েছিল। হুঁ, এক শিশি নাইট্রিক এসিড। সুন্দর মুখটা একেবারে জ্বালিয়ে দিয়ে বটুক চক্কোত্তি জেলখানায় চলে এসেছিল।

মাথা যন্ত্রণা নিয়ে বটুক দেওয়ালে মাথা ঠুকত। আবার চুপচাপ নিরিবিলি এক কোণায়

বসে এক টুকরো কাঠকয়লা দিয়ে ফুল পাখি মাছ চাঁদ ও চাঁদের মতন সুন্দর মেয়ের মুখ এঁকে দেওয়াল ভরিয়ে তোলে এমন সাধক শিল্পীর দেখাও পাওয়া যায় সেখানে। পিয়ারীলাল। রোগা পাতলা ফর্সা চেহারা। বড়ো বড়ো চোখ। এক মনে ছবি আঁকছে তো আঁকছেই। তারপর এক সময় চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। যেন ইয়ার্ডের বেলগাছটা দেখে। সকাল হতে যেটার মাথা কালো করে অগুর্ণতি কাক এসে বসে। আর গাছতলায় চেয়ারে বসে জেলার সাহেব সরকার সেলাম ভোগ করেন। এই জেলে বেলগাছ, আর এক জেলে কদম গাছ। নয়তো কুর্চি গাছ, ছাতিম গাছ। মোটের ওপর গাছ একটা থাকবেই। না হলে ছায়া হবে কেমন করে। জেলারবাবু বসবেন কোথায়! কিন্তু পিয়ারীলাল কী অপরাধ করেছিল কে জানে। দেখলে মনে হত ভালো করে গোঁফ ওঠেনি বুঝি ছোঁড়ার। বলত, যেদিন জেল থেকে খালাস পাব সেদিন আমার মাথায় আর একটাও চুল থাকবে না, গোঁফ সাদা হয়ে যাবে। পিয়ারীলাল অবশ্য বাড়িয়ে বলত। কত বছর সাজা হয়েছিল তার! কুড়ি বছর? এখন তার বয়স কত? আর পরিমলের? যেদিন উনিশ পুরল ঠিক সেদিন থেকে পরিমলের জেলের দিন আরম্ভ হয়েছিল না?

হিসাবটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

কাল—না, পরশু পর্যন্ত বয়সের হিসাব ঠিক ছিল। অঙ্কের মতন মিলিয়ে মিলিয়ে আসছিল সে।

আজ, এখন, এই ঘর তাকে কেমন বিমূঢ় করে দিল।

যেন এখানে নিজেকে চিনতেও তার হঠাৎ অসুবিধা হচ্ছে। অথচ এই ক'টা বছর—তাও কম না—দশটা বছর নিজেকে দেখে দেখে, নিজেকে বিশ্লেষণ করে সে মোটামুটি সন্তুষ্ট হতে পেরেছিল। পরিমল এই—অথবা পরিমল এই নয়। তাকে দিয়ে এটা সম্ভব—অথবা এই মানুষকে দিয়ে এটা কোনোদিনই সম্ভব না। নিজের কাছে সে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। কোনো আবরণ ছিল না। কুয়াশা ছিল না। হাতের রেখাগুলির মতন মনের সব ক'টা রেখা সে পড়তে পারত। তার মেজাজ, প্রকৃতি বোধ ও ভাবনা সম্পর্কে একই কথা। সবই সে জেনে গিয়েছিল। তাই জেলখানায় বসে নিজের একটা স্থির চিত্র এঁকে এঁকে সে দিনগুলি চমৎকার কাটিয়ে দিতে পারছিল। তার মনে কোন উদ্বেগ অশান্তি ছিল না।

কিন্তু এখানে পরিবেশটা সম্পূর্ণ নূতন, অপরিচিত। জানালার উজ্জ্বল রৌদ্র ও স্বচ্ছ নীল আকাশ দেখা শেষ করে সে ঘরের ভিতর চোখ নিয়ে এল। টেবিলে গোলাপের তোড়া. টেবিলের কাছে বুক-শেলফ। শেক্সপীয়র রবীন্দ্রনাথ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। নীল শেড পরানো চমৎকার একটা টেবিল-ল্যাম্প। ওপাশে নূতন আলনা, আলমারী। নূতন খাটের বিছানায় সে শুয়ে আছে। বার্নিশের গন্ধ নাকে লাগছে। বিছানাটাও আনকোরা নূতন। তোষক বালিশের তাজা তুলোর গন্ধ পরিষ্কার টের পাওয়া যায়। সদ্য পাটভাঙ্গা চাদর বালিশের অড়।

তার অর্থ একটি নূতন মানুষ এখানে আশ্রয় নিয়েছে। ঘরটাও নূতন। ইতিপূর্বে কেউ এ ঘরে বাস করেছে তার কোনো চিহ্ন নেই। যেমন শেলফ-এর বইগুলি নূতন। টেবিল-ল্যাম্পটা নূতন। কেই ব্যবহার করেনি। দোকান থেকে কাল অথবা পরশু কিনে আনা হয়েছে।

পরিমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

দোকান থেকে কিনে আনা এসব জিনিসের মতন এই পরিমলও নূতন। আগের পরিমল নেই, ভেঙে গেছে বা হারিয়ে গেছে।

এটা সে কালই আবিষ্কার করেছে।

জেলখানার গেট-এ পরিতোষকে দেখে ততটা বুঝতে পারা যায়নি।

এখানে এসে গাড়ি থেকে নেমে জগমোহনের চোখ দেখে পরিমল বুঝতে পেরেছিল। নূতন করে তিনি ছেলেকে দেখছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে অপরিচয়ের কুণ্ঠা ছিল, আড়ষ্টতা ছিল। যেন ভয়ও ছিল।

যেমন পরিতোষের স্ত্রী রমলার চোখে এই জিনিসগুলি ফুটে উঠেছিল। রমলার পক্ষে এটা স্বাভাবিক। পরিমল তার চোখে নূতন। কিন্তু বাবার চোখে?

পরিতোষও কি খুব সহজ স্বাভাবিক হতে পেরেছিল! এক সঙ্গে বসে দুজন খেয়েছে, গল্প করেছে, সন্ধ্যার দিকে বাগানে দুভাই পায়চারি করেছে। কিন্তু পরিমল লক্ষ্য করেছিল পরিতোষের কথার মধ্যে, হাসির মধ্যে একটু যেন সংযম একটু সতর্কতা লুকানো ছিল। যেন কিছুটা এড়িয়ে চলার চেষ্টা, একটা দূরত্ব রেখে চলার ইচ্ছা। অবশ্য দাদাকে সেটা বুঝতে দিতে চাইছিল না। কিন্তু তা হলে হবে কী, রৌদ্র রৌদ্রই—কুয়াশার মিশেল থাকলে, আকাশে মেঘের আনাগোনা থাকলে রৌদ্রের সেই ঔজ্জ্বল্য ম্লান হবেই। পরিতোষের হাসির মধ্যে, তাকানোর মধ্যে যথেষ্ট কুয়াশা ছিল, মেঘের আবরণ ছিল। তাও তো কথার মধ্যে গুটি কয়েক কথা। এই অঞ্চলের জমির দাম, আজকাল ভালো করে বাড়ি তৈরি করতে হলে কী পরিমাণ টাকা লাগে, সিমেন্ট জোগাড় করার অসুবিধা, যুদ্ধের পর থেকে কাঠ কেমন দুর্মূল্য হয়ে গেছে, কেবল এইসব। সন্ধ্যার দিকে হালের বাজার দর, রাজনীতি এবং আবহাওয়া নিয়েও যেন একটা দুটো কথা হয়েছে। তারপর তো পরিতোষের মাথা ধরল, শুয়ে পড়ল। জগমোহনও আর নিজের ঘর থেকে বেরোলেন না। বিকেলে চা খাবার পর রাত্রে পরিমলের আর কিছু খেতে ইচ্ছা করছিল না। কথাটা বুঝি জগমোহনের কানে গিয়েছিল। তিনি তাঁর ঘরে থেকেই যেন পরিতোষের স্ত্রীকে ডেকে বলেছিলেন, পরিমলের জন্য একটু গরম দুধ পাঠিয়ে দাও বউমা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে ঢোকার সময় পরিমল বাবার গলা শুনেছিল। একটু পরেই চাকর বাটি ভরে গরম দুধ নিয়ে এসেছিল। চাকরের সঙ্গে রমলাও যেন দরজা পর্যন্ত এসেছিল। সৌজন্য রক্ষার জন্য কেবল চাকরকে দিয়ে দুধটা না পাঠিয়ে পরিতোষের স্ত্রীও যে সঙ্গে এসেছিল পরিমল টের পেয়েছে। পরিমল দুধ খায়নি। দুধের বাটি টেবিলে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। এখনো সেই অবস্থায় পড়ে আছে। নূতন কাঁসার বাটি। বাড়ি এসে পরিমল দুধ খাবে বলে আর পাঁচটা জিনিসের মতন এটাও বুঝি কিনে আনা হয়েছে।

একটা ক্লান্ত হাসি তার ঠোঁটের প্রান্তে লেগে রইল।

আজ নিজেকে চিনতে তার কষ্ট হচ্ছে। এই পরিমলকে দেখতে সে প্রস্তুত ছিল না। বস্তুত সে কী আশা করেছিল তাও যেন এখন মনে করতে পারছে না। সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে হাতড়াবার মতন জেলের দিনগুলির দিকে ফিরে তাকাতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু হতাশ হল। কত তাড়াতাড়ি সেসব স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে নির্মমভাবে সে

নির্বাসিত হয়েছে। তাই এত অসহায় বোধ করেছে। যেন তার চারদিকে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই। বড়ো নিঃসঙ্গ একাকী এখন পরিমল।

॥ ৮ ॥

দীপুর সঙ্গে বারান্দায় ছুটোছুটি করছে সুকোমল, খেলা করছে, শব্দ করে হাসছে। সন্ন্যাসী কাকু বাড়ি এলে দীপুর যে কী আনন্দ! তার চঞ্চলতা তখন চরমে পৌঁছে। কাকুর কাঁধে ধরে ঝুলছে, নাক ধরে টানছে, গৈরিক বসনে মুখ ঘষে খিল খিল হাসছে কখনো, এমন কী, আনন্দের আতিশয্যে কাকুকে চুমু খেতে গিয়ে তার চোখে-মুখে হঠাৎ থুথু ছিটিয়ে দিতেও পিছপা হয় না শ্রীমান দীপংকর।

রমলা খুব বিরক্ত হয়।

'বানরকে লাই দিয়ে মাথায় তুলছ ঠাকুরপো। দেখছ তো, প্রশ্রয় পেলে লক্ষ্মীছাড়া কতটা অসভ্য হতে পারে। আয়, আজ তোকে আমি আস্ত রাখব না।' রমলা ছেলেকে মারতে উদ্যত হয়।

সুকোমল ভাইপোকে আগলে রাখে।

'তোমার ভুল ধারণা বউদি। শিশু কখনো অসভ্য হয় না।'

'কী কাজটা করল দেখলে তো।' রমলা কটমট করে তখনো ছেলেকে দেখছে। সুকোমল হাসল।

'শিশু অসভ্য হয় না, আবার সভ্যও হয় না।'

রমলা চমকে উঠল। নবীন সন্ন্যাসীর চোখের দিকে তাকাল।

'কী হয় তবে।' শুকনো নিস্তেজ গলায় সে প্রশ্ন করল।

দীপংকরের মুখের ওপর সস্নেহ দৃষ্টি বুলিয়ে সুকোমল বলল, 'যা ও আছে তাই —শিশু শিশুই থাকবে।'

সুকোমল মাঝে মাঝে এমন একটা কথা বলে। রমলা খুব একটা অবাক হয় না। সন্ন্যাসী তার নিজের মতন করেই তো সব কিছু বলবে, ব্যাখ্যা করবে।

এবং সুকোমল ব্যাখ্যাই করছিল।

'যেমন ফুল। যতক্ষণ গাছে আছে, ততক্ষণই সুন্দর। টেবিলের ফুলদানীতে এনে বসালে সেই সৌন্দর্য থাকে কি?'

'টেবিলের সৌন্দর্য বাড়ে।' রমলা না বলে পারল না।

'তা বাড়ে!' সুকোমল হাসল। 'মেয়েরা যখন খোঁপায় গোঁজে, তখন চুলটাও সুন্দর দেখায়। কাজেই ফুলটা তখন সজ্জা হয়ে যায়। সেটা ফুলের আর-এক রূপ।'

'তা বটে।' রমলা মাথা নাড়ল। 'গাছের বোঁটায় ফুল যখন হাওয়ায় কাঁপে তখন সেই সৌন্দর্যের তুলনা হয় না।'

'তার অর্থ ফুলের মধ্যে তুমি স্বর্গের ছবি দেখতে পাও। তুমি স্বর্গের কাছে গিয়ে দাঁড়াও।' সন্ন্যাসীর দুই চোখ দীপ্ত হয়ে উঠল।

রমলা কথা বলল না।

'তেমনি শিশু। মাথার চুল ছিঁড়ুক, কী আমার মুখে থুথু দিক—দীপু যতক্ষণ কাছে থাকে আমি একটা অত্যন্ত নির্মল পবিত্র জগতের মধ্যে থাকি। মনে হয়, স্বর্গের দরজায় দাঁড়িয়ে আছি।'

'তবে তো ভয়ের কথা।' রমলা মুখ শুকিয়ে ফেলল। 'দীপু যেদিন বড়ো হবে, সভ্যভব্য হয়ে যাবে, সেদিন আর এ-বাড়িতে তোমার দেখাই পাব না। শ্বশুরমশায় বেঁচে থাকলেও তুমি আসবে না—কেননা, সেদিন তোমার ওপর দৌরাত্ম্য করে স্বর্গের আনন্দ দিতে বাড়িতে কোনো শিশু থাকবে না।'

হয়তো জগমোহন সেখানে উপস্থিত থাকলে অন্য কথা বলতেন। রমলার কোলে আর একটিও শিশু আসবে না, এই উক্তি তিনি কখনই সমর্থন করতেন না।

কিন্তু সন্ন্যাসী অন্য কথা বলল।

'বড়ো হয়েও মানুষ শিশু থাকতে পারে। থাকে। আমি নিজের চোখে দেখেছি। যাঁরা মহৎ, তাঁদের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এটা, যেমন আমাদের ঠাকুর। সত্তর পার হয়েছেন। কত বড়ো জ্ঞানী গুণী পুরুষ। কিন্তু দেখলে কে বলবে। মনে হবে চঞ্চল সরল এক শিশু—'

সুকোমল বাধা পেল, সেই মুহূর্তে মোটা লাঠি হাতে জগমোহন এসে উপস্থিত হলেন। সুকোমল নুয়ে বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

'কখন এলি?' হৃষ্ট উৎফুল্ল গলায় জগমোহন প্রশ্ন করলেন।

'এই তো ছ'টা চল্লিশের ট্রেনে—'

'গাড়ি তা হলে লেট্ করে এসেছে?' জগমোহন হাতের ঘড়ি দেখলেন।

সুকোমল ঘাড় কাত করল।

'পনেরো মিনিট দেরি করেছে—'

জগমোহন আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন। রমলার পিছনের দিকের দরজা খুলে গেল। পরিতোষ বেরিয়ে এল। কিন্তু কেবল পরিতোষকে দেখলে জগমোহন কথা বন্ধ করতেন না। বারান্দার এপাশের আর একটা ঘরের দরজাও সেই মুহূর্তে খুলে গেল। পরিমল বেরিয়ে এল। এপাশে জগমোহন, ওপাশে পরিতোষ ও রমলা—এদিকে একলা পরিমল। মাঝখানে সুকোমল ও দীপু। কিন্তু জগমোহনের মতন পরিতোষও কেমন নীরব হয়ে আছে সুকোমলকে দেখে, কিছু একটা বলতে গিয়েও সে মুখ খুলতে পারল না। তেমনি পরিমল। কেমন যেন অপ্রস্তুত অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে আছে। রমলাও বুঝি হঠাৎ বোবা হয়ে গেল।

সবাই যখন চুপ করে আছে, তখন সুকোমল মৃদু গলায় দীপুর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল।

'এটা কী ফুল?' মার সঙ্গে বাগানে গিয়ে দীপু মুঠ ভরে ফুল নিয়ে এসেছে। কিছু ফুল বারান্দায় ছড়িয়ে দিয়েছে। কিছু জামার পকেটে রেখেছে। হাতের সাদা ফুলটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে দীপু ফিক করে হাসল। কাকুর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গন্ঢরাজ।'

দীপুর সুন্দর উচ্চারণটি শুনে সুকোমল হাসল।

'তুমি কোন্ ফুল বেশি ভালোবাস? গোলাপ, গন্ধরাজ, বেল, চাঁপা?' সুকোমল ফের প্রশ্ন করল। দীপু সবেগে মাথা নাড়ল।

'গোলাপ ভালো না, কেবল কাঁটা!'

'তাও বটে।' সুকোমল এবার শব্দ করে হাসল। 'গোলাপ তুলতে গেলে হাতে কাঁটার খোঁচা লাগে।'

'চাঁপাও ভালো না।' গম্ভীর হয়ে দীপু বলল. 'কত বড়ো গাছ—আকাশের মতন উঁচু—'

'তবে তো চাঁপাকেও বাতিল করে দিতে হয়। আকাশের কাছে থাকে ফুল—কষ্ট করে কে সেখান থেকে পেড়ে আনে।'

এবার জগমোহন না হেসে পারলেন না, জগমোহনের থমথমে গম্ভীর মুখে হাসি দেখে রমলার মুখে হাসি ফুটল। রমলাকে হাসতে দেখে পরিতোষের সদ্য ঘুমভাঙা ফোলা চোখ উজ্জ্বল হল, বড়ো হল। একটা সূক্ষ্ম হাসি তার ঠোঁটের প্রান্তে উঁকি দিল। এবং দেখা গেল ওপাশে দাঁড়িয়ে পরিমলও মুখ টিপে হাসছে।

জগমোহন নাতির দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ডাকলেন, 'দাদু!'

পরিতোষ ডাকল, 'দীপু!'

পরিমল দু-হাত বাড়িয়ে দিয়ে ডাকল. 'জেঠু, আমার কাছে এস।'

দুঃসহ গম্ভীর পরিবেশ চট করে সহজ স্বাভাবিক হয়ে গেল। একটি শিশুকে কেন্দ্র করে সকলে হাসছে, কথা বলছে। এই মাত্র সুকোমল যা বলছিল। শিশুরা স্বর্গ রচনা করে। স্নিগ্ধ সস্নেহ দৃষ্টি মেলে ধরে রমলা আর একবার নবীন সন্ন্যাসীকে দেখল।

'বউমা, আমার চা দাও।' জগমোহন পুত্রবধূর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

চায়ের আয়োজন করতে রমলা ভিতরে চলে গেল।

'তোমাদের মুখ হাত ধোয়া হয়েছে? পরিতোষ—পরিমল?' জগমোহন দুজনকেই একবার করে দেখলেন।।

পরিতোষ ঘাড় গুঁজে বাথরুমের দিকে রওনা হল। পরিমল মেজভাইকে অনুসরণ করল। জগমোহন ছোটো ছেলের দিকে চোখ ফেরালেন।

'আয়, আমার ঘরে আয়।'

জগমোহন নিজের ঘরের দিকে চললেন।

সুকোমল বাবাকে অনুসরণ করল। দীপুকে সঙ্গে নিল না। হঠাৎ এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হল কেন, শিশু বুঝতে পারল না। একলা দাঁড়িয়ে থেকে অসহায় ফ্যালফ্যাল চোখে দাদুকে দেখল, কাকুকে দেখল। দুজন ঘরে ঢুকে পড়ল। শেষটায় দাদুর ওপর তার রাগ হল। বুড়োটা এমনি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, আসলে লোকটা সুবিধার নয়। এই বুড়োর জন্যই তো দলটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল আর দীপুও এমন একলা পড়ে গেল। কটমট করে দাদুর ঘরটা আর একবার দেখে নিয়ে পা পা করে সে মার কাছে চলল। যেন তার বুকের ভিতর এর মধ্যেই অনেক নালিশ জমে উঠেছে। মাকে সব বলতে হবে। অভিমানে গাল ফুলিয়ে দীপু হাঁটছিল।

খুব অল্প সময় জগমোহন ছোটো ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পারলেন। চা খেতে খেতেই কথা বললেন, তারপর পোশাক পরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আগের দিন বিকালে ডিস্পেনসারিতে যেতে পারেননি। তাই ভিতরে একটা উদ্বেগ, অস্থিরতা ছিল। কেবল যে

অপেক্ষমাণ রোগীদের জন্য উদ্বেগ তা নয়; কাল নিয়মভঙ্গ হয়েছে, বাড়ি থেকে ডাক্তার বেরোননি, কর্তব্যর ত্রুটি হয়েছে—জগমোহন অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ, সময়নিষ্ঠ, নিয়মনিষ্ঠ। তিনি মনে করেন চিকিৎসকের এই বিশেষ গুণগুলি থাকা দরকার। এর একটারও ব্যত্যয় ঘটলে তাঁর মন খুঁতখুঁত করে, তিনি অস্বস্তি বোধ করেন, অপরাধ বোধ করেন। সুকোমলের সঙ্গে অত্যন্ত জরুরী কথা ছিল। কথা শেষ না করেই তাঁকে বাড়ি থেকে বেরোতে হল। আজ পৃথিবী উলটপালট হয়ে গেলেও চেম্বারে যাওয়া তিনি বন্ধ করতেন না।

কিন্তু যে দু-একটা কথা তিনি সুকোমলকে বলে গেলেন সুকোমল তা-ই গভীরভাবে চিন্তা করছিল। জগমোহনের চেয়ারের কাছে মাটিতে আসন পেতে বসে সে বাবার কথাগুলি শুনছিল। জগমোহন বেরিয়ে যেতে সুকোমল আসন ছেড়ে উঠে একলা ঘরে পায়চারি করতে লাগল, ভাবতে লাগল।

রমলা এসে ভিতরে ঢুকল। সঙ্গে দীপু। দীপু একটা টোস্ট কামড়ে কামড়ে খাচ্ছিল।

'আমায় দাও একটু।' সুকোমল ভাইপোর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখে ঈষৎ হাসি ফুটল।

কিন্তু দীপু একনিবিষ্টচিত্ত হয়ে হাতের জিনিসটা কামড়াতে লাগল। কাকুর দিকে তাকাল না। যেন কাকুর কথাই সে কানে নিল না। বোঝা গেল অভিমানটা তখনো রয়ে গেছে। একটু আগে দাদুর সঙ্গে একজোট হয়ে কাকু তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তা সে বেশ মনে রেখেছে।

রমলা হাসল।

'ভয়ংকর স্বার্থপর ছেলে। তুমি তো ওকে স্বর্গের দূত—দেবশিশু কত কী তখন আখ্যা দিলে—এখন তোমার দীপংকরকে চিনে রাখ ঠাকুরপো!'

সুকোমল আবার গম্ভীর হয়ে গেলে। রমলার চোখের দিকে তাকিয়ে কী যেন চিন্তা করল। তারপর কেমন একটু নিস্তেজ ক্ষীণ গলায় বললে, 'এই বয়সে স্বার্থপর হওয়াটা খারাপ না। স্বার্থপর হতে হতেই সেই একদিন নিজেকে চিনবে বুঝবে।'

রমলা আর এ বিষয়ে অগ্রসর হতে সাহস পেল না। সন্ন্যাসী তত্ত্বকথা আরম্ভ করবে। এসব কথা শুনতে যে সে ভয় পায় তা নয়। বা অপছন্দ করে তা-ও না। কিন্তু রমলার হাতে এখন অনেক কাজ। পরিতোষ কাজে বেরোবে। রান্নাবান্না সব পড়ে আছে ওদিকে। তা ছাড়া সবাই চা-টা খেল। সুকোমল এখনও অভুক্ত। তার জন্য উনুন ধরিয়ে আলাদ পাকের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

'তুমি স্নান করতে যাও, ঠাকুরপো—তোমার আহ্নিক করতেও তো অনেক সময় লাগবে।'

'বড়দা কোথায়?'

'তোমার মেজদার সঙ্গে কথা বলছে। তোমার বড়দার ঘরে বসে দুজনে চা খেয়েছে।'

'ও!' সুকোমল এবার অল্প হাসল। 'মেজদাকেই কিন্তু বড়দা বেশি ভালোবাসত।'

'কেন, তোমাকে কি ভালোবাসত না!' রমলাও অল্প হাসল।

'আমি তো খুব ছোটো ছিলাম—বাবার মতন বড়দাকেও অভিভাবকের মতন দেখতাম।'

'এখন—' কথাটা আরম্ভ করে রমলা চুপ করে গেল। অসতর্কের মতন কী যেন সে

বলে ফেলেছিল। চট করে অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি আর দেরি করো না ঠাকুরপো—স্নানে যাও।'

বউদিকে বুঝল সুকোমল। একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। কেননা ঠিক একই চিন্তা তার মনে উদয় হয়েছে। একদিন যাকে সে অভিভাবকের মতন দেখত আজ অভিভাবক সেজে সুকোমল তাকে উপদেশ দিতে যাচ্ছে। বাবা সাহস পাচ্ছেন না, মেজদা সাহস পাচ্ছেন না—সুকোমলের ওপর সেই দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু জগমোহন যদি জিনিসটা এভাবে না দেখতেন। উপদেশ। বাবার এই কথাটাই সুকোমলকে পীড়া দিচ্ছিল বেশি। অস্বস্তি বোধ করছে সে। সংসার ছেড়ে বন্ধনমুক্ত হয়ে সুকোমল ঈশ্বরচিন্তা করছে—জগতের মঙ্গল চাইছে। যে পতিত, পথভ্রষ্ট, তাকে আলো দেখানো, তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া, তার মনে ধর্মভাব জাগ্রত করার অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র সুকোমলেরই আছে। সংসারী মানুষ জগমোহনের মন দুর্বল। পরিতোষেরও তাই। পরিমল এখন কী করবে না-করবে, তার মনের গতি কোনদিকে, তার সঙ্গে কথা বলে সুকোমল দেখুক বুঝুক। সে বুঝবে। জগমোহনের বা পরিতোষের বুঝতে কষ্ট হবে। জগমোহন মায়াবন্ধন শব্দটাও প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর ভয়, পরিমলকে বিচার করতে গিয়ে তিনি অথবা পরিতোষ মায়ার বশীভূত হয়ে পড়বেন। সুতরাং তাঁদের বিচার পক্ষপাতদুষ্ট হবে। সুকোমল মুক্তপুরুষ। বড়ো ভাই হলেও পরিমল সম্পর্কে তার বিচার ও সিদ্ধান্ত নির্ভুল ন্যায়সঙ্গত হবে।

জগমোহন আরও বলছিলেন, সুকোমল বলে কয়ে তার দাদাকে একবার ব্রজদুর্লভপুর নিয়ে যাক। যেন বেড়াতে যাচ্ছে, আশ্রম দেখতে যাচ্ছে। আশ্রমে কত মানুষ যাচ্ছে, তাদের গুরুদেব ঈশ্বরানন্দকে দেখতে যাচ্ছে। সুকোমল সেভাবেই পরিমলকে বোঝাবে। কেবল পুণ্য অর্জন না, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রগুলি দেখার যেমন সার্থকতা আছে তেমনি এমন একজন মহাপুরুষ—আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা যাঁর কম না, বিলাত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে এসেছিলেন—ব্যারিস্টারী করে একদা অগাধ অর্থের মালিক হয়েছিলেন, অথচ সব ত্যাগ করে দানধ্যানে বিলিয়ে দিয়ে আজ একমাত্র ভগবানের আরাধনায় যিনি নিযুক্ত—সেই জ্ঞানীগুণী যোগী পুরুষকে চোখে দেখতে পাওয়ার আনন্দ কম কী। জগমোহনের বিশ্বাস, সুকোমলের দাদা, এই পরিচয় পেলে স্বামী ঈশ্বরানন্দ পরিমলকে অযাচিতভাবেই কিছু না কিছু উপদেশ দেবেন। তাঁর উপদেশের মূল্য অনেকখানি। পরিমলের পক্ষে এমন একজন মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে—ঈশ্বরানন্দের উপদেশ পরিমলের মনের ওপর ঔষধের মতন কাজ করবে। গুরুতর অপরাধের দণ্ডভোগ করেছে সে। দীর্ঘদিনের কারাবাসের ফলে তার মন নিশ্চয় হতাশার গ্লানিতে পূর্ণ হয়ে আছে—হয়তো দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের মতন অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে ভেসে চলার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে আছে—এই অবস্থায় তাকে একটা পথের সন্ধান দিলে, তার চোখের সামনে আলো তুলে ধরলে সে যে কতখানি উপকৃত হবে! এবং এই দায়িত্ব একমাত্র সুকোমলই নিতে পারে।

জগমোহন এমন কাতরস্বরে কথাগুলি বলছিলেন—তিনি খুবই বিপন্ন বিব্রত। সুকোমলের হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছিলেন। এই বিপদ থেকে সুকোমল তাঁকে উদ্ধার করবে বলে তাঁর

দৃঢ় বিশ্বাস। যেন কনিষ্ঠ পুত্রের ওপর দাবি না, পুত্রকে অনুরোধ জানাচ্ছিলেন জগমোহন। সুকোমল সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। অস্বস্তিবোধ করেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে দাদা বাড়ি আসতে না আসতে বাবা এতটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বেন, সুকোমলের ধারণা ছিল না। অথচ এই ক' বছর—দাদা যতদিন জেলে ছিলেন, জগমোহন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দাদার চরিত্রের কতগুলি বিশেষ গুণের কথা প্রতিদিন সকলের কাছে বলতেন। আশ্রম থেকে ছুটি নিয়ে সুকোমল বাড়ি এলে সুকোমলের কাছে নূতন করে তিনি বড়ো ছেলের স্বভাব চরিত্র স্বাস্থ্য সাহস বুদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে কত কথা বলেছেন, কত প্রশংসা করেছেন। আজ সব মিথ্যা হয়ে গেল। তাঁর প্রথম সন্তান না, একটা অবাঞ্ছিত মানুষ বাড়িতে ঢুকেছে। এখান থেকে তাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করতে পারলে জগমোহন শান্তি পান। সুকোমল তাকে ব্রজদুর্লভপুর নিয়ে যাক—আশ্রমে নিয়ে গিয়ে তার ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিক। যদি ঈশ্বরানন্দ দয়াপরবশ হয়ে এক পথভ্রষ্ট হতভাগ্যকে আশ্রয় দেন—আশ্রমে থাকার অনুমতি দেন। জগমোহনের বক্তব্য কি অনেকটা এই রকম না!

বাবার আচরণ সুকোমলকে অত্যন্ত মর্মাহত করেছে।

মেজদার মনোভাব কী বোঝা যাচ্ছে না—বড়দা সম্পর্কে বউদিও যে খুব নীরব হয়ে আছে এই একটু সময়ের মধ্যে সুকোমল লক্ষ্য করল। একবারও তাঁর কথা রমলার মুখে শোনা গেল কি।

তবে তো সত্যি মানুষটা হতভাগ্য। বড়দার জন্য অন্তরে বেদনাবোধ করতে লাগল সুকোমল। ঘরে ফিরে পরিমল তার স্বজনের কাছ থেকে এধরনের অভিনন্দন লাভ করবে নিশ্চয়ই আগে বুঝতে পারেনি। জেলখানায় বসে এই বিশেষ দিনটিকে সে মনে মনে কত রং দিয়ে না জানি সাজিয়েছিল।

সুকোমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বাবার ঘর থেকে সে বেরিয়ে এল। বড়দার ঘরের দিকে চলল।

একটা ক্ষীণ আশা তখনও তার বুকে জেগে ছিল। হুঁ, মেজদা সম্পর্কে। কিছুতেই সে বিশ্বাস করতে পারছিল না, জগমোহনের মতন পরিতোষ হতাশায় ভেঙে পড়েছে।

বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন। হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়ে এসেছে, দৃষ্টি নিস্তেজ হয়ে এসেছে। আলোর চেয়ে অন্ধকারটাই তিনি বেশি দেখতে পান। পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কে তিনি যত সহজে নিরাশ হন, নিরুৎসাহ হন, একটি যুবকের তা হতে যাবে কেন! তার বুকে তেজ, মনে উৎসাহ, বাহুতে অমিত শক্তি। সে পাথর ভাঙতে পারে, পাহাড়ে চড়তে পারে। অন্ধকারের মধ্যে সে আলোর ইশারা দেখতে পায়। যুবকের যা ধর্ম। মেজদাকে দিয়ে কি তাই আশা করতে পারে না সুকোমল।

তা ছাড়া তাদের দুজনের মধ্যে, পরিতোষ ও পরিমলের মধ্যে তো শুধু ভাই সম্পর্ক না, আর একটু বেশি, একটা মধুর হৃদ্যতা চিরদিনই ছিল। দুটি বন্ধুর মতন তারা এক সঙ্গে খেলাধূলা করেছে কলেজে গেছে, একত্র বসে খেয়েছে, গল্প করেছে। এক বিছানায় শুয়েছে। সেই ভাই বা বন্ধুর উপস্থিতি আজ মেজদার কাছে অপ্রীতিদায়ক মনে হবে?

সুকোমল কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। বরং তার মনে হল, বাবাকে দিয়ে

মেজদাকে বিচার করলে মেজদার ওপর অবিচারই করা হবে। বাড়ি আসতে না আসতে বড়দাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেবার প্রস্তাব মেজদা কখনই মেনে নেবে না। বাবা নিশ্চয় মেজদার কাছে কথাটা তুলতেই পারেননি। মেজদা ভয়ানক রাগ করত—বাবার ওপর বিরক্ত হত। জগমোহন সরাসরি সুকোমলকে বললেন। কেন? যেহেতু সুকোমল গৃহত্যাগী আশ্রমবাসী—পরিবারের মানুষগুলির সঙ্গে প্রীতি ভালোবাসা স্নেহ মমতার সম্পর্ক সে ছিন্ন করে ফেলেছে—এই? সুকোমল মনে মনে হাসল, আবার ক্ষুব্ধও হল। বেশ তো, না হয় জগমোহনরে এই ধারণা সে মেনে নিল। দাদার কথাটা ভুলে গিয়ে সে পরিমলকে বিচার করবে। মায়া মমতার প্রশ্রয় দেবে না। না-ই বা দিল। কিন্তু মানবতার দিক থেকে বিচার করলে কি জগমোহনের যুক্তি সমর্থন করা যায়? মানুষ ভুল করে—অপরাধ করে। এটা তার জীবনের একটা দুর্ঘটনা বলে ধরে নিতে ক্ষতি কী? পরিমলের জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তা বলে সে অপরাধপ্রবণ, চিরকালের হেয়, অধঃপতিত মানুষ, এমন মনে করার কারণ আছে কিছু? পরিমলকে পথ দেখাও—আলো দেখাও। আলো তো সকলেরই দরকার। মানুষ্য মাত্রই কাম ক্রোধ লোভ মোহের দাস। অবিদ্যা, মায়া তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং। অজ্ঞানতিমিরে আছে বলে তার মোহও কাটছে না। সংসারের পঙ্কে প্রতিনিয়ত সে হাবুডুবু খায়। জগমোহন নিজেও কি অন্ধকারে পড়ে আছেন না? আলো তো তাঁরও দরকার। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী হওয়া কি এতই সহজ!

না, আজ সুকোমল যেন বাবাকেও ক্ষমা করতে পারছিল না। যদি বিচার করার কথা ওঠে তো সকলকেই বিচার করতে হবে। জগমোহনকে, পরিতোষকে—এমন কী সুকোমল যখন নিজের দিকে তাকায়, নিজেকে বিচার করে, সে কি জোর গলায় বলতে পারে তার অজ্ঞানতা দূর হয়েছে। হয়তো তাঁর গুরু ঈশ্বরানন্দ বলতে পারেন; না, তিনিও তা বলেন না। বলেন, ভগবানের পাঠশালায় আজও আমি ছাত্র, শিশু শিক্ষার্থী। তাই তো দিবারাত্র সাধন ভজন—শাস্ত্রচর্চা নিয়ে আছেন।

আলো—জ্ঞানের আলো। জগমোহন আজ একটা বড়ো কথা বলে ফেলেছেন। জ্ঞানের কথায় গীতার সেই শ্লোক মনে পড়ল সুকোমলের।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥

যদি তুমি সকল পাপী থেকেও অধিক পাপী হও—জ্ঞানরূপ তরণীর সাহায্যে পাপরূপ সমুদ্র লঙ্ঘন করা তোমার পক্ষে সম্ভব।

কিন্তু পরিমল কি পাপী। যদি জগমোহন তাই মনে করে থাকেন তো তিনি ভুল করছেন। অপরাধ করতে পারে সে। পরিমল অপরাধ করেছিল। আইন তাকে দন্ড দিয়েছিল। কেননা তার অপরাধটা শ্রুতিগ্রাহ্য, দৃষ্টিগ্রাহ্য ছিল। সেই বিবেচনায় সেটা বড়ো অপরাধ। কিন্তু যে অপরাধ চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না? মানুষ প্রতিনিয়ত সে ধরনের কত অপরাধ করছে তার সীমাসংখ্যা আছে? হয়তো সেসব অপরাধের কথা কাগজে ছাপা হয় না, আপরাধীকে বেঁধে নিয়ে যেতে পুলিস ছুটে আসে না, আদালতে তার বিচারও হয় না। কিন্তু তা বলে কি অপরাধী অব্যহতি পায়? পুলিস আইন আদালত প্রতিবেশী স্বজন—সকলকে

সে ফাঁকি দিতে পারে—কিন্তু একজনকে ফাঁকি দেওয়া যায় কি। যিনি সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী—সর্বভূতে সমভাবে যিনি স্থিত—যিনি সব কিছুর নিয়ন্তা, সেই পরমেশ্বরকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তাঁর কাছ থেকে দন্ড পেতেই হয়। জেল জরিমানা ফাঁসি দ্বীপান্তরের আকারে হয়তো সেই দন্ড আসে না। কিন্তু ছোটো বড়ো সকল অপরাধেরই শাস্তি আছে। অপরাধী হয়তো বুঝতে পারল না কোন অপরাধের দরুন কী শাস্তি তাকে ভোগ করতে হল। এখানেই ট্র্যাজেডি। অজ্ঞান মানুষ নিজের অপরাধ সম্পর্কে যেমন অন্ধ, তেমনি দন্ডের স্বরূপটাও তার কাছে অপরিজ্ঞাত অপরিচ্ছন্ন থেকে যায়। যখন ভোগে, তখন অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়—এই পর্যন্ত।

জগমোহনকে এসব কথা বুঝিয়ে বলার ইচ্ছা ছিল সুকোমলের। কিন্তু তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। না, সুকোমল এখন চিন্তা করছে, ইচ্ছা থাকলেও বাবাকে সে বলত না। তিনি যে এসব বুঝতেন না তা নয়—বুঝতে চাইতেন না। বলতেন তত্ত্বটত্ত্ব কোনোদিন তাঁর মাথায় ঢোকে না। হয়তো হাসতেন। হেসে বলতেন, 'আজ সময় নেই, এখনি চেম্বারে হাজিরা দিতে হবে। আর একদিন। অবসর সময়ে বসে তোর ঠাকুরের কথা শুনব। এখন এসব শুনতে গেলে আমার কোনো কোনো রোগী হয়তো হার্ট ফেল করে বসবে—এদিকে পুণ্য সঞ্চয় করত গিয়ে ওদিকে মহাপাতকের কাজ করে বসব।'

জগমোহনের ধারণা, সুকোমল যা-কিছু বলে সবই তাঁর ঠাকুরের শেখানো বুলি। সুকোমল এবং আশ্রমের অন্য গুরুভাইরা ঈশ্বরানন্দের বাণী প্রচার করতে বুঝি কেবল দিগ্বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। এই তাদের কাজ।

কিন্তু জগমোহন জানেন না, ঈশ্বরানন্দ কোন বাণী দেন না—এবং তখন যে জগমোহন বলেছিলেন, সুকোমলের ঠাকুর পরিমলকে অযাচিতভাবে হয়তো কিছু কিছু উপদেশ দেবেন, জগমোহনের এই ধারণাও ভুল। অযাচিতভাবে ঠাকুর কাউকে উপদেশ দেন না। উপদেশ যাচ্ঞা করলেও যে ঠাকুরের উপদেশ পাওয়া যায়, তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। কত লোককে তো ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আশ্রম থেকে ফিরে যেতে দেখা গেছে। কাউকে উপদেশ দেবার আগে ঠাকুর বিচার করে দেখেন মানুষটির উপদেশ গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে কিনা—উপদেশের মর্যাদা সে রক্ষা করবে কিনা।

সে যাই হোক, জগমোহন মনে করেন, সুকোমল যখনই কোনো কথা বলে সে বুঝি তাঁকে ধর্মের কথা শোনাবার জন্য, তাঁর পুণ্য সঞ্চয়ে সাহায্য করার জন্য এসব বলছে। কিন্তু কথাগুলির পিছনে যে যুক্তি—লজিক আছে, জগমোহন তা কখনও মাথায় নিতে গ্রাহ্য করেন না। এবং তখনই আমার সময় নেই, আর একদিন শুনব, ইত্যাদি বলে তিনি তাড়াতাড়ি সরে পড়েন। এবং এসব শোনার কোনোদিনই তাঁর সময় হয় না। মেজদাও অনেকটা তাই। সুকোমলের আলোচনা সম্পর্কে তাঁদের কোনোরকম উৎসাহ নেই। সুকোমলের আশ্রম ও ঠাকুর সম্পর্কেও দুজন সমান উদাসীন। অত্যাধিক বিষয়াসক্ত হলে মানুষের মন যা হয়। এইজন্য সুকোমল অবশ্য মন খারাপ করে না।

কিন্তু আজ জগমোহন দায়ে পড়ে স্বামী ঈশ্বরানন্দের কথা, ব্রজদুর্লভপুরের আশ্রমের কথা বলছেন।

কেবল কি অধঃপতিত পরিমলের জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা! সুকোমল বেশ বুঝতে পারে, জগমোহন নিজের জন্যই বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি তাঁর পসারের কথা ভাবছেন, মানমর্যাদার কথা চিন্তা করছেন। যে কারণে একডালিয়া রোডের সেই ঘটনার পর তিনি তিনবার পাড়া বদল করেছেন, বাড়ি বদল করেছেন। এখন এই অঞ্চলে তিনি বাড়ি করেছেন—এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে চলেছেন। আজ হঠাৎ এক জেলফেরত আসামীকে পুত্র বলে পরিচয় দিতে হবে—এবাড়িতে সে থাকবে, এই চিন্তাই জগমোহনকে এমন ব্যাকুল বিব্রত বিষণ্ণ করে তুলেছে।

॥ ৯ ॥

নীল পর্দার এপারে দাঁড়িয়ে সুকোমল এক সেকেন্ড ইতস্তত করল! মেজদার গলা শোনা যাচ্ছে। এত স্কোয়ার ফুট একট ঘরের মেঝে সিমেন্ট করাতেই আজকাল প্রায় এত খরচ পড়ে যায়, অথচ ওয়ারের আগে শুনেছি............

সুকোমল এই আশা করেছিল।

একজন কথা বলবে আর একজন নীরব থেকে শুনবে।

মেজদা কথা বলছে, বড়দা চুপ করে আছে। তাই তো হবে। এমন একটা ছবিই বুঝি সুকোমল কল্পনা করেছিল।

না কি ইতিমধ্যে তার ব্যতিক্রমও ঘটেছে। বড়দাও একটা দুটো কথা বলেছে কি? ঠিক বুঝতে পারল না সে।

একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা বুকে নিয়ে সুকোমল পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল।

'এই যে সন্ন্যাসী এসে গেছে!' পরিতোষ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'তুমি বোসো, তুমি উঠছ কেন মেজদা।' সুকোমল মেঝের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'আমি এখানে বসব, মাটিতে বসব।'

'আমি কি তা জানি না মহাপুরুষ? ব্রহ্মচারী মাটির আসন ছাড়া অন্য কোথাও বসে না।' শব্দ করে হেসে পরিতোষ বড়দার মুখটা একবার দেখে পরে আবার কনিষ্ঠ ভাইয়ের চোখের দিকে তাকাল। 'না রে, আমাকে এমনিও এখন উঠতে হত। কাল বেরোন হয়নি। আজ আর বাড়িতে বসে থাকার উপায় নেই।'

সুকোমল হঠাৎ কথা বলল না। পরিমলকে দেখল। কাল মেজদা জেল গেট-এ উপস্থিত ছিল। সারাদিন আর কাজে যায়নি। মেজদাই পরিমলকে বাড়ি নিয়ে এসেছে। বাড়িতে পা দিয়ে সুকোমল বউদির মুখে এই কথাটাই সকলের আগে শুনেছে। যেমন রমলা প্রথমটায় বেশ একটু গর্বের সঙ্গে সন্ন্যাসীর কাছে কথাটা ঘোষণা করেছিল। তারপর কী ভেবে হঠাৎ গম্ভীর হয়েও গেল। বড়দা সম্পর্কে আরো দু-একটা কথা তখনই জানতে চেয়েছিল সুকোমল। কিন্তু বউদিকে চিন্তিত ও গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে সুকোমল আর কিছু প্রশ্ন করেনি। তারপর তারা দীপুকে নিয়ে কথা বলেছে। তখন রমলার চোখ মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখা গেছে। দীপুকে নিয়ে দুজন বিস্তর হাসা-হাসিও করল।

'বড়দা, তুমি সুকুর সঙ্গে কথা বল, আমি চললাম।' পরিতোষ হাত দিয়ে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে টেবিলের কাছ থেকে সরে এল।

সুকোমল তখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। পরিমলও নীরব। দুজনকে আর একবার দেখতে দেখতে পরিতোষ কী যেন চিন্তা করল। আর কিছু বলল না। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুকোমল বুঝল। মেজদা বেশ কিছুক্ষণ ধরে ছটফট করছিল। অথচ বড়দাকে একলা বসিয়ে রেখে উঠতেও পারছিল না। তাই সুকোমল ঘরে ঢুকতে আর এক সেকেন্ড দেরি না করে পরিতোষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বড়দার সঙ্গে কথা বলতে, এ ঘরে বসে থাকতে সে কি অস্বস্তিবোধ করছিল? সুকোমলের নিটোল ফর্সা কপালে সূক্ষ্ম রেখা জাগল। টেবিলের পাশে দাঁড় করানো প্রকাণ্ড মিরার। নবীন সন্ন্যাসী নিজের মুখ দেখতে পেল।

'সুকু—'

সুকোমল ঘাড় ফেরাল। এক জোড়া গভীর চোখ তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটো আবেগ ও আন্তরিকতায় পূর্ণ। যেন ঈষৎ বেদনার্দ্রও। এই ক'বছর অনেক চোখ দেখেছে সুকোমল। আশ্রম ও আশ্রমের বাইরের বৃহৎ জগতে ঘুরে ঘুরে তাকে কাজ করতে হয়েছে। সরল চোখ দেখেছে সে, কুটিল চোখ দেখেছে। ক্রূর কঠিন দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়েছে সে, নির্লিপ্ত উদাসীন দৃষ্টিও কম দেখল না। চোখে দেখে মানুষের প্রকৃতি বোঝা যায় কি? যায়। আবার এই চোখই তাকে প্রতারিত করেছে কতবার। যাকে নিরীহ মনে করেছে সেই মানুষ চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে। তেমনি দয়াহীন নির্মম-দৃষ্টি মানুষের মধ্যে ফুলের মতন সুন্দর স্নিগ্ধ মন দেখতে পেয়েছে। তার ঠাকুর বলেন, মানুষের চোখের ভিতর আর এক জোড়া চোখ লুকিয়ে থাকে। সেই চোখ চিনতে হবে—সেই দৃষ্টি বুঝতে হবে। জলের ওপরটা সর্বদাই ছলছল করে। সেই জন্য জলে নেমে দেখতে হয় তলায় পাঁক আছে কি পাথর—না কী সবটাই জল। মানুষের সঙ্গে না মিশে কেবল তার ওপরের দৃষ্টি দেখে ভেতরটা বুঝবে কেমন করে।

অন্য গুরুভাইদের সঙ্গে পল্লীসেবার কাজ করতে গিয়ে সুকোমল মানুষের সঙ্গে মিশেছে। মানুষের দৃষ্টির অন্তরালেও যে আর একটা দৃষ্টি আছে সেটা সে বুঝতে চেষ্টা করেছে। ঠাকুরের উপদেশে কাজ হয়েছে। এখন মানুষকে চিনতে আর তত যেন ভুল হয় না। ভুল হয়। কিন্তু আগের মতন প্রতিপদে সে ভুল করে না। অভিজ্ঞতার মূল্য আছে বইকি।

যেন ক'বছরের সামান্য অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে আজ সে খাটের ওপর উপবিষ্ট গম্ভীর শান্ত মানুষটিকে চিনতে চেষ্টা করল।

বড়দার চোখ দুটো তাকে অভিভূত করল বেশি। গভীর বেদনার্দ্র সেই দৃষ্টির দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে সে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। তার নিজের চোখ আর্দ্র হয়ে উঠল। এক হতভাগ্য শিল্পীর সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে, সুকোমলের মনে হল, শিল্পী কত কিছু গড়ে তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু নিয়তি তাকে বাধা দিল—তার স্বপ্ন সফল হয়নি। স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে শিল্পী কাঁদছে।

'সুকু—' পরিমল আবার ডাকল।

সুকোমল খাটের কাছে সরে গেল। নুয়ে পরিমলের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। সন্ন্যাস গ্রহণের পর একমাত্র বাবাকে ছাড়া আর কাউকে পা ছুঁয়ে সে প্রণাম করেনি। মেজদাকে না, বউদিকে না। তাঁরাও তার গুরুজন। পরিমল সন্ন্যাসীর মাথায় হাত রাখল। যেন ইচ্ছা করে সুকোমল একটু বেশি সময় বড়দাকে মাথায় হাত রাখতে দিল। সুকোমলের ভালো লাগছিল এই স্পর্শ।

আশ্রম থেকে ছুটি নিয়ে যখনই সে বাড়ি আসে তার মন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এখানে সে শুধু বিষয়বাসনার ব্যাকুলতা দেখতে পায়, লোভ লালসার নিশ্বাস শুনতে পায়, চিরন্তন ঈর্ষা হিংসা ক্ষুদ্রতা নীচতার ক্লান্তিকর ছবিগুলি বার বার তার চোখে পড়ে। নিজেকে কেমন যেন অপবিত্র অপরিচ্ছন্ন মনে হতে থাকে সুকোমলের। চারদিকে কতগুলি তামসিক মুখ। তা হলেও জগমোহন জন্মদাতা। পুত্রের কর্তব্য মনে রেখে বাবাকে সে দেখতে আসে, দেখা দিতে আসে। কর্তব্য শেষ করে সুকোমল আবার আশ্রমে পালিয়ে যায়।

আজ এই ঘরে এসে সে সেসব কিছুই দেখল না। তার মনে হল এখানে লালসা কামনা বাসনা মাথা গলাতে পারছে না। বিষয়চিন্তা এখানে অনুপস্থিত। ঈর্ষা দ্বেষ এই ঘরের বাতাস কলুষিত করতে পারেনি। এই ঘর মুক্ত পবিত্র। কেননা, এখানে এক শিল্পী বসে আছে, এক সাধক। সে সত্যকে ভালোবাসে, সুন্দরকে পূজা করে। সে কবি—প্রেমিক। তাই কি? চোখ বড়ো করে সুকোমল আর একবার মানুষটিকে দেখল। কেমন যেন রোমাঞ্চ উপস্থিত হল তার। একমাত্র স্বামী ঈশ্বরানন্দের পায়ের কাছে বসলে সুকোমলের মনের অবস্থা এমন হয়। তিনি যখন তাঁকে স্পর্শ করেন তখন তার রোমাঞ্চ জাগে। আবেগে আনন্দে চোখে জল আসে। এখন আবার এল।

সন্ন্যাসী ভাইয়ের চোখে জল দেখে পরিমল অবাক হ'ল। আর কেউ তাকে দেখে কাঁদল না। সন্ন্যাসী কাঁদছে। কে জানে, সংসার ত্যাগ করলেও সুকোমল হয়তো মায়ার বাঁধন আজও কাটাতে পারেনি। নরম মন। সাংসারিক কূটবুদ্ধি মাথায় নেই. কিন্তু মায়া মমতা ষোল আনা রয়ে গেছে। খুনের আসামী, জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে বড়দা, সবই তো সে জানে।

পরিমলের চোখ ছলছল করে উঠল।

দু হাত বাড়িয়ে সে নবীন সন্ন্যাসীকে জড়িয়ে ধরল।

'আয়, আমার পাশে বোস।'

সুকোমল হাতের কুশাসন টেবিলে রেখে খাটের ওপর বড়দার পাশে পা ঝুলিয়ে বসল। এ বাড়ির কারো বিছানায় সে বসে না। জগমোহনের বিছানাও সে স্পর্শ করে না।

কিছুক্ষণ দুজন চুপ করে রইল। সুকোমল তাকিয়ে দেখছিল বড়দার টেবিলে গোলাপ রাখা হয়েছে। সে খুব খুশি হল। জগমোহনের টেবিলে ফুল দেখে সে. রমলার ঘরেও ফুল দেখে। কিন্তু সেসব ঘরে ফুলের সৌন্দর্য যেন তেমন খুলতে চায় না। যেন কোথায় একটা বাধা থাকে, নিস্তেজ ম্রিয়মাণ মনে হয় সেসব ফুল, সময় সময় কৃত্রিম মনে হয়। অথচ তাঁরাও ফুল কম ভালোবাসেন না। কে জানে, হয়তো তাঁদের ভালোবাসার মধ্যে কৃত্রিমতা আছে, গলদ আছে। হয়তো সংসারের অন্য সব জিনিস তাঁরা ফুলের চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসেন।

'বড়দা, এখানে তোমার কেমন লাগছে?' সুকোমল দাদার দিকে চোখ ফেরাল।

'এখনো বুঝতে পারছি না।' পরিমল অসহায়ের মতন একটু হাসল। তারপর অন্যদিকে

তাকিয়ে কী যেন চিন্তা করল। তারপর আবার সন্ন্যাসীর দিকে তাকাল। 'কাল তো সবে এলাম......তবে সব কেমন অন্য রকম লাগছে......নতুন লাগছে।'

সুকোমল হঠাৎ কথা বলল না।

'ওই জীবনটাও সহ্য হয়ে গিয়েছিল।' পরিমল ধীরে ধীরে বলল 'প্রথমটায় খারাপ লাগত। সকলেরই লাগে। কারো কারো শেষ পর্যন্ত খুব খারাপ লাগে। এদিকে আমার আর তেমন খারাপ লাগত না।'

জেলের জীবন। সুকোমল দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

পরিমল বলল, 'আমি অবাক হয়ে ভেবেছি সময় সময়, আমার খারাপ লাগছে না কেন, মন তো অশান্ত হচ্ছে না।'

সুকোমলের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'যেহেতু অপরাধীর মন নিয়ে তুমি সেখানে থাকনি—নিশ্চয় তুমি অন্য কিছু ভাবতে, চিন্তা করতে।'

পরিমল চুপ করে রইল।

সুকোমল বলল, 'আর তোমার চারপাশে যারা ছিল—চোর ডাকাত খুনী লম্পট—এই কেবল তাদের পরিচয় না—তারা মানুষ—আমার মনে হয় তুমি কিছুতেই তা ভুলতে পারতে না। তাদের কারো কারো মধ্যে যে কিছু না কিছু ভালো জিনিস সুন্দর জিনিসও ছিল বা এখনও একটু আধটু রয়ে গেছে—তেমন যত্ন নেওয়া হয়নি, সুযোগ দেওয়া হয়নি, কী উপযুক্ত পরিবেশ পায়নি বলে সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে—আবার যত্ন নিলে সুযোগ দিলে তাদের ভেতরের সেই ভালো জিনিসগুলো ফুলের মতো ফুটে উঠবে, পূর্ণতা লাভ করবে—তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করতে।'

পরিমল সুন্দর করে হাসল।

'তুই খুব আশাবাদী।'

'আমার গুরু ঈশ্বরানন্দ আমার কানে এই আশার মন্ত্র তুলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, অন্ধকারের সবটাই অন্ধকার না। অন্ধকারের গর্ভে আলোর বীজ লুকিয়ে আছে।'

সেই কয়েদীকে হঠাৎ মনে পড়ল পরিমলের। সারাক্ষণ বসে বসে কাঠ কয়লা দিয়ে জেলখানার দেওয়ালে ছবি আঁকত।

'হ্যাঁ, ভালো জিনিস দেখেছিলাম বৈকি।' পরিমল আস্তে আস্তে বলল, অন্ধকারে বসে আলোর সাধনা করত একজন।'

'তাই তো বলছিলাম—' সুকোমলের গলার স্বর আরো দৃঢ় হয়ে উঠল, 'ভালোটা দেখতে পাওয়ার চোখ ছিল তোমার, সকলের থাকে না, তোমার ছিল, কারণ তুমিও অন্ধকারের মধ্যে আলো খুঁজতে, সুন্দরকে খুঁজতে। তোমার এই সৌন্দর্যপ্রীতি তোমাকে সেখানে খারাপ লাগতে দেয়নি।'

একটু সময় চুপ করে রইল পরিমল। তারপর হঠাৎ যেন অতিরিক্ত খুশি হয়ে বলল, 'আমার কেন জানি খুব কবিতা লিখতে ইচ্ছা করত সুকু।' শিশুর সরল আবেগ ফুটে উঠল পরিমলের গলায়। ছোটো ভাইয়ের একটা হাত নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল সে।

সুকোমল কথা বলল না। মুখ ফিরিয়ে জানালার ওপারে শরতের নীল নির্মেঘ আকাশ দেখতে লাগল।

তাই তো হবে। সুকোমল চিন্তা করল। ঘোর বাস্তববাদী জগমোহন। একমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎটাই তাঁর কাছে সত্য। এর বাইরে যদি কিছু থেকে থাকে তিনি তা আমল দিতে চান না এবং এই নিয়ে মাথাও ঘামান না। যেমন রোগের লক্ষণ মিলিয়ে রুগীকে ওষুধ দেন। রুগীর রক্ত থুথু মল মূত্র পরীক্ষা করে যন্ত্রে যা ধরা পড়ে, অ্যানালাইজ করে যা বোঝা যায় সেটাই তাঁর কাছে মূল্যবান সত্য, সেটাকে মূলধন করেই তিনি চিকিৎসা চালিয়ে যান । অন্য জিনিস তাঁর কাছে অবান্তর। রুগীর সাধস্বপ্ন আশা আকাঙ্ক্ষা চিন্তা করতে গেলে তাঁর চলে না। পরিমল একদিন কী কাজ করেছিল সেটাই তিনি মনে রেখেছেন, সেটাই তাঁর কাছে আজও বড়ো হয়ে আছে, সত্য হয়ে আছে; দীর্ঘ-দিনের কারাবাস পরিমলের মনের জগতে কোনো পরিবর্তন ঘটিয়েছে কিনা, আজ নূতন করে সে কি কিছু ভাবছে, দশ বছর আগে যে দৃষ্টি নিয়ে সে পৃথিবীটাকে দেখত আজও সেই দৃষ্টি নিয়ে সে সব কিছু দেখছে কি, অথবা একদিন উত্তেজিত হয়ে সে রক্তপাত ঘটিয়েছিল, সেই উত্তেজনার কতটা আজ অবশিষ্ট আছে—বা পরিমলের পরিচয় কি শুধু নিষ্ঠুরতার মধ্যে, হিংসার মধ্যে, হননের মধ্যে? না কি মানুষটার ভিতর এক কোমলপ্রাণ প্রেমিক—এক শিল্পী, এক উদাসীন কবি প্রথম থেকে কাজ করে যাচ্ছে!

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রণয়ীকে ছুরি নিয়ে আক্রমণ—জগমোহনের চোখে যা জঘন্য অপরাধ—কিন্তু যদি বলা যায় ঐ আক্রমণ ঐ নির্মম আঘাত এক শিল্পীর—এক প্রেমিকের সংক্ষুব্ধ হৃদয়ের প্রবল অপ্রতিরোধ্য কান্নারই আর এক রূপ? যদি বলা যায় সেদিনের সেই রোমহর্ষণ রক্তপাতের মধ্য দিয়ে পরিমল এক আশ্চর্য কবিতা লিখে ফেলেছিল? জগমোহন কি তা বিশ্বাস করবেন, বুঝবেন? জগমোহন বুঝবেন না। হৃদয় ও মনটনের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ কম। পরিমল অপরাধ করেছিল, আইন তাকে দন্ড দিয়েছিল। এর চেয়ে বড়ো সত্য জগমোহনের কাছে আর কিছুই নেই। তাই ভয় ত্রাস ঘৃণা ও সন্দেহ নিয়ে তিনি ছেলেকে দেখছেন, সেভাবেই আজও তিনি তাকে বিচার করছেন। কাজেই বড়দা সম্পর্কে বাবাকে অন্য কিছু বলা বা বোঝাতে যাওয়া যে নিরর্থক, সুকোমল বেশ বুঝতে পারছিল।

সুকোমলের চোখে মুখে একটা উদ্বেগের ছায়া পরিমল লক্ষ্য করল। কিন্তু কিছু প্রশ্ন করল না।

সেদিনই বিকালের ট্রেনে সুকোমল ব্রজদুর্লভপুর চলে গেল।

জগমোহন খুব একটা অবাক হলেন না, দুঃখও করলেন না তেমন। তবে হতাশ হলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন, সন্ন্যাসী ছেলে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল। তাই হবে।

চেম্বার থেকে ফিরে এসে তিনি সুকোমলকে পাননি। ছাদের সেই ছোটো ঘরটার দোর বন্ধ করে সে আহ্নিক করছিল। বাড়ি এলে ওই নীরব নির্জন চিলেকোঠায় বসে সুকোমল তপজপ করে। সেদিন যেন একটু বেশি সময় সে সেখানে কাটাল। জগমোহন স্নান করলেন ভাত খেলেন। সুকোমল যখন নীচে নেমে এল জগমোহন তখন শুয়েছেন।

তখন আর তিনি ছেলেকে ডাকলেন না। তার রান্না আছে। নিজের হাতে রাঁধবে, তারপর দুটি মুখে দেবে।

ঘুমিয়ে উঠে জগমোহন দেখলেন সুকোমল তার থলেটলে গুছিয়ে বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে আছে, বাবার জন্য অপেক্ষা করছে, তাঁর ঘুম ভাঙলে তাঁকে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে।

জগমোহন এটা আশা করেননি। আজকাল সুকোমল এখানে আর রাত্রিবাস করে না। ঠাকুরের নিষেধ আছে। সকালের ট্রেনে আসে, সারাদিন থাকে, তারপর সন্ধ্যার ট্রেনে ব্রজদুর্লভপুরে ফিরে যায়। ঘুম থেকে জেগে উঠে জগমোহন দেখলেন তখনো দুটো বাজেনি।

'এত সকাল সকাল?' ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্নের উত্তরও সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পেলেন। কাল আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস। অনেক কাজ পড়ে আছে। আজও সুকোমলের আসা হত না। কেবল বড়দাকে দেখতেই অল্প সময়ের জন্য তার কলকাতা আসা।

জগমোহন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন।

বড়দাকে দেখতে আসা। কিন্তু এই বড়দা নামক মানুষটিকে নিয়ে যে জগমোহন ভয়ঙ্কর চিন্তিত হয়ে পড়েছেন—তাঁর দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তার অবসান ঘটাতে সুকোমল তাঁকে সাহায্য করবে—সকালে ভালো করে তিনি কথা বলতে পারেননি, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা নিয়ে সুকোমলের সঙ্গে বিকালে ভালো করে আলোচনা করবেন এবং দরকার হলে জগমোহন ওবেলা আর চেম্বারে যাবেন না, সুকোমলও সন্ধ্যার পরের দিকের অর্থাৎ রাত আটটায় ট্রেন ধরে না হয় ফিরে যেতে চেষ্টা করবে, বা জগমোহনের এই উপস্থিত বিপদের কথা চিন্তা করে সত্বর এর যথাবিহিত একটা ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় সম্পর্কে আরও বিস্তৃতভাবে বাবার সঙ্গে আলোচনা করতে, অন্তত এই একটিবার গুরুর আদেশ লঙঘন করে রাতটাও সে এখানে থেকে যাবে। যদি মানুষের উপকার করা, বিপন্নকে সাহায্য করার ব্রতই তারা গ্রহণ করে থাকে, প্রতিবারই সুকোমল যেমন এসে বলে, তো এই বিপদেই বা জগমোহনকে সে সাহায্য করবে না কেন। বুঝিয়ে বললে ঈশ্বরানন্দ বুঝবেন—তাঁর আদেশ লঙঘন করে বিপন্ন পিতার গৃহে রাত্রিবাস করার জন্য তিনি সুকোমলকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। সন্ন্যাসী ছেলের কাছে জগমোহন ঠিক এমনটিই আশা করেছিলেন। অসহায় জগমোহনকে ফেলে আজ কিছুতেই সুকোমল ব্রজদুর্লভপুর চলে যাবে না।

কিন্তু জগমোহন ঠিক তার উল্টোটা দেখলেন।

থলে কাঁধে ঝুলিয়ে সন্ন্যাসী অপেক্ষা করছে।

জগমোহন চোখ খুলে তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসতে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে বাবাকে সে প্রণাম করল।

জগমোহন কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস। গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়ে যে অনেক বেশি গুরু কাজের দায়িত্ব সন্ন্যাসীকে গ্রহণ করতে হবে! সকালের কথাগুলি কি সে একেবারে ভুলে গেল। পরিমল সম্পর্কে কি সে কিছুই চিন্তা করতে চায় না! তা না হলে—

জগমোহন তাই দেখতে পাচ্ছিলেন। ভুলেও আর একবার সুকোমল তার দাদার কথা উল্লেখ করল না। এমন একটা চেহারা, এমন ভঙ্গি নিয়ে সে জগমোহনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল যেন আর এক সেকেন্ড অপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যেন আরো এক ঘন্টা আগে বাড়ি থেকে বেরোলে সে নিশ্চিন্ত হতে পারত। কিন্তু জগমোহন ঘুমোচ্ছিলেন বলে তা আর হয়ে ওঠেনি। যেন এই কারণে ছেলের চোখে মুখে একটা উদ্বেগ অশান্তির ছাপ ফুটে উঠেছিল। জগমোহন হতাশ হলেন, আর কিছু বললেন না, নীরব থেকে ছেলেকে তখনি বেরিয়ে পড়ার অনুমতি দিলেন।

অর্থাৎ তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, পরিমলের দায়িত্ব নিতে সুকোমল অনিচ্ছুক। আপন ভাই। কিন্তু তা হলেও দশ বছর জেল খেটে বেরিয়ে এসেছে। গুরুতর অপরাধ করেছিল। আইন তাকে ক্ষমা করেনি, সমাজ তাকে ক্ষমা করেনি। এমন হতভাগ্যকে আশ্রমের পবিত্র পরিবেশে নিয়ে যেতে, ঈশ্বররানন্দের মতন মহাপুরুষের সামনে উপস্থিত করাতে সুকোমল সঙ্কুচিত হচ্ছিল। হয়তো এই ভাইয়ের কথা আশ্রমে সে কোনোদিন বলেনি। তার গুরু এবং গুরুভাইরা জানে না জগমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ইতিহাস। অসম্ভব কি। পরিবারের এই কলঙ্ক আগাগোড়া সুকোমল গোপন রেখেছে। আজ এই কলঙ্ক উদ্ঘাটন করতে তার লজ্জা ভয়। সন্ন্যাসী হয়েও সে পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত হতে পারছে না।

যেন অনেক দুঃখে জগমোহন মনে মনে হাসলেন।

গৃহত্যাগী, সারাক্ষণ যার ঈশ্বরচিন্তা, মানুষের সেবা করার মহান ব্রত যে গ্রহণ করেছে সে এক পাপীকে ভয় পাচ্ছে—এক ক্রিমিন্যালকে কাছে টেনে নিয়ে তার চিত্ত-সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে দ্বিধা করছে।

তবে আর সংসারী মানুষকে, সাধারণ মানুষকে হেয়জ্ঞান করা কেন। তারা স্বার্থপর, তাদের মন ছোটো, তারা আত্মসুখান্বেষী—সংসারী মানুষের কতরকম ব্যাখ্যাই তো করা হয়। কিন্তু তুমি যে তাদের চেয়ে অনেক বেশি স্বার্থপর। তোমার ঘর নেই সমাজ নেই—ভিক্ষান্নজীবী বলে নিজের পরিচয় দাও। বৃত্তির লোভ নেই, বিত্তের মোহ নেই। জাগতিক সুনাম সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি তোমার কাছে তুচ্ছ জিনিস। আত্মীয়স্বজনের সমাজ থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন। তবে কী হারাবার ভয়ে—কোন অপ্রাপ্তির আশঙ্কায় জেলফেরত অপরাধীর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে তোমার এই ব্যাকুলতা ব্যস্ততা? যেন তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বেঁচে গেলে। এই তো! সব ঝঞ্ঝাট বৃদ্ধ বাপ পোহাক, নূতন একটা দুর্ভাবনার জালে জড়িয়ে পড়ে জগমোহন ডাক্তার ছটফট করুক।

হতাশার ভাবটা কেটে গিয়ে একটা ক্রোধ—আক্রোশের আগুন জগমোহনের বুকের ভিতর দপদপ করতে লাগল। রমলা কখন তাঁর কফি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল নেই। নাতির কচি হাতের মুষ্ট্যাঘাত চলছিল হাঁটুর ওপর। পরে দীপু চেঁচামেচি আরম্ভ করতে জগমোহন এদিকে ঘাড় ফেরালেন। পুত্রবধূর হাত থেকে কফির পেয়ালা তুলে নিলেন। আর এক হাতে নাতিকে কোলের কাছে টেনে নিলেন।

'সন্ন্যাসী ছোঁড়া এত সকাল সকাল পালিয়ে গেল কেন বউমা?'

'বলছিল কাজ আছে—কাল আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস।'

শ্বশুরমশায়ের গলার স্বরের তিক্ততা রমলার কানে লাগল।

'কাজ আছে—আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস!' গলার নীচে জগমোহন গর্জন করে উঠলেন। তাই গলার স্বরটা অদ্ভুত শোনাল। ছোটোঠাকুরপোর ওপর তিনি তো কোনোদিন রাগ করেন না। জগমোহনের চাপা উত্তেজনা রমলাকে বিস্মিত করল।

'আবার কবে আসবে তোমায় কিছু বলে গেছে?' রমলার চোখের দিকে তাকিয়ে জগমোহন প্রশ্ন করলেন। রমলা মাটির দিকে চোখ নামিয়ে মাথা নাড়ল।

'কিছু বলে যায়নি—তার মানে শীগগির আর এ-মুখো হচ্ছে না।' ক্রুদ্ধ জগমোহনের মুখের চামড়া কুঁচকে উঠল। রমলা নীরব। দাদুর চেহারা দেখে দীপু অস্বস্তিবোধ করছিল। দাদুর কোল ছেড়ে সে ধীরে ধীরে মার কাছে সরে এল । জগমোহন অন্যদিকে চোখ রেখে কফি খান। তারপর হঠাৎ আবার এদিকে ঘাড় ফেরান।

'আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করছি বউমা, শোন।' যেন খুবই গোপনীয় কথা। যেন চোখের ইসারায় তিনি পুত্রবধূকে ডাকলেন। রমলা অবশ্য সরে গেল না। একজায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে মৃদুগলায় বলল, 'বলুন।'

জগমোহন ইতস্তত করেন। চোখটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের এটা সেটা দেখেন। এমনি। দেখার উদ্দেশ্যে কিছু দেখা নয়। তিনি খুবই চিন্তান্বিত, বিক্ষুব্ধ, রমলা বুঝতে পারল।

জগমোহন হাতের পেয়ালা নামিয়ে রাখলেন।

'পরিমলের ঘরে কি সে গিয়েছিল? হ্যাঁ, সুকোমল? দুজন কি কথাটাথা বলেছে, তুমি টের পেলে?'

'তা আমি বলতে পারব না। তবে ছোটো ঠাকুরপো সে-ঘরে ছিল।' পরিতোষের দাদাকে দাদা ডাকবে কি ভাসুরঠাকুর বলবে রমলা ঠিক বুঝতে পারছিল না। কাল থেকে কথাটা চিন্তা করছে সে। তাই এখন পরিমলের ঘর বোঝাতে রমলা 'সে-ঘর' শব্দটাই ব্যবহার করল। কিন্তু জগমোহনের এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। তিনি সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে বসলেন। চোখ দুটো ছোটো করে পুত্রবধূকে প্রশ্ন করলেন, 'কতক্ষণ ছিল সে পরিমলের ঘরে?'

'ও চা খেয়ে বেরিয়ে এল—ছোটোঠাকুরপো সেখানে থেকে গেল। দুজনের কী কথা হয়েছে আমি জানি না—সেও জানে না। তবে ছোটোঠাকুরপো বেশ কিছুক্ষণ তার বড়দার কাছে ছিল।' একটু চুপ থেকে রমলা বলল, 'সে তো তখনই কাজে বেরিয়ে গেল, আজ দুপুরেও খেতে এল না।' পরিতোষের কথা বলছে রমলা। জগমোহন বুঝলেন। দূরে কাজ থাকলে তাই হয়। বাইরে খেয়ে নেয় পরিতোষ, ফেরে সেই সন্ধ্যায়। কোনো কোনো দিন রাত হয়। যেন এইজন্য জগমোহন আরো বেশি অস্বস্তিবোধ করছিলেন। মেজোছেলে বাড়ি থাকলে তিনি কতকটা সান্ত্বনা পেতেন। বিশেষ সুকোমলের এভাবে হঠাৎ অসময়ে চলে যাওয়ার বিষয়টা নিয়ে পরিতোষের সঙ্গে তিনি কথা বলতে পারতেন।

'আমার কী মনে হয় জান, বউমা।' জগমোহন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তাঁর গলার স্বরে একটা কাতরতা শোনা গেল, যেন ভিতরের উত্তেজনাটাও প্রশমিত হয়েছে, রমলা লক্ষ্য করল। জগমোহন বললেন, 'পরিমলের ঘরে সে কিছুক্ষণ ছিল—ঐ পর্যন্ত, তাকে দেখবে বলে আশ্রম

থেকে ছুটি নিয়ে দু-চার ঘন্টার জন্য এসেছিল—এও সত্য কথা—কিন্তু ঐ যে, ভেতরের অহংকার—আমি আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ—ঈশ্বরের কৃপা লাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে—তুমি পাপী, তুমি জঘন্য অপরাধ করে জেল খেটে এসেছ—সন্ন্যেসী ছেলে কিছুতেই কথাটা ভুলতে পারছে না—এমন কী পরিমল যে তার সহোদর—অগ্রজ—এই প্রকান্ড সত্যটা স্বীকার করে নিতেও আজ সুকোমলের বাধছে—কাজেই পরিমলের সঙ্গে খুব একটা কথাটথা বলেছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না।'

রমলা স্থির দৃষ্টি মেলে শ্বশুরমশায়কে দেখছিল। জগমোহন চুপ করতে সে অন্যদিকে চোখ ফেরাল।

'তোমার কি মনে হয় বউমা—'

রমলাকে আবার শ্বশুরের দিকে তাকাতে হল। 'ঠিক বুঝতে পারছি না —কিন্তু আমার মনে হয় ছোটোঠাকুরপোর মধ্যে এই জিনিসটা নেই—আমি ধর্মকর্ম আধ্যাত্মিক চিন্তা নিয়ে আছি—আমি পুণ্যবান—তোমাদের এসব নেই, সংসার-বিষয়বাসনা নিয়ে মত্ত, সুতরাং তোমরা পাপী, তোমাদের ঘৃণা করব—প্রায় চার বছর দেখছি ছোটোঠাকুরপোকে—যেন তাঁর ভেতরে একটা অন্য জিনিস আছে—একটা দয়ার ভাব, করুণার ভাব, সারাক্ষণই মানুষকে ভালোবাসতে ক্ষমা করতে তাঁর প্রাণ মন উন্মুখ হয়ে আছে—সংসারী মানুষকে ঘৃণার চোখে দেখে বলে মনে হয় না।'

রমলা কথা শেষ করার আগে জগমোহন নিচু গলায় হাসলেন, মাথা নাড়লেন।

'সেটা তোমার বেলায়—আমার বেলায়—পরিতোষের বেলায়—আমরা সংসার নিয়ে মত্ত, লোভ কামনা ছাড়তে পারছি না—ছোটো কাজ ছোটো চিন্তা নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত—আমাদের সে ক্ষমার চোখে দেখছে দয়া করছে—দয়া না বলে অনুকম্পাও বলতে পার—হ্যাঁ করুণা—আমাদের সে ভালোবাসে কিনা জানি না —তবে ঘৃণা করছে না অবজ্ঞা করছে না এটুকু বুঝি—কারণ আমরা তেমন কিছু অপরাধ করিনি—পাপ করিনি জেল খাটিনি—সুতরাং, আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছ?'

রমলা মাথা হেঁট করে ভাবতে লাগল।

জগমোহন চেয়ারের পিঠে শরীর এলিয়ে দিলেন।

'তাই তোমাকে বলছিলাম—সুকু আজ সকাল সকাল এখান থেকে সরে পড়েছে। বাড়ির আবহাওয়া তার সহ্য হচ্ছিল না। সে হাঁপিয়ে উঠেছিল—তার চোখ মুখের অবস্থা দেখে আমি টের পেয়েছি—সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে যেতে পারত—ইদানীং সে তাই করছিল— কিন্তু আজ ততটা সময় অপেক্ষা করতে পারল না। এর কারণ কী? বাড়ির আবহাওয়া আজ আর নির্মল নেই, স্বাভাবিক নেই—এক ঝুড়ি টাটকা ফলের সঙ্গে একটা দোষি দাগি পচা ফল দেখলে আমাদের মন খুঁতখুঁত করে—আমাদের মধ্যে পরিমলকে দেখে সন্ন্যাসী ছেলের মনের অবস্থা ঠিক তাই দাঁড়িয়েছে—সে পালিয়ে গেল।'

'থাক, এ নিয়ে আপনি এত ভাববেন না—আপনার প্রেসার বাড়তে পারে—দেখা যাক না—আমার মনে হয় না ছোটোঠাকুরপো—'

পুত্রবধূকে কথা শেষ করতে দিলেন না জগমোহন। কেমন যেন রুক্ষ বিকৃত গলায় বলে

উঠলেন, 'তোমার মনে হয় না—কিন্তু তার মনে কী আছে তুমি টের পাবে নাকি? মানুষের মনের কথা বোঝা যায় না। বড়ো বিশ্রী জিনিস এই মন। সমুদ্রের মতন এর তল নেই। অমাবস্যার অন্ধকারের মতন এর অনিশ্চিত চেহারা। কারোর মনের ভেতর উঁকি দিয়ে তাকে চিনতে যাওয়ার চেষ্টা করা বাতুলতা। আমি তা করি না। নেভার। কখনো কারো মনটন বুঝতে চাই না। মানুষকে বিচার করি তার কাজ দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে, তার বাহ্যিক চালচলন দেখে। ঐ যে বললাম, ছোঁড়া পালিয়ে গেল---আমি ঠিকই ধরেছি। জরুরী কাজ আছে। সকালে চেম্বারে যাবার আগে বার বার বলে গেলাম, হয়তো আজ সন্ধ্যার আগে তোর ফেরা হবে না। দরকার হলে এখানে রাত্রিবাস করতে হবে। তখন শুনল, ঘাড় কাত করল। এখন ঘুম থেকে উঠে দেখি শ্রীমান থলে কাঁধে ঝুলিয়ে সরে পড়ছে।' একটু দম নিয়ে জগমোহন বললেন, 'কাজেই ওই ছেলের মন বুঝতে ভেতরটা দেখতে আমার বাকি নেই—ভয়ংকর স্বার্থপর—গেরুয়া পরলে হবে কী—নিজের সুখ সুবিধে সম্পর্কে খুব সচেতন। সবটা বোঝা বুড়োর মাথায় চেপে থাক—দূর থেকে আমি মজা দেখব। এই তার মনের ভাব।'

রমলা অধোবদন হয়ে শুনছিল। শ্বশুরমশায় চুপ করতে সে মুখ তুলল। পুত্রবধূর চোখের দিকে তাকিয়ে জগমোহন বুঝলেন সে আরো কিছু জানতে চাইছে। জগমোহন আবাব এদিক ওদিক তাকান, সামনের দিকে ঝুঁকে বসেন, তারপর গলার স্বরটা আরো নীচে নামিয়ে প্রশ্ন করেন, 'পরিমল কি ঘুমোচ্ছে দেখলে।'

'ঠিক বুঝলাম না। দোরটা ভেজানো রয়েছে দেখলাম।'

'ঘুমোচ্ছে।' কেমন যেন নিশ্চিন্ত হয়ে জগমোহন ঘাড় কাত করলেন। 'না হলে কাশিটাশির শব্দ শোনা যেত। একটা মানুষ জেগে থাকলে বোঝা যায়। হুঁ', আমি তার বিষয় নিয়েই সন্ন্যাসী ছোঁড়ার সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম—কিন্তু স্কাউন্ড্রেল এড়িয়ে গেল।'

রমলা আহত হল। সংসারের নানা ব্যাপারে শ্বশুরমশায় ক্রুদ্ধ হন, উত্তেজিত হন, বিচলিত হন। তাঁর রূঢ় ভাষণ কম বেশি সকলকেই শুনতে হয়। কিন্তু এই রূঢ়তার পিছনেও একটা মাধুর্য থাকে—আশ্চর্য সংযম থাকে। রাগ করে চাকর দারোয়ানের সঙ্গেও যখন তিনি কথা বলেন কোনোদিন তাদের গালিগালাজ করেছেন বা একটা অশোভন উক্তি করেছেন, আজ অবধি রমলা শোনেনি। সুকোমল এবাড়ির ছোটো ছেলে। এই বয়সে ঘর-সংসার ছেড়ে আশ্রমবাসী হয়েছে। সংসারের সুখভোগের মোহ তাকে ধরে রাখতে পারল না। এই জন্য বাড়ির সকলের মনেই একটা দুঃখ—চাপা বেদনা আছে। মুখে সেটা কেউ প্রকাশ করেন না—জগমোহন না—পরিতোষ না। কিন্তু ছোটো ভাইয়ের—ছোটো ছেলের বিচ্ছেদ তাঁরা প্রতিনিয়ত অনুভব করেন। এইজন্য সুকোমল যখন বাড়ি আসে তখন তাঁরা যে কত আনন্দ পান। তাঁরা জানেন গৃহত্যাগী ব্রহ্মচারীকে গৃহের সুখ সম্ভোগ দিয়ে পরিতৃপ্ত করা যাবে না—ভালো খেতে দেওয়া, পরতে দেওয়া, ভালো বিছানায় শুতে দেওয়া, বাড়িতে অতিথি এলে। আত্মীয় কুটুম্ব এলে তাদের আদর আপ্যায়নের জন্য যে ধরনের ব্যবস্থা করতে হয় সুকোমলের বেলায় এসব অচল। তাই যেন ক্ষতিপূরণ হিসাবে শুধু অন্তরের স্নেহ দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, সুন্দর ব্যবহার দিয়ে বাড়ির ছোটো ছেলেকে সুখী করতে জগমোহন ব্যস্ত হয়ে পড়েন—জগমোহন—পরিতোষ—রমলা সকলেই। রমলাও কি কম স্নেহ করে বৈরাগী দেওরটিকে!

আজ তার সম্পর্কে শ্বশুরের উক্তি রমলাকে ব্যথিত করল, বিস্মিত করল। একটু ভাবল সে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'সংসারের মধ্যে সে নেই—তাই আমার মনে হয় এসব আলোচনার মধ্যেও ছোটোঠাকুরপো থাকতে চাইছে না—কারণ সে জানে সব ব্যাপার নিয়ে আপনি তার মেজদার সঙ্গে কথা বলেন, পরামর্শ করেন—তার বড়দার বিষয় নিয়েও—'

জগমোহন একটা হাত তুলে রমলাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন। 'শোন শোন—তুমি গোড়াতে ভুল করছ বউমা—পরিতোষের সঙ্গে আমি অনেক বিষয় নিয়ে কনসাল্ট করি—করতে হয়, সংসারের এমন কতগুলো জিনিস আছে, তার বুদ্ধি পরামর্শ আমাকে নিতে হয় বইকি—কিন্তু এই ব্যাপারে পরিতোষ কিছু না—শিশু। গ্রহশান্তির জন্য তাবিজ মাদুলি ধারণ করতে হয়—অশৌচ শোধনের জন্য তুলসীপাতা গঙ্গা জলের দরকার পড়ে—তেমনি বড়োছেলেকে নিয়ে আজ আমি যে সমস্যায় পড়েছি, যে ভাবনার পড়েছি তা থেকে মুক্ত হতে হলে আমাকে সাধুসন্ত ঈশ্বরনিষ্ঠ মানুষের সাহায্য নিতে হবে—সেই জন্যই সন্ন্যাসী ছেলেকে দরকার—পরিতোষ আমাকে এই বিপদে সাহায্য করতে পারবে না। বৈষয়িক বুদ্ধি সাংসারিক জ্ঞান এক্ষেত্রে অচল।'

কথা শেষ করে জগমোহন কপালের রগ দুটো টিপে ধরে নির্জীবের মতন বসে রইলেন। চোখ বুজে রইলেন। রমলা বুঝল তিনি আর কিছু বলতে চান না। একটু বিশ্রাম চাইছেন এখন, নিঃসঙ্গতা চাইছেন। দীপুর হাত ধরে রমলা ধীরে ধীরে শ্বশুরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অবাক লাগছিল তার, দীপু শেষদিকে একটি কথাও বলেনি—একবার 'দাদু' বলে ডাকেনি। পুতুলের মতন একজায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেন দাদুকে তার ভয় করছিল। ভয় করছিল, না কি বুড়ো মানুষটার চোখমুখের অবস্থা দেখে, কথা শুনে তার খারাপ লাগছিল। তবে কি জগমোহন এতক্ষণ যা বলছিলেন একটি শিশুর মধ্যেও তা নিরানন্দ সৃষ্টি করল, অপ্রীতি জাগাল! রমলার তাই মনে হচ্ছিল। তার নিজের এত খারাপ লাগছিল কথাগুলি শুনতে! বাইরে থেকে বোঝা যায় না, একটা নিষ্ঠুর কাঠিন্য লুকিয়ে আছে মানুষটার ভিতর। আজ রমলা সেটা দেখতে পেল। বড়োছেলে বাড়ি আসতে না আসতে তিনি এমন ক্ষিপ্ত অশান্ত হয়ে উঠেছেন। শোধন চাইছেন, অশৌচমুক্তি চাইছেন—দুষ্টগ্রহ নিবারণের উপায় খুঁজছেন। না, শ্বশুরকে রমলা শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, কিন্তু আজ রমলার মনের কোণে ঘৃণা, একটা অস্বস্তিকর বিদ্বেষের কালো ছায়া জাগল। এইজন্য তার দুঃখ হতে লাগল। নিজেকে নিজের কাছে খারাপ লাগল।

॥ ১০ ॥

দুঃসাহস বটে ছেলের! একটু অন্যমনস্ক ছিল রমলা। শ্বশুর মশায়ের কথাগুলি ভাবতে ভাবতে দীপুর হাত ধরে করিডোর পার হচ্ছিল। আর কোন ফাঁকে ছেলে মার শিথিল হাতের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পরিমলের ঘরের ভেজানো দোরটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। রমলা অবশ্য তৎক্ষণাৎ ছেলেকে ধরে ফেলল। না হলে দীপু তখনি চৌকাঠ পার হয়ে ভিতরে ঢুকে জেঠুর খাটের কাছে চলে যেত। এক সেকেণ্ড কী একটু বেশি সময়, রমলা চৌকাঠের

বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে ভিতরটা দেখল। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মানুষটা। ঘুমোচ্ছে। শিয়রের কাছে একটা বই পাতা-খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। ওদিকের দুটো জানালাই খোলা। বিকেলের লাল রোদ এসে পড়েছে বালিশের কিনারে। টেবিলের গোলাপ মজে গেছে। পরিতোষ হয়তো ফুলদানীতে জল কম দিয়েছিল। কাল সকাল পর্যন্ত ফুলগুলি শুকিয়ে যাবে। রমলার ইচ্ছে করছিল তখনি ঘরে ঢুকে ফুলদানিতে আর একটু বেশি করে জল দিয়ে আসে। গোলাপগুলি তাজা থাকুক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরিতোষের কথাটা মনে পড়ল। পরিতোষের কাল সকালের বিষণ্ণ গম্ভীর মুখটা মনে পড়ল। আগের মতন আজও দাদা গোলাপ ভালোবাসে কিনা সে জানে না।

বুকের মধ্যে নূতন করে একটা অনিশ্চয়তার ধাক্কা অনুভব করল রমলা। কে জানে, যৌবনের প্রান্তে এসে এই মানুষটি হয়তো এখন বাসি ফুল ভালোবাসে, গোলাপ ফুলের শুকিয়ে যাওয়া দেখতে ভালোবাসে। রৌদ্রের আকাশে মেঘের অন্ধকার ঘনিয়ে এল দেখে তৃপ্তি পায় এমন মানুষ কি নেই! হয়তো তাই। রমলা আবার খাটের দিকে চোখ ফেরাল। চোখের কোণায় এক ফোঁটা জল জমে আছে পরিমলের। ঘুমের মধ্যে কাঁদছিল। স্বপ্ন দেখে কাঁদছিল। অবসিত যৌবনের স্বপ্ন। এই স্বপ্নের রং কম, উজ্জ্বলতা কম, আবেগ নেই, উচ্ছ্বাস নেই। থাকা উচিত নয়। উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য যৌবনের কান্না সুন্দর। কিন্তু রমলা অবাক হল দেখে, ঘুমন্ত পরিমলের চোখের কোণায় যে অশ্রুবিন্দু টলটল করছে তা যেন আরো বেশি সুন্দর; সুন্দর বললে সবটা বোঝা যায় না, অধিকতর বিশুদ্ধ পরিস্রুত—যেন একটা অপার্থিব সৌন্দর্য লেগে আছে জলের ফোঁটায়।

আর দাঁড়াল না রমলা। হাত বাড়িয়ে দোরটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলল। দীপু ভয়ানক ছটফট করছিল জেঠুর কাছে যেতে, জেঠুর ঘরে ঢুকতে। দুপুরে পরিমলের সঙ্গে বসে ভাত খেয়েছে ছেলে—পরিমল আদর করে ভাজা মাছের টুকরোটা ভেঙ্গে কাঁটা ছাড়িয়ে ভাইপোর মুখে তুলে তুলে দিয়েছে। ব্যস, আর যায় কোথায়—ভয়ানক ভাব হয়ে গেছে জেঠুমণির সঙ্গে তার এখন। চেঁচিয়ে উঠবে ভয়ে রমলা ছেলের মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে জায়গাটা কোনোমতে পার হল।

তখন চা খেয়ে দাদার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পরিতোষ বলছিল, অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে গেছে মানুষটা। খুব একটা কথাটথা বলল না। রমলা চুপ করে শুনছিল। পরিতোষ আবার বলেছিল, আরো দু চারদিন না গেলে বোঝা যাবে না। নূতন জীবন আরম্ভ হয়েছে। পরিবর্তনটা ধাতস্থ হতে সময় লাগবে বইকি।

কিন্তু রমলার যেন মনে হল, পরিতোষও তার দাদার সঙ্গে তেমন করে কথা বলছে না। যেন রাতারাতি পরিতোষের মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে কিছু একটা তাকে বাধা দিচ্ছে। রমলা চিন্তা করতে লাগল। জগমোহনের মতন পরিতোষও কি এই মানুষটাকে নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়েছে? অশান্তি পাচ্ছে মনে মনে?

বিশ্বাস করতে বাধে। চার বছর বিয়ে হয়ে এ বাড়িতে আসার পর থেকে, কত লক্ষ বার রমলা স্বামীর মুখে 'দাদা' শব্দটা শুনেছে। এই ক'টা দিন পরিমল বাড়ি আসবে, কী ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সে। আজ সব উত্তেজনা উৎসাহ নিভে জল হয়ে

গেল? জগমোহনের মতন, জেল-ফেরত একটা মানুষকে দেখে সে-ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে?

যদি তাই হয় তার চেয়ে দুঃখের আর কী হতে পারে।

কিন্তু রমলার যেন মনে হল, এঁদের দুজনের মতন সুকোমল এতটা অস্থির হয়নি, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়নি। বরং পরিমলের ঘর থেকে যখন সে বেরিয়ে এল সন্ন্যাসীর চোখেমুখে একটা প্রসন্ন দীপ্তি রমলা দেখতে পেয়েছিল। রমলা কিছু প্রশ্ন করেনি। কিন্তু তা হলেও সুকোমল যে তার বড়দার সঙ্গে কথা বলে খুশি হয়েছে, নিশ্চিন্ত হয়েছে এটা বোঝা যাচ্ছিল। কী কথা বলেছে সে বা ক'টা কথা বলেছে তার দাদার সঙ্গে রমলা জানে না। জানতে তার ইচ্ছা হয়েছিল সন্দেহ কী, চোখে মুখে সে রকম একটা আগ্রহও জেগেছিল। যেন বউদির আগ্রহ লক্ষ্য করে সুকোমল বলেছিল, বাবা বড়দাকে বুঝতে পারছেন না, চিনতে পারছেন না—মেজদা কতটা বুঝেছেন জানি না, আমি মানুষটার চোখের ভেতর একটা আলো দেখতে পেয়েছি। মানুষের হৃদয় যখন সুন্দর হয়, মহৎ হয় তখন তার দৃষ্টির মধ্যে একটা আশ্চর্য দীপ্তি ফুটে ওঠে। বড়দার দৃষ্টি আমাকে অভিভূত করেছে।

ইচ্ছা করে রমলা শ্বশুরকে কথাগুলি বলেনি, বললে এই নিয়ে তিনি পরিহাস করতেন। এ সব আধ্যাত্মিক কথা আমায় শুনিও না বউমা—সন্ন্যাসী ছোঁড়া কিছু লম্বা বুলি তোমায় শুনিয়ে গেছে। তার মানে তোমাকেও সে এড়িয়ে গেল। এড়িয়ে যাবার সময় এমন সব উচ্চ মার্গের কিছু কিছু শব্দ তোমার কানে না দিয়ে গেলে তুমি যে তার ফাঁকি ধরে ফেলবে।

রুষ্ট উত্তেজিত জগমোহন আরো কী বলতেন কে জানে। ভয়ে রমলা চুপ করে ছিল। তিনি তাঁর কথা বলে গেছেন। রমলা শেষ দিকে আর একটা কথাও বলেনি।

এখন পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে নিদ্রিত মানুষটিকে দেখে এসে সুকোমলের কথাটা সে নূতন করে ভাবছিল।

না, এই দুদিন পরিমলের আসল রূপ সে ধরতে পারেনি। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। এখন রমলা একটা স্থির বিশ্বাসে উপনীত হতে পারল। রমলা সুখী হল। কাল বিকালে বারান্দায় যার চোখে সে শুধু প্রেম দেখেছিল, আবেগের আগুন দেখে চমকে উঠেছিল, আজ, একটু আগে, ওই ঘরে উঁকি দিয়ে সেই মানুষের নিদ্রিত মুদিত চোখের প্রান্তে মুক্তাবিন্দুর মতন স্থির স্নিগ্ধ অশ্রু দেখে রমলা বুঝতে পারল প্রেমের চেয়েও বড়ো কিছুর ধ্যান করছে সে, কোনো মহৎ বাসনা তার হৃদয়ে রয়েছে। শুধুই বিশাখাদের প্রেম না, প্রেমের নীলাকাশ অতিক্রম করে আরও ঊর্ধ্বে মহাশূন্যের এক রূপলোকে ছুটে যেতে তার আত্মা কাঁদছে। এই জন্যই তার চোখের জল এত সুন্দর, এত নির্মল। সুকোমল চলে গেছে। বড়দাকে দেখতে এসেছিল। দেখে প্রীত হয়ে চলে গেছে। আর এখানে তার অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। নিশ্চয় জগমোহন এমন কিছু বলেছেন, যে জন্য সন্ধ্যার ট্রেন ধরা পর্যন্ত সে থাকতে পারল না, ভালো লাগল না থাকতে। হয়তো জগমোহনের আচরণে ভিতরে ভিতরে সে অসন্তুষ্ট হয়েছে—ক্ষুব্ধ হয়েছে। পরিতোষের ব্যবহারেও তার দুঃখ হতে পারে, অভিমান হতে পারে। রমলা ঠিক বুঝতে পারল না। জগমোহনের পক্ষে অসম্ভব না, বড়োছেলেকে নিয়ে যে তিনি একটা সাংঘাতিক সমস্যার মধ্যে পড়েছেন রমলা এই মাত্র তো নিজের কানে শুনে এল,

কাজেই এই ছেলে সম্পর্কে তিনি হয়তো এমন কিছু মন্তব্য করেছেন, যেজন্য সুকোমল ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু পরিতোষ? পরিতোষ তার দাদার বিষয় নিয়ে সুকোমলকে কী বলতে পারে—কখন বলল? নিশ্চয় পরিতোষ কিছু বলেনি। চা খেয়ে পরিমলের ঘর থেকে সে তখনই তো বেরিয়ে এল—তারপর কাজে চলে গেল। সুকোমলের সঙ্গে কথা বলার সময় হয়নি তার। সুকোমলের মনে লাগতে পারে এমন কিছু সে না বলুক রমলা মনে-প্রাণে চাইছিল। দাদাকে একদিন সে খুব ভালোবাসত। রমলা চাইছে আজও তার স্বামী পরিমলকে আগের মতন ভালোবাসুক। রমলা সুখী হবে। অপরাধ করে জেল খেটে এসেছে বলে যে মানুষটা এ বাড়ির সকলের চোখে চিরদিন অপরাধী হয়ে থাকবে, এ কেমন কথা! এই যুক্তি রমলা মানতে রাজী না। এই নিয়ে আজ রাত্রেই সে পরিতোষের সঙ্গে কথা বলবে।

পরিমলের যখন ঘুম ভাঙল বেলা পড়ে গেছে। জানালার বাইরে তাকাল সে। ওদিকের মাঠে একটা তালগাছের মাথায় সোনার পাতের মতন একটুখানি রোদ লেগে আছে। মাঠের সবুজ ঘাসে কালো রং ধরেছে। গাছের মাথার রোদটুকু মিলিয়ে গেলে সব অন্ধকার হয়ে যাবে। কিছু পাখি সাঁই সাঁই করে বাসার দিকে ফিরে যাচ্ছে। যেন পুব দিকের কোনো জঙ্গলে তাদের বাসা। পশ্চিমের কোনো প্রান্তরে, নদীর ধারে তারা বেড়াতে গিয়েছিল। ফর্সা ধবধবে ইজের ফ্রক-পরা ছোটো ছেলেমেয়েরা রেলিং ঘেরা ছোটো পার্কটায় ছুটোছুটি করছে। চারদিকে একটা স্তব্ধতা মন্থরতা। এখন পর্যন্ত বিরলবসতি অঞ্চল। রাস্তায় লোকজন কম চলে—গাড়ি ঘোড়া কম চলে। সব শূন্য শান্ত মনে হয়। সেই তুলনায় টালিগঞ্জ বালিগঞ্জ কত মুখর চঞ্চল। কতকাল পর হঠাৎ সেই সব রাস্তা বাড়ি মানুষের ভিড়ের ছবি পরিমলের মনে পড়ল। দিবানিদ্রার অভ্যাস তার নেই। জেলখানায় দিনের বেলা কোনোদিন সে ঘুমিয়েছে মনে করতে পারে না। সেই সুযোগও ছিল না। অনেক দিন পর অবেলায় ঘুমিয়ে উঠে ক্লান্ত অবসন্ন মনে হচ্ছিল তার। নিজেকে কেমন শূন্য ব্যর্থ অন্তঃসারশূন্য লাগছিল। সকালে ঘুম ভাঙার পর জেলের কথা মনে পড়েছিল। এখন একবারও ঐ জীবনটা মনে পড়ছে না। আর দূর অতীতের টুকরো টুকরো ছবি চোখের সামনে ভাসতে লাগল। লেকের ধার, রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর আলো-ঝলমলে ডাইং ক্লিনিং, হেয়ার কাটিং সেলুন, বালিগঞ্জ প্লেস, ছোটো রেলস্টেশন, কালো রঙের ওভারব্রীজ, কলেজ, কমন রুম, কফি হাউস, কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথের পুরোনো বইয়ের দোকান। বইয়ের দোকানের নুর মহম্মদ। বসন্তের দাগ-ধরা কালো চেপটা মুখ। একটা কানের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এত বড়ো একটা ফুটো যেন কেউ নুর মহম্মদের মাথা লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়েছিল। মাথা বেঁচে গেল। চোখ বেঁচে গেল, কিন্তু চিরদিনের মতন বাঁ কানটা ছিদ্র করে দিয়ে গেছে বুলেট। নুর মহম্মদকে দেখলেই কথাটা মনে হত পরিমলের। অবশ্য এভাবে কান নিয়েই হয়তো মানুষটার জন্ম হয়েছিল—রোজই পরিমল ভাবত, নুর মহম্মদকে কথাটা জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে—কিন্তু জিজ্ঞেস করা হত না। কেমিস্ট্রির প্রফেসার ব্যানার্জিকে মনে পড়ল পরিমলের। ব্যানার্জির সঙ্গে সঙ্গে একগাদা ক্লাস-মেট্ হুড়মুড় করে পরিমলের চোখের সামনে ভিড় করে দাঁড়াল। প্রণব মিহির সুকুমার অসিত নবারুণ গোলক মধুছন্দা মিনতি রাণু......অনেক মুখ অনেক চোখ অনেক

কথা......পরিমল তাড়াতাড়ি চোখ বুজল। ভয় পেয়ে চোখ বুজল। চোখ অন্ধকার করে রাখলে মনের পটও অন্ধকার হয়ে যাবে। ছবিগুলি আর সেখানে ভাসবে না। এত অল্প সময়ের মধ্যে অকারণে হঠাৎ এত মুখ এত স্মৃতির চাপ সে সহ্য করতে পারছিল না। অনেক চেষ্টা করে যত্ন করে—সাধনা করে সে একটা পৃথিবী ভুলতে পেরেছিল। অনেক দিন চেষ্টা করতে হয়েছিল। তারপর সুন্দরভাবে সে সফল হয়েছিল। অন্য পৃথিবী গড়ে তুলেছিল। নূতন জগৎ এবং নূতন শক্তিও সঞ্চয় করেছিল। শক্তি চলে না যায় এই জন্য সে সর্বদা সতর্ক থাকত, সচেতন থাকত। ক্রমে সেই পুরোনো পৃথিবী আয়তনে যেটা বিশাল ছিল, একটা বিন্দুর মতন হয়ে চিরদিনের মতন শূন্যে মিলিয়ে গেল। পরিমল সুখী হল নিশ্চিন্ত হল। নূতন শক্তি নিয়ে নূতন জগতে সে বিচরণ করতে লাগল।

আজ সকালেও সে যখন সুকোমলের সঙ্গে কথা বলে তার মনের দৃঢ়তা চিত্তের প্রশান্তি অটুট ছিল। এখন এই দুর্বলতা। যেন চোখ বুজে থেকেও নিস্তার নেই; কানের ছিদ্র নাসারন্ধ্র রোমকূপ ইত্যাদি দিয়ে সেই সব মুখ, পুরোনো পৃথিবীর অসংখ্য স্মৃতি তার অন্তস্তলে প্রবেশ করছে। ছটফট করতে লাগল সে। অস্থির পায়ে ঘরের মেঝেয় পায়চারি করল কিছুক্ষণ। সেল্‌ফ থেকে একটা বই টেনে নিয়ে একটু পড়তে চেষ্টা করল। মনঃসংযোগ করতে পারল না। বই সরিয়ে রাখল। টেবিলের টানা খুলে দেখল নীল মলাটের মনোরম রাইটিংপ্যাড, সুন্দর একটা পেনও রয়েছে। নূতন। এবং যত্ন করে কলমে কালিটুকুও ভরে রাখা হয়েছে। কলম ও প্যাড নিয়ে সে টেবিলে বসল। যেন কিছু একটা মনে এসেছে। না, চিঠি না, ডাইরি না। অন্য কিছু। হঠাৎ সে ঠিক করতে পারল না, তার মনে এমন কি কথা এসেছে যে তাড়াহুড়ো করে সেটা লিখে ফেলতে চাইছে! কবিতা? কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা অট্টহাসি শুনল সে। চমকে উঠল। যেন তার বুকের ভিতর বসে কেউ ওভাবে হাসছে। শব্দটা সেখানে হচ্ছে। দু কান গরম হয়ে উঠল, তৎক্ষণাৎ কলমটা রেখে দিল সে। তার মনে পড়ল কেউ কবিতা লিখছে শুনলে প্রচণ্ড শব্দ করে সে হাসত। কবিকে ঠাট্টা করত। ফুটবল ক্রিকেটের জগতের মানুষ। কবিতা শব্দটা শুনলে সেদিন তার আর একটা শব্দ মনে পড়েছে। বণিতা। কেউ একজন কবিতা লিখছে যখনই শুনেছে তখনই সে কল্পনা করেছে মেয়েলী মন নিয়ে কবিনামধারী পুরুষটি নরম নরম কথা সাজিয়ে কিছু একটা লিখে যাচ্ছে। যেমন অজিত পুরকায়স্থ। পরিমলের সঙ্গে পড়ত। বড়োবড়ো চোখ। রোগা ফর্সা চেহারা। সুযোগ পেলেই পরিমল ঠাট্টা করত। কথার হুল ফুটিয়ে 'বেচারা কবিকে' আক্রমণ করত। দুবর্ল ভীরুপ্রকৃতির মানুষ কখনই রুখে উঠবে না বুঝতে পেরে পরিমলের ঠাট্টা সময় সময় সীমা ছাড়িয়ে যেত। একদিন অজিত আর সহ্য করতে পারল না। কেঁদে ফেলল। বড়ো বড়ো চোখ লজ্জায় অপমানে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল সত্য, কিন্তু সেই চোখ থেকে টসটস করে জল ঝরতে লাগল।

আজ পরিমল সেই মুখ দেখতে পাচ্ছে। সেই চোখ। সেই স্মৃতি।

অজিত কাঁদছে না। হাসছে। পরিমলের বুকের ভিতর বসে হো হো করে হাসছে। কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারে উঠে পটেশিয়াম সায়নাইড খেয়ে তরুণ কবি সুইসাইড করেছিল না? তা হলে হবে কী। পরিমলকে ঠাট্টা করতে অপমান করতে ঠিক সময় ফিরে এসেছে।

তারা ফিরে আসে।

অন্য অনেকের মতন অজিত পুরকায়স্থও যথাসময়ে এসে হাজির হল। প্যাড ও কলমটার দিকে করুণভাবে তাকিয়ে রইল পরিমল। তারপর তার ভয় করতে লাগল। এভাবে একলা বসে থাকা ঠিক না। কেননা, আরো কিছু কিছু মুখ একটা অন্ধকার ভারি পর্দা ঠেলে তার বুকের ভিতর ঢুকতে চেষ্টা করছিল। যেন তার ভিতরটা একটা স্টেজ। যেন কতকাল পর সেখানে প্রেক্ষাগৃহের আলো জ্বলে উঠেছে। পুরোনো পৃথিবীর মৃত জীবিত সব মানুষ অভিনয় করতে দলবেঁধে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করছে। পরিমল কাউকে বাধা দিতে পারছে না।

ঘর থেকে সে বেরিয়ে এল। দরজার পাল্লা দুটো জোরে টেনে দিল। একটু বেশি শব্দ হল। সচরাচর এতটা শব্দ করে এ বাড়িতে কেউ দরজা বন্ধ করে না। তাই এ ঘরে চমকে উঠে কান খাড়া করে ধরলেন। ওদিকের ঘরে রমলার কানেও শব্দ গেল। যেন রাগ করে কেউ দরজার পাল্লা টেনে দিল। তারপরও আর কোনো শব্দ হয় কিনা শুনতে রমলা কান পেতে রইল। অস্থির দ্রুত পায়ে পরিমল বাথরুমের দিকে ছুটে গেল। সেই শব্দ জগমোহনের কানে গেল; রমলাও শুনল। তারপর বেশ শক্ত হাতে জোরে ধাক্কা দিয়ে বাথরুমের দরজা খুলে কেউ ভিতরে প্রবেশ করল বোঝা গেল। তারপর জলের সোঁ সোঁ শব্দ। যেন ট্যাপের সব ক'টা প্যাঁচ খুলে দিয়ে মোটা ধারায় জল পড়তে দেওয়া হচ্ছে। তাই এখন দরকার পরিমলের—একটা ধারা না, সহস্র ধারায় জল পড়ুক। মাথাটা ট্যাপের নীচে বাড়িয়ে দিল সে। ঘাড়ে গলায় কানের খাঁজে চিবুকের তলায় সোঁ সোঁ করে প্রপাতের মতো প্রচুর জল নেমে আসুক। আঁজলা ভরে জল নিয়ে বার বার সে চোখে-মুখে ছিটোতে লাগল। যেন ধুলো-বালি পড়েছিল চোখে—যেন কত মাছি, ময়লা তার মাথায় ঘাড়ে গণ্ডদেশে লেগে ছিল। এখন সে পবিত্র হল, মুক্ত হল, স্নিগ্ধ হল। অত্যধিক জল ঢুকে চোখের ভিতর লাল হয়ে গেছে। তা হোক। ঘাড় সোজা করে পরিমল দেওয়ালের আয়নায় লাল চোখ দুটো দেখল। এই চোখ দেখলে অনেকেই ভাববে, পরিমল বুঝি উত্তেজিত ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠেছে। অথচ ঠিক তার বিপরীত জিনিসটা এখন তার মধ্যে ঘটল। উত্তেজনার অবসান হল, ক্রোধ প্রশমিত হল, বিরক্তি দূর হল। সে বিরক্ত হয়েছিল, ক্রুদ্ধও হয়েছিল। পঙ্গপালের মতন অসংখ্য স্মৃতি তাকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল। এখন সে শান্ত। তার চিত্তের স্থৈর্য ফিরে এসেছে। সবল হাতে সব প্রতিরোধ করতে পেরে সে আনন্দিত। আত্মশক্তির ওপর বিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠল। এই শক্তি সঞ্চয়ের জন্য কত চেষ্টা—কত সাধনা সে করেছে। তোয়ালে দিয়ে ঘাড় মাথা মুছে বাথরুম থেকে হৃষ্টমনে পরিমল বেরিয়ে এল।

পর পর অনেকগুলি শব্দ শুনে জগমোহন বিস্মিত হয়েছিলেন, বিরক্ত হয়েছিলেন। ঠিক একইভাবে বসে থেকে তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে উপর্যুপরি কয়েকটা অস্বস্তিসূচক শব্দও করেছেন তিনি। এদিকে তাঁর চেম্বারে যাবার সময় হয়ে গেছে। বার বার হাতের ঘড়ি দেখছেন। অথচ তিনি উঠতে পারছেন না। বাগানের ফুলগাছে জল দেওয়ার হাঙ্গামা চুকিয়ে ওপরে এসে বেরোবার জন্য তৈরি হবেন। এমন সময় একটার পর একটা দুপদাপ, হুটহাট, ছড়ছড় বিচিত্র সব আওয়াজ তার কানে আসতে লাগল। জগমোহন নিজে যখন হাঁটাচলা করেন, বাথরুমে ঢোকেন, কাজ সেরে সেখান থেকে বেরোন কী সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামেন,

ওপরে ওঠেন, তখন বেশ শব্দ-টব্দ হয়, তার ওপর তাঁর জোরালো হাঁচি, কাশি হাঁকডাক আছে। অর্থাৎ বোঝা যায়, অত্যন্ত সজীব আর শক্তিশালী কোনো পুরুষ বাড়িতে অধিষ্ঠান করছেন। তিনি ছাড়া আর কেউ এত শব্দ করে হাঁটে না, দরজা খোলে না, দোর বন্ধ করে না, কথা বলে না, হাসেও না। চাকর-দারোয়ান তো নয়ই, বাড়ির ছেলে পরিতোষও যেন কত সতর্ক সঙ্কুচিত হয়ে চলাফেরা করে, কথা বলে। তেমনি বউমা। শিশু নাতিটি ক্ষেপে গেলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তোলে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। কাজেই এখন এই সব শব্দ জগমোহনের কানে অবাস্তব, অসঙ্গত ঠেকছিল। তাঁর খারাপ লাগছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল, এত শব্দ করে মুখ-হাত ধোয়া, দরজা খোলা, দুমদুম করে হেঁটে যাওয়ার মধ্যে একটা অমার্জিত অসংস্কৃত মনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। যেন মানুষটার ঔদ্ধত্য, উচ্ছৃঙ্খলতা ভালো করে প্রকাশ পাচ্ছে। এবং এই ধরনের অবাঞ্ছিত অনাবশ্যক শব্দগুলি আরো কতক্ষণ স্থায়ী হয় শুনতে, একটা পাথুরে স্তব্ধতা নিয়ে তিনি কান খাড়া করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর ঘড়িতে ছ'টা পনেরো হয়েছে। অন্য দিন তিনি ছ'টা—ছ'টা দশের মধ্যে বেরিয়ে পড়েন। এবেলা সাড়ে ছ'টার মধ্যে তাঁকে চেম্বারে উপস্থিত থাকতে হয়।

কিন্তু রমলার মনের ভাব অন্যরকম।

পরিতোষের দাদা কতকটা সহজ স্বাভাবিক হতে পেরেছে।

এই দুদিন এত চুপচাপ ছিল। কখন ঘর থেকে বেরিয়েছে, বাথরুমে গেছে, বারান্দায় দাঁড়িয়েছে, বোঝা যায়নি। যেন সঙ্কোচ কাটছিল না। রমলার মনে হয়েছে, এ-বাড়ির ছেলে না সে, নবাগত কেউ, অমন একটা ভাব কিছুতেই পরিমল মন থেকে দূর করতে পারছিল না। নিজের উপস্থিতি বাড়ির মানুষকে টের পেতে দিতে কত যেন তার দ্বিধা, ভয়। রমলার খারাপ লাগছিল দেখে। এখন সে সুখী হল।

এ-বাড়ির ছেলে সে, জগমোহনের জ্যেষ্ঠ সন্তান, এই সংসারে তার কর্তৃত্ব, তার মর্যাদা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না—এই বোধ পরিমলের ফিরে এসেছে। তার মন দৃঢ় হয়েছে। চলাফেরার মধ্যে সেই দার্ঢ্যতা প্রকাশ পাচ্ছে। এখানে জগমোহনের পরেই যে তার স্থান, সেই সম্পর্কে পরিমল এখন সচেতন। এটা খুবই আশার কথা। রমলাও প্রতিমুহূর্তে তাই আশা করছিল।

জগমোহনের চেহারা বড়োছেলের। এবং প্রকৃতির দিক থেকেও দুজনের যথেষ্ট মিল আছে, এককালে ছিল, পরিতোষের মুখে রমলা কত দিন শুনেছে। কাজেই শ্বশুরমশায় যেমন করেন, পরিতোষের দাদাও বেশ শব্দ-টব্দ করে ঘরে বারান্দায় সিঁড়িতে চলাফেরা করবে, আবার বাথরুমে যাক কী বাগানে নামুক কী খাবার ঘরে ঢুকুক—কোনো কাজই চুপি চুপি শেষ করতে পারবে না, কোনো পুরুষের পক্ষে তা যেন সম্ভব না; মেয়েরা পারে—নীরবে কাউকে টের পেতে না দিয়ে কত কাজ যে তারা করে ফেলে। এই জন্য পৃথিবীতে হই-চই হট্টগোলের মাত্রাটা এখনো কম। যেদিন তারাও পুরুষদের মতন এক পা বাড়াতে গিয়ে কী কোনো কাজে হাত লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ করতে আরম্ভ করবে, সেদিন পৃথিবীর সব মানুষকে সারাক্ষণ কানে তুলো গুঁজে থাকতে হবে। পুরুষদের মধ্যে পরিতোষ বুঝি

ব্যতিক্রম। ভয়ংকর নিঃশব্দ তার গতিবিধি, টের পাওয়া যায় না, কখন টুক্ করে বাড়িতে ঢুকল, ঘরে ঢুকল, ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে গেল। তেমনি দাড়ি কামানো, মুখ-হাত ধোওয়া, স্নান করা, খাওয়া। শব্দ নেই। শব্দ করতে হয় জগমোহনের জন্য। তিনি কথা বলেন, পরিতোষও কথা বলে। তা না হলে বোঝা যেত না জগমোহন ছাড়া বাড়িতে দ্বিতীয় পুরুষ আছে। চাকর-দারোয়ানের কথা আলাদা। বাইরে তারা যেভাবে হাঁটাচলা করুক, কথা বলুক, হাসুক, মনিবের বাড়িতে তারা অন্য মানুষ। তাদের নীরব থাকতে হয়। মাথা গুঁজে, মুখ বুজে কাজ করে যেতে হয়। কিন্তু পরিতোষ মনিববাড়ির একজন কর্তা। হলে হবে কী, যেমন স্বভাব, চুপচাপ থাকার মধ্যে তার আনন্দ।

কিন্তু এখন বোঝা যাবে, বোঝা যাচ্ছে, শুধু জগমোহন না, আর-একজন মনিব, অত্যধিক সজীব সবল পুরুষ বাড়িতে আছেন।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে পরিমল যখন ঘরে যায়, গরাদের ফাঁক দিয়ে মানুষটিকে আর একবার চুরি করে দেখার লোভ রমলা সংবরণ করতে পারল না।

তোয়ালে দিয়ে মাথা মোছা হয়েছে। উস্কোখুস্কো, ভেজা চুল ফুলে আছে, কানের ওপর, কপালের ওপর কিছু ছড়িয়ে পড়েছে, আঁচড়ান হয়নি। জগমোহন হলে কাজটি বাথরুমেই সেরে আসতেন। বাথরুমে আয়না চিরুনি রয়েছে। তবে জগমোহনের মাথায় এখন ক'টা চুলই বা আছে। মাঝখানটা তো একেবারে ফাঁকা। মাথার পিছনে কানের কাছে ক'টি নরম নিস্তেজ ধূসর চুল কোনো রকমে টিকে আছে। তাদের পরিচর্যা করতেই বুড়োর কী অসীম আনন্দ আগ্রহ, মাথায় চিরুনি চালাতে জগমোহনের কখনও ক্লান্তি আসে না। পরিতোষের কিছু ঠিক থাকে না। হয়তো হাত দিয়েই ভেজা চুলটা চেপেচুপে ঠিক করে দিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। আবার ঘরে এসেও কোনোদিন মাথায় চিরুনি ঠেকাবার কথা ভুলে যায়। তার মাথার চুলের তেজ কম। রংটাও কেমন যেন মরাটে, পরিমলের মতন এমন ঝকঝকে কালো চুল না। এবাড়িতে পুরুষের মাথায় সত্যিকারের কালো পরিচ্ছন্ন চুল রমলা এখন দেখতে পেল। সন্ন্যাসী সুকোমল ধরতে গেলে বারোমাসই মাথা মুড়ে রাখে। তার চুলের রং কালো কী মেটমেটে রমলা আজও জানতে পারল না।

সে যাই হোক, কপালের ওপর কানের ওপর বিক্ষিপ্ত এলোমেলো কালো কোঁকড়া চুলের বোঝা, রক্তবর্ণ চক্ষু, কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতন দেখাচ্ছিল মানুষটাকে। এই মাত্র রমলার মনে আশা জেগেছিল। আবার সে হতাশ হল। মাথাটা সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে আছ, কিছু একটা চিন্তা করছে পরিতোষের দাদা বোঝা যায়। কী চিন্তা করছে? রমলার ভুরুতে অস্বস্তির রেখা জাগল। জগমোহনেরও এভাবে সামনের দিকে মাথা ঝুঁকে থাকে, যখন তিনি বাথরুম থেকে বেরোন। মনে হয় বাথরুমে থাকতে থাকতেই ভাবনার উদয় হয়েছিল। এখনও তার জের চলেছে। ভাবনা শেষ হয়নি। তিনি কি রুগীর কথা ভাবছেন? বিষয়সম্পত্তির কথা ভাবছেন? ছেলেদের কথা? আগে আগে রমলা এই নিয়ে ভাবত। কিন্তু একদিন সে খুব ঠকেছিল। তারপর থেকে শ্বশুরমশায় কখন কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন জানতে বুঝতে একটুও মাথা ঘামায় না। সেদিনের কথাটা মনে পড়লে তার এমন হাসি পায়। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন জগমোহন। অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত চেহারা। যেন সাংঘাতিক কিছু নিয়ে তিনি

মাথা ঘামাচ্ছেন। রমলা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে জগমোহন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন, পুত্রবধূর মুখের দিকে এক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে পরে তিনি হাসলেন।

'এই যে, বউমা—ভাবছিলাম, তোমাকে তো কথাটা বলা হয়নি, আমার দাদু ভয়ানক চটে গেছে। আমার সঙ্গে আর কথাই বলছে না।'

'কেন!' রমলা সশব্দ হেসে, ঘাড় হেঁট করে মাটির দিকে তাকাল।

'গাড়ি পছন্দ হচ্ছে না দাদুর। বলছে ওটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে।'

'ভীষণ দুষ্টু হয়েছে, আমায়ও বলছিল তখন, এই গাড়ি ভালো না। বড়ো না। ভেতরে বসা যায় না।'

জগমোহন এক সেকেণ্ড গম্ভীর থেকে আবার হাসলেন। কাল ফেরার পথে নাতির জন্য একটা দম দেওয়া মোটর গাড়ি কিনে এনেছিলেন। তিনি দু একবার ওটা চালিয়ে-টালিয়ে দেখার পর দীপু আজ সকাল থেকে রাগ করে বসে আছে. জগমোহনের সঙ্গে কথা বলছে না।

'আমি ওটা আলমারিতে তুলে রেখেছি।' রমলা বলল। এখন থেকেই যা জেদী একরোখা হতে আরম্ভ করেছে আপনার নাতি। এমন সুন্দর খেলনাটা ও ঠিক বাইরে ছুঁড়ে-টুড়ে ফেলে দেবে। ওকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই।'

'ওর দোষ কী বউমা।' জগমোহন নরম গলায় বললেন, 'সারাক্ষণ আমার গাড়ি দেখে ও। সময় সময় ওটাতে চড়েছেও, ওর মেজাজটা বড়ো গাড়ির হয়ে গেছে। সত্যি তো। ভেতরে বসে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে যদি গাড়ি চালাতে না পারল তো ওটা আবার একটা গাড়ি নাকি। তাই আমি এখন বাথরুমে বসে ভাবছিলাম, আজ ওর জন্য একটা ট্রাইসিকল কিনে আনতে হবে—না হলে দাদুর অভিমান ভাঙবে না।'

রমলা আর কিছু বলেনি। সেদিনই বিকেলে চেম্বার থেকে ফেরার পথে জগমোহন নাতির জন্য সুন্দর চকচকে ট্রাইসিকল কিনে এনেছিলেন। দীপু ওই গাড়ি পেয়ে খুশি হয়েছিল। কিন্তু রমলা সেদিন বার বার কথাটা চিন্তা করেছিল। শ্বশুরের মুখ দেখে তার মনে হয়েছিল, না জানি কী গুরুতর বিষয় নিয়ে ভাবতে ভাবতে তিনি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি যে নাতির গাড়ির বিষয় চিন্তা করছিলেন তাঁর চোখ-মুখের অবস্থা দেখে কে বুঝত! এখন পরিমলকে দেখে জগমোহনের সেদিনের চিন্তাক্লিষ্ট গম্ভীর মুখ রমলার মনে পড়ল। গভীর কিছু সাংঘাতিক কিছু ভাবছে পরিতোষের দাদা—তাই কি? খুব ছোটো জিনিস তুচ্ছ বিষয়, দীপুর খেলনার কথা না হোক, জেঠুমণির সঙ্গে বসে দুপুরে ভাত খেয়েছিল ভাইপো—তখনকার কোনো কথা নিয়ে কি পরিতোষের দাদা কিছু ভাবতে পারে না? কিন্তু রমলা যেন তা বিশ্বাস করতে পারল না.......নিশ্চিন্ত হতে পারল না। একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। হয়তো সত্যি গভীর কিছু ভাবছে পরিমল।

কী নিয়ে ভাবনা, কেন এই ভাবনা, রমলা চিন্তা করল। জগমোহনের মতন প্রশস্ত লোমশ পিঠ পরিতোষের দাদার। জগমোহনের পিঠে চর্বির চাকা চোখে পড়ে। এর গায়ের চামড়া টান মসৃণ উজ্জ্বল।

পরিমলকে আর দেখা গেল না, নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু তবু রমলার মনে হল, এই সংসারের কথা, এই পরিবারের কথা নিশ্চয়ই মানুষটি ভাবছে না। — সি আই টি এত নম্বর প্লটের বাড়ির মানুষগুলির চিন্তা ভাবনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে না ফেলতে যেন সে দৃঢ়সংকল্প। তেমন একটা দৃঢ়তার ছাপ তার চোখে মুখে ফুটে আছে। এই দৃঢ়তা এই স্বাতন্ত্র্য সন্ন্যাসী সুকোমলের চোখে রমলা দেখতে পায়; আর এক বৈরাগী আনন্দমোহনের ছবির সামনে রমলা যখন দাঁড়ায় তখন ছবির উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি তাকে মুগ্ধ করে অভিভূত করে। দুই চোখে একটা পবিত্র সঙ্কল্প, আধ্যাত্মিক তেজ, আত্মপ্রত্যয়ের হীরকদীপ্তি নিয়ে আনন্দমোহন তাকিয়ে আছেন। কিন্তু এখানে, যে মানুষটি এই মাত্র বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেল, রমলার মনে হল তার চোখে শুধুই আগুন বা সঙ্কল্প না, প্রত্যয়ের অনির্বাণ দীপশিখা ধরে রেখে শুধু আত্মচিন্তা আত্মানুসন্ধানের তপস্যা তার নয়, আরো কিছু সে চাইছে। কেবল আকশের আলোর দিকে দৃষ্টি না, যেন মাটির কাছে বনের অন্ধকার দেখে কখনো সে থমকে দাঁড়ায়। তাই তার চোখে কিছু ছায়া, কিছু মেঘ, কিছু অশ্রু। আনন্দমোহনের চোখে আলোর উৎসব স্বর্গের দীপ্তি—সুকোমলের চোখেও তাই। কিন্তু এই চোখে বিন্দু বিন্দু কান্না জমে আলোর ইন্দ্রধনু সৃষ্টি হয়েছে। আনন্দমোহন বা সুকোমলকে দেখলে পৃথিবীর শোক, তাপ, দুঃখ, জ্বালা, দু'দণ্ড ভুলে থাকতে হয়। কিন্তু এই মানুষকে দেখলে সব মনে পড়ে। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, মিলন-বিচ্ছেদ, আলো-অন্ধকার এখানে এসে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছে। যেন কিছুই সে অস্বীকার করে না—কাউকে দূরে সরিয়ে রাখে না। সে আনন্দ পেতে চায়, দুঃখ পেতে চায়। সে আলোর সাথি, অন্ধকারেরও সাথি। সে তৃপ্ত, আবার তৃষ্ণার্তও।

॥ ১১ ॥

সুটকেস-এর ডালা খুলে পরিমল খুশি হল।

কেবল কোট প্যাণ্ট শার্ট না। তার জন্য ধুতি পাঞ্জাবি ধুয়ে ভাঁজ করে রাখা হয়েছে। খাঁটি বাঙালী পোশাক। সিল্কের পাঞ্জাবি তাঁতের ধুতি গরদের চাদর। কতকাল পর এই পোশাকের কথা তার মনে পড়ল। রমলার কথামতো পরিতোষ দাদার জন্য ধুতি পাঞ্জাবি চাদর কিনে এনেছে। রমলাই মনে করিয়ে দিয়েছিল। পরিতোষের খেয়াল ছিল না। আজ কত বছর সে নিজেও ধুতি পরা ছেড়ে দিয়েছে। কাজে বেরোবার সময় তাকে টাইস্যুট পরতে হয়। কোথাও বেড়াতে যাবার সময়ও এই পোশাক। কারো বাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেও কোট প্যান্ট বা শার্ট প্যান্ট। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ঢিলে পায়জামা এবং শার্ট বা গেঞ্জি। কিন্তু দশ বারো বছর আগে তারা যখন কলেজে যেত, বেড়াতে যেত, তখন ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি শান্তিপুরী ধুতি না হলে তাদের মন উঠত না। আজ ছেলেরা আর এই পোশাক পরে না। পরিতোষ তো দেখছে। শার্ট প্যান্ট পরে তারা স্কুল কলেজ করে, খেলা দেখতে যায়, সিনেমা দেখতে ছোটে, পিকনিক করতে বেরোয়। ধুতি পাঞ্জাবি সেকেলে হয়ে গেছে।

দশ বছরে অগ্রগতির সঙ্গে পরিমলের পরিচয় নেই।

রমলা ঠিকই অনুমান করেছে।

সেদিনের আধুনিকতা পরিমলের চোখে আজও আধুনিক রয়ে গেছে। যত্ন করে কাছা দিয়ে সে ধুতি পরল, পাঞ্জাবি গায়ে চড়াল। চারদরটা অবশ্য আর গলায় জড়াল না। জড়াতে পারলে সে খুশিই হত। কিন্তু কারো বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছে না সে এখন, কোনো সভায় বা অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে যাচ্ছে না। এমনি বেড়াতে বেরোচ্ছে। রাস্তায় বেরোচ্ছে। আয়নায় নিজের ধুতি পাঞ্জাবি পরা মূর্তি দেখে সে সন্তুষ্ট হল। ভদ্রলোকের বেশ। কাল থেকে সে ট্রাউজার পরে আছে। বাড়িতে জগমোহনও এই পরেন, পরিতোষেরও এই পোশাক। অবশ্য এখানে এসে পোশাক নিয়ে যে পরিমল খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছিল তাও না। কিন্তু এখন বাড়ি থেকে বেরোবার সময় পোশাকের কথাটা সে চিন্তা করল। ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া অন্য পোশাক পরে বেরোতে তার মন উঠল না। পাউডারের কৌটা থেকে খানিকটা পাউডার ঢেলে নিয়ে ঘাড়ে গলায় ছড়িয়ে দিল। স্নান করে এসে, জামা পরার আগেই এ কাজটা শেষ করা উচিত ছিল যদিও। কিন্তু তার খেয়াল ছিল না, মনে ছিল না। এক কালে সে প্রচুর পাউডার গায়ে মাখত। বিশেষ করে গরমের সময়। চিরদিন তার ঘাম বেশি। শরতের সন্ধ্যায়, এখনও সে ঘামছিল। কপালটা বেশি ঘামছে। বড়ো বড়ো ঘামের ফোঁটা ঝুলে আছে ভুরুর ওপর। বুকের ভিতর একটা ধাক্কা অনুভব করল সে। প্রায় এক ডজন মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। চোখ কান নাক থুঁতনির রেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে, ঝাপসা হয়ে গেছে। সব মুখ এক রকম দেখাচ্ছে। কিন্তু মুখ না, এখানে কপালটা প্রধান। এক ডজন কপালের ছবি স্পষ্ট প্রখর হয়ে তার চোখের সামনে ভাসছে। সরু কপাল, চওড়া কপাল, চৌকো মতন কপাল, গোল কপাল—চেপ্টা, যেন মাঝখানে গর্ত হয়ে আছে এমন কপালও আছে। কোনো কপালের শিরা দড়ির মতন মোটা। যেন সব সময় শিরাটা দপ্ দপ্ করছে নড়ছে। কোনো কপালে সরু মোটা অসংখ্য শিরা। চামড়া দেখা যায় না। যেন শিরার জাল বোনা কপাল। একটা কপালের বাঁ দিকে এত বড়ো একটা মাংসের গুলি। মনে হয় শক্ত কোনো কিছুর সঙ্গে ঠোকা লেগে কপালটা এই মাত্র ফুলে উঠেছে । কিন্তু এই ফোলা চিরকালের ফোলা। মাংসের গুলিটা কোনোদিনই ওখান থেকে নড়বে না, ছোটো হবে না, বড়ো হবে না। এক রকম থাকবে। একটা কপালে মস্ত কাটা দাগ। যেন চামড়া কেটে গিয়ে কবে প্রকাণ্ড ঘা হয়েছিল। ঘা শুকিয়ে গেছে, চামড়া কালো হয়ে গেছে কিন্তু জায়গাটা আজও হাঁ করে আছে। একটা কপালের চামড়ায় অসংখ্য কুঞ্চন অগুণতি রেখা। যেন খেজুর কাঁটা দিয়ে কপালটা কে আঁচড়ে দিয়েছিল। হয়তো একদিন রক্ত ঝরেছিল। আজ রক্ত ঝরছে না। ঘাম ঝরছে। ঘামের ফোঁটাগুলি বড়ো বড়ো হয়ে ভুরুর কাছে ঝুলছে। কাঠ-ফাটা চৈত্রের রোদ। জেল ইয়ার্ডের এক ধারে জড়ো করে রাখা বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই। হাতুড়ির ঘা বসিয়ে বসিয়ে তারা পাথর ভাঙছে। গাছ আছে, ছায়া আছে। গাছের ছায়া কয়েদিদের জন্য না, সেপাইদের জন্য। ছায়ায় বসে সেপাইরা ঝিমোয় বিড়ি ফোঁকে। পাথর ভাঙার শব্দ থেমে গেলে হাতের রুল মাটিতে ঠুকে তারা হৈ-হৈ করে ওঠে। কারো কপালের ঘাম শুকিয়ে গেছে দেখতে সেপাইরা মোটেই রাজি না। শুকনো কপাল দেখলে তারা রাগ করে, গালিগালাজ করে। কপাল বেয়ে আবার ঘাম ঝরুক, ভুরুর কাছে ঘামের ফোঁটা টলটল করুক। সেপাইরা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ঝিমোবে, বিড়ি ফুঁকবে।

সেই ছবি পরিমলের মনে পড়ল।

কিন্তু আয়নার ভিতর ছবিটা বিসদৃশ।

কপালে ঘাম। অথচ গায়ে ফিনফিনে আদ্দি, পরনে জরিপাড় শান্তিপুরী। ডোরা কাটা জাঙ্গিয়া নেই, ফতুয়া নেই। গলায় টিকিট ঝুলছে না। ঘামটা এখানে মানায় না। কিছুটা আহত হয়ে, লজ্জা পেয়ে পরিমল আরো খানিকটা পাউডার হাতের তেলোয় নিয়ে কপালে ঘষল। তারপর টেবিলের টানা খুলে সুদৃশ্য মনিব্যাগটা তুলে নিল। চামড়ার ওপর সুন্দর কাজ করা। কাল বিকেলে জিনিসটা তার চোখে পড়েছে। কিন্তু হাতে নিয়ে দেখেনি, প্রয়োজনবোধ করেনি বা ভিতরে কী আছে না-আছে জানতে তার কৌতূহলও হয়নি। আজ সকালে পরিতোষ বলছিল, ড্রয়ারে তোমার হাত খরচের টাকা আছে, একটা ব্যাগের মধ্যে পাবে—একটু থেমে পরিতোষ আবার বলছিল, চামড়ার ওই ব্যাগটা রমলা পছন্দ করেছিল তোমার জন্য—ছোটো বড়ো নানা ডিজাইনের মনিব্যাগ দেখিয়েছিল দোকানী। দেখলাম রমলা যেটা বেছে নিল সেটাই সবচেয়ে সুন্দর।

এখন সেটা হাতে নিয়ে পরিমল নেড়েচেড়ে দেখল। মনে মনে ভ্রাতৃবধূর পছন্দের প্রশংসা করল। বোতাম খুলে ভিতরটা দেখল। ভাঁজ করা কিছু কারেন্সি নোট।

একটা সূক্ষ্ম রেখা জাগল পরিমলের ভুরুর মাঝখানে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে রেখাটা মিলিয়েও গেল।

না, এই নিয়ে এখনই সে খুব একটা ভাবছে না। কিন্তু তা হলেও ভাবনাটা আছে। টাকা পয়সা বড়ো বিশ্রী জিনিস। খুন জখম লাঠালাঠি চুরি ডাকাতি হিংসা বিদ্বেষ অপমান অপমৃত্যু—পৃথিবীর চৌদ্দ আনা অপরাধ অশান্তি ঐ একটা জিনিস নিয়ে। কত অশান্তি অপরাধের গল্প শুনে এল পরিমল—অপরাধীদেরও দেখে এসেছে; এখানে অবশ্য সেসব কিছু না, তা হলেও বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের মতন সূক্ষ্ম চিন্তাটা পরিমলের মগজের কোষে কামড় দিয়ে গেল।

এই টাকা কার? তার হাত খরচের জন্য জগমোহন দিয়েছেন? না কি পরিতোষের রোজগারের টাকা?

যেন হঠাৎ সে ঠিক করতে পারছিল না, বাবা ভাই—এই দুজনের মধ্যে কার টাকা জানতে পারলে সে সেটা হৃষ্টমনে গ্রহণ করতে পারে, নিশ্চিন্ত হয়ে খরচ করতে পারে। অর্থাৎ দুজনের মধ্যে কে পরিমলকে টাকাটা দিয়ে সুখী? তাই কি?

না, কেবল এইটুকু চিন্তা নিয়ে পরিমল সন্তুষ্ট হতে পারল না। ব্যাগটা হাতের মুঠোয় ধরে রেখে সে আরো কিছু ভাবল। পাউডার লাগান সত্ত্বেও কপালটা ঘামছিল। টাকা এমন বিশ্রী। অগত্যা সে ব্যাগটা পকেটে পুরল। যেমন ছেলেবেলায়, উপমাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেদিনকার ছবিটাও তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভীষণ খোয়া উঠে থাকত তাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটায়, পরে অবশ্য সেটা পিচের রাস্তা হয়েছিল, চকচকে মসৃণ রাস্তায় খালি পায়ে হেঁটে গেলেও পায়ে আর লাগত না; কিন্তু যতদিন খোয়া ছিল অন্যমনস্ক হয়ে চলতে গিয়ে কত যে সে হোঁচট খেয়েছে, আঙুলের চামড়া ছড়ে গিয়ে দর দর করে রক্ত বেরোত, যন্ত্রণায় উঃ করে উঠে পা-টা চেপে ধরত। কিন্তু কতক্ষণ? হয়তো এক মিনিট, তা-ও না, ব্যথা ভুলে গিয়ে আবার সে ছুটত, ঘুড়ি ধরতে ছুটত, ব্যাণ্ডের শব্দ শুনে বিয়ের

মিছিল দেখতে ছুটত। এখনও তাই হল। ক্লেশ ভুলে থাকতে হল, মগজের মধ্যে চিন্তার কামড়টা তাকে হজম করতে হল। পরিমল ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সিঁড়িটা অন্ধকার হয়ে গেছে।

কিন্তু নীচে নেমে আবার গোধূলির আলো দেখতে পেল সে।

জগমোহনের গাড়ি গ্যারেজের বাইরে দাঁড় করানো।

এখনও তিনি বেরোননি। পরিমল অনুমান করল।

এখনও তিনি কেন অপেক্ষা করছেন, ওদিকে চেম্বারে রুগীরা ডাক্তারবাবুর পথ চেয়ে বসে আছে, অনেক কিছু ভাবতে পারত পরিমল।

কিন্তু আর কোন ভাবনা তাকে পীড়ন করতে পারল না।

গোধূলির আকাশ দেখে সে মুগ্ধ হল। শরতের বিকালের স্নিগ্ধ নির্মল বায়ু তার মনকে চিন্তাভাবমুক্ত করে তুলল।

যে রাস্তা ধরে জগমোহন প্রতিদিন প্রাতর্ভ্রমণ করেন সেই রাস্তা ধরে পরিমল হাঁটতে লাগল। রাস্তার পাশের রাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়া গাছগুলির পাতায় পাতায় অন্ধকার জমতে আরম্ভ করেছিল। ঝিঁঝি ডাকছিল। জেল থেকে বেরিয়ে, এই কলকাতায়, এমন জনশূন্য একটা পথে সে হাঁটতে পারবে তার ধারণা ছিল না। যখনই রাস্তার কথা চিন্তা করত, ভিড়ের ছবি দেখত সে, রাস্তার দুপাশে উঁচু উঁচু বাড়ি আকাশ ঢেকে রেখেছে, সারাক্ষণ কলরব, ব্যস্ততা।

এখানে সেসব নেই। এখনো হয়নি। পরে হবে। বাড়ির জটলা, ভিড়, কলরব। না, তা হবে না। বাড়ির সংখ্যা বাড়বে, আকাশ ঢাকা পড়বে না। ভিড় বাড়বে, কিন্তু পথ চলতে গিয়ে গায়ে গা লাগবে সেই সম্ভাবনা কম। কাল বিকেল, আজ সকালে পরিতোষ তাকে তাই বুঝিয়েছে। গাড়ি ঘোড়া চলার জন্য এতটা জায়গা, মানুষ চলার জন্য এতটা জায়গা—এত ফুট জমি ফাঁক রেখে রেখে প্রতিটি বাড়ি—সুতরাং এই অঞ্চলের চেহারা কোনোদিনই ভবানীপুর হবে না, কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোড হবে না। বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ নিয়ে আমরা গর্ব করি। কিন্তু এখানকার ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট পার্ক ময়দান লেক ইত্যাদি আরও উন্নত আধুনিক পরিকল্পনা সামনে রেখে তৈরি হচ্ছে।

কিন্তু এখন জায়গাটা বড়ো বেশি স্তব্ধ নীরব নির্জন।

এই নির্জনতার এই প্রশান্তির প্রয়োজন ছিল নাকি পরিমলের।

জেল-জীবনের তৃতীয় বছর থেকে তার নির্জনতা নিঃসঙ্গতার সাধনা আরম্ভ হয়েছিল। এর মধ্যেই সে ভুলে গেল? সেখানেও ভিড় ছিল কলরব ছিল। যথেষ্ট বেগ পেতে হত তাকে নিজের মধ্যে এক শান্ত স্থির নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ জগৎ গড়ে তুলতে। এই জন্য সময় সময় সে নিষ্ঠুর কঠিন হয়েছে। উপায় ছিল না। জেলখানায় এসে এক অপরাধী আর এক অপরাধীকে বন্ধুর মতন, আত্মীয়ের মতন দেখে। সেই হিসাবে পরিমলের আত্মীয় বন্ধুর সংখ্যা সেখানে কম ছিল না। পরিমল যে তাদের ঘৃণা করত অবজ্ঞা করত তা নয়। তাদের সঙ্গে সে গল্প করত হাসত মেলামেশা করত। কিন্তু একটা সময়—অন্তত কিছুক্ষণ তাকে নির্লিপ্ত উদাসীন থাকতে হত। কঠিন মৌন থেকে সে নিজের ভিতরের সেই একাকীত্বের অন্ধকারে ডুব দিত। সে উপলব্ধি করত, সেখানে একটা বীজ লুকিয়ে আছে। সেটাকে বাঁচাতে হবে, বাইরের রুক্ষ আলো ও কলরবের জগৎ থেকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে। বীজ

একদিন অঙ্কুরিত হবে। অঙ্কুরিত হবে, তারপর পত্রোদগম হবে। তারপর ধীরে ধীরে গাছ বাড়বে, বড়ো হবে। তারপর একদিন শাখা প্রশাখা বিস্তার করে সবল সুন্দর বৃক্ষ আকাশ আলিঙ্গন করবে। তখন আলোর আকাশ তার সাথি, মেঘের আকাশ তার সাথি।

তবে আর মেঘ দেখে পরিমল আজ মন খারাপ করছিল কেন? জগমোহন মুখ ভার করে আছেন? পরিতোষ ভালো করে কথা বলছে না? ছোটো ছেলের মতন অভিমানে তার বুক ভার হয়ে উঠেছিল? একটু আগে? দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে? ছেলেবেলার টুকরো টুকরো ছবি চোখের সামনে ভাসছিল? বাবার হাত ধরে এক বিকেলে বেড়াতে বেরোনো। হঠাৎ মেঘ করে বৃষ্টি নামল। শুরুতেই এত বড়ো বড়ো ফোঁটা পড়ছিল যে দেখতে দেখতে দুজন ভিজে গেল। ছুটে গিয়ে কারো বাড়ির বারন্দায় বা রকে উঠে আশ্রয় নেবে তার উপায় ছিল না। কেননা ধারে কাছে কোনো বাড়িই ছিল না। রেল লাইনের ধারের মাঠের ওপর দিয়ে তারা হাঁটছিল। জলের মধ্যে ছুটতে ছুটতে মাঠটা পার হয়ে দুজন রাস্তায় উঠেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কি রিক্সা পাওয়া যায়। রিক্সা ট্যাক্সি কিছুই চোখে পড়ছিল না। অগত্যা একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দুজন নূতন করে ভিজতে আরম্ভ করল। বৃষ্টি পড়ছিল, তার ওপর তখন এলোমেলো হাওয়া দিতে শুরু করেছে। ঝরঝর করে গাছের সব জল মাথায় পড়তে লাগল। প্রায় দশ মিনিট পর একটা রিক্সা পাওয়া গেল। তাড়াহুড়ো করে রিক্সায় উঠতে গিয়ে চাকার ওপরের সেই বাঁকানো টিনের ঢাকনার একটা কোণা লেগে পরিমলের বাঁ হাতের চামড়া ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল। ছেলের হাতের রক্ত দেখে জগমোহনের সে কী উদ্বেগ দুশ্চিন্তা। ডাক্তার মানুষ। তৎক্ষণাৎ আইডিন ডেটল যা হোক কিছু একটা লাগিয়ে ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা করা গেল না। অবশ্য বাড়ি ফিরে ভেজা জামাকাপড় নিয়েই তিনি পরিমলের হাত ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন, একটা এন্টি-টিটেনাস ইনজেকশনও যেন দিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু রিক্সার সেই পাঁচ সাত মিনিটের পথ অস্থির জগমোহন যে কী করে কাটিয়েছিলেন, পকেট থেকে রুমাল বার করে ছেলের হাতে সেটা জড়িয়ে দিয়ে হাতটা তিনি কোলের কাছে ধরে রেখেছিলেন আর বার বার পরিমলের মুখের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন, ব্যথা হচ্ছে? যন্ত্রণা হচ্ছে? যেন প্রশ্ন করতে গিয়ে জগমোহন কেঁদে ফেলেছিলেন। তাঁর দুই চোখ ছলছল করছিল। হ্যাঁ, এই জগমোহন। তার বাবা। বাবার ছলছল চোখের দৃষ্টি পরিমলের আজ বড়ো বেশি মনে পড়ল। পরিতোষের কী হয়েছিল? একদিন স্কুলের ছুটির পর দু-ভাই খাতা বই বগলে বাড়ি ফিরছে। রাস্তায় একটি ছেলের সঙ্গে কী নিয়ে পরিতোষের কথা কাটাকাটি হল। পরিতোষের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত সেই ছেলে—সুদিন—ঝপ করে সুদিনের চেহারাটাও মনে পড়ল পরিমলের। ফর্সা রং, চেপ্টা নাক, খাড়া খাড়া চুল, কটা রঙের চোখ দুটো। কেমন যেন বেড়ালের মতন দেখাত সুদিনকে। কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি আরম্ভ হয়ে গেল। একটা পেন্সিলের সীস দিয়ে সেই বেড়ালমুখো সুদিন পরিতোষের কপালটা ফুটো করে দিল। পরিতোষের কপাল থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। ব্যস, আর যায় কোথায়, বাঘের মতন হুঙ্কার ছেড়ে পরিমল লাফিয়ে পড়ল সুদিনের ঘাড়ের ওপর। আঁচড়ে কামড়ে কিল ঘুষি মেরে সেদিন সুদিনের কী অবস্থা করে তুলেছিল সে! কত বয়স ছিল তাদের তখন। যেন ক্লাস ফোর ফাইভে পড়ত, পরিমলের বুঝি ক্লাশ সিক্স ছিল সে বছর।

না, কেবল সুদিনের ঘটনা কেন? সারাটা স্কুল-জীবন। স্কুলে, রাস্তায়, খেলার মাঠে ছায়ার মতন আগলে রাখত ছোটো ভাইটিকে। রোগা পটকা পরিতোষ অন্য ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করে সুবিধা করতে পারত না। অথচ ছেলেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকত। কি, সেদিন যদি কেউ পরিতোষকে আক্রমণ করেছে পরিমল তার প্রতিশোধ তুলতে, আক্রমণকারীকে সমুচিত শিক্ষা দিতে যে-কোন বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে গেছে। প্রতিপক্ষ দল ভারি হলেও পরিমল ভয় পেত না, পিছিয়ে আসত না। সঙ্গী না পেলে একলা হাতেই লড়েছে। দাদাকে ছেড়ে পরিতোষ এক পা চলতে সাহস পেত না। দাদা তার রক্ষক, বন্ধু, সর্বসময়ের সাথি। ধূসর অতীতের সব স্মৃতি দূরান্তের নক্ষত্রের মতন অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে আছে। তা হলেও এক একটা নক্ষত্র উজ্জ্বল হয়ে কখন জানি ছুটে এসে চোখের সামনে জ্বলতে থাকে। সুদিনকে আজ বড়ো বেশি মনে পড়ছিল পরিমলের। নাদুসনুদুস ফর্সা চেহারা, কটা রঙের চোখ। কোথায় আছে এখন কে জানে। স্কুলের গণ্ডী পার হতে পারেনি। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে একটা দর্জির দোকানে কাজ শিখত যেন। আশ্চর্য, কলেজে ঢুকে কিন্তু সুদিনের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল পরিমল। তারপরও একটা যুগ গেছে, একদিনও তাকে মনে পড়েনি। আর ছোটো ভাই পরিতোষ? দাদার হাত ধরে এখন তাকে রাস্তায় বেরোতে হয় না; শক্ত সমর্থ সক্ষম স্বাবলম্বী পুরুষ, রাসভারি ইঞ্জিনীয়ার।

না, শুধু মেঘ থাকবে কেন। স্বচ্ছ দীপ্ত আকাশে কি আলো দেখতে পাচ্ছে না পরিমল!

জগমোহনের চোখে ভয় সন্দেহ, অবিশ্বাসের অন্ধকার; পরিতোষের চোখে, ক্লান্তি হতাশা উদ্বেগ অশান্তি। তা হলেও চতুর পরিতোষ অনেক কথা বলেছে। জমির দর, বাড়ির প্ল্যান, মেটিরিয়াল জোগাড় করার হয়রানি, লেবার কস্ট, বেটারমেন্ট ফি, একটার পর একটা কথা দিয়ে ভিতরের উদ্বেগ অশান্তি ঢেকে রাখতে বেচারা কম চেষ্টা করেছে কি। পরিমল টের পেয়েছে। এখন সে মনে মনে হাসল।

কিন্তু আর একটি চোখ?

সেই চোখে আশা আনন্দ উৎসাহ, শুভ ইচ্ছা ও স্থির বিশ্বাস ছাড়া আর তো কিছু দেখল না সে।

ভোরের আকাশের মতন উজ্জ্বল সুন্দর সুকোমলের চোখ।

তাই তো আশা করেছিল পরিমল।

তার আকাশে আলো থাকবে, মেঘও থাকবে। জগমোহন পরিতোষ থাকবে, আবার সুকোমলও তার জন্য অপেক্ষা করবে।

আত্মার অন্ধকারে একটা বীজ সে লালন করছিল। সেটা অঙ্কুরিত হয়েছিল তার জেল-জীবনের প্রায় সাতটা বছর কেটে যাওয়ার পর। যেদিন সে পিয়ারীলালকে আবিষ্কার করল। অন্ধকারে বসে আলোর সাধনা করছে আত্মভোলা শিল্পী। কাঠ কয়লা দিয়ে সেল-এর দেওয়ালে ছবি এঁকে চলেছে একটার পর একটা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। ফুল পাখি মাছ চাঁদ নারীর মুখ।

পরিমল সেদিন নিশ্চিন্ত হল। তার সংশয় দূর হল। বীজটাকে সে চিনতে পারছিল না, অঙ্কুরোদগমের পর সে চিনতে পারল, বুঝল, সত্য ও সুন্দরের প্রতীক এই গাছ।

যেভাবেই হোক কিছু সত্য, কিছু সৌন্দর্য তার মধ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তাই থেকে এ-গাছের জন্ম।

আনন্দে উত্তেজনায় বিশ্বাসে অনুরাগে তার অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল।

অবশ্য কিছুদিন থেকেই সে অনুভব করছিল, তার মধ্যে একটা কিছুর উন্মীলন ঘটছে, একটা সুন্দর জিনিস বিকশিত হচ্ছে। তখন চৈত্রের শেষ। জেলখানার পশ্চিম পাঁচিলের কাছে দুটো কৃষ্ণচূড়া গাছ আকাশ লাল করে রেখেছিল। তার ভয়ানক ইচ্ছা হত ওখানে ছুটে যায়। দুই চোখ ভরে কৃষ্ণচূড়ার রক্ত সমারোহ দেখে। কিন্তু একটা কিছু তাকে বাধা দিত, ধরে রাখত; convict, দণ্ডিত আসামী সে। অপরাধীর জগতের মানুষ হয়ে কী করে ওই সুন্দর পবিত্র ফুলের অরণ্যে গিয়ে দাঁড়াবে। সেখানে যাবার অধিকার তার নেই। প্রথম দুদিন সে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করল। তৃতীয় দিন তার ইচ্ছার জয় হল। ভিতরের হীনতাবোধ হেরে গেল। কে যেন তার কানে কানে বলল, সুন্দরকে কাছে পাবার, পবিত্রের সমীপবর্তী হবার অধিকার সকলেরই আছে, ঘৃণ্যতম অপরাধীরও আছে। আসল কথা হল, অনুরাগ। যদি সত্য তোমাকে আকর্ষণ করে, সুন্দর তোমাকে মুগ্ধ করে তো বুঝতে হবে তুমি ভাগ্যবান। তোমার ওপর ভগবানের করুণা বর্ষিত হচ্ছে। তোমার মুক্তি আসন্ন, তোমার অন্তরের শুদ্ধি আরম্ভ হয়েছে। আর তোমার ভয় নেই।

পরিমল আর দ্বিধা করল না। পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়া গাছের কাছে চলে গেল। ঘাড় বেঁকিয়ে অনেকক্ষণ ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকল। না, কেবল ফোটা ফুলের শোভা সে দেখল না, সেই সঙ্গে অনেক কিছু দেখল। গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের কলি দেখল। অর্ধস্ফুট হয়ে আছে কিছু। এখনো সবুজ কোমল কুঁড়ি রয়ে গেছে।—এমন কলিরও অভাব নেই। ফুলের মতন কৃষ্ণচূড়ার নধর চিকন মসৃণ উজ্জ্বল পাতার রাশিও তাকে কম মুগ্ধ করল না। কী গভীর সবুজ রঙ! তার চোখের পলক পড়ছিল না। হাওয়ায় প্রত্যেকটা পাতা কাঁপছে। যেন গাছের সর্বাঙ্গে আনন্দের শিহরণ বয়ে যাচ্ছে। শাখা প্রশাখা আন্দোলিত হচ্ছে। কেনই বা আনন্দ হবে না, পরিমল চিন্তা করল, কেবল সজ্জিত শোভিত বর্ণাঢ্য হয়েই তো কৃষ্ণচূড়া গাছ ক্ষান্ত থাকেনি, পরিতৃপ্ত হয়নি—মধু বিলোচ্ছে, অমৃত পরিবেশন করছে। কত শত পাখি এসে উড়ে বসেছে ডালে ডালে। তারা কলরব করছে। মধুলোভী মৌমাছির ঝাঁকও পরিমলের চোখে পড়ল। একটা উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে কৃষ্ণচূড়ার বনে।

পরিমলের রোমাঞ্চ উপস্থিত হল, চোখে জল এল।

মহতের সব ক'টি গুণ এই গাছের মধ্যে দেখতে পেল। একদিকে যেমন অগাধ রূপ অমেয় সৌন্দর্য গাছের প্রতি অঙ্গে বিচ্ছুরিত, তেমনি তার দয়া দাক্ষিণ্য প্রেম পরহিতব্রতেরও বুঝি তুলনা নেই। গাছের ঋজু সুঠাম কাণ্ড বেয়ে ধূসর বর্ণের কাঠবিড়াল ক্রমাগত ওঠানামা করছে। এখানে তারা নিঃশঙ্ক, তারা জেনে গেছে এই গাছ তাদের পরম আশ্রয়। তেমনি গুঁড়ির কাছে একটা ফোকরের মধ্যে কিছু লাল পিঁপড়ে বাসা বেঁধেছে। নিশ্চিন্ত মনে তারা সেখানে ঘরসংসার করছে। অসংখ্য সাদা সাদা ডিম পরিমলের চোখে পড়ল। মনে মনে সে হাসল এবং যুক্তকর হয়ে বিশাল বনস্পতিকে প্রণাম জানাল।

পাঁচিলের ওদিকটায় কয়েদিদের যাওয়ার নিয়ম ছিল না, সেপাইদের অনেক অনুরোধ উপরোধ জানাবার পর দু-তিন দিন মাত্র পরিমল সেখানে যেতে পেরেছিল। কিন্তু তার ইচ্ছা করত রোজ ওই কৃষ্ণচূড়া ফুল গাছ দুটোর নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। ইয়াসিন, গুরুবচন সিং, সিরাজুদ্দিন, টমাসকেও সেখানে ডেকে নিয়ে যায়। ওই সুন্দর ফুলের গাছ তারাও দেখুক। তাদের ভিতরের গ্লানি দূর হবে। মনের পরিবর্তন হবে। কিন্তু সকলকে সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এইজন্য তার দুঃখ হত।

বহরমপুর জেলের বিশালকায় কৃষ্ণচূড়া গাছ এখন তার চোখের সামনে নেই। কিন্তু সেই গাছের স্মৃতি তার হৃদয়ে দৃঢ়মূল হয়ে আছে। সেরকম একটা গাছই সে অন্তরে লালন করছে। এখনো ছোটো আছে, গাছের শৈশব কাটেনি। একদিন বড়ো হবে। আকাশে শাখা প্রশাখা বিস্তার করবে। চৈত্র মাসে প্রচুর পুষ্পসমাগম হবে। সেদিন উৎসবের দিন। সার্থকতার দিন। না, কেবল মধূৎসব কেন। বর্ষার মেঘাবৃত আকাশের নীচেও সে সার্থক সুন্দর। সেদিনও সে মহাপ্রাণ। বনস্পতি তাকে এই শিক্ষা দিয়েছে। পরিমল আর একবারও জগমোহনের অনাদর, উপেক্ষা, পরিতোষের ঔদাসীন্যের কথা ভাবল না। গায়ে মাখল না। তার হৃদয়ের প্রশস্ততা সকল অবস্থায় অটুট থাকবে এমন একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে দৃঢ় পা ফেলে সে হাঁটতে লাগল।

কিছু দূর পর্যন্ত রাস্তায় আলো ছিল।

তারপর অন্ধকার। বসতি একরকম নেই বলে এখনো বাকি পথটুকুতে আলোর ব্যবস্থা করা হয়নি। দু পাশে সারি সারি খুঁটি পোঁতা হয়েছে, পরিমল দেখতে পেল, ইলেকট্রিক তার খাটানো হয়নি। অন্ধকার পথে তার হাঁটতে ভালো লাগছিল। কিছুটা অগ্রসর হবার পর সে থমকে দাঁড়াল। এতক্ষণ ঝিঁঝির ডাকটা অস্পষ্ট ছিল। এখন সেই শব্দ স্পষ্ট প্রখর হয়ে উঠল। যেন খুব কাছে কোথাও বন জঙ্গল আছে। গাছের পাতা, লতাগুল্মের ঘন গন্ধ তার নাকে লাগল। না, সেই গন্ধের চেয়েও স্নিগ্ধ মিষ্টি একটা গন্ধে বাতাস ভরে উঠেছে। পরিমল জোর শ্বাস নিল। এবার সে গন্ধটা টের পেল, চিনল। কোথাও শিউলি ফুটেছে, এখনো ফুটছে, সন্ধ্যা হতে শিউলি ফুটতে আরম্ভ করে তার মনে পড়ল। তাই গন্ধটা এত টাটকা। কতকাল পর টাটকা শিউলির গন্ধ নাকে লাগল। তিনটে জেল ঘুরেছে, কোথাও সে শিউলি গাছ দেখল না। ভুলে গিয়েছিল পৃথিবীতে এমন সুন্দর একটা ফুল আছে। একডালিয়া রোডের বাড়ির বারান্দায় সিঁড়ির কাছে একটা গাছ ছিল। সন্ধ্যায় ফুল ফুটতে আরম্ভ করত, শেষ রাত থেকে টুপটাপ সব ঝরে পড়ত। বারান্দা, সিঁড়ি—সিঁড়ির নীচের ঘাস সাদা হয়ে থাকত। একটু বেলা হতে চাকর ঝাঁট দিয়ে এক জায়গায় সব ফুল জড়ো করে তুলে নিয়ে বাইরে রাস্তার পাশে কোথাও ফেলে দিয়ে আসত। কিন্তু ঠাকুর্দা জীবিত থাকতে এমন অনাচার বাড়িতে কখনো ঘটতে দিতেন না। ফুলের গায়ে ঝাঁটা লাগাচ্ছে, দেখলে আনন্দমোহন হয়তো খেপে গিয়ে চাকরকে খুন করতেন। সেই ভোর রাত্রে তিনি উঠে পড়তেন। একটু একটু মনে আছে পরিমলের। ছোটো ছেলের মতন হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে আনন্দমোহন হাত দিয়ে কাছিয়ে ফুলগুলি এক জায়গায় জড়ো করতেন। বারান্দা সিঁড়ি বা সিঁড়ির নীচে ঘাসের ওপর কোথাও একটা ফুল পড়ে থাকত না। যত্ন করে সব কুড়িয়ে নিয়ে তিনি মালা গাঁথতে বসতেন। তারপর

স্নান করে এসে সেই মালা তাঁর ঘরের ঠাকুর দেবতার ফটোগুলির গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে পূজা করতে বসতেন। আবার জগমোহনের আমলেই দেখা গেল সেই ঝরে পড়া শিউলির কত অনাদর উপেক্ষা। তখন সেগুলি আবর্জনার সামিল। তাই ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা।

একই জিনিস। ফুল। এর বেলায়ও দুটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির কত পার্থক্য!

আর কোনোদিন বিষয়টা নিয়ে পরিমল চিন্তা করেনি, আজ করল। পিতা পুত্র। তা হলেও ভিন্ন প্রকৃতির দুটি মানুষ—জগমোহন আনন্দমোহন তার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল। একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল সে। তারপর আরো দু'পা অগ্রসর হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

প্রাচীর ঘেরা প্রশস্ত বনভূমি তার চোখে পড়ল। প্রবেশদ্বারে টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে। ভিতরটা গাছপালায় নিবিড় অন্ধকার হয়ে আছে। পরিমল এগোতে লাগল। তার ভয়ানক কৌতূহল হল। নিশ্চয় ওখানেই কোথাও শিউলি ফুটেছে। কিন্তু একটা শিউলি গাছ না, সে অনুমান করল, অনেক গাছ এই প্রাচীরের ভিতর রাশি রাশি ফুল ফোটাচ্ছে। তাই গন্ধটা এত মিষ্টি এত তীব্র। পাতার সরসর শব্দ হচ্ছিল। পাখির অস্ফুট মধুর কূজন কান পাতলে শোনা যায়। যেন অনেক পাখি ওই নির্জন শান্ত বনে বাসা বেঁধেছে। দিনের শেষে ঘরে ফিরে এসে পরিতৃপ্ত শান্ত পাখিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে। সেই শব্দও পরিমল শুনতে পেল। বাগান না, বাগান-বাড়ি না; প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত, পরিমলকে কেউ বাধা দিল না। ভিতরে ঢুকে সে বুঝতে পারল কোথায় এসেছে।

কেয়ারি-করা সরু পরিচ্ছন্ন একটা পথ ধরে আস্তে আস্তে সে হাঁটতে লাগল। ঝোপ ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকি জ্বলছে। যেন যুগ যুগান্তের স্মৃতি, স্বপ্ন ও ঘুম নিয়ে ছোটো বড়ো গম্বুজ ও খিলান দেওয়া অসংখ্য সমাধি বনভূমির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এক জায়গায় পরিমল স্থির হয়ে দাঁড়াল। ছোটো একটা আলো জ্বলছে। যেন কেউ সন্ধ্যাবেলা আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। ধূপকাঠি জ্বলছে। সমাধির শিয়রের কাছে ক্ষীণাঙ্গী কিশোরীর মতন নূতন একটা শিউলি গাছে ফুল ফুটেছে। যেন এ-বছরই প্রথম ফুল ফুটল। দুধের মতন সাদা সমাধি-প্রস্তরের গায়ে কিছু একটা লেখা রয়েছে। পরিমল স্থির চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

In loving memory of Begam Rabeya Khatoon who answered the call of her Lord at the premature age of 20, on July 7, 1960.

চোখের জল দিয়ে লেখা দু লাইনের ছোটো একটা কবিতা। কার চোখের জল? কে ওই পাথর বসিয়ে গেছে? পাথরের গায়ে তা-ও লেখা রয়েছে। রাবেয়ার শোকসন্তপ্ত স্বামী। পরিমল স্তব্ধ হয়ে রইল।

মাথার ওপর প্রকাণ্ড বুকল গাছে ঘন পাতার ঝোপের ভিতর একটা পাখির ছানা চিঁচিঁ করছে। দূরে কাছে আর কোনো শব্দ নেই। একটা গভীর নিশ্বাস ফেলল সে এবং কথাটা চিন্তা করে কেমন রোমাঞ্চিত হল। দীর্ঘ কারাবাসের পর বাড়ি এসে এই প্রথম আজ তার বাড়ির বাইরে আসা। আর কোথাও গেল না তো সে, অন্য কোনোদিকে তাকাল না। ফুলের গন্ধ পেয়ে ফুল খুঁজতে এক সুন্দর নির্জন দেশে চলে এসেছে—স্মৃতি স্বপ্ন ও ঘুমে ভরা এক আশ্চর্য জগৎ।

না কি এই তার নিয়তির নির্দেশ!

চঞ্চল জীবনের কাছে ছুটে যাবার আগে সে গম্ভীর মৃত্যুকে দেখবে। মৃত্যুকে মনে রাখবে। বিমূঢ় হয়ে ভাবল পরিমল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশের নীচে অসংখ্য ডালপালা ছড়িয়ে কত গাছ দাঁড়িয়ে আছে। একটু আগে সে বনস্পতির কথা চিন্তা করছিল; তারা তাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসেছে। জীবনের সাক্ষী, মৃত্যুর সাক্ষী এইসব গাছ। গাছের মাথায় পক্ষিশাবক মায়ের বুকের তাপ পেয়ে সুখে গুঞ্জন করছে। নবজীবনের ছবি। বৃক্ষমূলে অন্য দৃশ্য। অশ্রু ও বেদনা জমাট বেঁধে আছে। একটি অকালমৃত্যু। তরুণী রাবেয়া চিরনিদ্রায় শায়িত।

জীবন ও মৃত্যুর এমন ঘনিষ্ঠ চিত্র পরিমল আগে দেখেনি; একই সঙ্গে জীবন ও মৃত্যুকে এমন নিবিড়ভাবে সে অনুভব করেনি।

গোরস্থানের গাছগুলির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করল সে এবং আরো কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে স্থির অপলক চোখে অন্ধকার ও চঞ্চল জোনাকিদের মৃঢ় আনন্দ উৎসব দেখল। তাই হয়। পরিমল বুঝতে পারল, জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে অনেক আবিলতা, অনেক মূঢ়তা এমনি ঘোরাফেরা করে। তাদের পাখা আছে, মনোহর আলো আছে।

॥ ১২ ॥

নিজের চোখ দুটোকে জগমোহন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

পরিমল বাড়ি থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুপদাপ শব্দ করে সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে গেলেন। বারান্দায় দাঁড়ালেন। বারান্দা থেকে রাস্তা দেখা যায়। কিন্তু ততটুকু দেখা নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। আরো অগ্রসর হলেন। গেট্ পর্যন্ত ছুটে গেলেন। এবং শেষটায় গেট্ পার হয়ে রাস্তায় দিয়ে দাঁড়ালেন।

খোলা রাস্তায় মুক্ত হাওয়ার ঝলক তাঁর চোখে মুখে লাগল। অন্য সময় হলে তিনি পরিতৃপ্তির গাঢ় নিশ্বাস ফেলতেন। অস্ফুট একটা 'আঃ' শব্দ তাঁর মুখ দিয়ে বেরোত।

এবং অধিকতর হাওয়ার লোভে তিনি ঘুরে দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন।

এখন 'আঃ'-এর পরিবর্তে একটা যন্ত্রণার 'ইস্' শব্দ বাতাসের মতন শব্দ করে তাঁর দৃঢ়বদ্ধ দুই ঠোঁটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

তিনি দু হাতে চোখ রগড়ালেন।

যেন মুক্ত পরিস্রুত হাওয়ার স্রোত তাঁর কাছে বিরক্তিকর।

দক্ষিণ দিকে পিঠ রেখে তিনি উত্তরমুখো হয়ে দাঁড়ালেন।

সেই পথ। জগমোহনের পথ। যেটা সল্ট্-লেক পর্যন্ত চলে গেছে। যে পথ ধরে তিনি প্রতিদিন প্রাতর্ভ্রমণে বেরোন এবং ভ্রমণ শেষ করে প্রচুর জীবনীশক্তি ও আনন্দ নিয়ে গৃহে ফেরেন।

তাঁর সেই প্রিয় রাজপথ হঠাৎ একটা আতঙ্কের ছবিতে পরিণত হল।

সেরকম চেহারা করে জগমোহন রাস্তাটা দেখছিলেন।

রাস্তায় একটি মানুষ আছে। তার পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। এমন কোঁচা লুটানো ঢিলেঢালা জামাকাপড় পরা বাঙালী যুবক দশ পনেরো বছর আগে হলে মানাত। এই যুগে এই পোশাক,

এই ফ্যাশন অচল। পরিতোষের সঙ্গে কেনাকেটা করতে বেরিয়ে রমলার যে ধুতি-পাঞ্জাবির দিকে নজর যাবে জগমোহনের ধারণা ছিল না। কোট প্যান্ট শার্ট পায়জামার সঙ্গে সেরকম কিছু পোশাকও দু এক জোড়া না হয় কিনে আনা হয়েছিল। বাক্সে পড়ে থাকত। কিন্তু এখন বেরোবার সময় ঠিক এই পোশাকটি শ্রীমানের ভালো লাগল—

জগমোহন দাঁতে দাঁত চাপলেন।

পোশাকটা বড়ো কথা না—এই ধরনের বেশভূষা নিয়ে রাস্তায় বেরোনোর পিছনে যে মনস্তত্ত্ব কাজ করছে সেটাই আসল। এবং চট করে সেটা তিনি পড়ে ফেললেন, বুঝে গেলেন। সেই অধিকার তাঁর আছে।

তিনি পিতা. জন্মদাতা।

দশ বছর জেলে কাটিয়ে আসুক বা যেখান থেকে আসুক—এখন আবার তাঁর সামনে এসেছে ছেলে। তার মেজাজ মন রুচি ইচ্ছা তিনি যত চট করে বুঝবেন অন্যে তা পারবে কেন? পারার কথা না। পারা উচিতও না। ভাইও ভাইয়ের মন সব সময় বুঝতে পারে না। ভাই জিনিসটা কী? আমরা তিনি ভাই—তার মানে একটি গাছের তিনটি ফল, বা একই গাছের তিনটি ফুল। এক গাছে দুরকম স্বাদের ফল ফলে. দু রঙের ফুল ফোটে, সেই দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এই সংসারের দিকে তাকালেই তা চোখে পড়ে। একই পিতামাতার সন্তান—একজন খুনী, একজন সন্ন্যাসী। কাজেই তখন জগমোহন যা-ই চিন্তা করে থাকুক, এখন তিনি বেশ বুঝতে পারছেন, সন্ন্যাসী কনিষ্ঠ ভাই তার অগ্রজকে মোটেই চিনতে পারেনি—তার মনের গঠন ও পরিমলের মনের গঠনের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। পরিমলের মনের ভিতর প্রবেশ করা সুকোমলের সাধ্য না। ওপর ওপর হয়তো দুটো ভালো কথা, সুন্দর কথা বড়োভাইয়ের মুখে শুনেছে এবং তাই শুনে যদি সে মনে করে থাকে দাদা বদলে গেছে, অন্য মানুষ হয়ে গেছে তো সেই ভুল সংশোধন করবে কে? আর নিরীহ গোবেচারা মানুষ—যে ধর্মকর্মের মধ্যে নেই রক্তারক্তির মধ্যেও নেই—মনে প্রাণে গৃহী সংসারী, ছাপোষা পরিতোষের পক্ষে পরিমলকে বোঝা সম্ভব না। এবং যেখানে ভাই ভাইকে বুঝতে পারে না, অন্য আত্মীয়স্বজন কতটুকু বুঝবে। বুঝতে পারে একমাত্র বাপ-মা।

কিন্তু মা তো অনেকদিন আগেই স্বর্গে গেছেন। সরযূর কথা মনে পড়তে জগমোহন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আবার হঠাৎ যেন কুপিতও হয়ে উঠলেন। অভিমান ও আক্রোশে তাঁর মন পূর্ণ হয়ে উঠল। সমস্ত দায়দায়িত্ব আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে আর একজন দিব্যি হাসতে হাসতে ইহসংসার ছেড়ে চলে গেল, মুক্ত হয়ে গেল—এখন আমাকে সব যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে, হোঁচট খেতে হচ্ছে, মাথার চুল ছিঁড়তে হচ্ছে, বুক চাপড়াতে হচ্ছে।

জগমোহনের দুই চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। অবোধ চঞ্চল শিশুর মতন গেট্ পার হয়ে আবার তিনি বাড়িতে ঢুকলেন এবং তেমনি দুপদাপ শব্দ করে ওপরে উঠে গেলেন।

চাকর দারোয়ান হাঁ করে তাকিয়ে দেখল। কর্তার পোশাক পরা হয়ে গেছে। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করা হয়েছে। অথচ তিনি বেরোচ্ছেন না। রাস্তায় ছুটে গিয়ে তখনি ফিরে এলেন।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রমলাও শ্বশুরকে দেখছিল। ছেলেমানুষের মতন ছুটোছুটি করছেন। এই মাত্র পরিমল বেরোল। এই প্রথম আজ বাড়ি থেকে বেরোল। ধুতি-পাঞ্জাবিতে চমৎকার

মানিয়েছে ভাশুরকে। টাইস্যুট না পরে পরিতোষের দাদা এই পোশাক পরে বাইরে গেল দেখে ভিতরে ভিতরে সে খানিকটা গর্ববোধ করল, খুশি হল। কেননা নিজে পছন্দ করে রমলা পাঞ্জাবির কাপড়টা কিনে এনেছে।

বাড়ি এসে বড়োছেলে এই প্রথম বেড়াতে বেরোচ্ছে দেখবেন বলে কি জগমোহন নিজে বেরোতে পারছিলেন না? একটা নূতন জিনিস? দেখে আনন্দিত হওয়ার মতন, নিশ্চিন্ত নির্ভয় হতে পারার মতন দৃশ্য? কেনই বা তা না হবে। রমলা চিন্তা করল। যদি পরিতোষের দাদা সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকত, গম্ভীর হয়ে থাকত, আজও বাড়ি থেকে না বেরোত তো দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। মানুষটা স্বাভাবিক হতে পারছে না, এই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না, দীর্ঘদিন জেলে থেকে তার মন—হ্যাঁ, অনেক কিছু মনে হতে পারত, অনেকদিন জেল খাটলে মন মেজাজ বিগড়ে যায়, এমন কী কারো কারো মধ্যে ইন্‌স্যানিটি পর্যন্ত দেখা দেয়—জেলখানাকে সংশোধনাগার বলা হয় সত্য, কিন্তু সংশোধনের পরিবর্তে কেউ কেউ নানারকম বিকৃতি পারভারশন নিয়ে বেরিয়ে আসে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সুতরাং পরিমল যে বিকেল পড়তে স্নান করে ধোয়া জামাকাপড় পরে আর পাঁচটি সুখী যুবকের মতন বেড়াতে বেরোল এটা খুবই আশার কথা—সুলক্ষণ; খুশি হয়ে শ্বশুরমশায় বুঝি তাই দেখতে রাস্তা পর্যন্ত ছুটে গেলেন।

কিন্তু জগমোহন যখন ফিরে এসে রমলার সামনে দাঁড়ালেন তাঁর চেহারা দেখে সে হতাশ হল। পরিমলকে বাইরে যেতে দেখে তিনি মোটেই খুশি হননি বোঝা গেল। বরং একটু আগে তাঁর চোখে মুখে দুশ্চিন্তা উদ্বেগের ঘনঘটা দেখতে পেয়েছিল রমলা। এখন যেন তা শতগুণে বেড়ে গেছে। যেন শ্বশুরের বুকের ভিতর বিক্ষোভ অশান্তির ঝড় বইতে আরম্ভ করেছে। রমলা ভয় পেল।

'কোথায় গেল সে, বউমা, এই অবেলায় কোথায় বেরোল?' জগমোহনের গলার স্বর কাঁপছিল।

রমলা চুপ করে রইল।

পরিতোষের স্ত্রীকে এই প্রশ্ন করা যে নিরর্থক তা কি তিনি জানেন না! ভাশুরের সঙ্গে রমলা এখন পর্যন্ত ভালো করে কথাই বলেনি। বা পরিতোষের দাদাও যে ছোটো ভাইয়ের স্ত্রীকে আদর করে কাছে ডেকে এই সংসারের কথা কী রমলার বাবা-মা ভাই-বোনদের সম্পর্কে একটা দুটো কথা জানতে চেয়েছে—বা রমলা, কোন কলেজে পড়েছিল, আর পড়াশোনা করার ইচ্ছা ছিল কিনা, নূতন বাড়িতে এসে এ-পাড়াটা তার কেমন লাগছে, স্নেহের পাত্রীকে কতরকম প্রশ্নই তো করা যায়—কিন্তু সেসব কিছুই এখন পর্যন্ত হয়নি, এমন কী রমলা যখন পরিবেশন করছিল, খেতে বসে ভাশুর কাল বা আজ অন্তত তার রান্না ঘরকন্না সম্পর্কেও এক-আধটা কথা তার সঙ্গে বলেনি। হ্যাঁ, দীপুর সঙ্গে কথা বলেছে—অনেক কথা বলেছে—ভাইপোকে আদর করে নিজের পাতের মাছটা মাংসের টুকরোটা খেতে দিয়েছে। এই পর্যন্ত।

'বউমা—' ছুটোছুটি করার দরুণ জগমোহন হাঁপাচ্ছিলেন। 'তুমি চুপ করে আছ কেন?'

কোমল স্থির চোখ দুটো মেলে ধরে রমলা শ্বশুরের মুখ দেখছিল। সে বুঝতে পারল, শ্বশুর তাকে প্রশ্ন করছেন না—একটা নালিশ নিয়ে এসেছেন, যেন পরিমলের হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরোনোর ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখছেন না, তাই হাতের কাছে রমলাকে পেয়ে

তার কাছে অভিযোগ জানাতে ছুটে এসেছেন। বাড়িতে পরিতোষ বা সুকোমল থাকলে তিনি তাদের কাছে আগে যেতেন।

'আজ তো তিনি প্রথম বেরোলেন', রমলা শান্ত গলায় বলল, 'সারাক্ষণ ঘরের ভেতরে ভালো লাগছিল না, তাই হয়তো একটু রাস্তায় হাঁটতে গেছেন।'

'উঁহু', জগমোহন প্রবলবেগে মাথা নাড়লেন। 'হাঁটবার ইচ্ছা হলে আমার লনে চমৎকার হাঁটা যেত, আমার এত বড়ো বাগান, বাগানে বেড়ানো যেত—ছাদে উঠে দিব্যি হাওয়া খাওয়া চলে, তা বলে এমন কোঁচা ঝুলিয়ে গিলে করা পাঞ্জাবি চড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরোনোর দরকার পড়ত না।'

রমলা আবার নীরব হয়ে রইল।

'না, তুমি আর কী করে বুঝবে—' গলার স্বর গম্ভীর করে তুললেন জগমোহন। 'আমি বুঝি—আমার ছেলেকে আমি চিনি। এমনি কোঁচা দুলিয়ে আদ্দির পাঞ্জাবি ঝুলিয়ে শ্রীমান রোজ লেকের হাওয়া খেতে গেছে—সেখানে বন্ধুরা অপেক্ষা করত, বান্ধবীরা বসে থাকত। আবার সেই হাওয়া তাকে টানছে—দশ বছর খেটে এসেছে—কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি এই ছেলের এতটুকু পরিবর্তন হয়নি, আজও সেই কলেজী দিনের রোমান্সের স্বপ্নই দেখছে।'

'না, এখন আর সেই বন্ধুদের তিনি কোথায় পাবেন।' অল্প হেসে রমলা বুঝি শ্বশুরকে সান্ত্বনা দিতে চাইল। বান্ধবী শব্দটা সে অবশ্য ব্যবহার করল না। 'বন্ধুরা যে যার কাজকর্ম নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছেন। বিয়ে-থা করে সবাই এতদিনে নিশ্চয় সংসারী মানুষ সেজে গেছেন—এখন কী আর সকলে এক জায়গায় জড়ো হয়ে গল্প করার আড্ডা দেবার সময় পান।'

জগমোহন পূর্ববৎ মাথা দোলাতে লাগলেন। পুত্রবধূর কথায় তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। যেন কারো কোনো সান্ত্বনা বা প্রবোধবাক্য শুনে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন হতে তিনি রাজি নন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পর্কে তাঁর মনে যে-ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে তাই অকাট্য অব্যর্থ—তাঁর এই ধারণা কেউ কোনোদিন বদলে দিতে সক্ষম হবে তা-ও তিনি বিশ্বাস করেন না।

'এখান থেকে ঢাকুরিয়ার সেই লেক অনেক দূর—রোজ সেখানে বেড়াতে যাওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।—' রমলা বিড়বিড় করে বলতে আরম্ভ করেছিল। বিকৃত গলায় জগমোহন হঠাৎ হেসে উঠলেন।

'ঢাকুরিয়া লেক অনেক দূর, কিন্তু আমাদের এই নারকেলডাঙ্গায় নতুন লেক তৈরি হচ্ছে—তোমরা তো সেদিন দেখে এসেছ; হুঁ, সন্ধ্যাবেলা হাওয়া খেতে লেকের অভাব হবে না। পুরোনো বন্ধুরা নেই, নতুন বন্ধুর দল জুটিয়ে নেবে আমার ছেলে, নতুন বান্ধবীদের আবিষ্কার করবে। সেই প্রতিভা তার আছে। ক্লাব লাইব্রেরী পিকনিক পার্টি এসব ছাড়া যে তার একদিনও চলবে না।' জগমোহনের হাসি নিভে গেল, কিন্তু চোখ মুখের বিকৃতিটা থেকে গেল। রমলার চোখের সামনে বদ্ধমুষ্টি হাত দুটো শূন্যে তুলে নাচাতে নাচাতে তিনি বললেন, 'স্পোর্টস্‌ম্যান—চিরকাল খেলাধূলা ভালোবেসেছে, সুতরাং খেলার নেশা ছেলে ছাড়তে পারবে কেন, সবরকম খেলায় সে অভ্যস্ত—ফুটবল ক্রিকেট হকি ভলিবল ওয়াটারপোলো থেকে শুরু করে তোমরা ঐ যাকে বল হৃদয় নিয়ে প্রাণ নিয়ে জীবন নিয়ে খেলা—'

এ পর্যন্ত বলে জগমোহন হঠাৎ থেমে যান। উত্তেজনার প্রাবল্যে তিনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন বুঝতে পেরে একটু বিব্রত বোধ করেন। একবার চোখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকালেন, তারপর কেমন লজ্জিত বিষণ্ণ গলায় ধীরে ধীরে বললেন, 'না, বলছিলাম তোমরাও একদিন কলেজে পড়েছিলে—তুমি পড়েছ, পরিতোষ পড়েছে—কত ছেলেমেয়ে তোমরা দেখেছ, প্রীতি ভালোবাসা—ইংরেজীতে যাকে লভ্ বলে, তোমাদের সময়েও একটু-আধটু ছিল, থাকাটাই স্বাভাবিক—এটা তেমন কিছু একটা দোষের—অপরাধের না—যৌবনের ধর্ম—দুটি তরুণ-তরুণীর মধ্যে হৃদয় বিনিময়—কিন্তু তা বলে এই জিনিস নিয়ে এমন উন্মত্ততা—কাণ্ডজ্ঞানহীনতা—' যেন জগমোহন পায়ে মাথায় শিউরে উঠলেন। আবার একটু সময় চুপ থেকে পরে ফিসফিস করে বললেন, 'পরিতোষের মুখে নিশ্চয় শুনেছ—ঐ একটা মামলায় ক' হাজার টাকা আমাকে ঢালতে হয়েছিল—আবার যদি তেমন কিছু একটা—আমি কি সাধে ভয় পাচ্ছি বৌমা—আমি যে ঘরপোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলে আত্মা শুকিয়ে যায়।'

'না, আপনি এখনি এমন অস্থির হবেন না। এতটা চঞ্চল ব্যস্ত হওয়া আপনার পক্ষে ঠিক না। প্রেসারের রুগী। সবে তো তিনি বাড়ি এসেছেন। দেখা যাক না। আপনার মেজোছেলের সঙ্গে কথা বলে দেখুন। দুজনে পরামর্শ করে—'

জগমোহন মাথা নেড়ে লম্বা নিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন।

'তোমায় বলেছি তখন—এই ব্যাপারে সে শিশু। আমি আমার সন্তানদের চিনি—তাদের প্রত্যেকের মনের চরিত্রের নাড়ি নক্ষত্র আমার মুখস্থ। পরিতোষ কী বলবে আমি কি জানি না। তার যেন ইচ্ছা তার দাদা আবার কলেজে ভর্তি হোক বা বাড়িতেই পড়াশোনা করুক—মাঝে মাঝে এই নিয়ে তার সঙ্গে আমি কথা বলেছি। পরিতোষের মনের ভাব আমার জানা হয়ে গেছে।'

রমলা যে তা শোনেনি এমন না।

দু বছর আগে পরিতোষ এই বলত। দাদা বাড়ি এসে কী করবে এই নিয়ে সে সময় সময় খুব ভাবত এবং রমলার সঙ্গেও কথা বলত। যেন পরিতোষের ইচ্ছা, তার দাদা যদি বিদেশে গিয়ে সেখানকার কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে চায় তো পরিতোষকে সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। খরচের কথা চিন্তা করে জগমোহন যদি রাজি না হন তা পরিতোষই তার দাদার ফরেন যাবার ও সেখানে থেকে পড়াশোনা করবার টাকা জোগাড় করবে। যেভাবেই হোক এই ব্যবস্থা তাকে করতে হবে। কারণ সে চাইছে, তাব দাদার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল, সেটা যাতে পূর্ণাঙ্গ হয়, সুসম্পূর্ণ হয়। তা ছাড়া জেল থেকে বেরিয়ে এসে এমনি বাড়িতে বসে না থেকে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে পরিমলের মনও ভালো থাকবে। আর এটাও তো সত্য কথা এ বাড়ির বড়ো ছেলে অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত থেকে যাবে—জিনিসটা বড়ো অশোভন অস্বস্তিকর ঠেকবে। সকলের কাছেই খারাপ লাগবে। পরিমল চিরকাল কিন্তু এমনি ঘরে বসে থাকবে না। যা হোক একটা কিছু কাজকর্ম নিয়ে তাকে থাকতে হবে। কিন্তু এইটুকুন বিদ্যা নিয়ে এ বাজারে বড়োজোর একটা মার্চেন্ট অফিসের কেরানি হতে পারবে সে। কী পরিতোষ তার ফার্মেও ঢুকিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তাও সাধারণ কেরানিগিরি বা ঐ জাতীয় কাজই হবে—না, পরিতোষ কখনই তা হতে দেবে না। দাদার সফল সুন্দর জীবন দেখতে চায় সে—প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি নিয়ে একটি উজ্জ্বল বিশিষ্ট মানুষ।

হ্যাঁ, পরিতোষের দু বছর আগের চিন্তাভাবনা এগুলি। ভবিষ্যতে দাদা কী করবে না করবে তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা।

কিন্তু এদিকে, এই দু বছর পরিতোষ এসব কথা আর তেমন বলত না। মুক্তির দিন এগিয়ে আসছে—আগে দাদা বাড়ি আসুক, তারপর দেখা যাবে, তখন চিন্তা করা যাবে এ বিষয়ে কতটা কী করা যায়। একদিন পরিতোষ রমলাকে বুঝিয়েছিল। কিন্তু তখন থেকে রমলা বেশ বুঝতে পারছিল, পরিমলের কারামুক্তির দিন যত নিকটবর্তী হচ্ছিল, দাদা সম্পর্কে কিছু কিছু বিশ্বাস ধারণা এবং দাদা বাড়ি এলে তার জন্য কী করা হবে না-হবে ভেবে পরিতোষ এতদিন যে সকল জোরালো সঙ্কল্প ও ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করে আসছিল সেগুলি ক্রমশ শিথিল দুর্বল হয়ে পড়ছিল। এই বয়সে পরিমলের যে লেখাপড়ায় মন বসবে তার ঠিক কী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির মোহ তার কাছে এখন হাস্যকর তুচ্ছ মনে হতে পারে—তেমনি একটা ফুল, আগে ভালোবাসত, এখন না-ও বাসতে পারে; জামার একটা বিশেষ রং, দশ বছর আগের পছন্দ আজও রয়ে গেছে তোমায় কে বললে! দাদার রুচি-অরুচি পছন্দ-অপছন্দ ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্বন্ধে পরিতোষের মনে নানা সংশয় সন্দেহ জাগছিল। রমলা লক্ষ্য করত।

জগমোহন যে পরিতোষের সেই দু বছর আগের সঙ্কল্পটাই উল্লেখ করেছেন সে বুঝতে পারল।

'উঁহু—কলেজ-টলেজে ভর্তি হওয়া আর চলবে না। তার কলেজে ভর্তি হওয়া মানেই আবার সেখানে নায়কের রোল নেওয়া। বিস্তর বন্ধু সেখানে, বান্ধবীরা আছেন। পড়াশোনার লাইনেই তাকে আর থাকতে দেওয়া অন্যায় হবে। বাড়িতে পড়াশোনা করতে দিলেও সেই একই প্রশ্ন। কত তরুণ-তরুণীর আনাগোনা আরম্ভ হবে এই সরযূধামে। অর্থাৎ আবার সেই অবাধ মেলামেশা, ক্লাব পিকনিক, হৈ-চৈ, রোমান্স প্রেম। না, কিছুতেই এ জিনিস এলাউ করা চলবে না। আমি চাইছি তাকে কঠোরতার মধ্যে কৃচ্ছ্রতার মধ্যে রাখতে। তাই সন্ন্যাসী ছোঁড়াকে বলেছিলাম—কিন্তু—'

জগমোহনের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল।

তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন। চেম্বার থেকে কম্পাউণ্ডার অনুকূল কথা বলছিল।

'হুঁ, আমি এক মিনিটের মধ্যেই বেরোচ্ছি।' কম্পাউণ্ডারকে আশ্বাস দিয়ে টেলিফোন নামিয়ে রেখে তিনি তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

'আমি চললাম বউমা, অনেক দেরি হয়ে গেল। পেশেণ্টরা অধৈর্য হয়ে পড়েছে।' রমলা নীরব থেকে ঘাড় কাত করল।

'না, এমন করলে পসার টিকবে না। সমস্ত রুগী হাতছাড়া হয়ে যাবে।' ক্লান্ত বিষণ্ণ গলা শ্বশুরের। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়েও তিনি আর একবার পুত্রবধূর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। 'বুঝেছ বউমা—অত্যন্ত মন্দ সময় আরম্ভ হয়েছে আমার।'

রমলা এবারও শব্দ করল না।

শ্বশুর নীচে নেমে গেলেন। রমলা কান পেতে থাকল। গাড়িটা বেরিয়ে গেল।

প্রায় চল্লিশ বছরের প্র্যাক্‌টিস। অনেক অর্থ উপার্জন করেছেন তিনি। কত রুগী তাঁর চিকিৎসার গুণে বেঁচে উঠল, আবার তাঁর চিকিৎসায় থাকতে থাকতে মারা গেছে এমন রুগীর সংখ্যাও কম হবে না। সময় সময় জগমোহন তাঁর দীর্ঘ চিকিৎসকজীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী

রমলাকে শোনান। কত বিচিত্র রোগ, কত বিচিত্র রুগী এই জীবনে দেখলেন। কঠিন ব্যাধি. অথচ রুগী হাসছে—তার যে রোগ হয়েছে এই কথাটাই সে বিশ্বাস করতে চায় না। ওষুধ খেতে দিলে ফেলে দেয়। বলে, যদি অসুখ হয়েই থাকে এমনি সেরে যাবে। কিন্তু অসুখ সারল না। ভুগে ভুগে একদিন মৃত্যুর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তখনও সে নির্বিকার উদাসীন। বলে, নিয়তিকে রুখবে কে। সময় হয়েছে, মরব। ডাক্তারের সাধ্য নেই ওষুধ খাইয়ে আমায় বাঁচিয়ে রাখে। আবার উল্টোটাও দেখেছেন জগমোহন। অতি সাধরণ রোগ। ওষুধ খাবার দরকার হয় না। একটু নিয়ম করে চললে, খাওয়া-দাওয়ায় সাবধান হলে রোগ সেরে যায়। কিন্তু রুগী তা শুনবে কেন। তার বিশ্বাস, কঠিন রোগে সে আক্রান্ত। যে কোনো দিন, যে কোনো সময়ে তার মৃত্যু ঘটতে পারে। মৃত্যু ভয়ে অস্থির সেই মানুষ সারাজীবন ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে—আর নিত্য নূতন চিকিৎসকের দরজায় হানা দিচ্ছে। আরো ভালো ডাক্তার চাই, আরো বড়ো ডাক্তার দেখাতে হবে। হ্যাঁ, সেই আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ রোগে মরল না। মৃত্যু হল অন্যভাবে। জগমোহনকে তার শেষ দেখানো। গুনে গুনে ভিজিটের বত্রিশটা টাকা টেবিলে রেখে বড়ো ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনটি পকেটে পুরে খুশি মনে চেম্বার থেকে বেরিয়ে যখন সে বাসে উঠতে গেল পিছন থেকে একটা লরি এসে—

গল্পটা শুনে রমলা হেসেছিল, হেসেছিল আবার দুঃখও করেছিল। এমন হাসির দুঃখের অনেক গল্প শ্বশুরের মুখে সে শুনেছে। কিন্তু সব গল্প বলা হয়ে যাবার পর তিনি বিষণ্ণ ম্রিয়মান হয়ে থাকেন, তারপর একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলে বলেন, আর না, অনেক হয়েছে, অনেক মৃত্যু দেখেছেন, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা দেখেছেন, বিশ্বাসী মানুষ দেখেছেন, অবিশ্বাসী মানুষ দেখেছেন। রুগ্ন মানুষের চোখে জল, রোগমুক্তির পর তার মুখভরা হাসি—সব দেখে দেখে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এবার নিজের দিকে তাকাতে চান, এখন তাঁর বিশ্রাম নেবার পালা।

কথাগুলি বলে জগমোহন একটু সময় চুপ করে থাকেন, রমলাও তখন চুপ থেকে ভাবে, হ্যাঁ, সেই বয়সে শ্বশুরমশায় পৌঁছেছেন সে বয়সে অর্থোপার্জন আর ভালো লাগে না, বিষয়চিন্তা বিষবৎ মনে হয়, ভোগবাসনায় অরুচি জন্মে—তখন নিজের দিকে তাকানো, তার অর্থ পরকালের ভাবনা হয় মানুষের; তাই বিশ্রাম গ্রহণ—পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ—সংসারের কর্মকোলাহল থেকে সরে গিয়ে স্থিরচিত্ত হয়ে ভগবানের নাম নেওয়া। এখন আর বন কোথায়—বার্ধক্যের বারানসী—কাশীতে গিয়ে অনেকে বসবাস করেন।

জগমোহনের অন্তরের ইচ্ছাও কি তাই। তবে আজকাল কাশীবাসীই বা ক'জন হন। রিটায়ার করে অবসরের দিনগুলি তাঁরা ঘরেই শুয়ে বসে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেন—নাতিনাতনী থাকলে তাদের সঙ্গে গল্প করেন—বিকাল পড়তে একটু পার্কে বেড়ান—ধারে কাছে কালীমন্দির থাকলে সেখানে সন্ধ্যারতি দর্শন করে আবার ঘরে ফেরেন। জগমোহন হয়তো সেই শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের ছবিই দেখছেন। রোগ নিয়ে রুগী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি আর ভালো লাগে না। অবশ্য একটু পরেই তিনি আবার বলেন, 'হুঁ' আমিও অবসর নেব। কিন্তু এখন না। পরিমল বাড়ি আসুক—পড়াশোনা হল না ছেলেটার—কিন্তু হল না বললেই তো সব শেষ হল না, জীবনে যাতে সে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটেল্ড্ হয় সেই ব্যবস্থা আমাকে করে যেতে হবে—কাজেই আমার ছুটির দেরি আছে, আরো ক' বছর ঘানি টানতে হবে।' কথাটা বলায় সময় শ্বশুরের মুখে সেই ক্লান্ত করুণ হাসি!

কিন্তু আজ তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

তাঁর চল্লিশ বছরের পসার নষ্ট হতে চলেছে।

সব রুগী হাতছাড়া হয়ে যাবে।

সময়মতন চেম্বারে গিয়ে বসতে পারছেন না। মন্দ সময় আরম্ভ হয়েছে, দুষ্ট গ্রহের কোপে ভুগছেন জগমোহন ডাক্তার।

অভিজ্ঞ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দৃঢ়চেতা বলে রমলা শ্বশুরকে জানত। এই মানুষের ভিতরটা যে শিশুর মতন চঞ্চল অস্থির অপরিণত তার ধারণা ছিল না। আবার টেলিফোন বেজে উঠল। রমলা শ্বশুরের ঘরের দিকে ছুটল। বাড়িতে ওঁরা না থাকলে এই এক ঝামেলা। রমলাকে যে সারাদিন কতবার টেলিফোন ধরতে হয়, কথা বলতে হয়। একজন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনীয়ার। নানা জায়গা থেকে যখন তখন এ বাড়িতে ফোন আসছে। রমলা সাধ্যমতন সকলের প্রশ্নের জবাব দেয় এবং দরকার মতন তাদের নাম ঠিকানা অথবা ফোন নম্বর দিলে সেটা টুকে রাখে এবং সময়। কে কখন পরিতোষকে অথবা জগমোহনকে খোঁজে মনে রাখা সম্ভব না বলে প্রত্যেকটা নামের পাশে সময়টাও সে লিখে রাখে।

কিন্তু এখন রমলা অবাক হল।

ডাক্তারকে চাইছে না, পরিতোষকেও দরকার নেই।

বাড়ির বড়োছেলেকে খুঁজছে, পরিমলকে। রমলার মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠল, বদ্ধ মুঠোর ভিতর টেলিফোনটা ঈষৎ কেঁপে উঠল। তা হলেও শান্ত ধীর গলায় সে বলল, 'তিনি বাড়ি নেই।'

'কখন বেরিয়েছেন?'

'এই তো সন্ধ্যার আগে।'

'কোথায় গেছেন?'

'বলতে পারব না।'

'কখন ফিরবেন আশা করা যায়?'

'তা-ও জানি না।'

ওদিকটা নীরব হয়ে রইল।

'আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?' রমলা প্রশ্ন করল।

'আচ্ছা, উনি বাড়ি এলে আমি আবার ডাকব।'

রমলা রুষ্ট হল, বিস্মিত হল।

'তা হলে আমি তাঁকে কী বলব?'

'আপনাকে কিছুই বলতে হবে না।'

'আশ্চর্য।' অস্ফুট গলায় রমলা উচ্চারণ করল, হয়তো ওপারের মানুষ তা শুনল না। টেলিফোন রেখে দিয়ে রমলা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটি মেয়ের গলা। নামধাম কিছুই বলল না। চেপে গেল। যেন পরিচয় দিতে কুণ্ঠা। কে ইনি? পরিমল বাড়ি এসেছে এর মধ্যেই খবর পেল কার কাছে? পরিতোষদের কোনো আত্মীয়া? না, আপনজন বলতে, নিকট আত্মীয় আত্মীয়া বলতে এখানে তাদের কে আছে? কলকাতায়? জগমোহনের কোনো ভাই বোন নেই। তিনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। সুতরাং এদিক দিয়ে তাঁরা একেবারে ফর্সা।

জগমোহনের এক কাকা এখনো জীবিত আছেন। তিনিও ডাক্তার। দীর্ঘকাল ধরে মাদ্রাজে থেকে প্র্যাক্‌টিস করছেন। তাঁর দুই ছেলে এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে দিল্লীতে আছে। স্বামী সেখানকার একটা কলেজের অধ্যাপক। বড়ো ছেলে সস্ত্রীক আমেদাবাদ না কোথায় যেন থাকেন। কী একটা মিলে চাকরি করেন। ছোটো ছেলে বাবার কাছে থেকে স্কুলে পড়ছে। হ্যাঁ, আর একজন আছেন। জগমোহনের এক মামাতো বোন। বিধবা। কিন্তু তিনি তো আসানসোলে ছেলের সঙ্গে আছেন। ছেলে সেখানে চাকরি করে। ভদ্রমহিলার কোনো মেয়ে নেই। তা হলেও, এমন কোনো আত্মীয়া যদি হঠাৎ কলকাতায় এসেও থাকেন তো এভাবে তাঁরা পরিমলের খোঁজ করবেন কেন। ধরা যাক জগমোহন তাঁদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, অমুক তারিখে পরিমল বাড়ি আসছে। যদি তাই হয় তাঁরা আগে জগমোহনকে ডাকবেন, পরিতোষকে টেলিফোনে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন পরিমল নির্বিঘ্নে বাড়ি এসে পৌঁচেছে কিনা, বা পরিমল এখন বাড়ি আছে কিনা।

রমলা ভাবতে লাগল। তবে কি জগমোহনের কোনো বন্ধুর বাড়ি থেকে কেউ ফোন করেছিল। কিন্তু এমন কোনো বন্ধু তো তাঁর নেই—বন্ধুর পরিবারের কেউ টেলিফোন করে এবাড়ির বড়োছেলের খোঁজ করবে এমন ঘনিষ্ঠতা তিনি কারো সঙ্গে রাখেন নি। হয়তো আগে ছিল, দশ বছর আগে অনেকের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ঘনিষ্ঠতা ছিল। ডাক্তার মানুষ। কত তার রুগী। সেসব পরিবারের সঙ্গেও এই পরিবারের একটা সম্প্রীতি থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পরিমলের ঘটনার পর থেকে তিনি নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছেন। কতবার বাড়ি বদল করেছেন। কারো সঙ্গে মাখামাখি হোক তিনি চাননি। পরিতোষের মুখে রমলা সবই শুনেছে। কেমন যেন পালিয়ে পালিয়ে থাকতেই ভালোবেসেছেন শ্বশুরমশায় এই ক'টা বছর।

আর যদি এ ধরনের কোনো পরিবারের কোনো মেয়ে কী মহিলা ফোন করতেন তো আগে জগমোহনকেই খুঁজতেন। বা পরিতোষকে। সরাসরি পরিমলের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন, কেমন যেন অদ্ভুত লাগে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

রমলার কপালের রগটা টিপটিপ করতে লাগল।

না, পরিতোষেরও এমন কোনো বন্ধু নেই, পরিবারের মেয়েরা, আজই, পরিতোষের দাদা বাড়ি আসতে না আসতে তার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে কথা বলবে—চিন্তাটা কত অবাস্তব—তবে হ্যাঁ, সেই কলেজের দিনের বন্ধু, পরিমলের সঙ্গেও যাদের হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু সেসব বন্ধুদের কারো সঙ্গে তো পরিতোষের যোগাযোগ নেই। ইচ্ছা করে পরিতোষ রাখে নি। যেমন জগমোহন তাঁর পুরোনো পরিচিত জগত থেকে নিজেকে একরকম বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। তা ছাড়া সবই যে যার কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। কে কোথায় বন্ধুরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে খোঁজ রাখা এমনিও সম্ভব হত না। আর যখন তারা অন্তরঙ্গ হয়ে সর্বদা মেলামেশা করত তখন তাদের প্রায় সকলেই অবিবাহিত। কাজেই তাদের কারোর স্ত্রী যে হঠাৎ, পরিমল বাড়ি এসেছে পরিতোষের মুখে শুনে, পরিমলকে রিং করবে—হ্যাঁ, তবে কোনো বন্ধুর মা বা বোন, মা হবে না, রমলা টের পেয়েছে, বর্ষীয়সীর গলার স্বর না এটা, যাই হোক, যদি বোনই হয়—কিন্তু বন্ধুর বোন হলেও এভাবে নামধাম গোপন রাখতে চাইবে কেন! পরিমলকে যখন ডেকে পেল না তখন পরিতোষকে নিশ্চয়ই ডাকত। না, তাদের বন্ধুদের কোনো বোনের সঙ্গে পরিমলের এতটা মাখামাখি মেলামেশা ছিল না যে, সে জেল

থেকে বেরিয়ে এসেছে খবর পেয়ে তার সঙ্গে লুকিয়ে কথা বলতে মেয়েটি আস্থির হয়ে উঠেছে। বন্ধুর বোন কেন, পরিমলদের কলেজে তো গুচ্ছের মেয়ে ছিল, পরিমলের সঙ্গে পড়ত ক'টি—কারো সঙ্গে তার এধরণের সম্পর্ক ছিল পরিমলের শত্রুও একথা বলত না।

শত্রু মিত্র সবাই অন্য কথা বলত। একটি মেয়েকে তারা জানত, একজনকেই তারা চিনে রেখেছিল। পরিমল যাকে জীবনের ধ্রুবতারা করতে চেয়েছিল। বিশাখা। কিন্তু সেই মেয়ে—

ঘড়ির কাঁটার মতন টিকটিক করতে করতে রমলার চিন্তাটা এক জায়গায় এসে থেমে রইল। আর যেন কাঁটা চলল না। হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে গেল ঘড়ির।

রমলার কপালে অজস্র ঘামের বিন্দু দেখা দিল।

একমাত্র বিশাখাই তো এভাবে পরিমলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চাইত। কার কাছে খবর পেল পরিমল বাড়ি এসে গেছে? পরিতোষ যখন তাদের সেদিনের বন্ধু বান্ধবী কারো সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি? না, কারোর খবর দেওয়ার অপেক্ষায় থাকে না বিশাখা। পরিমলের কারাবাসের প্রথম দিন থেকে আরম্ভ করে মুক্তির দিন পর্যন্ত যদি কেউ প্রতিটি বছর মাস সপ্তাহ দিন ও ঘণ্টার নির্ভুল হিসাব রেখে থাকে তো সেই একজন। কিন্তু—

যেন ভয়ংকর একটা শূন্যতার সামনে রমলা থমকে দাঁড়াল। সূচীভেদ্য অন্ধকার। কিছুই সে দেখতে পাচ্ছিল না। জানতে পারছিল না। নির্জন ঘরে জড় অনড় বোবা টেলিফোনটার দিকে আরো কতক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল শুধু।

॥ ১৩ ॥

'বউদি!'

'আসুন।'

জুতোর শব্দ শুনে রমলা টের পেয়েছিল কেউ ওপরে উঠছে। জগমোহন না, পরিতোষ না। অন্য কেউ। এবং মানুষটি কে তা-ও সে অনুমান করেছিল। তাই সঙ্কোচ না করে বারান্দায় এসেছিল।

কিন্তু তা হলেও গিরিজা দু'ধাপ সিঁড়ি বাকি থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল, ইতস্তত করল। সিঁড়ির মুখে রেলিং ধরে রমলা অপেক্ষা করছিল পরিতোষের বন্ধুকে অভ্যর্থনা করতে।

'পরিতোষ ফেরেনি?' গিরিজা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল।

'না, আপনি আসুন', রমলা হেসে বলল, 'এখনি এসে যাবে।'

'সেকী!' গিরিজা ঈষৎ বিস্ময় প্রকাশ করল, 'আমায় বলল দশ মিনিটের মধ্যে ফিরছি। তুই চলে আয়।'

'আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?' রমলা একটু বিস্মিত হল।

গিরিজা মাথা নড়ল। সঙ্কোচ কাটিয়ে বাকি সিঁড়ি দুটো ডিঙ্গিয়ে ওপরে উঠে এল।

'আমি রিং করেছিলাম। আজ তো কলকাতায় ফিরলাম।'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো!' রমলার এখন মনে পড়ল। 'আপনি বাইরে গিয়েছিলেন, ও বলেছিল।'

পকেট থেকে রুমাল বের করে গিরিজা কপাল মুছল। লম্বা চওড়া সুশ্রী পরিচ্ছন্ন পুরুষ। সাদা শার্ট হাল্কা বাদামী রঙের ট্রাউজার পরনে। কিন্তু তা হলেও পরিতোষের এই বন্ধুটিকে

দেখতে রমলার কেমন যেন হাসি পায়। গিরিজার মাথার চুলের জন্য অবশ্য। কালো কোঁকড়া ঢেউ খেলানো চুল। আজকাল পুরুষের এত ঢেউ তোলা কোঁকড়া চুল বড়ো একটা দেখা যায় না। কিন্তু তাতেও কিছু এসে যেত না। মেয়েদের মতন মাথায় একটু বেশি তেল দেয় গিরিজা এবং মেয়েদের মতন মাঝখান দিয়ে সিঁথি কাটে। তাই তাকে দেখলে রমলার কেবল মনে হয় এমন আধুনিক বেশভূষা ফিটফাট চেহারা নিয়েও গিরিজার মধ্যে একটা সেকেলে মানুষ লুকিয়ে আছে।

রমলার সঙ্গে গিরিজা ঘরে ঢুকল।

'বসুন, এখনি এসে যাবে আপনার ফ্রেণ্ড।' রমলা পাখা খুলে দিল।

গিরিজা একটা সোফার ওপর বসল, হাতের ঘড়ি দেখল।

'ভাবলাম পরিতোষ ইতিমধ্যে বাড়ি পৌঁছে গেছে—তার সঙ্গে কথা বলেছি তাও তো প্রায় আধ ঘণ্টা হতে চলল।'

'ট্রাফিকের ভিড়—রাস্তায় দেরি হচ্ছে হয়তো।'

'তাই হবে।' গিরিজা ঘাড় নাড়ল। রমলা একটু সরে গিয়ে একটা জানালা খুলে দিল এবং সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

'কোথায় গিয়েছিলেন বাইরে?'

'পুরী।' গিরিজা একটু পিছনে হেলে বসল। 'আপনারা তো জানেন, আমি অন্য কোথাও যাই না। ফাঁক পেলেই পুরীর টিকিট কাটি।'

'পুরীর সমুদ্র আপনাকে টানে।'

'তার চেয়েও বেশি টানে নীলধ্বজের মন্দির।' গিরিজা হঠাৎ সোজা হয়ে বসল। 'ভয়ংকর প্রাচীন জিনিস। দশদিন ছিলাম। এক আধ বেলা হয়তো সমুদ্র দেখেছি, বীচে বসেছি। বাকি সময়টা আমি মন্দিরের ভেতর বসে কাটিয়েছি। এত ভালো লাগত। কেমন একটা ঐতিহাসিক গাম্ভীর্য সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মন্দিরের ঐ পুরোনো গন্ধটাই আমাকে বেশি আকর্ষণ করে।'

'আপনার মধ্যে নিশ্চয়ই একটি পুরোনো মানুষ আছে।' অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে রমলা ঠোঁট টিপে হাসল। গিরিজা কৌতুকটা ধরতে পারল না। বরং বন্ধুপত্নী তাকে প্রশংসা করছে ধরে নিয়ে গর্ববোধ করল ও বেশ একটু শব্দ করে হেসে উঠল।

'যা বলেছেন, কিছু কিছু পুরোনো প্রাচীন জিনিসের প্রতি যে আমার গভীর অনুরাগ রয়েছে এটা আমি নিজেও সময় সময় ফিল্ করি এবং ভাবি, কেন এমন হয়—' গিরিজা আবার শব্দ করে হাসতে গেল, কিন্তু আর হাসল না, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। যেন কেমন সচকিত সন্ত্রস্তও হয়ে উঠল।

রমলা ঠিক বুঝতে পারল না।

গিরিজা ঘাড় ঘুরিয়ে বারান্দার দিকে তাকাল। তার চোখে উদ্বেগ, অনুশোচনা। সে বুঝতে পারল বাড়ি একরকম জনশূন্য।

'কাকাবাবুর ফিরতে তো সেই রাত আটটা।'

'হ্যাঁ।' রমলা ঘাড় কাত করল। চেম্বার থেকে জগমোহনের বাড়ি ফিরতে কোনোদিন রাত সাড়ে আটটাও বেজে যায়।

'খোকাকে দেখছি না?' কাতর গলায় গিরিজা প্রশ্ন করল।

'দীনদয়ালের সঙ্গে পার্কে গেছে।'

এখন রমলা কিছুটা আঁচ করতে পারল। শূন্য বাড়িতে শব্দ করে হেসে ফেলে গিরিজা যেন খুবই লজ্জিত। যদি তাই হয় তো এটা তার রুচিবোধ শালিনতাবোধের বাড়াবাড়ি, রমলা চিন্তা করল, কেননা গিরিজা এ বাড়িতে নূতন না, বা খুব যে একটা কালে-ভদ্রে আসে তা-ও না। রোজ না হোক, সপ্তাহে দুদিন তিনদিন পরিতোষের কাছে সে আসবেই। বিয়ে হয়ে এ বাড়ি এসেই রমলা স্বামীর এই বন্ধুটিকে দেখছে। বলা যায় পরিতোষের এই একমাত্র বন্ধু। আর কোনো বন্ধুকে রমলা বাড়ি আসতে দেখেনি। যেন আর কোনো বন্ধুও পরিতোষের নেই। অন্তত এতটা হৃদ্যতা—এমন নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা আর কারো সঙ্গে সম্ভব হয়নি। পুরোনো বন্ধু গিরিজা। সেই কলেজের সময় থেকে। পরিতোষের পুরোনো বন্ধুরা হারিয়ে গেছে। কে কোথায় আছে সে খোঁজ রাখে না। এবং তারা হারিয়ে গেছে বলে সে মনে মনে সন্তুষ্ট। কিন্তু গিরিজার বেলায় অন্যরকম। গিরিজাকে এড়ানো সম্ভব হয়নি। গিরিজাও তা হতে দেয়নি। পরিতোষকে সে ভালোবাসে। জগমোহনকে শ্রদ্ধা করে। জগমোহনও ছেলেটিকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। না, এটুকু বললে যথেষ্ট হয় না। জগমোহনকে একদিন অনেকখানি নির্ভর করতে হয়েছিল অক্ষয় উকিলের এই ভাগ্নেটির ওপর। মানুষের চরিত্র বোঝা মুস্কিল, রমলা চিন্তা করেছে, কেননা পরিতোষের মুখে সে শুনেছিল পরিমলের মামলায় গিরিজা জগমোহনকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। তার মামাতো ভাই মলয়ের যে এক সময় টি বি হয়েছিল এই খবর গিরিজাই জগমোহনকে দিয়েছিল। কেবল তাই না, শহরের কোন্ ক্লিনিকে ক'বার মলয় এক্স-রে করিয়েছিল, কোন্ ডাক্তার তাকে চিকিৎসা করত ইত্যাদি সমস্ত তথ্য সুন্দরভাবে গিরিজা জগমোহনকে সরবরাহ করেছিল। এমন কী মলয়ের অসুখের সময়কার দুটো পুরোনো প্রেসক্রিপশন পর্যন্ত অক্ষয়বাবুর বাড়ি থেকে কৌশলে গিরিজা উদ্ধার করে এনেছিল। পরিমলের মামলায় সেগুলি যথেষ্ট কাজে লেগেছিল। গিরিজার এই উপকার জগমোহন ভুলতে পারেন নি। কিন্তু তা হলেও, রমলা ভেবে দেখেছে, গিরিজা তার মামা অক্ষয়বাবুকে দেখল না, অক্ষয়বাবুর ছেলে মলয়কে দেখল না—জগমোহন ডাক্তারকে দেখল, তাঁর জন্য সে অনেক কিছু করল। এ যেন অনেকটা গৃহশত্রু বিভীষণের মতন কাজ করা হল। রমলার কথা শুনে পরিতোষ বলেছিল, গিরিজাকে এভাবে বিচার করলে তার প্রতি অন্যায় করা হয়। আত্মীয় স্বজনের চেয়ে বন্ধু তার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিল। পরিতোষের বাল্যবন্ধু সে। একডালিয়া রোডে সেও ছেলেবেলা থেকে মানুষ। স্কুলের ইনফ্যাণ্ট ক্লাশ থেকে দুজন এক সঙ্গে পড়ছিল। পরিতোষ যেমন তার বন্ধু—পরিতোষের দাদা পরিমলের সঙ্গেও গিরিজার যথেষ্ট সম্প্রীতি, আবার বন্ধুর বড়ো ভাই হিসাবে পরিমলকে সে শ্রদ্ধা করে। অবশ্য সব ছেলেই পরিমলকে সেদিন শ্রদ্ধা করছিল। তার শৌর্য বীর্য, সাহস, সুন্দর স্বভাব ও দেহসৌষ্ঠব সকলকেই মুগ্ধ করত। পরিমলের ভক্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছিল। গিরিজা সেই ভক্তদের একজন। ছেলেবেলায় পরিমলকে সে কী বলে ডাকত পরিতোষের মনে নেই, হয়তো নাম ধরেই ডাকত, কিন্তু বড়ো হয়ে ডাকত 'লর্ড'—গিরিজার দেওয়া এই 'লর্ড' পরিতোষদের পাড়ায় এবং পরে কলেজেও চালু হয়েছিল। সকলের মুখের লর্ড—

লর্ড আজ অমুক টিমের হয়ে খেলছে, কালকের খেলায় লর্ড যা একখানা স্কোর করেছিল! লর্ড বুঝি আজ কলেজে এল না। পরিমল ছাড়া এমন অভিজাতোচিত আখ্যা আর কাউকে মানাত না। তার চলাফেরা, কথাবার্তা, হাসি ও ব্যবহারের মধ্যে সত্যি একটা আভিজাত্য ছিল। সকল বিষয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব, তার প্রভুত্ব ছেলেরা সেদিন স্বীকার করে নিয়েছিল। সেই মানুষের ফাঁসি হয়ে যাবে গিরিজা সহ্য করতে পারছিল না। পরিতোষদের বাড়িতে বসে একদিন সে কেঁদে ফেলেছিল, 'কাকাবাবু, বলুন আমায় কী করতে হবে—পরিমলকে বাঁচাতে আমি আমার জীবন দিতে প্রস্তুত আছি।' এটা অবশ্য আবেগের কথা, উচ্ছ্বাসের আতিশয্য। কেননা পরিমলের প্রাণ রক্ষা করা বা তার প্রাণনাশের হুকুম দেবার দায় আদালতের—এখানে জগমোহন কিছু না, গিরিজা কিছু না। কিন্তু তা হলেও জগমোহনের চোখে জল এসেছিল। পরিমলের জন্য দুঃখ করা, চোখের জল ফেলা অনেক হয়েছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি যে একটি ছেলের হৃদয়ের প্রশস্ততা, মনের সারল্য, অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতির পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়েছিলেন, তাঁর চেহারা দেখে বোঝা গিয়েছিল। গিরিজাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে জগমোহন সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

পরিমলের জন্য গিরিজাকে প্রাণ দিতে হয়নি। কিন্তু ক'টা দিন প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়েছিল তাকে। জগমোহনের সঙ্গে দু বেলা উকিলের বাড়ি যাওয়া, এটা ওটার জন্য ছুটোছুটি করা আর সেই লাইব্রেরীর কাগজপত্র—মলয়ের সঙ্গে যা নিয়ে পরিমলের ঝগড়া হয়েছিল—খুঁজেপেতে গিরিজা সমস্ত জোগাড় করেছিল। কেবল তাই নয়, হিসাবের খাতা, লাইব্রেরীর প্রসপেক্টাস, চাঁদার বই—রাত জেগে জেগে সব কিছুর ডুপ্লিকেট—নকল তৈরি করে সে জগমোহনকে দিয়েছিল। আর মলয়ের পুরোনো প্রেসক্রিপশন দুটো। বেশ বেগ পেতে হয়েছিল গিরিজাকে ঐ দুটো জোগাড় করতে। মামার বাড়ি হলেও যতীন দাস রোডের অক্ষয়বাবুর বাসায় গিরিজাদের যাওয়া আসা খুব কম ছিল। গিরিজার বাবা তো ভুলেও সেখানে পা দিতেন না, খুব দরকার না হলে গিরিজার মাও ভাইয়ের বাসায় যেতেন না। গিরিজার দিদিমা গিরিজার মাকে এক সময় যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি লিখে দিয়েছিলেন। গিরিজার মামা কারচুপি করে বোনের সেই সম্পত্তিটুকু গ্রাস করেছিলেন। এই জন্য ভাইয়ের ওপর গিরিজার মা খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। গিরিজার বাবা অবশ্য কাঠের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থের মালিক হন। গাড়ি বাড়ি করেন। তিনি সামান্য দু কাঠা জমির জন্য মামলা মোকদ্দমা করে শ্যালকের সঙ্গে লড়তে রাজি হননি। তবে অক্ষয় বোসকে তিনি চিনে রেখেছিলেন। গিরিজার বাবার নাম বসন্তবাবু—বসন্ত রায়। উঁচু লম্বা ফর্সা সুন্দর চেহারার মানুষ। সে তুলনায় গিরিজা রোগা, রংটাও বেশ ময়লা। অক্ষয় উকিলের কথা উঠলেই বসন্ত রায় বলতেন, ওটা আবার মানুষ নাকি—ছুঁচো। যেমন তার চেহারা তেমনি তার অন্তর। না হলে বোনের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে! অক্ষয় উকিল মানুষটা দেখতে খুবই ছোটোখাট। মাথাটা বড়ো। হাত পা কাঠির মতন সরু, লোকে বলে অক্ষয় উকিল পসার জমাতে পারল না তার ঐ 'ডিফেক্টিভ ফিগারের' জন্য। মাথা পরিষ্কার ছিল। কিন্তু তা হলে হবে কী—কেবল মগজ দিয়ে মাল কাটে না—উকিলের ডাক্তারের দশাসই চেহারা হওয়া চাই, তবে না রুগীরা মক্কেলেরা ভিড় করবে। অক্ষয় উকিলের সেরেস্তায় ধুলো জমে থাকত, মক্কেল বড়ো একটা দেখা যেত না। আজও

সেই অবস্থা। এখন তো বুড়োই হয়েছেন। আগে যতটা খাটতে পারতেন, এজলাসে দাঁড়িয়ে বকতে পারতেন এখন তাও পারেন না। ভদ্রলোকের দারিদ্র্যদশা কোনদিন ঘুচল না। তাই ভগ্নীপতি বসন্ত রায় বলতেন, এই মানুষের তো এমন হবেই। তার আত্মা ছোটো—সুতরাং ভগবান তাকে দেবেন কেন। আর এটা তো শাস্ত্রের বাক্য, চোরের বাড়িতে কোনোদিন দালান ওঠে না। সহোদরার সম্পত্তি গ্রাস করাটাকে বসন্ত রায় সোজাসুজি চুরি বলেই অভিহিত করতেন। সুতরাং তিনি এবং তাঁর স্ত্রী যতীন দাস রোড যেতেন না। গিরিজার কথা অবশ্য আলাদা। মামাতো ভাই মলয় তার সমবয়সী। এক সঙ্গে খেলাধূলা করে, ক্লাব পিকনিক করে। এখানেও সেই কথা। এই বয়সে আত্মীয়তাবোধের চেয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা বড়ো হয়ে ওঠে। দুই পরিবারের মধ্যে কলহ যেমন থাক, মলয় তার বন্ধু, খেলার সাথি এটা মনে রেখে সে মাঝে মাঝে মলয়দের বাড়ি গেছে। অবশ্য বন্ধু হিসাবে পরিতোষের কাছে পরিমলের কাছে মলয় কিছু না। পরিতোষ ও পরিমলের সঙ্গ লাভ গিরিজার কাছে অনেক বেশি প্রিয়। তারা তার প্রথম শ্রেণীর বন্ধু—মলয় ও অন্যরা দ্বিতীয় শ্রেণীর। সে যাই হোক, মলয়ের টি বি হয়েছিল, এই মূল্যবান তথ্যটা জেনে যাওয়ার পর থেকে জগমোহনের উকিল ক্রমাগত তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন কোন্ ডাক্তারকে দিয়ে মলয় চিকিৎসা করাত, কোন্ ক্লিনিকে তার বুকের ফটো তোলা হয়েছিল ইত্যাদি খবর প্রমাণপত্র সহ যাতে তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করা হয়। জগমোহনও গিরিজাকে সেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাকাবাবুর নির্দেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

সেদিন গিরিজা এক নাগাড়ে সাত দিন মামার বাসায় ছুটে ছুটে গেছে। স্বাভাবিক। মলয় নেই। শোকসন্তপ্ত বাবা মা ও ছোটো ভাইবোনগুলিকে সান্ত্বনা দিতে গিরিজাই তো বার বার সেখানে যাবে। বসন্তবাবু এবং তাঁর স্ত্রীও একদিন গিয়েছিলেন। এত নিকট আত্মীয়। না গেলে খারাপ দেখায়। মৃত্যুর সঙ্গে মান-অভিমান, কলহ-কোন্দল চলে না। সুতরাং অনেকটা নিয়ম রক্ষার খাতিরেও তাঁদের যেতে হয়েছিল। কিন্তু গিরিজা তো শুধু নিয়ম রক্ষা করে একবার দেখা দিয়েই চলে আসতে পারে না। মলয় তার ভাই ছিল, আবার বন্ধুও ছিল। এক সঙ্গে খেলাধূলা করেছে, চড়ুইভাতি খেয়েছে, সরস্বতী পুজোর চাঁদা তুলেছে, একত্র সিনেমা দেখতে গেছে। মলয়ের বিচ্ছেদ গিরিজারই তো বেশি লাগবার কথা। মলয়ের বাবা মা ভাইবোনেরা তাই মনে করেছিল। মলয়কে সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তাই রোজ আসছে। মলয়ের পড়ার ঘরে ঢুকছে, বইগুলি উল্টেপাল্টে দেখছে, খাতাগুলি দেখছে, দেরাজ খুলে মলয়ের প্রিয় জিনিসগুলি টেনে টেনে বার করছে। তিন ব্যাটারির একটা টর্চলাইট, আইভরি নস্যির কৌটো, জার্মান-সিলভারের সিগারেট কেস, স্মেলিং-সল্টের নীল শিশি। মলয়ের প্রায়ই মাথা ধরত। তাই হাতের কাছে সর্বদা স্মেলিং-সল্ট রাখত। মলয় নেই—তার স্মৃতি রয়ে গেছে। ওটা কী? সবুজ রঙের রাইটিং প্যাড। প্রিয়জনের কাছে চিঠি লিখতে, কবিতা লিখতে মানুষ এমন সুন্দর প্যাড ব্যবহার করে। মলয় কি কারো কাছে চিঠি লিখত? রঙিন কাগজে চিঠি লেখার মতন প্রিয়জন তার ছিল কি? প্রেয়সী? না, গিরিজা সে-খবর পায় নি। পরিতোষ ও পরিমল ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ মলয়ের প্রেয়সী কে জানত না। হয়তো জানলেও সেই মুহূর্তে মলয়ের দেরাজ ঘেঁটে পুরোনো প্রেম-পত্র খুঁজে বার করতে গিরিজা গ্রাহ্য করত না।

তার অন্য জিনিসের দরকার। অন্য কিছু খুঁজছিল সে। এবং সঙ্গে সঙ্গে পেয়েও গেল। ঠিক রাইটিং-প্যাডের নীচেই ভাঁজ করা দুখানা কাগজ পড়ে ছিল। কোণায় আলপিন গোঁজা। আলপিনের মাথা জং পড়ে লাল হয়ে গিয়েছিল। ভাঁজ খুলে গিরিজা বুঝতে পারল কীসের কাগজ। তার প্রার্থিত দলিল। গিরিজা তখনি পকেটে পুরল। কেউ কিছু বুঝল না, দেখল না, সন্দেহ করল না। সন্দেহ করার মতন মনের অবস্থা সেদিন অক্ষয়বাবুর বাড়ির কারোর ছিল না। বরং মৃত মলয়ের পড়ার ঘরে মলয়ের একটি সাথিকে ঘুরঘুর করতে দেখে তাদের ভালো লেগেছিল। যেন গিরিজার উপস্থিতির মধ্য দিয়ে মলয়কে তারা কিছুক্ষণের জন্য কাছে পেয়েছিল।

আজ রমলার মনে পড়ল।

হয়তো গিরিজার নিজেরও এত কথা মনে নেই। পরিতোষও নিশ্চয় ভুলে গেছে। রমলাও ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু সেই মানুষ বাড়ি ফিরে এসেছে। সেদিনের সেই নায়ক। গিরিজা ও আর পাঁচটি ছেলে যাকে 'প্রভুর' আসনে বসিয়েছিল। 'লর্ড'—মনের মধ্যে শব্দটা উচ্চারণ করল রমলা এবং সামনে সোফায় উপবিষ্ট ভক্তটিকে দেখে একদিন সে তার প্রভুর প্রাণরক্ষার জন্য কী প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিল পরিতোষের মুখে শোনা খুঁটিনাটি সব রমলার নূতন করে মনে পড়ে গেল। এবং রমলা অবাক হয়ে ভাবছিল, আজ পরিমলের সামনে গিরিজা যখন দাঁড়াবে তখন তার চোখমুখের অবস্থা কেমন হবে কে জানে। গিরিজাকে দেখে পরিমল কী করবে, কী বলবে রমলা তা-ও চিন্তা করল।

না কি গিরিজা যে হঠাৎ এত সন্ত্রস্ত সচকিত হয়ে উঠল, পরিমলকে মনে পড়ে! পরিমল বাড়ি এসেছে, পরিতোষের মুখে নিশ্চয় শুনেছে, টেলিফোনে তার সঙ্গে যখন কথা হয়েছে. তা ছাড়া জগমোহন ও পরিতোষের মতন পরিমলের রিলিজের তারিখটা গিরিজারও তো একরকম মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। গিরিজার পুরী যাবার আগে ক'দিন তো জগমোহন এই নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনাও করেছেন। বড়ো ছেলে এই ঘরে থাকবে, এই এই জিনিস তার দরকার হবে। কাঠের জিনিসগুলি কেনার সময় গিরিজা উপস্থিত থাকলে ভালো হত—কিন্তু সে বাইরে চলে যাচ্ছে, এই জন্য জগমোহন একটু দুঃখও করেছিলেন।

রমলার অনুমান মিথ্যা হল না।

বারান্দার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে গিরিজা পরিমলের ঘর দেখছিল। দোরটা ভেজানো।

'লর্ড এখনো ঘুমোচ্ছে তা হলে?' রমলার দিকে মুখ ফিরিয়ে গিরিজা ঈষৎ হাসল। যেন কিছুটা আশ্বস্ত হল সে।

রমলা মাথা নাড়ল।

'বেরিয়েছেন।'

'বেরিয়েছেন!' গিরিজা চমকে উঠল।

'আজই প্রথম বেরোলেন।' রমলাও চোখ তুলে বারান্দার ওদিকটা দেখল।

'কিন্তু—' গিরিজা আবার একটু চিন্তাভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

'ধুতি পাঞ্জাবি পরে খাঁটি বাঙালী ভদ্রলোকটি সেজে বেরিয়েছেন।' রমলা বলল।

'কিন্তু পরিতোষ তখন আমায় বলছিল, বাড়ি এসেছে পর থেকে দরজা বন্ধ করে পড়ে পড়ে সারাদিন কেবল ঘুমোচ্ছে।'

'না, তা কেন হবে।' প্রতিবাদের সুর শোনা গেল রমলার গলায়। 'সারাদিন ঘুমোবেন কেন, তা হলে মিথ্যা কথা বলেছে। দীপুর সঙ্গে কতক্ষণ তো গল্প করলেন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর। বেলা দশটা পর্যন্ত সুকোমলের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কাল সারাটা বিকেল পরিতোষের সঙ্গে বাগানে ছিলেন।'

গিরিজা শুনল। শুনে চুপ করে রইল। মুখের ভারটা থেকে গেল।

'আজ দিনের বেলা ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছিলেন সত্যি, তারপর উঠে শেভ্ করলেন, বাথরুমে গেলেন, তারপর সেজেগুজে এই তো খানিকক্ষণ আগে বেরোলেন।' মৃদু অস্পষ্ট গলায় রমলা বলছিল, যেন নিজে নিজে সে কথা বলছিল। গিরিজা একটা লম্বা নিশ্বাস ত্যাগ করল।

'সেদিনও এই পোশাক পরে বেড়াতে বেরোত। লম্বা ঝুলের চুড়িদার পাঞ্জাবি, শান্তিপুরী ধুতি। লর্ডের প্রিয় বেশ।'

রমলা ভাবছিল কথাটা বলার সময় গিরিজার চোখ চকচকে হয়ে উঠবে, চেহারা উজ্জ্বল হবে, হল না। বরং অস্বস্তির সরু মোটা কতগুলি রেখা তার কপালে চোখের কিনারে ফুটে উঠল। জগমোহনের যেমন হয়েছিল। জগমোহনের মতন গিরিজাও যেন দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছিল একটি মানুষের সেজেগুজে বাড়ি থেকে বেরোন নিয়ে। এবং রমলা আশঙ্কা করল, বাড়ি ফিরে পরিতোষ যখন খবরটা শুনবে তার চোখমুখের অবস্থা এমন হবে। দারুণ অস্বস্তি নিয়ে কতক্ষণ সে ছটফট করবে। রমলার সঙ্গে ভালো করে হয়তো কথা পর্যন্ত বলতে পারবে না। তাই কি?

'আপনি বসুন, আমি চা করে আনছি।'

'কিন্তু পরিতোষ এখনো এল না।' গিরিজা হাতের ঘড়ি দেখল।

'এখনি আসবে।' রমলা দরজার বাইরে পা বাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়াল। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল।

'পরিতোষ এসেছে।' গিরিজার চোখেমুখে উৎসাহ ফিরে এল। আসন ছেড়ে সেও দরজার কাছে ছুটে গেল। কিন্তু আর অগ্রসর হতে পারল না।

একটি গম্ভীর বিষণ্ণ মূর্তি সিঁড়ির শেষ ধাপ অতিক্রম করে ততক্ষণে করিডোরে উঠে এসেছে। এদিকে তাকাল না। এখানে একটা ঘরের দরজায় দুজন দাঁড়িয়ে আছে মানুষটি দেখল না, বা দেখতে পেলেও তার এমন উৎসাহ নেই যে এগিয়ে এসে কারো সঙ্গে কথা বলবে। যেন কোনো গভীর চিন্তায় সে নিমগ্ন। একান্তভাবে নিজের মধ্যে সে সীমাবদ্ধ। বহির্জগৎ সম্বন্ধে তার কৌতূহল কম, আগ্রহ কম।

ভেজানো দরজা ঠেলে পরিমল নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। দরজার পাল্লা দুটো আবার বন্ধ হয়ে গেল।

গিরিজাকে মনে হচ্ছিল একটা পাথরের মূর্তি। স্থির কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রমলা বিস্মিত হল। প্রতি মুহূর্তে সে আশা করছিল 'লর্ড' বলে উল্লাসে চিৎকার করে উঠে গিরিজা ছুটে গিয়ে পরিমলের হাত চেপে ধরবে। পরিমলও ঘুরে দাঁড়িয়ে তার এক পুরাতন ভক্তকে, বিশ্বস্ত বন্ধুকে আবেগে জড়িয়ে ধরবে।

এসব কিছুই হল না।

কেউ কাউকে চেনে না।

অপরিচয়ের কঠিন ঔদাসীন্য নিয়ে আলোকিত শূন্য বারান্দাটা থমথম করছিল।

'শরৎ এসে গেছে, তবু গরম কমছে না।' গিরিজা বিড়বিড় করে বলল, একটা কিছু তখন তাকে বলতেই হত। যেন নিজের লজ্জা—হীনতা ভুলতে কথা না বলে তার উপায় ছিল না। রমলা বুঝতে পারল। পরিমল যতক্ষণ অনুপস্থিত ছিল ততক্ষণ ভক্তের দাবি নিয়ে বন্ধুর অধিকার নিয়ে গিরিজা ঐ মানুষটি সম্পর্কে অনেক কিছু চিন্তা করছিল—কিন্তু পরিমলকে এখন চোখে দেখার পর গিরিজা স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে গেছে। ভক্তের আসন থেকে সে স্খলিত। বন্ধুর মর্যাদাও পরিমল আর তাকে দিতে রাজি নয়। যেন অনেক নীচে নেমে গেছে, ছোটো হয়ে গেছে গিরিজা এই ক'বছরে—অথবা অনেক ওপরে উঠে গেছে, মনের দিক দিয়ে বড়ো বেশি এগিয়ে গেছে তার ছেলেবেলার সেই সাথি। গিরিজার চোখে এমন একটা হীনতাবোধ দেখতে পেল না রমলা?

না, শুধু গিরিজা কেন, জগমোহনের অবস্থাও তো তাই।

অনেক আস্ফালন করেছেন তিনি; পরিমল যখন ঘুমোচ্ছে, কী বাগানে নেমে গেছে, কী বেড়াতে বেরোল, জগমোহনের ক্ষোভ ক্রোধ বিরক্তি চরমে উঠেছে। কিন্তু যখনই পরিমল তাঁর সামনে এসেছে তিনি সংকুচিত হয়ে গেছেন, নীরব হয়ে রয়েছেন। কই, রমলার সামনে তিনি যত কথা বলেছেন, সুকোমলকে যা যা শুনিয়েছেন, বড়ো ছেলের মুখের ওপর একটা কথাও তো তিনি বলতে পারলেন না। ছেলের ব্যক্তিত্বকে ভয়? তার সমকক্ষ তিনি নন, তিনি ছোটো—সাধারণ, তার মনের অবস্থা কি এই শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে?

পরিতোষ? পরিতোষকে এখনো বুঝতে পারছে না রমলা।

আশ্চর্য, পরিতোষকেই তার সকলের আগে বুঝে ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু বড়ো ভাইয়ের ব্যাপারে সে এখন পর্যন্ত অস্পষ্ট অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে। জগমোহনের মতন সুকোমলের মতন সরাসরি কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না—অন্তত রমলাকে সে বলতে পারত, দাদা এই, দাদা এই নয়। দাদাকে ভালো লাগছে, বা দাদাকে ভালো লাগছে না। কাল রাত্রে শোবার সময় একটা কথাই শুধু সে বলেছিল, এই তো সবে জেল থেকে বেরিয়ে এল—দেখা যাক না। অর্থাৎ জগমোহন অস্থির হয়ে পড়েছেন বুঝতে পেরে পরিমল সম্পর্কে নিজের মনের ভাবটা সে স্ত্রীর কাছে একটুখানি প্রকাশ করেছিল। আর কিছু বলেনি, বলার প্রয়োজনবোধ করেনি। অত্যন্ত সতর্ক—সতর্ক এবং বুদ্ধিমান তার স্বামী। জগমোহনের মতন চট করে সে জেল-ফেরত মানুষকে ঘৃণা করছে না ভয় করছে না—আবার সুকোমলের মতন ভালোও বাসছে না। পরিমলকে সে আগে দেখবে, পরীক্ষা করবে, বিচার করবে—কটা দিন যাক, কী তার মতিগতি, কেমন তার চলাফেরা—সব দেখে শুনে তারপর স্থির করবে দাদাকে সে ভালোবাসবে কি অশ্রদ্ধা করবে, ঘৃণা করবে কি ঈর্ষা করবে। এই?

না, এত সতর্কতা, এত বুদ্ধিশালীতা রমলা পছন্দ করে না।

হিসাব করে মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে পারে না ঘৃণা করতে পারে না। বাবা মা ভাইবোনকে তো নয়ই—বন্ধুকেও না; স্বামী-স্ত্রীর বেলায়ও একই কথা।

রমলা ভিতরে ভিতরে কেমন যেন শিউরে উঠল।

পরিতোষের চরিত্রের একটা দিক তার অজানা ছিল। পরিমল বাড়ি এসেছে পরে তা

প্রকাশ পাচ্ছে, উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। জগমোহন বলেন, তার মেজো ছেলে নিরীহ শান্ত প্রকৃতির মানুষ; সাধারণ বাঙালীর ঘরের ছেলে যেমন হয়, ছা-পোষা সংসারী জীব।

কিন্তু রমলা দেখল পরিতোষের সবটাই নিরীহ গো-বেচারা নয়। তার মধ্যে যথেষ্ট কাঠিন্য আছে, চাতুর্য আছে। সুযোগ বুঝে সে তা প্রয়োগ করে। রাজনীতি করতে গেলে মানুষ যেমন করে। অতিমাত্রায় সতর্ক—অত্যধিক স্বার্থান্বেষী হলে যা হয়। বাইরে থেকে মানুষ তার ইচ্ছা অভিসন্ধি বুঝতে পারে না। বাইরের মানুষের চোখে সে দুর্বোধ অস্পষ্ট হেঁয়ালী।

সেই তুলনায় জগমোহন কত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ।

সুকোমল কত সরল সুন্দর স্বাভাবিক।

রমলা যদি দেখত, পরিতোষ আগের মতন আজও তার দাদাকে ভালোবাসছে তবে সে নিশ্চয়ই সুখী হত, যদি দেখত পরিমল বাড়ি আসতে না আসতে জগমোহনের মতন সে-ও ভয়ংকর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, জেল-ফেরত মানুষটাকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার জন্য ছটফট করছে তো রমলা দুঃখ পেত। কিন্তু তা তো হচ্ছে না, স্বামীকে বিচার করতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে। বাড়ির মেজো ছেলে তার দাদার ব্যাপারে অতি মাত্রায় স্থির নীরব সংযত হয়ে আছে।

তাই রমলার ভয় হচ্ছে।

অনেক বিচার বিবেচনার পর পরিতোষ যদি ভবিষ্যতে পরিমলকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করে তো সেই ঘৃণা কত তীব্র নির্মম হবে এখনই যেন তা অনুমান করে রমলার গা কাঁটা দিয়ে উঠছে। আর যদি ভালোবাসে, সুকোমল যেমন দশ বছর পর বড়োদাকে দেখেই ভালোবেসে ফেলল, পরিতোষ অবশ্য তা করছে না, মানুষটাকে পরীক্ষা করে সূক্ষ্মভাবে বিচার করে তারপর ভালোবাসবে।

কিন্তু রমলার যেন মনে হল, সেদিন পরিতোষের ভালোবাসাটাও বাড়াবাড়ি হবে—ভয়ংকর কিছু হবে, উগ্র ভালোবাসাও পৃথিবীতে অনেক অনর্থ সৃষ্টি করেছে।

রমলা চা করতে পাশের ঘরে চলে গেল। সেই মুহূর্তে পরিতোষ বাড়ি ফিরল।

॥ ১৪ ॥

জগমোহন বাড়ি ফিরতে একটু রাত করে ফেললেন। চেম্বার থেকে বেরোবার মুখে একটা কল্‌ এসেছিল। পার্ক স্ট্রীট। পার্ক স্ট্রীট হয়ে তিনি যখন বাড়ি পৌঁছলেন তখন সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।

এতক্ষণ গিরিজাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে।

পরিতোষ তাকে যেতে দেয় নি। 'বাবার সঙ্গে দেখা করে যাবি, আজও বাবা দুবার তোর কথা জিজ্ঞেস করেছেন—পুরী থেকে গিরিজা ফিরল কি।'

কথাটা সত্য। গিরিজাকে আবার বিশেষ দরকার পড়েছে জগমোহনের। একবার সে তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল—আবার তিনি সঙ্কটে পড়েছেন। একটু আগে চেম্বারে বসেও তিনি গিরিজার কথা চিন্তা করছিলেন।

'তারপর, নীলাচল থেকে আমাদের জন্য কী আনলে?' গিরিজার পিঠে হাত রাখলেন জগমোহন। কাকাবাবুকে প্রণাম করে গিরিজা সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'বোস বোস।' জগমোহন তাঁর নির্দিষ্ট আসনটি দখল করলেন। গিরিজার সঙ্গে কথা বলতে পরিতোষ একতলার বৈঠকখানায় চলে এসেছিল। চা নিয়ে রমলাকে নীচে নামতে হয়েছিল। যেন দুজনের একটা গোপন পরামর্শ আছে, তাই দোতলার ঘরে বন্ধুকে নিয়ে বসা হল না। পরিতোষের ব্যবহারে রমলা অসন্তুষ্ট হয়েছে। এমন বড়ো একটা হয় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওপরে পরিতোষের ঘরে বসে দুজনে কথা বলেছে কত দিন। এখন, আজ, হঠাৎ একতলায় কেন, বুদ্ধিমতী রমলার আঁচ করে নিতে কষ্ট হল না। ওপরে আর একজন আছে, তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত।

এবং এই তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ পরিমল সম্পর্কে কথা বলতে যে দুই বন্ধু নীচের ঘরে আশ্রয় নিল রমলা তা-ও সন্দেহ করল। চা নিয়ে রমলা এক মিনিটও সেখানে থাকে নি। গিরিজা বা পরিতোষ সে রকম কিছু অনুরোধ আজ তাকে করল না। অন্য দিন দুই বন্ধু যখন কথা বলে, রমলাকেও কাছে থাকতে হয়, বসতে হয়, এমনকী তাদের আলোচনায়ও যোগ দিতে হয়। কাঠ সিমেন্টের দর নিয়ে, খাবার নিয়ে, সিনেমা নিয়ে—যা নিয়েই আলোচনা হোক না—অন্তত রমলাকে হুঁ হাঁ করতে হয়—তা না হলে তাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তারা অস্বস্তি বোধ করে। আজ উল্টা জিনিসটা দেখা গেল। রমলা কাছে থাকল না বলে দুই বন্ধু যেন স্বস্তি বোধ করল। একটা চাপা অভিমান নিয়ে রমলা ওপরে চলে গেল এবং আর একবারও নীচে এল না।

এখন দুজনের সঙ্গে জগমোহন এসে যোগ দিলেন। ওপরে গিয়ে পোশাক ছেড়ে আসারও সময় পেলেন না। গিরিজাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে তিনি বসে পড়লেন।

'আজ সকালে কলকাতা পৌঁছেছ?'

গিরিজা হেসে ঘাড় কাত করল।

'শনিবার ফিরতাম, চিল্কাটা এবার দেখে এলাম তাই দুদিন দেরি হয়ে গেল।'

'তা এমন বাইরে গেলে দু'চারদিন—' তার পর আবার মৃদু গলায় জগমোহন কী বললেন বোঝা গেল না। তিনি পরিতোষকে দেখলেন। নীরব নতমুখ হয়ে নখ দিয়ে টেবিলের বনাত খুঁটছে। জগমোহনের উৎফুল্ল ভাবটা চলে গেল। দেখতে দেখতে মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। পরিতোষের দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে আবার গিরিজাকে দেখলেন।

'আপনার শরীর ভালো আছে কাকাবাবু?' গিরিজা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, শরীর—' ঈষৎ বিকৃত শোনাল তাঁর গলার স্বর। যেন ছেলেটি আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে তাঁর শরীর তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলছে, এবং এই জিনিস অভিজ্ঞ চিকিৎসক হয়ে তিনি যত ভালো বোঝেন, নিজের দেহের প্রতি তাঁর যেমন সতর্ক কঠোর দৃষ্টি এমন আর কারোর নেই—থাকা উচিত নয়, এই রকম একটা মনের ভাব নিয়ে বুঝি জগমোহন প্রশ্নটা সেখানেই থামিয়ে দিতে চাইলেন। 'শরীর আমার ভালোই আছে।' কথা শেষ করে তিনি অন্য দিকে চোখ রাখলেন। গিরিজা বুঝল জগমোহন অন্য কিছু চিন্তা করছেন। এমনটাই সে আশা করছিল যদিও, সে এবং তার বন্ধু পরিতোষ মুখ তুলে আড়চোখে বাবাকে দেখল।

'বউমা—'ওপরের দিকে তাকিয়ে তিনি গম্ভীর গলায় ডাকলেন।

এক মিনিট পর রমলা ধীরে ধীরে নীচে নেমে এল। ভিতরে ঢুকল না। দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। যেন ঘুমিয়ে উঠেছে। চোখ দুটো ফোলা ফোলা।

জগমোহন পুত্রবধূর দিকে ঘাড় ফেরালেন।

'কেউ ফোন করেছিল?'

'না।' রমলা চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকাল। মিথ্যা কথাই তাকে বলতে হল। ফোনের কথায় পরিতোষও হঠাৎ উৎসুক হয়ে উঠে স্ত্রীকে দেখছিল। কিন্তু রমলা তার দিকে তাকাল না লক্ষ্য করে কেমন যেন হতাশ হয়ে পরিতোষ আবার টেবিলের বনাত খুঁটতে লাগল।

'বউমা—' জগমোহন আবার ডাকলেন। এবার তাঁর গলার স্বরটা একটু ভাঙা, যেন কিছুটা বিষাদমাখা। 'পরিমল বাড়ি ফিরেছে?'

'হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।' যেন এই প্রশ্নটাই রমলা এতক্ষণ আশা করছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দিতে পারল। 'অনেকক্ষণ ফিরে এসেছেন।' কথা বলার সময় তার চোখ উজ্জ্বল এবং স্বচ্ছ হয়ে উঠল। পরিতোষ গিরিজা দুজনই লক্ষ্য করল।

জগমোহন হঠাৎ চোখ বুজে চুপ করে রইলেন।

ঘরটা স্তব্ধ হয়ে গেল। সকলেই নীরব সকলেই অধোবদন। বুঝি মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সময় মানুষ এমন চুপ করে থাকে। অথবা মর্মান্তিক শোকবার্তা শুনে কারো মুখে কতক্ষণ যেমন কথা সরে না।

'আচ্ছা, তুমি ওপরে যাও।' জগমোহনই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করলেন। রমলা দরজা থেকে সরে গেল।

'নাতি ঘুমিয়েছে?' জগমোহন আবার চেঁচিয়ে উঠলেন।

সিঁড়িপথ থেকে রমলা 'হ্যাঁ' বলল কী 'না' বলল বোঝা গেল না। তার গলার স্বরটাই শুধু শোনা গেল।

কিন্তু এই জন্য জগমোহন খুব একটা গ্রাহ্য করলেন না। তৎক্ষণাৎ গিরিজার দিকে চোখ ফেরালেন। সামনের দিকে ঝুঁকে বসলেন।

'তোমার সঙ্গে তা হলে পরিমলের দেখা হয়েছে!'

'আমি দেখেছি', অনেকটা ফিসফিসে গলায় গিরিজা বলল, 'আমায় দেখেছে কিনা বুঝতে পারলাম না। আমি পরিতোষের ঘরে ছিলাম। বারান্দা পার হয়ে লর্ড নিজের ঘরে চলে গেল।'

জগমোহনের ভুরুর মাঝখানের চামড়া কুঁচকে রইল। এক সেকেণ্ড চুপ থেকে তিনি পরিতোষের দিকে তাকালেন।

'পরিতোষও কি তা হলে—'

'আমি পরে ফিরেছি—এসে শুনলাম দাদা আজ বেরিয়েছিল।'

'হুঁ, বেরিয়েছিল'—জগমোহন ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন। 'আমি থাকতে থাকতেই বেরিয়ে গেল দেখলাম। চেম্বারে যাবার জন্য তখন আমি তৈরি হচ্ছি—'

পরিতোষ কথা বলল না।

গিরিজা বলল, 'আপনি আসবার আগে এই নিয়ে পরিতোষের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল—'

'কী কথা হচ্ছিল শুনি?' জগমোহন আর একটু ঝুঁকে বসলেন। এবার তাঁর মুখের সবটা

চামড়া কুঁচকে উঠল। 'আমি ভয়ঙ্কর চিন্তিত হয়ে পড়েছি, গিরিজা, সে বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম দুর্ভাবনা আরম্ভ হয়েছে, কাল রাত্রে আমার ভালো ঘুম হয় নি।'

'না, এখনি আপনি এতটা বিচলিত হবেন না।' কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে গিরিজা সোজা হয়ে বসল। আড়চোখে একবার পরিতোষকে দেখল। 'একটু আগে পরিতোষকে তাই বলছিলাম। আমার সঙ্গে সে একমত হয়েছে। লর্ডকে এখন ফ্রীলি চলাফেরা করতে দিতে হবে। বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। তাতে ফল খারাপ হতে পারে।'

জগমোহন চুপ করে শুনলেন।

'তা ছাড়া, সারাদিন বাড়ি বসে থাকতে দেওয়াও উচিত না। একটু বেরোক—বাইরে ঘোরাফেরা করুক।'

'তা-ও বটে। সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকতে দেওয়াটাও খারাপ।' জগমোহন মাথা নাড়লেন। 'অলস হয়ে যায় মানুষ। Idle brain is devil's workshop. তুমি ঠিকই বলেছ। তবে কী জান গিরিজা, জায়গাটা খারাপ, হুঁ, আমি তোমাদের এই কলকাতা শহরটার কথা ভেবে ভয় পাই। অবশ্য এই শহরে আমি আছি, তুমি আছ, আমার পরিতোষ আছে—কিন্তু তোমাকে দিয়ে আমাকে দিয়ে পরিতোষকে দিয়ে ভয় করার কিছু নেই—লোকবিশেষের জন্য ভয়, ভাবনা, আমি কী বলতে চাইছি নিশ্চয় বুঝতে পারছ?'

গিরিজা নীরব।

'চতুর্দিকে প্রলোভন, মনোহর মূর্তি নিয়ে এখানে পাপের দেবতাদের অবাধ সঞ্চরণ—কপালে ভুরু তুলে জগমোহন চোখ দুটো বড়ো করে ফেললেন। গিরিজার কেমন হাসি পাচ্ছিল। ডাক্তার মানুষ, কিন্তু এক একটা বিশেষ মুহূর্তে তিনি চমৎকার সাহিত্যের ভাষা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। 'এই অবস্থায় সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানশূন্য, অবিবেচক, হুজুগে, সেণ্টিমেণ্টাল এবং তোমরা যাকে বল প্যাশনেট—অবশ্য আমি এখানে ঠিক কামুক শব্দটা ব্যবহার করতে চাই না—বলব প্রণয়বিলাসী, কিন্তু তা-ও খারাপ, এ সব নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে কতজন উচ্ছন্নে গেছে—হ্যাঁ, এই ছেলেকে, এমন যার প্রকৃতি, মানসিক গঠন—যেখানে সেখানে চলাফেরা করতে দিতে ভয় করে নাকি?'

'সুকোমল কী বলল?' পরিতোষ এই প্রথম জগমোহনের চোখের দিকে তাকাল।

'কিছুই না।' জগমোহন মেজো ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে গাঢ় নিশ্বাস ফেললেন। 'সবই তাকে ভেঙে বললাম, শুনল, শুনে চুপ করে রইল—তারপর আড়াইটার ট্রেন ধরতে হুড়মুড় করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।'

'আমি এসে শুনলাম, কাল নাকি ওদের আশ্রমে উৎসবটুৎসব কী আছে।'

'ঘোড়ার ডিম আছে।' জগমোহনের মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠল। 'বুঝলে গিরিজা, পরিতোষকে কাল রাত্রে বলেছিলাম, সন্ন্যেসী ছোঁড়াকে খবর দিয়েছি, সে এলে আমি তাকে বুঝিয়ে বললে বুঝবে; পরিবারের প্রতি, আমার এই সংসারের প্রতি তার কোনো দায়িত্ব নেই, কর্তব্য নেই ঠিকই—কিন্তু কোনো কোনো ব্যাপারে তোমাকে দায়িত্ব নিতে হবে বইকি, কর্তব্য পালনও করতে হবে। আর এই দায়িত্ব তো তুমিই নেবে। একটা ফলেন্—বিপথগামী মানুষকে তোমরা ধর্মাচারীরা তো রক্ষা করবে। ভেবেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে সে রাজি হয়ে যাবে এবং আগ্রহের সঙ্গেই তার বড়োদাকে আশ্রমে নিয়ে যাবার জন্য—সেখানে অন্তত কিছুদিন

তাকে রাখার ব্যবস্থাও করবে। কিন্তু এক কান দিয়ে শুনল আর এক কান দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত হুঁ হাঁ কিছুই বলল না আমাকে—আশ্রমে কাজ আছে বলে থলে কাঁধে ঝুলিয়ে দুপুরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।'

'কিন্তু আমার মনে হয়, একটু আগে পরিতোষকে বলছিলাম, লর্ডকে এখনই আশ্রমে পাঠাবার পক্ষপাতী আমি নই।'

'কেন নও শুনি?'

'পরিমলের মন সেভাবে তৈরি হয়েছে বলে মনে হয় না। আশ্রম-জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে তার ভয়ংকর কষ্ট হবে—পারবে না। জোর জবরদস্তি করে সেখানে পাঠাতে গেলে তার মনের ওপর চাপ পড়বে—তাতে উল্টা ফল হবে—রিয়্যাকশন দেখা দেবে।'

'তবে তোমরা আমায় কী করতে পরামর্শ দিচ্ছ শুনি?' জগমোহন হতাশ হয়ে একবার গিরিজার দিকে একবার পরিতোষের দিকে তাকাল। 'দুশ্চিন্তায় আমার যে ঘুম হচ্ছে না।'

'তা ছাড়া দীক্ষা না নেওয়া পর্যন্ত আশ্রমে থাকতে দেবে কেন।' পরিতোষ বলল, 'সুকোমলের মুখে সেরকমই তো শুনি। যেদিন থেকে সে আশ্রমবাসী হল, সেদিন থেকে তার সন্ন্যাসজীবন আরম্ভ হল। এবং দীক্ষা লাভেরও একটা সময় আছে—একটা পিরিয়ড আছে—ঠাকুর এক দিনেই কিছু কাউকে দীক্ষা দান করেন না। আপনার হয়তো মনে নেই—সুকোমলকে কি কম দিন আশ্রমে ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল—দীক্ষালাভের জন্যও নাকি সাধনা করতে হয়। ঠাকুর আগে পরীক্ষা করে দেখেন—'

'যাক গে—', জগমোহন মাথা ঝাঁকালেন, 'আমি আর এসব শুনতে চাই না, দীক্ষা, সন্ন্যাস, আশ্রম, ঠাকুর, অনেক শোনা হয়েছে—ফেড্ আপ হয়ে গেছি আমি—মোট কথা আমার কনিষ্ঠ পুত্রটি একটি স্বার্থপর জীব ছাড়া আর কিছু না—আমি তাকে চিনে ফেলেছি, নিজের সুখ নিজের শান্তি ছড়া অন্য কিছু চিন্তা করার তার সময় নেই। আমার ইহকালের চিন্তা আমার পরকালের চিন্তা—দুটো কালকেই আমি সোনার পাত দিয়ে মুড়ে রাখব। তাই রাতদিন সাধন-ভজন, ঠাকুর আর গুরুভাইদের নিয়ে মত্ত রয়েছি। বাপকে দেখব না, ভাইকে দেখব না, আত্মীয়স্বজনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখব। বলতে কী, এই সাধু সন্ন্যাসীগুলো আমার দু চোখের বিষ—না, ঐ ছোঁড়াকে দিয়ে আমি আর কিছু আশা করি না—এখন তোমরা বল, আমায় বুদ্ধি দাও কী করতে হবে।'

'আপনাকে কে বুদ্ধি দেবে, কাকাবাবু।' বিনয়ের ভঙ্গিতে মাথাটা একদিকে হেলিয়ে দিয়ে গিরিজা হাসল। 'আপনি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি চিন্তাশীল বিচক্ষণ দূরদর্শী এবং অভিজ্ঞ। আপনি বরং আমাদের বুদ্ধি দেবেন, উপদেশ দেবেন। সেই উপদেশ আমরা মাথা পেতে গ্রহণ করব। তবে এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয়ে পরিতোষকেও আমি বলেছি, জিনিসটাকে আমরা সহজভাবে নিতে চেষ্টা করব। ধরুন এই পরিমল সেই পরিমল নয়। সম্পূর্ণ একটি নূতন মানুষ আমাদের মধ্যে এসেছে। এ যে পরিতোষের দাদা কী আমার বন্ধু কী আপনার সন্তান, আপাতত আমরা তা ভুলে থাকব। ভুলে থাকা সম্ভব না যদিও—তবু চেষ্টা করতে হবে। অনেকটা নিরপেক্ষ-দৃষ্টি নিয়ে নির্লিপ্ত মন নিয়ে আমরা তাকে দেখব, বুঝব, বিচার করব। এখনি তার কাছে আমরা কিছু প্রত্যাশা করব না, দাবি করব না বা চাপ দিয়ে তাকে কোনো রকম বাধ্যবাধকতার মধ্যেও টেনে আনব না। সে কী চাইছে কী বলছে, আমাদের

দেখতে হবে শুনতে হবে। সুকোমল হয়তো ঠিকই বলেছে—দীর্ঘ দিন জেলের জীবন কাটিয়ে মানুষটা একেবারে বদলে গেছে। এখন এই পরিবর্তন তাকে ভালো করেছে কী মন্দ করেছে জানি না। পরিতোষও তাই বলছিল। সুকোমলের মতন আমরা অপ্‌টিমিস্ট হতে পারছি না। অপ্‌টিমিস্ট হতে পারছি না, আবার একেবারে নিরাশ হতেও বাধছে। কঠোর দণ্ডভোগের ফলে মানুষের বিবেকবুদ্ধি সুস্থ পরিচ্ছন্ন হয়েছে, দৃষ্টিভঙ্গি সুন্দর হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত আছে বইকি। আবার এটাও মনে রাখতে হবে, এক একটা জেল ক্রিমিন্যালের আড্ডা—নানা চরিত্রের অপরাধী সেখানে জড়ো হয়। তাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল মেলামেশার ফলে কত নিরীহ সৎস্বভাবের মানুষেরও অধঃপতন ঘটেছে। হ্যাঁ, অপরাধ না করেও একজন চরিত্রবান বিবেকবান মানুষ ভাগ্যের দোষে জেল খাটতে পারে, আপনার অজানা নেই। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর দেখা গেল সেই মানুষ সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে গেছে। যাই হোক—লর্ডকে আমাদের স্টাডি করতে হবে। তা না করে আজই তার সম্পর্কে কোনরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আমাদের ঠিক না। সেটা রং ক্যালকুলেশান হবে।'

জগমোহন চুপ করে রইলেন।

কথা বন্ধ করে গিরিজা আড় চোখে পরিতোষকে দেখল। অধোবদন হয়ে জগমোহন কিছু একটা চিন্তা করছিলেন। গিরিজা তাঁকেও দেখল। তার সিগারেটের পিপাসা পেয়েছিল। কিন্তু এখানে জগমোহনের সামনে সেটা সম্ভব না। অগত্যা পকেটে হাত ঢুকিয়ে বাক্সটা দুবার স্পর্শ করে তাকে পিপাসা ঠেকিয়ে রাখতে হল।

'আমি আর একটা বিষয়ে চিন্তা করেছি।' এবার একটু চাপা গলায় গিরিজা বলল, 'না, আপনি মনে করবেন না যে আমি তেমন কিছু আশঙ্কা করছি। বললাম তো, লর্ড সম্পর্কে এখনি কিছু আশঙ্কা করার বা আশ্বস্ত হওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। দুটো দিন যাক। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন হতে দেখা গেছে—তাই হঠাৎ কথাটা মনে হল।'

জগমোহনের কপালের রেখাগুলি একত্র জমাট বেঁধে গেল। অল্প শব্দ করে কাশলেন তিনি, এদিক ওদিক দুবার তাকালেন, তারপর গলাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

'তোমার কী মনে হয়েছে পরিষ্কার করে আমায় বলতো, এখানে সঙ্কোচ করার কিছু নেই। জান তো, আমি ডাক্তার, সব খুলে ভেঙ্গে রুগীরা যদি আমাকে না বলে আমি চটে যাই। কোনোরকম গোপনতা লুকোচাপা আমি পছন্দ করি না। মানুষের মনের কথা—ভেতরের কথা শুনতেই আমি অভ্যস্ত। অবশ্য এখানে তুমি রুগী না, রুগীর বন্ধু ভক্ত শিষ্য শুভানুধ্যায়ী—পরিমল সম্পর্কে তুমি যদি কিছু সন্দেহ করে থাক, যদি অত্যন্ত মৃদুরকম আশঙ্কাও তোমার মনে সৃষ্টি হয়ে থাকে আমাকে নিশ্চয়ই বলবে—আমি সুখী হব আনন্দিত হব—তা ছাড়া সব খোলাখুলিভাবে আলোচনা করার জন্য আমরা এখানে একত্র হয়েছি, পরিতোষ, তুমি চুপ করে আছ?'

পরিতোষ ঘাড় তুলে জগমোহনের দিকে তাকাল, কথা বলল না।

গিরিজা একটু বিব্রতবোধ করল। তার মুখের ভাঙা অস্পষ্ট হাসিটা তা প্রমাণ করল কিন্তু তা হলেও সে চুপ থাকল না।.

'শুনুন, কাকাবাবু, আমি দশ বছর পর লর্ডকে আজ এইমাত্র একটুখানি দেখলাম। আপনারাও অনেকদিন পর দেখছেন। তা হলেও দুদিন সে বাড়িতে আছে। তার খাওয়া ঘুম

হাঁটাচলা লক্ষ্য করছেন। কম হোক বেশি হোক তার সঙ্গে কথাও বলেছেন। এখন সেটা আপনারা বুঝতে পারেন; আপনি, পরিতোষ বা পরিতোষের স্ত্রী।'

পরিতোষ একটু অবাক হয়ে গিরিজার দিকে তাকাল। কারণ জগমোহন আসার আগে পরিমলের বিষয় নিয়ে গিরিজার সঙ্গে তার অনেক কথাই হয়েছে। এখন গিরিজা যেন অন্য কিছু, নূতন কিছু বলতে চাইছে।

'আমি তোমায় ঠিক ফলো করতে পারছি না, গিরিজা।' জগমোহনের কপালের রেখাগুলি এবার ছড়িয়ে পড়ল। চোখ দুটো বড়ো হয়ে গেল। তাঁর মুখ দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল নূতন করে তিনি অস্বস্তিবোধ করছেন। 'আমি—না, খুব একটা কথা হয়নি আমার সঙ্গে। সব মিলিয়ে দুটো কী তিনটে কথা বলেছি এ পর্যন্ত বড়ো ছেলের সঙ্গে। পরিতোষ কিছু কথা বলেছে, তা-ও ব্যক্তিগত কোনো বিষয় নিয়ে নয়—জেনারেল টক্—যেমন আবহাওয়া, বাজারদর, কলকাতার জায়গা জমির চড়া দাম, বাড়ি তৈরি করার হাঙ্গামা, সিমেণ্টের দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদি—পরিতোষ তার নিজের সুখ-সুবিধা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা কিছু বলে নি বা পরিমলের সুখদুঃখের কথা, জেলখানায় সে কেমন ছিল, বাড়ি এসে কেমন লাগছে ইত্যাদি নিয়েও তার দাদাকে কোনো প্রশ্ন করেনি—কেমন, তাই না পরিতোষ?'

তেমনি নীরব থেকে পরিতোষ ঘাড়টা একটু কাত করল।

'এবং রমলার সঙ্গে এখন পর্যন্ত একটা কথাও হয় নি—সম্পর্কে ভাশুর। তা না হয় হ'ল। আজকাল বউরা ভাশুরদের সঙ্গে ফ্রীলি সব কথা বলে। আমাদের কালে এটা ছিল না। হয়তো রমলাও ভবিষ্যতে কথা-টথা বলবে আশা করা যায়। কিন্তু এখন বউমার কাছে মানুষটা একেবারে নূতন—তার ওপর—এবং আমার মনে হয় এটাই সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক—মেয়েদের মন কত সফ্‌ট, কত সহজে তারা ভয় পায়, নার্ভাস হয়ে পড়ে, আর এখানে আমার ছেলে খুন করে দশ বছর জেল খেটে বেরিয়ে এসেছে—কাজেই ভাশুর বাড়ি আসবার সঙ্গে সঙ্গে বউমা যদি তেমন একটা প্রীতি ও শ্রদ্ধার মন নিয়ে তাকে গ্রহণ করতে না পারে, বা মানুষটিকে একটু এড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে তো বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না—পরিতোষের স্ত্রীর পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক।'

'তা তো বটেই'—কনুইয়ের ওপর শরীরের ভর রেখে গিরিজা আবার একটু ঝুঁকে বসল। 'তা হলেও একটা মানুষকে দেখে যতটা বোঝা যায়—'

বন্ধুর কথা শুনে পরিতোষের এখন কেমন একটু সন্দেহ হল। গিরিজার দিকে সে চোখ ফেরাল।

'তুমি কি দাদার ব্রেন অ্যাফেক্টেড হওয়া-টওয়া নিয়ে কিছু ইঙ্গিত করছ—ইন্‌স্যানিটি বা ঐ ধরনের মানসিক কোনোরকম—'

গিরিজা সবেগে মাথা নাড়ল।

'না, লর্ড সম্পর্কে এমন ইঙ্গিত আমি করছি না—আমি মনে করি না যে—তবে কিনা.......শোন আমি কী বলতে চাইছি। জেল জিনিসটার সঙ্গে আমাদের কারো পরিচয় নেই—সেটা একটা অন্য জগৎ, অ্যানাদার ওয়ার্লড, এখন ভাগ্যের দোষে হোক কী কর্ম দোষে হোক, আমাদের মতন নিরীহ লোক সেখানে গিয়ে পড়লে প্রায়ই মাথা ঠিক রাখতে পারে না—সেখানকার কঠোর নিয়মকানুনের মধ্যে একটা বদ্ধ জায়গায় দিনের পর দিন

বাস করা—যাদের আট বছর দশ বছর, কারো কারো আরো বেশি, বারো বছর চৌদ্দ বছর এভাবে কাটাতে হয় তাদের মনের অবস্থা স্বাভাবিক থাকতে পারে কি? তার ওপর নিদারুণ শারীরিক শ্রম। রিগারাস ইম্প্রিজনমেণ্ট বলতে যা বোঝায়। এবং দীর্ঘকাল পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা। এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে কাদের মধ্যে বাস করেছে? বিচিত্র চরিত্রের সব কন্‌ভিক্ট। সব জিনিসগুলি মনের ওপর কাজ করছে। ইন্‌স্যানিটি কথাটা বড়ো জিনিস—একটা ভারি শব্দ, তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বটে—কিন্তু সেটা না হয় এখানে বাদ দিলাম, তা, হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর মানুষটার মেজাজ-মরজি চালচলন বদলে গেছে, যেন স্বাভাবিক অবস্থায় নেই সে, অদ্ভুত আচরণ করছে, কথাবার্তাও অন্য রকম—আমি কী বলতে চাইছি এবার কিছুটা আঁচ করতে পারবে।'

জগমোহন স্থিরচোখে গিরিজার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলি শুনছিলেন। গিরিজার কথা শেষ হতে তাঁর ঠোঁট দুটো ঈষৎ নড়ে উঠল, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

'দাদার চালচলন কথাবার্তার মধ্যে কোনোরকম অ্যাবনর্মালিটি আমাদের চোখে পড়েছে কিনা এই তো তুমি জানতে চাইছ? তাই না?' পরিতোষ হঠাৎ অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, এটা তোমরাই বুঝবে, আমি শুধু এইমাত্র—' গিরিজার কথাগুলি একটু অস্পষ্ট শোনাল, যেন জড়িয়েও গেল।

'না, সেরকম কিছু আমাদের চোখে পড়ে নি—'

জগমোহন তাঁর দীর্ঘ দেহ সোজা করে ধরলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দরজার বাইরে তাকালেন, তারপর পরিতোষের দিকে চোখ ফেরালেন। 'পরিতোষ, তোমার চোখে কি কিছু—আমি তো সেরকম কিছু দেখলাম না।'

'না', পরিতোষ মাথা নাড়ল, 'আমার তা মনে হয় না।'

জগমোহন কি খুশি হলেন? যেন তিনি খুশিই হলেন মেজো ছেলের কথা শুনে। একটু গর্বের ভঙ্গিতে গিরিজাকে দেখলেন। 'ইনস্যানিটি অ্যাব্‌নর্মালিটি মেণ্টাল ডিরেঞ্জ্‌মেণ্ট্—সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে সবই এক পর্যায়ে পড়ে, মাথার গণ্ডগোল—তবে কিনা ডিগ্রির তারতম্য আছে; হুঁ, বৃষ্টি নামল আর অমনি তুমি হা হা করে রাস্তায় ছুটে গিয়ে বেশ খানিকটা ভিজে এলে, বললাম, হঠাৎ এই পাগলামি কেন, আবার জেনেশুনে আগুনে ঝাঁপ দেয় এমন পাগলও চোখে পড়ে। আমি চেয়ারে না বসে হঠাৎ চেয়ারের হাতলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসলাম—এটাও অস্বাভাবিক, কিন্তু তুমি কি বলবে কাকাবাবু অ্যাব্‌নর্মাল? কিন্তু আমি যদি ঘরে ঢুকেই চেয়ারটা উল্টে ফেলে চার পায়ার গর্তের মধ্যে বসে পড়ি তখন তোমার চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে, পরিতোষের কানে কানে ফিসফিস করে একটা কিছু বলবে—তোমার চোখে সন্দেহ ভয় দুশ্চিন্তা অনেক কিছু ফুটে উঠবে, তাই নয় কি? তা হলেও আমরা সকলেই কিন্তু সময় সময় একটু আধটু পাগলামি করি, আমাদের চালচলন কথাবার্তার মধ্যেও অস্বাভাবিকতা অসংলগ্নতা থেকে যায়—তবে দেখতে হবে আর পাঁচটি মানুষের চোখ মন এই অস্বাভাবিকতা অসংলগ্নতা কতটা মেনে নিচ্ছে, কতখানি সহ্য করছে। সীমা ছাড়িয়ে গেলেই তারা বলবে, অমুকের মাথার গোলমাল হয়েছে—গোলমালের মাত্রা আর একটু

বেশি হলে বলবে, লোকটা বদ্ধ উন্মাদ।' কথা শেষ করে জগমোহন অল্প শব্দ করে হাসলেন। ঘরের ভিতরটা থম্‌থম করতে লাগল। গিরিজা নীরব। পরিতোষ অধোবদন হয়ে নখ দিয়ে টেবিলের বনাত খুঁটছিল।

'তা ছাড়া', জগমোহন আবার বললেন, 'আমাদের বংশের কারো কোন সময় এই রোগ হয়েছিল জানা যায় না। আমি অবশ্য সব সময় কথাটা বিশ্বাস করি না—তা হলেও অনেকে বলে শুনি, উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো কোনো মানুষ এই মাথার রোগটি পেয়ে যায়। সকলে পায় না। হয়তো ঠাকুর্দা উন্মাদ ছিল, ছেলের মধ্যে তা দেখা গেল না, কিন্তু নাতির মধ্যে লক্ষণটি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেল। সব সময় এই থিয়োরি খাটে না। আমাদের মেডিকেল সায়ান্সে বলে—'

'থাক, এত কথা এখানে ওঠে না।' জগমোহনের বক্তৃতা দীর্ঘ হচ্ছে লক্ষ্য করে যেন পরিতোষ একটু অধৈর্য হয়ে পড়ল, তা ছাড়া তার মুখ দেখে বোঝা গেল আলোচনাটা তার ভালো লাগছে না। ঘাড় ঘুরিয়ে সে গিরিজার দিকে তাকাল। 'জেলখানা একটা অত্যন্ত বাজে জায়গা। এবং দীর্ঘকাল দাদাকে সেখানে থাকতেও হয়েছে—কিন্তু কাল এবং আজ তাঁকে দেখে তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হল না কোনোরকম পাগলামির ছিট বা বিকৃতি অথবা অস্বাভাবিকতা মানুষটার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। অন্তত আমার চোখে তা পড়ে নি। মনটা তাঁর চিরদিনই শক্ত—কাজেই কোন অবস্থায়—' পরিতোষ জগমোহনকে দেখল।

জগমোহন সোৎসাহে ঘাড় নাড়লেন। পরিতোষকে শেষ করতে না দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'আমি ঠিক এই পয়েণ্টেই আসছিলাম—কিন্তু তুমি আমাকে বলে শেষ করতে দিলে না। শোন গিরিজা, অত্যন্ত শক্ত নার্ভের মানুষ তোমার এই লর্ড। আমার ছেলে—আমি তাকে চিনি—সাময়িক উত্তেজনাবশত—আমি এটাকে উত্তেজনা বলতেও রাজি নই—দীর্ঘদিনের আক্রোশ দ্বেষ ক্রোধ প্রতিহিংসা ইত্যাদি ভেতরে জমা হয়ে হয়ে শেষ পর্যন্ত সে একদিন অক্ষয় উকিলের ছেলেকে—সে যাই হোক, চট্ করে নিজের ওপর কণ্ট্রোল হারাবার মানুষ কিন্তু সে নয়। আজ যদি পরিতোষ হত তবে ভয়ের করণ ছিল। মনটা নরম ভেতরটা দুর্বল। হয়তো দশ বছর সশ্রম কারাবাস তার সহ্য হত না—সে ভেঙে পড়ত—মন শরীর দুটোরই সর্বনাশ ঘটত—মাথার রোগ মনের রোগ দেহের রোগ—অনেক কিছুই তাকে আক্রমণ করত—ছোটো ছেলের কথা অবশ্য আমি বলতে পারব না—সে আমার ধ্যানধারণার বাইরে চলে গেছে—অ্যাডলেসেণ্ট পিরিয়ডে যে ছেলে কৌপিন পরতে আরম্ভ করে গীতা পাঠ করে আশ্রমে মঠে ঘুরে গুরু অন্বেষণ করে বেড়ায় সেই ছেলের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা আমার কর্ম নয়—হ্যাঁ, মেজো ছেলে পরিতোষ সম্পর্কে কী বড়ো ছেলে পরিমল সম্পর্কে আমি দুটো কথা জোর গলায় বলতে পারি। পরিতোষের ভেতরটা নরম, তেমনি পরিমলের ভেতরটা ভয়ানক শক্ত। ইস্পাতের মতন কঠিন। কোনো অবস্থায় ভেঙে পড়ার মানুষ সে নয়। লং ইম্প্রিজন্‌মেণ্ট তার শরীরের বা মগজের কোনরকম ক্ষতি করেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। বরং শরীরটা তো ভালোই হয়েছে—হেল্‌থ ইম্প্রুভ করেছে—তাই না, পরিতোষ?'

পরিতোষ শব্দ করল না।

'এবং মাথারও কোনো গোলমাল হয় নি।' জগমোহন গম্ভীর গলায় বললেন, 'অত্যন্ত সচেতন সতর্ক পুরুষ। মাথা ঠিক রেখে যে কোনো পরিবেশ যে কোনো অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতা সে রাখে। জেলে থেকে তার চরিত্রের, তার দৃষ্টিভঙ্গির কতটা অবনতি বা উন্নতি ঘটেছে বলতে পারব না। কিন্তু ব্রেন-সিক্ হয়ে যে সেখান থেকে সে বেরিয়ে আসে নি এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত।'

গিরিজা কিছু বলছিল না। কথাগুলি শুনে যাচ্ছিল। জগমোহন চুপ করতে সে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তুমি কি ওপরে যাবে—লর্ডের সঙ্গে কথা বলবে?'

'আজ থাক, কাকাবাবু। পরিতোষ আমায় বলেছিল, কিন্তু চিন্তা করে দেখলাম, লর্ডের মনের অবস্থা কেমন না জেনে এখনি তাকে গিয়ে ডিস্টার্ব করা ঠিক হবে না।'

'সেই ভালো।' জগমোহন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, হাতের ঘড়ি দেখলেন। 'দশটা বাজে।' গিরিজা ও পরিতোষের মুখের দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমরা দুজন পরামর্শ করে যা ভালো বুঝবে করবে। আমি খুব অসহায় হয়ে পড়েছি। চলি।'

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। গিরিজা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। পরিতোষ কান পেতে জগমোহনের পায়ের শব্দ শুনছিল। তিনি ওপরে উঠে গেলেন।

'কথা বলছ না?' পরিতোষ বন্ধুর দিকে তাকাল।

গিরিজা অল্প হাসল।

'কাকাবাবুর কথাটাই চিন্তা করছি।'

'বুড়ো একটু বেশি অস্থির হয়ে পড়েছে—এই তো?'

'হ্যাঁ—তা ছাড়া আর একটা জিনিস—তিনি লর্ডের প্রশংসা করলেন কী নিন্দা করলেন ঠিক বোঝা গল না।'

'কী রকম?' পরিতাষ ভুরু কোঁচকাল।

'কোনও অবস্থায় চিত্তবিকার ঘটে না, সংযম হারায় না—মাথা ঠিক রেখে চলতে পারে কে—কারা, বলতে পার?'

গিরিজার প্রশ্নের উত্তর দিল না পরিতোষ। চুপ করে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'যাঁরা মহাপুরুষ। শ্রীঅরবিন্দ জেলখানায় বসে যোগসাধন করেছিলেন। জেল তো ভালো। ডেথ্-পানিশমেন্টই হয়ে গেল সক্রেটিসের। হাসতে হাসতে বিষের পেয়ালা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলো।'

'তবে তো তিনি প্রশংসাই করে গেলেন বড়ো ছেলের।' পরিতোষ হাসতে চেষ্টা করল।

গিরিজা মাথা নাড়ল।

'উল্টোটাও আছে। শয়তানের ঘাড়ের শলা ভয়ংকর শক্ত। কিছুতেই ঘাবড়ায় না। হ্যাবিচুয়াল ক্রিমিন্যাল—যে স্বভাব-দুর্বৃত্ত—'

'এই আলোচনা এখন থাক।' পরিতোষ অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে গেল।

'তাই ভাবছিলাম।' গিরিজা বিড় বিড় করে বলল, 'যদি লর্ডকে এতটা স্থির সংযত সমাহিত না দেখে কিছুটা অস্থির অস্বাভাবিক উদ্‌ভ্রান্ত দেখতেন কাকাবাবু তো নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে তিনি এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভীত চঞ্চল হতেন না।'

॥ ১৫ ॥

এখন বাতাসে ঠাণ্ডার স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে। দক্ষিণের দুটো জানালাই খুলে দিয়েছে সে। আকাশে নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। পার্কটা আর চেনা যায় না। গাঢ় অন্ধকার। লোহার রেলিং দেওয়া সাদা গেটটা শুধু বোঝা যায়। টিমটিম করে একটা বাল্‌ব জ্বলছে। রঙ্গিন ফ্রক পরা ইজের পরা ছোটো ছেলেমেয়েগুলি মাঠটাকে কেমন জীবন্ত করে তুলেছিল এক সময়। অনেকক্ষণ তারা বাড়ি ফিরে গেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে সব। এত রাত্রে শিশু জেগে থাকে না। কিন্তু জাগবে।

একটু একটু করে তাদের বয়স বাড়তে থাকবে আর তারা রাত জাগতে আরম্ভ করবে। একটু একটু করে তারা বুঝতে শিখবে, তাদের যন্ত্রণার দিন আরম্ভ হবে। সেদিন আর তাদের মুখের কচি গন্ধ থাকবে না, চোখের তারার কালো ঝিকিমিকি নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।

সেদিন আর এই পার্কে এমন ছুটোছুটি করতে আসবে না এই শিশুর দল। পরিমল একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

নূতন শিশুরা আসবে, কিন্তু বিকালে যাদের দেখা গেল তারা চিরদিনের মতন হারিয়ে যাবে। তারা তখন যন্ত্রণাবিদ্ধ অভিশপ্ত মানব-মানবী। যেমন আমি, পরিমল চিন্তা করল, যেমন আমার ভাই পরিতোষ, বাবা জগমোহন এবং পৃথিবীর আর-সব বয়স্ক মানুষ। অধিকতর জ্ঞানলাভের আশায়, সুখ পাবার লোভে আমরা তাড়াতাড়ি বড়ো হই--আড়াআড়ি করে নিজেদের শৈশবকে গলা টিপে হত্যা করি। তারপর একদিন পরম বিচক্ষণ জ্ঞানবান দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ হয়ে যাবার পর যখন নিজেদের দিকে তাকাই তখন হতাশ হই। তখন মনে হয় আমরা অনেক কিছু পেয়েছি, কিন্তু ভিতরটা শূন্য রিক্ত বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমরা কাঁদি। চোখে জল নিয়ে পিছনের দিকে তাকাই। কিন্তু তখন আর সময় নেই।

কতদিন পর পরিমল আজ এক জায়গায় এতগুলি শিশু দেখল। তাই সে তার নিজের ও পৃথিবীর সব মানুষের শৈশব নিয়ে ভাবল।

গায়ের পাঞ্জাবি খুলে ফেলল সে, জরিপাড় শান্তিপুরী ছেড়ে পায়জামা পরল। জামাটা ব্রেকেটে ঝুলিয়ে রাখতে গিয়ে মনিব্যাগটা হাতে ঠেকল, অথবা ওটার কথা তার তখন মনে পড়ল। একটি কপর্দকও খরচ হয় নেই। স্বাভাবিক। মনে মনে সে হাসল। খরচ করা সে ভুলে গেছে। দীর্ঘ দশ বছরের অভ্যাস। জেলে টাকা পয়সা সে চোখে দেখে নি। না, দেখেছিল, তারা সবাই দেখত। সিরাজুদ্দিনের একটা চকচকে আধুলি ছিল। গলার খাঁজের ভিতর মুদ্রাটা সে লুকিয়ে রাখত। মাঝে মাঝে উগরে গলার ভিতর থেকে সেটা বার করে এনে কয়েদিদের দেখাত। প্রত্যেকে হাতে তুলে আধুলিটা বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখত, দীর্ঘশ্বাস ফেলত। প্রত্যেকেই একটু বেশি সময় ওটা হাতে রাখতে চেষ্টা করত। যেন ওটা একলা সিরাজুদ্দিনের না, সকলেরই। সবাই ওই রজতখণ্ডের মালিক। কেননা সিরাজুদ্দিন তো ওটা খরচ করতে পারত না। যেন এই ভেবে ভিতরে ভিতরে সকলেই সন্তুষ্ট ছিল, আধুলিটা নিয়ে তারা লোফালুফি করত, তারপর যখন সেপাইদের বুটের খটখট শব্দ শোনা যেত সিরাজুদ্দিন কোঁৎ করে আধুলিটা গিলে ফেলত। পরে অবশ্য সেপাইরাও জেনে গিয়েছিল সিরাজুদ্দিনের কাছে একটা রূপোর আধুলি আছে। সিরাজুদ্দিন ওয়াক করে গলার খাঁজের

ভিতর থেকে মূল্যবান মুদ্রাটা বার করে সেপাইদের দেখাত, কোন সেপাই হাত বাড়িয়ে ওটা ধরতে গেছে কি সিরাজ কোঁৎ করে আবার ওটা গিলে ফেলেছে। কয়েদীরা হিহি করে হাসত, সেপাইরাও হাসত। তারা ম্যাজিক দেখার মজা পেত। গলার মধ্যে লুকোনো সেই আধুলিটা নিয়েই বুঝি সিরাজুদ্দিন সুইসাইড করেছিল। আধুলিটার কী হয়েছিল আর জানা যায় নি।

মনিব্যাগটা টানার ভিতর রেখে দিল সে। জানালার কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল। আলোটা নিবিয়ে দেবে কিনা চিন্তা করল। তার মনে হল অন্ধকার ভালো লাগবে। অন্ধকার আকাশের জ্বলন্ত নক্ষত্রগুলির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পারবে। কিছুক্ষণ আগে কবরের জমাট নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে আশ্চর্য শান্তি পেয়েছিল সে। এখানে দেওয়ালগুলি বড়ো বেশি সাদা পরিচ্ছন্ন। কোথাও একটু কালির আঁচড় বা দাগ চোখে পড়ে না। এত পরিচ্ছন্নতা এত সাদা চোখে সহ্য হয় না। আর এমন ঝকঝকে আসবাব। টেবিল চেয়ার খাট আলনা সোফা-সেট। সুদৃশ্য পর্দা, কার্পেট। মাঝখানে একটা পুতুলের মানুষ হয়ে বসে থাকা। কৃত্রিম লাগে নিজেকে। দোকানের পুতুল। বাড়ির মানুষগুলিও কৃত্রিম। জগমোহন পরিতোষ পরিতোষের স্ত্রী—কলের পুতুলের মতন নড়াচড়া করছে। মেপে মেপে কথা বলছে। কেউ হাসছে না। বেশি শব্দ করছে না। শিশুটি পর্যন্ত। 'জেঠুমনি' বলে একবার জোরে ডাকলে দ্বিতীয়বার আর ডাকতে পারছে না। জেঠুমণির কোলের কাছে একবার ঘেঁষতে পারলে দ্বিতীয়বার আর কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না। যেন পিছন থেকে কে তাকে চোখের ইশারায় বারণ করছে, চোখ রাঙাচ্ছে। মুখ কালো করে শিশু দূরে সরে যায়।

আলোটা নিবিয়ে দিল পরিমল।

বাইরে আকাশের তারাগুলি অধিকতর উজ্জ্বল মনে হল তখন এবং সত্য।

নিজের মধ্যে ফিরে এল সে। নিজের অস্তিত্ব অনুভব করল।

গোরস্থানের নির্জন অন্ধকারে যেমন নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল। তার জেল-জীবনের শেষ ক' বছরের সার্থক উপলব্ধি আত্মদর্শন।

এখানে এসে বার বার সব গোলমাল হয়ে যায়। নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তার এত কষ্ট হয়! এই জন্যই তার মনে হয় ইয়াসিন গুরুবচন সিং টমাস সিরাজুদ্দিন পিয়ারীলাল তার আপনজন ছিল। আপন মানুষদের কাছ থেকে সে দূরে সরে এসেছে। এখানে যারা আছে তারা পর, অনাত্মীয়। এখানে সে অসহায়।

দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনল সে।

প্রথম মৃদু, তারপর শব্দটা একটু বড়ো হল, স্থায়ী হল।

'কে!' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। আলো জ্বালল। বোধ হয় দীনদয়াল, পরিমল চিন্তা করল। এ বাড়ির এই মানুষটির সঙ্গে তার যা হোক একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। কারণ সে-ই একাধিকবার ঘরে ঢুকছে, ঝাড়পোছ করছে, টেবিল গুছিয়ে দিচ্ছে, বিছানা ঠিক করে দিচ্ছে, চা-জলখাবার এনে দিচ্ছে। 'স্নানের বেলা হল বাবু, স্নান করতে যান', 'ঠাঁই হয়েছে, খেতে আসুন' ইত্যাদি খবর দিতে সে-ই ছুটে ছুটে আসছে—অথবা তাকে পাঠানো হচ্ছে। 'দীনদয়াল?' ভেজানো পাল্লা দুটোর ওপর চোখ রেখে পরিমল স্থির হয়ে দাঁড়াল।

'আমি।' দরজার ওপারে পরিতোষের গলা শোনা গেল।

'এসো, ভেতরে এসো।' পরিমল ভাইকে ডাকল। পাল্লা দুটো টেনে খুলে দিল।

'তোমার ফোন এসেছে।' পরিতোষ চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে থাকল, ভিতরে ঢুকল না।

'আমার!' বিস্ময়ের চোখে পরিমল মেজোভাইয়ের মুখের দিকে এক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে বিড়বিড় করে বলল, 'হঠাৎ আমাকে কে ফোন করবে?'

'হুঁ, বাবার ঘরে, তুমি এসো।' পরিতোষ চৌকাঠ ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

'কে, কে ডাকছে আমাকে টেলিফোনে?' পরিমল নড়ল না। ব্যস্ত হয়ে টেলিফোন ধরতে জগমোহনের ঘরে ছুটে যাবে এমন কোনো লক্ষণ তার মধ্যে প্রকাশ পেল না। বরং কেমন আড়ষ্ট কঠিন হয়ে গেল তার চোখ-মুখ, শরীর। 'নামধাম বললে? কোথা থেকে কথা বলছে?'

. 'তা জানি না। বাবা ফোন ধরেছেন।'

'বাবা কিছুই বলেন নি তোমাকে?' 'না।' পরিতোষ মাথা নাড়ল। 'কিন্তু—'অনেকগুলি রেখা ফুটে উঠল পরিমলের কপালে। 'আমাকে কে ডাকবে, আমার সঙ্গে কে কথা বলবে, আমায় কি কেউ চেনে এখন।' উদাস চোখে পরিমল ব্যালকনির বাইরের অন্ধকার আকাশটার দিকে তাকাল।

'তুমি এসো, বাবা বসে আছেন।' দরজা ছেড়ে চলে যেতে পরিতোষ পা বাড়াল।

'শোন—'

'বলো।' পরিতোষ ঘুরে দাঁড়াল;

'তুমি কি বাবাকে গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করে আসবে, নামটা তিনি জানতে পেরেছেন কিনা, কোথা থেকে কথা বলছে—কেনই বা আমাকে চাইছে?'

পরিতোষ নিঃশব্দে ঘাড় কাত করে চলে গেল।

দরজা ছেড়ে পরিমল টেবিলের কাছে সরে এল। ফুলদানির গোলাপ ক'টা আরো মজে গেছে, জলের অভাবে কেমন দ্রুত কুঁকড়ে শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যেন আজ রাত্রেই পাপড়িগুলি খসে পড়বে। একটা ফুল আঙুল দিয়ে একটু নেড়ে দিতে সত্যি পাপড়িগুলি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল।'কত ক্ষীণায়ু তুমি'—পরিমল মৃদু হেসে ফুলের সঙ্গে কথা বলল। পরিতোষের পায়ের শব্দ শোনা যেতে সে তৎক্ষণাৎ দরজার দিকে ঘুরে গেল। পরিতোষের মুখটা একটু বেশি গম্ভীর।

'নামটা বলতে চাইছে না।'

'কোথা থেকে কথা বলছে?'

'তা-ও তো বাবাকে বলছে না।'

'আমার কথা বাবা কী বললেন!'

'বললেন, দেখছি বাড়ি আছে কিনা।'

পরিমল কতকটা নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল না, চুপ করে রইল।

'এসো, বাবা বসে আছেন।'

এবার পরিমলের সমস্ত মুখমণ্ডলে অসংখ্য ভাঙ্গাচোরা রেখা ফুটে উঠল। যেন শারীরিক যন্ত্রণা অনুভব করছে সে। দুই চোখে অস্বস্তি, কাতরতা।

'তুমি বরং এক কাজ করো পরিতোষ—বলে দাওগে আমি বাড়ি নেই।'

পরিতোষ হঠাৎ কথা বলল না। অবাক হয়ে অগ্রজকে দেখতে লাগল।

'তুমি একটু চিন্তা করে দ্যাখো—' পরিমল বলল, 'আমার কোনও বন্ধু নেই, পরিচিত কেউ নেই—কতকাল পর জেল থেকে বেরিয়ে এসেছি, আজই হঠাৎ আমাকে কেউ টেলিফোনে ডাকবে, কেমন অদ্ভুত লাগছে—বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে না—আমার মনে হয়, হ্যাঁ, তাই হবে, ভুল করে কেউ ডাকছে। তুমি তাই বলে দাও—পরিমল বলে এ বাড়িতে কেউ থাকে না।'

'মিথ্যা কথা বলা হবে—' পরিতোষ হাসতে চেষ্টা করল। 'কে কথা বলছে, কী বলতে চাইছে তুমি একবার গিয়ে শুনতে পারতে—যাক গে, তোমার যখন আপত্তি—' পরিতোষ অন্যদিকে চোখ ফেরাল। এবার বিড়বিড় করে যেন অনেকটা নিজের মনে বলল, 'খামকা বাবাকে বসিয়ে রেখেছি—কখন থেকে ফোনটা ধরে আছেন।' দরজা থেকে সে সরে গেল।

উত্তেজিত হয়ে পরিতোষকে কী যেন বলতে গিয়েও সে তেমনি স্থির কঠিন নীরব হয়ে প্রায় এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল। খোলা দরজা দিয়ে ঝলক দিয়ে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া ভিতরে ঢুকল। একটা জানালার পাল্লা ঈষৎ শব্দ করে নড়ে উঠল। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে খাটের কাছে সরে এল সে। কপালের রগ দুটো দপদপ করছিল। তাইতো, পৃথিবীতে এমন মানুষ কে আছে আজও আমাকে মনে রেখে বসে আছে! অতি প্রাচীন যুগে আমার কিছু বন্ধু ছিল সত্য। তাদের চেহারা ভুলে গেছি। নাম মনে করতে পারছি না। সেই যুগের স্মৃতির ওপর পুরু হয়ে আছে ধুলোর আস্তরণ। কবে কার সঙ্গে বেড়াতে গেছি, গল্প করেছি, কোথায় আমরা একত্র হতাম, একজন আর একজনের কাছে কতটা মন খুলে কথা বলেছিলাম, হৃদয় খুলে দিয়েছিলাম— কিছুই আজ মনে নেই। সুতরাং তৃতীয় ব্যক্তির নিকট নামধাম গোপন রেখে কোনো বন্ধু—বন্ধু বা বান্ধবী—আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চাইবে, বিশ্বাস করতে বাধছে। না কি শত্রু কেউ? আমার অবশ্য শত্রু কে ছিল এই পুরোনো পৃথিবীতে। একজন ছিল। তাকে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম। এই জন্য আমার কঠোর সাজা হয়েছিল। দশ বছর তার জের টেনেছি।

খাটের কিনারে পা ঝুলিয়ে বসে সে ভাবতে লাগল।

না কি সেই শত্রুর কোনো মিত্র?

দশ বছর ধরে অপেক্ষা করছে, দশ বছরের প্রতিদিনের প্রতিটি মিনিট সেকেণ্ড পর্যন্ত গুনে গুনে হিসাব করে রেখেছে কবে আমি জেল থেকে বেরিয়ে আসব? ওৎ পেতে আছে, মলয়কে খুন করেছি, তার প্রতিশোধ নেবে? আইনের শাস্তি যথেষ্ট না, ব্যক্তিগতভাবে সে আমাকে দণ্ড দেবে, নিজের হাতে আমাকে সংহার করবে?

এই চিন্তা পরিমলকে শঙ্কিত অস্থির উত্তেজিত করে তুলতে পারত।

কিন্তু তা করল না, কেমন যেন নিস্তেজ বিষণ্ণ ম্রিয়মাণ হয়ে গেল সে। কপালের রগ দুটো টিপে ধরে মেঝের দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে রইল।

মনের আয়নার ওপর রাশি রাশি ধুলো জমে আছে। কোনো মুখের ছায়া পড়ছে না সেখানে। মলয়ের পরম বন্ধু—বন্ধু বা বান্ধবী, প্রতিশোধ গ্রহণ করতে যে উদ্যত, পরিমলের

গাঁটবাঁধর ওপর অব্যর্থ লক্ষ্য রাখতে বদ্ধপরিকর এবং এইজন্য এখন থেকে তার খোঁজ খবর নিচ্ছে, এমন একটি মানুষের মুখও মনে করতে না পেরে সে হতাশ হল। এক সময় খাট ছেড়ে সে পায়চারি করতে আরম্ভ করল।

যেন একটু একটু মনে পড়ছে তখন চেহারাটা।

কুয়াশা ভেদ করে, বিস্মৃতির গাঢ় অন্ধকারের বুক চিরে খর্বকায় শীর্ণ একটি মানুষ তার সামনে এসে দাঁড়াল।

পরিমলের পা দুটো অসাড় হয়ে গেল। আর সে পায়চারি করতে পারল না। চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। মানুষটাকে সে চিনল।

সে বিশ্বাস করল, এই সেই মানুষ, মলয়কে যে সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছিল, মলয়ের সুখে সবচেয়ে বেশি সুখী হত এবং মলয়ের দুঃখও তাকে দুঃখ দিত সবচেয়ে বেশি।

মলয়ের মৃত্যুর দশ বছর পরেও এই পুরোনো পচা জঘন্য পৃথিবীতে যদি কেউ তার নিকটতম বন্ধু, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তার আত্মার সর্বাধিক ইষ্টকামী ব্যক্তি বলে পরিচয় দেবার উৎসাহ উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষা রাখে তো এই সেই বৃদ্ধ।

বন্ধুর জন্য বন্ধু ক'দিন চোখের জল ফেলে? নূতন বন্ধু—বন্ধু অথবা বান্ধবী এসে পুরোনো বন্ধুর বিচ্ছেদ-বেদনা ভুলিয়ে দেয়।

কিন্তু অক্ষয় উকিলের চোখের জল শুকোয় নি, দীর্ঘশ্বাস থেমে থাকে নি, কোটরগত ক্লান্ত চোখ দুটো বলে দেয় পুত্রশোক ভুলতে না পেরে আজও তার বিনিদ্র নিশিযাপন, হাহাকার, কপালে করাঘাত সমানভাবে চলেছে।

পরিমল ভয় পেয়ে শিউরে উঠল না, দু হাত দিয়ে চোখ ঢাকল না, কৌতূহল ও করুণার দৃষ্টি নিয়ে মানুষটাকে দেখতে লাগল।

ত্রিশ বছর ধরে অম্বলে ভুগছে। অ্যাসিডে দাঁতের মাথাগুলি ক্ষয় পেয়ে প্রায় মাড়ির সঙ্গে লেগে গেছে। চোখে পুরু লেন্স্। মাথায় বিবর্ণ ধূসর কয়েকটা চুল। পথ চলতে সারাক্ষণ ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে, যেন কেবল ভয় কখন গাড়ি ঘোড়া এসে ঘাড়ে পড়ে। দুর্বল ভীরু-প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু তা হলেও ভিতরটা আশ্চর্য শক্ত। 'বুঝলে পরিমল, আসল হল স্ট্যামিনা, ঐ জিনিস যার নেই, তার কিছুই নেই—কোনোদিন সে শাইন করতে পারে না।' গ্রীষ্মের ছুটির এক দুপুরের ছবি। মলয় ও যতীনদাস রোডের আরো দুটি ছেলের সঙ্গে অক্ষয় উকিলের একতলার বৈঠকখানায় বসে পরিমল যেন ক্যারাম খেলছিল। কী কারণে কাছারি বন্ধ। ভিতরের ঘরে দিবানিদ্রার চেষ্টা করেছিলেন অক্ষয়বাবু। কিন্তু মনে হল কী এক দুশ্চিন্তায় তাঁর ঘুম পায় নি। খড়মের ফট্‌ফট্ শব্দ করে তিনি এক সময় বৈঠকখানায় ছুটে এসেছিলেন। দুশ্চিন্তার কারণটা অবশ্য তখনই জানা গেল। স্কুলের প্রথম টার্মিন্যাল পরীক্ষায় মলয় অঙ্ক পরীক্ষায় ফেল করেছে। সেই দুঃখ তিনি জানাতে এসেছেন, না সকলের কাছে না, সব ছেলের সঙ্গে তিনি কথা বলেন না, তাদের দিকে বুঝি তাকানও না, তাঁর দৃষ্টি পরিমলের দিকে, খেলাধূলার মতন পড়াশোনায়ও সর্বদা যে শীর্ষস্থান অধিকার করে চলেছে—'উজ্জ্বল ব্রাইট ছেলে জগমোহন ডাক্তারের।' অক্ষয়বাবু বলতেন, এবং সেদিন দুপুরে পরিমলকেই তিনি তাঁর বেদনার কথা বলেছিলেন, 'কাজ না করলে, পরিশ্রম না করলে তার

ফল যে এই দাঁড়াবে আমি জানতাম। শোন তা হলে পরিমল, সেবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষার বছর। ফার্স্ট ক্লাসে উঠেই আমার টাইফয়েড হয়েছিল। একটা মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হল। জ্বর সারল, পথ্য করলাম, কিন্তু ভয়ংকর দুর্বল হয়ে পড়লাম—টাইফয়েড কী খারাপ জিনিস তোমার অজানা নেই। শরীরটা একেবারে ভেঙে দিয়ে যায়. কেউ কেউ তো বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে শুনি। আমার পড়তে বসে মাথা ঘুরত, বুকটা ধড়ফড় করত। কিন্তু আমি তো হাল ছাড়ি নি। আবার চলল রাত জেগে পড়া। অক্লান্ত খাটুনি। পরীক্ষা দিলাম। খুব ভালো রেজাল্ট্ করতে পারি নি। তা হলেও দশ টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিলাম। অঙ্ক ও সংস্কৃতে এইট্টি পার্সেণ্টের ওপর নম্বর ছিল। হুঁ, দুটো লেটার পেয়েছিলাম। অসুখটা না হলে আরো ভালো রেজাল্ট্ করতে পারতাম।' একটু থেমে থেকে অক্ষয়বাবু পরে বলেছিলেন, 'তাই রাতদিন ছেলেকে বলি. যার স্ট্যামিনা নেই, টেন্যাসিটি নেই সে পড়াশোনা কেন, খেলাধূলাও ভালো করতে পারে না। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই সে সফল হয় না।' স্কুলের ছাত্র পরিমল সেদিন অবাক চোখে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় জলপানি পাওয়া মানুষটাকে দেখছিল। দেখছিল আর ভাবছিল. ছাত্রজীবনে পড়াশোনায় তিনি এত ভালো ছিলেন, এম-এ, বি-এল পাশ করে উকিল হলেন—কিন্তু তাঁর তো দৈন্যদশা কাটল না। মক্কেলের মুখ দেখতে পান না, বৈঠকখানার রিক্ত শূন্য হতশ্রী চেহারা, একটা কাচ পরানো আলমারির ভিতর খান পাঁচ-ছ' আইনের বই কবে তুলে রাখা হয়েছে আর যেন নামানো হয় না, নীচের তাকে দড়িবাঁধা নথিপত্রের ওপর ধুলোর পাহাড় জমে উঠেছে, সেগুলি কোনোদিনই খুলে দেখার দরকার পড়ে না। অক্ষয়বাবুর গায়ে ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি, চশমার একটা পাশ কবে যেন ভেঙে গেছে. সুতো দিয়ে কোনোমতে জুড়ে রাখা হয়েছে। অথচ তিনি জেদী, কখনও উদ্যম হারান না. ত্রিশ বছরের অম্বলের রুগী হয়েও প্রচুর খাটবার ক্ষমতা রাখেন। পকেটে ওষুধের শিশি নিয়ে পঞ্চান্ন বছর বয়সেও কোর্ট কাছারিতে ছুটোছুটি করেন. দু'বেলা ছেলে পড়াতে যান। পরিমলের কাছে সেদিন অনেক কথাই বলেছিলেন তিনি। 'কিন্তু তা হলে হবে কী।' অক্ষয়বাবু এ জায়গায় মাথা নেড়েছিলেন। ক্লান্ত হেসে আঙুল দিয়ে নিজের কপাল স্পর্শ করে বলেছিলেন. 'ভাগ্যলিপি কেউ খণ্ডাতে পারে না। চেষ্টা করে তুমি পড়াশোনায় ভালো হতে পার। সসম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো পাশ করে বেরিয়ে আসতে পার। ভালো খেলোয়াড় হতে পার। নামজাদা অভিনেতা হতে পার, প্রথম শ্রেণীর লেখক কী সঙ্গীতবিশারদ হতে পার—সবই হওয়া যায়—সর্বক্ষেত্রে সাফল্যলাভ যশোলাভ সম্মান লাভ সম্ভব. অবশ্য শিল্প সাহিত্য ললিতকলার ক্ষেত্রে কিছুটা সহজাত ক্ষমতা—ইংরেজীতে যাকে বলে ইন্‌বর্ন্ ফ্যাকাল্টি—না থাকলে চলে না. কিন্তু তা থাকলই বা, যত্ন চেষ্টা পরিশ্রম অনুশীলন. অধ্যবসায়—এগুলোর অভাবে জন্মগত—ঈশ্বরদত্ত. যা-ই বলো. ক্ষমতাটুকুও নষ্ট হয়ে যায়—আবার যত্ন চেষ্টা ও ক্রমাগত সাধনার ফলে ভেতরের ঐ একটুখানি আগুনই একদিন সূর্যের মতন উজ্জ্বল সুন্দর ও দীপ্তিমান হয়ে ওঠে—সূর্যের কিরণের মতন তোমার যশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। হ্যাঁ. যশ সম্মান তুমি পেলে. কিন্তু আর একটা জিনিস? অর্থ?' অক্ষয়বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। 'ভাগ্যে না থাকলে এই জিনিস আসে না। তাই বলতে চেয়েছিলাম, চেষ্টা করে পরিশ্রম করে তপস্যা করে তুমি এই সংসারে অনেক কিছু অর্জন করতে পার—কিন্তু, যতদিন না তোমার স্টার ফেভার করছে

ততদিন তুমি পয়সার মুখ—' হঠাৎ থেমে গিয়ে পরিমলের কাঁধে হাত রেখে তিনি পরে বলেছিলেন, 'তোমার বাবা জগমোহনবাবুর দিকে তাকাও, আমাদের এই বালিগঞ্জে টালিগঞ্জে ডাক্তার কম আছে? কিন্তু জগমোহন ডাক্তার ক'জন হতে পেরেছে। আজ লাখ টাকার ওপর তাঁর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স: গাড়ি কিনেছেন, লেকের ধারে জায়গা কিনে রেখেছেন, বাড়ি করবেন—হ্যাঁ, তা তিনি করবেন বইকি। কেননা ভাগ্যদেবী তাঁর ওপর সুপ্রসন্ন। না হলে কত ডাক্তার তো রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘোরে, চোখের ওপর দেখি। তেমনি আমারও হল না। পসার জমল না, অর্থের মুখ দেখলাম না—তা না হলে আজ পঞ্চান্ন বছর বয়সে আমাকে কাছারি থেকে ফিরে এসে টিউশনি করতে হয়? কিন্তু কার জন্য করছি, কাদের মুখের দিকে চেয়ে অতিরিক্ত দুটো পয়সা উপার্জনের জন্য এই বুড়ো বয়সে খেটে মরছি?' অক্ষয়বাবু ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেকে দেখছিলেন। মাথা গুঁজে মলয় ক্যারামবোর্ডের ওপর একটা আঙুল ঘষছিল। নখের মাথাটা পাউডারে মাখামাখি হয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল। 'একলা আমার পেট নুন-ভাত খেয়ে চালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তা হলে তো চলবে না—তোদের মানুষ করতে হবে, লেখাপড়া শেখাতে হবে—আমার জীবনে আমি কিছু করতে পারলাম না, তা বলে হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকলে চলবে কেন—আমি আশাবাদী, তুই আমার বড়ো ছেলে, তোকে দিয়ে যে আমার অনেক আশা। এখন ফার্স্ট ডিভিশনে যদি ম্যাট্রিকও পাশ করতে না পারিস তো আমার দুঃখ রাখবার জায়গা কোথায়—' অক্ষয়বাবুর গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, চোখের কোণায় জল দেখা গিয়েছিল। ক্রোধ নিয়ে অভিমান নিয়ে তিনি ঘরে ঢুকেছিলেন। পরিমলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেলেছিলেন।

যাই-হোক, ক্লাসের পরীক্ষায় অঙ্কে খারাপ নম্বর পেলেও ম্যাট্রিক পাশ করেছিল মলয়। সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করেছিল। অক্ষয়বাবু তাতেই খুশি হয়েছিলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হত তাঁর অন্তরে আশার আলো আবার সহস্র শিখায় জ্বলে উঠেছে। ছেলেকে কলেজে ভর্তি করার জন্য কী অসম্ভব ছুটোছুটি করেছিলেন কদিন। টিউশন ফী বেড়ে গেল এখন, গাদা গাদা বই কিনতে হবে, কলেজে পড়বে মলয়, তার জুতোটা জামাটা ভালো হওয়া চাই। অনেক খরচ সামনে, অক্ষয়বাবু দমবার পাত্র নন। কোমর বেঁধে লেগে গেলেন আরো দু'একটা টিউশনি সংগ্রহ করা যায় কিনা তার চেষ্টায়, পেয়েও গেলেন। শত হোক বিদ্বান মানুষ, একটা এম-এ, বি-এল। টিউশনি খুঁজলে তিনি পেতেন। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের বাড়িতে পড়াবার জন্য টিউটর রাখার মতন সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষের অভাব বালিগঞ্জে টালিগঞ্জে কোনোদিনই ছিল না।

—হ্যাঁ, অনেক আশা মলয়কে দিয়ে। ডায়েরীতে মামলা না থাকলেও অক্ষয়বাবুকে শামলা চড়িয়ে রোজই কোর্টকাছারিতে ছুটতে হত, দুপুরে কাছারি, আবার সকাল বিকাল ছেলে পড়ানো। এদিকে এই স্বাস্থ্য, এই বয়স। কিন্তু কিছুই তিনি গ্রাহ্য করতেন না। ছেলে কলেজে পড়ছে, তাঁর মনের জোর শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আই এস-সি পাশ করার পর মলয় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে অথবা ডাক্তারি। এখন এই দুটো লাইনেই পয়সা। আইনের রাস্তায় আর না। উকিল হয়ে অক্ষয়বাবুর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। ছেলেকে দিয়ে এই ভুল আর তিনি করবেন না।

হয়তো শেষ পর্যন্ত তাই দেখা যেত, সতর্ক প্রহরীর মতন হাতে মশাল নিয়ে সংসার-অরণ্যে ছেলেকে সঠিক পথে তিনি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু যাত্রার শুরুতেই সব শেষ হয়ে গেল। তাঁর হাতের মশাল দপ্ করে নিভে গেল। তাঁর আশার আলো চিরদিনের মতন হিম অন্ধকারে ঢেকে গেল। আর ক'টি সন্তান তো নেহাত শিশু; মলয়ের ছোটো দু তিনটি ভাইবোন। তারা কবে বড়ো হবে, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে—ততদিন কি তিনি বাঁচবেন। বুঝি পুত্রশোকে অক্ষয়বাবু উন্মাদ হয়ে গেলেন। উন্মাদ—অথবা স্নেহান্ধ পিতার আত্মহত্যা করাও বিচিত্র না। জেল হাজতে বসে পরিমল কদিন কেবল সেই শীর্ণ খর্বকায় মানুষটির কথা চিন্তা করল। জগমোহন যেদিন তার সঙ্গে জেলে দেখা করতে গেলেন, পরিমল ইচ্ছা করেই মলয়ের বাবার কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল না। কেমন যেন তার সাহস হল না। খারাপ কিছু শুনতে হবে ভয়ে সে চুপ করে রইল। তারপর পাকাপাকিভাবে তার জেলজীবন আরম্ভ হল। ক্রমাগত চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারা একটা পুরোনো পৃথিবীর অন্য অনেক মুখের মতন অক্ষয়বাবুর চেহারাটাও আস্তে আস্তে সে ভুলে যেতে পারল। কেননা জেলে বসে পরিমল আবিষ্কার করল, ভুলে যেতে পারার মধ্যেই আনন্দ, ভুলে থাকাই শান্তি। পরিমল শান্তি পেয়েছিল।

কিন্তু এখন?

স্তম্ভিত হয়ে গেল সে।

শান্তির জগত ছেড়ে সাবেকি পৃথিবীতে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে মলয়ের বাবাকে সে সকলের আগে চোখের সামনে দেখছে।

বুড়ো উন্মাদ হয় নি, আত্মহত্যা করে নি।

তেমনি কঠিন, অবিচল অধ্যবসায় নিয়ে আজও বেঁচে আছে।

স্ট্যামিনা, টেন্যাসিটি। শব্দ দুটো নূতন করে পরিমলের মনে পড়ল।

অম্বলে ভুগে ভুগে শরীরটা আরো কুঁকড়ে গেছে, জীর্ণ হয়ে গেছে। তাহলে হবে কী। জরা জীর্ণতা, অমানুষিক শোকতাপ এবং দীর্ঘ রোগভোগ সত্ত্বেও অক্ষয় উকিলের টিকে থাকার উদ্দেশ্য, আর কারো কাছে না হোক, পরিমলের কাছে সুস্পষ্ট।

সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, সব আলো নিভে গেছে, সব আশা অন্ধকার হয়ে গেছে। কেবল ছাইচাপা আগুনের মতন ওই দুর্বল জীর্ণ পাঁজরের ভিতর একটা স্ফুলিঙ্গ এখনও ধিকিধিকি করছে। কিছুতেই বৃদ্ধ সেটা নিভতে দিচ্ছে না। দেবে না। ভয়ংকর জেদী একরোখা মানুষ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বুকের ভিতর প্রতিহিংসার আগুনটুকু ধরে রাখবে।

স্বাভাবিক। বাড়ি ফিরে পরিমল তার বাবা জগমোহনকে দেখছে। সেই সঙ্গে আর একটি বাবার মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ব্যর্থ, বিপর্যস্ত—জীবনযুদ্ধে পরাজিত হতভাগ্য মানুষ।

জগমোহন সব দিক থেকে ভাগ্যবান। ভয়ংকর অপরাধ করেছিল তাঁর পুত্র। ফাঁসি হল না, দ্বীপান্তর হল না; ক'বছর জেল খেটে হাসতে হাসতে ছেলে আবার বাবার কাছে ফিরে এসেছে। আজ জগমোহনের বাড়িতে আনন্দ উৎসব আরম্ভ হয়েছে। অন্তত মলয়ের বাবা তাই ভাবছে। জগমোহন যে গম্ভীর হয়ে আছেন, বাড়ির আবহাওয়া বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে

অক্ষয় উকিল সে-খবর রাখেন না, রাখবার তার দরকার পড়ে না। তিনি শুধু দেখছেন, নরহত্যার পাপ করেছিল পরিমল, জগমোহন আজ তা ভুলে গেছেন, ভুলে গেছেন অথবা চিন্তা করছেন, দণ্ড পেয়ে এসেছে ছেলে, সুতরাং আর তার গায়ে পাপ লেগে থাকতে পারে না, সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, পরিমল এখন মুক্ত বিশুদ্ধ পরিবর্তিত সুন্দর মানুষ, তাকে আবার বুকে টেনে নাও, জ্যেষ্ঠপুত্র, এই সংসারে সে আবার তার যোগ্য আসন ফিরে পাবার অধিকারী।

হ্যাঁ, জগমোহন তাঁর পুত্রের অপরাধ ভুলে গেছেন, তাকে ক্ষমা করেছেন, কিন্তু অক্ষয়বাবু পুত্রহন্তাকে কেমন করে ভুলবেন। তাঁর মলয় আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। নিজের ঘরের দিকে তাকিয়ে তাঁর বুকের ভিতর হাহাকার করে উঠেছে। তিনি চুপ করে আছেন, ঈর্ষার জ্বালা নিয়ে অপেক্ষা করছেন, সুযোগ খুঁজছেন; সেদিন পরম শত্রুকে তিনি চোখে দেখতে পান নি, তার আগেই পুলিস তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরেছিল। যেদিন শত্রুকে চোখে দেখলেন, সেদিন সে আর তাঁর আয়ত্তের মধ্যে ছিল না, আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মুখ নিচু করে ছিল জগমোহনের নরঘাতক পুত্র—আদালত তার বিচারের ভার নিয়েছিল। অক্ষয়বাবুর নিজের হাতে কিছু করার উপায় ছিল না।

আজ সুযোগ এসেছে।

আজ অক্ষয়বাবু শত্রুর মোকাবিলা করতে চাইছেন, তাকে খুঁজছেন। আজও নিজের হাতে কিছু করার ক্ষমতা তাঁর নেই। পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ। ক্ষীণ দুর্বল বাহু তুলে ত্রিশ বছরের যুবককে আঘাত করার মতন মূঢ় অপ্রকৃতিস্থ তিনি নন।

এভাবে তিনি পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবেন না।

তাঁর অন্য অস্ত্র আছে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার ভিন্ন কৌশল জানা আছে। প্রবীণ অভিজ্ঞ পোড়-খাওয়া মানুষ। ঝোঁকের মাথায় হুট্ করে কিছু করবেনই বা কেন।

না, তা তিনি করবেন না। তাছাড়া দশ বছর অপেক্ষা করেছেন, দশ বছরের প্রতিটি দিন, প্রত্যেকটা মুহূর্ত তিনি চিন্তা করেছেন, জগমোহনের দুষ্কৃতকারী সন্তানকে কেমন করে চরম শাস্তি দিতে হবে। আইন আদলতের দণ্ড নিতান্তই পোশাকী, লোক দেখানো সাজা। হ্যাঁ, মৃত্যুদণ্ডও। এই জগত থেকে একটি অপরাধী বিলুপ্ত হল, কিন্তু অপরাধ শেষ হল কি। আর একজন অপরাধ করবে, তারপর আর একজন। আইনের দণ্ড মানুষ মনে রাখে না। অপরাধের আগুন তাকে ক্রমাগত টানছে।

কাজেই পরিমলের জন্য তিনি এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করে রেখেছেন যা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর।

জীবন্মৃত হয়ে থাকবে সে, আর চোখের জল ফেলবে, আর জগতের মানুষকে ডেকে ডেকে বলবে, তোমরা অপরাধ করো না ভাই, অপরাধ করার আগে আমার দিকে তাকাও, অভিশপ্ত মানুষটিকে দেখ।

এখন পরিমল ভয় পেল। ভয় পেয়ে দুহাত দিয়ে চোখ ঢাকল। ঘরের মেঝে বা দেওয়ালের দিকেও সে তাকাতে পারছিল না। চোখ মেললেই মলয়ের বাবাকে দেখবে, এই মাত্র বুড়োর শীর্ণ শোকদগ্ধ মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।

কিন্তু জোর করে হাত দিয়ে চোখ চেপে ধরেও কি সে নিষ্কৃতি পেল? অধ্যবসায়ী অক্ষয় উকিলের জোর অনেক বেশি। গায়ের জোর না, মনের জোর। যেন মনের জোরে তিনি পরিমলের হাতটা অবলীলাক্রমে সরিয়ে দিয়ে নিজের মুখ ও মাথাটা পরিমলের মুখের সামনে বাড়িয়ে দিতে পারলেন। আশ্চর্য, পরিমলকে তখন চোখ খুলে তাকাতে হল। না তাকিয়ে উপায় ছিল না।

তার মনে হচ্ছিল, যতদিন সে বেঁচে থাকবে পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধের মুখটা বার বার তাকে দেখতে হবে।

এই তার অভিশাপ।

চেষ্টা করেও সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবে না। অন্য কোনোদিকে চোখ রাখতে গিয়ে ব্যর্থ হবে।

দুর্বার আকর্ষণ যতীন দাস রোডের ওই খর্বকায় ক্ষীণ মানুষটার।

অথচ কত স্থির নীরব। কোনোরকম চঞ্চলতা নেই, আস্ফালন নেই। চঞ্চল হবার মতন, আস্ফালন করার মতন শক্তি তেজ অবশ্য কোনোদিনই ছিল না। এবং এই ক'বছরে আরো নির্জীব ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছেন অক্ষয়বাবু। মাথাটা সোজা করে ধরতে গেলে কাঁপছে। মরা মাছের চোখের মতন দুটি চোখ। এখন সম্পূর্ণ বিবর্ণ ও শীতল হয়ে গেছে।

কিন্তু তা হলই বা। ভিতরটা যে ভয়ানক জেদী শক্ত।

পরিমলের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

প্রায় গলে যাওয়া ঠাণ্ডা চোখ দিয়ে বৃদ্ধ চরম অস্ত্র হানছে। অবিরল বৃষ্টিধারার মতন সেই চোখ থেকে ঘৃণা ঝরে পড়ছে। আর কিছু না।

পরিমল বুঝল এই তার চরম দণ্ড।

যদি অক্ষয়বাবু একটু উত্তেজিত হয়ে দুটো কথা বলতেন, ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে অভিসম্পাত দিতেন, পরিমল শান্তি পেত। এর মধ্যে কিছুটা সান্ত্বনা থাকত বইকি। কিন্তু নিঃশব্দ ঘৃণা—

ছবিটা কল্পনা করে পরিমল ছটফট করতে লাগল।

জগমোহনের গম্ভীর মূর্তি দেখে পরিতোষ ভয় পেল। হাত থেকে টেলিফোন নামিয়ে রেখে তিনি কাঠের মতন শক্ত হয়ে বসে আছেন, কোনো দিকে তাকাচ্ছেন না।

এখন বাইরের পোশাক ছেড়ে তাঁর বাথরুম যাবার কথা।

চেম্বার থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গেছে। বাড়ি এসে গিরিজার সঙ্গে আবার কতক্ষণ কথা বললেন। এবং ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই ফোন-এর ব্যাপার।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে পরিতোষ বাবাকে দেখল, চিন্তা করল। কিন্তু তার সাহস হল না কিছু জিজ্ঞাসা করে।

জগমোহনও আর কিছু বলছেন না। সে আশা করছিল, তিনি কিছু বলবেন। দাদা বাড়ি আসতে না আসতে তার সঙ্গে কে টেলিফোনে কথা বলতে চাইছে, পরিতোষ কিছু অনুমান করতে পারছে কি না, লোকটা তাঁর কাছে নামধাম গোপন রাখল কেন এবং দুবার ডেকে পাঠানো সত্ত্বেও পরিমল কেন এল না—অনেক কিছু নিয়ে তিনি মেজোছেলের সঙ্গে কথা

বলতে পারতেন, আলোচনা করতে পারতেন। চেম্বার থেকে ফিরে এসে অনেক দিন পোশাক না ছেড়েই তিনি নিজেদের সংসারের, সংসারের বাইরের কত সাধারণ বিষয় নিয়েও পরিতোষের সঙ্গে কথা বলেন, রমলাকে কাছে ডাকেন, দীপু জেগে থাকলে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকেই আদর করতে লেগে যান।

একটু আগে গিরিজার সঙ্গেও তো কত কথা হল। সেসব বিষয় নিয়েও তিনি পরিতোষকে এখন আবার কিছু বলতে পারতেন। তখন সঙ্কোচবশত যে-কারণেই হোক, গিরিজাকে যে-কথা বলতে পারেন নি, এখন পরিতোষের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে তা নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন।

একটু ইতস্তত করে পরিতোষ ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পরিতোষ যা আশা করছিল, রমলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে।

'কী হল, তোমরা খাওয়া-দাওয়া করবে না? রাত হচ্ছে।' অন্য দিনের মতন রমলা খুব একটা ব্যস্ততা দেখাল না, গলার স্বরে সেরকম উৎসাহও ছিল না, যেন না বললে না হয়, স্তিমিত বিষণ্ণ শোনাল কথাগুলি।

পরিতোষ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। শব্দ করল না।

'বাবামশায় কি কাপড় ছেড়েছেন?' রমলা প্রশ্ন করল।

পরিতোষ মাথা নাড়ল।

'বসে আছেন, তুমি একবার বলে এসো।'

কিন্তু রমলা শ্বশুরের ঘরে না ঢুকে পরিতোষের সঙ্গে হাঁটতে লাগল। তারা নিজেদের ঘরের দিকে চলল।

পরিমলের ঘরের দরজা তেমনি খোলা রয়েছে। আলো জ্বলছে। কপালে হাত রেখে পরিতোষের দাদা চুপ করে চেয়ারে বসে আছে। দরজা পার হবার সময় রমলা আড়চোখে ভিতরটা দেখে নিল। পরিতোষ সেদিকে তাকাল না। মাথা গুঁজে হাঁটছিল। রমলা একটু অবাক হল। পরিমলের ঘরের দরজা এভাবে খোলা থাকে না।

'কী হয়েছে এবার পরিষ্কার করে বলো তো।' নিজের ঘরে ঢুকে রমলা গলার স্বর পরিবর্তন করল, চোখের দৃষ্টিটাও ধারালো করে তুলল।

পরিতোষ কোনো জবাব দিল না। পোশাক ছাড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'গিরিজাবাবুর সঙ্গে এতক্ষণ তোমাদের কী কথা হল?' রমলা আবার প্রশ্ন করল। প্যান্ট ছেড়ে ফেলে পরিতোষ পায়জামা পরল। আলনা থেকে ভাঁজ-করা ফর্সা গেঞ্জি টেনে এনে রমলা স্বামীর হাতে দিল। পরিতোষ ঘামে ভেজা গেঞ্জিটা ছেড়ে ফেলল।

'ঐ তো, পুরী বেড়াতে গিয়েছিল, কদিন সেখানে থেকে মন্দির-টন্দির খুব দেখে এল, বাবার কাছে তাই গল্প করছিল।' রমলার চোখের দিকে তাকাল না পরিতোষ। পাখাটা খুলে নিয়ে সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রমলা স্বামীর মুখ দেখছিল।

'শুধু এই! এতক্ষণ বসে পুরীর গল্প হল তোমাদের?' রমলা বিশ্বাস করল না। একটু চুপ থেকে আবার বলল, 'আমি তো দেখলাম নীচের ঘরে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স বসেছে তোমাদের—যেন গুরুতর কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।'

পরিতোষ চুপ করে রইল।

রমলা চুপ থাকল না।

'নিশ্চয় তোমার দাদার বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছিল, তাই না?'

পরিতোষ বিস্মিত হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল।

'তুমি কী করে বুঝলে!' বিড় বিড় করে বলল সে।

রমলার চোখে মুখে বিরক্তি ফুটে উঠেছে, সে লক্ষ্য করল। পরিতোষ চোখ তুলে তাকাতে রমলা চট করে অন্য দিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

'হ্যাঁ, দাদার কথা উঠেছিল বইকি।' পরিতোষ বলল, 'এতদিন পর বাড়ি এসেছে। গিরিজার সঙ্গেও দাদার এককালে যথেষ্ট মাখামাখি ছিল কিনা। আমার বন্ধু সে, দাদার সঙ্গেও কম বন্ধুত্ব ছিল না। যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল দুজনের মধ্যে।'

রমলা স্বামীর দিকে তাকাল।

'এটুকু অনুমান করা খুবই সহজ। কোনোদিন তোমরা নীচের ঘরে বসে এতক্ষণ কথা বলেছ আমার মনে পড়ে না।'

পরিতোষ হাসল।

'গিরিজা বলছিল, লর্ড তাকে হঠাৎ চিনতে পারে নি—না হলে তার সঙ্গে তখনই কথা বলত।'

রমলা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

'তোমার দাদা গিরিজাবাবুকে দেখেন নি। গিরিজাবাবু তো এখানেই দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের এই দরজায়। তিনি ওপরে উঠে সোজা নিজের ঘরে চলে গেলেন। মুখটা নীচের দিকে ছিল। এদিকে তাকান নি।'

'হ্যাঁ, গিরিজা তাও বলল, খুবই গম্ভীর অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল লর্ডকে। মানুষটা একেবারে বদলে গেছে, গিরিজা অনুমান করছে।'

'সুকোমলও তাই বলছে। আগের মানুষ আর নেই তোমার দাদা।' একটু থেমে রমলা বলল, 'পরিবর্তন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এতদিন জেলে ছিলেন, সে-ও একটা কথা—আর, সেদিন তিনি উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক ছিলেন—আজ তাঁর বয়স ত্রিশের কোঠায়—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্তন তো হবেই। কারো বেশি হয়, কারো কম হয়। দশ বছর আগে আমি যা ভেবেছি চিন্তা করেছি—আজ তা করছি না। সেদিন যা খেতে বা পরতে ভালো লাগত, আজ হয়তো তা লাগে না।'

'হ্যাঁ, পরিবর্তন হয়, সময় অবস্থা পরিবেশ ইত্যাদি বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ইচ্ছা রুচি চিন্তা ভাবনা দৃষ্টিভঙ্গিও বদলায়। দশ বছর কেন, দু'-বছর আগেও আমার রোজ সিনেমা দেখতে ইচ্ছা করত, এখন ছ মাসেও একটা ছবি দেখা হয় না। ইচ্ছা করে না, ভালোও লাগে না। কলেজে যখন পড়তাম রাত্রে শোবার আগে রবিঠাকুরের কবিতা না পড়লে আমার ঘুম হত না। বন্ধুরা ঠাট্টা করত, ইঞ্জিনীয়ার হতে চলেছে যে মানুষ তার রাত জেগে এত কবিতা পড়ার শখ কেন। এখন কিন্তু ভুলেও রবিঠাকুর পড়ি না। ক্রাইম নভেলের পোকা হয়ে গেছি।' কথা শেষ করে পরিতোষ হাসল।

রমলা গম্ভীর হয়ে রইল।

পরিতোষ বলল, 'তবে এর মধ্যে কথা আছে—এই যে সিনেমা দেখার ইচ্ছা, কবিতা পড়ার ইচ্ছা—এগুলো নেহাত মনের ওপরের স্তরের জিনিস। মনের সদর মহলের জিনিসও বলতে পার। মন ভালো থাকল, কী বন্ধুবান্ধব জুটে গেল সিনেমা দেখলাম, মন ভালো নেই দেখলাম না। এসব ইচ্ছা-অনিচ্ছার সহজেই পরিবর্তন ঘটে—আমাদের মনের গভীরে আর-একটা জগৎ আছে। সেই জগতের সঙ্গে এ-ধরনের সাধারণ ইচ্ছা-অনিচ্ছা ভালো লাগা মন্দ লাগার যোগাযোগ কম। মানসিক গঠন বলতে ঐ ভেতরের মনটাকেই বোঝায়—এটার কিন্তু সহজে পরিবর্তন হয় না—সহজে কেন, হয়তো কোনোদিনই হয় না।'

রমলা ফ্যালফ্যাল করে স্বামীকে দেখছিল।

পরিতোষ বলল, 'একটা উদাহরণ দেখাচ্ছি—আজ আমি ভালো চাকরি করছি, বেশ সচ্ছলতার মধ্যে আছি, আমার কোনো অভাব নেই—এক জায়গায় গিয়ে দেখলাম, মনে কর, এক বন্ধুর ঘরে ঢুকে দেখলাম তার টেবিলের বই কাগজপত্রের গাদার ভেতর দশ টাকা কী পাঁচ টাকার একটা কারেন্সি নোট পড়ে আছে বা তার সোনার আঙটিটা—আঙটি ফাউন্টেন পেন ঘড়ি—যে-কোনো একটা জিনিস আমার চোখে পড়ে গেল, বন্ধু হয়তো বাথরুমে গেছে,—অন্য ঘরে গেছে, কিন্তু তা হলেও আমার কি ইচ্ছা করবে ঐ ধরনের কোনো জিনিস চট করে সরিয়ে ফেলার? দশ টাকা, পাঁচ টাকা, একটা আঙটি ঘড়ি বা যত দামিই হোক না কেন, একটা ফাউন্টেন পেন আমার চোখে খুবই সাধারণ জিনিস, তুচ্ছ জিনিস—যেহেতু আমি উপার্জন করছি, আমার অবস্থা সচ্ছল। কিন্তু যদি অবস্থা অন্যরকম হয়—মনে কর, আমার চাকরি নেই, বেকার হয়ে পড়েছি, আমার স্ত্রী পুত্র উপোস থাকছে, রেশন তুলবার টাকা নেই, তখন কী করব—দেখলাম বন্ধুর টেবিলে টাকা পড়ে আছে, ঘড়ি পড়ে আছে, আঙটি পড়ে আছে?'

পরিতোষ স্ত্রীর চোখের দিকে তাকাল। এবার কিন্তু রমলা তত গম্ভীর ছিল না। মিটিমিটি হাসছে।

'বল, চুপ করে রইলে কেন?' পরিতোষ স্ত্রীর হাত ধরে আস্তে নাড়া দিল।

'সেদিনও এমনি হাত গুটিয়ে থাকবে। টেবিলের কোনো জিনিসটি ছোঁবার প্রবৃত্তি হবে না তোমার।'

পরিতোষ শব্দ করে হাসল।

'তার মানে, যেদিন সচ্ছল ছিলাম, সেদিন আমার মনের অবস্থা যেমন ছিল, দারুণ অভাবের দিনেও তার পরিবর্তন হল না। অর্থাৎ, চুরি জিনিসটাকে আমি সেদিনও ঘৃণা করি—এই তো?'

রমলা শব্দ করল না।

পরিতোষ বলল, 'তা হলে বুঝতে হবে, আমার মনের ভেতরটা চিরদিন একরকম আছে—কোনো অবস্থায়ই—' কিন্তু কথা শেষ হল না তার, চুপ করে গেল।

রমলা আবার গম্ভীর হয়ে গেছে, মুখের রেখাগুলি আগের চেয়েও কঠিন হয়ে উঠেছে। পরিতোষ অস্বস্তিবোধ করল।

রমলা সরে গিয়ে পাখার সুইচ বন্ধ করে দিল।

'তুমি বাথরুমে যাবে না, মুখ-হাত ধোবে না?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি, বাবা কেন এখনো—' পরিতোষ আমতা আমতা করে বলল।

রমলা দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'আমি যাচ্ছি তাঁর কাছে—এত রাত তো তিনি কোনোদিন করেন না—' বলে ঘাড় ফিরিয়ে সে পরিতোষকেই আবার দেখল। 'তা হলে তুমি বলছ, তোমার দাদার মনের ভেতরটা এক রকমই আছে—গিরিজা বা সুকোমলের চোখে যে পরিবর্তনটুকু ধরা পড়েছে, সেটা কিছু না—কেবল ওপর ওপর—মানুষটার সাধারণ ইচ্ছা অনিচ্ছা ভালো লাগা মন্দ লাগার যা-একটু হেরফের দেখা যাচ্ছে। না হলে দশ বছর আগে পরিমল যা ছিল আজও তাই আছে—একচুল বদলায় নি, এই তো?'

পরিতোষের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল।

'তুমি বলছ' কথাটা খট করে তার কানে লাগল। 'তুমি' শব্দটার ওপর যেন রমলা জোর দিয়েছে বেশি।

চোখ নামিয়ে সে চিন্তা করছিল, নিজেকে সংশোধন করতে এখন তার কী বলা উচিত। হঠাৎ দরজার বাইরে জগমোহনের গলা শোনা গেল।

'পরিতোষ!'

'বাবা!' পরিতোষ চোখ তুলে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে জগমোহন ভিতরে ঢুকলেন। রমলা একপাশে সরে দাঁড়াল।

'এই যে বউমাও রয়েছে এখানে—আমি ভাবলাম, তোমার ওদিকের রান্নার পাট এখনো শেষ হল না—ভালোই হয়েছে'—পুত্রবধূকে এক-নজর দেখে জগমোহন ছেলের দিকে তাকালেন। 'পরিতোষ, ভাবলাম তোমাদের কাছে জিনিসটা চেপে যাব—কিন্তু পারলাম না। তুমি কি বউমাকে টেলিফোনের কথাটা বলেছ?'

পরিতোষ মাথা নাড়ল। রমলা চমকে উঠে প্রথমে স্বামী তারপর শ্বশুরের মুখ দেখল।

জগমোহন একটা চাপা নিশ্বাস ফেললেন।

'বসে বসে চিন্তা করছিলাম, জিনিসটা তোমাদের কাছে আজই, এখনই প্রকাশ করা যুক্তি-সঙ্গত হবে কি না। কেননা, আমি চাইছিলাম না তোমরাও আমার মতন আজ থেকেই, এখন থেকেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়।' দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে জগমোহন কথা বলছিলেন। 'আমি যা সন্দেহ করেছি, যা অনুমান করেছি, তা কখনো মিথ্যা হবে না—এখন থেকেই প্রমাণ পাচ্ছি।'

'দাদাকে টেলিফোন করেছিল কেউ একটু আগে—' পরিতোষ রমলার দিকে তাকাল। 'নাম-ধাম কিছু বলল না।'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রমলা স্থির স্তব্ধ হয়ে রইল। যা সে আশঙ্কা করছিল। শ্বশুরমশায় ঘরে আছেন, এই অবস্থায় সেই মেয়েটি বুঝি আবার ফোন করে বসল।

'বুঝলে পরিতোষ'—জগমোহনের গলার স্বর কাঁপছিল। 'আমি পরিষ্কার শুনলাম স্ত্রী-কণ্ঠ। পুরুষের গলা না।'

পরিতোষ এখন বুঝল ফোন আসার পর থেকে তিনি কেন এমন গম্ভীর, কাঠনমূর্তি ধরে নিজের ঘরে এতক্ষণ বসে ছিলেন।

'কোথায় আছে সেই মেয়ে এখন?' জগমোহন রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কী যেন নামটা?'

'বিশাখা—' পরিতোষ বলল, 'এখন কোথায় আছে তা তো বলতে পারব না, দিল্লি ছিল একবার যেন শুনেছিলাম, কিন্তু এদিকে আর খোঁজখবর—'

'তা তো বটেই—' জগমোহন মাথা নাড়লেন। 'খোঁজখবর নেবার দরকারও পড়ে না, অন্তত এতকাল পড়ে নি।'

'তাছাড়া, আগের বন্ধুবান্ধব কারো সঙ্গেই আমার যোগাযোগ নেই—বহুদিন থেকেই নেই—এখন তো নিজের কাজকর্ম নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়—পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র গিরিজার সঙ্গেই যা—' পরিতোষ আড়চোখে রমলাকে দেখল।

'হ্যাঁ, গিরিজা, গিরিজার মতন সৎ ছেলে আমার দুটি চোখে পড়ে নি—সৎ বন্ধুও বলতে পার—এমন একটি বন্ধুলাভ ভাগ্যের কথা সন্দেহ কী—' জগমোহন চুপ থেকে একটু চিন্তা করলেন। 'আচ্ছা, গিরিজা কি বলতে পারে, চ্যাটার্জির সেই মেয়ে এখন কোথায় আছে—তার তো জানবার কথা সাউথের ছেলে যখন?

'বোধ হয় জানে না'—পরিতোষ মৃদু গলায় বলল, 'তা-ছাড়া, আজকাল তো সে সাউথে থাকে না। মিশন রোয়ের ওদিকটায় আলাদা একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে আছে।'

'তা আমি জানি। একটা টি-মার্ট খুলেছে ধর্মতলায়। বিয়ে-থা করল না, ব্যাচিলার মানুষ। বিজনেস নিয়ে মেতে আছে। বাবাও সারাজীবন কাঠের ব্যবসা করে গেছেন। তবে গিরিজার ওটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয় নি।'

'বাবা মারা গেলেন। এখন কাকারা কাঠের ব্যবসা দেখছে। কাকাদের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না, তাই নিজের অংশ বেচে দিয়ে সে চা-এর ব্যবসা আরম্ভ করেছে।'

'খুব ভালো, একটা কিছু তো করতে হবে। কাকাদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকার ছেলে সে নয়, বেশ বুঝতে পারি। কাঠ ছেড়ে সোজা চা-এ চলে এসেছে—তার পক্ষে একটা নূতন ভেঞ্চার বইকি এবং এটাতেও সে সাকসেসফুল হবে। হ্যাঁ, আমায় বলেছিল, ওখান থেকে দুবেলা এসে কারবার দেখাশোনা করার অসুবিধা হয়—এদিকে চলে এসেছে। না, বলছিলাম, মা ভাই বোনদের দেখতে মাঝ মাঝে বালিগঞ্জ তাকে যেতে হয়, হয়তো রিচি রোডের ও-বাড়ির খবর জানতে পারে—এমনও হতে পারে সেই মেয়ে এখন কলকাতায় আছে—কী করত যেন ছেলেটি, হুঁ, তোমাদের ওই বিশাখার স্বামী?'

'দিল্লির একটা কলেজে প্রফেসারী করত।'

'বেশ তো, অধ্যাপকটি যে কলকাতার কোনো কলেজে চলে আসেনি, তাই বা কে জানে—তুমি খোঁজখবর রাখ না, প্রয়োজন হয়নি—তা-ছাড়া বহুদিন আমরা ও-পাড়া ছেড়ে চলে এসেছি-গিরিজার পক্ষে নীলাদ্রি চ্যাটার্জির মেয়ে, মেয়ের জামাইয়ের খবর রাখা সহজ।' জগমোহন পুত্রবধূর দিকে তাকালেন।

'তা-ছাড়া, মেয়েরা কি বাপের বাড়ি বেড়াতে আসে না বউমা। এমনও হতে পারে, মেয়েটি

এখন বালিগঞ্জেই আছে। চেষ্টা করলে গিরিজা কারেক্ট খবরটা আনতে পারে—আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ফোনটা ওখান থেকেই করা হচ্ছিল।'

'আমার মনে হয় না।' তেমনি মাটির দিকে চোখ রেখে রমলা বলল, 'বিয়ে হয়ে গেছে। এতকাল পরে আর---'

'ভুল করলে।' জগমোহন একটা শুকনো হাসি হাসলেন। 'আগুন নিয়ে খেলা করছিল সে। তোমার মতন মন নিয়ে সবাই যদি স্বামী-শ্বশুরের সংসারে দিন কাটাত তো আবার আমরা রামায়ণ-মহাভারতের যুগে ফিরে যেতে পারতাম। কিন্তু তোমার মন সব মেয়ের না। হ্যাঁ, প্রাক্‌বিবাহিত জীবনে আগুন নিয়ে খেলা করেছিল জিয়োলজিস্টের মেয়ে। খেলতে গিয়ে হঠাৎ একটা প্রলয় কান্ড সৃষ্টি হয়ে গেল। একজন যমের বাড়ি গেছে, আর-একজন দশ বছর জেল খেটে বেরিয়ে এসেছে। এখন আর সেই আগুনটা নেই—ছাইটা পড়ে আছে শুধু। ভস্মস্তূপ। কিন্তু খেলার স্মৃতিটা মন থেকে হয়তো মুছে ফেলতে পারছে না বিশাখা। এখন আর নূতন করে খেলার স্পৃহা নেই। সেই স্কোপও নেই। না থাক, কৌতূহলটা তো থাকতে পারে, একদিন যে-আগুন সে তৈরি করেছিল, তার ছাইটা নেড়েচেড়ে দেখার লোভ যদি তার হয়ে থাকে তো তুমি কী করতে পার শুনি? হুঁ, ভস্মস্তূপের নীচে এক-আধটু আগুন আজও রয়ে গেছে কি না নীলাদ্রি-দুহিতা জানতে চাইছে, তাই এ-বাড়ি হঠাৎ ফোন করে বসল। অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে—'

পরিতোষ মাথা নাড়ল, মাটির দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলল, 'আমার মনে হয় না বিশাখার সেই সাহস আছে, সেই নার্ভ আছে—'

জগমোহন ধমক দিয়ে উঠলেন।

'কার কতটা নার্ভ আছে, তুমি ওপর দেখে, চেহারা দেখে বুঝবে নাকি--- বেশ তো, তাই তো বলছিলাম, যদি তোমার গুণী দাদাটি জেলে বসে চিঠি লেখালেখি করে থাকে? নূতন করে শ্রীমতীর নার্ভ জাগিয়ে তোলে?'

পরিতোষ নীরব। রমলার মুখটা ঈষৎ লাল হয়ে উঠল।

চুপ থেকে একটু সময় চিন্তা করলেন জগমোহন।

'হ্যাঁ, ভালো কথা বউমা—আমি বেরিয়ে যাবার পর, পরিতোষ বেরিয়ে যাবার পর তোমার ভাশুর কি আমার ঘরে ঢুকেছিল?'

রমলা নীরব থেকে মাথা নাড়ল। জগমোহন নিরুপায় হয়ে দেওয়ালের দিকে চোখ ফেরালেন। 'না, বলছি এইজন্য—আমাদের অবর্তমানে আমার ঘরে ঢুকে শ্রীমান যদি কারো কাছে ফোন-টোন করে থাকে—'

'না, তিনি একবারও আপনার ঘরে যাননি। দোর বন্ধ করে নিজের ঘরেই ছিলেন সে সময়টা।' রমলার গলায় সূক্ষ্ম ঝাঁজ ফুটে উঠল। 'আপনি আর দেরি করবেন না, হাত-মুখ ধুয়ে আসুন, রাত হয়েছে, এত রাত্রে খাওয়া সহ্য হবে না।'

'যাচ্ছি—' বাথরুমে যাবার জন্য জগমোহন তৈরি হয়ে এসেছিলেন। কাঁধের তোয়ালেটা তিনি হাতে নিলেন, পরিতোষের দিকে তাকালেন। 'তোমারও তো মুখ-হাত ধোওয়া হয়নি দেখছি, পরিতোষ। যা, আর দেরি করো না, খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ করে বউমাকে অবসর

করে দাও। আমার এক মিনিটে হয়ে যাবে।' ঘর থেকে বেরোবার জন্য পা বাড়াতে গিয়েও তিনি ফিরে দাঁড়ান। 'হ্যাঁ, আমি এটা ভগবানের আশীর্বাদ বলে ধরে নিয়েছি—ফোন এসেছে শুনেও যে সে ঘর থেকে বেরোল না—যদি আমার ঘরে গিয়ে সে কথা বলত, তা হলে অবশ্য কিছু আঁচ করা যেত, কে ফোন করছে, কোনো থেকে কথা বলছে।'

পরিতোষ ও রমলা চুপ করে রইল।

'এবং তোমরা কী মনে করবে জানি না, পরিমল যখন গেল না, তখন আমি কথাটা একটু চিন্তা করলাম, তারপর যিনি ফোন করছিলেন তাঁকে পরিষ্কার বলে দিলাম, এ-বাড়িতে পরিমল বলে কেউ থাকে না, আপনি রং নাম্বার চেয়েছেন। হ্যাঁ, বাধ্য হয়েই আমাকে বলতে হল, কেননা, আমার কাছে নাম-ধাম গোপন করে কেউ আমার ছেলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবে, এটা আমি চাই না। আমি কিছু অন্যায় করেছি বউমা?'

'দাদাও চেয়েছিল, তুমি যাতে এমন কিছু একটা বলে দাও—আমি অবশ্য সাহস পাইনি তোমাকে তখন বলতে—' পরিতোষ ঢোক গিলল। জগমোহন একটু হাসলেন।

'আহা, দাদা তো চাইবেই—ইচ্ছা থাকলেও, যেহেতু আমি বাড়ি আছি, আমি টেলিফোনে বসে আছি—এই অবস্থায় কখনও সে আমার সামনে কথা বলত না, এবং জিনিসটা চাপা দেবার জন্য তখন হঠাৎ সাধু সাজা ছাড়া তার আর উপায়ই বা কী ছিল—যাক গে, তোমার দাদার জ্ঞাতসারে কেউ তাঁকে খুঁজছিল না কি এ সম্পর্কে আদৌ সে কিছু জানে না, এই নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাতে চাই না—তবে আমার বক্তব্য, আমার টেলিফোন নিয়ে এ ধরনের হাইড্-অ্যান্ড-সীক্—লুকোচুরি খেলা আমি কখনো এলাউ করব না—লুকিয়ে প্রেমালাপ করতে হয়, অন্য টেলিফোন ব্যবহার করবে—আজকাল যে-কোনো পোস্ট-অফিসে ফোনে কথা বলার চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে। আর কথাটা ভুলে যেও না পরিতোষ, গিরিজাকে বলে রাখবে রিচি রোডের বাড়ির খবরটা যেন সে একবার নেয়—আমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।'

পরিতোষ ঘাড় নাড়ল। জগমোহন ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন।

'উঃ, কী সন্দিগ্ধ মন ওঁর।' রমলা অস্ফুট গলায় বলল।

'উপায় কী।' পরিতোষ প্রতিবাদ না করে পারল না। 'ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কাল বাড়ি আসতে না আসতে আজই দাদাকে টেলিফোন করছে, কে করছে—কোথা থেকে করছে—নাম-ধাম বলছে না—বাবার মনে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।'

'তোমাদের আত্মীয়স্বজন কেউ যদি—'

পরিতোষ মাথা নাড়ল।

'অসম্ভব। আমাদের আত্মীয়স্বজন এখানে আর কে আছে। তা হলেও নাম বলত। তা ছাড়া, দাদার সঙ্গে এভাবে কেউ কথা বলবে না। এবং আমরা যত দূর টের পেয়েছি, সেই ঘটনার পর থেকে আমাদের আত্মীয়স্বজনরাও এ-বাড়ির বড়োছেলেকে বেশ একটু ঘৃণার চোখেই দেখছে।'

রমলার মুখ দিয়ে হঠাৎ কথা সরল না। মুখটা সাদা হয়ে গেল।

॥ ১৬ ॥

ওদিকে একটু বেশি রাত করেই তিনি শুয়েছিলেন।

আবার এদিকে ঘুমটাও ভেঙে গেল সকাল সকাল।

বেড-সুইচ টিপে আলো জ্বেলে ঘড়ি দেখেই জগমোহন বেশ টের পেলেন অন্যদিনের চেয়ে অন্তত আধঘন্টা আগেই তিনি জেগে গেলেন।

তাঁর দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা। নির্দিষ্ট সময়ের আগে ঘুম ভাঙলে চোখের ভিতরটা চটচট করে, আঠালো ভাবটা থেকে যায়। এবং মাথাটা টিপটিপ করে। মাথার ভিতর একটা চাপ অনুভব করেন। প্রেসার বাড়বার আগেও এটা হত। এখন বেড়ে গেছে। পরিমিত ঘুমের অভাব হলে অস্বস্তিবোধ করেন।

কিন্তু শরীরের এই সমস্ত গ্লানির কথা আজ যেন তিনি তেমন করে ভাবলেন না, সময় পেলেন না, কেন না জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পর পর কয়েকটা ভারি শব্দ তাঁর কানে এল। তিনি কান পেতে রইলেন। কেউ দরজা খুলে বাথরুমে ঢুকল। জোরে জোরে কাশল। বালতির ঝনঝন শব্দ হল। বালতি উপুড় করে প্রচুর জল ঢালছে, সেই শব্দ শোনা গেল।

জগমোহন টের পেলেন, কেউ স্নান করছে।

কেমন আড়ষ্ট সঙ্কুচিত হয়ে তিনি শয্যা আঁকড়ে পড়ে রইলেন। অন্যদিনের মতন লাফিয়ে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে মাটিতে নামতে পারলেন না।

একমাত্র সুকোমল এখানে রাত্রিবাস করলে অন্ধকার থাকতে শৌচকর্ম স্নান ইত্যাদি সেরে ফেলে।

আজ সুকোমল নেই।

সুকোমল বাথরুমে ঢুকে এত শব্দ করে না। এভাবে বালতি আছড়ায় না। এমন দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে না। তার চলাফেরা কাজকর্মের মধ্যে সংযম ও শৃঙ্খলা আছে। আশ্রমের ট্রেনিং। অপরের নিদ্রাভঙ্গ হবে অপরের অসুবিধা হবে—এ সম্পর্কে সে অত্যন্ত সচেতন।

কিন্তু এখন যেন কেউ গায়ের জ্বালা, একটা আক্রোশ নিয়ে নানারকম শব্দ করে বাড়িশুদ্ধ মানুষকে জাগিয়ে তুলছে।

স্নান করে সুকোমল যখন বাথরুম থেকে বেরোয় তখন গুণগুণ করে সে গীতার শ্লোক আওড়াতে থাকে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা অত্যন্ত মিষ্টি তার কণ্ঠস্বর। এই স্বর যার কানে যায় তার মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, মনে পবিত্র ভাব জাগে।

এখন জগমোহনের মনটা খিঁচড়ে রইল।

অপরিমিতি ঘুম, দেহের গ্লানি, তার ওপর এই ধরনের শব্দ। যেন গোটা বাড়িটা আলোড়িত হচ্ছে। যেন সরযূধামের শান্ত ভদ্র নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশ ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিতে আজ কেউ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

জগমোহন বিছানায় উঠে বসলেন। খাট থেকে নামলেন না। আলো জ্বাললেন। ঘড়ি দেখলেন। চারটে চল্লিশ। তাঁকে বাথরুমে যেতে হবে। মুখ হাত ধোওয়া আছে। কিন্তু কেউ তাঁর পথরোধ করে আছে। তিনি ঘড়ি দেখে চলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে জামাজুতো পরে মুক্তবায়ু সেবন করতে বেরিয়ে পড়বেন। কিন্তু হল না। তাঁর নিয়মটিয়মগুলি উল্টেপাল্টে

দেবার একটা জঘন্য জেদ নিয়ে দশ মিনিটের জায়গায় আধঘণ্টা বাথরুম দখল করে একজন খুশিমতন জল ঢালছে, বালতি আছড়াচ্ছে, কাশছে, থুথু ফেলছে।

পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মতন জগমোহন একটা অসহায় আক্রোশ নিয়ে চুপ করে বিছানায় বসে রইলেন।

ওঘরে রমলা জেগে উঠেছে, পরিতোষের ঘুম ভেঙে গেছে। দীপু জেগে উঠে বাবার খাটে চলে গেছে। পরিতোষ ও রমলার মতন সে-ও চুপ করে আছে। শব্দগুলি সে চিনতে পারছে না। দাদু এ সময়ে বাথরুমে যান, শব্দ করে মুখহাত ধোন। কাশেন হাঁচেন। আজ শব্দগুলি তার কাছে অন্যরকম লাগছে। অস্বাভাবিক ঠেকছে। ভোরের দিকে প্রায়ই তার ঘুম ভেঙে যায় বলে দাদুর হাঁটা চলা হাঁচি কাশি তার মুখস্থ হয়ে গেছে।

আজ সে ঠিক অনুমান করতে পারছে এটা দাদু না। অন্য কেউ বাথরুমে ঢুকেছে। কাকু বাড়ি নেই সে জানে।

এবং মানুষটা জেঠুমণি হতে পারে কিনা বাবার কোল ঘেঁষে চুপচাপ শুয়ে থেকে বড়ো বড়ো চোখ মেলে অন্ধকার দেওয়ালটার দিকে চেয়ে থেকে শিশু ক্রমাগত ভাবছিল।

একটু পরে রমলাও নিজের খাট ছেড়ে পরিতোষের খাটে চলে গেল। দীপু ভিতরে ভিতরে খুশি হল। তার মতন মা-ও আজ বাবার খাটে এসেছে দেখে সে বেশ একটু গর্ববোধ করল। অন্যদিন বাবার খাট থেকে মা তাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যায়। আজ তা হল না। তার পথ অনুসরণ করে মাও বাবার কাছে চলে এসেছে। এই ঘটনা অন্যদিন হলে সে খিলখিল করে হাসত, আহ্লাদের আতিশয্যে মার আঁচল ধরে টানাটানি করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। আজ সেসব কিছু করল না সে। খুশি হল, কিন্তু চুপ করে ছিল। বাথরুমের অপরিচিত অস্বাভাবিক শব্দগুলি তার আনন্দটা প্রকাশ করতে দিল না। তাকে বেশ কিছুক্ষণ বোবা, অসাড় করে রাখল।

এক সময় বাথরুমের ভিতরের সব শব্দ থেমে গেল। তাদের ঘরের সামনে দিয়ে কে যেন দুমদুম করে হেঁটে চলে গেল। এক সেকেণ্ড পর ওধারের একটা ঘরের দরজা খোলার এবং সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে সেটা বন্ধ হওয়ার একটা বেশ বড়ো আওয়াজ শোনা গেল। তারপর বাড়ি নিঝুম স্তব্ধ হয়ে গেল। আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না।

'ওটা কে, বাবা?' বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে দীপু ফিসফিসে গলায় প্রশ্ন করল।

'জেঠুমণি'। ছেলেকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে পরিতোষ রমলাকে দেখছিল। অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি হয়ে পায়ের কাছে চুপ করে বসে আছে। আঁচল দিয়ে পা হাঁটু মুড়ে উবু হয়ে বসে আছে; যেন শীতের আগুন পোহাচ্ছে রমলা। দেখে পরিতোষের হাসি পেল।

'কথা বলছ না?' পরিতোষ নিচু গলায় প্রশ্ন করল।

'এত সকালে উঠলেন তিনি?' রমলা ঈষৎ নড়েচড়ে বসল।

'তাই তো দেখছি।' পরিতোষ আধশোয়া হয়ে উঠে বসল।

'স্নান করলেন মনে হচ্ছে।' রমলা বলল।

পরিতোষের ইচ্ছা করছিল আলো জ্বালে। কিন্তু এখনই জগমোহন উঠে বাথরুমে যাবেন

চিন্তা করে ঘর অন্ধকার থাকতে দিল। আলো দেখলেই জগমোহন দরজায় দাঁড়াবেন। 'বউমা, তোমার কি ঘুম ভাঙ্গল? নাতি জেগেছে? পরিতোষ নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে?' ইত্যাদি নানা প্রশ্ন তিনি আরম্ভ করে দেবেন। এবং দাদুর গলার শব্দ শোনামাত্র দীপু ভিতর থেকে হৈ-চৈ শুরু করে দেবে। দাদুর কাছে ছুটে যেতে চাইবে। রমলা ছেলেকে ধরে রাখবে। জগমোহন চেঁচিয়ে বলবেন, 'বেশ তো, দাদু যখন বাইরে আসতে চাইছে, ওর গায়ে একটা জামা পরিয়ে দাও বউমা—বাইরে এসে ছুটোছুটি করুক না—তুমিও তো বাগানে নেমে একটু হাঁটতে পার—সকালের হাওয়া গায়ে লাগানো যে কত ভালো—তোমাদের তো আমি অনেকদিন বলেছি' ইত্যাদি। ভোরবেলা এত কথা, হৈ-চৈ, ছুটোছুটি, ঘর-বার হওয়া পরিতোষের অপছন্দ। বরং চোখে একটু ঘুম নিয়ে দেহে আলস্য নিয়ে এই যে সে অন্ধকার বিছানায় বসে রমলার সঙ্গে কথা বলছে এই সুখের যেন তুলনা হয় না। পরিবেশটা কেমন রোমান্টিক লাগছে। রমলাকে মনে হচ্ছে স্বপ্নের একটা ছায়ামূর্তি। কিন্তু মূর্তির সবটাই যে স্বপ্ন বা ছায়া না, হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে ছুঁয়ে দেখতে পরিতোষের ভীষণ ইচ্ছা করছিল। কিন্তু দীপু জেগে আছে, চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে। এখন রমলাকে ধরতে গেলেই সে হি-হি করে হেসে উঠবে, অত্যধিক খুশি হয়ে হাততালি দিয়ে উঠবে, আর রমলা রেগে গিয়ে দুমদুম করে ছেলের পিঠে কিল বসিয়ে দেবে। 'এই বয়সেই এমন পেকে গেছ তুমি, দুষ্টু ছেলে!' দাঁত খিঁচিয়ে ছেলেকে শাসন করতে লেগে যাবে মা। দীপু ভ্যা ভ্যা করে কাঁদতে শুরু করবে। পরিতোষের সব আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। চিন্তা করে সে আলো জ্বালল না এবং রমলাকেও ধরল না।

'মনে হয় ছোটো ঠাকুরপোর মতন ভোরে স্নান করা তাঁর অভ্যাস।'

রমলার কথা শুনে পরিতোষ হাসল।

'তাই কি? শুনেছি কয়েদিদের এত সকালে স্নান করতে দেওয়া হয় না। যে যার খুশিমতন যখন তখন পায়খানায় যাবে স্নান করবে মুখ হাত ধোবে জেলখানায় নাকি এ নিয়ম খাটে না। ভয়ংকর ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হয় কয়েদিদের। বেলা দশটায় সার বেঁধে সবাই এক সঙ্গে এলুমিনিয়ামের বাটি হাতে ঝুলিয়ে চৌবাচ্চায় স্নান করতে যাবে। সঙ্গে সেপাই থাকবে। পাঁচ মিনিট কী সাত মিনিট সময় দেবে স্নানের জন্য। এর মধ্যে কাজটি শেষ করা চাই। না হলে রুলের গুঁতো। হপ্তায় দুদিন নাকি গায়ে সাবান মাখতে দেওয়া হয়। তা-ও এক টুকরো করে কাপড়-কাচা সাবান।' কথা শেষ করে পরিতোষ ওজ ওজ করে হাসছিল।

রমলা গম্ভীর হয়ে রইল।

'অবশ্য সাধারণ কয়েদীদের বেলায়ই এত সব কড়া নিয়ম—হুঁ, যারা খুন করে ডাকাতি করে চুরি করে জেল খাটে। কয়েদিদের মধ্যেও আবার শ্রেণী ভাগ করা আছে কিনা। মনে কর একজন শিক্ষিত মানুষ রাজনীতি করে জেলে গেলেন, তাঁকে তখন সাধারণ কয়েদিদের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হবে না। তাঁর জন্য আলাদা ঘর, তাঁর স্নান খাওয়া শোয়া থাকার ব্যবস্থাটাও অন্য রকম। দশটা কয়েদির সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁকে পায়খানায় যেতে হয় না, স্নান করতে হয় না, খিচুড়ি খেতে হয় না, কাপড়-কাচা সাবানও গায়ে মাখতে হয় না। মোটামুটি ভালো তেল সাবানটাই ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। আর এটা তো খুবই স্বাভাবিক, চোর ডাকাত খুনেকে আমরা ঘৃণার চোখে দেখি—কিন্তু একজন রাজনৈতিক আসামীকে একটু

অন্য রকম দৃষ্টি নিয়ে, হয়তো কোনো কোনো সময় সম্মানের চোখেই দেখি। জেলেও সেই সম্মান অসম্মানের প্রশ্ন—'

পরিতোষকে শেষ করতে দিল না রমলা।

'থাক, এসব শুনে আমার কী হবে।' তার গলার স্বরে বেশ একটু ঝাঁজ ছিল। পরিতোষ টের পেল না। কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেল।

এমনিও তাকে চুপ করে থাকতে হত।

জগমোহন বাথরুমে যাচ্ছেন টের পাওয়া গেল।

রমলাও আর কথা বলল না। দীপু উসখুস করতে আরম্ভ করল। এবার পায়ের শব্দ শুনেই সে বুঝতে পেরেছে এটি দাদু। পাছে দীপু খাট থেকে নেমে বেরিয়ে দাদুর কাছে ছুটে যায় এই ভয়ে রমলা জেগে উঠেও দরজা খোলে নি।

'মা, দাদু যাচ্ছে।'

'হুঁ, চুপ করে থাক। এখন বাইরে গেলে ঠাণ্ডা লাগবে।'

আজ অবশ্য আর দাদুর কাছে ছুটে যেতে তেমন গরজ নেই দীপুর। কেন না বাবা জেগে আছে। বাবার বিছানায় আজ সে শুয়ে আছে। তাই রমলার এক কথাতেই সে শান্ত হয়ে গেল।

কিন্তু রমলা ভাবছিল পরিতোষের কথা।

সেদিন রমলাকে নিয়ে পরিতোষ একটা বড়ো স্টেশনারী দোকানে ঢুকে পরিমলের ব্যবহারের জন্য আর পাঁচটা জিনিসের মতন বাজারের সেরা তেলটা সাবানটাও কিনে এনেছিল। সেদিন কেন, তার আগেও সে কোনোদিন স্বামীর মুখে শোনে নি, সাধারণ কয়েদিদের, অর্থাৎ চুরি ডাকাতি খুনের অপরাধে যারা জেল খাটে তাদের সপ্তাহে একদিন কাপড়-কাচা সাবান গায়ে মেখে স্নান করতে দেওয়া হয়, পাঁচ মিনিটের বেশি সময় দেওয়া হয় না স্নানের জন্য, তার পরেও যদি কোনো কয়েদি গায়ে মাথায় জল ঢালছে দেখা গেল তখনই তাকে সেপাইয়ের রুলের গুঁতো খেতে হয়। কে জানে, এসব কথা বলতে পরিতোষ এতকাল বোধ হয় ভুলে ছিল। কিন্তু রমলা ভেবে পাচ্ছিল না, কথাগুলি যদি কোনোদিন পরিতোষের মনে পড়ত তো আজ সেসব রমলার কাছে বলতে গিয়ে সে যেভাবে হাসছিল সেদিনও হাসত কিনা। একটু আগে বাথরুমের ওদিক থেকে দামি সাবানের গন্ধ ভেসে আসছিল। রমলার মতন পরিতোষও এখান থেকে টের পেয়েছে নিশ্চয়। আর পরিমল যে প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে প্রচুর জল খরচ করে স্নান করছিল তাও বোঝা গেছে। আজ পরিমলের স্নানের বহর দেখে কি জেলখানার চোর ডাকাত খুনে কয়েদিদের কোনো রকমে স্নান শেষ করার কথাটা পরিতোষের মনে পড়ল? শুধু তাই না, এ ধরনের কয়েদিদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করার পিছনে যে একটা প্রবল ঘৃণা ও বিদ্বেষ কাজ করছে তা-ও পরিতোষ সুন্দর করে স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিল।

'ঘৃণা' শব্দটা কাল রাত্রেও স্বামীর মুখে শুনেছে রমলা।

আত্মীয়স্বজনরা তার দাদাকে ঘৃণার চোখে দেখবে। তা না হয় তারা দেখল, কিন্তু রমলার বিস্ময় পরিতোষকে নিয়ে। কথাটা বলার সময় কাল রাত্রে পরিতোষের গলার স্বর কত

স্বাভাবিক ছিল, দৃষ্টি কত স্বচ্ছ ছিল রমলা লক্ষ্য করেছে। সে আশা করেছিল পরিতোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, তার চোখ দুটো করুণ হয়ে উঠবে বা কথাটা বলা শেষ করে কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকবে। সেসব কিছুই হতে দেখা গেল না। তখনি সে বাথরুমে চলে গেল। মুখ হাত ধোবার সময়, রোজ যা করে, গুণগুণ করে গান গাইছিল পরিতোষ। আজ পরিতোষ আরও স্বাভাবিক আরও স্বচ্ছন্দ। কথাগুলি বলার সময় চমৎকার হাসতে পেরেছে।

এই হাসি দেখে রমলা কী অনুমান করতে পারে? পরিতোষের হাসির মধ্যে কী লুকানো আছে? ঠাট্টা? জেল-ফেরত মানুষটা বাড়ির মনোরম বাথরুম দেখে সেখান থেকে আর বেরোতে চাইছে না? মূল্যবান সুগন্ধি সাবান পেয়ে প্রাণখুলে গায়ে মাখছে? এই মানুষ দশ বছর এলুমিনিয়ামের বাটি করে মাপা জল মাথায় ঢেলে স্নান করে এসেছে। এখন বালতি বালতি জল ঢালছে বটে, ভয়ানক দামি কেক ক্ষয় করে জেলের ময়লা সাফ করছে, কিন্তু তবু ময়লা থেকে যাবে, আত্মীয়স্বজনের ঘৃণার দৃষ্টি থেকে—

ভাবনাটুকু শেষ করতে পারল না রমলা। যন্ত্রণা হয়ে সেটা গলার কাছে ঠেকে রইল। সত্যি কি পরিতোষের হাসির মধ্যে এতটা কটাক্ষ এত সব ইঙ্গিত রয়েছে! বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল রমলার, তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না পরিতোষের হাসির সবটা অর্থ সে বুঝে গেছে।

অন্তত কিছুটাও বুঝতে না পারার মধ্যে যে সান্ত্বনা আছে রমলা তা থেকে বঞ্চিত হতে চাইছে না।

আবার চোর ডাকাত খুনে কয়েদিদের বিষয় নিয়ে পরিতোষ কিছু বলতে আরম্ভ করেই গলার নিচে গুজগুজ শব্দ করে হাসতে থাকবে ভয়ে সে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল।

জগমোহন তখন বাথরুমের কাজ শেষ করে ফিরে যাচ্ছেন।

'বাবা বেরিয়ে যাক, চলো বাগানে নেমে আজ একটু মর্নিং-ওয়াক্ করব আমরা।' রমলা শব্দ করল না। পরিতোষ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। মা খাট থেকে নেমে পড়ল দেখে দীপুও নেমে পড়ল। বাইরেটা প্রায় ফর্সা হয়ে এসেছে। পুবের দুটো জানালার পাট খুলে দিল রমলা।

পরিতোষ ততক্ষণে খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে মাথার চুল ঠিক করতে লেগে গেল।

সেই মুহূর্তে কেউ একজন দুপদাপ শব্দ করে ঘরের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। যেন নিচে নেমে গেল।

দাদু না। দাদুর পায়ের শব্দ না।

দীপুর চকচকে চোখ দুটোতে কৌতূহল ধরছিল না। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

পরিতোষ রমলার মুখ দেখছিল। কিন্তু তার চোখদুটো অন্যদিকে ফেরানো। কাজেই পরিতোষ কথাটা বলতে পারছিল না। মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে না পারলে কথা বলার আনন্দ পাওয়া যায় না।

'এই শোন!' চাপা গলায় সে স্ত্রীকে ডাকল।

'কী?' রমলা এবার চোখ ফেরালো বটে, মুখটা ভার।

পরিতোষ দমে গেল। যতটা উৎসাহ নিয়ে কথাটা বলবে ভেবেছিল সে তা আর হল না।

রমলা চুপ থেকে আবার জানালার বাইরে তাকায়। আকাশে লাল আভা ফুটতে আরম্ভ করেছে।

পরিতোষ একটা ঢোক গিলে ফিসফিস করে বলল, 'বেড়াতে বেরিয়ে গেল মনে হচ্ছে।'

'কে?' রমলা স্বামীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তার গলার স্বরটা ধমকের মতন শোনাল।

পরিতোষ অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

'কী হল, হঠাৎ তুমি রাগ করছ?' স্ত্রীর হাত ধরতে যাচ্ছিল সে। রমলা হাত সরিয়ে নিল।

তথাপি পরিতোষ হাসল, 'কে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল বুঝতে পারছ না!'

'বুঝতে পেরেছি, বুঝতে না পারার জন্য রাগ করছি না। দুঃখ হচ্ছে তোমার কথা শুনে।'

'কেন, আমার অপরাধটা কী শুনি?'

যেন প্রবল ঘৃণায় রমলা মুখ ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এমনভাবে কথা বলছ, যেন বাইরের মানুষ কোনো তৃতীয় ব্যক্তি তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছে—বেড়াতে বেরোল মনে হচ্ছে—আজ দাদা শব্দটা উচ্চারণ করতে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

এখন পরিতোষ রমলার রাগের কারণ বুঝল। চুপ করে রইল।

রমলা চুপ থাকল না।

'না কি আত্মীয়স্বজনের মতন তুমিও তোমার দাদাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলে।'

বাইরে জগমোহনের পায়ের শব্দ শোনা গেল। এবার তিনি বেড়াতে বেরোলেন। শ্বশুরের পায়ের শব্দ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত রমলা আর কথা বলল না।

জগমোহন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন নিশ্চিত হবার পর পরিতোষ দরজা খুলে ঘর থেকে বেরোল। বাবার হাত ধরে দীপুও বেরোল। তারা এখনি নীচে নামল না। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। পূব আকাশটা ভয়ংকর লাল হয়ে গেছে এখন। যেন রক্ত ফেটে বেরোচ্ছে।

পরিতোষ রমলার কথাটা চিন্তা করছিল। তার ওপর খুব চটে গেছে সে। রমলা তাকে ভুল বুঝেছে। মনে মনে স্ত্রীকে সে অনুকম্পা করল। দাদার ওপর ঘৃণা বিদ্বেষ নিয়ে কথা বলবে এমন অবিবেচক সে নয়। বরং এবাড়ির বড়ো ছেলেরও যে প্রাতর্ভ্রমণ করার নেশা আছে—এদিক দিয়েও তাদের বড়ো ভাই বাবার স্বভাবটি পেয়েছে—একথাটাই সে রসিয়ে স্ত্রীর কাছে বলতে চেয়েছিল। এ কথার মধ্যে দোষ ধরার কিছু নেই। শুনলে রমলাও হয়তো উপভোগ করত। হাসত। কিন্তু শোনার আগেই সে এমন চটে গেল।

না, দাদাকে সে ঘৃণা করে না। আবার সুকোমলের মতন জোর গলায় সে একথাও বলতে পারছে না, যেহেতু পরিমল এতদিন জেলে ছিল, অনেক ক্লেশ তাকে পেতে হয়েছে এই জন্য তার চরিত্রের অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটছে। দুঃখ কষ্ট মানুষের চোখ খুলে দেয়। সে সত্যকে চিনতে পারে, সুন্দরকে বুঝতে পারে।

অর্থাৎ সুকোমলের কথা মেনে নিলে বলতে হয়, জেল থেকে পরিমল সম্পূর্ণ নূতন মানুষ—মহৎ চরিত্রের মানুষ হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

না, পরিতোষ, গিরিজা যা বলে গেল, সুকোমলের মতন এতটা অপটিমিষ্ট হতে পারছে না। সুকোমল অন্য জগতের মানুষ। বাস্তবের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই বললে চলে। সে সর্বদাই ঈশ্বরের করুণার কথা চিন্তা করে, স্বর্গের আলোর কথা ভাবে। তার ভাবনার সঙ্গে পরিমলের ভাবনা কখনও মিলতে পারে না। তাকে যুক্তি মেনে চলতে হয়, সংসারের দশটা জিনিসের ওপর চোখ রেখে অঙ্ক কষে কষে সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে যেতে হয়। শুধু মাত্র আবেগ নিয়ে কোনো কিছু বিচার করা পরিতোষের পক্ষে অসম্ভব। গিরিজাও তাই বলে গেল। কঠোর দণ্ডভোগের ফলে মানুষের বিবেকবুদ্ধি সুস্থ পরিচ্ছন্ন হয়েছে, দৃষ্টিভঙ্গি সুন্দর হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত আছে বইকি! আবার এটাও মনে রাখতে হবে, এক একটা জেল ক্রিমিন্যালের আড্ডা, নানা চরিত্রের অপরাধী সেখানে জড়ো হয়—তাদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে নিরীহ সৎস্বভাবের মানুষেরও অধঃপতন ঘটেছে।

কেবল আলোর দিকটাই দেখব—অন্ধকারের দিকে চোখ বুজে থাকব, একমাত্র সুকোমলের মতন মানুষদের পক্ষেই তা সম্ভব। মেয়েরা অতিমাত্রায় সেন্টিমেন্ট্যাল। যেহেতু সুকোমল সন্ন্যাসী হয়েছে, সুতরাং ধরে নিতে হবে তার মতন সত্যদ্রষ্টা এ বাড়িতে আর কেউ না। রমলা তাই ধরে নিয়েছে, সুকোমল যা বলছে তাই ঠিক, তাই সত্য।

কিন্তু রমলা এটা বুঝল না, পরিতোষ তার জেল-ফেরত দাদাকে এখনি ভালোবাসতে পারছে না, তা বলে তাকে সে ঘৃণাও করছে না। পরিমল সম্পর্কে কি এই পর্যন্ত একটাও অপ্রিয় অন্যায় কথা বলেছে সে? বলেনি। খামকা তার ওপর রাগ করছে স্ত্রী।

পরিতোষের চিন্তায় ছেদ পড়ল। দীপু তার হাত ধরে টানাটানি করছে। চেঁচামেচি করছে।

'কী হল?' ছেলের দিকে তাকাল সে।

'ঐ দ্যাখ।' কচি হাতটা রেলিঙের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে সে আঙুল বাড়িয়ে নীচের বাগান দেখাল। তারপর খিলখিল করে হেসে উঠল। 'জেঠুমণি, জেঠুমণি!'

পরিতোষ বাগানের দিকে চোখ নামিয়ে পরিমলকে দেখতে পেল।

পরিমল তাদের দেখতে পেয়েছে।

দীপু চিৎকার করে 'জেঠুমণি' 'জেঠুমণি' করছিল। তার চিৎকার শুনে সম্ভবত পরিমল ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে। ভাইপোকে দেখে হাসছে।

'এসো, এখানে এসো।' পরিমল হাত তুলে দীপুকে ডাকছে।

তাই দেখে দীপু আরও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বাগানে নামতে পরিতোষের হাত ধরে টানতে শুরু করে দিল।

পরিতোষ ইতস্তত করছিল, কিন্তু দীপু কিছুতেই তাকে সুস্থির হয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেবে না।

ইতিমধ্যে রমলাকে দেখা গেল। জগমোহনের ঘরের সামনে এদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, দীপুকে দেখছে পরিতোষকে দেখছে। পরিতোষের সঙ্গে বাগানে নামতে দীপু কেমন অস্থির হয়ে পড়েছে রমলা তাও লক্ষ্য করল।

স্ত্রীর সঙ্গে পরিতোষের চোখাচোখি হয়ে গেল। পরিতোষ লজ্জা পেল। বাগানে পরিমল আছে. রমলা নিশ্চয়ই তার ঘরের জানালা দিয়ে দেখেছে। এবাড়ির সব ঘরের জানালা দিয়েই নীচের বাগান দেখা যায়।

এখন পরিতোষের বাগানে যাওয়ার অনিচ্ছার কারণটা রমলা যে ধরে ফেলবে অনুমান করতে একটুও বেগ পেতে হল না তার। কারণ একটু আগে ঘরে যে ব্যাপার হয়ে গেছে! কাজেই আর দ্বিধা করল না সে। ছেলের হাত ধরে পরিতোষ সিঁড়ির দিকে এগোতে লাগল। জগমোহনের ঘরের সামনে পৌঁছে সে রমলার দিকে তাকাল।

'তুমি আমাদের সঙ্গে নীচে যাবে? দাদাকেও বাগানে দেখলাম।'

রমলা মাথা নাড়ল। মুখটা এখনও গম্ভীর।

'বাবা আমাদের সবাইকে বাগানে বেড়াতে দেখলে ভীষণ খুশি হবেন আজ।' পরিতোষ ঈষৎ হাসতে চেষ্টা করল।

কিন্তু তাতেও রমলার গাম্ভীর্য দূর হল না।

পরিতোষ একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

'তুমি নীচে যাও।' রমলা গম্ভীর গলায় বলল, 'দীপুকে সঙ্গে নিয়ে তোমার দাদার কাছে যাও। তিনি তাকে ডাকছেন।'

পরিতোষ নিশ্চিন্ত হল। যা সে অনুমান করেছে। ঘর থেকে রমলা পরিমলকে দেখতে পেয়েছে।

দীপুর হাত ধরে সে নীচে নেমে গেল।

দুজন বাগানে ঢুকতে পরিমল ছুটে এসে দীপুকে কোলে তুলে নিল। দীপু মহাখুশি। জেঠুর কোলে চেপে গর্বের দৃষ্টি নিয়ে সে বাবার দিকে তাকাল। হি-হি করে এক চোট হাসল। তারপর ওপরের দিকে তাকাল। মা-ও জিনিসটা দেখতে পেয়েছে কিনা—আজ প্রথম সে জেঠুমণির কোলে উঠেছে, এত বড়ো ঘটনাটা মাকে না দেখাতে পারলে তার তৃপ্তি ষোল আনা পূর্ণ হবে কেন, কিন্তু মাকে সে দেখতে পেল না। ব্যালকনির দিকে চোখ তুলে পরিতোষ রমলাকে দেখল না।

'কী ফুল চাই তোমার, বলো?' দীপুর গালের সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে পরিমল ভাইপোকে আদর করছিল।

'ওই যে—চাঁপা।' আঙুল দিয়ে দীপু দূরের চাঁপা গাছটা দেখিয়ে দিল। অনেক দিন থেকে চাঁপার ওপর তার লোভ। কেন না মাঝে মাঝে দাদুর সঙ্গে কী রমলার সঙ্গে যখন সে বাগানে আসে তখন তাঁদের কাছ থেকে সে গোলাপ যুঁই চামেলি—অর্থাৎ ছোটো গাছের ফুল উপহার পায়। হাত বাড়িয়ে জগমোহন ও রমলা যেসব ফুল পাড়তে পারে। চাঁপা অনেক উঁচুতে থাকে। সেখানে রমলার হাত পৌঁছায় না। জগমোহনেরও না।

আজ সে উপযুক্ত মানুষটির কাছে চাঁপা ফুলের জন্য আব্দার জানাল।

পরিমল তৎক্ষণাৎ দীপুকে নিয়ে চাঁপা গাছের দিকে ছুটল।

পরিতোষ হেনা ঝোপটার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখের পলক পড়ছিল না। এবং যা সে সন্দেহ করল, দীপুকে গাছতলায় নামিয়ে দিয়ে পরিমল লাফ দিয়ে গাছে উঠে পড়ল।

তাই তো হবে, ছেলেবেলায় তার কোন্ আব্দারটা অপূর্ণ রাখত এই মানুষটি? আমটা জামটা —পরিতোষ আঙুল দিয়ে দেখানো মাত্র পরিমল গায়ের জামা খুলে ফেলে গাছে উঠে গেছে—গাছ তলায় দাঁড়িয়ে পরিতোষ ওপরের দিকে তাকাত, তার বুক ঢিবঢিব করত, একেবারে আকাশের কাছে, সেই কত উঁচুর মগডাল থেকে ফলের ছড়া পেড়ে পেড়ে দাদা হাফপ্যান্টের পকেটে পুরছে। তারপর দু পকেট ভর্তি করে ছোটো ভাইয়ের জন্য জাম জামরুল কী সিঁদুরে আমটা নিয়ে তরতর করে আবার নীচে নেমে এসেছে।

আজও সেই দৃশ্য।

একটি শিশুকে খুশি করতে তার কত উৎসাহ।

তবে ছবির পরিবর্তন ঘটেছে। আধ ময়লা প্যান্ট-পরা উস্কোখুস্কো চুল মাথায় চপলমতি একটি কিশোরের জায়গায় ত্রিশ বছরের শান্ত গম্ভীর পরিচ্ছন্ন একটি মানুষ গাছের ডালে দাঁড়িয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল পাড়ছে। গায়ে গেঞ্জি, উস্কোখুস্কো চুলের পরিবর্তে মাথা ভর্তি মসৃণ কালো চুল। সেদিনের কিশোর বাঁদরের মতন একটা ডাল থেকে ঝুলে পড়ে অবলীলাক্রমে আর একটা ডালে চলে গেছে, এই বয়সে মানুষটি আজ আর তা পারছে না। একটা ডালে দাঁড়িয়ে একটু একটু কাঁপছে। সবল দেহের ভারে চাঁপা গাছ কাঁপছে।

পরিতোষ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ছবির ওপরের রূপের পরিবর্তন ঘটেছে।

কিন্তু ভিতরটা? মানুষটির মন?

সেই দীপ্ত প্রাণশক্তি, অমিত উৎসাহ, আশ্চর্য ভালোবাসা। গাছ থেকে নেমে শিশুর হাতে এত এত ফুল চাপিয়ে দিয়ে পরিমল কত তৃপ্ত! পরিতোষের হাতে ফুল ফল তুলে দিয়ে একদিন যেমন তার উৎসাহের উচ্ছ্বাসের শেষ ছিল না।

মুহূর্তে পরিতোষের সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না এই মানুষ খুন করেছিল। দশ বছর জেলে ছিল, ক্রিমিন্যাল গিস্‌গিস্ করছে সেখানে।

ফুল পেয়ে দীপু কিন্তু আর এক সেকেণ্ড দাঁড়াল না। বাগান থেকে ছুটে বেরিয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে দৌড়তে লাগল। বোঝা গেল জেঠুমণির কাছ থেকে এতকালের আকাঙ্ক্ষিত প্রচুর চাঁপা উপহার পেয়ে মা-কে সেগুলি দেখাতে যাচ্ছে। তার আনন্দ তার গর্ব মা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

শিশু চলে যেতে জায়গাটা হঠাৎ কেমন শূন্য স্তব্ধ মনে হতে লাগল। পরিতোষ অস্বস্তিবোধ করল। পরিমল চোখ তুলে আকাশ দেখতে লাগল। শরৎ প্রভাতের স্বচ্ছ নীল আকাশ। পুব দিকে একটা তাল গাছের পিছনে সোনার থালার মতন দেখাচ্ছে সূর্যটাকে। সোনার থালা বনবন ঘুরছে।

'খুব সকালে স্নান করলে আজ?' পরিমল চোখ নামাতে পরিতোষ হেসে প্রশ্ন করল।

'হুঁ'। গলার মৃদু শব্দ করে পরিমল হাঁটতে লাগল। পরিতোষ সঙ্গে চলল।

'বাথরুমটা আর একটু বড়ো করা যেত। কিন্তু দেখলাম ওদিকে কিচেন-এর স্পেস্ কমে যায়।'

পরিমল শব্দ করল না।

একটু চিন্তা করে পরিতোষ আবার বলল, 'কাল গিরিজা এসেছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে। গিরিজাকে মনে আছে নিশ্চয়?'

পরিমল দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন একটু অবাক হল পরিতোষের কথায়। ভুরুর চামড়া কুঁচকে উঠল। চোখের পলক পড়ছিল না। হঠাৎ এমন একটা নাম শুনে সে একটু বিব্রত হয়ে পড়েছে বোঝা গেল।

পরিতোষ অল্প শব্দ করে হাসল।

'সেই যে দাবা খেলায় চমৎকার হাত ছিল যার! একমাত্র দাবাটাই তুমি জানতে না। গিরিজার কাছ থেকে শিখে নিয়েছিলে। পরে অবশ্য খেলতে বসে তুমিই জিতে যেতে— গিরিজা আর কোনোদিন তোমার সঙ্গে পেরে উঠত না।'

তথাপি পরিমলের মনে পড়ল না। অন্তত তার চোখ দেখে পরিতোষের তাই মনে হল।

'কেমন দেখতে?' মৃদু অস্পষ্ট গলায় পরিমল প্রশ্ন করল।

'কালো রং, হাল্কা গড়ন, মেয়েদের মতন মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি কাটত!'

পরিমল চুপ করে রইল।

'তোমার প্রধান ভক্ত ছিল। তোমাকে লর্ড বলে ডাকত।' পরিতোষ আবার বলল।

'চিনি না, আমার মনে পড়ছে না।' কেমন যেন ভীত কাতর গলায় পরিমল উত্তর করল। মাথা নাড়ল।

পরিতোষ বিস্মিত হল।

॥ ১৭ ॥

দোকানের ঝাঁপ তুলতে ব্যস্ত ছিল কানাই। ডাক্তারবাবুকে দেখে ঘুরে দাঁড়াল। প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরছেন তিনি।

আজ কানাইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়াবার প্রয়োজনবোধ করলেন না জগমোহন, মানুষটাকে কালই তাঁর দেখা হয়ে গেছে, কানাইয়ের চোখ দুটো স্টাডি করে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

কিন্তু আজ কানাই তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল।

ব্যাপার কী! জগমোহন অস্বস্তিবোধ করলেন। কোনো কথা না বলে একগাল হেসে কানাই ঢিব করে ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করল। তাতে জগমোহনের অস্বস্তি দূর হল না, তবে তিনি একটু খুশি হলেন। আজকাল আর পা ছুঁয়ে ক'টা মানুষ প্রণাম করে।

সম্ভবত কাল ডাক্তারবাবুর অনুগ্রহ লাভ করেছে, তাই প্রতিদান হিসাবে আজ রাস্তায় দেখা হওয়া মাত্র কানাইয়ের এই শ্রদ্ধা নিবেদন, চিন্তা করে জগমোহন মনে মনে হাসলেন।

'তুমি কোন্‌দিকে থাক হে কানাই!'

'উল্টাডাঙ্গার একটা বস্তিতে ঘর ভাড়া করে আছি, কর্তা।'

'বেশ বেশ।' বেতের লাঠিটা ক্ষণকালের জন্য মাটিতে ঠেকিয়ে জগমোহন বাঁ হাতের ঘড়ি দেখলেন। 'দোকানের ঘরভাড়া কত?'

'তিরিশ টাকা।'

'অনেক ভাড়া. একটুখানি একটা ডেরা।' জগমোহনের গলার স্বরে কাতরতা ফুটল, কিন্তু চোখে কানাইয়ের ক্ষুদ্র দোকানটির দিকেও একবার তাকালেন।

'ঐ ঘরভাড়া দিয়েই মরে গেলাম, কর্তা।'

'মুস্কিল, বড়ো দুর্দিন দেশের।' জগমোহন গাঢ় নিশ্বাস ফেললেন, 'জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য, এদিকে বাড়িভাড়া ঘরভাড়া দিন দিন বেড়েই চলেছে।'

'আমাদের গরিবের মরণ।'

জগমোহন আর কথা বললেন না। হাতের লাঠি শূন্যে তুলে হাঁটতে আরম্ভ করার জন্য পা বাড়ালেন। কিন্তু কানাইয়ের করুণ কাতর মুখটা তখনি আবার হাসিতে ভরে উঠল। জগমোহন পরমাদ গণলেন। আর কী বলতে চাইছে লোকটা!

'কাল বড়োবাবুকে দেখলাম।'

'কে, কাকে?' চমকে উঠলেন জগমোহন, প্রকাণ্ড একটা ঢোক গিলে কানাইয়ের চোখ দুটো দেখলেন। 'কোথায় দেখলে বড়োবাবুকে, আমার ছেলের কথা বলছ?'

কানাই ঘাড় কাত করল।

'হুঁ, ইঞ্জিনারবাবুর দাদা, যিনি বিদেশে থাকতেন।'

জগমোহন হঠাৎ কথা বললেন না। তাঁর মুখে বিরক্তির রেখা ফুটল। কানাই এই বিরক্তি অনুধাবন করতে পারল না। বরং ডাক্তারবাবু যে আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার কথাটা শুনতে চাইছেন তাতে তার উৎসাহটা আরও বেড়ে গেল।

'দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলাম। হুঁ, রাত আটটা হবে তখন। দক্ষিণদ্বারির ঐ রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে যেয়ে পরে আমাদের উল্টাডাঙ্গার রাস্তা ধরি। আপনি তো ওদিকেই বেড়াতে যান, কতবড়ো একটা কবরখানা দেখেছেন তো। বাইরে থেকে মনে হয় ভেতরটা জঙ্গলে বোঝাই হয়ে আছে। মেলাই ফুলফলের গাছ আছে শুনি, বড়ো বড়ো দিঘি আছে।'

'তা থাকতে পারে, আমি কোনোদিন ভেতরে ঢুকিনি।' জগমোহন ভুরু কুঁচকালেন। 'বড়োবাবুর সঙ্গে কোথায় দেখা হল তোমার?'

এবার যেন কানাই একটু ইতস্তত করল, মুখের প্রশস্ত হাসিটা ছোটো হয়ে গেল, ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকটা একবার দেখে নিল। তারপর গলার স্বর নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'হুঁ, রাত আটটা বেজে গেছে তখন। একটু রাত হতেই ওদিকের রাস্তাটা কেমন ঝিম মেরে যায়, ফাঁকা হয়ে যায়। এখনো তো তেমন লোকজন আসেনি এ তল্লাটে। ক'টা আর বাড়ি হয়েছে। তা কাল হয়েছে কী, কবরখানার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমি, আলো-টালো তেমন নেই, জায়গাটা অন্ধকার অন্ধকার, কিন্তু তা হলেও যেন দেখলাম বাবুমতন, ধোপদুরস্ত ধুতিজামা পরা কেউ ফটক পার হয়ে ওটার ভেতরে ঢুকে পড়ল। আমার কেমন একটু সন্দেহ হল। এত রাত করে এমন একটা অসময়ে কবরখানায় কে ঢুকল। মুসলমানদের কেউ যখন মারা যায় তখন অনেক লোক একত্র হয়ে আলো-টালো নিয়ে মিছিল করে মানুষটাকে কবর দিতে নিয়ে যায়। কিন্তু এমন একলা এত রাত করে—তা-ও আবার দেখলাম কিনা একজন বাঙালিবাবু। ভদ্রলোক। কাজেই দাঁড়িয়ে গেলাম। দশ মিনিট পনেরো মিনিট—হুঁ, আধঘণ্টা

খুব হবে, ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর দেখলাম বাবুটি কবরখানা থেকে বেরিয়ে আসছে। ফটকের ডান পাশে একটা কাফেলা গাছ আছে। ঐ গাছের নীচে আমি ছিলাম। গাছটার আট দশ হাত দূরে রাস্তার আলোটা টিমটিম করে জ্বলছিল। তা হলেও বাবুর মুখটা দেখতে পেলাম, দেখে চিনলাম।'

জগমোহন চুপ থেকে ভাবছিলেন।

কাল পরিমল সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, কালই প্রথম বাড়ির বাইরে যায়। কিন্তু তার আগে পানের দোকানের এই মানুষটি কি পরিমলকে দেখেছিল যে রাস্তার অল্প আলোয় মুখটা দেখেই সে চিনে ফেলল? জগমোহনের সন্দেহ হল।

'তুমি ঠিক দেখেছিলে আমার বড়োছেলে?'

কানাই ঘাড় কাত করল।

'দুপুরে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে আমি ভাত খেতে বাড়ি যাই। কাল ভাত খেয়ে যখন ফিরি বড়োবাবুকে আপনাদের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমাদের ইঞ্জিনারবাবুর ছেলেকেও দেখলাম। যেন ভাইপোর সঙ্গে গল্প করছিলেন বড়োবাবু। বিকালে দীনদয়াল সিগারেট কিনতে দোকানে এসেছিল। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম এই আমাদের ডাক্তারবাবুর বড়োছেলে। যিনি বিদেশে থাকেন।'

আর একটাও কথা বললেন না জগমোহন মাথা হেঁট করে হাঁটতে লাগলেন। কানাই দাঁড়িয়ে রইল। কানাই তখনও হাসছে না কি গম্ভীর হয়ে আছে দেখতে জগমোহন ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে আর একবারও তাকালেন না। তাঁর মনে অনেক চিন্তা—দুশ্চিন্তাই বেশি।

ক'দিন আগেও প্রাতর্ভ্রমণ সেরে তিনি যখন বাড়ি ফিরেছেন তখন তাঁর মনে হত তাঁর মতন সতেজ প্রফুল্ল চিন্তাভাবনাহীন মানুষ পৃথিবীতে কম আছে।

আজ এখন, এক বিপরীত কথাটাই তাঁর মনে হল।

তিনি মাথা হেঁট করে চলেছেন। দুশ্চিন্তার ভারে মাথাটা নুয়ে পড়েছে। ঘাড় সোজা রেখে রাস্তায় চলা আর বুঝি এই জীবনে তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। এর কারণ কী। কারণটা এত বেশি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ যে তা তলিয়ে দেখবার দরকার পড়ে না। দাঁতে দাঁত চেপে ক্রুদ্ধ আহত বাঘের মতন বড়ো বড়ো পা ফেলে তিনি সরযূধামের দিকে অগ্রসর হন।

বাড়ির কাছে পৌঁছে সকলের আগে তিনি বাগান দেখেন—চোখটা আপনা থেকেই সেদিকে চলে যায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে নিজের হাতে গড়া মনোরম ফুলবাগিচাটি কিছুক্ষণ লক্ষ্য করেন। যেন এটা দূর থেকে দেখা, নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে দেখা। নিজের কীর্তির ওপর মানুষের মোহ থাকে। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির চোখে সেটা কেমন দেখায়, দোষত্রুটি কিছু ধরা পড়ে কিনা বিচার করতে জগমোহন এভাবে রোজ মর্নিং ওয়াক্ সেরে ফেরার পথে সরকারী সড়কে দাঁড়িয়ে পথচারীর দৃষ্টি নিয়ে সরযূধামের বিখ্যাত উদ্যানটি মনোযোগ দিয়ে দেখেন।

আজ বাড়ির কাছে এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ পড়ল বাগানের সবচেয়ে উঁচু চাঁপা গাছটার দিকে। গাছের ওপর-মানুষ দেখতে পেলেন তিনি। এই দৃশ্য তিনি আর কোনোদিন দেখেননি। তাঁর চোখ গোল হয়ে গেল। তেতোমতন একটা ঢোক গিললেন।

ব্যাপারটা যে খুব বিস্ময়কর তা না, তাঁর মনে হল একটা অকওয়ার্ড—বিদঘুটে ছবি তাঁর চোখের সামনে ঝুলছে। তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে নিলেন তিনি। নীচের দিকে তাকালেন। রাস্তার পিচ দেখতে দেখতে রাস্তার ওপাশের শাল গাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। লাগোয়া প্লটে শিগগির বাড়ির কাজ আরম্ভ হবে বোঝা গেল। ইট খোয়া চূণ বালি সব এনে জড়ো করা হয়েছে।

কিন্তু জগমোহন কি অবনতমস্তক হয়ে প্রায় দশ মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সত্যি কিছু ইট খোয়া চূণ বালির ঢিবি দেখলেন। তা নয়। বার বার চাঁপা গাছের সেই দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল। এবং সেই সঙ্গে পানের দোকানের কানাইয়ের কথাগুলিও মনে পড়ল।

শাল গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর জগমোহনের প্রায় পায়ের কাছটায় দুটো শালিক ঘুরে ঘুরে পোকা খুঁটে খাচ্ছিল।

এক সময় হাতের লাঠি তুলে শালিক দুটোকে কী মনে করে তিনি তাড়া করলেন। পাখি দুটো উড়ে গেল।

তাই। যেন হঠাৎ তাঁর একটু অত্যাচারী, নিষ্ঠুর হবার স্পৃহা জাগল। এভাবে কোনোদিন তো তিনি পাখি বা কীট পতঙ্গকে তাড়া করেন না।

শালিক দুটো উড়ে যেতে মনে মনে তিনি দুঃখ পেলেন। নিজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হলেন। মনের অবস্থা ভালো না থাকলে মানুষ যে সময় সময় কতরকম বিসদৃশ আচরণ করে নিজেকে দিয়ে, তিনি এখন তার প্রমাণ পেলেন।

কিন্তু এমন হওয়া উচিত না।

মন ভালো হওয়ার মত না, মন খারাপ করে দেবার উপাদান—উপকরণ, যা-ই বলা যাক, পৃথিবীতে সর্বদা যথেষ্ট পরিমাণে মজুত রয়েছে। থাকবেই। কিন্তু তা বলে মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলাটা কাজের কথা নয়। এমন হওয়া অনুচিত। চিন্তা করে জগমোহন বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। নিজের এই অসংযত আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন।

গেট্ পার হয়ে ভিতরে ঢুকেও তিনি আর বাগানের দিকে তাকালেন না। তাঁর ভয় করছিল। পাছে সেই দৃশ্য আবার চোখে পড়ে। অবশ্য সেদিকে চোখ ফেরালে তিনি দেখতে পেতেন পরিমল গাছ থেকে নেমে গেছে। হেনা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে পরিতোষের সঙ্গে কথা বলছে। যেন দু ভাই আজ এই প্রথম কোনো গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। যেন কিছুক্ষণ ধরে দুজন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

জগমোহন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। বউমাকে ডাকলেন না, নাতিকে ডাকলেন না, দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অন্যদিন এ সময় তিনি সর্বাগ্রে মেজোছেলের ঘরের দরজাটা লক্ষ্য করেন। দরজার পাল্লা ভেজানো দেখলে তাঁর মুখ অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। অর্থাৎ তিনি ধরে নেন পরিতোষ তখনো ঘুমোচ্ছে। এত বেলায়ও তার ঘুম ভাঙল না। পাল্লা দুটো খোলা দেখলে তিনি নিশ্চিন্ত হন সুখী হন। বুঝতে পারেন পরিতোষের ঘুম ভেঙেছে এবং আলস্যবশত আর বিছানায়ও শুয়ে থাকেনি, রীতিমত শয্যা ত্যাগ করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাই দরজা এমন খোলা পড়ে আছে। সত্যি তখন তাঁর আনন্দ চরমে ওঠে।

আজ দোতলায় উঠে জগমোহন এসব কোনো কথা চিন্তা করলেন না, অন্য কোনোদিকে তাকালেন না, সোজা নিজের কামরায় ঢুকে পড়লেন।

কাউকে তিনি ডাকলেন না বটে, কিন্তু তাঁর পায়ের ভারি শব্দটা শুনতে কেউ একজন যে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল জগমোহন বুঝি তা বুঝতে পারেননি।

বেতের লাঠিটা দেওয়ালের হুকে ঝুলিয়ে রেখে তিনি গায়ের জামাটা খুলতে যাবেন এমন সময় গালভরা হাসি নিয়ে এক ঝলক হাওয়ার মতন শ্রীমান দীপঙ্কর ছুটে এসে ভিতরে ঢুকল।

'দাদু, এই ড্যাখো কটো ফুল।' দুহাত ভরা চাঁপা ফুল নিয়ে দীপু দাদুর হাঁটু ঘেঁষে দাঁড়াল।

'বাঃ চমৎকার!' জগমোহন হর্ষ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তথাপি নাতির হাতের ফুল কটার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে পরে দরজার দিকে চোখ ফেরাতে রমলাকেও দেখতে পেলেন। রমলা ভিতরে ঢুকল।

'পরিতোষের ঘুম ভেঙেছে, বউমা?'

'আপনি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজ উঠে পড়েছে। এতক্ষণ বাগানে ছিল।'

'বেশ বেশ।' তাহলেও অন্যদিনের মতন তিনি খুশি হতে পারলেন না, হাসলেন না।

রমলা শ্বশুরের গাম্ভীর্য লক্ষ্য করল। তাই যেন একটু ইতস্তত করে পরে অল্প হেসে বলল, 'আজ দীপুরই সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে।'

'অ, তাই নাকি, কেন—' একটা ঢোক গিলে জগমোহন আবার নাতিকে দেখলেন। দাদুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ফুলগুলি শূন্যে তুলে ধরে দীপু তখন থেকে ক্রমাগত খিলখিল হাসছে।

রমলা বলল, 'আজ জেঠুমণি তাকে ফুল পেড়ে দিয়েছে।'

'হুঁ'— জগমোহন গলার একটা অদ্ভুত শব্দ করলেন, কিছু বললেন না, মুখটা অত্যধিক কালো করে ফেললেন।

'আচ্ছা, বউমা, তুমি একবার পরিতোষকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে, একটু দরকারী কথা আছে।'

রমলা ঘাড় কাত করে দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'ওরা কি চা খেয়েছে?' জগমোহন প্রশ্ন করলেন।

'না, আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'আমার চা, হ্যাঁ, আমার ও পরিতোষের চা-টা এখানে পাঠিয়ে দাও, পরিতোষকে বল আমি ডাকছি।'

রমলা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফুলের ব্যাপারটা নিয়ে তেমন একটা হইচই হল না, আনন্দ করা গেল না, দাদুটা দুদিন ধরে কেমন গোমড়ামুখো হয়ে আছে ইত্যাদি চিন্তা করে দীপু ক্ষুণ্ণ মনে মার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

জগমোহন স্বস্তিবোধ করলেন।

এখন তিনি পরিতোষকে খুঁজছেন। অন্য মানুষের উপস্থিতি তাঁর কাছে বিরক্তিকর। এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে গায়ের জামা খুলে ফেলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলেন।

পরিতোষ ভিতরে ঢুকল।

'হুঁ, দরজাটা ভেজিয়ে দাও, তুমি এই চেয়ারটায় বস।' জগমোহন আঙুল দিয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে নিজে তাঁর নির্দিষ্ট আরামকেদারায় চেপে বসলেন। অন্য দিন পরিতোষ এ ঘরে ঢুকলে দাঁড়িয়ে থেকে বাবার সঙ্গে কথা বলে, কিন্তু আজ যেন একটা বিশেষ কথা আছে, পরিতোষকে স্থির হয়ে বসে শুনতে হবে এমন একটা ভাব দেখিয়ে জগমোহন ছেলেকে বসতে বললেন। পরিতোষ বসল।

জগমোহন চুপ করে রইলেন। এটা তাঁর স্বভাব। জরুরী কিছু বলবার আগে চুপ করে থাকেন, যেন মনে মনে জিনিসটা আর একবার ভেবে নেন। সুতরাং পরিতোষ চুপ থেকে অপেক্ষা করতে লাগল।

এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল।

'কে!' জগমোহন গম্ভীর গলায় হাঁকলেন। দীনদয়ালের গলা শোনা গেল। জগমোহন ইঙ্গিত করতে পরিতোষ উঠে গিয়ে দরজার পাল্লা দুটো খুলে দিল। চা নিয়ে দীনদয়াল ভিতরে ঢুকল। পরিতোষ অবাক হল। সে আশা করছিল রমলা নিজে আসবে। হঠাৎ চাকরকে দিয়ে এ-ঘরে চা পাঠানোর কারণ সে বুঝতে পারল না। মনে মনে সে বিরক্ত হল। কিন্তু জগমোহনের সামনে বিরক্তি প্রকাশ করতে পারল না। চুপ করে চেয়ারটায় বসল। জগমোহন কিন্তু দীনদয়ালকে দেখে মোটেই অসন্তুষ্ট হলেন না। বরং তাঁর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল তিনি খুশি হয়েছেন। হাত বাড়িয়ে সাগ্রহে ট্রে থেকে সোনালী বর্ডার দেওয়া নিজের বিশেষ কাপটি তুলে নিলেন। পরিতোষের চা ও আনুষঙ্গিক জিনিসগুলি টেবিলে নামিয়ে দিয়ে দীনদয়াল সরে দাঁড়াল, হয়তো আর কিছুর দরকার হবে মনে করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বুড়ো অপেক্ষা করছিল। হাতের ইশারায় জগমোহন তাকে পাল্লাটা ভালো করে টেনে দিয়ে চলে যেতে বললেন। দীনদয়াল বেরিয়ে গেল

'তুমি আজ আর্লি-রাইজার হয়েছ দেখছি।' জগমোহন প্রশংসার চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন।

পরিতোষ কথা না বলে চায়ের কাপ তুলে নিল।

'বাগানে নেমেছিলে বুঝি? একটু হেঁটেছিলে কি?' জগমোহন হাতের কাপ নামিয়ে রেখে মেরুদণ্ড সোজা করে বসলেন, এগুলি যে তাঁর জরুরী কথার ভূমিকা পরিতোষ জানত। এবং তিনি হঠাৎ মর্নিং-ওয়াক থেকে ফিরে এসেই তাকে কেন ডাকলেন ঠিক অনুমান করতে না পেরে সে কিছুটা উদ্বেগ বোধ করছিল। তা হলেও হেসে বলল, 'দাদাও বাগানে ছিল এতক্ষণ। দীপুকে অনেক ফুলটুল পেড়ে দিল।'

জগমোহনের মুখের চামড়া শক্ত হয়ে উঠল।

'বউমার কাছে শুনলাম। ফুল পাড়তে তোমার দাদা একবারে গাছে উঠে পড়েছিল। তাই না?'

জগমোহনের চোখ-মুখের ভঙ্গী দেখে পরিতোষ মাথা হেঁট করল। জগমোহন যে স্বচক্ষে জিনিসটা দেখেছেন ছেলের কাছে আর তা প্রকাশ করলেন না।

'তা তোমার সঙ্গে কিছু কথা-টথা হল!'

'খুব বেশি না।' পরিতোষ চোখ তুলে জগমোহনের মুখের দিকে তাকাল। 'দুটো একটা কথা হয়েছে। আমি গিরিজার কথা বলেছিলাম; কাল রাত্রে সে এসেছিল।'

'হুঁ, কী বলল?'

'চিনতেই পারল না। আমি সবরকম পরিচয়ই দিলাম—তোমাকে লর্ড বলে ডাকত, বাবার কাঠের কারবার ছিল, ভালো দাবা খেলত—একডালিয়া রোডের ছেলে, আমার ছেলেবেলার বন্ধু, তোমার সঙ্গেও যথেষ্ট মাখামাখি ছিল। শেষ দিকে তো তোমার ভক্ত হয়েই পড়েছিল, তুমিও বলতে গিরিজা আমার প্রাধান ভক্ত, তখন থেকেই তোমাকে লর্ড বলে ডাকতে আরম্ভ করেছিল—

'হুঁ, তারপর?' চিবুকটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জগমোহন অত্যন্ত মনোযোগরে সঙ্গে কথাগুলি শুনে যাচ্ছিলেন। 'এত সব পরিচয় দেবার দরকার পড়ল গিরিজাকে মনে করিয়ে দিতে! তা যা হোক, কী বলল শেষ পর্যন্ত সে?'

'এমন কী আমি চেহারার বর্ণনাও দিলাম। কালো রোগামতন দেখতে। এভাবে চুল আঁচড়াত, হাসবার সময় বাঁ চোখটা একটু ছোটো হয়ে যেত—'

'বুঝতে পেরেছি।' জগমোহন ছেলেকে বাধা দিলেন। 'বাকি ছিল গিরিজার ফটো দেখানো কি গিরিজাকে তার সামনে এনে দাঁড় করানো। তা কাল রাত হয়ে গেল—না হলে কালই গিরিজাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে—'

পরিতোষ মাথা নাড়ল।

'কিন্তু তাতেও ফল হত বলে আমার মনে হয় না। কেন না খুঁটিয়ে এত সব বলার পরও দাদা এমন একটা চেহারা করে রাখল যেন কোনোদিন তার এমন একটি বন্ধু ছিল মনে করতে পারছিল না। আমি আরো বেশি অবাক হলাম, বলল, যতদূর মনে পড়ে, আমার কোনো বন্ধু ছিল না—আমি কাউকে চিনতাম না, পরিতোষ—সর্বদা একা একা কাটাতে হত আমাকে।'

'স্ট্রেঞ্জ!' শব্দটা উচ্চারণ করে জগমোহন স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তাঁর কপালের শিরাটা ফুলে উঠল। ভুরুর মাঝখানের চামড়া দলা পাকিয়ে গেল।

'অথচ সেদিন দাদার বন্ধু ভক্ত অ্যাড্‌মায়ারার—কত ছেলে সারাক্ষণ তাকে ঘিরে থাকত।' পরিতোষ কেমন যেন নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল, 'পরিমলের বন্ধুভাগ্য দেখে অনেকেই তাকে ঈর্ষা করত দেখতাম—'

জগমোহন ফোঁস করে একটা নিশ্বাস পেললেন।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, এমন কথা আজ সে বলে কী করে, বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে সারাক্ষণ যে হৈ-চৈ করে কাটিয়েছে!'

পরিতোষ আবার মাথা হেঁট করল।

'আমি ভাবছি, এই যে গিরিজাকে ভুলে যাওয়া, কোনো বন্ধুকে মনে না রাখা, এটা কি দাদার ইচ্ছাকৃত, একটা পোজ্—না কি আসলে তাঁর স্মৃতিশক্তির কোনোরকম গোলমাল—'

জগমোহন মেঝের দিকে চোখ রেখে কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর পরিতোষের দিকে তাকালেন।

'শোন তা হলে, আমার দিকে তাকাও—'

পরিতোষ মাথা সোজা করে জগমোহনের দিকে তাকাল। জগমোহনের গলার

একটা শব্দ হল। যেন তিনি হাসলেন, যেন নিজেকে ধিক্কার দিতে গিয়ে এমন একটা শব্দ করলেন।

'জানি না ঈশ্বর আমাকে কী পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন—কাল সন্ধ্যার দিকে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল—কালই প্রথম বেরিয়েছিল তুমি শুনেছ। কিন্তু কোথায় গিয়েছিল জান?'

পরিতোষ মাথা নাড়ল।

জগমোহন সামনের দিকে ঝুঁকে বসলেন।

'ঐ যে বললে, একটা পোজ্—একটা ভান ছাড়া কিছু না, নিজের আসল রূপটা ঢাকবার জন্য দুষ্টামি করে খামখেয়ালীর মতন কাজগুলো করে যাচ্ছে কি? আবার এ-ও চিন্তা করছি, না কি গিরিজা কাল যা বলে গেল, আসলে মাথাটাই বিগড়ে গেছে, পাগলামির লক্ষণগুলো প্রকাশ পাচ্ছে?'

'কাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে দাদা কোথায় গিয়েছিল?' পরিতোষ খুব একটা চঞ্চলতা প্রকাশ করল না। শান্তভাবে জগমোহনের চোখের দিকে তাকাল।

জগমোহন তখনই এ-প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, বললেন, 'এই যে এখন বললে, দীপুর কথায় তর্‌তর্ করে চাঁপাফুল পাড়তে গাছে উঠে গেল—এটাই বা কেমন কাজ হল? আমি বুড়ো মানুষ, আমার কথা ছেড়ে দাও—তোমার ছেলে মগডালের ফুলটির জন্য ফলটির জন্য বায়না ধরবে আর অমনি তুমি বানরের মতন লাফিয়ে গাছ বাইতে শুরু করবে? ইচ্ছা থাকলেও করবে না। কারণ তুমি পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা আগে চিন্তা করবে। বয়স বলে একটা জিনিস আছে, রুচির প্রশ্ন আছে—তোমার খেয়ালপনা যাতে ডিসেন্‌সি ডিঙিয়ে না যায় সেই জন্য তুমি সর্বদা সতর্ক চিন্তান্বিত। এটা পাড়া গাঁ না, এখানে চাষাভুষো থাকে না, সভ্য শিক্ষিত, মার্জিত রুচির মানুষ তোমার চতুষ্পার্শ্বে—বাড়িতে চাকর দারোয়ানরা রয়েছে—তারাই বা জিনিসটাকে কী চোখে দেখছে, হুঁ যদি আজ সুকোমল হত তবু একটা কথা ছিল। সন্ন্যাসী মানুষ—আশ্রমবাসী—তার হোম যজ্ঞ পূজা অর্চনার জন্য অহরহ ফুল বেল-পাতা আম্রপল্লব কাষ্ঠ ইত্যাদি দরকার হয়—সুকোমলের গাছে চড়া অন্য জিনিস—লোক এটাকে তার ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের অঙ্গ হিসাবে দেখবে। কিন্তু এখানে এসে সে-ও হুঁসিয়ার হয়ে যায়—আমার বাড়িতে আমগাছ আছে বেলগাছ আছে—প্লটটা যখন আমরা কিনি তখন জায়গাটা একটু বাগানের মতন ছিল দেখেছ। এই জন্যই আমার পছন্দ হয়েছিল—গাছ-গাছড়া আমি ভালোবাসি। সে যাই হোক—সুকোমল কিন্তু এখানে এসে ফুল বেলপাতা বা কাঠের দরকার হলে দীনদয়া[illegible] দিয়ে বাজার থেকে সব আনিয়ে নেয়—নিজে কখনো গাছে ওঠে না। নিশ্চয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা সে চিন্তা করে—লোকে নিন্দা করবে, আমরা বাড়ির মানুষরাও যে জিনিসটাকে ভালো চোখে দেখব না সে তা জানে। আমি একদিনও তাকে আমার বাগানের কোনো গাছে উঠতে দেখিনি। অথচ শুনেছি তাদের আশ্রমে কোনো দিনই আনাজ-তরকারী থেকে আরম্ভ করে ফল-ফুল বেলপাতা কিছুই কিনতে হয় না। আড়াই বিঘা জমি নিয়ে প্রকাণ্ড বাগান করা হয়েছে। সবই তারা বাগান থেকে সংগ্রহ করে। রাত সাড়ে তিনটায় উঠে একদল নাকি ফুল তুলতে চলে যায়, একদল যজ্ঞের কাঠ আম্রপল্লব বেলপাতা দূর্বা তুলসীপাতা সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়ে—রোজই আশ্রমে পূজা অর্চনা হোম যজ্ঞ লেগে আছে কিনা। তাই বলছিলাম, আজ আমাকে কী তোমাকে যদি হঠাৎ একটা গাছের মাথায়

দেখা যায় তো লোকের চোখে দৃশ্যটা কেবল অদ্ভুত অস্বাভাবিক না, ভয়ঙ্কর কুৎসিত অকোয়ার্ড ঠেকবে। আমিও আমার বাড়ির মানুষকে দিয়ে—চাকর দারোয়ানের কথা বলছি না, আমার কোনো ছেলেকে দিয়ে এই জিনিস কল্পনা করতে পারি না। আমার মনে হয় এই দৃশ্য আমার চোখে পড়লে আমি রীতিমত শক্ পাব।'

ঘাড় গুঁজে পরিতোষ হাতের নখ খুঁটতে লাগল।

জগমোহন একটু থেমে দম নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন। এবার তাঁর গলার আওয়াজ গমগম করে উঠল। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন তিনি বোঝা গেল।

'আমি তো মনে করি এসব তার গোঁয়ার্তুমি, জেদ ছাড়া কিছু না। নিছক আক্রোশের জ্বালায় ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এসব করছে। আমরা পছন্দ করব না সহ্য করব না জেনেশুনে বুঝে এ ধরনের এক একটা কাজ করছে—গিরিজা যে কাল রিয়্যাকশন-এর কথা বলে গেল, হয়তো তা-ই ঠিক—তবে সেটা এসেছে অন্যভাবে—ব্রেন-সিক্ কিংবা ক্ষিপ্ত হওয়া কিছু না, অবদমিত বাসনা সাপ্রেসড্ প্যাশন নিয়ে সে ভুগছে—কামনা চরিতার্থ করবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না, তাই এই রাগ আক্রোশ জ্বালা। বাল্‌তি আছড়াচ্ছে, বারান্দা কাঁপিয়ে হাঁটছে, শব্দ করে দরজা খুলছে, বন্ধ করছে, গাছে উঠছে, গিরিজাকে চিনতে পারছে না, কোনো বন্ধু ছিল মনে করতে পারছে না—সজ্ঞানে সচেতন থেকে সে এ ধরনের আচরণ করছে কথা বলছে অর্থাৎ প্রতিনিয়ত আমাদের বুঝিয়ে দিতে চাইছে, তোমাদের শালীনতা শোভনতা ডিসেন্‌সি বোধকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। আত্মীয় বন্ধুদেরও অস্বীকার করছি।'

জগমোহন চুপ করলেন।

ঘরের ভিতরটা থমথম করতে লাগল।

পরিতোষ আর নখ খুঁটছিল না। কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বাবার মুখের দিকে তাকাল। চোখ বুজে জগমোহন কপালের রগ টিপছিলেন। হঠাৎ চোখ খুলতে পরিতোষের চোখ দুটো দেখতে পেলেন।

'কিন্তু এখানেই শেষ না, শুনে শক্‌ড হবার মতন আরো সংবাদ আছে। এই মাত্র কানাইয়ের সঙ্গে দেখা হল, মোড়ের পানের দোকানের কানাই। তার মুখে শুনলাম।'

'কী বলল সে?'

'কাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে তোমার ভাই ওই কবরখানার মধ্যে ঢুকে পড়ল। কানাই স্বচক্ষে দেখেছে—তখন রাত আটটা বাজে।'

'কেন। ওখানে কী?' পরিতোষ ঠিক বিস্মিত হল না, কেমন যেন কৌতুকবোধ করল, চোখের কোণায় একটু অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল।

'গড্ নোজ!' জগমোহন হাতের বুড়ো আঙুলটা শূন্যে উত্তোলন করলেন। তাঁর গলার স্বর বিকৃত শোনাল। 'যদি নির্জনতা—লোন্‌লিনেস উপভোগ করার একান্ত ইচ্ছা হয়েছিল তার তো বাড়ির লাগোয়া পার্কটায় গিয়ে সে চুপ করে বসে থাকতে পারত, সন্ধ্যার পর একটি প্রাণীও সেখানে থাকে না।— হাঁটতে হাঁটতে সল্টলেকের দিকে চলে যেতে পারত—মরুভূমির মতন খাঁখাঁ করছে জায়গাটা এখন, ডান দিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে নতুন লেক কাটা হয়েছে দেখতে পেত। ওখানটাও কম নির্জন না। একটু অন্ধকার হলে আর

জনপ্রাণীর সাড়া পাওয়া যায় না। কেবল ক'টা নারকেল গাছের পাতার সরসর শব্দ শোনা যায়। না, আমি বলছি, তবু এসব জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার পিছনে একটা যুক্তি থাকে, মানুষকে কথাটা বলা যায়—কিন্তু বাড়ি থেকে প্রথম দিন বেরিয়েই রাত করে ঝোপঝাড়ে ভর্তি একটা কবরখানার মধ্যে সরাসরি ঢুকে পড়া— শুনে আমার কান গরম হয়ে গেল. লজ্জায় মশাইয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। কেন এসব করছে সে আমায় বলতে পারো?

অদ্ভুত চরিত্র!' পরিতোষ বিড়বিড় করে বলল।

॥ ১৮ ॥

সেদিন শুধু একটা উদ্দেশ্য, অদ্ভুত একটা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়েছিল। কাজেই অন্য কোনো দিকে তার চোখ ছিল না, মন ছিল না—আগ্রহ স্পৃহা কিছুই ছিল না।

জগমোহনকে সে দেখতে পেল না।

প্রায় তার শরীর ঘেঁষে জগমোহনের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। তিনি চেম্বারে যাচ্ছেন। মোড়ের মাথায় ট্রাফিক পুলিস হাত উঁচু করাতে তাঁর গাড়ি কয়েক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়েছিল। গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জগমোহন উদাসী পথচারীকে কটমট করে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর রাস্তা পরিষ্কার হতে দাঁতে দাঁত ঘষে কিছু একটা বিড়বিড় করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

পরিতোষও পরিমলকে দেখল। পরিতোষ ঠিক পাশ দিয়ে চলে গেল। বাস ধরতে তার দেরি হচ্ছিল। সে দাঁড়াল না। অন্য দিন মোড়ে এসে সে ট্যাক্সি পেয়ে যায়। আজ ট্যাক্সি না পাওয়াতে তার এই বাড়তি ছুটোছুটি। কিন্তু তা হলেও পরিমলের সঙ্গে একটা কথা সে বলতে পারত। বলা উচিত ছিল, পরিতোষ বুঝতে পারছিল। কিন্তু কেমন যেন বাধা পেল।

কেমন মনে হল, একটা সৃষ্টিছাড়া মানুষ ওখানে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। যেন ওপাশের একটা দেওয়ালের দিকে চোখ তুলে সিনেমার পোস্টার বা কোনো ওষুধের বিজ্ঞাপন দেখছে। পরিমলের দাঁড়াবার ভঙ্গিটাই কেমন অন্য রকম। লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি গায়ে, পায়ে চটি। মাথার চুল উস্কোখুস্কো হয়ে আছে। অথচ কাল বিকেলে যখন বাড়ি থেকে বেরোয়, রমলার মুখে পরিতোষ শুনেছিল, খুব ফিটফাট হয়ে বেরিয়েছিল পরিমল। স্নান করেছিল। চিরুনি চালিয়ে মাথাটি পাট করেছিল। পাউডার-টাউডার মেখেছিল। কুঁচি দিয়ে কাপড় পরেছিল। পাম্পশু পরে বেরিয়েছিল। কিন্তু এখন মানুষটাকে কেমন হন্নছাড়া দেখাচ্ছে। যেন নিজের বেশভূষার দিকে তেমন লক্ষ্য নেই—চওড়া কাঁধ, মাথার পিছনে চুল বেশি, তাই মাথাটা আজ বেশি রুক্ষ অমসৃণ দেখাচ্ছে। দেওয়ালের দিকে চোখ তুলে কিছু একটা পড়ছিল বটে, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল তার মন আদৌ সেখানে ছিল না। যেন অন্য কিছু চিন্তা করছিল সে। পরিতোষের একবার মনে হয়েছিল, পরিমলের গায়ে দামী জামাকাপড় বাদ দিলে মনে হতে পারত একটি বেকার অসহায় মানুষ রাস্তায় বেরিয়েছে। এত বড়ো শহরের অসংখ্য গাড়িঘোড়া, জমকালো বাড়িঘর, কর্মব্যস্ত হাজার হাজার মানুষের ছুটোছুটি তাকে প্রথমটায়

খুব বিস্মিত করেছিল, উৎসাহিত করেছিল। প্রকান্ড একটা আশা নিয়ে সে পথে বেরিয়েছিল। তারপর ঘুরে ঘুরে ক্রমশ ক্লান্ত বিমর্ষ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। কোথাও কর্মসংস্থানের আশা নেই দেখে এখন হালভাঙা একটা নৌকোর মতন এমনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। একটা ভিড় দেখলে সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াচ্ছে, একটা পোস্টার চোখে পড়লে—তা সেটা সিনেমার হোক, ওষুধের হোক, কী সরকারের পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে হোক—দাঁড়িয়ে থেকে কতক্ষণ পড়ছে—হয়তো কোনো দোকানের সাইন-বোর্ডটাই পড়তে আরম্ভ করে দিল—একটা ভিক্ষুক দেখলে তাকেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে—অর্থাৎ যা-হোক একটা কিছু দেখে সময় কাটানো—তার হাতে কাজ নেই, যাবার কোন জায়গা নেই, মন জুড়ে আছে পুঞ্জ পুঞ্জ নৈরাশ্য, আর সর্বাঙ্গে শৈথিল্য, অপরিসীম ক্লান্তির লক্ষণ। এই মানুষকে তুমি যখন-তখন যে-কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কী মন্থরগতিতে যাহোক একটা কিছু লক্ষ্য করতে করতে পথ চলছে দেখতে পাবে। যাহোক কিছু একটা লক্ষ্য করছে বটে, কিন্তু তার আসল দৃষ্টি কোনোকিছুর ওপর ন্যস্ত নেই, যেন তার আসল চোখটা মনের ভিতর রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, এই মুখর ব্যস্ত চঞ্চল শহরের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। কোনো কিছুর সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। এইজন্য, অসুখী তো বটেই সে, ভীত সন্ত্রস্তও কম না। তার চোখে সর্বদা একটা লজ্জা, একটা হীনতাবোধ ফুটে রয়েছে। শহরের মানুষকে সে এড়িয়ে চলে, শহরের মানুষগুলিও তাকে এড়িয়ে চলে—তাই পরিতোষের মনে হচ্ছিল, ঠিক এই রকম একটা এড়িয়ে চলার মনোভাব নিয়ে যেন সে দাদার কাছে একবার দাঁড়াল না, তার সঙ্গে একটা কথাও বলল না, তাড়াতাড়ি বাস স্ট্যান্ডের দিকে ছুটে গেল।

আবার এ-ও পরিতোষের মনে হল, যেন সে এক বড়োলোকের আদর-পাওয়া, নষ্ট, বিগড়ানো ছেলেকে দেখছে—জীবনে কিছুই করল না, প্রচুর সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও লেখাপড়াটাও ভালো করে শিখল না, ঘুমিয়ে আড্ডা দিয়ে, সিনেমা-থিয়েটার দেখে, হোটেলে-রেস্টুরেন্টে খেয়ে, বন্ধু-বান্ধবদের আপ্যায়িত করে অথবা নানা বদখেয়াল চরিতার্থ করে জীবনের মূল্যবান সময়গুলি নষ্ট করেছে এবং সেই সঙ্গে প্রচুর অর্থ। এখন বয়স হয়েছে, এখন যেন পৃথিবীটাকে দেখে একটু থমকে দাঁড়িয়েছে, সংসারটা বুঝতে পারছে, বন্ধুদেরও চিনেছে—যৌবনের বন্ধুরা এখন কেটে পড়েছে—জীবিকা অর্জন, পরিবার প্রতিপালন ইত্যাদি নিয়ে তারা এখন সর্বদাই ব্যস্ত। তাই সে কেমন অসহায় একাকী বোধ করছে। কিন্তু এই জন্য কারো প্রতি সে রাগ দ্বেষ হিংসা অভিমান পোষণ করে না। সে বুঝতে পারছে, এটাই সংসারের নিয়ম। মানুষ এক সময় নিজের দিকে ফিরে তাকায়—একটা বয়সে সে সতর্ক হয়ে পড়ে। তেমনি সতর্ক হবার, নিজেদের ভবিষ্যতের দিকে তাকাবার সময় হয়েছে বন্ধুদের, তারা চলে গেছে। হ্যাঁ, সে নিজেও এখন সময় সময় নিজেকে দেখছে। অবশ্য তার খাওয়া-পরার অভাব নেই। প্রচুর সম্পদের অধিকারী হবে সে বা হয়েছে—কিন্তু তা হলেও যেন আর নিজের খেয়াল-খুশি মেটাতে যদৃচ্ছ অর্থব্যয় করতে সে ইচ্ছুক নয়। অনেক টাকা সে উড়িয়েছে—অনেক সাধ অভিলাষ কামনা বাসনা তার পূর্ণ হয়েছে, আবার অনেক কিছু অপূর্ণও থেকে গেছে, তথাপি সে এখন তৃপ্ত, প্রশান্ত। নিজের খেয়াল-খুশি নিয়ে সারাক্ষণ

মত্ত থাকবার ইচ্ছা বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগতের মানুষ সম্বন্ধে তার কেমন একটা কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। সময় সময় সে তাদের দেখে। সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য এক-একটা মানুষকে—রুগ্ন, অসুস্থ দেহ নিয়েও একটি বৃদ্ধকে কেমন উদয়াস্ত খাটতে হয়। খোঁড়া পা নিয়ে মানুষটা ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠতে পারছে না, অথচ সময় মতন তাকে অফিসে হাজিরা দিতে হবে—উলঙ্গ অস্থিচর্মসার মানুষটা ডাস্টবিনের ভিতর মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে খাদ্য অন্বেষণ করছে—রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুখী বিত্তবান যুবকটি এই রকম নানা দৃশ্য দেখছে। দেখতে দেখতে এক সময় এই পৃথিবী সম্পর্কে কেমন একটু চিন্তিতও হয়ে পড়ছে—কিন্তু তা বলে যে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করবে এমন ইচ্ছা তার নেই—সে যে তাদের দেখে অনুকম্পা করছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলছে যেন এই যথেষ্ট—অথবা বলা যায়, গাড়িটা গ্যারেজে রেখে পায়ে হেঁটে কিছুক্ষণ এইভাবে রাস্তায় ঘুরে জগতের মানুষের দুঃখ-কষ্ট অবলোকন করা এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলা তার একটা বিলাস। তা হলেও এই বিলাসের মধ্যে একটা লাবণ্য, একটা সৌন্দর্য আছে। পরিমলের চেহারার মধ্যে এমন একটা সৌন্দর্য ও সততা ফুটে উঠেছে, পরিতোষ এখন অস্বীকার করতে পারল না। মনে হয়, মানুষটা সুখে আছে—কিন্তু কেবল সুখভোগ করেই সে পরিতৃপ্ত নয়—পৃথিবীর দুঃখীদের দিকে তাকিয়ে কাতর হয়ে ওঠার প্রবণতা তার মধ্যে আছে বা ছিল। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে অপরের দুঃখমোচনের ভার সে গ্রহণ করত। কিন্তু সেই শিক্ষা সে পায় না। পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে কেউ তার জন্য এই দৃষ্টান্ত রেখে যায়নি। ভোগ-বাসনায় মত্ত থেকে তাঁরা সারা জীবন কাটিয়ে গেছেন। অথবা ঐহিক বাসনার যখন অবসান ঘটেছে, তখন কেউ কেউ পারলৌকিক সুখের কথা চিন্তা করে ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তীর্থভ্রমণ করেছেন, মন্দির-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং দশজনের ব্যবহারের জন্য একটি পুষ্করিণী খনন করে গেছেন কি বিদ্যালয় স্থাপন করে গেছেন—তার পিছনেও একটা স্বার্থচিন্তা ছিল—একটা সুকীর্তির মধ্যে তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন—তার মৃত্যুর পরেও মানুষ তাঁর মহানুভবতার কথা স্মরণ করবে। কিন্তু অপরের হিতের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে কেউ ফকির সাজেনি। পরিমলকে দেখে মনে হয়, সে ততদূর এগিয়ে যেতে পারত। ফকির হয়ে যেতে দ্বিধা করত না। তার চেহারার মধ্যে সেই প্রতিশ্রুতি ছিল। আবার পরিমলকে দেখে পরিতোষের এ-ও মনে হচ্ছিল, একটি নরম নিরীহ প্রকৃতির মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। এই শহরে তার জন্ম—এখানেই সে বড়ো হয়েছে—কিন্তু তা হলেও শহরের হালচাল, বিশেষ করে উগ্র আধুনিকতাটা চিরকাল তার আয়ত্তের বাইরে থেকে গেছে। সর্বদাই সে পিছনে পড়ে আছে। তাই সর্বদাই শহরের জীবনটার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত ও বিব্রত হয়ে পড়ে। অথচ মানুষটা মূর্খ নয়, বোকা নয়। বিদ্বান বুদ্ধিমান। হয়তো একটা কলেজেই পড়ায়। কিন্তু তা হলে হবে কী—বিদ্যাবুদ্ধি নিয়েও সে অনাধুনিক, অনগ্রসর—আজকালকার ছেলেমেয়েদের চোখে নিতান্তই সেকেলে, এমন কী, তার কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও তাকে দেখে মুখ টিপে হাসে, অনুকম্পা করে; ভাবে, এত ভালোমানুষের এই যুগে বেঁচে থাকাটা হাস্যকর এবং বিপজ্জনকও বটে, যেমন দার্শনিকের মতন আকাশের দিকে চোখ তুলে রাস্তাটা পার হচ্ছে তাতে যে-কোনো সময় গাড়ি চাপা পড়তে পারে।

পরিতোষের তাই মনে হচ্ছিল, যেমন উদাসীন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে পরিমলকে তাতে যে

কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই বাসে উঠেও সে বেশ একটু উৎকণ্ঠা নিয়ে জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে মানুষটাকে দেখতে চেয়েছিল, হয়তো দেওয়ালের সেই পোস্টার পড়া শেষ করে এখন এই ফুটপাথ থেকে নেমে সেই ফুটপাথের দিকে রওনা হয়েছে—কিন্তু গাড়িতে অত্যধিক ভিড় থাকার দরুন পরিতোষ জানালার নাগাল পেল না এবং পরিমলকে দেখতে পেল না। গাড়ি হুহু করে ছুটে চলল।

কিন্তু জগমোহন ভাবছিলেন অন্যরকম।

এখন পরিমলকে নিরীহ শান্ত এবং একটু যেন বোকা বোকাই দেখাচ্ছে। তাই তো দেখাবে। সে রাস্তায় এসেছে, ভিড়ের মধ্যে বহু লোকের চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে — তার আসল রূপ এখানে ফুটতে পারে না। দশটা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষকে দেখে সে লজ্জিত বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে। লজ্জিত? তবে তো নিজের প্রকৃতি সম্পর্কে সে অতিমাত্রায় সচেতন। যদি তাই হয়, জগমোহন চিন্তা করলেন, তবে তার মতন অসাধু কপট পৃথিবীতে খুব কম আছে বলে নিতে হয়। দশজনের চোখের সামনে সে চট্ করে নিজের রঙ পাল্টাতে পারে, ভালোমানুষ সাজতে দেরি হয় না। যেমন এখন। নিতান্তই একটি গোবেচারা ভালোমানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। এখন তাকে দেখলে চেনা যাবে না, বাড়িতে তার নিজস্ব পরিবেশে সে কত বেশি বন্য, অমার্জিত, রুক্ষ ও ভয়ঙ্কর! একটু নির্জনতার মধ্যে সে কেমন উলঙ্গ কুৎসিত হয়ে ওঠে। কবরখানার অন্ধকার তার প্রিয়, বানরের মতন গাছে চড়তে সে ভালোবাসে। সে জেদী একরোখা অসামাজিক অভদ্র। তার ভিতরে অনেক আক্রোশ ও অভিমান টগবগ করে ফুটছে। যে কোনো মুহূর্তে সে প্রলয়কাণ্ড সৃষ্টি করতে পারে।

না, জগমোহনেরই দেখবার ভুল, তাঁর চিন্তার মধ্যেই বিশেষ ত্রুটি ছিল। অনেক দিন আগেই তো এই জিনিস তাঁর চোখে পড়তে পারত, যখন এই সন্তান প্রায় বালক ছিল, কিশোর ছিল। সেদিন কত বন্ধু কত ভক্ত জুটিয়ে আসর জমিয়েছিল তার — স্কুলে কলেজে একটি উজ্জ্বল রত্ন, খেলার মাঠে এক আশ্চর্য দীপ্তিশালী খেলোয়াড় — ফুলের সৌরভের মতন তার সুনাম সুযশ ছড়িয়ে পড়ছিল চতুর্দিকে; প্রখর বুদ্ধি, মিষ্টি স্বভাব, সুন্দর দেহ, মিষ্টি চেহারা, বন্ধুর মন বান্ধবীর হৃদয় জয় করার অসামান্য প্রতিভা নিয়ে। তার জন্য জগমোহন অত্যন্ত গর্ববোধ করতেন জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য। ছেলের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তার প্রখর দৃষ্টি। এবং এই জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। আর দুটি ছেলের জন্যও করতেন, কিন্তু পরিমলের জন্য যেন একটু বেশি করতে পারলে তিনি সুখী হতেন। শেষ পর্যন্ত তাই করা হত। পরিমলের জুতোর দামটা বেশি পড়ে যেত, জামা-কাপড় দুখানার জায়গায় চারখানা কেনা হয়ে যেত, হাতখরচের জন্য তার পকেটে দু-পাঁচ টাকা বেশি উঠত। না, বাইরের মানুষ বুঝবে কেমন করে, মৌমাছির ঝাঁকের মতন তরুণমতি ছেলের দল মেয়ের দল তার কাছে প্রতিনিয়ত ছুটে এসেছে, তাকে ঘিরে গুঞ্জন তুলেছে; তারা কেমন করে বুঝবে ঐ ফুলের মধ্যে কী বিষ লুকিয়ে আছে, জন্মদাতা জগমোহনই বুঝতে পারেননি, পরিমলের বাইরেটা সুন্দর লোভনীয়, ভিতরটা অন্ধকার—সেই অন্ধকারে আস্তে আস্তে একটা পশু-মন তৈরি হচ্ছিল।

আজ অবশ্য আর তাঁর ভুল বুঝবার কারণ নেই।

কিন্তু তিনি অবাক হচ্ছিলেন, ভালোমানুষ সেজে সে হঠাৎ এমন প্রকাশ্য জায়গায় এসে দাঁড়াল কেন, তার অভিপ্রায় কী—লক্ষ্য কোন্ দিকে!

যতক্ষণ গাড়িতে ছিলেন ততক্ষণ তো বটেই, চেম্বারে বসেও জগমোহন জিনিসটা বার বার চিন্তা করলেন। যদি কালকের মতন এখন আবার সে কবরখানায় চলে যেত কী পরিতোষের ছেলেকে নিয়ে বাগানে ঢুকে আরো কিছুক্ষণ হৈ-চৈ করত অথবা বাগানের মালির কুড়ুলটা চেয়ে নিয়ে খুব শব্দটব্দ করে একটা গাছটাছ কোপাতে আরম্ভ করে দিত বা ঐ ধরনের কোন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আক্রোশের জ্বালায় সময় সময় সে যা করেছে, যদি তিনি বাড়ি থেকে বেরোবার সময় দেখে আসতেন দোতলার বারান্দার রেলিংটার ওপর চেপে বসে গলা ছেড়ে সে গান গাইছে তো জগমোহন কতকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। অর্থাৎ নূতন করে তাঁকে কিছু ভাবতে হত না। একটা নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে, একটা সীমানার ভিতরে থেকে সে যা করবার করছে।

পরিতোষের মতন তিনিও লক্ষ্য করলেন আজ তার বেশভূষা তেমন পরিপাটি নয়, মাথাটা রুক্ষ হয়ে আছে—দাঁড়াবার ভঙ্গিটা শিথিল; এই ঔদাসীন্য এই শৈথিল্যও তার ইচ্ছাকৃত, সমাজের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলার দায়িত্ব তার নেই। জগমোহন এই জন্য বিস্মিত হলেন না, দশজনের সামনে সে চটি পরে বেরোবে, কবরখানার জঙ্গলে ঢুকবার সময় তার পায়ে পাম্পশু দেখা যাবে। তা যাক, জগমোহন ভাবিত হচ্ছিলেন অন্য কারণে। এই দুদিন সে বাড়িতে ছিল বা বাড়ির ধারে-কাছে ঘোরাঘুরি করছিল। কী করছে না করছে দেখা গেছে, বোঝা গেছে। এখন সে ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন চোখের আড়ালে চলে যাবে। কী করবে না করবে কিছুই বোঝা যাবে না, দেখা যাবে না । এই জন্যই দুশ্চিন্তা। এবং ভালোমানুষ সেজে ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে সে যে ভিতরে ভিতরে নূতন কোন দুষ্কর্মের মতলব আঁটছে না তা-ই বা কে জানে।

জগমোহন মুখভার করে কখনো বা খিটখিটে মেজাজ নিয়ে আজ তাঁর রুগীদের দেখলেন। তাঁর মুখে হাসি ছিল না। অন্য দিন চেম্বারে বসে একথা সেকথা নিয়ে মানুষের সঙ্গে তিনি নানারকম রসিকতা করেন। এটা তাঁর একটা বিশেষ গুণ। অন্য ডাক্তারদের মতন ভয়াবহ রকম গম্ভীর থেকে একটা থমথমে পরিবেশ সৃষ্টি করে রুগীদের কী তাদের আত্মীয়স্বজনের মনে কোনোরকম ভয় বা নৈরাশ্য সঞ্চার করার পক্ষপাতী তিনি নন। তিনি নিজে হাসিখুশি থেকে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে চান, তাদের মন হাল্কা রাখতে চান। 'ও কিছুই হয়নি, সেরে যাবে', 'এই জন্য খুব একটা ভাবতে হবে না'—সারাক্ষণ তাঁর মুখে এ ধরনের কথা লেগে থাকে। তিনি বিশ্বাস করেন, অষুধপথ্যের মতন একটু হাসি একটু অভয়বাণী শুনিয়ে রুগীদের উৎসাহিত উজ্জীবিত করে তোলার প্রয়োজন আছে। তাতে ফল ভালো হয়। কিন্তু আজ ডাক্তারবাবুর ডাক্তার সাহেবের' মেজাজ ও চেহারা দেখে সকলেই বিস্মিত হল।

পরিতোষ অবশ্য তার কর্মস্থলে পৌঁছে তেমন গম্ভীর বা বিষণ্ণ হয়ে থাকল না। পরিমলের কথা যে সে একেবারে ভুলে রইল তা-ও না। মাঝে মাঝে ছবিটা তার মনে পড়ছিল। পরিমল যেভাবে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের পোস্টার দেখছিল—বেকার, দার্শনিক, অলস, কর্মবিমুখ ধনীর দুলাল সেকেলে মন নিয়ে একালের একটি ভালোমানুষ অধ্যাপক ইত্যাদি

অনেক কিছুই পরিমলকে দেখে মনে করা যেত—এ সব পরিতোষের রাস্তার চিন্তা, কিন্তু এখন একটা কনস্ট্রাকশনের কাজ দেখতে আকাশের দিকে চোখ তুলতে হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ল তার। মনে মনে সে হাসল।

জেল থেকে পরিমল বেশ মোটাসোটা হয়ে বেরিয়েছে। গায়ে চর্বি দেখা দিয়েছে। গাল দুটো ফুলে উঠেছে। তার ফলে হয়েছে কী, চোখ দুটো আর তেমন ভাসা ভাসা দেখায় না, কেমন যেন একটু ভিতরে ঢুকে গেছে। ঠোঁট দুটো আগের চেয়ে অনেক বেশি পুষ্ট হয়েছে মনে হয় এবং হয়তো এই কারণে নীচের ঠোঁটটা একটু ঝুলে পড়েছে। পরিমলের এই চিত্র কল্পনা করতে গিয়ে পরিতোষের এখন কথাটা মনে হল। মানুষটার দাঁড়াবার ভঙ্গি, মেদালো দেহ, ঈষৎ ঝুলে পড়া পুরু ঠোঁট এবং কোটরে প্রবিষ্ট চোখ—সব মিলিয়ে অবশ্য তার সম্পর্কে এই চিত্র কল্পনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রথম নজরে তাকে দেখেই কারো মনে হতে পারে, বেশ একটু ভলাপচ্যুয়াস প্রকৃতির মানুষ জগমোহন ডাক্তারের বড়ো ছেলে। অবশ্য এমন মনে হওয়াটা কিছু দোষের না। একজনের আকৃতি দেখে চোখ মুখ দেখে কত কিছু মানুষের মনে হয়। এবং পরিতোষও বলছে না যে, তার দাদা পরিমল একটি ভয়ানক ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি। একটা মানুষকে দেখে আর পাঁচজনের মনে কী ইম্প্রেসন্ সৃষ্টি হতে পারে তাই নিয়ে কথা হচ্ছে। সেই জন্য কথাটা মনে হতে পরিতোষ নিজেকে খুব একটা দোষী সাব্যস্ত করতে পারল না। বরং সে হাসতে পারল। এবং লাটাইয়ের সুতো ছাড়বার মতন চিন্তাটাকে অবাধে সে আরো বড়ো—লম্বা হতে দিতে পারল। এই জন্য নিজের ভিতর কোনো রকম বিবেকের দংশনও সে অনুভব করল না। এটা অ্যাসাম্পশন্ না ইম্প্রেসন্—পরিতোষ সত্যি কিছু তার দাদাকে সেই প্রকৃতির মানুষ বলে মনে মনে স্বীকার করে নিচ্ছে না। তাই ভাবনাটাকে দীর্ঘ হতে দিতে সে এতটুকু সঙ্কোচ করল না। মধ্য যৌবন—না যৌবনের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে পরিমল। এখন আর কামনা বাসনার সেই দাপাদাপি নেই। আগের দিনের মতন তেমন চঞ্চল বেপরোয়া হতেও পারছে না। বয়সের ভার বলে একটা জিনিস আছে। চাপল্য আপনা থেকে কমে আসে। তা হলেও মানুষের স্বভাব বদলায় না। আগুনের লকলকে শিখা নেই—আগুন আছে। হয়তো সেটা ছাইচাপা পড়েছে। ঘুম নেই—ঘুমের অবসান ঘটেছে, কিন্তু থেকে থেকে হাই তুলছে। তেমনি নিস্তেজ ম্রিয়মাণ পরিমল শরতের রৌদ্রাচ্ছন্ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাই তুলছে।

উপমাটা মনে পড়তে পরিতোষ নূতন করে হাসল। কিন্তু এ কথা তো কাউকে বলা যায় না। কাকে বলবে এখানে? হ্যাঁ, একজনকে বলা যেত, বাড়িতে রমলাকে। কিন্তু ভীষণ চটে যাবে শুনলে। হয়তো পরিতোষকে একটা ধমক খেতে হবে। বড়ো বেশি শক্ত ধাতের মেয়ে। ধনুকের ছিলার মতন সর্বদা টান হয়ে আছে। হিউমারবোধ না থাকলে যা হয়—পরিহাসচ্ছলেও কোনো রকম বাজে কথা বলে স্ত্রীর কাছে সে হারতে পারে না। হয়তো তারপর থেকে তিন দিন সে পরিতোষের সঙ্গে কথাই বলবে না। হ্যাঁ, আর একটি মানুষকে বলা যায়, গিরিজাকে। কিন্তু নিজের দাদা সম্পর্কে এখনই গিরিজার কাছে এ ধরনের একটা কথা বলা উচিত হবে কিনা পরিতোষ চিন্তা করতে লাগল। তা ছাড়া লর্ড সম্পর্কে গিরিজা আরও গুরুতর রকম কিছু চিন্তা করছে। এমন একটা হাল্কা কথা বললে সে হয়তো তা আমলই দেবে না—বরং

পরিতোষই তখন খেলো প্রতিপন্ন হবে। পরিতোষের মুশকিল হচ্ছে, জেলফেরত ঐ মানুষটি সম্পর্কে কিছু ভাবতে গিয়ে সে জগমোহনের মতন, গিরিজার মতন সিরিয়াস হতে পারছে না—বা রমলার মতন—সুকোমলও সিরিয়াস। তার কারণ, পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় নিয়ে তারা গোড়া থেকেই গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করে দেয়। পরিতোষ তা করে না। তার কথা হচ্ছে কোনো সত্যই চিরদিন সত্য থাকে না, কোনো বিশ্বাসই চিরকাল অটল থাকে না। বিশ্বাস টলে যায়, আজকের সত্য কাল মিথ্যা হয়ে যায়। আজ পরিমলকে তোমার এই মনে হচ্ছে দুদিন পরে অন্যরকম মনে হতে পারে। এই জন্যই মোড়ের কাছে দাদাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পরিতোষ এক সঙ্গে তার একাধিক রূপ কল্পনা করল। করতে পারল। গিরিজা, জগমোহন বা রমলার পক্ষে তা সম্ভব না। তারা এখন থেকেই মানুষটার একটা রূপ মনের মধ্যে গেঁথে ফেলতে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছে। এই রোগের ওষুধ নেই।

॥ ১৯ ॥

ভুল করছিল সে, এখন বুঝতে পারল।

এত বড়ো একটা পৃথিবীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকলে তার নিজের ক্ষতি হত।

অন্ধকারে বসে তুমি আলোর সাধনা করতে পার, কিন্তু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে কিনা তার পরীক্ষা দেবে না? এই পরীক্ষা শুধু নির্জনতায় থেকে হয় না—তোমাকে মানুষের সমাজে এসে দাঁড়াতে হবে, বাস্তবের মুখোমুখি হতে হবে।

কাল রাত্রেই সে বুঝতে পেরেছিল।

পুরোনো পৃথিবীর দিকে তাকাব না, পুরোনো মানুষগুলিকে এড়িয়ে চলব—এটা কাপুরুষের কথা। তুমি তো কাপুরুষ নও। তবে তোমার এই পলায়নের মনোবৃত্তি কেন।

যদি তোমার মধ্যে কিছু সত্য কিছু সৌন্দর্য এসে আশ্রয় নিয়ে থাকে, জেলখানায় বসে যা উপলব্ধি করতে, তো তোমার আর ভয় কী। এই পুরোনো পৃথিবীতে যদি কিছু ক্লেদ হীনতা অন্ধকার ও মালিন্য থেকে থাকে, তুমি তোমার সত্যবোধ, সুন্দর উপলব্ধি দিয়ে সেই ক্লেদ হীনতা ও অন্ধকার জয় করবে।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই পরিমল খুব ছোটো একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ পেয়েছে।

দুর্বলতা ভীরুতা ঝেড়ে ফেলতে না পারলে তুমি তোমার সত্যকেও বড়ো করে পাবে না। সৌন্দর্যের পূর্ণবিকাশ তোমার মধ্যে কোনোদিন ঘটবে না। তুমি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তোমার সাধনা সিদ্ধ হল না। পরিমল তা চায় না। আজ সকালে সে এভাবে বুঝেছে. ছোটো ছেলেটি তার কাছে আসতে চায়, পারছে না, পিছন থেকে কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে, শাসন করছে, চোখ রাঙাচ্ছে; শিশুর কোমল চোখে সেই ভয়, কাতরতা; তাই দু-হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গিয়ে পরিমল তখনি আবার হাত গুটিয়ে নিয়েছে। যেন নিষেধের তর্জনীটা সে চোখের সামনে দেখতে পেয়েছে —যেন শিশুর ভয় সঙ্কোচ জড়তা তার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। দুদিন ধরে তাই চলছিল। অবুঝ দীপু সময় সময় নিষেধের বেড়াজাল ডিঙিয়ে পরিমলের ঘরের দরজার কাছে ছুটে এসে 'জেঠুমণি' 'জেঠুমণি' বলে চিৎকার করে ডেকে উঠেছে—

কিন্তু পরিমল সাড়া দেয়নি—দরজা খুলে বেরিয়ে এসে ভাইপোকে আদর করে কোলে টেনে নেয়নি। সাহস পায়নি। ঘুমের ভান করে বিছানায় শুয়ে রয়েছে।

কিন্তু কেন এই দুর্বলতা, ভয়? রাত্রে সে চিন্তা করেছে।

তুমি ভয় করবে অন্যায়কে অসত্যকে পাপকে অসুন্দরকে—এদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে। কিন্তু যেখানে একটি নিষ্পাপ শিশু সেখানে ভয় কী? তাকে দূরে সরিয়ে রেখে তুমি তোমার নিজের ক্ষতি করছ। যেমন ভোরবেলা দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে থেকে তুমি আশ্চর্য আলোর জাগরণটা দেখতে পেলে না। মাত্র কয়েক মিনিটের লীলাখেলা তোমার অলক্ষ্যে নিঃশব্দে সম্পন্ন হয়ে গেল। এই উৎসবে সমারোহ ছিল জাঁকজমক ছিল, কিন্তু কলরব ছিল না। তাই টের পেলে না কখন উৎসব আরম্ভ হল কখন শেষ হল।

আজ সকালে কোন রকম দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করে পরিমল বাগানে নেমে গেল। বাবার সঙ্গে দীপু দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু তা হলেও পরিমল হাতছানি দিয়ে শিশুকে ডাকল। যেন পরিতোষ একটু উদার হল। ছেলেকে নিয়ে বাগানে নেমে এল। পরিমল আর এক সেকেন্ড দেরি করল না। তার ভয় কেটে গিয়েছিল। জড়তা দূর হয়েছিল। শিশুকে তৎক্ষণাৎ কোলে তুলে নিল। তার কপালে চুমু খেল। শিশু খিল খিল করে হেসে উঠল। বুকের ভিতর শিহরণ অনুভব করল পরিমল। একটা কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরে তার আনন্দের অবধি রইল না। চাঁপাফুলের জন্য শিশু বায়না ধরেছিল। লাফিয়ে গাছে উঠে কত ফুল পেড়ে এনে ভাইপোকে সে উপহার দিল। শিশু পরিতৃপ্ত হল। শিশুর তৃপ্তির মধ্যে দিয়েই বুঝি মানুষ প্রথমে জীবনের স্বাদ খুঁজে পায়, বেঁচে থাকার সার্থকতা উপলব্ধি করে। পরিমল অনুপ্রেরণা লাভ করল।

পরিতোষ কী ভাবল, রমলা কিছু মনে করল কি না, অথবা জগমোহন যখন শুনবেন তখন তিনিই বা জিনিসটাকে কী চোখে দেখবেন এই নিয়ে সে একটুও মাথা ঘামাল না। প্রদীপ্ত নক্ষত্রের মতন দুটি পরম সত্য তার মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করতে লাগল।

একজন চেয়েছে, আর একজন দিয়েছে।

চাওয়ার মধ্যে কোনো জড়তা নেই কুণ্ঠা নেই ভাবনা ভয় নেই—দেওয়ার মধ্যেও কোনোরকম আক্ষেপ আশঙ্কা দ্বিধা বা ভীতি ছিল না।

এই দুই সত্যের মাঝখানে আর কী থাকতে পারে—থাকা উচিত নয়, এই সুন্দর উপলব্ধিই পরিমলকে আজ রাস্তায় টেনে এনেছে—মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে পুরোনো পৃথিবীটাকে সে দুই চোখ ভরে দেখছে।

মাথার ওপর শরতের স্বচ্ছ নীল আকাশ। উজ্জ্বল রৌদ্রে উদ্ভাসিত পরিচ্ছন্ন পথ ঘাট বাড়ি ঘর। যেন মানুষগুলিকেও সুন্দর লাগছিল পরিমলের। তার মনে হচ্ছিল রৌদ্র লাগা শিশিরের মতন তার ভিতরের অভিমানটাও আস্তে আস্তে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে সেই শিশু, শিশুর অনাবিল হাসি ও উল্লাসের রৌদ্র লেগে তার মন প্রাণ শুকিয়ে ঝরঝরে হয়ে গেছে। আর অভিমান থাকল না, সংশয়ের কুয়াশা কেটে গেল।

কে জানে পরিত্যক্ত প্রাচীন পৃথিবীটাকে তার আবার হয়তো ভালো লেগে যেতে পারে।

পরিমল তাকিয়ে দেখছিল বুড়োটাকে।

রাস্তার পাশে লাইটপোস্টের নীচে ফলের দোকান সাজিয়ে বসেছে। আশ্বিনের লালাভ মসৃণ আপেলের গায়ে রৌদ্র পিছলে পড়েছে। কাচের মতন স্বচ্ছ গুচ্ছ গুচ্ছ আঙ্গুর। কিছু নাসপাতি সাজানো রয়েছে ডালায়। একটু একটু করে পরিমল সেদিকে এগিয়ে গেল। কত পুরোনো এই ফল। কত যুগ আগে দেখেছিলে সে। আজ নূতন করে তার দেখতে ইচ্ছা করল।

তাই নূতন করে আপেল আঙ্গুর দেখতে দেখতে আর একটা পুরোনো দোকান মনে পড়ল তার। আর একটা দিন। এমন সুন্দর রৌদ্র ছিল না। সকালও ছিল না সেটা। বিকাল। মেঘলা ধূসর মনমরা বিকাল। সেই মনমরা বিকালের আলোয় কলেজ থেকে বেরিয়ে বাস ধরতে হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে দাঁড়াল সে। একলা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল অনেকক্ষণ। রাস্তায় কোথায় কী গোলমাল হয়েছিল, বাস আসতে দেরি করছিল। এক সময় তার পাশে এসে দাঁড়াল একজন। নামটা যেন চিত্তপ্রিয়। এক সঙ্গে পড়ত তারা। একটু আগে বাগানে পরিতোষ গিরিজার কথা বলছিল, পরিমল কিছুতেই মুখটা মনে করতে পারছিল না। এই চিত্তপ্রিয়ের মুখের সঙ্গে বার বার কেমন গোলমাল করে ফেলছিল সে। এখন তার মনে পড়ছে—কালো রং হলেও লম্বা সুছাঁদ গড়ন ছিল চিত্তপ্রিয়র। নামের সঙ্গে স্বভাবের মিল ছিল। ভীষণ হাসাতে পারত মানুষকে। খুব ভালো ক্যারিকেচার জানত। সবাই তাকে ক্যারিকেচারিস্ট বলে ডাকত। না, গিরিজা অন্য মানুষ। নামটা মনে পড়লেও চেহারাটা মনে করতে পারছে না পরিমল। তাই হয়, অতীতের মুখগুলি মনে পড়ার সঙ্গে বর্তমানের কোনো কোনো ঘটনা বা দৃশ্য—দৃশ্য কেন এমন কী গন্ধেরও হয়তো যোগাযোগ আছে। একটা বিশেষ গন্ধ নাকে লাগল, আর অমনি হুস করে অন্ধকার অতীতের একটা মানুষ তোমার সামনে এসে দাঁড়াল। তার হাসি, চোখের পলক পড়াটি পর্যন্ত তোমার মনে পড়ে গেল। হয়তো তার আগে কেউ একজন বকে বকে হয়রান হয়েছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কতরকম বর্ণনা করেছে তোমার কাছে অতীতের সেই মানুষটির চোখ মুখ এবং চিবুক হাঁটা চলার; কিন্তু কিছুতেই তোমার মনে পড়ছিল না। যেমন একটু আগে পরিতোষ অনেক কিছু বলে-কয়েও গিরিজা নামক মানুষটিকে মনে করিয়ে দিতে পারল না পরিমলকে। এখন কিনা আপেলের দোকান দেখে চিত্তপ্রিয়কে মনে পড়ে গেল তার। পরিমল নিজের মনে হাসল। কাল বিকালেও এই হয়েছিল। টেবিলের ওপর খাতা কলম ও কাগজ নিয়ে সে কবিতা লিখতে বসেছিল। তার পক্ষে একটা হাস্যকর [illegible] হাঁ সত্যি কী—মাথায় একটু কবিতার মতন কিছু এলেই যে সেটা লিখে ফেলা যায় না [illegible] তাই ঠেকে, কাগজ কলম নিয়ে টেবিলে বসার সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে তাদের ক্লাসের [illegible] সেই কবি—অজিত পুরকায়স্থ পরিমলের চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। অজিত হাসছিল। অজিতের হাসি কান্না, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকানোটি পর্যন্ত পরিমলের মনে পড়ে গেল। কবে মরে গেছে সেই ছেলে। কত যুগ পরিমল তাকে দেখে না। কিন্তু কত জীবন্ত নিখুঁত একটা ছবি তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। তাই হয়, আপনা থেকে মনে পড়লে যদি কিছু মনে পড়ে যায়—আর একজন বলে-কয়ে হাজারটা বর্ণনা দিয়েও তোমাকে কিছু মনে করিয়ে দিতে পারে না। আজ রাসভারি ইঞ্জিনীয়ার পরিতোষকে দেখে ছেলেবেলার ভীরু দুর্বল পরিতোষকে তার মনে পড়ে গেল, জেলখানায় বসে পরিতোষের

ছোটো সময়ের ঐ ভয়কাতুরে চেহারাটা কিছুতেই পরিমল মনে করতে পারছিল না। যেদিন কথায় কথায় দাদাকে তার দরকার পড়ত—দাদা সঙ্গে না থাকলে অন্য ছেলেদের হাতে সে মার খেত। এসব চিন্তা করতে গিয়ে কাল সুদিনকেও মনে পড়েছিল পরিমলের। বিড়ালমুখো সুদিন। ফর্সা রং চেপ্টা নাক কটা চোখ। যখন কাউকে মনে পড়ার তখন এমনি হঠাৎ মনে পড়ে যায়—বলে কয়ে—

হ্যাঁ, সেদিন হয়েছিল কী, জন্য একলা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পরিমলের কেমন ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল, একটা ট্যাক্সিও চোখে পড়ছিল না; এমন সময় চিত্তপ্রিয় এসে তার পাশে দাঁড়াল। চিত্তকে দেখে সে খুব খুশি হল। এখনি দু-একটা রঙ্গরসের কথা বলে সে হাসিয়ে মারবে, কিন্তু চিত্ত এসেই তাকে এমন জোরে এক কনুইয়ের গুঁতো মারল, অবাক হয়ে পরিমল ক্যারিকেচারিস্টের মুখের দিকে তাকাল।

'কী হল ভাই?' পরিমল প্রশ্ন করল।

'এমন হাঁ করে তাকিয়ে দেখছ কী?' গম্ভীর গলায় চিত্ত পাল্টা প্রশ্ন করল।

'বাস আসছে না কতক্ষণ! আধঘণ্টার ওপর দাঁড়িয়ে আছি।'

'উহুঁ', চিত্ত কথাটা বিশ্বাস করল না। 'আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না, আমি দেখে ফেলেছি।'

মহা ফাঁপরে পড়ল পরিমল।

'কী আবার দেখে ফেলেছ!' রুষ্ট হয়ে ক্যারিকেচারিস্টের চোখ দুটো দেখল সে। এবং তৎক্ষণাৎ তার মনে পড়ল, এই মাত্র পাশের ফলের দোকানটার সামনে গিয়ে আপেলের দাম জিজ্ঞাসা করছিল সে। বাস আসছে না, বিরক্ত হয়ে পরিমল দু পা হেঁটে ফুটপাথের ওই দোকানটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আপেল কেনার ইচ্ছা ছিল না তার। তবে সুন্দর লালচে গোলাপি রঙের আপেলগুলি দেখতে তার খুব ভালো লাগছিল। 'হুঁ, ওই সুন্দর আপেলগুলি দেখছিলাম—'পরিমল হেসে বলল, 'তুমি ঠিক ধরেছ, কিন্তু সেটা কি খুব দোষের হল ভাই?'

'মোটেই না'—তেমনি গম্ভীর থেকে ক্যারিকেচারিস্ট মাথা নাড়ল। 'লাল আপেল দেখবে এ তো খুব সুখের কথা—আপেল লাল, আপেল গাল'— কবিতার সুর করে চিত্তপ্রিয় বলল, 'ত্রিভুবনে এর চেয়ে রমণীয় লোভনীয় জিনিস আর কী আছে!'

এবার পরিমল ক্যারিকেচারিস্টের পরিহাসটা বুঝতে পারল। শব্দ করে হেসে উঠে চিত্তপ্রিয়র কাঁধে একটা চাপড় বসিয়ে দিল। পরিমল যখন আপেলের দাম জিজ্ঞাসা করছিল তখন একটি তরুণী, সম্ভবত আপেল আঙ্গুর নাসপাতি, যা হোক একটা কিছু কিনতে ধীরে ধীরে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার গাল দুটো আপেলের মতন লাল ছিল কিনা পরিমল মোটেই লক্ষ্য করেনি। তবে মেয়েটিকে তার মনে পড়ল। পরিমল হাসছিল, কিন্তু চিত্তপ্রিয় তখনও গম্ভীর থেকে সুর করে 'আপেল লাল আপেল গাল' ছড়া কাটছিল। সেই মুহূর্তে বাস এসে যায়। পরিমল গাড়িতে উঠে পড়ল। চিত্ত নাছোড়বান্দা। গোলমালে ছড়া শোনা যাবে না তাই দাঁড়িয়ে থেকে হাত দুটো গোল করে শূন্যে তুলে নাচাতে লাগল, যাতে পরিমল গাড়ির জানালা দিয়ে দুটো আপেল দেখতে পায়। গাড়ি ছেড়ে দিল। চিত্তপ্রিয়কে আর দেখা

গেল না, আপেলের মতন গোল করা তুলে ধরা তার হাত দুটো আর দেখা গেল না। তাহলেও গাড়িতে বসে পরিমল একা একা সেদিন ভীষণ হেসেছিল।

কত বছর পর আজ মনমরা এক মেঘলা বিকালের ছবি হ্যারিসন রোডের মোড়ের সেই আঙ্গুর আপেলের দোকান ও রসিক চিত্তপ্রিয়কে তার মনে পড়ল।

এখানে লাইটপোস্টের নীচে বুড়োর ওই ফলের দোকানটা চোখে না পড়লে এসব কিছুই হয়তো পরিমলের মনে পড়ত না।

কিছুক্ষণ একটা রিকশার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। খালি রিকশা। ঠুনঠুন শব্দ করে চলে যাচ্ছে। আজকাল যেন কলকাতার রিকশার উন্নতি হয়েছে। না কি অনেকদিন পর দেখছে বলে গাড়িটা তার চোখে ভালো লাগছে। ভিতরটা কেমন লাল তকতকে ঝকঝকে দেখাচ্ছে, আরো পুরু মোলায়েম গদি বসানো হয়েছে যেন। চাকা দুটো বড়ো বড়ো লাগছে। না কি আগের মাপের আছে, পরিমল ঠিক মনে করতে পারল না। রিকশা দূরে মিলিয়ে গেল। রাস্তায় এখন বড়ো গাড়ির মিছিল চলেছে। লরির পিছনে বাস, তার পিছনে ট্যাক্সি, তারপর দুটো প্রাইভেট গাড়ি, কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার গাড়ি, আবার প্রাইভেট গাড়ি, প্রাইভেট.... ....প্রাইভেট। পরিমল একটা লম্বা নিশ্বাস পরিত্যাগ করল। রৌদ্রের তাপ বাড়ছে। তা হলেও সে ছায়া খুঁজল না। হাঁটতে লাগল। হাঁটতে ভালো লাগছিল। কপাল ঘামছে। আজ আর জেলের কয়েদিদের ঘামে ভেজা কপাল, কপালের শিরা উপশিরা, চামড়ার কুঞ্চন ও নানারকম কাটাচেরা দাগ-ধরা মুখগুলি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল না। সেদিনের কিছুই তার মনে পড়ল না। তার চোখ মন বর্তমানের পরিব্যাপ্ত প্রশস্ত নীল আকাশ ও রৌদ্রঘন প্রতিটি মুহূর্ত এবং রাস্তার প্রতিটি স্থির ও চঞ্চল দৃশ্য নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে থাকল, ক্রমশ এই পুরোনো জগতটার মধ্যে সে একটা নূতনত্ব ও আকর্ষণীয় কিছু দেখতে পাচ্ছিল। এখানে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না, জেলে থাকতে সর্বদা সে এই ভয় করত।

আজ ভয়টা কেটে গেছে।

একটা আলোর ইশারা দেখতে পাচ্ছে সে।

এই জন্য বাড়ির শিশুটির নিকট সে কৃতজ্ঞ। শিশু তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তোমার সুন্দর উপলব্ধি দিয়ে তুমি সকল ক্লেদ হীনতা ও অন্ধকার জয় করবে।

শিশু তাকে শিখিয়েছে, তুমি যদি চাওয়ার মতন করে চাইতে পার তো আর একজন তোমাকে দেবে বইকি।

চাওয়া ও পাওয়া, এই দুই পরম সত্যের মাঝখানে আর কিছু থাকতে পারে না।

তাই পরিমলের আশা হচ্ছিল। যদি সে চাইতে পারে।

চাইতেই হবে তাকে। তা না হলে তার মনে হবে সে অপবিত্র অশুদ্ধ। চিরকাল কেউ কিন্তু অপরাধী হয়ে থাকতে পারে না। তবে আর এতদিন সে কীসের সাধনা করল। তার লক্ষ্য পূর্ণতার দিকে, পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে।

নির্জন বনের বিশাল উন্নত বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে সে রোমাঞ্চিত হয়েছে। আনন্দরসে তার মন আপ্লুত হয়েছে। নিজের মধ্যে সেই বিশালতা অনুভব করেছে।

আজ লোকালয়ে এসে সে সেই আনন্দ সেই রোমাঞ্চ থেকে বঞ্চিত হবে, এতদিন যে

সাধনা করে এসেছে তার সিদ্ধি দেখবে না? একটা অপরাধের শিকল গলায় ঝুলিয়ে বাকি জীবন তাকে কাটাতে হবে? এ যে মৃত্যুর চেয়েও মর্মান্তিক।

তা হয় না, হতে দেবে না সে।

ঊর্ধ্বশির বনস্পতি হয়ে তাকে বাঁচতে হবে।

তখন মেঘ আসুক আলো আসুক—রুক্ষ রৌদ্র কর্কশ হিম, ঝড়ঝঞ্ঝা বসন্তের মলয়ানিল—সব সে মাথা পেতে গ্রহণ করবে। কেননা, তখন সে বিস্ফারিত সুন্দর ও সার্থক। কিন্তু তার আগে তাকে সুদৃঢ় হতে হবে শক্তিমান হতে হবে। সেই শক্তি সেই দৃঢ়তা আসবে যদি সে একটি মানুষের চোখে ক্ষমা দেখতে পায়, সেই শীর্ণকায় হতাশ ক্ষুব্ধ বৃদ্ধ যদি অন্তত একবার তাঁর চোখের ঘৃণা মুছে ফেলে একটি অনুতপ্ত মানুষের দিকে প্রীতির ও স্নেহের বাহু বাড়িয়ে দেয়। দেবে না? নিশ্চয় দেবে।

যদি পরিমল চাইতে পারে অক্ষয়বাবু দেবেন।

হঠাৎ সে চোখ তুলে ওপরের দিকে তাকাল। সাদা ধবধবে এক খণ্ড মেঘ দেখা দিয়েছে। এতক্ষণ ছিল না। শরতের স্বচ্ছ নীল আকাশ শুধু রৌদ্র নিয়ে কেমন ধূধূ করছিল। সাদা মেঘ দেখে সে সান্ত্বনা পেল। এই শুভ্রতা বুঝি কারো আশীর্বাদের প্রতীক। অক্ষয়বাবু তাকে আশীর্বাদ করবেন। লম্বা পা বাড়িয়ে পরিমল রাস্তাটা ক্রশ করবে। থমকে দাঁড়াল। যেন কেউ তাকে পিছন থেকে ডাকল।

ঘাড় ফেরাল সে।

ফুটপাথের ভিড় থেকে আলাদা হয়ে বেরিয়ে এল মানুষটা। টাই-সুট পরা কালো রোগা মতন একটি মানুষ। একটা হাত শূন্যে তুলে পরিমলের দিকে তাকিয়ে হাসছে। দাঁতগুলি খুব পরিচ্ছন্ন। সব কটা দাঁত বার করে পরিচিত মানুষের মতন, আত্মীয়ের মতন হাসছে।

পরিমল বিব্রত বোধ করল। তা হলেও সে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়াল। পরিমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে বুঝতে পেরে মানুষটি আর শূন্যে হাত তুলে রাখল না। বরং হাতটা ঝুলিয়ে দিয়ে, কাঁচিমতো আন্দোলিত করতে করতে, মাথাটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রেখে যেন হৃষ্ট মনে দ্রুত পা ফেলে পরিমলের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

পরিমলকে দেখে মানুষটি যে খুব খুশি হয়েছে বোঝা যাচ্ছিল। হয়তো কিছুক্ষণ ধরে তাকে অনুসরণ করছিল পিছনে পিছনে হাঁটছিল। এমনও হতে পারে ভিড়ের মধ্যে পরিমলকে খুঁজে বার করতে তাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। বড় রাস্তা বলে এদিকটায় একটু বেশি মানুষ চলাফেরা করছে। তা ছাড়া এখন অফিস কাছারির সময়।

কপালের ঘাম মুছে পরিমল ঘাড় সোজা রেখে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মানুষটি যখন তার প্রায় কাছে এসে পড়েছে, দুজনের মাঝখানে আর তিন হাতও ব্যবধান নেই, তখনও পরিমল হাসতে পারল না। কিন্তু আর একজনের মুখের হাসিটা ততক্ষণে আরও বড়ো হয়ে কান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

'চিনতে পারছেন?' সে-ই প্রথম আপনি করে সম্বোধন করল। পরিমল কথা বলল

না, ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক করে মাথাটা একটু পিছনের দিকে হেলিয়ে দিয়ে মানুষটির কপাল চোখ চিবুক পরীক্ষা করতে লাগল।

গিরিজা আর হাসছিল না, বরং তার চোখে একটা কাতরতা ফুটে উঠল। পরিমল অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে আছে দেখেই হঠাৎ সে বিমর্ষ হয়ে পড়ল।

পরিমল মাটির দিকে চোখ নামাল। যেন মাটির দিকে চেয়ে মানুষটিকে মনে করতে চেষ্টা করল।

'আমি গিরিজা।' গিরিজা আর চুপ করে থাকল না।

'ও।' অস্ফুট শব্দ করে পরিমল আবার চোখ তুলল। এবার তার চোখে মুখে হাসির ভাব ফুটে উঠল। 'হ্যাঁ, আমিও চিন্তা করছিলাম [illegible] ...' কাঁধে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে সামনের দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সে।

গিরিজা তৎক্ষণাৎ পরিমলের হাতটা মুঠোর মধ্যে তুলে নি[illegible] কতদিন পর আমাদের দেখা হল!' আবেগে উচ্ছ্বসিত গিরিজার গলার স্বর কেঁপে উঠল। হাসিটা সারা গালে ছড়িয়ে পড়ল। যেন এতটা সময় আর কোনো কথা [illegible]।

'তারপর? কেমন আছ?' পরিমল প্রশ্ন করল।

'তুমি কেমন আছ আগে বলো।' উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে গিরিজা [illegible] উঠল। 'বেশ একটু মোটা হয়েছ।'

'তা হয়েছি।' পরিমল মৃদু শব্দ করে হাসল। 'তুমি [illegible]।'

'না বলেছ।' বন্ধুর হাত ছেড়ে দিয়ে গিরিজা [illegible] আমি এই মাত্র তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম।'

'আচ্ছা? পরিতোষের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না। শুনলাম মিনিট পনেরো হল [illegible]— [illegible] সেই বাড়ি [illegible] সাড়ে নটা।'

'তা হবে।' পরিমল [illegible] ওদিক ঘুরেফিরে দেখছিলাম [illegible]।'

'তা করেছে।' গিরিজা চোখ বুজিয়ে [illegible]— নিউ আলিপুরকে হার মানিয়েছে।'

পরিমল হঠাৎ কথা বলল না। যেন চোখ ঘুরিয়ে [illegible] দেখছিল।

'হ্যাঁ, পরিতোষের স্ত্রীর কাছে শুনলাম', গিরিজা বলল, 'চা খেয়েই তুমি বেড়াতে বেরিয়েছ, ভাবলাম আজও তা হলে দেখা হল না লর্ডের সঙ্গে— কালও তোমাদের বাড়ি এসেছিলাম।'

'আমি শুনেছি—আজ সকালে পরিতোষ বলছিল—'

'তারপর লর্ড!' গিরিজা আবার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। পরিমলের কাঁধ ছেড়ে দিয়ে হাত চেপে ধরল। 'কত দিন পর দেখা হল আমাদের!'

'তুমি—তোমরা কী এখনো বালিগঞ্জে আছ?'

'না, হ্যাঁ, আমি নেই—মা আছে, বোনেরা আছে সেখানে, আমাদের পুরোনো বাড়িতে—আমি এদিকে চলে এসেছি। মিশন রোয়ে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আছি।'

যেন হঠাৎ এক সেকেণ্ড কী ভাবল পরিমল, তারপর গিরিজার চোখে চোখ রেখে হাসল।

'বিয়ে করেছ বুঝি?'

হো হো করে হেসে উঠল গিরিজা।

'তা তুমি মনে করতে পার, কিছু অস্বাভাবিক না, সবাইকে ছেড়ে আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে আছি যখন—' টেনে টেনে হেসে এক সময় সে থামল। 'না, আজও ঐ কাজটি আমার সারা হল না, লর্ড—সময়ই পেলাম না।'

পরিমল চুপ করে রইল।

'বাবা মারা গেছেন তুমি শুনেছ বোধ করি?'

'না। কদ্দিন?'

'হুঁ, বছর তিন হয়ে গেল।'

কথা না বলে পরিমল মাটির দিকে তাকাল।

'লর্ড, উঃ কত কথা যে তোমার জন্যে জমা করে রেখেছি, বলতে কী, এই শেষের দিকে বছর যেন আর কাটছিল না, কবে তুমি বেরিয়ে আসবে!'

'আমাকে মনে রেখেছিলে তা হলে?' পরিমলের চোখ দুটো চকচকে হয়ে উঠল। 'আমি ভাবলাম—'

'আশ্চর্য!' তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে গিরিজা একটা আক্ষেপসূচক শব্দ করল। 'পরিতোষকে জিজ্ঞেস করবে—কেন, পরিতোষ তোমাকে বলেনি? প্রায় রোজই তোমার কথা বলতাম আমি, বিশেষ করে এদিকে—শেষের এই দুটো বছর—'

চিবুক তুলে পরিমল আকাশ দেখতে লাগল। সাদা মেঘটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে তুলোর আঁশের মতন ছড়িয়ে পড়েছে। হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে। পরিমলের মাথার অবিন্যস্ত ঝাঁকড়া চুল বাতাস লেগে থরথর করে কাঁপছিল।

'বরং তুমিই আমাকে ভুলে গিয়েছিলে।' গিরিজা বলল, 'পরিতোষের কাছে মাঝে মাঝে চিঠি দিতে। প্রায় সব ক'টা চিঠিই আমি পড়তাম। কই, একটা চিঠিতেও কিন্তু তুমি আমার কথা লেখনি। গিরিজা কেমন আছে, কোথায় আছে, কী করছে এখন—যদি সামান্য দুটো-একটা কথাও আমার সম্বন্ধে থাকত—'

আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে পরিমল গিরিজার মুখটা দেখল। ভেবেছিল সে, যেমন একটা অভিমানের সুর নিয়ে কথাগুলি বলা হচ্ছে, হয়তো সেই সঙ্গে গিরিজার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠবে। তা অবশ্য পরিমল দেখল না। তা হলেও গিরিজা যে খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছে তার মুখের ক্লান্ত হাসিটাই তা বলে দিল। হেসে হেসে গিরিজা কথাগুলি বলছিল যদিও।

পরিমলের মুখেও একটা ক্লান্ত বিষণ্ণ হাসি ফুটল।

'মিথ্যা কথা বলব না গিরিজা, আমি তোমাকে—তোমাকে কেন, সবাইকে, এই পুরোনো পৃথিবীটাকেই ভুলে থাকতে চেয়েছি।'

'কেন!' কথাটা বিশ্বাস করতে চাইল না গিরিজা, সবেগে মাথা নাড়ল। 'না না, এটা একটা কথাই নয়। কেন তুমি এমন অভিমান নিয়ে বসে থাকবে। কাকে তুমি ভুলে থাকবে? যাদের ভুলে থাকতে চাইছিলে তারা তোমাকে ভুলতে পারছিল কি? একদিনের জন্য না, এক মুহূর্তের

জন্য না, আমরা সর্বদা লর্ডের কথা বলেছি—লর্ডের কথা ভেবেছি—আমরা তাকিয়ে ছিলাম কবে তুমি আবার আমাদের মধ্যে—'

'আচ্ছা ঠিক আছে'—গিরিজা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, যেন তকে সান্ত্বনা দিতে পরিমল তার পিঠে মৃদু চাপড় দিল। 'আমারই ভুল হয়েছে, আমিই ভুল ভেবেছিলাম—তাই তো, একদিন তুমি আমার প্রধান ভক্ত ছিলে, পৃথিবীর আর সবাই যদি আমায় ভুলে গিয়ে থাকে তুমি ভুলবে না, ভুলতে পারবে না, এটা আমার বোঝা উচিত ছিল। এখন কী করছ—বাবার সেই কাঠের বিজনেস?'

'আমি শুধু একলা তোমায় মনে রাখব কেন—' অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় গিরিজা বলল. 'আরো মানুষ আছে যে প্রতি মুহূর্তে তোমাকে মনে করছে, দিন গুণছে, কবে তুমি মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসবে—হ্যাঁ, কী বলছিলে, বাবার কাঠেব ব্যবসা কাকারা লুটেপুটে খাচ্ছে—আমি একটা টি-মার্ট খুলেছি, বলব, সবই একে একে বলছি তোমায়—না, এভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না, এসে কোথাও বসে একটু চা খাওয়া যাক।'

'এদিকে যেন এখনো ভালো দোকানটোকান হয়নি।' পরিমল মৃদু গলায় বলল. 'আমি এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম।'

'না, এখানে আমরা চা খাব কেন. আমরা আমাদের পুরোনো জায়গায় যাব।' গিরিজা রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। একটা ট্যাক্সি আসছিল। হাত তুলতে সেটা দাঁড়াল।

'লর্ড, এসো!' গিরিজা ডাকল।

পরিমল আপত্তি করতে পারল না।

॥ ২০ ॥

'এ আমরা কোথায় এলাম!'

'একবার ভালো করে চারদিকটা তাকিয়ে দেখ—চিনতে পারবে।' ট্যাক্সিভাড়া মেটাতে ব্যস্ত ছিল গিরিজা। ট্যাক্সি চলে যেতে পরিমলের দিকে চোখ ফেরাল। 'লর্ড চিনতে পারছ জায়গাটা এখন?'

পরিমল অস্পষ্টভাবে ঘাড় কাত করল।

'কলেজ স্ট্রীট! তাই না?'

গিরিজা মৃদু হাসল।

'ওই তো ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং. ওই তোমার প্রেসিডেন্সী কলেজ, হেয়ার স্কুল. পেছনে ওটা হিন্দু স্কুল, ওদিকে—'

'থাক, আর চেনাতে হবে না. সবই আমার মনে আছে।' কেমন একটু বিব্রত লজ্জিত দেখাল পরিমলকে।

'কেন চিনবে না, ক'দিনের কথা; খুব বেশিদিন তো হয়নি। তা ছাড়া তেমন কোনো পরিবর্তনও হয়নি এখানকার। সবই প্রায় এক রকম আছে। কেবল ওই স্কুলের বাড়িটা বড়ো হয়েছে, ওপরের দিকেও কয়েক তলা বাড়ানো হয়েছে। এদিকটায় কিছু হকার্স স্টল বসেছে—আগে ফাঁকা ছিল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে গোলদিঘির জল দেখা গেছে।'

'গোলদীঘি।' পরিমল বিড়বিড় করল, ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনটা দেখল। তারপর হঠাৎ কী মনে পড়তে গিরিজার চোখের দিকে তাকাল। 'কোণার সেই সরবতের দোকানটা আছে এখনো?'

'কেন থাকবে না।' গিরিজা সোৎসাহে ঘাড় নাড়ল। 'কবেকার দোকান, স্টিল গোয়িং স্ট্রং।'

পরিমল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

গিরিজা গলার নিচে হাসল।

সেই কোল্ড্ ড্রিঙ্ক্, সেই আধো-অন্ধকার দোকান, মাথার ওপর দুরন্ত ঘূর্ণায়মান শব্দায়মান পাখা—সবই আছে, কিছুই বদলায়নি, তবে কিনা রুচির পরিবর্তন ঘটেছে।'

'কী রকম?' পরিমল না হেসে পারল না।

'এসো, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাক।' গিরিজা হাত বাড়িয়ে দিল। পরিমল তার হাত ধরল। দুজনে মন্থরগতিতে ফুটপাথ ধরে অগ্রসর হল। গিরিজা বলল, 'এখন যে আর ছেলেরা ম্যাংগো খাচ্ছে না, পাইন্‌অ্যাপেল্ পছন্দ করছে না, তুমি নিশ্চয় সে খবর রাখ না, লর্ড।'

'কেন!' পরিমল আবার হাসল।

'ওল্ড্ অর্ডার চেঞ্জেথ্ ইল্ডিং প্লেস টু নিউ—কেন, এ প্রশ্নের উত্তর নেই। কালের গতি তুমি রুখবে কী করে।' গিরিজার গলার স্বর ঈষৎ গম্ভীর শোনাল। 'আম আনারস এখানকার ছেলেদের কাছে সেকেলে হয়ে গেছে। গেলাসে খড় ডুবিয়ে চোঁ চোঁ করে তারা অরেঞ্জ স্কোয়াশ্ গিলছে।'

'আচ্ছা!' গিরিজার কথা বলার ধরন দেখে পরিমল কৌতুক বোধ করল। 'তা হলে বলতে হবে তাদের রুচিবিকার ঘটেছে।'

'শোন শোন, আমায় শেষ করতে দাও—ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে।'

'কী রকম!'

'অরেঞ্জ-স্কোয়াশ্ তাদের মন ভোলাতে পারছে না। তারা সোজা চলে এসেছে আইসক্রিমে।'

'চমৎকার!' গিরিজার হাতে মৃদু চাপ দিল পরিমল। 'তার মানে ওরা আরো বেশি ঠান্ডা খেয়ে দেহমন জুড়োতে চাইছে।'

'উঁহু, দেহমন জুড়োবার কথা বললে লর্ড!' গিরিজা রীতিমতো দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন সে আহত হয়েছে এমন একটা চেহারা করে পরিমলের চোখ দুটো দেখল এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিমলের মুঠ থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিল। 'শোন তা হলে, এ পর্যন্ত যা বললাম সব বাসি খবর, আজকের খবর এখনো তোমার শোনা হয়নি।'

'বল, বলতে বাধা আছে কিছু?'

'কিছু না, বলব বলেই তো তোমায় ধরে নিয়ে এলাম লর্ড। কত কথা তোমার জন্য জমিয়ে রেখেছি।—'

গিরিজা আবার হাঁটতে আরম্ভ করল। চুপ করে পরিমলও হাঁটতে লাগল। নীল হাফ্-প্যান্ট, সাদা শার্ট পরা কচিমুখ একঝাঁক শিশু পিল পিল করে রাস্তায় নেমে এসেছে। পিঠে

বইয়ের ব্যাগ। বোঝা গেল সকালে তাদের স্কুল বসেছিল। এখন ছুটি হল। কিন্তু দুধের শিশুরা ট্রাম-বাস ধরতে কেমন বীরের মতন এগিয়ে যাচ্ছে দেখে পরিমলের চোখ গোল হয়ে গেল। ট্রাম-বাস ধরা দূরে থাক, ওই বয়সে পরিমলদের বুঝি রাস্তায় বেরোতে দেওয়া হত না। দিনকাল বদলে গেছে। অনেক কিছু পরিবর্তন পরিমলের চোখে পড়ছিল। ছেলেরা কলেজে যাচ্ছে, মেয়েরা কলেজে যাচ্ছে। তাদের হাঁটা, বেশভূষা অন্য রকম। পরিমলের চোখে সব নূতন ঠেকছিল। না, পরিমল মনে করতে পারল না, তাদের সময় এত মেয়ে কলেজে পড়ত? আঙুলে গোনা গেছে সেদিন।

গিরিজা বলল, 'আজ সরবতের দোকানে ভিড় নেই। সরবতের ব্যবসার ঘোর দুর্দিন আরম্ভ হয়েছে।'

'কেন?' পরিমল নূতন করে গিরিজার কথা শুনতে তার দিকে চোখ ফেরাল।

'আজ আর ছেলেরা অরেঞ্জ-স্কোয়াশ্ খাচ্ছে না—আইসক্রিম মেয়েদের তুষ্ট রাখতে পারছে না। ঠাণ্ডা জিনিসটাই কেউ পছন্দ করছে না।'

'ভারী মজা তো!' পরিমল চোখ বড়ো করল। 'তবে তারা এখন কী খাচ্ছে!'

'চা কফি—চায়ের চেয়েও বেশি কফি। পেয়ালা পেয়ালা উত্তপ্ত ধূমায়মান কফি খেয়ে তারা দেহমন জুড়োচ্ছে।'

'তবে তো তারা অতি আধুনিক স্বীকার করতেই হবে।' পরিমল আবার শব্দ করে হাসল।

'তাই', গিরিজা হাসল না। বরং হাসির কথা বলার সময় সে অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে থাকছে। যেন সেই জন্যই পরিমল আরো বেশি কৌতুক বোধ করছিল। 'বুঝলে লর্ড—' মুখ ভার করে গিরিজা বলল, 'আধুনিকতার ঝাঁঝ বেশি—সারাক্ষণ তারা উত্তাপ চাইছে, প্রখরতা চাইছে, উগ্রতা চাইছে।'

'তুমি সব খবর রাখছ—মনে হয় আজও সব মহলে তোমার আনাগোনা আছে।' পরিমল না বলে পারল না।

এবার গিরিজা হাসল।

'তাই, এটা আমার দোষও বলতে পার, গুণও বলতে পার। আমি এক জায়গায় থেমে থাকিনি। এতকাল পর পরিতোষকে তো দেখলে। কেমন বুড়িয়ে গেছে না? আগের সেই তরতরে ঝরঝরে মানুষ নেই। যেন চাপ চাপ শ্যাওলা জমেছে তার মনের ওপর।'

'সংসারী মানুষ, সারাক্ষণ কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত—' পরিমল বিড়বিড় করে বলল।

'হলই বা সংসারী, থাকুক না কাজকর্ম—তাই বলে এই বয়সে এমন জেঠামশাই হয়ে যাওয়া। আমি তো তার সঙ্গে কথা বলে একটুও সুখ পাই না—' বলতে বলতে গিরিজা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

'লর্ড, আমরা এসে গেছি।'

'কোথায়।' পরিমল থমকে দাঁড়াল।

'ভালো করে তাকিয়ে দেখ, চিনতে পারবে—তোমার পরিচিত জায়গা।'

চোখ তুলে ওপরের দিকে তাকিয়ে পরিমল কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল।

'চিনতে পারছ না লর্ড!' পরিমলের কাঁধে একটা হাত তুলে দিল গিরিজা। 'সেই পুরোনো

বাড়ি—আমাদের বিখ্যাত কফিখানা, পৃথিবীর যাবতীয় জিনিসের পরিবর্তন ঘটেছে, আকৃতি বদলেছে, প্রকৃতি বদলেছে; কিন্তু আমাদের কলেজপাড়ার কফি হাউসটি অবিকৃত অকৃত্রিম থেকে গেছে। ধূসর গম্ভীর চেহারা নিয়ে আজও আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।'

কিন্তু এখন গিরিজার রসিকতায় পরিমল যেন তেমন সাড়া দিতে পারল না। মুখটা অস্বস্তিতে ফিরিয়ে নিল।

'কী হল, লর্ড।' গিরিজা কি মুখ টিপে হাসছিল, পরিমলকে পরীক্ষা করছিল? নাকি তার প্রকৃতিই এই। আজও সে সতেজ প্রফুল্ল, বয়সের ছাপ পড়তে দেয়নি, অভিজ্ঞতার দাগ পড়ল না—সেদিনের মতন মনে-প্রাণে তরুণ থেকে গেছে। একটু বিব্রত হয়ে পড়ল পরিমল। কাতর চোখে ভক্তটিকে দেখল।

'এসো,' গিরিজা তার হাত ধরল। 'কত কাল পর তোমার সঙ্গে এখানে এলাম, একটা যুগ পার হয়ে গেছে, আমরা একসঙ্গে বসে কফি খাই না।'

'কেন, ছোটোখাটো একটা দোকানে ঢুকলে হয় না—একটু চা খেয়ে বেরিয়ে আসব।' পরিমল প্রস্তাব করল।

'উঁহু,' ছোটো শিশুর মতন গিরিজা বায়না ধরল। 'কেন আমরা ছোটোখাটো দোকানে ঢুকে চা খাব—এখানে বসে কফি খাব. এখানকার স্মৃতি কি আমরা ভুলতে পারি!'

'হয়তো ভেতরে গিয়ে দেখব ছেলে-ছোকরার দল আসর গরম করে রেখেছে—ওখানে আমাদের অসুবিধা হবে।'

'কিচ্ছু না কিচ্ছু না'— গিরিজা আবেগে মাথা নাড়ল। 'একটুও অসুবিধা হবে না আমাদের, সে কথাই তোমাকে একটু আগে বলতে চেয়েছিলাম, এযুগের ছেলেমেয়েরা ম্যাংগো খাচ্ছে না, অরেঞ্জ-স্কোয়াশ্ খাচ্ছে না, আইস্‌ক্রিম দেখলে ঠোঁট বেঁকাচ্ছে, তারা শুধু গরম কফির ভক্ত, তাদের মন-মেজাজ উত্তপ্ত প্রখর—ঠাণ্ডা জিনিসের ধারেকাছেও ঘেঁষছে না—তেমনি তাদের চলায় বলায় বেশভূষায় আধুনিতার উগ্র ঝাঁঝ—কিন্তু লর্ড, এই অতি-আধুনিকতার পথ দেখিয়েছিল কে, পাইওনীয়ার কে শুনি?' পরিমলের বুকের ওপর আঙুলের টোকা মারল গিরিজা। 'এই মানুষটি, আমাদের লর্ড—আর পাশে ছিলাম আমরা ক'টি ভক্ত, শিষ্য, আমি চিত্ত নবারুণ সন্দীপ মোহন অমরেশ—'

'থাক, এখন আর এ-সব বলে কী হবে, এখন আর কেই-বা আছে।' পরিমল হাসল।

গিরিজা লক্ষ্য করল না পরিমলের হাসির মধ্যে ক্লান্তি ছিল বিষণ্ণতা ছিল। বরং আর একটু উত্তেজিত হয়ে সে বলতে লাগল, 'না লর্ড, নেই—সব হারিয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে—থাকবার মধ্যে আছে এই শর্মা—' নিজের বুকের ওপর হাত রাখল গিরিজা. তারপর পরিমলের কাঁধ ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিল। 'আর আছে আমার লর্ড—দি গ্রেট পরিমল—আমি মনে করি না সে বুড়িয়ে গেছে, তার মনে এতটুকু শ্যাওলা জমেছে—সে চিরজাগ্রত, চির নূতন।'

'আরে না না।' পরিমল সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল, অন্য দিকে চোখ ফেরাল। 'তুমি খামকা আমায় দলে টানছ গিরিজা, আমার সেই তারুণ্য আর নেই, আমি অন্য মানুষ হয়ে গেছি।'

'তা বললে কেউ বিশ্বাস করে কখনো! অন্তত আমি করি না, কেননা, আমি লর্ডকে যত চিনেছিলাম, এমন আর কে চিনেছিল—হুঁ, তার তারুণ্য চাপা পড়তে পারে, দীপ্তি সাময়িক ঢাকা থাকতে পারে—একটু হাওয়া লাগলে আবার উত্তাল হয়ে উঠবে, উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, এসো।' যেন জোর করে পরিমলের হাত টেনে ধরে গিরিজা দোতলার সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে সে বকে যাচ্ছিল। 'আধুনিক আধুনিকারা আসর জমিয়েছে—কিন্তু কতটা আধুনিক হতে পেরেছে তারা শুনি? তাদের ওপরটা আধুনিক, বাইরেটা আল্ট্রা মডার্ন—রং বেশি ঝাঁঝ বেশি অস্বীকার করব না—কিন্তু অন্তর—হৃদয়ের দিকে থেকে? না, সেখানে তারা আজও শিশু—নাবালক নাবালিকা। তারাও ভালোবাসে, হৃদয়বৃত্তির চর্চা করে, মন দেওয়া নেওয়া করে শুনি, কিন্তু সেই ভালোবাসার ধার কতটুকু, গভীরতা কতটুকু, ব্যাপ্তি কতখানি! হুঁ, যেটুকু করছে ফ্যাশানের খাতিরে করছে—তারা সবাই ফ্যাশানের পূজারী ফ্যাশানের পূজারিণী, পরিমলের মধ্যে, আমাদের লর্ডের মধ্যে যে প্রবল প্যাশন ছিল, তোমরা এ যুগের ছেলেমেয়েরা তা কল্পনাও করতে পার না। কেবল কফি খাওয়া না, সব দিক দিয়ে, বারো বছর আগে একটি তরুণ কী ভয়ংকর আধুনিক ছিল, যদি জানতে চাও, তবে এই মানুষটির কাছে এসো—আমাদের লর্ডের দিকে একবার চোখ তুলে তাকাও। কী, মিথ্যা বললাম?'

পরিমল কথা বলল না।

এবং গিরিজাও এদিকে ঘাড় ফেরাল না। তার মুঠোর মধ্যে পরিমলের হাত। আগে আগে চলছিল সে। পরিমল পিছনে হাঁটছিল। যেন পরিমলকে শেষ পর্যন্ত এখানে নিয়ে আসতে পারল বলে তার উত্তেজনার উৎসাহের শেষ ছিল না। যেন রাজ্য জয় করে ফিরছে সে। মাথা উঁচু করে বুক টান করে বীরদর্পে, লম্বা পা ফেলে গিরিজা এগিয়ে যাচ্ছিল। যদি একবার পিছনে ফিরে তাকাত তো দেখত, আর-একটি মানুষ কেমন স্থির সংযত হয়ে আছে।

তাই। প্রথমটায় পরিমল অসহায় বোধ করছিল, ক্লান্তিবোধ করছিল।

গিরিজাকে সে বাধা দিতে পারছিল না।

একবার তার ইচ্ছা করল হাত দিয়ে গিরিজার মুখ চেপে ধরে, একবার ভাবল জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে এখান থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। কিন্তু পরমুহূর্তে সে শান্ত সংযত হয়ে গেল।

তারপর গিরিজা যত কথা বলছিল তার অর্ধেকই পরিমলের অশ্রুত থেকে গেল। আস্তে না, চেঁচিয়ে কথা বলছিল গিরিজা। কিন্তু তা হলেও সব কথায় পরিমল কান দিতে পারল না। সে গভীরভাবে অন্য কিছু চিন্তা করল। নূতন করে নিজেকে উপলব্ধি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল তার। আমি কে, কোথায় ছিলাম এতদিন, আবার এক এক করে পুরোনো মানুষগুলি যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে তখন আমাকে কী করতে হবে বলতে হবে—এবং আমার এই পরীক্ষা তো বাড়ি আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়েছে। বাবাকে দেখলাম, ভাইদের দেখলাম, পরিতোষের স্ত্রীকে—তাদের শিশুটিকে দেখলাম। বাড়ির চাকর-দারোয়ানের সামনেও আমাকে দাঁড়াতে হচ্ছে। স্বতন্ত্র এক-একটি মানুষ। একটি চেহারার সঙ্গে আর-একটি

চেহারার মিল নেই। প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তাভাবনা স্বতন্ত্র। এক রমলা ছাড়া সকলের সঙ্গে আমার দরকার মতো কথা বলতে হচ্ছে, তাদের চোখের দিকে তাকাতে হচ্ছে—সবই তো পরীক্ষা। সে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য যদি আমি প্রস্তুত হয়ে থাকি তো এই প্রগল্ভ উত্তেজিত পুরোনো বন্ধুটির কাছে আমি হেরে যাব কেন? জোর করে গিরিজাকে থামিয়ে দেওয়া বা তার মুঠ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এখান থেকে সরে পড়ার মধ্যে যে অসংযম অসিহষ্ণুতা অস্থিরতার পরিচয় থেকে যায় আমি তার প্রশ্রয় দেব না। জগমোহনের ক্ষুব্ধ বিরক্ত দৃষ্টির সামনে আমি স্থির শান্ত থাকতে পারছি, পরিতোষের ঔদাসীন্য অথবা নীরব উপেক্ষা আমাকে বিব্রত ক্লান্ত অস্থির করতে পারছে না; এখানে না হয় এই পুরোনো বন্ধুটি আমাকে পেয়ে অতিমাত্রায় চঞ্চল অস্থির উল্লসিত হয়ে উঠেছে—তার এই উল্লাস চাপল্যও আমাকে সহ্য করতে হবে।

গিরিজা আঘাত পেতে পারে এমন কোনো ব্যবহার করবে না স্থির করে পরিমল নীরবে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল।

একটি শিশুকে সন্তুষ্ট করতে সকালে গাছে উঠে সে চাঁপাফুল পেড়ে দিয়েছিল।

যেন আবার একটি বয়স্ক শিশুর আবদার রাখতে পরিমল কত বছর পর কফি-হাউসে ঢুকে কফি খেতে যাচ্ছে। বাড়ি থেকে যখন বেরোয় তখন সে কল্পনা করতে পারেনি তাকে এখানে আসতে হবে। মনে মনে সে হাসল। ক্লান্তি ও হতাশার ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পেরে তার আনন্দ হল।

তবে তার ভয় হচ্ছিল, ভিতরে ঢুকে একগাদা ছেলেমেয়ের সামনে না গিরিজা আবার চেঁচাতে আরম্ভ করে দেয়—এই আমাদের লর্ড। তোমরা এঁকে চিনে রাখ। চিরজাগ্রত চিরনবীন পুরুষ। আজ থেকে বারো বছর আগে—তোমরা যখন নিতান্তই শিশু অবোধ ছিলে তখনই এই মানুষ চূড়ান্ত আধুনিকতার পরিচয় দিয়ে গেছে।

বস্তুত উল্লাসের আতিশয্যে গিরিজা যদি এ ধরনের বক্তৃতা শুরু করে দেয় তখন অবস্থা কী দাঁড়াবে চিন্তা করে পরিমল অস্বস্তি বোধ করল। তখন সেখান থেকে, গিরিজা মনে মনে যতই আঘাত পাক, পালিয়ে আসা ছাড়া পরিমলের আর কোনো পথ থাকবে না। নয়তো মাথা হেঁট করে চোখ কান বন্ধ রেখে তাকে পাথর হয়ে বসে থাকতে হবে। কারণ পরিমল এটা বিশ্বাস করে, আজ যখন তার বয়স ত্রিশ পূরতে চলল, গিরিজারও আটাশ-উনত্রিশের কম হবে না, সেখানে আঠারো-উনিশ কী কুড়ি-বাইশ বছরের যুবক-যুবতীদের সামনে গিরিজা যখন তার লর্ডকে নিয়ে গর্ব করবে, অতীতে লর্ড কী পরিমাণ আধুনিক ছিল তার ফিরিস্তি গাইতে আরম্ভ করবে তখন প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে মুখ টিপে হাসবে, বিগত-যৌবন দুটি বন্ধুর দিকে অনুকম্পার দৃষ্টি নিয়ে তাকাবে।

দৃশ্যটা কল্পনা করে পরিমল রীতিমতো ঘামতে আরম্ভ করল।

কিন্তু ভিতরটা ফাঁকা। পরিমল স্বস্তিবোধ করল। এত বড়ো হলের সর্বত্র শূন্য। টেবিল-চেয়ারগুলি কঙ্কালের মতন দাঁড়িয়ে আছে। পাখাগুলি স্থির। কেবল কোণার দিকে যেন একটি পাখা ঘুরছে। ক্ষীণ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। একটি কী দুটি মানুষ সেখানে

চুপ করে বসে আছে। যেন খবরের কাগজ পড়ছে। কেমন নিঃসঙ্গ অসহায় মনে হচ্ছিল ওই দুটি মানুষকে।

'মাই গড্—একেবারে মরুভূমি!' গিরিজার গলায় আক্ষেপের সুর শোনা গেল। পরিমল হাসল।

'তাই তো হবে, বেলা দশটা, অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজের সময়—এখন এখানে কফি খেতে আর কে আসে—নিতান্তই যাদের কাজকর্ম নেই, হাতে অঢেল সময়—'

'কিন্তু আমাদের সময় এখন থেকেই ভিড় লেগে যেত। গমগম করত হলটা।' ক্ষুব্ধ হতাশ চোখে গিরিজা চারদিকটা একবার দেখল, তারপর মুখ বেঁকিয়ে পরিমলের দিকে তাকাল। 'তার মানে সব পান্‌সে মেরে গেছে—রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, বললাম তো, এদের সবটাই লোক-দেখানো—ওপর ওপর—বিকেলের দিকে দল বেঁধে এখানে এসে এক-আধ পেয়ালা নিয়ে বসবে, একটু গল্পগুজব হৈ-চৈ করবে, তারপর সন্ধ্যাবাতি লাগবার সঙ্গে সঙ্গে গুটিগুটি বাড়ি ফিরে যাবে—অন্তত একটিবার কফি-হাউসে না এলে ফ্যাশান বজায় থাকে না, তাই একবার ঢুঁ মেরে যায়। আর আমাদের সময়? কলেজ অর নো-কলেজ, ছুটি থাক না-থাক, বেলা দশটা বাজুক কী বারোটা—আমরা মাছির মতন এখানে ছুটে এসেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে গল্প করেছি—কত স্বপ্ন দেখেছি—আবার কত স্বপ্নের জাল এই টেবিলে বসেই আমরা কঠিন হাতে ছিঁড়ে দিয়েছি। এ যুগের ছেলেমেয়েরা স্বপ্ন দেখতে জানে? আমি বিশ্বাস করি না, লর্ড। তাই বলছিলাম, কত রোমান্টিক জীবন ছিল আমাদের, মেজাজের দিক থেকে কী ভয়ঙ্কর বোহিমিয়ান ছিলাম আমরা। এখনকার ওরা অতিমাত্রায় প্র্যাকটিক্যাল টিপটাপ এবং এদের সব কিছু শো- প্রেম বল, স্বপ্ন দেখা বল, আড্ডা, বন্ধুপ্রীতি—ভান ছাড়া কিছু নয়, আন্তরিকতা বলে কিছু নেই—অন্তরের দিক থেকে এরা দেউলিয়া, ফাঁকা, শূন্য, নীরক্ত, বিবর্ণ—'

'থাম থাম।' পরিমল ফিসফিস করে বলল, 'কোণার ওই ভদ্রলোক দুটি তোমার কথা শুনতে পাবে।'

গিরিজা চেঁচিয়ে কথা বলছিল।

'আমি তো শোনাতেই এসেছিলাম, লর্ড—আশা করেছিলাম এর মধ্যেই আসর জমে উঠেছে—তোমায় নিয়ে এখানে ঢুকে সবাইকে চমকে দেব—তারা তাকিয়ে দেখত আমাদের লর্ডকে, আমাদের রাজাকে—একদিন যে আমাদের মধুচক্রের মধ্যমণি ছিল—'

'এসো, এ দিকটায় কেউ নেই, এই টেবিলটায় বসা যাক—' গিরিজা চুপ করছে না দেখে পরিমল অসিহষ্ণু হয়ে উঠল, বন্ধুকে বাধা দিতে চেষ্টা করল।

'উঁহু, এখানে বসবে কেন, আমরা ওখানে যাব—ওই জানলার ধারে।' গিরিজা আঙুল দিয়ে দক্ষিণের একটা জানালা দেখাল। 'তোমার ফেভারিট নুক্—মনে নেই লর্ড, ওই সুন্দর জায়গাটি ছাড়া আর কোথাও আমাদের নিয়ে বসে তুমি তৃপ্তি পেতে না।?'

পরিমল কথা বলল না।

'এসো।' গিরিজা তার হাত ধরে জানালার দিকে এগিয়ে গেল।

'আমি বেশিক্ষণ বসব না।'

'আচ্ছা, আগে তো দুটো কফি বলা যাক। হুঁ, এই চেয়ারটায় বসো—জানালার দিকে মুখ করে চিরকাল তুমি এই চেয়ারে বসে গেছ—আমি এখানে বসব।'

'আচ্ছা তাই হবে।' মৃদু হেসে পরিমল বসল। গিরিজা বসল।

'এখনো সেই গাছটা আছে, দেখতে পাচ্ছ, লর্ড?'

পরিমল রাস্তার ওপারের সুন্দর গাছটা দেখে খুশি হল।

'কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে তুমি মাঝে মাঝে ওদিকে তাকিয়ে থাকতে, তখন তোমার চোখ দুটো কেমন ড্রীমি—স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে উঠত, তুমি জানালা দেখতে, আর আমরা সবাই তখন—আমি নবারুণ চিত্ত সন্দীপ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতাম—মনে আছে লর্ড—তোমার সেদিনের স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ দুটো আমাদের প্রেরণা দিত, আমরা কেমন অভিভূত হয়ে পড়তাম।'

'তাই নাকি, আমার সব মনে পড়ছে না।' পরিমল গিরিজার মুখের দিকে তাকাল।

'হুঁ, তোমার পাশের চেয়ারটায় নবারুণ বসত—এখন ওয়েস্ট বার্লিন আছে—বড়ো ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে শুনেছি।'

'আচ্ছা!' চোখ বড়ো করে তাকাল পরিমল।

'হুঁ, এখানটায় বসত চিত্ত—'

'হ্যাঁ, চিত্ত—কোথায় আছে এখন?'

'পাঞ্জাবি মেয়ে বিয়ে করেছে—লাডাক আছ, মিলিটারি চাকরি—' আঙুল দিয়ে গিরিজা আর একটা চেয়ার দেখাল, 'আর ওটা ছিল সন্দীপের আসন, সন্দীপকে মনে পড়ছে লর্ড? চমৎকার গীটার বাজাত?'

অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়ল পরিমল।

'কোথায় আছে এখন, কী করছে?'

'মারা গেছে—ভীষণ ড্রিঙ্ক করতে আরম্ভ করেছিল এদিকে, ওতেই—'

'স্যাড', অস্ফুট শব্দ করল পরিমল।

কিন্তু গিরিজা তেমন কিছু কাতরতা প্রকাশ করল না। বরং চোখ মুখ একটু বেশি উজ্জ্বল করে ফেলল ও সঙ্গে সঙ্গে আঙুলটা আর এক দিকে ঘুরিয়ে ধরল।

'আর ওটা, ওই চেয়ারে কে বসত আশা করি তোমায় মনে করিয়ে দিতে হবে না—এখানে এসে সকলের আগে নিশ্চয় তোমার ওই মুখটি মনে পড়েছে— তাই না লর্ড!'

পরিমল অপ্রস্তুত হল, ঢোক গিলল।

'তোমার কফি কোথায়, বয়কে ডাকো।' পরিমল আর একবার যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

গিরিজা ঠোঁট টিপে হাসছিল।

'আসছে, আমি আঙুলের ইশারা করেছি।' গিরিজা একটু ঝুঁকে বসল। 'লর্ড, বিশাখাকে কি তুমি একবারও মনে করতে চাইছ না।'

পরিমলের মুখটা কালো হয়ে গেল, শক্ত হয়ে গেল। তারপর দুহাতে সে মুখ ঢাকল।

'লর্ড! লর্ড!' গিরিজার গলার স্বরে এবার কাতরতা ফুটল। 'শোন, আমার দিকে তাকাও।'

॥ ২১ ॥

কান্নার গল্প। একটি বিষণ্ণ কাহিনী।

স্থির নিবিষ্টচিত্ত হয়ে পরিমল শুনল।

গিরিজা চুপ করল। পরিমল একটা কথাও বলল না।

'আর-একটা কফি খাবে?' গিরিজা প্রশ্ন করল। পরিমল মাথা নাড়ল। তার আগের পেয়ালায় কফি পড়ে আছে। অর্ধেকটা খাওয়া হয়েছে। বাকিটা ঠাণ্ডা হয়ে কেমন কালচে রং ধরেছে। পরিমল নিস্পৃহ চোখে জিনিসটা একবার দেখল। গিরিজাও এখন লক্ষ্য করল। তার কথা শুনতে শুনতে পরিমল ওটা খেতে ভুলে গেছে।

'আর-একটা গরম কফি বলি?' গিরিজা দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল।

'আমার আর দরকার নেই। যেটুকু খেয়েছি তাতেই বেশ নেশা হয়েছে। তোমার ইচ্ছা হলে আর-একটা খাও।'

'না, না, আমিও খুব একটা কফিখোর নই। আজকাল ঐ একবার বসে এক পেয়ালাই যথেষ্ট।' গিরিজা হাসল। পরিমলের 'নেশা' কথাটা উপভোগ করল সে।

পরিমল বলল—'তা ছাড়া বাড়ি থেকে চা খেয়ে বেরিয়েছি।'

'হ্যাঁ, পরিতোষের স্ত্রী তাই বলল।' এক সেকেণ্ড চুপ থেকে গিরিজা বলল, 'জেলখানায় চা-কফির ব্যবস্থা আছে?'

'কফি দেয় না। চা পাওয়া যায়। তবে সকলের জন্য না।'

পরিমল চা পেত কি না, গিরিজা প্রশ্ন করল না।

আবার দুজন গম্ভীর নীরব হয়ে গেল। আবহাওয়াটা হালকা করতে চা-কফির প্রসঙ্গটা যে খুব সাহায্য করল না দুজনই তা উপলব্ধি করল। কিন্তু এই ব্যাপারে তাদের যেন কিছু করবার নেই। পরিমল চুপ করে থেকে জানালা দিয়ে বাইরে দেখতে লাগল।

গিরিজা হাতের ইশারায় বয়কে ডাকল। 'জল।'

'আমিও জল খাব।' পরিমল এদিকে তাকাল।

বয় জল নিয়ে এল। জল খেয়ে পরিমল স্বস্তিবোধ করল। ছোটো একটা ঢেঁকুর তুলল।

'এই বেলা উঠবে?' গিরিজার দিকে তাকাল সে।

'হ্যাঁ, উঠব, কিন্তু—'

গিরিজা ইতস্তত করছে। পরিমলের কাছ থেকে কোনোরকম আশ্বাস পাচ্ছে না। সে কি সেখানে যাবে? হ্যাঁ-না কিছুই তো বলছে না। সব শুনেও কেমন নিরাসক্ত উদাসীন হয়ে আছে। গিরিজা কি আশা করছিল না, পরিমল অতিমাত্রায় ব্যস্ত, চঞ্চল হয়ে উঠবে, বিস্মিত হবে, অভিভূত হবে? কিন্তু সে-সব কোনো লক্ষণই মানুষটার মধ্যে দেখতে পেল না। গিরিজা বলে গেল, সে শুনল। ব্যস্ এই পর্যন্ত। পরিমলের ব্যবহারে গিরিজা বিস্মিত হল। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে সে আবার বলল, 'ডাফ্ স্ট্রীট। তোমাদের ওখান থেকে খুব বেশি দূর হবে না।'

'না, তা হবে না।' পিঠ টান করে পরিমল সোজা হয়ে বসল। 'শোন গিরিজা, এখনি, আজই সেখানে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। আমাকে একটু চিন্তা করতে হবে।'

'তা হলে কাল যাও।'

ব্যগ্র প্রখর দৃষ্টি মেলে সে পরিমলকে দেখল। 'লর্ড, আমি অবশ্য ওদিকে আর যাইনি, যেতে ইচ্ছাও করে না। কেমন যেন ভয় হয় সেখানে যেতে। অত্যন্ত করুণ—প্যাথেটিক একটা ছবির সামনে দাঁড়াতে হয়। আপনা থেকে একটা মেলান্‌কলি এসে পড়ে। মনে হয় তখন, গোটা পৃথিবীর চেহারাই বুঝি এই। আশা নেই, উৎসাহ নেই, আলো, আনন্দ, সুন্দর কোনও ফুল, পাখি সব লুপ্ত হয়ে গেছে, এই যে তুমি জানালা দিয়ে বার বার নীল ঝকঝকে আকাশটা দেখছ, সোনাঝরা রৌদ্র দেখছ, সেখানে একটু সময় থাকলে তোমার মনে হবে এই জগতে এ-সব জিনিস কোনোদিন ছিল না, কোনদিন থাকবে না। এগুলো সত্য না। মানুষের কল্পনা শুধু। তখন তোমার মনে হবে, কেবল বিষাদ ক্লান্তি নৈরাশ্য ব্যর্থতা নিয়ে এই জগতটা তৈরি হয়েছে। এগুলোই একমাত্র সত্য। মাথা ঝিমঝিম করে। ভয়ংকর ডিজেক্টেড হয়ে পড়েছিলাম। একদিনই গিয়েছিলাম রিণার সঙ্গে। তারপর আর যাইনি। ইচ্ছা করে যাইনি। তা হলেও সব সময় খোঁজখবর নিয়েছি। রীণার সঙ্গে দেখা হলেই তার দিদির কথা জিজ্ঞেস করে সব খুঁটিয়ে জেনে নিতাম। অবশ্য রীণাই গরজ করে সব সময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। ক'দিন পর পর এসে জেনে গেছে, তোমার রিলিজ অর্ডারের খবর এসেছে কি না। এদিকে, এই দু মাস ধরে নাকি পাগলামিটা বেড়ে গেছে। জামা কাপড় ছিঁড়ছে। এটা-ওটা ভাঙছে। কথায় কথায় হাসছে, কাঁদছে। যখন একা থাকে, তখন এ-সব বেশি করে। কেউ সামনে থাকলে খুব ঠাণ্ডা থাকে। তখন সে অত্যন্ত শান্ত ভদ্র মার্জিত। বাইরের মানুষের বুঝবার উপায় নেই বিশাখার মাথার গোলমাল হয়েছে। অবশ্য রীণা বলে, বছর দুই ধরে তার দিদির মাথার গোলমাল। ইদানীং বেড়ে গেছে। জিনিসটা বোঝা যায়। আগে ততটা বোঝা যেত না। রীণাও ঠিক ধরতে পারেনি। এখন ধরতে পারছে। বাইরের মানুষের আজও বুঝতে কষ্ট হবে। দু মাস আগেও সে স্কুলে গেছে, সময়মত সব ক'টা ক্লাস নিয়েছে। তার পড়ানোর পদ্ধতি নাকি খুব সুন্দর। হেড মিস্ট্রেস খুব প্রশংসা করেন। যদিও নীচের ক্লাসের ছোটো মেয়েদের পড়ায়। ছোটো মেয়েদের পড়ানোই নাকি খুব শক্ত। কিন্তু এই কাজে বিশাখার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। হেড মিস্ট্রেস তার পরিচয় পেয়েছেন। সে যাই হোক, রীণা যা বলছে, দু বছর ধরে তার মাথার গোলমাল, কারণে অকারণে হাসে, কাঁদে, তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, কিন্তু আমার কী মনে হয় লর্ড জান। আমার তো মনে হয়, যেদিন থেকে তুমি পুলিস কাস্টডিতে চলে গেলে, তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, গল্প করা বন্ধ হয়ে গেল, সেদিন থেকে তার মাথার গোলমালের সৃষ্টি। ফ্রম্ দ্যাট্ ভেরি ডে। আমার এখন তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে, বিশেষ এদিকের সব ব্যাপার দেখেশুনে। আগে মনে করতাম, নীলাদ্রি চ্যাটার্জী গরজ করে, ইচ্ছা করে, টেণ্ডার এজে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। গোঁড়া রক্ষণশীল মানুষ। মেয়েদের খুব একটা হায়ার এডুকেশন দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। হয়তো ভালো পাত্রের সন্ধানও তখন পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিশাখা তো রুখে দাঁড়াতে পারত। বাপ-মার অবাধ্য হতে পারত। না, এখন ভাবছি, তোমার ঐ অবস্থা দেখে সে ভয়ানক শক্ পেয়েছিল, স্বপ্নেও যা কোনোদিন ভাবেনি—অনির্দিষ্টকালের জন্য, হয়তো চিরকালের জন্য, তোমার সঙ্গে তার সেপারেশন হয়ে গেল। কেননা, খুনের মামলার আসামী তুমি। তোমার ডেথ্ পানিশমেণ্ট হবার সম্ভাবনাই বেশি। তখন নিজেকে সান্ত্বনা দেবার মতন কিছু খুঁজে

পাচ্ছিল না সে। হতাশায় ভেঙে পড়েছিল। এক দিকে তীব্র প্রেম, আর এক দিকে আকস্মিক বিচ্ছেদ। সব কিছু ভুলে থাকতে চাইল সে, একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইল—সুযোগ এসে গেল, বিয়ে, বিশাখা রাজি হয়ে গেল। জোর করে তোমাকে ভুলে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতি তার কাজ করে যাচ্ছিল। প্রকৃতিকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না। প্রকৃতি প্রতিশোধ তুলল। তাদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। বিশাখার জন্যই হয়নি। রীণা আমাকে বলেছে। অধ্যাপক অত্যন্ত শান্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু বিশাখা একদিনের জন্যও ভদ্রলোককে সুখ দেয়নি, শান্তিতে থাকতে দেয়নি। অনবরত ঝগড়া করেছে, অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিস নিয়েও খিটিমিটি করেছে, স্বামীর প্রতি তার দুর্ব্যবহারের সীমা ছিল না—এমন কী উত্তেজিত হয়ে সময় সময় স্বামীকে শারীরিক আঘাত করতেও বিশাখা দ্বিধা করত না। বিয়ের ঠিক তিন বছর পর তাদের ডিভোর্স হয়। ভাগ্যিস তাদের কোনো ইসু ছিল না। কিন্তু নীলাদ্রি চ্যাটার্জী মেয়ের এই ঔদ্ধত্য অসংযম ক্ষমা করতে পারলেন না। রক্ষণশীল মানুষ। তা ছাড়া, আমার মনে হয়, তোমাদের লভ অ্যাফেয়ার্সটা তাঁর কানে উঠেছিল। হয়তো ছোটো মেয়ে রীণার মুখেই শুনেছিলেন। বা মেয়ের বিয়ের আগেই জিনিসটা তিনি জেনে গিয়েছিলেন। এই জন্যই তিনি আরো বেশি রেগে গিয়েছিলেন। ঠিক বলতে পারব না, তবে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে মেয়ে হুট্ করে কলকাতায় বাপ-মার কাছে চলে আসতে পারল না। নীলাদ্রি কড়া চিঠি দিয়ে মেয়েকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এমন সন্তানকে তিনি বাড়িতে আশ্রয় দেবেন না।

'বিশাখা পাটনার মাসির কাছে চলে গেল। ছেলেবেলা থেকেই পাটনার মাসির প্রিয়পাত্রী ছিল সে। মাসি তাকে আশ্রয় দিলেন সত্য, বছর দুই বিশাখা সেখানে থাকলও। তারপর সেখানেও ভালো লাগল না। চলে এল কলকাতায়। অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায়, তার ভেতর অবিরত একটা জ্বালা এখটা ছটফটানি, একটা বন্ধনহীনতা মাথা ঠুকে মরছিল। কোন অবস্থায় সে শান্তি পাচ্ছিল না। তখন রীণা এম. এ. পাশ করে একটা কলেজে পড়াবার চান্স পেয়েছে। উঃ, রীণা তার দিদির জন্য অনেক করেছে, এখনও করছে। রীণা না থাকলে বিশাখা কোথায় ভেসে যেত! প্রথম প্রথম বিশাখার সব খরচ সে চালিয়েছে। নীলাদ্রি এই মেয়েকে বাড়িতে রাখবেন না জেনে রীণা প্রথমে কালীঘাটের ওদিকে একটা সস্তা ঘর ভাড়া করে বোনকে রাখল। অত্যন্ত বাজে জায়গা। তারপর রীণা চেষ্টাচরিত্র করে একটা প্রাইমারী স্কুলে বিশাখাকে ঢুকিয়ে দেয়। তখন বিশাখা ডাফ্ স্ট্রীটের এই বাড়িতে চলে আসে। একতলার ছোটো ঘর। তা হলেও পরিবেশটা ভালো, ভদ্র। মিশনারী স্কুল। প্রাইমারী স্কুল হলেও মাইনে-টাইনেটা মোটামুটি ভালো। তা ছাড়া, বিশাখা সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনিংটা নিয়ে নেয়। বিশাখার চাকরি হওয়া, ট্রেনিং নেওয়া ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে রীণার কলেজের প্রিন্সিপাল নাকি রীণাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। যা হোক, তিনটা বছর মোটামুটি ভালোই কাটল। তারপর এদিকে বছর দুই ধরে—আমি কিন্তু এ-সব কিছুই জানতাম না। বিশাখার বিয়ে হয়ে গেছে—তারপর সে কোথায় আছে কী করছে না করছে জানতে আমার একটুও আগ্রহ ছিল না। রীণাদের বাড়িতেও আমার যাওয়া-আসা তেমন নেই। হয়তো মাঝে মাঝে রীণার সঙ্গে রাস্তায়, বাস স্টপে বা কোথাও হঠাৎ দেখা হয়েছে। ভুলেও আমি বিশাখার কথা তাকে জিজ্ঞেস করিনি, এবং সে-

ও আমাকে তার দিদি সম্পর্কে কিছুই বলত না। এখন বুঝতে পারছি, রীণা এবং নীলাদ্রিবাবুর বাড়ির আর সবাই বিশাখার ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়তে, বিশেষ করে এখানে কলকাতায়, দিল্লিতে কি হয়েছে না হয়েছে দিল্লির মানুষ জানুক—কলকাতার মানুষকে জানতে দিতে মোটেই ইচ্ছুক ছিল না। ডিভোর্স জিনিসটা অবশ্য আমাদের সমাজেও এখন ডাল-ভাত হয়ে গেছে। কিন্তু তা হলেও একটা রক্ষণশীল পরিবার জিনিসটাকে অত্যন্ত ভয়ের চোখে ঘৃণার চোখে দেখবে আশা করা অন্যায় না। রীণা ওরা বিশাখার ব্যাপারটা একেবারে চেপে গেল। বিশাখা বাড়িতে থাকছে না, বালিগঞ্জেও থাকছে না—কোথায় কেন সুদূর ডাফ্ স্ট্রীটের এক বাড়িতে থেকে একটা স্কুলে মাস্টারী করে খাচ্ছে। আশপাশের লোক বিন্দুবিসর্গও টের পেল না, আর এত বড়ো শহরে কে তার খোঁজ খুঁটিয়ে রাখতে যায়। কিন্তু আমি জেনে গেলাম, আমাকে জানাতে হল। রীণা শেষ পর্যন্ত আমার কাছে ছুটে এল। সে জানে, আমি তোমার পরম ভক্ত। এতকাল পর জগমোহন ডাক্তারের পরিবারের সঙ্গে আর কারো যদি যোগাযোগ না থাকে, আমার থাকবে। আমি পরিতোষেরও বন্ধু। পরিমল কবে জেল থেকে বেরিয়ে আসবে, সে খবর আমি ছাড়া আর কে ভালো দিতে পারবে। কেননা, রীণাও এতদিনে বুঝে গিয়েছিল, তার দিদির ব্যাধিটা কোথায়, কেন। পুরী যাবার আগে তোমার রিলিজের তারিখটা আমি জেনে গিয়েছিলাম, রীণাকেও জানিয়ে দিয়েছিলাম, তাই কাল রাত্রে দুবার বাড়িতে তোমাকে সে টেলিফোনে খুঁজেছিল, সাড়া না পেয়ে আজ ভোরবেলা ট্যাক্সি নিয়ে আমার কাছে ছুটে গেছে।'

'এবং তারপর তুমি আমার কাছে ছুটে এসেছ।'

পরিমল মৃদু গলায় হাসল। হাসি দেখে গিরিজা একটু চমকে উঠল।

'ওটাই সত্য, বুঝলে গিরিজা।' পরিমল গম্ভীর হয়ে বলল, 'নেমেসিস— প্রকৃতির প্রতিশোধ, অনেক কথা বললে, কিন্তু ওই একটা কথাই সুন্দর লাগল।'

কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গিরিজা পরিমলের চোখের দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'এটা অস্বাভাবিক না, তোমার মনে দুঃখ আছে, অভিমান আছে, ঝোঁকের মাথায় বিশাখা কাজটা করে ফেলল, কিন্তু তখন তার মনের অবস্থা কী ছিল, আশা করি, এখন বুঝতে পারছ—ব্যথা ভুলতে একটা ওষুধ খেয়েছিল সে, দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতে মানুষ যেমন ড্রাগ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তেমনি বিশাখা ঘুমিয়ে পড়তে চেয়েছিল—কিন্তু ঘুম হল না, ব্যথা সারল না। বরং শতগুণে তা বেড়ে গেল, তার যন্ত্রণা ছটফটানির সীমা রইল না। বিয়ে—বিবাহিত জীবন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হল। ইচ্ছা করে সে ব্যর্থ করে দিল। কী চাইছিল সে এবং এখনও কী চাইছে, একটু ভেবে দেখলে নিশ্চয় তুমি তাকে ক্ষমা করতে পার, তুমিই তো তাকে ক্ষমা করবে, সেই উদারতা, সেই মহত্ত্ব একমাত্র তোমার মধ্যেই আছে—এই জন্যই তুমি লর্ড—তোমার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না যে।' একটু থেমে গিরিজা আবার বলল, 'রীণার মুখে শুনলাম, মাথার গোলমাল তো আছেই, এক মাস যাবৎ সে খুব অসুস্থ, শয্যাশায়ী, স্কুলে পড়াতে যাচ্ছে না। শিয়রের কাছে একটা জানালায় মাথা রেখে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। পরিমলের জেলের মেয়াদ শেষ হতে চলল, এবার সে আসছে, ঐ বুঝি এল—চব্বিশ ঘন্টা শুধু এই জপছে, তাই বলছিলাম লর্ড, তার

সব গেছে, স্বাস্থ্য, যৌবন, আশা স্বপ্ন—আত্মীয়স্বজনের স্নেহ সহানুভূতি থেকে সে বঞ্চিত—সকলের কাছ থেকে সরে এসে পালিয়ে পালিয়ে থাকতে হচ্ছে তাকে, ভালো করে মানুষের কাছে গিয়ে পরিচয় দিতে তার লজ্জা কুণ্ঠা—সব দিক দিয়ে সে ব্যর্থ, কিন্তু একটা সত্য সে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, সেখানে সে নিজেকে মিথ্যা হতে দেয়নি, ব্যর্থ হতে দেয়নি, একটা সত্য সূর্যের মতন তার বুকের মধ্যে জ্বলছে। তার প্রেম—পরিমলের প্রতি প্রবল অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসা। নিজে আগুনে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে প্রেমের দীপটি যত্ন করে সে জ্বেলে রাখল—হ্যাঁ এই দশ বছর—সব মিথ্যা হতে দিয়ে এক জায়গায় বিশাখা জেনুইন থেকে গেল। লর্ড!'

'হ্যাঁ, জেনুইন জেনুইন।' সার্কাসের খেলোয়াড় যখন মাথার ওপর চমৎকার সব তারের খেলা দেখায়, তখন নীচে দাঁড়িয়ে ক্লাউন যেমন হাসে, ঘাড় নাড়ে, তেমনি গিরিজার দিকে চোখ তুলে পরিমল হাসছিল, ঘন ঘন ঘাড় নাড়ছিল। 'হুঁ, প্রেম—ঐ যে একটু আগে বললে, এ যুগের আধুনিক-আধুনিকারা আমাদের তুলনায় কিছুই না—আমাদের প্রেম প্যাশন তাদের নেই, আমাদের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি ছিল বিশাখার, আশ্চর্য প্রেমের খেলা খেলে গেছে সে. প্যাশনের আতসবাজি জ্বালিয়ে গেছে, তাই তো।' চুপ থেকেও পরিমল মাথাটা নাড়তে লাগল।

গিরিজা অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে গেল।

'আমি উঠব গিরিজা, আর এখানে ভালো লাগছে না।'

'দাঁড়াও, বিলটা মিটিয়ে দিচ্ছি।' গিরিজা হাতের ইশারায় বয়কে ডাকল। বিল মিটিয়ে দিয়ে দুজন উঠে পড়ল।

'আমি পরিতোষকে এ সব কিছুই বলিনি—রীণা বলছিল, বিশাখা চাইছে না পরিতোষের কানে এ সব কথা ওঠে, পরিতোষ, পরিতোষের স্ত্রী, তোমার বাবা—বাড়ির কাউকে যেন কিছু না বলা হয়, হুঁ, বিশাখা এখন কী করছে, কোথায় আছে, পরিমলকে যে সে দেখতে চাইছে—'

'তাই তো চাইবে বিশাখা—' পরিমলের গলার স্বর হঠাৎ দৃঢ় হয়ে উঠল। 'তার পক্ষে এমনটা হওয়াই তো স্বাভাবিক। আমাদের বাড়ির সবাইকে যে তার ভয়।' দৃঢ় কণ্ঠস্বর নিয়েও পরিমল গলার নীচে হাসল।

'কিন্তু কেন বলো তো?' সিঁড়ি বেয়ে পাশাপাশি দুজন নীচে নামছিল। গিরিজা চোখ কাত করে পরিমলের মুখ দেখতে চেষ্টা করল। 'তা না হয় তোমার বাবার কাছে তার সঙ্কোচ, পরিতোষের স্ত্রীর কাছে সঙ্কোচ, এই জন্যই কাল রীণা ফোন করতে গিয়ে তার নামধাম বা তোমাকে কেন চাইছে কিছুই তাদের কাছে বলল না. পরিতোষ ক'দিন আগেও বিশাখার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—আমি চেপে গেছি, বলেছি জানি না, বিশাখার খোঁজখবর আমি রাখি না। মিথ্যা কথা আমাকে বলতে হয়েছে।'

'বেশ করেছ।' সিঁড়ি শেষ করে দুজন রাস্তায় দাঁড়াল। গিরিজা পরিমলের কাঁধে হাত রাখল।

'আহা—বেশ করেছ বললেই তো হল না। শোন লর্ড, এটা আমার মাথায় আসছে না—বাড়ির আর সবাইকে না-হয় তার ভয় সঙ্কোচ—কিন্তু পরিতোষকে কেন, তোমার ও বিশাখার

সেই গভীর প্রেম পরিতোষের তো অজানা ছিল না, আমি যতটুকু জানতাম—জেনেছিলাম, পরিতোষও জেনেছিল, তবে আর তার কাছে সব গোপন রাখা কেন।'

ফুটপাথের রৌদ্র মুখে নিয়ে পরিমল গলা ছেড়ে হাসল। 'বরং পরিতোষ একটু বেশিই জেনেছিল। তবে কথা কী জান, গিরিজা, ডিভোর্স করে বিশাখা কলকাতা চলে এসছে, আমি কবে জেল থেকে বেরিয়ে আসব, তার অপেক্ষা করছে—কথাটা জানতে পারলে বাবার মতন পরিতোষও ভয় পাবে। এবং যখন শুনবে, বিশাখা আমায় ডাকছে, আমি তার কাছে ছুটে যাচ্ছি তখন তারা আমায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবে।'

'সে কি!' গিরিজা চোখ বড়ো করল। 'ভুল করে বা যে কারণে হোক বিশাখা একটা বিয়ে করে ফেলেছিল, বিয়েটাই সত্য হয়ে রইল! তার প্রেম—ভালোবাসা কিছু না? হ্যাঁ, কাকাবাবু, তোমার বাবা তা ভাবতে পারেন, সেকেলে মানুষ, বিয়েটাই তাঁর কাছে বড়ো—হয়তো এই জীবনে তিনি প্রেমটেমের ধার ধারেননি। বিয়ের বাইরেও যে আর-একটা মানুষকে ভালোবাসা যায়—তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করা চলে, এ-জিনিস তাঁর ধ্যান-ধারণার বাইরে। কিন্তু পরিতোষ? হোপ্‌লেস?' গিরিজা আকাশের দিকে চোখ তুলে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। 'তোমার ভাই—তার চিন্তা-ভাবনা দৃষ্টিভঙ্গি যে এতটা সঙ্কীর্ণ হয়ে যাবে, ভাবতেও কেমন লাগে—তাই বলছিলাম, কিছু আর নেই ঐ মানুষটার মধ্যে, ফসিল হয়ে গেছে, বিয়ে করেছে—বিয়ে করার পর থেকেই তার এই অধঃপতন আমি তো লক্ষ্য করছি—স্ত্রী ছাড়া আর কিছু জানে না সে এখন। স্ত্রীরত্ন লাভই জীবনের চরম প্রাপ্তি বলে ধরে নিয়েছে—গিন্নীকে মাথায় রাখবে কি—'

'যাক গে, এসব বলে কিছু লাভ নেই—সে যদি তার স্ত্রীকে মাথায় করে রাখে, তাই রাখতে দাও না—হয়তো বিয়ে করলে তুমিও—'

'নো—নেভার।' গিরিজা প্রবলভাবে মাথা নাড়ল, 'বিয়ে এবং প্রেম যে সম্পূর্ণ দুটো আলাদা জিনিস, এই মোটা কথাটাই অনেকে বোঝে না, অনেকে না বুঝুক, কিন্তু পরিতোষ—'

'আর একদিন, আর-এক সময় এসব আলোচনা হবে।' গিরিজার পিঠে মৃদু চাপড় দিল পরিমল। 'চলি আজ, অনেক বেলা হল—তুমি তো ওদিকের ট্রাম ধরবে, নাকি বাস?'

'দেখি একটা ট্যাক্সি পাই কি না—' গিরিজা আড়চোখে রাস্তা দেখল এবং পরক্ষণে পরিমলের দিকে চোখ ফেরাল। 'তা হলে তুমি আমায় কথা দিচ্ছ লর্ড, একবার ওকে গিয়ে দেখে আসবে?'

'দেখি—' রাস্তার দিকে মুখ করে পরিমল বিড়বিড় করে কিছু বলল।

'ঠিকানাটা মনে আছে তো? হান্ড্রেড ওয়ান বাই ওয়ান বাই........'

'মনে আছে, মনে থাকবে।' পরিমল পা-পা করে হাঁটতে আরম্ভ করল।

গিরিজার উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না।

'দেখবে বিল্ডিংটার সামনেই ঝাঁকড়া মাথা একটা লিচু গাছ—'

কথা না বলে পরিমল শুধু ঘাড় কাত করল। গিরিজাকে পিছনে রেখে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল। না, গিরিজার দোষ নেই; ভাবল সে, গিরিজা একটা প্রেমই জানত, একটা

প্রেমের কথাই শুনেছিল। শুনেছিল এবং চোখেও দেখত। পরিমলের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল এই ভক্তটি। কাজেই সেই অমলধবল প্রেম ভক্তের চোখে আজও অবিনশ্বর হয়ে আছে। বিশাখার মধ্যে সত্য কতটা আছে, তা পরিমল জানে, কিন্তু গিরিজা যে একটা সত্য আঁকড়ে ধরে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই সে আবার উপকার করতে এগিয়ে এসেছে। উপকার করতে যখন অগ্রসর হয়, তখন গিরিজা ভয়ানক সিরিয়াস হয়ে ওঠে। গিরিজার ওপর রাগ করতে পারল না পরিমল। মনে মনে তাকে অনুকম্পা করল।

রাস্তা ক্রশ করে পরিমল এপারে উঠে এল।

হঠাৎ খুব ছুটতে ইচ্ছা করছিল তার, একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ইচ্ছা করছিল। এক জায়গায় এতটা সময় বসে থেকে ভিতরে একটা জড়তা অনুভব করছিল সে। জড়তা ঝেড়ে ফেলতে আপাতত কী করা যায়, চিন্তা করতে করতে সামনের একটা হেয়ার-কাটিং সেলুনে ঢুকে পড়ল। আজই কিন্তু দাড়ি না কামালেও চলত, তবু সে একটা আসন দখল করল। মুখে সাবানের ফেনা উঠল। দীর্ঘকাল পর আবার একটা বড়ো আরসির মধ্যে পরিমল নিজেকে দেখতে পেয়ে আনন্দিত হল। জেল থেকে বেরিয়ে এই নিয়ে সে দ্বিতীয়বার নিজেকে নিরীক্ষণ করার সুযোগ পেল। কাল প্রথম ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ঘরের মিররে চেহারাটা দেখেছিল। দেখে একটু অস্বাভাবিক ও অপরিচিত ঠেকেছিল। আজ আর তা মনে হল না। তার অর্থ, পরিত্যক্ত পৃথিবী আবার তাকে নিজের মধ্যে টেনে নিচ্ছে, জীর্ণ করছে। করুক। এই জন্য সে ভয় করে না। তার বাইরেটা জীর্ণ হবে, পুরোনো জগতের সঙ্গে মিশে যাবে, তার বেশভূষা, চাল চলন, কথাবার্তা, খাওয়া, ঘুম আর অন্যরকম থাকছে না। কিন্তু অন্তর? উপলব্ধি? তা কেউ জীর্ণ করতে পারবে না, করায়ত্ত করতে পারবে না। এতক্ষণ বকে বকেও গিরিজা সেখানে হাত বাড়াতে পারল কি!

সেলুন থেকে বেরিয়ে একটা খাবার দোকানে ঢুকল সে। আধ-পেয়ালা কফি ও দু-গ্লাস ঠান্ডা জল খেয়ে তার ভয়ংকর ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। গপ গপ করে প্রায় দু টাকার সিঙ্গাড়া-রসগোল্লা খেয়ে ফেলল। এটা অসংযম না। একটা কিছু নিয়ে কিছুক্ষণ ব্যাপৃত ও ব্যস্ত থাকা। সেখান থেকে বেরিয়ে একটা সেটশনারি দোকান চোখে পড়তে সে ঢুকে পড়ল। কী কিনবে, কী কেনা যায়, চিন্তা করতে করতে দীপুর জন্য এত বড়ো একটা ডল কিনে ফেলল এবং হৃষ্টমনে দোকান থেকে বেরিয়ে এল।

॥ ২২ ॥

ঠিক রাস্তায় সে এসেছিল। তারপর সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। একটা লেটার-বক্স ছিল ওখানটায়। পানের দোকানটার গায়ে। এখন আর চোখে পড়ছে না।

হাঁ-করা পেট-মোটা লাল বাক্সটা নাই। পানের দোকানও উঠে গেছে। কিন্তু তা কি হয়। তার মনে সংশয় হল। কলকাতার রাস্তার চেহারার অনেক অদলবদল হয়। কিন্তু পানের দোকান ও ডাকবাক্সের স্থানচ্যুতি বড়ো সহজে ঘটে না। এক যদি রাস্তাটা উঠে যায়। বা সারি সারি ক'টা বাড়ি এক ধার থেকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। তা না হয় পানের দোকান যাবে। কিন্তু চিঠি ফেলার বাক্স?

অসুবিধা হলে রাস্তার এপার থেকে সরিয়ে নিয়ে ওপারে বসানো হবে। কী পাঁচ-দশ হাত দূরে বসানো হবে। কিন্তু ওটা রাখা হবে। ভয়ংকর জরুরী জিনিস। একটা ডাকবাক্সের অন্তর্ধান অবলুপ্তি সমগ্র ডাকবিভাগের অবলুপ্তি অবসানের সামিল নয় কি? চিন্তা করে পরিমল মনে মনে হাসল।

তাই হবে। সে ভুল রাস্তায় এসেছে।

পা-পা করে আবার সেই মোড়ের সিঙ্গাড়া জিলিপির দোকানটার কাছে চলে এল। অবাক লাগছিল তার, দোকানের চেহারার এক চুল পরিবর্তন হয়নি। সেই ফুটপাথের গা ঘেঁষে প্রকান্ড উনুনের ওপর বিশাল কড়াই চাপানো। কড়াই ও ভিতরের কাঁচ-ভাঙা আলমারিটার মাঝখানে এক জায়গায় মাথার ওপর হলদে চেহারার একটা বাল্‌ব দশ বছর আগে যেমন টিমটিম করে জ্বলত, এখনও ঠিক তাই জ্বলছে। সেই টাক-পড়া জলধর। মুখটা দেখা মাত্র নামটা মনে পড়ে গেল পরিমলের। আগের মতন তার নির্দিষ্ট জায়গায় কাঠের ক্যাশ-বাক্সটা আগলে নিয়ে গোল হয়ে বসে আছে। মুখে বিড়ি নিয়ে যেভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকত, এখনও তাই আছে। তবে খুব মোটা হয়েছে। ঘাড়ে গর্দানে চিবুকের তলায় চর্বি থলথল করছে। ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। কাঁধছেঁড়া ময়লা গেঞ্জিটা এখনও গায়ে আছে। আর জলধরের দোকানের সামনে ফুটপাথের এতটা জায়গা জুড়ে ডালপালা ছড়ানো সেই কালো অশ্বত্থ গাছটা। কোনো পরিবর্তন নেই। এদিকটায় সব একরকম আছে। তবে তার ভুল হচ্ছে কেন বাড়িটা খুঁজে বার করতে! একবার কি জলধরকে জিজ্ঞাসা করবে? এক পা সেদিকে অগ্রসর হয়েও আবার সে পিছিয়ে এল। দোকান মুখ করে না দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ সে রাস্তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। অদ্ভুত একটা ভয় ও জড়তা তাকে কেমন আচ্ছন্ন করে ফেলল। জলধর যে তাকে চিনতে পেরেছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। মুখ থেকে বিড়ি নামিয়ে যেভাবে মানুষটা এদিকে তাকাল, তার এই তাকানোটাই পরিমলের খারাপ লাগল।

এমন না যে, যদি জলধর জিজ্ঞাসা করত, পরিমল তার নাম-ধাম-পরিচয় গোপন করত।

এ পাড়ায় মাঝে মাঝে যখন বেড়াতে এসেছে বন্ধুদের নিয়ে এই দোকানে বসে সে খাবার খেয়েছে, গল্প-সল্প করেছে। পরিমলের মুখটা তার মনে থাকতে পারে।

কিন্তু এভাবে তাকানো কেন! যেন সন্দেহে সংশয়ে জলধরের চোখ দুটো হঠাৎ গোল হয়ে উঠল। খুবই অস্বস্তিবোধ করল পরিমল। মাথা গুঁজে রাস্তা ক্রশ করে সে উল্টো দিকের ফুটপাথে উঠে গেল।

আশ্বিন মাস। এখন থেকেই সন্ধ্যাবাতি লাগার সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়া ও কুয়াশা ঝুলতে আরম্ভ করেছে। রাস্তাঘাট, গাড়িঘোড়া ও পথচারী মানুষের মুখগুলি ঝাপসা দেখায়। এটা মন্দ না। একটা আবরণের কাজ করে। খুব কাছে না এলে একটা মানুষকে চেনা যায় না।

পরিমল অবশ্য আবরণ চায়নি। তবে আর ইচ্ছা করে সে জলধরের দোকানের আলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াত না। আবরণ না রেখে মুক্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে বাঁচবে বলে তো তার এখানে ছুটে আসা। কিন্তু পৃথিবীটা এত সহজ না, মানুষ এটাকে জটিল করে তুলছে। জলধরের সন্দিগ্ধ সংশয়াচ্ছন্ন চোখ দুটো তা আবার প্রমাণ করল।

'শুনুন!'

'বলুন'। যুবকটি দাঁড়াল। খুবই অল্প বয়স। হয়তো সুকোমলের বয়সী হবে। তা হলেও পরিমল আপনি করে সম্বোধন করল।

'অক্ষয় উকিলের বাসাটা কোন্ দিকে বলতে পারেন?'

'কোন্ অক্ষয় উকিল বলুন তো?' যুবক ভুরু কোঁচকাল।

পরিমল অল্প হাসল।

'একজন অক্ষয় উকিলই তো এ-পাড়ায় ছিল জানতাম। রোগা পাতলা মতন দেখতে। পুরু লেন্সের চশমা চোখে—'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, আর বলতে হবে না।' যুবক উৎসাহিত হয়ে উঠল। 'প্রলয়ের বাবার কথা বলছেন তো? হাত-কাটা প্রলয়?'

পরিমল হঠাৎ কথা বলল না। 'প্রলয়' মনে মনে নামটা উচ্চারণ করল সে। মলয়ের সঙ্গে মিল আছে। মলয়ের ছোটো ভাই, কিন্তু তার নাম কি প্রলয়? তখন বারো-তেরো বছর বয়স ছিল ছেলেটির। যেন 'ঝন্টু' বলে ডাকা হত। কিন্তু তার তো হাত কাটা ছিল না।

'আপনি কি ঝন্টুর কথা বলছেন?' পরিমল যুবকের চোখের দিকে তাকাল। 'প্রলয়ের আর-এক নাম কি ঝন্টু?'

যুবক ঘাড় কাত করল।

'তা হবে হয়তো, আমরা প্রলয় বলেই জানি। হকারি করে। রোজ সকালে সাইকেলে করে বাড়ি বাড়ি কাগজ দিয়ে যায়।'

পরিমল একটু নিশ্চিন্ত হল। তবে হয়তো যাঁকে সে খুঁজছে যুবক তাঁকে চেনে না। অক্ষয়বাবুর ছেলে কাগজ ফেরি করে—তার অর্থ, তেমন লেখাপড়া শেখেনি—ভালো চাকরিটাকরি করে না। কিন্তু তা হবে কেন। হওয়া উচিত না।

'আচ্ছা', যেন যুবককে তার নির্দিষ্ট পথে হেঁটে চলে যাবার একটা নীরব সম্মতি জানাতে পরিমল মাথা নাড়ল এবং নিজেও অন্য দিকে সরে পড়ার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু যুবক নড়ল না। পরিমলের চোখের দিকে একটু তীক্ষ্ণ-চোখে তাকাল।

'আপনি কোথা থেকে এসেছেন?'

'আমি এখান থেকেই এসেছি।'

'এই বালিগঞ্জেই থাকেন বুঝি?'

'না', পরিমল মাথা নাড়ল। 'আমি নর্থ ক্যালকাটা থাকি।'

'ও', অস্ফুট শব্দ করে যুবক চুপ করল। একটু কী চিন্তা করল। তারপর হেসে বলল, 'আমরাও এ-অঞ্চলে বছর দুই হয় এসেছি। আগে বেহালায় ছিলাম। আপনি কোন্ অক্ষয়বাবুকে খুঁজছেন জানি না। তবে প্রলয়ের বাবার নামও অক্ষয়বাবু—লোকে বলে অক্ষয় উকিল। আমি অবিশ্যি বুড়োকে আজ পর্যন্ত চোখে দেখিনি। তবে শুনেছি, এই অক্ষয় উকিলের বড়ো ছেলেকে, মানে প্রলয়ের দাদাকে তার এক বন্ধু—তখন প্রলয়ের দাদা কলেজে পড়ত, কী যেন পাড়ার ক্লাব-ট্লাব নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল বন্ধুর সঙ্গে—বন্ধু চায়ের দোকানে ডেকে নিয়ে প্রলয়ের দাদাকে সেখানেই বুকে ছোরা বসিয়ে একেবারে সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে দেয়।'

পরিমল স্থির স্তব্ধ হয়ে শুনল। অন্য দিকে মুখটা ফেরানো ছিল।

'উঃ, কী বীভৎস ঘটনা', যুবক বলছিল, 'শুনলেও গায়ে কাঁটা দেয়।' পরিমল এবারও তার দিকে চোখ ফেরাল না। 'সবাই জানে এ ঘটনা।' যুবক বলল, 'বালিগঞ্জের ইতিহাসে একটা রেকর্ড রয়ে গেছে। গুন্ডা বদমায়েস ছুরি-ছোরা চালায়, খুন-জখম করে—সব জায়গায়ই এমন আছে—কিন্তু বন্ধু বন্ধুকে—'

'আচ্ছা চলি।' পরিমল রাস্তার দিকে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়াল। যেন আর তার এ-সব শুনবার দরকার নাই। এই অক্ষয় উকিলের কাছে সে আসেনি। যুবকও তাই বুঝল। পিছন থেকে বিনীত গলায় বলল, 'আপনি বরং এখানকার যারা পুরোনো মানুষ, স্থায়ী বাসিন্দা, তাদের কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন—হয়তো আর একজন অক্ষয় উকিল থাকতেও পারে—বাড়িটাও হয়তো কেউ কেউ চেনে।'

কথা না বলে পরিমল শুধু ঘাড় কাত করল। তারপর-রাস্তায় নামল। যেন এখান থেকে ফিরে যাবে বলে বাস স্টপের দিকে চলছিল সে। তারপর থমকে দাঁড়াল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল যুবকটি আর দাঁড়িয়ে নাই। ধোঁয়াও কুয়াশার অন্ধকারে মিশে গেছে। পরিমল স্বস্তিবোধ করল। কিন্তু এই স্বস্তি মুহূর্তের। পরক্ষণে তার মন আবার অশান্তিতে ভরে উঠল। তার অনুশোচনা হতে লাগল। বিষণ্ণ লজ্জিত হয়ে ভাবল সে, এমন তো কথা ছিল না। তাকে এ-পাড়ায় সকলেই চিনবে। যতীন দাস রোডে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বলাবলি করবে, ঐ তো জগমোহন ডাক্তারের বড়োছেলে পরিমল। দশ বছর জেল খেটে বেরিয়ে এসেছে। এবং কেউ জিজ্ঞাসা করলে তৎক্ষণাৎ সে উত্তর দেবে, 'আমি অক্ষয়বাবুর কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। আমার কৃতকর্মের জন্য আমি অনুতপ্ত। অক্ষয়বাবু ক্ষমা না করা পর্যন্ত আমার মুক্তি নাই।' সকলকে সে এ কথা বলবে, বলতে প্রস্তুত হয়ে সে এ-রাস্তায় পা বাড়িয়েছিল। এখন হঠাৎ সে ভয় পেল কেন! যুবকটি ঐ প্রসঙ্গ তুলবার সঙ্গে সঙ্গে সে সেখান থেকে পালিয়ে এল! নিজের এই কাপুরুষতার কথা চিন্তা করে সে অত্যন্ত মর্মাহত হল। রাস্তা ক্রশ করে আবার সে অশ্বত্থতলার সিঙ্গাড়া-জিলিপির দোকানের দিকে এগোতে লাগল। জলধর যখন পরিমলকে চেনে, তখন তাকেই তো জিজ্ঞাসা করা ভালো। পরিমল এতদিন কোথায় ছিল, আজ হঠাৎ তাকে এখানে দেখা যাচ্ছে কেন, অক্ষয়বাবুর কাছে তার কী দরকার ইত্যাদি কোনো প্রশ্নই হয়তো জলধর করবে না। পরিমলকে দেখলেই সব বুঝে নেবে। হ্যাঁ, অক্ষয় বাবুর বাড়ির নম্বর পরিমলের মনে নাই। বা মনে থাকলেও নম্বরটা সে খুঁজে বার করতে পারছে না। দশ বছর কম সময় কি? রাস্তাঘাটের চেহারা অনেক বদলে গেছে। পরিমলের অসুবিধাটা বুঝতে জলধরের কষ্ট হবে না, বরং তৎক্ষণাৎ আঙুল দিয়ে অক্ষয় উকিলের বাড়িটা সে দেখিয়ে দেবে। তাছাড়া, এখন আবার তাকে দেখলে যে জলধরের চোখ গোল হয়ে উঠবে না জানা কথা। প্রথমবার তো সে বিস্মিত হবেই। বহুকাল অদর্শনের পর হঠাৎ পরিচিত এই মুখ দেখলে সকলেই বিস্মিত হয়। চমকে ওঠে।

'কী চাই আপনার?'

'কিছু না।' পরিমলের হাসি পেল। জলধর ভাবল, পরিমল বুঝি খাবারটাবার কিছু কিনতে তার দোকানের সামনে দাঁড়াল। 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে।'

'বলুন।' অত্যন্ত বিনীত ভদ্র চেহারা করে জলধর পরিমলের দিকে তাকাল। যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সে কথা বলছে।

'অক্ষয়বাবুর বাড়িটা কোন্ দিকে বলতে পারেন, অক্ষয় উকিল?' পরিমল এখন স্থির চোখে জলধরের চোখের দিকে তাকাতে পারল। জলধর মাথা নাড়ল।

'তিনি তো আগের বাড়িতে থাকেন না। অনেকদিন হয় উঠে গেছেন।'

'কোথায় গেছেন বলতে পারেন?'

জলধর একটু চিন্তা করল, তারপর গদি ছেড়ে উঠে এল।

'এক কাজ করুন। ঐ যে সামনে সাদা দোতলা বাড়িটা দেখছেন, ওটা পার হয়ে গেলে একটা গলি দেখতে পাবেন, হুঁ, ডানহাতি। গলি ধরে সোজা এগিয়ে যাবেন—একটু হাঁটতে হবে আপনাকে—তারপর দেখবেন এক জায়গায় দুটো তাল নারকেল গাছ দাঁড়িয়ে আছে, বেশ ফাঁকা, মাঠের মতন জায়গাটা। ঠিক মাঠের গায়েই টিন-টালির কতকগুলো ঘর—হুঁ, গোঁসাইপাড়া বস্তি বলে ওটাকে, ওখানে যে-কোনো একজনকে জিজ্ঞেস করলে অক্ষয়বাবুর ঘরটা দেখিয়ে দেবে।'

'আচ্ছা, চলি।'

'আচ্ছা।' যেন অপরিচিত কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে জলধর দুহাত একত্র করে চিবুক ও বুকের কাছে ঠেকিয়ে বিনয়ের ভঙ্গিতে অল্প একটু হাসল।

পরিমল বিস্মিত হল। একটু হতাশও হল। জলধর তাকে চিনতেই পারল না। বা কোনোদিন তাকে দেখেছে কিনা, এমন একটা সন্দেহ পর্যন্ত করল না। তখন পরিমল নিশ্চয় দেখতে ভুল করেছিল। হয়তো অন্য কোনো কারণে জলধরের চোখ দুটো গোল হয়ে উঠেছিল। বা চোখ স্বাভাবিকই ছিল, পরিমল অন্যরকম দেখেছিল।

একফালি বারান্দা নিয়ে ছোটো টালির ঘর। কিন্তু এখনই যেন এ অঞ্চলে নিশুতি নেমেছে। বড়ো বেশি চুপচাপ সব। হয়তো পিছনের ওটা মাঠ। অনেকটা জায়গা জুড়ে গাঢ় অন্ধকার। মাথার ওপর তাল নারিকেল পাতার সোঁ সোঁ শব্দ শোনা গেল। অন্ধকার আকাশে তারা জ্বল জ্বল করছে।

একবার কড়া নাড়তেই ভিতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

অত্যন্ত মিষ্টি গলা। পরিমলের মনে হল, কেউ নরম হাতে ছোট্ট করে বেহালার ছড় টানল। না, একটা পাখি একবার ডেকে উঠে চুপ করে গেল। আর কড়া নাড়ল না সে। আর দরকার ছিল না। একটি মুগ্ধ বিহ্বল মানুষের মতন চোখ দুটো টান করে মেলে ধরে পরিমল অন্ধকার দরজাটা দেখতে লাগল। জীবনে অনেক শব্দ শুনেছে সে, হাসি গান কান্না ও কথার বিচিত্র ধ্বনি সারা জীবন শুনে এসেছে। কিন্তু এমন গলার স্বর কোনোদিন তার কানে লেগেছে বলে মনে করতে পারল না।

যেন ঐ স্নিগ্ধ সংক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যে ভোরের আলোর আমেজ ছিল, ফুলের গন্ধের পবিত্রতা ছিল, বসন্তের কচিপাতার নমনীয়তা ছিল। ঠিক কী ছিল, পরিমল তা-ও ভেবে ঠিক করতে পারছিল না সত্য! আকাশের জ্বলজ্বলে তারাগুলির এক পাশে একটু নিভৃতে

একটা সবুজ তারা চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই তারাটাকে তার মনে পড়ল। কাল সকালে জগমোহনের বাগানে একটা লিলির নবোদগত সতেজ ডাঁটা দেখেছিল সে। এখন সেটিও হঠাৎ মনে পড়ল।

তার অর্থ পৃথিবীর যাবতীয় সুন্দর পবিত্র জিনিসের ছবি পরিমলের মাথায় এল। কবিতার মতন কিছু একটা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

একটু দেরিই হচ্ছিল। তা হলেও পরিমলের মনে হল, ঐ একটুখানি গলার শব্দ শুনে সারারাত সে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। অপেক্ষা করতে পারে। কোনো কষ্টই কষ্ট মনে হবে না। যদিও অনেকটা পথ হেঁটে সে ক্লান্ত। পায়ে বিস্তর মশার কামড় অনুভব করছিল।

এক মিনিট পর দরজা খুলে গেল। একটা হ্যারিকেন হাতে ঝুলিয়ে একজন বেরিয়ে এল। পায়ের কাছে আলো থাকলে মুখ দেখা যায় না। তাই আগন্তুককে দেখতে মেয়েটি নিজের মুখের কাছে—কানের পাশে হ্যারিকেনটা উঁচু করে তুলে ধরল। তাতে পরিমলেরই বেশি সুবিধা হল। টলটল করছে একজোড়া চোখ। এই কি হরিণ চোখ! হয়তো তাই। আয়ত গভীর কালো পরিচ্ছন্ন চোখ। কাঁচা সবুজ ফলের দৃঢ়তা নিয়ে মুখের ডৌলটি আশ্চর্য সুন্দর। কান দুটো ছড়ানো, চিবুক ও চুলের সঙ্গে লেগে না থেকে যেন একটু বেরিয়ে এসেছে, মনে হতে পারে দুটো অবাধ্য ফুলের পাপড়ি, ফুল থেকে আলাদা হয়ে আছে।

'কাকে চাইছেন আপনি?'

'অক্ষয়বাবুকে।

চুপ করে মেয়েটি কী ভাবল। তারপর আলোটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ঘরে চলে গেল। এক সেকেণ্ড পর একটি পুরুষ বেরিয়ে এল। যুবক। পরিমল চমকে উঠল। আধময়লা একটা হাফ-শার্ট গায়ে। যুবকের একটা হাত কনুই পর্যন্ত এসে থেমে গেছে। কনুইয়ের জায়গায় কেমন কুঁকড়ে দুমড়ে আছে। বোঝা যায় হাতের বাকি অংশটা কোনো সময় কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল। সেলাই করার দরুন ওখানে জায়গাটা এমন হয়ে আছে। প্রলয়। নামটা মনে ছিল পরিমলের। মলয়ের মুখের আদল আছে চেহারায়। মলয়ের মুখটা কেমন ঝাপসা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এতদিনে। হঠাৎ সেই মুখ জীবন্ত স্পষ্ট হয়ে পরিমলের চোখের সামনে ভেসে উঠতে ভয়ংকর অস্বস্তিবোধ করল সে।

'কাকে খুঁজছেন?'

'আমি অক্ষয়বাবুর কাছে এসেছি। একজন বলল, একটাই অক্ষয়বাবুর বাড়ি।'

মেয়েটির মতন যুবকও হ্যারিকেনটা উঁচু করে তুলে ধরে বেশ একটু ধারালো চোখে পরিমলকে দেখল।

'হ্যাঁ, এটা অক্ষয়বাবুর বাড়ি, আপনি কোথা থেকে এসেছেন?'

'আমি নর্থ ক্যালকাটায় থাকি।'

'কী দরকার বাবার কাছে?' এবার আর অক্ষয়বাবু বলল না প্রলয়। বলল, 'বাবা অসুস্থ। শয্যাশায়ী, বাতব্যাধিতে অচল। এখন আর কোর্টেকোর্টে যান না। আপনি কি কোনো মামলা মোকদ্দমার ব্যাপার নিয়ে এসেছেন?'

'না,' পরিমল হাসল। শান্ত গলায় বলল, 'এমনি একটু দরকারে এসেছি, তার সঙ্গে দেখা করব।'

'এমনি একটু দরকার!' যেন নিজের মনে বিড়বিড় করল প্রলয়। তার গলার স্বরটা বদলে গেল। আর একটু এগিয়ে এসে পরিমলের মুখের সামনে আলোটা তুলে ধরল। যেন তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে পেঁচ ঘুরিয়ে সলতেটা বাড়িয়ে দিল। বাতির শিখা এবার বেশ বড়ো হল উজ্জ্বল হল। আর সেই সঙ্গে প্রলয়ের চোখের তারা চকচক করে উঠল।

'আচ্ছা মশাই, আপনাকে তো কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?'

পরিমল কথা বলল না।

'আচ্ছা,' প্রলয় তৎক্ষণাৎ আবার প্রশ্ন করল, 'আপনি কি কোনদিন বালিগঞ্জে ছিলেন?'

'ছিলাম', পরিমল একটা ঢোক গিলল। যেন গলাটা ভিজিয়ে নিল। 'সে তো অনেক দিনের কথা ভাই।'

'তা হলই বা।' বেশ একটু উত্তেজিত চঞ্চল হয়ে উঠল যুবক। 'কিন্তু আপনাকে আমি দেখেছি—খুব পরিচিত লাগছে।'

পরিমল চোখ বুজল, চোখ বুজে মাথাটা একটু নাড়ল, তারপর প্রলয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'কিন্তু সেদিন তুমি খুব ছোটো ছিলে।'

'তা থাকতে পারি।' প্রলয় ঘাড় নাড়ল, 'তা হলেও আমার পরিষ্কার মনে আছে। আচ্ছা, দাঁড়ান, আপনার নামটা শুনতে পারি কি?'

'কেন পারবে না।' এবার পরিমলের মুখ নির্ভীক উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠল। 'আমার নাম পরিমল।'

'এ্যাঁ! তাই তো—' কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল প্রলয়ের মুখটা। যেন ভয় পেল। পরিমলের সামনে থেকে সরে দাঁড়াল। বিড়বিড় করছিল সে। 'তাই তো, ঘরে গিয়ে আমার বোন বলল মানুষটাকে কোথাও সে দেখেছে—'

'আচ্ছা, তোমার বাবা কি—' পরিমল কিছু একটা বলতে চাইছিল। কিন্তু প্রলয় আর দাঁড়াল না। ঠক্ করে হ্যারিকেনটা মাটিতে নামিয়ে রেখে একটা চাপা আর্তনাদের সুর করে 'বাবা' 'বাবা' ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকে পড়ল। যেন ঘরের ভিতর আর্তনাদটা ছড়িয়ে পড়ল। পরিমল কান পেতে রইল। যেন সেখানে ক্রোধ বিস্ময় যন্ত্রণা ও আক্রোশের ছোটো ছোটো টুকরোগুলি হঠাৎ একত্র হয়ে গুঞ্জন ও কলরবের একটা ঝড় সৃষ্টি করল। এক মিনিট পর প্রলয় আবার ঘরের বাইরে ছুটে এল। দ্রুত শ্বাস ওঠা-নামার দরুণ তার বুক কাঁপছিল। পরিমল সেই কম্পন লক্ষ্য করল।

'আপনি বাবার কাছে কেন এসেছেন?' প্রলয় চিৎকার করে উঠল। কিন্তু তার চিৎকারের মধ্যে উত্তেজনার চেয়ে হতাশা ক্লান্তি অসহায়তা—এইগুলি যেন ফুটে উঠল বেশি।

পরিমল শান্ত গলায় হাসল।

'ক্ষমা চাইতে এসেছি।' বেশ জোর গলায় কথাটা বলল সে। হয়তো ঘরের মানুষগুলিও শুনল। প্রলয় আর কথা বলল না। হাঁ করে পরিমলের মুখের দিকে চেয়ে রইল। যেন মুহূর্তের মধ্যে ঘরের কলরব গুঞ্জনটা থেমে গেল। আবার সেই নিশুতির স্তব্ধতার কথা মনে পড়ল

পরিমলের। আকাশের তারাগুলি জ্বল জ্বল করছিল। মাথার ওপর নারিকেল ও তালপাতার সোঁ সোঁ শব্দ শোনা গেল।

'যাও, বাবাকে গিয়ে বল।' হয়তো প্রলয় বুদ্ধি ঠিক করতে পারছিল না, ভাবছিল, পরিমল তাকে সান্ত্বনা দিল উৎসাহ দিল। 'আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতেই এসেছি।'

মাথা নিচু করে প্রলয় ঘরে ফিরে গেল। সে আর এল না। বোনটি বেরিয়ে এল। হরিণের মতন সুন্দর চোখ তুলে নরম ভীরু গলায় পরিমলকে ডাকল।

'আপনি ভেতরে আসুন।' হ্যারিকেনটা তুলে ধরল মেয়েটি। পরিমল তার পিছনে চলল।

এতক্ষণ পর পরিমলের মনে হল, সে তার ঈপ্সিত তীর্থে এসে পৌঁছেছে। এখন মন্দিরে ঢুকছে। এবার সত্যি তার পাপস্খালন হবে। আর কোনো ভয় নেই।

শীর্ণ কঙ্কালসার মানুষটি বিছানায় আধশোয়া হয়ে উঠে বসেছেন।

পরিমল চিনতে পারল। অক্ষয়বাবু!

'আয় বাবা, আয়!' পরিমলকে দেখেই অক্ষয়বাবু দু হাত তুলে ডাকলেন। পরিমল তাঁর বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বিছানায় বসল না। হাঁটু গেড়ে মেঝের ওপর বসে অক্ষয়বাবুর পায়ে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

অক্ষয়বাবু তার মাথায় হাত রাখলেন। হাতটা থরথর করে কাঁপছিল। একটু সময় দুজনের কারোর মুখ দিয়ে কথা সরল না। প্রণাম সেরে পরিমল উঠে দাঁড়াল।

'বোস বাবা, আমার পাশে বোস।' অক্ষয়বাবুর হাত তখনও কাঁপছিল। সেই কাঁপা হাতেই তিনি বিছানার ময়লা জীর্ণ চাদরটা একটু টেনেটুনে সমান করে দিয়ে পরিমলকে বসতে বললেন, পরিমল বসল।

আবার অক্ষয়বাবু চুপ করে রইলেন। ঘরের দেওয়ালে দেখলেন। পরিমল মাথা গুঁজে বসে রইল। 'তোরা কোথায় গেলি সব—তোরা কি ঘরে আছিস!' অক্ষয়বাবু দেওয়াল থেকে চোখ নামিয়ে ঘরের এদিক ওদিক চোখ নামিয়ে ঘরের এদিকে ওদিকে চোখ ঘোরালেন। পরিমল বুঝতে পারল বৃদ্ধের দৃষ্টিশক্তি বলতে আজ আর কিছুই নেই। কেবল অনুভূতি, কেবল আন্দাজের উপর নির্ভর করে মানুষকে দেখেন, মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। পরিমল ঘরে ঢুকল অনুমান করতে পেরে তার সঙ্গে কথা বলেছেন, তাকে কাছে ডেকেছেন। এবার তিনি বাড়ির মানুষগুলিকে ডাকছেন। তারা ঘরেই ছিল। দরজার কাছে প্রলয় দাঁড়িয়ে। প্রলয়ের সামনে আট দশ বছরের একটি বালক দাঁড়িয়ে। তারও মলয়ের মুখের আদল। বোঝা গেল মলয়ের আর একটি ভাই। মেঝের এক কোণায় অক্ষয়বাবুর স্ত্রীর দাঁড়িয়ে। পরিমল এতক্ষণ দেখতে পায়নি। তিনিও কেমন জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেছেন। পরিমল উঠে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করল। তিনি কিছু বললেন না। অক্ষয়বাবুর মতন হাত বাড়িয়ে পরিমলের মাথাও স্পর্শ করলেন না, কেমন যেন কাঠের মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পুত্রহন্তাকে দেখলেন, তার প্রণাম গ্রহণ করলেন। পরিমল অক্ষয়বাবুর কাছে ফিরে এল। যেন অনুভূতির চোখ দিয়ে অক্ষয়বাবু এটাও দেখে ফেললেন। তাঁর মুখে একটা হাসির আভা ফুটল। তাঁর গলার স্বর গদগদ হয়ে উঠল।

'দেখ, তোমরা তাকিয়ে দেখ কত বড়ো মানুষের ছেলে আজ আমার কাছে ছুটে এসেছে—আমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে।' একটু চুপ করে তিনি পরিমলের দিকে মুখ ফেরালেন। 'বুঝলে পরিমল, আমি অনেকদিন কথাটা চিন্তা করেছি—ভেবে দেখেছি, না, তার তো কোনো দোষ নেই—তার অন্তরটা যে মহৎ—সে যে সোনার টুকরো ছেলে আমি চিরদিন জানতাম—উঁহু, এটা হল আমার ছেলের নিয়তি—তার পূর্বজন্মের কর্মফল—এভাবেই সে যেত, এতটা আয়ু নিয়ে সে এসেছিল—জগমোহন ডাক্তারের ছেলে পরিমল এখানে কী—কিছু না—একটা নিমিত্ত মাত্র, মলয়ের নিয়তি তাকে দিয়ে কাজটা করিয়েছে শুধু—কারোর মৃত্যুর জন্য কেউ কি দায়ী হতে পারে? পারে না।'

পরিমল মাথা গুঁজে রইল।

অক্ষয়বাবুর চোখ দিয়ে এবার জল গড়াতে লাগল।

'এ আমার সুখের অশ্রু পরিমল। আমার এক ছেলে গেছে—কিন্তু আর-এক ছেলে ফিরে এসেছে—আমার মন বলত সে আসবে, আসতেই হবে তাকে। আমি যে ছুটির দুপুরে তার সঙ্গে বসেই গল্প করতাম—আমার সুখদুঃখের কথাগুলো সে শুনত, কখনো সে সুখী হত, কখনো তার চোখ ছল ছল করে উঠত। সেই ছেলে কি একবার না এসে পারে? নিশ্চয় আসবে। ঠিক এল। এলি তো!' যেন শীর্ণ কম্পমান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে অক্ষয়বাবু পরিমলের হাত ধরতে চাইলেন। পরিমল নিজের হাত বাড়িয়ে দিল।

'কই রে মা বুলা, এদিকে আয়—' অক্ষয়বাবু মেয়েকে ডাকলেন। এতক্ষণ চৌকাঠের পাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রলয়ের বোন। বাবার ডাক শুনে কাছে আসতে অক্ষয়বাবু বললেন, 'তোর পরিমল-দাকে একটু চা করে দে।'

'না না, এত রাত্রে আমি চা খাব না।' পরিমল ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আমি অনেক চা খেয়েছি কাকাবাবু।' কিন্তু কাকাবাবুকে না দেখে পরিমল একজোড়া কালো গভীর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। বুলা। নামটা সুন্দর। ভাবল সে।

॥ ২৩ ॥

আরামপ্রিয় বিলাসী মানুষ গিরিজা। সুন্দর সাজানো গোছানো তার ঘর। বেশভূষার দিকে সতর্ক দৃষ্টি। নিজের বাসস্থান সম্পর্কে সে অতিমাত্রায় সচেতন। এখন আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে একলা আছে। বাড়িতেও সে একটু নিরিবিলি একলা থাকতেই ভালোবাসত। মানে, তার ঘরে কেউ না ঢুকুক, তার জিনিসপত্র টেবিল বিছানায় কেউ হাত না দিক, এমন কী বাড়ির মানুষ—মানুষ বলতে আর কে, একমাত্র ছেলে সে, ছোটো দুটি বোন আর মা—বাবা তো সারাক্ষণ ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত—তাঁর সঙ্গে কথা বলার মেলামেশা করার সুযোগ কম—মা ও বোনদের সঙ্গেও গিরিজা খুব একটা কথা বলা হৈ-চৈ করা পছন্দ করত না। যতক্ষণ বাড়িতে সর্বদা সে গম্ভীর রাসভারি। নিজেকে নিয়েই অতিমাত্রায় ব্যস্ত। জামা-কাপড় ধুয়ে এসেছে, সেগুলি বাক্সে তুলছে, যেগুলি ময়লা হয়েছে নিজের হাতে বেছে বেছে ড্রাইক্লিনিং-এ পাঠাচ্ছে। জুতো সাফ করছে, বিছানা ঝাড়ছে টেবিল গুছোচ্ছে, ঘর সাজাচ্ছে; অন্য কারোর কাজ তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। তাই খেতে বসে তার খুঁতখুঁতানির শেষ

নেই। কারণ এই জিনিসটা নিজের হাতে মনের মতন করে করা সম্ভব নয়। সকলের জন্য যা রান্না হবে তাই তাকে খেতে হবে, শুধু তাই না, থালা গেলাস বাটি—ঝি চাকরেরা যেভাবে ধুয়ে মেজে দিচ্ছে, টেবিল চেয়ার—সকলের সঙ্গে যেখানে বসে খাবে, যেভাবে সাজানো হচ্ছে পরিষ্কার করা হচ্ছে সবই তাকে মেনে নিতে হয়েছে—এখানে প্রতিবাদ চলে না—নিজের হাত লাগানো চলে না—কাজেই ঐ একটি জায়গায় গিরিজার গা রি-রি করত। চোখ বুজে কোনোরকমে আহার সেরে আবার নিজের ঘরে চলে এসেছে। সুতরাং খাবার টেবিলে, যেখানে সকলের একত্র হওয়ার সুযোগ, সেখানেও কারো সঙ্গে কথা বলার মেজাজ থাকত না তার। মা বোনেরা চিরকাল তাকে স্বার্থপর আত্মসুখী খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ বলে জেনে এসেছে। এটা তার বাড়ির জীবন। বাইরে বন্ধু মহলে কিন্তু গিরিজা হাসিখুশি দিলদরিয়া মানুষ। বন্ধুদের এভাবে সেভাবে সাহায্য করা, তাদের উপকার করা, দরকার হলে তাদের জন্য অর্থব্যয় করতেও সে কুণ্ঠিত না। কিন্তু মানুষের জীবনে বন্ধুরা কতটা সময় জুড়ে থাকে: আবার তাকে ব্যক্তিগত জীবনে ফিরে আসতে হয়। বাইরের পোশাক বদলাবার মতন। ঘরে ফিরে তাকে বিশ্রাম করতে হয়, তার দাড়ি কামানো আছে, স্নান আহার আছে, ঘুমানো আছে, এবং এসবের ফাঁকে ফাঁকে ব্যক্তিগত ভাবনা চিন্তা—তা ছাড়াও কত খুঁটিনাটি বিষয়। বৃষ্টির ছাট আসছে, জানালাটা বন্ধ করে দাও, শীত শীত করছে, পাখাটা কমিয়ে দাও, ভালো ঘুম হচ্ছে না, কানে ঘাড়ে একটু জল দিয়ে এসো—চেহারাটা ক'দিন ধরে খারাপ দেখাচ্ছে, ডাক্তারের পরামর্শ নাও, চিঠিপত্র লেখা, চুপ করে থাকা, কত কী নিয়ে মানুষ নিজের মধ্যে ব্যাপৃত ও সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। কিন্তু গিরিজা যেন একটু বেশি। নিজের দিকে তাকানো, নিজেকে নিয়ে ভাবা। তাই, তার আটাশ বছরের জীবনে বন্ধুবান্ধবদের জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করা ছাড়া বাকি সবটা সময় সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। এক কথায় গিরিজা নিজেকে দেখেছে, নিজেকেই সব চেয়ে বেশি ভালোবেসেছে। মা ও বোনদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেনি—বাবা মারা যাওয়ার পর কাকাদের সঙ্গে মিলেমিশে বাবার কাঠের ব্যবসা দেখতে গিয়ে সেখান থেকেও ঠোক্কর খেয়ে সরে এল। তাদের সঙ্গে বনিবনা হয়নি। এখন একলা চা-এর ব্যবসা করছে। এবং তার বহুদিনের বাসনা—সম্পূর্ণ একলা থাকা, আলাদা বাড়িতে থাকা, বসন্তবাবু বেঁচে থাকতে সেটা সম্ভব হয়নি—তিনি মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিরিজা এই ফ্ল্যাট ভাড়া করে এখানে বাস করছে।

হ্যাঁ, সারাজীবন সে নিজেকে ভালোবেসেছে, নিজের দিকে তাকিয়েছে—নিজেকে ভালোবেসে সেটুকু ভালোবাসা উদ্বৃত্ত থাকত সেটুকু বন্ধুদের বিলিয়েছে। পরিমল পরিতোষ এবং তার আরো দু-চারজন পুরুষ বন্ধু।

না, মেয়েদের প্রতি কোনোদিন আকর্ষণ বোধ করেনি সে। তার একটিও বান্ধবী ছিল না। হয়তো তার একটা প্রধান কারণ বাড়িতে সর্বদা মেয়েদের মধ্যে তাকে কাটাতে হয়েছে। চোখ ফেরাতেই মাকে দেখেছে, দুই বোনকে দেখেছে। দেখে সে খুশি হত কী বিরক্ত হত বলা মুশকিল—তবে সুযোগ পেলেই সে তাদের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। স্ত্রী জাতি সম্পর্কে পুরুষের একটা সহজাত কৌতূহল থাকে, যেন ক্রমাগত তিনটি স্ত্রী-মুখ দেখে দেখে তার কৌতূহলের ধার মজে গিয়েছিল। তাই প্রথম যৌবনে কোনো মেয়ের প্রেমে পড়তে

পারল না সে। তবে একটি জ্বলন্ত সুন্দর প্রেমের কাছাকাছি সে ছিল। পরিমল ও বিশাখার প্রেম চোখের ওপর দেখত। দেখে মুগ্ধ হত। এবং মনেপ্রাণে চাইত তাদের প্রেম স্থায়ী হোক সার্থক হোক। প্রেম সম্বন্ধে সেখানেই তার ভাবনা চিন্তার শেষ হয়ে যেত—এর বেশি আর কিছু সে ভাবত না।

তা ছাড়া সেদিন তার ধারণা ছিল, পরিমলের মতন নায়ক ও বিশাখার মতন নায়িকা যেখানে, একমাত্র সেখানেই প্রেমের রক্তকমল ফোটে। সেই প্রেমের কাছে অন্য একটি ছেলে ও মেয়ের প্রেম কিছু না। নিতান্তই খেলো ফিকে জিনিস, তার না আছে রঙের গরিমা, না আছে সৌরভের ঐশ্বর্য। প্রেম বলতে গিরিজা একটি প্রেমই চিনে রেখেছিল। তার সর্বদা মনে হত অন্য আর কারোর প্রেম করা প্রেমে পড়া অনধিকার চর্চার সামিল। কারণ তারা কেউ পরিমল হতে পারবে না এবং বিশাখার মতন নায়িকাও জুটবে না।

মলয় ও বিশাখার গোপন ভালোবাসার কথা গিরিজা জানত না, আজও জানে না। কেবল সে জানত, দুই বন্ধুর মধ্যে একটা সাধারণ জিনিস নিয়ে ঝগড়া এবং তাই থেকে দুর্ঘটনা সৃষ্টি—যার ফলে বিশাখা-পরিমলের প্রেমের স্রোত হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে গেল। এটাও একটা দুর্ঘটনা। একটা দুর্ঘটনা আর একটা দুর্ঘটনা টেনে আনল। এই জন্য গিরিজার আফসোসের শেষ ছিল না।

যাই হোক, সেদিন বিশাখা ও পরিমলের প্রেম তার চোখে ভয়ংকর পবিত্র—কথাটা চিন্তা করে গিরিজা আজও দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

কিন্তু তা হলেও দশ বছর আগের ফুল। বিষণ্ণ স্তিমিত নির্জীব চেহারাটাই গিরিজার এখন মনে পড়ে।

তার কারণ আছে।

একটা তাজা সদ্য ফোটা লাল গোলাপ গিরিজার বুকের ভিতর থরথর করে কাঁপছে।

আজ আটাশ বছর বয়সে সে প্রেমে পড়েছে।

এই জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। আশা করতে পারেনি এমন একটা বিস্ময়কর কাণ্ড তার মধ্যে ঘটবে।

যেন কোন দিক দিয়ে কী হয়ে গেল!

সাউথের মেয়েরা রবীন্দ্র জয়ন্তী করবে। দল বেঁধে তারা তার মিশন রোয়ের ফ্ল্যাটে চড়াও হয়েছিল। 'মোটা চাঁদা দিতে হবে গিরিজাদা', কলভাষিণীরা তাকে ছেঁকে ধরেছিল। 'বালিগঞ্জ থেকে পালিয়ে এসে এখানে বাস করছ—সুতরাং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই টাকাটা এবার তোমাকে না দিলে চলবে না।' চাঁদার বইয়ে টাকার অঙ্কটা তারা আগেই বসিয়ে রেখেছিল। দেখে গিরিজার চোখ গোল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মেয়েরা ছাড়বে না। গিরিজা সন্দেহ করছিল তার দুই বোন যূথিকা মল্লিকাও দলে আছে। বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে বলে আক্রোশের বশবর্তী হয়ে যেন ভাইকে একটু ভালোরকম শিক্ষা দিতে বালিগঞ্জ-টালিগঞ্জের মেয়েদের ফুসলিয়ে বোনেরা তার ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দিয়েছিল। অন্তত তখন গিরিজার তাই মনে হয়েছিল। তার নূতন ঠিকানা তো আর কারোর জানা ছিল না। তা না হলে ঠিক রাস্তাটা খুঁজে বার করে বাড়ির নম্বর মিলিয়ে পিলপিল করে এই বিশাল নারী সেনাবাহিনী কী করে

তার তিনতলার ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ল। বোনেদের ওপর গিরিজা মনে মনে রাগ করেছিল। আজ কথাটা মনে হলে তার হাসি পায়। সেদিন যূথিকা মল্লিকার সেরকম কোনো দুরভিসন্ধি থাক না থাক, ঐ চাঁদার বইয়ের ভিতর দিয়ে যে কন্দর্পদেব গিরিজার কঠিন শুষ্ক বুকে শর নিক্ষেপ করার তোড়জোড় করছিলেন গিরিজা এখন বেশ বুঝতে পারে। কেননা টাকার অঙ্ক দেখে সে চোখ বড়ো করেছিল বটে, আবার সঙ্গে সঙ্গে মনিব্যাগ খুলে টাকাটা তো বারও করে দিয়েছিল; মোটা চাঁদা আদায় করে মেয়েরা ক্ষান্ত থাকল না—পরদিন, যেন গিরিজার বদান্যতায় মুগ্ধ হয়েই তারা তাকে তাদের অনুষ্ঠানে 'প্রধান অতিথি'র আসন অলঙ্কৃত করার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। গিরিজা মনে মনে হেসেছিল। যেন পাল্টা 'ক্ষতিপূরণ' হিসাবে মেয়েরা তাকে এই সম্মানটুকু দিয়ে গেল। তা হলেও, কোনোদিন যা সে করে না, মেয়েদের এই ধরনের সভা সম্মেলন নাচগানের আসর সম্পর্কে সে চিরদিন উদাসীন, প্রধান অতিথি সেজে বালিগঞ্জের সেই ফাংশনে গিরিজা কেন জানি উপস্থিত না থেকে পারল না। যেন একটা অদৃশ্য শক্তি তাকে সেখানে টেনে নিয়ে গেল। তাই। অদৃশ্য কামদেব ভালো ভাবেই তাকে ঘায়েল করার মতলব আঁটছিলেন।

হ্যাঁ, সেই মেয়েটি। চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় যে অনবদ্য অভিনয় করল। কে এই মেয়ে, কোথাকার মেয়ে। গিরিজা প্রথমটায় চিনতে পারেনি। তারপর চিনল। তাদের রিচি রোডের নীলাদ্রি চ্যাটার্জির মেয়ে রীণা। কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল গিরিজা। এত কাছের মেয়ে, এত জানাশোনা—অথচ কত নূতন লাগছে, আশ্চর্য সুন্দর মনে হচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে রোজ যাকে দেখে আসছে। অভিনয় শেষ হল, আসর ভাঙল। তৃতীয় পাণ্ডবের চিত্ত জয় করে হৃষ্টমনে চিত্রাঙ্গদা গ্রিনরুমে ঢুকে তোয়ালে সাবান দিয়ে মুখের রং তুলছিল—অর্জুনের সাজ পোশাক খুলে ফেলে যূথিকাও যেন তৎক্ষণে বাড়ি ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু একজন আটকে গেল। যেন কিছুতেই ভাঙা আসর ছেড়ে নড়তে পারছিল না। প্রধান অতিথি হিসাবে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীকে তার ধন্যবাদ জানানো হয়নি। রীণার জন্য অপেক্ষা করছিল গিরিজা।

সামান্য একটা কথাই সে বলতে পেরেছিল সেদিন। কেননা মিসেস চ্যাটার্জি মেয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

তা হলেও ঐ একটি কথার মধ্য দিয়েই গিরিজা যেন অনেক কথা রীণাকে বলেছিল। অথবা তার মন তার হৃদয় যে অনেক কিছু বলবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে রীণাকে সে তা বুঝতে দিয়েছিল বইকি। 'তুমি এত ভালো অভিনয় করতে পার রীণা!'

রীণা কথা না বলে অল্প একটু হেসে গিরিজার দিকে তাকিয়েছিল শুধু। কথা বলেছিলেন মিসেস চ্যাটার্জি। মেয়ের প্রশংসা শুনে খুশি হয়ে অল্প একটু সময়ের মধ্যে অনেক কিছু তিনি গিরিজাকে শুনিয়েছিলেন। মাত্র ক'দিনের রিহার্সেল। তাও তো সব মেয়ে সবদিন উপস্থিত থাকত না। এদিকে আলোটালোর ব্যবস্থাও তেমন ভালো করে করা গেল না, স্টেজ সাজাবার ভার ছিল যার ওপর—ইত্যাদি ইত্যাদি।

গিরিজা কতটা শুনেছিল বা সেদিকে মন দিতে পেরেছিল, মিসেস চ্যাটার্জির তা জানবার কথা নয়, হয়তো রীণা বুঝতে পেরেছিল। যূথিকা-মল্লিকার দাদাকে ছেলেবেলা থেকে সে

দেখে আসছিল সত্য। কিন্তু সেদিন গিরিজা যে একটা বিশেষ চোখ দিয়ে তাকে দেখেছিল রীণা তা বুঝতে পেরেছিল।

বাড়ি ফেরার পথে সারাক্ষণ গিরিজার বুকের ভিতর একটা কবিতার লাইন গুণগুণ করে উঠছিল : Take all my loves, my love, yea, take them all না, কেবল এই একটা না, আর একটা কবিতা তার হৃৎপিণ্ডের রক্তে গুঞ্জন তুলছিল। কবে কোথায় এসব পড়েছিল তার মনে নাই, কিন্তু তা হলে হবে কী, সেদিন সেই বিশেষ মুহূর্তে সুন্দর কথাগুলি তার মনে পড়েছিল।

Live with me, and be my love

গিরিজা প্রেমে পড়ল, 'প্রেম' শব্দটার অর্থ এতদিন তার কাছে অস্পষ্ট ছিল, হেঁয়ালির মতন ঠেকত—কিন্তু সেদিন সে বুঝতে পারল, পরিমল না হয়েও প্রেমিক হওয়া যায়, প্রেমে পড়ার জন্য বিশাখার দরকার পড়ে না।

বরং বিশাখার চেয়ে রীণাকেই গিরিজা বেশি সুন্দর দেখছিল। তার নাক ভুরু ঠোঁট শরীরের গঠন—সব কিছু খুঁটিয়ে বিচার করে গিরিজার মনে হতে লাগল, বিশাখার মধ্যে লাবণ্যের মাত্রাটা বেশি, সেই সঙ্গে একটা আবেগের স্থূলতা, একটা লাস্যের হাই তোলা ভাব মিশে তার রূপকে কেমন যেন মন্থর ঢিলেঢালা করে রেখেছে, একদিন রাখত, আজ অবশ্য আর তার সেই রূপ নাই। কিন্তু ছোটো বোন রীণার চোখে মুখে, তাকানোয়, শরীরের গতি-ভঙ্গিমায় একটা পরিচ্ছন্ন মননের দীপ্তি ঝলসে ঝলসে উঠছে। যে দীপ্তি যে পরিচ্ছন্নতা সন্ধ্যাতারার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়—লাবণ্য ঢলঢল চাঁদের মধ্যে যে জিনিস নেই। অথচ লোকে কথায় বলে, চাঁদপানা মুখ। এমন উপমা রীণাকে দিতে গিরিজার ইচ্ছা হয় না। পূর্ণিমার চাঁদের আলোর জোয়ার নিয়ে বিশাখা একদিন পরিমলকে ভাসিয়ে দিতে পেরেছিল, কিন্তু রীণা কাউকে ভাসিয়ে দেবে না, আচ্ছন্ন করবে না। ভোরের আলোর চমক হয়ে সে মানুষের সামনে এসে দাঁড়াবে। প্রথমটায় তাকে বিস্মিত চকিত করে তুলবে, তারপর মুগ্ধ করবে। রীণার সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে চোখ মন দুটোরই দরকার।

গিরিজার হৃদয়-মন্দিরে সেই ছিপছিপে গৌরী বুদ্ধি-উজ্জ্বল মেয়ের নীরব আরাধনা চলল। বালিগঞ্জে তার আনাগোনা বেড়ে গেল। ভিন্ন পাড়ায় আলাদা ফ্ল্যাটে চলে গেছে, আবার ছেলের ঘনঘন বাড়ি আসা কেন মা বুঝল না। যূথিকা মল্লিকা বুঝল। সেই ফাংশনের রাত্রেই তারা বুঝে গিয়েছিল চিত্রাঙ্গদাবেশিনী রীণা সত্যি অর্জুনকে ঘায়েল করতে পেরেছে।

তারপর অবশ্য আপনা থেকে সুযোগ এল।

বিশাখার ব্যাপার নিয়ে বারবার রীণাকে গিরিজার কাছে আসতে হয়েছে।

তাই তো, সব জেনেশুনে গিরিজা বুঝতে পারছিল, এখানে রীণার কষ্টটাই বেশি। ঝোঁকের মাথায় একজন জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে—কিন্তু শুধু খেলা নিয়ে খেয়াল নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না, তার আহার চাই বাসস্থান চাই—জামাকাপড়, অসুস্থ হয়ে পড়েছে বিশাখা, ওষুধপথ্য সেবাশুশ্রূষা—সব কিছুরই তার দরকার এবং একলা হাতে রীণাকে সব সামাল দিতে হচ্ছে। কিন্তু কতদিন এভাবে চলে! খরচটা এখানে সব নয়, মানসিক রোগগ্রস্তা বিশাখাকে নিয়ে উদ্বেগ অশান্তি কত!

তাই গিরিজা চেষ্টা করছে, ছুটোছুটি করছে, যদি বলে কয়ে বুঝিয়ে পরিমলকে একবার বিশাখার সামনে এনে দাঁড় করানো যেত। যদি তাদের পুরোনো ভগ্ন জীর্ণ প্রেম আবার জোড়া লাগে। হয়তো বিশাখা সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে—রীণার তাই ধারণা. তার চেয়েও বড়ো কথা রীণা বেঁচে যায়।

রীণার কষ্ট লাঘবের জন্যই গিরিজার এই পরিশ্রম।

তা না হলে দশ বছর আগের একটা বাসি প্রেমের ওপর গিরিজার যে খুব শ্রদ্ধা বিশ্বাস আছে এমন নয়। কাল পরিমলের সঙ্গে দেখা হতে মুখে অনেক কিছুই গিরিজাকে বলতে হয়েছিল। তার কথার মধ্যে উচ্ছ্বাসের মধ্যে যথেষ্ট কৃত্রিমতা ছিল। পরিমলকে দেখে সে খুশি হয়েছিল, লর্ড লর্ড বলে চিৎকার করছিল, লর্ড কত আধুনিক ছিল কত বড়ো প্রেমিক ছিল তাই নিয়ে লম্বা বক্তৃতা করেছে গিরিজা, কিন্তু আসলে মনে মনে জেলফেরত এই মানুষটিকে সে অনুকম্পাই করছিল। গিরিজা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, পরিমল আর সেই পরিমল নেই, তার দীপ্তি নষ্ট হয়ে গেছে, তার কথা হাসি তাকানোর মধ্যে কেমন একটা স্থূলতা প্রকাশ পাচ্ছিল, আগের সেই উইট্ হিউমার কিছুই নেই। চেহারার মধ্যে একটা বুদ্ধিহীনতার ছাপ। দেখলে হঠাৎ মনে হয় নিতান্তই গোবেচারা বোকাসোকা ভালোমানুষটি হয়ে গেছে। এখন জেল থেকে সে ভালো হয়ে বেরিয়েছে কী মন্দ হয়ে বেরিয়েছে বলা মুশকিল। যদি ভালোও হয় তো ভালো হওয়ার মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য থাকবে না, হয়তো জগমোহন আজ বললে কালই সে একটা কেরানির কাজটাজ নিয়ে কোনো অফিসে ঢুকে পড়বে এবং জগমোহনের নির্দেশ মতন অচিরেই একটি মেয়েকে বিয়ে করে পূর্ণ উদ্যমে সন্তান উৎপাদনের কাজে লেগে যাবে। হ্যাঁ, পরিমল তখন ষোল আনা সংসারী। কোথায় ভেসে গেল তার প্রেম প্যাশন স্বপ্ন সৌন্দর্যবোধ। যেমন হয়েছে পরিতোষের অবস্থা। তা হলেও, ষোল আনা পারিবারিক হয়ে গিয়েও পরিতোষের মধ্যে একটা জিনিস বেঁচে আছে। অ্যাম্বিশান। হ্যাঁ, কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করার উচ্চাভিলাষ, তার মানে আরও অধিক অর্থ উপার্জনের নেশা। এটা মন্দ না। কিন্তু পরিমলের মধ্যে যে তাও থাকবে না। কেরানির আবার অ্যাম্বিশান কী! উঃ, যদি পরিমল তাই হয়? পরিমলের এই শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করে গিরিজার কষ্ট হচ্ছিল। আজ সে মনে কষ্ট পাচ্ছে, একদিনে তাদের লর্ডের এমন দশা হয়েছে দেখলে গিরিজা এবং পরিমলের আর পাঁচটি ভক্ত শিষ্য আত্মহত্যা করত সন্দেহ কি।

হ্যাঁ, এটা তার ভালো হওয়ার দিক।

যদি এতকাল কুসংসর্গে থেকে পরিমলের চরিত্রের অবনতি ঘটে থাকে, আজ অথবা কাল কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত হয় তো তার মধ্যে একটা হাস্যকর নির্বুদ্ধিতা, স্টুপিডিটি প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ মন্দ হয়ে—দুশ্চরিত্রের মানুষ হয়েও সে ডেভিল হতে শিখল না, ইডিয়ট হয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এল। তার চেহারা দেখে কাল বার বার গিরিজা কথাটা চিন্তা করেছে।

সে যাই হোক, এত কথা বলা সত্ত্বেও পরিমল কাল বিশাখাকে দেখতে যায়নি এবং আজ সকালেও যায়নি। এই মাত্র রীণা কলেজে যাবার পথে গিরিজাকে খবর দিয়ে গেল।

পরিমলের সঙ্গে গিরিজার দেখা হয়েছে, পরিমল আসবে কথা দিয়েছে, কাল রীণার মুখে

কথাটা শুনে বিশাখার ফ্যাকাশে মুখখানা নাকি চমৎকার লাল হয়ে উঠেছিল। বিছানায় বসে বসে আরসী সামনে নিয়ে অনেকদিন পর চুলটুল বেঁধেছিল, কাজল পরেছিল, মুখে একটু স্নো পাউডার বুলিয়েছিল, এবং গত একমাসের মধ্যে যা করে না, ভালো শাড়ি-ব্লাউজ পরবে কী—পরতে দিলে সেগুলি দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফালা ফালা করেছে, কাজেই রীণা দামি শাড়ি ব্লাউজগুলি বাক্সে তুলে রেখেছিল—কিন্তু কাল নিজে থেকেই রীণাকে বলে বিশাখা বাক্স থেকে একটা চাঁপা রঙের মুর্শিদাবাদী শাড়ি বার করে পরেছিল। সেজেগুজে অনেকক্ষণ জানালায় বসে রইল। তারপর যত রাত হতে লাগল মেজাজ খারাপ করতে লাগল, আবার দাঁত দিয়ে কামড়ে পরনের শাড়িখানা ছিঁড়ল, আয়না চিরুনি স্নো পাউডারের কৌটো হাতের কাছে ছিল—সেগুলি মেঝেয় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলল। কাল অনেক রাত পর্যন্ত রীণাকে জেগে থাকতে হয়েছিল। অসম্ভব বাড়াবাড়ি করেছে বিশাখা। আজ সকালেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। আজ ঘুম থেকে উঠেই নাকি রীণাকে ব্লাফার মিথ্যুক ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করেছে—অর্থাৎ রীণা কাল যা বলেছিল সব মিথ্যা। বিশাখাকে ভুলিয়ে রাখতে গিরিজার সঙ্গে পরামর্শ করে রীণা এই ধরনের কতগুলি কথা আবিষ্কার করেছে। পরিমল জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে, পরিমল এ-বাড়ি আসবে। আসলে পরিমল এখন জেলেই পচছে। হয়তো সে সেখানেই মরে গেছে। কোনোদিন আর আসবে না। রীণাকে বেশ কিছুক্ষণ গালিগালাজ করার পর বালিশে মুখ ঢেকে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছে।

বীণাকে বাসে তুলে দিতে গিরিজা নীচে নেমেছিল।

ফিরে এসে দাড়ি কামাতে বসে সে চিন্তা করছিল, কী করা যায়!

॥ ২৪ ॥

'হ্যালো—'

'পরিতোষ কথা বলছি। গিরিজা?'

'হ্যাঁ, কী খবর?'

'কই, কাল সারাদিন তো তোমার দেখা পেলাম না।'

'সকালে আমি তোমার বাড়ি গিয়েছিলাম। তখন তুমি বেরিয়ে গেছ। কেন, তোমার স্ত্রী বলেনি?'

'হ্যাঁ, তা সকালে এসেছিলে শুনলাম—বিকালে এলে না কেন? তোমার সঙ্গে কথা ছিল।'

'পারলাম না ভাই, একটা কাজে আটকে গেলাম।' গিরিজা একটু চুপ থাকল, তারপর বলল, 'লর্ড তোমায় কিছু বলেছে?'

'লর্ড! দাদা!' পরিতোষ ঈষৎ চমকে উঠল। 'কেন, তোমার সঙ্গে কি দেখা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, কেন, তোমায় কিছুই বলেনি?'

'না'—পরিতোষের গলার স্বর গম্ভীর হয়ে উঠল। 'আমায় কিছু বলেনি। বাড়ির কাউকে বলেনি। কাল ধরতে গেলে প্রায় সারাদিন বাইরে বাইরে ছিল। রাত্রেও অনেকক্ষণ বাইরে ছিল। যখন বাড়ি ফিরল রাত দশটা।'

'তাই নাকি?' গিরিজা একটু বিস্মিত হল। 'আমার সঙ্গে তো সেই সকালে

দেখা। তোমাদের বাড়ি থেকে ফিরছিলাম। রাস্তায় তোমাদের ঐ মোড়ের কাছেই দেখা হয়ে গেল।'

'আচ্ছা!' পরিতোষের গলার স্বরে উৎসাহ জাগল। 'কী বলল? দেখেই তোমায় চিনতে পেরেছিল নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, তা পেরেছিল বইকি—সঙ্গে সঙ্গে হাত চেপে ধরল।'

'তা তো ধরবেই। এককালে তুমি তার প্রধান ভক্ত ছিলে। তারপর? কতক্ষণ ছিলে দুজন? তুমি তোমার আস্তানায় ধরে নিয়ে গেলে বুঝি লর্ডকে?'

'না', গিরিজা হাসল। 'সে এক মজা—একটা ট্যাক্সি করে দুজনে সোজা চলে গেলাম আমাদের পুরোনো আড্ডার জায়গায়—তা আড্ডা তো কবে মরে হেজে ভূত—তা হলেও কেন জানি ইচ্ছা হল দুজন এক সঙ্গে বসে কফি খাব।'

'কফি হাউসে গিয়েছিলে! মজা তো! কতক্ষণ ছিলে—কী কথা হল দুজনের?'

'না, সেদিকে বেশ একটু নিরাশই হয়েছি—একটা খুব কথাটথা বলল না। সবাইকে প্রায় ভুলেই গেছে। পুরোনো বন্ধুদের দু-একজনের কথা বললাম, চুপ করে শুনল, একটু হুঁ হাঁ করল—এই পর্যন্ত—তেমন একটা উৎসাহ দেখলাম না কারো সম্বন্ধে কিছু জানতে।'

'অনেকদিন হয়ে গেল তো—ছিল একটা অন্য ওয়ার্লডে—তোমাকে সেদিন বলেছি, খুবই বদলে গেছে, তোমার লর্ড। তা জেলের কথা-টথা কিছু বলল? কী খেতে দিত, কী পরত, সারাদিন কী করে সময় কাটত?'

'না, সেসব কিছুই বলল না, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—কিন্তু ঐ হুঁ হাঁ করে এক-আধটা প্রশ্নের জবাব দিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিলাম আমরা সেখানে—বেশির ভাগ সময় পরিমল চুপ করে ছিল—গম্ভীর হয়ে ছিল।'

'হ্যাঁ, তোমায় বলেছি, অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে গেছে মানুষটা। বাড়িতে কারোর সঙ্গে তেমন কথাটথা—'

গিরিজা বাধা দিল। ক্ষুব্ধ আহত গলায় বলল, 'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু এতকাল পর আমার সঙ্গে দেখা, তোমায় একবার বলল না, খুব অবাক লাগছে কিন্তু।'

'আচ্ছা, শোন, তোমার মামা অক্ষয়বাবু তা হলে এখনো বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ, কেন বল তো!' গিরিজা বিস্মিত হল। পরিতোষের মুখে এই নাম বহুকাল শোনেনি সে। এই ক'বছর কত বিষয় নিয়ে পরিতোষের সঙ্গে তার আলোচনা হয়েছে, জগমোহনের সঙ্গেও গিরিজার কত কথা হয়, কিন্তু পরিতোষ বা পরিতোষের বাবা কোনোদিন ভুলক্রমেও অক্ষয় উকিল সম্বন্ধে গিরিজাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করত না। বেশ সতর্কতার সঙ্গে তারা ঐ নামটা বর্জন করে চলত। স্বাভাবিক। গিরিজা মাঝে মাঝে চিন্তা করেছে। পরিমল এখনও জেলে। সুতরাং অক্ষয় উকিলের ওপর তাদের আক্রোশ ও বিদ্বেষ পুরোপুরি বজায় ছিল। গিরিজাও তার মামা বা মামার পরিবার সম্পর্কে কোনদিন কোন কথা এদের কাছে বলত না। দরকার পড়ত না। 'বেঁচে আছেন; তবে—' পরিতোষের প্রশ্নের উত্তরে গিরিজা শান্ত গলায় বলল, 'খুব নরম হয়ে পড়েছেন। বাতে এখন একরকম শয্যাশায়ী।'

'হ্যাঁ, তাই শুনলাম। কাল তোমার লর্ড তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছে।'

'পরিমল! পরিমল কাল বালিগঞ্জ গিয়েছিল? সে কী? মামা তো আগের ঠিকানায় থাকেন না—ঠিকানাই বা সে পেল কার কাছে?' কী মনে করে গিরিজা হেসে ফেলল।

'হ্যাঁ, তা-ও বলেছে লর্ড। অক্ষয়বাবুরা এখন ওদিকের একটা বস্তিতে উঠে গেছেন। একে ওকে জিজ্ঞেস করে বাড়িটা খুঁজে বার করতে হয়েছিল।'

'তা তো হবেই, রাস্তাঘাটও অনেক বদলে গেছে। কিন্তু—কিন্তু—' গিরিজা ইতস্তত করতে লাগল। যেন তারপর কী প্রশ্ন করা যায় ঠিক করতে পারছিল না। 'জেল থেকে বেরিয়ে এসেই প্রথম ও বাড়ি ছুটে গেল—'

'হুঁ', এবার পরিতোষ হাসল। 'ক্ষমা চাইতে গিয়েছিল অক্ষয়বাবুর কাছে। অক্ষয়বাবু ক্ষমা করেছেন পরিমলকে। বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।'

গিরিজা স্তব্ধ হয়ে রইল।

'খুব কষ্টে আছেন তিনি। লর্ড বলল, দিন চলছে না, এমন। মলয়ের ছোটো ভাই, ঝণ্টু না কি যেন নাম ছিল, আমি ভাই চেহারাটা একদম ভুলে গেছি, তা ছাড়া ওবাড়ি আমার যাওয়া-আসা কম ছিল। তুমি যেতে, তোমার তো মামাবাড়িই—তোমার সঙ্গে পরিমল খুব যেত। সেই ঝণ্টুই এখন সংসার চালাচ্ছে। সকালে খবর কাগজ ফেরি করে, দুপুরেও নাকি এদিক ওদিক ঘুরে টুকিটাকি অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করে, খাটুনির অনুপাতে রোজগার সামান্যই—আরো অসুবিধা হয়েছে, একটা হাত নেই। কবে নাকি বাস থেকে পড়ে গিয়েছিল। হাতল ধরে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছিল। গাড়ির ঝাঁকুনি লেগে পড়ে যায়—হাতে চোট লাগে, তারপর হাতটা কেটে বাদ দিতে হয়। লেখাপড়া অবশ্য এমনিও হত না, স্কুলের মাইনে চালাতে পারছিলেন না অক্ষয়বাবু, তার ওপর দুবার এক ক্লাসে ফেল করেছিল—তারপর আর ঝণ্টুর পড়া হয়নি। মেয়েটি বড়ো হয়েছে। মলয়ের একটি ছোটো বোন ছিল, তাই না গিরিজা?'

'হ্যাঁ বুলা। তুমি যখন দেখেছিলে খুব ছোটো ছিল, সাত-আট বছরের ছিল।'

'আমার একদম মনে নেই। আজ সকালে লর্ডের মুখে শুনলাম। খুব মিষ্টি ঠাণ্ডা চেহারা মেয়েটির। তেমনি শান্ত নম্র স্বভাব। খুব প্রশংসা করছিল পরিমল।'

'যাক গে, ক্ষমা চেয়ে এসেছে খুব ভালো করেছে, আমি খুশি হয়েছি—' গিরিজা হঠাৎ ক্লান্তিবোধ করছিল। টেলিফোনে এতটা সময় কথা বলা কথা শোনা কোনোদিন তার ধাতে সয় না। কানের ভিতরটা কীরকম দুব্‌দুব্ করছিল। মাথা ধরে গিয়েছিল। 'তুমি কি আজ বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে আমার এখানে আসবে? হ্যাঁ, আমার ফ্ল্যাটে—দোকান থেকে আমি দুটোর আগেই পালাব।'

'কেন, তোমার শরীর খারাপ নাকি।'

'না, এমনি একটু কাজ আছে—আচ্ছা, আমি না হয় তোমার কাছে যাব। তোমার বাড়ি ফিরতে কটা হবে আন্দাজ?'

'আমি সাড়ে সাতটার মধ্যে ফিরব।'

'তাই ভালো, আমি যাব তোমার বাড়ি—ছেড়ে দি এখন?'

'এক সেকেণ্ড, আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস তোমায় বলা হয়নি। কাল অক্ষয়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে লর্ড—'

গিরিজা প্রমাদ গণল। প্রসঙ্গটা কি পরিতোষ শেষ করতে চাইছে না! তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ছিল। ওদিকে পরিতোষ বলে চলল, অক্ষয়বাবুর সংসারের দারিদ্র্য চেহারা দেখে পরিমলের চোখ ছলছল করে উঠেছিল। প্রত্যেকের পরনে ময়লা ছেঁড়া কাপড়, বিছানাপাটির সেই দশা, রং চটা কিছু কলাই করা বাসনকোসন ছাড়া এক ফোঁটা তামা-কাঁসা পরিমলের চোখে পড়ল না। পরিমলের হাতখরচের জন্য তার মনিব্যাগে পরিতোষ ক'টা টাকা রেখে দিয়েছিল। সেই টাকা থেকে পরিমল দুখানা দশ টাকার নোট কাল অক্ষয়বাবুর হাতে গুঁজে দিয়ে এসেছে।

'তোমার বাবা কি শুনেছেন এসব?' গিরিজা প্রশ্ন করল।

'না, বাবাকে বলা হয়নি। বাবা সকালে উঠে চেম্বারে চলে গেলেন। আমার উঠতে আজ আবার একটু বেলা হল। এই তো, যখন বেরিয়ে আসি তখন লর্ড সব বলল। প্রথমদিন বাড়ি থেকে বেরিয়েই এত রাত করে লর্ড বাড়ি ফিরছিল বলে বাবা কাল রাগারাগি করছিলেন, দুশ্চিন্তাও করছিলেন খুব।'

'তারপর?' রাত্রে তিনি কিছু বললেন না বড়োছেলেকে? সারাদিন কোথায় ছিল, কার কাছে গিয়েছিল?'

'না, তার আগেই তিনি শুয়ে পড়েছিলেন। তাঁর তো সব ঘড়ি-ধরা কাজ।'

'আচ্ছা, এখন ছেড়ে দিচ্ছি, সন্ধ্যার পর তোমার ওখানে—' আধখানা কথা মুখে রেখেই গিরিজা হাত থেকে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল। আবার না পরিতোষ নূতন করে বকতে আরম্ভ করে।

জগমোহন কথাটা শুনলেন। রমলা বলল। শ্বশুরকে কফি দিতে এসেছিল সে। পুত্রবধূর মুখের দিকে একটু সময় চুপ করে চেয়ে থেকে তিনি কী যেন ভাবলেন। তারপর হাসলেন। খুশি হয়েছেন তিনি বোঝা গেল। যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

'যাক গে, এটা মন্দ না, আমি আরো ভাবলাম, কী জানি আবার কোনো আড্ডার সন্ধানে শ্রীমান বুঝি হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিয়েছে।'

তাঁর কফি শেষ হয়ে গিয়েছিল। শূন্য পেয়ালাটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে তিনি তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছলেন।

'আমার মাথায় কিন্তু এটা আসেনি বউমা।' জগমোহন এবার রীতিমতো শব্দ করে হাসলেন। 'সে যে অক্ষয় উকিলের কাছে ক্ষমা চাইতে ছুটে যাবে—স্ট্রেঞ্জ, সত্যি অদ্ভুত লাগছে শুনে!'

রমলার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আমি গোড়া থেকেই সেরকম কিছু ধরে রেখেছিলাম—তাঁর ভেতর সুন্দর কিছু মহৎ কিছু একটা আছে—আমরা ঠিক ধরতে পারছিলাম না, বুঝতে পারছিলাম না।'

মুখের হাসি ধরে রেখে জগমোহন আরাম কেদারায় পিঠ এলিয়ে দিলেন।

'তুমি একটু বেশি সেন্টিমেন্টাল বউমা—মেয়েরা অবশ্য তাই হয়—একেবারে মহৎ-টহতের মধ্যে চলে যাচ্ছ, তবে হ্যাঁ, আমার বড়ো ছেলে সর্বদাই একটু খেয়ালি টাইপের,

প্রকৃতিটা অন্যরকম। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই পুরোনো সঙ্গী সাথিদের কথা মনে পড়ে গেল, আর সেই সঙ্গে অক্ষয় উকিলের ছেলেকেও মনে পড়ল। নিশ্চয় তার মনে অনুতাপ হচ্ছিল দুদিন ধরে। নিজের অপরাধটা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না, তাই তাড়াতাড়ি ছুটে গেছে বুড়োর কাছে ক্ষমা চাইতে। আমি বলব কতকটা ঝোঁকের মাথায়, খেয়ালের বশবর্তী হয়েই সে কাল সেখানে গিয়েছিল। এমন তো হতে পারত, উকিল কিছুতেই তাকে ক্ষমা করল না, বাড়িতে পর্যন্ত ঢুকতে দিল না, বরং উল্টে খুনীটুনি বলে চেঁচিয়ে উঠে পাড়ার মানুষ জড়ো করে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। কেমন তাই না?'

রমলা চুপ করে রইল।

'যাক গে, ক্ষমা চেয়ে এসেছে ভালো করেছে—এবং উকিলমশাই যে আর উচ্চবাচ্য না করে তোমার ভাশুরকে ক্ষমা করতে পেরেছেন এটাও কম কথা না। এখন আমি ভাবছি, যদি পরিমল এই অনুতাপ অনুশোচনা সর্বদা মনে রেখে চলে, অতীতের দুষ্কর্মের পরিণতিটা চিন্তা করে সেভাবে ভবিষ্যতে সাবধানে বন্ধুবান্ধবীর সঙ্গ বর্জন করে কী করে দুটো পয়সা উপার্জন করা যায় সেদিকে মনোযাগী হয় তবে আর ভয়ের কোনো কারণই থাকে না।'

জগমোহন চুপ করলেন।

হঠাৎ একটা হাসির শব্দ তাঁর কানে এল। একটা গলা নয়। একটু কান পেতে থেকে তিনি বুঝলেন দুজন হাসছে, একসঙ্গে হাসছে। শিশুর তরল উচ্ছল হাসির সঙ্গে বয়স্ক মানুষের ভারি মন্থর গলার হাসির চমৎকার মিশে গেছে।

'কী ব্যাপার!' জগমোহন রমলার মুখের দিকে তাকান।

'জেঠুমণির সঙ্গে দীপু ক্যারাম খেলছে। ভীষণ ভাব হয়েছে দুজনের।' রমলা মৃদু হাসল।

'হুঁ, তাই তো দেখছি। খুব ভালো খেলার সাথি পেয়ে গেছে আমার দাদু। তাই আজ সকালেও তাকে দেখিনি—এবেলাও একবার এদিকে এল না।'

'সকালে ছাদে উঠে দুজনে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। দীপুর জন্য তার জেঠু একটা প্রকাণ্ড পুতুল আর সেই সঙ্গে ঘুড়ি লাটাই সুতো সব কিনে এনেছে।'

জগমোহন একটা লম্বা নিশ্বাস ফেললেন।

'ছেলেবেলায় পরিমলের ঘুড়ি ওড়াবার ভয়ংকর নেশা ছিল। আমি কি কম পয়সা দিয়েছি ওকে লাটাই সুতো আর ঘুড়ির জন্যে।'

'আজ ভাইপোকে সেই নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে।' রমলার চাপা হাসির মধ্যে একটা কৌতুকের ঢেউ জাগল।

জগমোহন হঠাৎ কথা বললেন না।

'সুকু ঠাকুরপোকেও দেখেছি দীপুর সঙ্গে মিলেমিশে খেলা করতে। ঠাকুরপো বাড়ি এলেই তো দীপু তার প্রধান সাথি হয়ে দাঁড়ায়। এক পুজো-আচ্চাব সময়টুকু ছাড়া সারাক্ষণ দীপুকে নিয়ে বাগানে ঘুরছে ছাদে উঠছে, একতলার বারান্দার ছায়ায় বসে গল্প করছে। আমি তো দেখে হেসে বাঁচিনে। গল্প করার চমৎকর সঙ্গী জুটিয়েছে বলে ঠাকুরপোকে সময় সময় ঠাট্টা করি—কিন্তু আমার ঠাট্টা গায়ে মাখতে তার বয়ে গেছে। বরং উল্টে আমাকে বুঝিয়ে দেয়,

যতক্ষণ একটি শিশুর কাছে থাকি মনে হয় আমি নন্দনকাননের একটি মন্দার কী পারিজাত পেয়ে গেছি বউদি। কিন্তু কাল থেকে দেখছি আপনার নাতির একটি নূতন সাথি জুটেছে। দীপুর জেঠুমণি দীপুর সঙ্গে যেভাবে মিশে খেলাধুলা করছে আমি তো অবাক, সুকু ঠাকুরপোও এতটা পারে না। সত্যি তখন মনে হয় মানুষটি তাঁর নিজের বয়স ভাবনা-চিন্তা সব ভুলে যান। যেন আর একটি শিশু। চেহারাটা পর্যন্ত শিশুর মতো হয়ে যায়—'

শুনতে শুনতে জগমোহন গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন। রমলার কথা শেষ হবার আগে তিনি মাথা নাড়লেন। 'তাই, আমি বলেছি তোমাকে, ভয়ংকর খেয়ালি এই ছেলে। হুঁ, এর একটা ভালো দিক আছে—আবার মন্দ দিকও আছে। এই জন্যই আমার ভয়। কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই—শিশুর সঙ্গে খেলতে গিয়ে নিজেও আত্মভোলা একটি শিশুই হয়তো হয়ে গেল—অক্ষয় উকিল যে তাকে শত্রুর মতন দেখবে, দেখা হওয়া মাত্র ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে পরিমল কি তা জানত না—কিন্তু জেনেশুনেও তার কাছে ছুটে গেছে ক্ষমা চাইতে—আমি হলে তা কখনই পারতাম না, পরিতোষও পারত না, কাজেই তার প্রকৃতিটা অন্যরকম, সংসারের আর পাঁচটি মানুষের সঙ্গে মেলে না। আমি স্বীকার করছি এগুলো ভালো কাজ, তার প্রকৃতির ভালো দিক—কিন্তু সবই কেমন ঝোঁকের মাথায় করছে না কি—খেয়াল হয়েছে, চার বছরের ভাইপোকে নিয়ে ঘুড়ি ওড়াতে মেতে গেল, তার সঙ্গে বসে ক্যারাম খেলছে, তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসছে। কিন্তু আবার যখন খেয়াল হবে।—'

রমলা বুঝতে পারল তিনি কী বলতে চাইছেন, কিছুতেই তাঁর মন থেকে ভয় সংশয় দূর হচ্ছিল না। কিন্তু জগমোহনের কথা হঠাৎ থেমে গেল। টেলিফোন বেজে উঠতে তিনি খপ করে সেটা তুলে নিলেন।

'হ্যালো—' জগমোহনের দরাজ গলা গমগম করে উঠল। তাঁর চোখে মুখে একটা ব্যস্ততা একটা ক্ষিপ্রতা দেখা দিল। এইমাত্র তিনি যে কিছুটা নিস্তেজ বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন এখন দেখলে বোঝা যায় না। কাজে নামলে তিনি অতিমাত্রায় সজীব সপ্রতিভ হয়ে ওঠেন। রমলা শ্বশুরকে দেখছিল। হয়তো কোনো রুগীর বাড়ি থেকে ফোন এসেছে।

জগমোহনও তাই ভেবেছিলেন। তিনটা বাজে। বেহালার একটা রুগীর বাড়ি থেকে এ সময় একটা ফোন আসার কথা।

কিন্তু রমলা লক্ষ্য করল প্রবল উৎসাহ নিয়ে শ্বশুর টেলিফোন তুলে ধরলেন বটে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেমন থমকে গেলেন, অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁর দরাজ গলা অস্বাভাবিক খাদে নেমে এল।

'কাকে চাই?' ভুরু কুঁচকে তিনি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন, যেন ওদিকের কথাটা অস্পষ্ট অপরিচ্ছন্ন হয়ে তাঁর কানে আসছিল, বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল। 'কাকে? আচ্ছা দেখছি—' হাতের তেলো দিয়ে মাউথপিসটা চেপে ধরে জগমোহন অসহায় চোখে রমলার দিকে তাকালেন। 'আজ আবার পরিমল[illegible]ছে।'

'পরশু যিনি কথা বলছি[illegible] সেই মহিলা কি?'

'না।' জগমোহন মাথা নাড়লেন। [illegible] একটু কচিকচি লাগছে গলার স্বরটা, যেন একটি অল্প বয়সের মেয়ে।'

'কোথা থেকে বলছে?' রমলা মৃদুগলায় প্রশ্ন করল।

'দাঁড়াও দেখছি।' হাত সরিয়ে জগমোহন মাউথপিসটা চিবুকের সামনে তুলে ধরে আবার কথা বলতে আরম্ভ করলেন, তারপর একটা একটা করে জেরা করে চললেন। 'হুঁ, বালিগঞ্জ— বালিগঞ্জ তো অনেকটা জায়গা জুড়ে, রাস্তার নাম?.........কার বাড়ি থেকে?........তিনি তোমার কে হন?.......তোমার নাম?' একটু গম্ভীর থেকে জগমোহন আস্তে আস্তে বললেন, 'আচ্ছা ডেকে দিচ্ছি।' টেলিফোনটা টেবিলে কাত করে শুইয়ে রেখে তিনি রমলার দিকে তাকালেন। 'অক্ষয়বাবুর মেয়ে। পরিমলের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।'

রমলা চুপ করে রইল।

'তা হলে অক্ষয় উকিলের একটি মেয়ে আছে?' জগমোহন বিড়বিড় করে প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ', রমলা ঘাড় কাত করল। 'একটি মেয়ে আছে—দুটি ছেলেও আছে, আপনার মেজোছেলে তখন বলছিল।'

'মেয়েটির বয়স কত?'

'সতেরো আঠারো হবে বলছিল।'

'হুঁ।' জগমোহনের গলার ভিতর একটা গম্ভীর শব্দ হল। দেখতে দেখতে তাঁর কপালের শিরাটা ফুলে উঠল। 'কাল দেখা করে এসেছে, ক্ষমা চেয়ে এসেছে, সেখানেই তো ব্যাপারটা চুকে যাবার কথা—আজ আবার ডাকাডাকি কেন—' শ্বশুরের চাপা উত্তেজনা রমলা লক্ষ্য করল। দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে তিনি কথা বলছিলেন।

'হয়তো অক্ষয়বাবুই কোনো দরকারে আবার ডেকেছেন।' রমলা ভয়ে ভয়ে বলল, 'নিজে অসুস্থ—তাই মেয়েকে দিয়ে টেলিফোন—'

'হ্যাঁ, বুঝলাম, মেয়েও তাই বলল, বাবার কী একটু দরকার আছে, পরিমলদাকে তাই সে জানাতে চাইছে—কিন্তু আমার কথা হচ্ছে কী বউমা—একবার একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেছে—আবার কী ওই পরিবারের সঙ্গে মেলামেশাটা ঠিক? হুঁ. দরকার—কাল দেখা করে এসেছে—আজই আবার হঠাৎ কী দরকার পড়ল উকিলমশায়ের যে. অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে থেকেও মেয়েকে দিয়ে ফোন করিয়ে তিনি আমার ছেলেকে ডেকে পাঠাচ্ছেন? ফ্যামিলিয়ারিটি ব্রীডস্ কণ্টেম্পট্—তুমি তো জান বউমা।'

রমলা নীরব অধোবদন হয়ে ছিল।

'পরিমল! পরিমল!' জগমোহন গর্জন করে উঠলেন। এক মিনিট পর দীপুর হাত ধরে পরিমল দরজায় এসে দাঁড়াল।

'তোমার টেলিফোন'—জগমোহন টেলিফোনটা তুলে ধরলেন। 'ভেতরে এসো— অক্ষয়বাবুর মেয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবে।'

'অ, বুলা!' অনুচ্চ শান্ত গলায় পরিমল নামটা উচ্চারণ করল। কোনো দ্বিধা নেই জড়তা নেই সঙ্কোচ নেই। শিশুর মতন হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বাবার হাত থেকে টেলিফোনটা তুলে নিল।

জগমোহন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

রমলা সঙ্কুচিত হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে পরিতোষের দাদাকে দেখছিল।

॥ ২৫ ॥

ভীষণ লজ্জা করছিল বুলার। টেলিফোনে কথা বলছিল যদিও। মানুষটিকে চোখে দেখছিল না। তবু কথাটা বলার সময় তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

অবশ্য এতটা লজ্জা হত না যদি প্রদোষ সামনে দাঁড়িয়ে না থাকত। কিন্তু প্রদোষকে আড়াল করে কথাটা বলতই বা সে কেমন করে। আশেপাশে কারো বাড়িতে টেলিফোন নাই, বস্তি অঞ্চল। টেলিফোন রাখবে কে?

অগত্যা প্রদোষকে সঙ্গে নিয়ে বুলা 'মধুসূদন বস্ত্রালয়ে' চলে এসেছে। তাদের টেলিফোন আছে। এ-কাজে সে-কাজে পাড়ার মানুষের যখন কোথাও টেলিফোন করার দরকার হয় তখন তারা অবশ্য কোথাও না গিয়ে মোড়ের এই কাপড়ের দোকানে চলে আসে। টেলিফোন থাকলেও কি আর সবাই বাইরের মানুষকে যখন-তখন তা ব্যবহার করতে দেয়—উপযুক্ত চার্জ দিতে চাইলেও তাদের টেলিফোন পাওয়া যায় না। এদিক থেকে 'মধুসূদন বস্ত্রালয়' বাস্তবিক উদার।

কিন্তু বুলা একলা দোকানে এসে টেলিফোন করতে সাহস পাচ্ছিল না। কাজটার ভার পড়েছিল প্রলয়ের ওপর। সে রাজি হয়নি। আসলে অক্ষয়বাবু একটা চিঠি দিয়ে প্রলয়কে জগমোহন ডাক্তারের বড়ো ছেলে পরিমলের কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন। ক'টা টাকার জন্য তিনি পরিমলকে এই চিঠি লিখছিলেন। প্রস্তাবটা শুনে প্রলয় হৈ-হৈ করে উঠেছিল। ভয়ানক আপত্তি করেছিল সে। কাল যেচে পরিমলদা না হয় ক'টা টাকা দিয়ে গেছেন। আজ আবার তার কাছে টাকা চাওয়া কেন! এতে আত্মসম্মান থাকে নাকি? ছি, ছি, যদি পরিমলদার বাবা ভাই বা বাড়ির অন্য কেউ কথাটা জানতে পারেন তো তাঁরাই বা অক্ষয়বাবুকে কী মনে করবেন। না না, এত ছোটো হতে পারবে না প্রলয়। সে গরিব হতে পারে, ছেঁড়া জামা গায়ে দিতে পারে—তা বলে কারো কাছে ভিক্ষা চাওয়া! ছেলের কথা শুনে অক্ষয়বাবু রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। শয্যাশায়ী হলেও যে তাঁর তেজ বিক্রম কিছুই কমেনি সেদিন তিনি আর একবার তা প্রমাণ করেছিলেন। 'আমার কথার ওপর কথা বলিস হারামজাদা! বেরিয়ে যা, এখনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা, আমায় উনি আত্মসম্মান শেখাতে এসেছেন—সম্মান কীসে বাড়ে কীসে কমে আমার চেয়ে তুই বেশি বুঝিস, তোর কাছে আমি শিখব এ জিনিস? হুঁ, যেচে জগমোহনের ছেলে কাল দু-খানা দশ টাকার নোট আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে। দেবেই তো, লক্ষপতি তার বাপ। আমার এই দুরবস্থা দেখে তার মনে কষ্ট হয়েছে। সঙ্গে যা ছিল দিয়ে গেছে—এ টাকা তার কাছে কী—ধুলোমুঠি। আরো অনেক বেশি দেবে, দেওয়া উচিত তার। কেন দেবে না শুনি? তোর মাথায় যদি কিছু পদার্থ থাকত তো বুঝতিস, আজ আমি তার কাছে মোটে একশ টাকা চাইছি, একশ কেন, হাজার টাকা দিয়ে আমাকে সাহায্য করবার জন্য জগমোহনের ছেলের প্রাণ ছটফট করছে—কী ভয়ংকর জ্বালা তার ভেতর তোর তো জানবার কথা নয় —যদি তুই এমন একটা কাজ করতিস তো তখন বুঝতিস বিবেকের দংশন কাকে বলে, অনুশোচনার কামড় কী জিনিস। সেই জ্বালা নিয়ে সে জেল থেকে বেরিয়েই ছুটে এসেছে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে। সে জানে, আজ আমার এই ভয়ংকর দারিদ্র্য, অসহায় বিপন্ন অবস্থার জন্য পৃথিবীতে

যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকে তবে সেই মানুষ সে নিজে। আজ আমার মলয় বেঁচে থাকলে কত স্বচ্ছল সুন্দর জীবন হত আমাদের। তোর মতন গাধা ছিল না তোর দাদা—একবারে ম্যাট্রিক পাশ করে বেরিয়ে কলেজে পড়ছিল। বেঁচে থাকলে কত অর্থ উপার্জন করত সে, কত সুখের সংসার হত এটা! কিন্তু আমার সব আলো নিভে গেল—ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল এই পরিমল। কাজেই কত বড়ো পাপ করেছিল সে! এই অপরাধ সে কখনো ভুলতে পারে! আমার যে ক্ষতি করল তা কি ঐ সামান্য বিশ পঞ্চাশ, না একশ দুশ টাকা দিলে পূরণ হবে? হয় না, হতে পারে না। তোর মাথায় এ জিনিস আসবে না—কিন্তু জগমোহনের ছেলে জানে, পাপ করেছিল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সে প্রস্তুত—হয়তো আমায় এই অবস্থায় দু পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারলেই সে সুখী হয়, প্রাণে শান্তি পায়।'

'বেশ তো', প্রলয় তখন বলেছিল, 'পরিমলদা যাতে তোমার সঙ্গে এসে দেখা করে—চিঠিতে তাই লিখে দাও আমি চিঠি পৌঁছে দিয়ে আসি—এখানে এলে মুখে তুমি তাঁকে কথাটা বলো।'

'আরে মূর্খ, টাকার কথাটা আমিই মুখে বলতে পারছি নাকি—তাই তো চিঠি দেওয়া—তার এখানে আসাটা তো বড়ো কথা নয়—চিঠিতে জিনিসটা যত সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলা যায়, প্রকাশ করা যায়—সামনাসামনি তা পারা যাবে কেন! বাধো বাধো ঠেকবে। সকলেরই ঠেকে।'

একটু ভেবে প্রলয় বলল, 'বেশ, তাহলে দু-চারদিন যাক—কাল তো সবে কটা টাকা দিয়ে গেছে—দু-চারদিন পর টাকার কথা লিখে চিঠি দিও, আমি সে চিঠি নিয়ে যাব—আজই আবার তাঁর কাছে গিয়ে হাত পাততে লজ্জা করছে।'

'লজ্জা করছে!' শীর্ণ শুকনো মুখটা বিকৃত করে অক্ষয়বাবু ভেংচি কেটেছিলেন। 'তাই তো বলছি, তোর মাথায় যদি ভগবান এক ছটাক বুদ্ধি দিত—দু-চারদিন পর জিনিসটা জুড়িয়ে যাবে—তখন আর আজকের গরমটা থাকবে না, সবে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে জগমোহনের ছেলে, এখনো গায়ে কয়েদির গন্ধটা লেগে আছ, কী অপরাধ করেছিল সে. কোন দুষ্কর্মের দরুণ এই কঠোর শাস্তি ভোগ করে এসেছে আজই কিছু ভুলে যায়নি। ভুলে যাবে। ভুলতে তাকে হবেই। সংসারের এই নিয়ম। কয়েদির গন্ধ একদিন গা থেকে মুছে যাবে—কিন্তু যতদিন মুছতে পারছে না ভুলতে পারছে না ততদিন অনুতাপ অনুশোচনা—ততদিন মনটা নরম ভেতরটা দুর্বল, ঐ নরম থাকতে থাকতেই হাত বাড়ানো—তারপর মন যখন শক্ত হয়ে যাবে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, অনুতাপের ছিটেফোঁটা আগুন আর ভেতরে থাকবে না তখন একটা আধলাও তার কাছে চেয়ে পাওয়া যাবে না। সেদিন আমার এই বস্তির ঘরে ঢুকে আমার ময়লা বিছানার পাশে বসে আমার রুগ্ন অক্ষম শরীরের দিকে ছলছল চোখে চেয়ে তাকাতে তার বয়ে গেছে।'

প্রলয় চুপ করে রইল। এত কথা শোনার পরও বাবার চিঠি নিয়ে পরিমলের কাছে যেতে সে যে রাজি হতে পারছিল না তার চোখমুখের অবস্থা দেখে অক্ষয়বাবু বুঝতে পারলেন। অতঃপর আর কী বলা যায়, কপাল কুঁচকে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর তিনি একটা উপায় খুঁজে বার করলেন।

'তবে একটা টেলিফোন করে দে. ফোন-নাম্বারও আমাকে দিয়ে গেছে সে, বাড়ির ঠিকানা ফোন-নাম্বার সবই রেখে গেছে. দরকার হলে যে-কোনো সময় তার কাছে যাতে খবর পাঠাতে পারি বা তাকে ডাকতে পারি সব ব্যবস্থাই পরিমল করে গেছে, বুঝলি, আর এখন কিনা একটা চিঠি নিয়ে যেতে তোর হঠাৎ লজ্জার লেজ বেরিয়ে পড়ল। বেশ, ঐ কাপড়ের দোকানে চলে যা। ফোন করে পরিমলকে বলবি. বাবা আজ আবার একটু বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ডাক্তার এসেছিল, ওষুধ ইনকেজসন পথ্যটথ্য কী কী সব লিখে দিয়ে গেছেন, হুঁ. আপনি কাল টাকাটা দিয়েছিলেন বলেই এ যাত্রা সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকা সম্ভব হল—তা না হলে যে কবে ডাক্তার ডাকা হত—এখন বাবা আপনার কাছে আরো কটা টাকা সাহায্য চাইছেন—হুঁ, বাবা চাইছেন—একথাই বলবি, তুই চাইছিস না, তুই তো ভিক্ষুক নয়, ভিক্ষা আমি চাইছি, আমি তার কাছে হাত পাতছি—এতে আমার কোনও লজ্জা নেই, বলবি, বাবা বললেন আপাতত শ'খানেক টাকা হলে চলবে, তিনি নিয়মমতো চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারেন। চলে যা, আর দেরি করিস নে।'

'এ তো আরো বিচ্ছিরি ব্যাপার'—প্রলয় বলল, 'তবু একটা চিঠি দিয়ে আসা যায়, আমায় মুখে কিছু বলতে হল না, কিন্তু টেলিফোনে টাকার কথা বলা—'

'তুই বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে নচ্ছার পাজি ছেলে।' অক্ষয়বাবু চিৎকার করে উঠেছিলেন। 'তোর তো ক্ষমতা নেই নিয়ম করে আমার ওষুধপত্র পথ্য চালাবার—একটা সুযোগ এসেছে, জগমোহনের ছেলেকে একটা মুখের কথা বলা শুধু—তাতে কতরকম টিপ্পনি কাটছেন লাটসাহেবের নাতি, বিচ্ছিরি ব্যাপার. লজ্জার ব্যাপার. হতভাগা কোথাকার!'

প্রলয় আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেনি। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের কাজে চলে গেছে। নিরুপায় অক্ষয়বাবু তখন মেয়েকে ডেকেছেন। চৌকাঠের পাশে দাঁড়িয়ে বুলা সব কথাই শুনছিল। কাজেই বাবা যখন তার ওপর টেলিফোন করে পরিমলদাকে কথাটা জানাবার ভার দিলেন তখন সেও খুব সন্তুষ্ট হতে পারল না—কিন্তু আবার আপত্তি করতেও তার সাহসে কুলোল না। তবু তো দাদা দুটো পয়সা ঘরে আনছে। সে তো কিছুই করছে না। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ে ঘরে বসে আছে। আর পড়া হয়নি। হাতের কাজটাজও কিছু শিখতে পারল না। আজকাল মেয়েরাও কতরকম কাজ করছে।

'এক কাজ কর'—অক্ষয়বাবু বলেছিলেন, 'নিলয়কে সঙ্গে নিয়ে যা। একলা দোকানে যাবিনে।' একলা কোথাও মেয়েকে বেরোতে দিতে অক্ষয়বাবুর আপত্তি। মেয়ে বড়ো হয়েছে। এই জন্য সেলাই বা অন্য হাতের কাজ শেখার এমন কোনো স্কুল বা প্রতিষ্ঠানে বুলা ভর্তি হতে পারছে না। অথচ আজকাল মেয়েরা আকছার ঘরের বাইরে যাচ্ছে। এক একটা মেয়ে চাকরি করে সংসারও চালাচ্ছে। এই ব্যাপারে বাবার দৃষ্টিভঙ্গির মোটেই প্রশংসা করতে পারছে না বুলা। বাবার না, মারও না। দুজনই একরকম।

'না, নিলয়কে সঙ্গে নিয়ে সুবিধা হবে না।' বুলার মা অন্য প্রস্তাব দিলেন। 'বরং প্রদোষ সঙ্গে যাক। চালাক চতুর আছে। আজকাল টেলিফোনগুলোরও তো শুনছি অন্যরকম কী সব কায়দাটায়দা হয়েছে, নিজের হাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নম্বর-টম্বর ঠিকঠাক না বসাতে পারলে

সাড়েই নাকি পাওয়া যায় না।' মার কথা শুনে বুলার এত হাসি পাচ্ছিল—যেন জীবনে সে টেলিফোন দেখেনি, কোথাও টেলিফোন করেনি। বুলা বেশ ভালো টেলিফোন করতে জানে। তারা যখন ওপাড়ায় ছিল পাশের বাড়ির মুক্তি বউদির টেলিফোন তুলে তাকে কতদিন কত জায়গায় কথা বলতে হয়েছে। সবই অবশ্য মুক্তি বউদির কাজে। স্বামীর অফিস থেকে ফিরতে দেরি হচ্ছে—অফিসে ফোন করে খবর নেওয়া, মুক্তি বউদি সিনেমায় যাবে, ফোন করে সিট রিজার্ভ করা। ছেলের অসুখ করেছে ডাক্তার ডেকে দাও; কানে খাটো, টেলিফোনের সব কথা বউদি ভালো বুঝতে পারত না বলে কোথাও ফোন করতে বুলার ডাক পড়েছে।

সে যাই হোক, প্রদোষকে সঙ্গে নিয়ে মধুসূদন বস্ত্রালয়ে যাওয়ার কথায় বুলা ভিতরে ভিতরে খুশিই হল। হ্যাঁ, চালাক চতুর, তা হলেও ঠাণ্ডা প্রকৃতির ছেলে প্রদোষ। বুলাদের পাশের ঘরের অটলবাবুর ছেলে, প্রায় বুলার সমবয়সী, এক-আধ বছরের বড়ো হতে পারে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, চোখ দুটো বড়ো বড়ো, রংটা কালো হলেও বেশ মাজাঘষা, লম্বা ছিপছিপে গড়ন, দেখলেই মনে হয় ছেলেটি বুদ্ধিমান এবং একটু ভাবপ্রবণও যেন। বুলাদের ঘরে প্রায়ই আসে। পাশাপাশি ঘর। আসা-যাওয়া তো থাকবেই। তা হলেও বুলার মা ছেলেটিকে একটু বেশি পছন্দ করেন। বুলার মাকে মাসিমা ডাকে, বুলার বাবাকে মেসোমশাই ডাকে। প্রলয়কে তো সব সময় হাতের কাছে পাওয়া যায় না, সারাদিন তাকে বাইরে বাইরে থাকতে হয়, আর নিলয় তো ছোটো, ন'দশ বছরের ছেলেকে দিয়ে তেমন কি কাজ হয়, কাজেই তখন প্রদোষকেই এ-কাজে সে-কাজে পাঠান বুলার মা। একটা সুবিধা, ডাকলেই প্রদোষকে পাওয়া যায়, ঘর থেকে বড়ো একটা বেরোয় না। সারাক্ষণ বইয়ের ভিতর মুখ গুঁজে আছে। কলেজে পড়ছে। থার্ড ইয়ারের ছাত্র। কিন্তু সারাক্ষণ যে পাঠ্য বই নিয়ে আছে তা নয়। বরং বাজে বই বেশি পড়ছে। উপন্যাসের দিকে ঝোকটা বেশি। ইংরেজি বাংলা অনেক উপন্যাস এর মধ্যে সে পড়ে ফেলেছে। কলেজের লাইব্রেরি থেকে বই আনছে, একটা পাবলিক লাইব্রেরির মেম্বার হয়েছে, সেখান থেকে বই আনছে, তা ছাড়া এর ওর কাছ থেকে চেয়েও কম বই এনে পড়ছে না। বইয়ের পোকা বলা যায় প্রদোষকে। বুলার মারও উপন্যাস পড়ার নেশা আছে। প্রদোষের কল্যাণে নিত্য নূতন বাংলা উপন্যাস তিনি পড়তে পান। যেন এই কারণে ছেলেটিকে তাঁর ভালো লাগে। প্রদোষ তাঁর মনের খোরাক যোগাচ্ছে। প্রদোষের মতন একটি ছেলে বুঝি তিনি চেয়েছিলেন। কেবল পড়াশোনা নিয়ে যে থাকবে। বইয়ের জগতে বাস করবে। প্রলয় তো আর সে রকম হল না। ছোটো ছেলে নিলয় কেমন হবে এখনও ভালো বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু বড়ো ছেলে মলয় অনেকটা প্রদোষের মতন ছিল। পড়াশোনা ভালোবাসত। কিন্তু সে ছেলে তো রইল না। প্রদোষকে দেখে হঠাৎ এক এক সময় মলয়ের কথা মনে পড়ে যায় অক্ষয়বাবুর স্ত্রীর। এদিকে মার পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বুলাও সব কটা উপন্যাস পড়ে পড়ে শেষ করছে। ঘরে বসে থাকলেও এদিক থেকে তার সময়টা মন্দ কাটছে না। প্রচুর বই হাতে আসছে। একটা বই শেষ করে অক্ষয়বাবুর স্ত্রী মাঝে মাঝে গল্পটা নিয়ে প্রদোষের সঙ্গে আলোচনা করেন, হয়তো কোনো চরিত্র তাঁর কাছে অস্পষ্ট থেকে গেছে বা গল্পের শেষটা ভালো বুঝতে পারেননি। প্রদোষ সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয়। তখন বুলাও সেখানে উপস্থিত থাকে। সে কোনো কথা বলে না। চুপ করে দুজনের কথা শোনে। কথা

বলার ফাঁকে ফাঁকে প্রদোষ বুলার দিকে তাকায়। বুলা তখন ঠোঁট টিপে হাসে। প্রদোষও একটুখানি হেসে নেয়। অক্ষয়বাবুর স্ত্রীর অলক্ষ্যেই এটা ঘটে যদিও। কেননা, গল্পটা হয়তো একালের দুটি ছেলে-মেয়ের ভালোবাসা নিয়ে লেখা। এখন একালের ছেলেমেয়ের ভালোবাসা, প্রদোষ ও বুলা যত সহজে বুঝতে পারে অক্ষয়বাবুর স্ত্রী তা পারবেন কেন। তাই কোনো কোনো জিনিস তাঁর কাছে ধোঁয়াটে হেঁয়ালি থেকে যায়। তাই বার বার তিনি প্রশ্ন করেন। মার এই অসহায় অবস্থা দেখে বুলার হাসি পায়। বুলার হাসি দেখে প্রদোষ হাসি সংবরণ করতে পারে না। তা হলেও মাসিমার রসবোধ ও রুচির সে যথেষ্ট প্রশংসা করে। আবার আলোচনা শেষ হয়ে যাবার পর কোনো কোনোদিন প্রদোষ বলে, সে একটা বই লিখবে। লেখক হবার ইচ্ছা তার অনেকদিনের। এই জন্য সে এত বেশি বই পড়ছে। তখন প্রদোষ যদি বুলার দিকে তাকায়ও বুলা আর ঠোঁট টিপে হাসতে পারে না, মার মতন গম্ভীর হয়ে ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তার কথা শোনে। তখন বুলা ও বুলার মার মনে হয়, আর পাঁচটি ছেলের সঙ্গে এই ছেলের এতটুকু মিল নেই—এ সম্পূর্ণ অন্য রকম। অস্বস্তিবোধ করে তারা, আবার ভিতরে ভিতরে কেমন যেন গর্ববোধও করে। তাদের পক্ষে একটা নূতন অভিজ্ঞতা। একটি ছেলে বই লিখবে, সেভাবে নিজেকে সে তৈরি করছে, ছেলেটি তাদের সামনে বসে আছে, কথা বলছে। মাথায় বড়ো বড়ো চুল, প্রকাণ্ড দুটি চোখ, কালো ছিপছিপে শরীর, মসৃণ গায়ের রং।

উপন্যাসের চরিত্রের মতন এই ভাবী লেখকটিও মা ও মেয়ের চোখে এক এক সময় রহস্যময় হয়ে ওঠে।

আজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রদোষ প্রস্তাব করেছিল টেলিফোন করে ফেরার পথে দুজনে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে একটু চা খাবে। বুলা প্রথমটায় আপত্তি করেছিল—'যদি কেউ দেখে ফেলে?' প্রদোষ অভয় দিয়েছিল—'এত বড়ো শহরে কে কাকে চেনে! আর যে মুহূর্তে আমরা দোকানে ঢুকব ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির মানুষ কেউ দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে তোমায় কে বললে।'

'কিন্তু চা খেতে গেলে দেরি হবে যে—মা যদি কিছু মনে করে?'

এবারও প্রদোষ অভয় দিয়েছিল।

'টেলিফোন এনগেজ্ড ছিল—আমাদের লাইন পেতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল।' এমন গম্ভীর হয়ে সে কথাটা বলেছিল যে, বুলা হেসে ফেলেছিল। পরে প্রদোষও হেসেছিল। 'কেমন, তা হলে মাসিমা নিশ্চয় আর কিছু মনে করবেন না?'

'হ্যাঁ, তা বলা যায় মাকে।' প্রদোষের বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে বুলা খুশি হয়েছিল। তার খুব ভালো লাগছিল। আশ্বিনের বেলাশেষের ঝিরঝিরে রোদ মাথায় নিয়ে তারা হাঁটছিল। বাড়িতে দুজনের যথেষ্ট মেলামেশা আছে। কথাও কম বলা হয় না। কিন্তু তবু যেন সেখানে বাধা থেকে যায়। বুলার মা থাকবে সামনে, নয়তো প্রদোষের মা, বুলার দাদা আছে, প্রদোষের বোনেরা আছে—কিন্তু এখানে কেউ নেই। একলা দুজনের রাস্তায় বেরোনোর অন্য স্বাদ।

টেলিফোনের ব্যাপারটা দু মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। জগমোহনের সঙ্গে কথা বলার

সময় বুলার কেমন ভয় ভয় করছিল। কী ভয়ংকর চড়া গলা মানুষটার, তার ওপর কেমন যেন রেগে গিয়ে একটার পর একটা প্রশ্ন করছিলেন—কী চাই, কাকে চাই, তোমার নাম তোমার বাবার নাম, বাড়ির নম্বর, রাস্তার নাম—উত্তর দিতে গিয়ে বুলা ঘেমে উঠেছিল। তারপর আর কোনো কষ্ট থাকেনি, ভয়টাও একেবারে কেটে গেল। কী মিষ্টি ঠাণ্ডা গলার স্বর পরিমলদার! কাল রাত্রেই বুলা বুঝতে পেরেছিল, অত্যন্ত নরম শান্ত প্রকৃতির তিনি। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ সুন্দর মানুষটিকে দেখে একটা ধূসর গম্ভীর পাহাড়ের কথা মনে পড়েছিল বুলার। কোথায় যেন একটা ছবি সে দেখেছিল। পাহাড়ের গহ্বর থেকে রূপালি রেখার মতন কোমল ঝর্নাধারা বেরিয়ে আসছে। পরিমলদার চোখ দুটো থেকে যেন এমন একটা স্নিগ্ধতা কোমলতা ঝরে ঝরে পড়ছিল। এই মানুষ কোনোদিন নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে বা করেছিল বুলা বিশ্বাস করতে পারছিল না। উনি চলে যাওয়ার পর রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ সে চিন্তা করেছিল। ঘুম আসছিল না। কেন জানি বার বারই বিরাট বিস্ফারিত একটা কিছুর সঙ্গে মানুষটির তুলনা করতে তার ইচ্ছা করছিল। যেমন নীল ধূসর পাহাড়, যেমন আকাশছোঁয়া একটা বটগাছ। সর্বাঙ্গে ঝলমলে সবুজ পাতার সমারোহ। নীচে অগাধ ঠাণ্ডা ছায়া। দু দণ্ড বসে জিরোতে ইচ্ছা করে। প্রজাপতির কথা মনে পড়ে তখন, রাখালের বাঁশীর সুর মনে পড়ে। বাবা যেমন বলে দিয়েছিলেন, টাকার কথাটা বলতে পরিমলদা বুলাকে জানিয়ে দিলেন, সন্ধ্যার দিকে তিনি আসবেন। তারপর বুলাকে একটা দুটো প্রশ্ন করলেন, 'কোথা থেকে ফোন করছ', তুমি একা দোকানে এসেছ, নাকি সঙ্গে কেউ এসেছে', 'মা কী করছেন দেখে এলে....... ছোটো ভাইটি খেলতে বেরিয়েছে নিশ্চয়' ইত্যাদি।

দোকান থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে প্রদোষ প্রশ্ন করল, এতক্ষণ চুপ ছিল সে, রাস্তায় নেমে আর কৌতূহল দমন করতে পারল না।

'কে ইনি?'

'পরিমলদা।'

'কোথায় থাকেন?'

'সে অনেক দূর—নারকেলডাঙ্গা।'

কী একটু চিন্তা করে প্রদোষ আবার প্রশ্ন করল, 'তিনি কি আমাকে দেখেছেন? আমায় চেনেন?'

'না, কেন বল তো?' বুলা একটু অবাক হল প্রশ্নটা শুনে।

প্রদোষ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তবে আমার নাম বলা ঠিক হয়নি।'

'তাতে কী।' বুলা হাসল। 'আমায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সঙ্গে কে এসেছে, তোমার নাম বললাম।'

'তাই তো বলছি, হুট্ করে নামটা বলা তোমার উচিত হয়নি।'

'কেন বল তো?' বুলা একটা ঢোক গিলল। কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। 'তোমার নাম বলতে দোষ হল কি!'

আকাশের দিকে চোখ তুলে তেমনি গম্ভীর গলায় প্রদোষ বলল, 'ভাববেন প্রদোষ তোমার লাভার—বয় ফ্রেণ্ড কেউ হয়তো।'

'যা. ছিঃ', বুলা প্রবলবেগে মাথা নাড়ল। 'না, তিনি কখনো তা ভাববেন না, তিনি এমন মানুষ নন।'

'কী জানি, যদি ভেবে বসে থাকেন তা হলে মুশকিল,' বিড়বিড় করে প্রদোষ বলল, 'বাড়ির মানুষ কেউ সঙ্গে এল না, মাঝখান থেকে আমি। আমার আসাটাই অন্যায় হয়েছে। শত হোক বাইরের মানুষ তিনি।'

বুলার এবার রাগ করতে ইচ্ছা করল।

'কী সব আবোল-তাবোল বকছ—আবার তখন কিনা খুব সাহস দেখিয়ে বলছিলে চায়ের দোকানে ঢুকবে।'

'হ্যাঁ, চায়ের দোকানে ঢুকব, চা খাব বইকি। বা-রে, আমরা একলা করে দুজন বাড়ি থেকে কোনোদিন বেরোতে পারি নাকি—আবার কবে সুযোগ হবে, ঐ তো একটা চায়ের দোকান দেখা যাচ্ছে—এসো—'

উৎসাহ নিভে গিয়েছিল প্রদোষের। আবার সে সচকিত হয়ে উঠল। বুলার সঙ্গে চায়ের দোকানে ঢুকে চা খাবার কথা মনে পড়তে তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বুলার মুখে হাসি ফিরে এল। কিন্তু তখনি সে কিছু বলল না।

ছোটো দোকান। তা হলেও চমৎকার সব ব্যবস্থা। পর্দা টাঙ্গানো একটা খুপরির মধ্যে দুজন পাশাপাশি দুটো চেয়ার নিয়ে বসল।

দোকানের দরজায় পৌঁছে সতর্ক চোখে তারা এদিক ওদিক দেখে নিয়েছিল বইকি। পরিচিত কেউ না দেখে ফেলে। কিন্তু খুপরির মধ্যে এসে পড়ার পর তাদের ভয়টা আর তত রইল না। দোকানের একটা ছোকরা এসে আলো জ্বেলে দিল পাখা খুলে দিল। চোখ বড়ো করে দুজন কামরার ভিতরটা দেখতে লাগল। তাদের মনে হচ্ছিল, হঠাৎ যেন পরিচিত পৃথিবী থেকে আলগা হয়ে একটা অত্যন্ত নির্জন ঘনিষ্ঠ জগতে দুজন চলে এসেছে।

ঘাড় কাত করে একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল।

'কী খাবে?' চাপা গলায় প্রদোষ বলল।

'শুধু চা।' ফিসফিসে গলায় বুলা বলল, 'চট করে দু কাপ চা আনতে বলে দাও। দেরি করলে কিন্তু চলবে না।'

'কেন, চপ কাটলেট?' প্রদোষ বলল, 'দুটো ব্রেস্ট কাটলেই আনতে বলি।'

'না, না', প্রদোষের কাঁধ ধরে ব্যস্ত হয়ে ঝাঁকুনি দিল বুলা। 'হাঙ্গামা করতে যেও না—ভয়ানক দেরি হয়ে যাবে। কাটলেট ফাটলেট খেতে গেলে আধ ঘণ্টা লেগে যাবে।'

অতএব প্রদোষ নিরস্ত হল। পর্দার ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে ছেলেটাকে ডেকে দু কাপ চায়ের কথা বলে দিল।

'কেমন লাগছে?' প্রদোষ আবার এদিকে ঘাড় ফিরিয়ে ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল।

'কেন, ভালোই তো লাগছে।' বুলা ঘামছিল। আঁচল দিয়ে কপালটা মুছে ফেলল।

'কিন্তু মনে হচ্ছে ভয়ে সারা হয়ে যাচ্ছ। ঘেমেটেমে অস্থির।' প্রদোষ এবার চাপা গলায় হাসল।

'মোটেই না। আমার ঘাম বেশি। এমনিতে আমি ঘামি।'

চা এসে গেল।

বুলা বলল, 'বরং আমার চেয়ে আপনার ভয়খানাই বেশি মশাই।'

'কেন? কী রকম?' আপনি ও মশাই শব্দ দুটো শুনে কৌতুক বোধ করল। তাই সঙ্গে সঙ্গে সেও বলল, 'আমিই তো সাহস করে শ্রীমতীকে এখানে নিয়ে এলাম।'

'আহা, সেকথা হচ্ছে নাকি।' বুলা ভুরু কুঁচকাল। 'তখন পরিমলদাকে নামটা বললাম, আর সঙ্গে সঙ্গে কী একটা বাজে চিন্তা মাথায় ঢুকল—এর মধ্যেই ভুলে যাওনি নিশ্চয়।'

'না, ভুলব কেন।' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ঘাড় সোজা করল।

'তাই আমি ভাবছিলাম তখন, বলতে চেয়েছিলাম, এমন হুট করে একটা আজগুবি ভাবনা যার মাথায় ঢোকে সে কিনা আবার একদিন লেখক হবে, উপন্যাস লিখবে।'

'এটা বলেছ ভালো।' প্রদোষ এবার শব্দ করে হাসল। তারপর আবার গম্ভীরও হয়ে গেল। 'তুমি হয়তো জান না, বাজে চিন্তা আজগুবি ভাবনা মাথায় না এলে লেখক হওয়া যায় না।' বুলার চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল সে। 'যার মাথায় যত বেশি বাজে চিন্তা তার বড়ো লেখক হবার সম্ভাবনা তত বেশি।' বুলা চুপ করে রইল। 'সত্যি আমি একটা বই লিখব—উপন্যাস লিখব।' বলতে বলতে প্রদোষ অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

'কী নিয়ে লিখবে?' কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বুলা একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল, প্রদোষকে আবার অন্যরকম অন্য কিছু—কেমন যেন রহস্যের মতন মনে হচ্ছিল তার, তাই ফ্যাল ফ্যাল করে ছেলেটাকে দেখতে লাগল।

'কী নিয়ে লিখব তা জানি না।' প্রদোষ বুলার দিকে তাকাল। 'তবে একজনকে নিয়ে লিখব—একটি মেয়েকে নিয়ে।'

'কোথায় সেই মেয়ে?' অস্পষ্ট অনুচ্চ গলায় বুলা প্রশ্ন করল।

'আমার পাশেই সে বসে আছে।'

বুলার মুখ দিয়ে হঠাৎ কথা সরল না।

'কী, বিশ্বাস করছ না?' প্রদোষের গলার স্বর আবেগে কাঁপছিল। 'আমি যত বই পড়ি প্রত্যেকটা বইয়ের মধ্যে তোমার মতো একটি মেয়েকে খুঁজি—তারপর যখন পড়া শেষ হয়ে যায় তখন তোমাকে নিয়ে কেমন করে একটা বই লেখা যায় ভাবতে আরম্ভ করি।'

বুলা দু-হাতে মুখ ঢাকল, যেন শিউরে উঠছিল সে, একটু একটু কাঁপছিল।

'ভালোবাসি কথাটা মুখ দিয়ে বার করতে নেই। একটা বইয়ে পড়েছি আমি। মুখ দিয়ে বার করলে কর্পূরের মতন সেটা বাতাসে উড়ে যায়। আবার না বললেও কান্নার ডেলা হয়ে কথাটা বুকের মধ্যে আটকে থাকে। এত কাছে আছি আমরা। পাশাপাশি ঘর। তবু তোমাকে কিছু বলতে পারি না।' কাগজের মতো খসখস করছিল প্রদোষের গলার স্বর। 'চব্বিশ ঘণ্টা তোমার কথা ভাবি। তোমাকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে আমার ভালো লাগে না।'

.চায়ের মনে চা জুড়োতে লাগল। সময়ের কথা তাদের মনে রইল না।

॥ ২৬ ॥

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অক্ষয়বাবুর ছোটো টালির ঘরে কেমন যেন একটা উৎসবের সাড়া পড়ে গেল।

ঘরদোরের চেহারাও আজ কিছুটা পরিচ্ছন্ন ছিমছাম দেখাচ্ছিল। বারান্দা সিঁড়ি ভালো করে ঝাঁট দেওয়া হয়েছে। বিকেল হবার আগেই বুলা, বুলার মা চটপট হাত লাগিয়ে ঘরের ভিতরের জিনিসপত্র, বিছানাপাটি, সবই যতটা সম্ভব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে। হ্যারিকেনের চিমনিটা ঘষে মেজে পরিষ্কার করা হয়েছে, সলতেটা সমান করে কেটে দেওয়া হয়েছে। তাই আলোটা এত উজ্জ্বল ও বড়ো লাগছিল। একটু বেশি করে তেলও ভরা হয়েছিল।

এবং পরিমলও সন্ধ্যাবাতি লাগবার সঙ্গে সঙ্গে এসে গিয়েছিল। অক্ষয়বাবুর মুখের ক্লান্তি, নৈরাশ্য ও বিষাদের ছায়াটা যে এই একটা সন্ধ্যার মধ্যে কতখানি দূর হয়েছে, বাতির উজ্জ্বল আলোয় তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। জরাজীর্ণ প্রাচীন চেহারায় একটা প্রসন্ন হাসি, একটা প্রশান্তি লেগে রয়েছে।

পরিমলের সঙ্গে তিনি কত কিছু নিয়ে আলোচনা করছিলেন, আবহাওয়া, বাজারদর, পলিটিকস্। আজ আর অক্ষয়বাবুর বিছানায় বসতে হয়নি পরিমলকে। প্রদোষদের ঘর থেকে একটা চেয়ার চেয়ে আনা হয়েছে। প্রদোষই নিজের হাতে সেটা বয়ে এনে অক্ষয়বাবুর বিছানার পাশে বসিয়ে দিয়ে গেছে।

প্রদোষকে আর দেখা যায়নি।

বুলার সঙ্গে টেলিফোন করতে যাওয়া থেকে আরম্ভ করে একটু আগে পর্যন্ত সারাটা বিকেল সে কাছে কাছে ছিল। এমন কী, এটা-ওটা গোছগাছ করতে বুলাকে, বুলার মাকে সে কম সাহায্য করেনি। তার নিজের টেবিলে একটা ফুলদানি ছিল। এক সময় ছুটে গিয়ে সেটা এনে অক্ষয়বাবুর বিছানার পাশে অর্থাৎ পরিমল যে চেয়ারটায় বসবে, তার সামনে একটা টিপয়ের ওপর বসিয়ে দিয়েছিল। ফুলদানিতে ডাল-পাতা সমেত একটা দোপাটি ফুলের তোড়া শোভা পাচ্ছিল। অক্ষয়বাবু দেখে ভারী খুশি হয়েছিলেন। এই ফুলও প্রদোষের নিজের হাতে লাগানো গাছের ফুল। বস্তি বাড়ি, তা হলেও তাদের ঘরের সামনে কঞ্চির বেড়া দিয়ে প্রদোষ ছোটোখাটো একটা ফুলের বাগান করেছে। প্রদোষ যখন খাটের পাশে টেবিলের ওপর ফুলদানিটা রাখবার উদ্যোগ করছিল তখন অক্ষয়বাবু হেসে বলেছিলেন, 'আমাদের প্রদোষের অ্যাসথেটিক সেন্স—সৌন্দর্যবোধ আছে।' শুনে প্রদোষ মুখটা ঘুরিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বুলাকে দেখছিল। বুলা ঝাড়ন চালিয়ে ওদিকের একটা বেড়ার গায়ের কালি-ঝুলগুলি পরিষ্কার করছিল। ফুলদানি দেখতে সে-ও ঘাড় ফিরিয়েছিল। এমন সময় প্রদোষের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে যায়। অক্ষয়বাবুর কথা শুনে প্রদোষ ঠোঁট টিপে হাসছিল। তার হাসি দেখে বুলার কান দুটো সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে উঠেছিল। কেননা, একটু আগে চায়ের দোকানের সেই নির্জন খুপরিতে বসে প্রদোষ ঠিক এই কথাই বলছিল। 'বুঝলে, আর পাঁচটা মানুষের তুলনায় আমার সৌন্দর্যবোধ সৌন্দর্যপ্রীতিটা একটু বেশি। সুন্দর জিনিস আমার মনকে সহজে নাড়া দেয়। এই জন্যই আশা আছে, একদিন আমি বড়ো ঔপন্যাসিক হতে পারব।' যেন

হঠাৎ কথাটা বুঝতে পারছিল না বুলা। চোখ বড়ো করে প্রদোষকে দেখছিল। প্রদোষ তখন বুলার হাত ধরে বলেছিল, 'প্রমাণ চাও? 'কীসের প্রমাণ?' ফিসফিসে গলায় বুলা প্রশ্ন করেছিল। 'আমার সৌন্দর্যবোধ—সুন্দরের প্রতি তীব্র আসক্তির প্রমাণ?' প্রদোষ অল্প অল্প হাসছিল। আর বুলা কিনা তৎক্ষণাৎ বোকার মতন ঘাড় কাত করে বলেছিল, 'হ্যাঁ, দেখাও প্রমাণ।'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রদোষ এমন একটা কাণ্ড করল! তখন আর সে মোটেই হাসছিল না কিন্তু। তার চোখ-মুখের অবস্থা যে হঠাৎ কী হয়ে গেল! প্রদোষের সেই চেহারাটা মনে করে বুলার ভিতরটা এখনও থেকে থেকে দুবদুব করছে। বস্তুত এত সাহস প্রদোষের কী করে হল বুলা ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। বড়োলোকের ছেলে পরিমলদা আসবে, তাই তাড়াহুড়ো করে ঘর-দরজা পরিষ্কার করতে হচ্ছে, জিনিসপত্র গুছোতে হচ্ছে, কিন্তু এত কাজের মধ্যে থেকেও একটা দৃশ্যই শুধু বার বার বুলার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। তখন প্রদোষকে দেখে মনেই হচ্ছিল না, ছেলেটি তাদের পাশের ঘরে থাকে, তার বাবার নাম অটলবাবু, দু বোনের নাম সীমা ও রেখা; রোজ সে বুলাদের ঘরে আসে, বুলার মাকে মাসিমা ডাকে, বাবাকে মেসোমশাই বলে, বুলার মাকে নূতন নূতন উপন্যাস এনে পড়তে দেয় এবং মার পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বুলাও সেগুলি পড়ে শেষ করে। অত্যন্ত কাছের মানুষ, পরিচিত মুখ। কিন্তু চায়ের দোকানের আলো জ্বলা সেই ছোটো ঘরটায় প্রদোষকে তখন চেনাই যাচ্ছিল না। এত বদলে গিয়েছিল সে হঠাৎ।

কিন্তু তারপর চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার সময় সারা রাস্তা বুলা আর একটা কথাও তার সঙ্গে বলেনি। বস্তুত বুলা বুঝতে পারছিল না, রাগ করে সে প্রদোষের সঙ্গে কথা বলছিল না, না কি কথা বলতে তার লজ্জা করছিল, অথবা একটা ভয়ংকর অভিমান তাকে পেয়ে বসেছিল, যে জন্য তার মুখ দিয়ে আর একটা কথাও সরছিল না—ঠিক কী যে হয়ে গেল! তা তো বটেই, এক সেকেণ্ডের মধ্যে সব গোলমাল করে ফেলল প্রদোষ। তা না হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার সঙ্গে হাঁটতে কত ভালো লাগছিল কত গল্প করছিল দুজনে, প্রদোষ তাকে ভালোবাসার কথা বলছিল, একদিন যে সে লেখক হবে, সেকথা বলছিল, বুলাকে নিয়ে বই লিখবে, বুলার কথা তার সব সময় মনে পড়ে—একটুও খারাপ লাগছিল না শুনতে, বরং শুনতে শুনতে—একটি ছেলে চব্বিশ ঘণ্টা তার কথা ভাবছে জানতে পারলে কোন্ মেয়ের না ভালো লাগে, একটা কেমন উচ্ছ্বাসের মতন এসে গিয়েছিল বুলার, যেন কিছুটা দুঃখে, কিছুটা আনন্দে তার চোখে জল এসেছিল, দুহাতে মুখ ঢেকে সে কাঁদছিল, খুব ভালো একটা উপন্যাসের গল্প পড়ে শেষ করার পর মাঝে মাঝে তার মনের অবস্থা এমন হয়েছে, সে কেঁদে ফেলেছে। তাই তো, প্রদোষের কথাগুলি উপন্যাসের মতন সুন্দর লাগছিল। একদিন লেখক হবে বলেই এমন চমৎকার কথা বলতে পারে সে, কিন্তু তা হলেও তো কথা কথা, ততক্ষণ সেটা একটা গল্প ছাড়া আর কিছু না, তার মধ্যে কল্পনা, স্বপ্ন, কত কী মেশানো থাকে, বুলা ঐ একটু সময়ের জন্য একটা স্বপ্নের জগতে চলে গিয়েছিল। কিন্তু প্রদোষ তাকে সেই জগতে বেশিক্ষণ থাকতে দিল না। সুন্দর জিনিস ভালোবাসে সে, বুলার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলছিল, যদি বুলা তার প্রমাণ চায়, এখুনি সে প্রমাণ দেখাতে পারে।

তারপর আর কী, কথার প্যাঁচে পড়ে বুলাও রাজি হয়ে গেল—আর চোখের পলক ফেলার আগে প্রদোষ তার মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে ঠোঁটে গালে চুমু খেল। উঃ, কী ভয়ংকর রাগ হয়েছিল বুলার, তার কান্না পাচ্ছিল। না পারছিল ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে, না পারছিল চিৎকার করে কাঁদতে। চায়ের দোকান। চারদিকে কত রকমের মানুষ। তাই তাকে চুপ থাকতে হল। কিন্তু টের পাচ্ছিল সে, এক সেকেণ্ডের মধ্যে তার বুকের ভিতর একটা ভূমিকম্পের মতন কিছু হয়ে গেল। স্নায়ুগুলি ঝনঝন করে শব্দ করে উঠেছিল। তারপর আর পাঁচ মিনিট তারা সেখানে ছিল। বিল নিয়ে আসতে বয় দেরি করছিল। কিন্তু এই পাঁচ মিনিট প্রদোষ আর একটা কথাও বলেনি। যেন কাজটা করে সে লজ্জা পেয়েছিল। কেননা, বুলা এত কঠিন, আড়ষ্ট, নীরব হয়ে থাকবে, সে বুঝতে পারেনি।

বুলা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর কোনোদিন প্রদোষের সঙ্গে কথা বলবে না, তার মুখের দিকেও তাকাবে না। রাস্তায় সে একটা কথাও বলেনি। বাড়ি ফিরে বুলা কাজে লেগে গেল। মা প্রদোষকে ছাড়ল না। তাকে দিয়েও এটা-ওটা করাতে লাগল। কিন্তু বুলা একবারও প্রদোষের দিকে তাকায়নি। যতবার সে সামনে পড়েছে, বুলা মুখটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রেখেছে। কিন্তু ফুলদানির ব্যাপারটার সময় বাবা যখন প্রদোষের সৌন্দর্যজ্ঞানের প্রশংসা করছিলেন, তখন দুজনের আবার চোখাচোখি হয়ে গেল। আশ্চর্য, প্রদোষ তখন ঠোঁট টিপে হাসতে পারছিল, বুলা হাসছিল না, তার দু কান গরম হয়ে উঠেছিল, তা হলেও আর যেন তখন সে রাগ করতে পারছিল না। বরং একটু বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে আগের রাত্রে দেখা একটা অদ্ভুত স্বপ্নের স্মৃতির মতন চায়ের দোকানের সেই এক সেকেণ্ডের ঘটনাটা মনে করতে চেষ্টা করছিল।

তারপর সন্ধ্যা হলে প্রদোষকে কিন্তু আর দেখা গেল না। অক্ষয়বাবুর স্ত্রী বলে রেখেছিলেন, পরিমল এলে প্রদোষকে আবার দরকার হবে। দোকান থেকে একটু খাবার আনাবেন। কাল পরিমল চা খায়নি। আজ একটু চা না খাইয়ে দিলে মুখ থাকে না। অবশ্য প্রদোষকে আর দরকার হল না, পরিমলের আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়ও বাড়ি ফিরল। তারপর প্রলয়ই তো ছুটে ছুটে দুবার তিনবার দোকানে গেল। তখন বাবার সঙ্গে সে রাগারাগি করেছিল সত্য, কিন্তু পরিমলদা যে কত আপনার মতন করে তাদের সকলকে দেখছে, কত সহজে তিনি এ-বাড়ির মানুষগুলির সঙ্গে মিশে গেলেন দেখে প্রলয় অবাক হল। কত বড়োলোকের ছেলে। একটু দম্ভ নেই, অহংকার নেই। হ্যারিকেনের চড়া আলোর সামনে পরিমল, যখন গুনে গুনে দশ টাকার দশখানা নোট অক্ষয়বাবুর হাতে গুঁজে দিচ্ছিলেন, তখন প্রলয় কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রলয়ের ছোটো ভাই নিলয়, বুলা এবং অক্ষয়বাবুর স্ত্রী একটু দূরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সকলেরই চোখ ছিল এদিকে। কারো মুখে কথা ছিল না। অক্ষয়বাবু কী বলছেন, তার উত্তরে পরিমল কী বলছে, শুনতে সকলে উৎকর্ণ হয়ে ছিল।

কিন্তু কাগজের নোটগুলি হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রেখে অক্ষয়বাবু কেমন যেন স্থির স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তাঁর মুখে কথা সরছিল না। তা হলেও তাঁর শীর্ণ রেখাসঙ্কুল মুখখানা যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানেরা বেশ বুঝতে পারছিল।

'আপনি আমায় কাল বলতে পারতেন, আমি তো জানি না—' টাকাটা গুনবার সময়

পরিমল সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসেছিল, এখন সোজা হয়ে বসল, অক্ষয়বাবুর স্থির নীরব মুখের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বলল, 'আমার কাছে সঙ্কোচ করার কী কারণ থাকতে পারে কাকাবাবু, আমিও আপনার আর-একটি ছেলে—আমার কাছে তো কিছুই গোপন করা আপনার উচিত না।'

কিন্তু অক্ষয়বাবু তখনও কিছু বলতে পারছিলেন না। তাঁর ফ্যাকাশে চোখ দুটো যে ঈষৎ আর্দ্র হয়ে উঠেছিল, ঘরের মানুষগুলি তাও লক্ষ্য করছিল। চাওয়ামাত্র এতগুলি টাকা ঘরে এসে গেছে, এটা কি কম কথা! অক্ষয়বাবুর স্ত্রীর চোখ দুটো পর্যন্ত কৃতজ্ঞতায় ছলছল করে উঠল।

'এ বয়সে রোগের অবহেলা করলে চলবে না, নিয়মিত চিকিৎসার দরকার, ডাক্তার যেভাবে বলবে, সেভাবে চলতে হবে—পথ্য-টথ্য যাতে চালিয়ে যেতে পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে......' সত্যি যেন ঘরের ছেলে কথা বলছিল, সেই আন্তরিকতা আর তার সঙ্গে কিছুটা যেন অনুযোগ-অভিযোগ ছিল পরিমলের গলার স্বরে। 'আপনি বলেননি, কিন্তু প্রলয় আমাকে বলতে পারত, বুলা বলতে পারত, কাকিমা বলতে পারতেন. টাকার অভাবে আপনার চিকিৎসা চলছে না। আমি সকালেই টাকা নিয়ে আসতাম।'

অক্ষয়বাবু আর চুপ থাকতে পারলেন না, আবেগে তাঁর গলার স্বর কাঁপছিল। 'ঠিক আছে, তুমি তো এসে গেছ বাবা, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলে—তোমার মন যে কত প্রশস্ত, ভেতরটা যে কত সুন্দর তা কি আমি জানি না........তাই তো বুলাকে তখন বললাম, যা তোর দাদাকে একটা ফোন করে দে—কই রে বুলা—'

অক্ষয়বাবু মেয়েকে কেন ডাকলেন, অক্ষয়বাবুর স্ত্রী বুঝতে পারলেন। কেননা, আগে থাকতেই সেভাবে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন তাঁরা। আজ আর চায়ের কথাটা অক্ষয়বাবু মুখে প্রকাশ করলেন না। বুলার ডাক পড়তেই অক্ষয়বাবুর স্ত্রী মেয়েকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। উনুনে কেটলি চাপানো ছিল। একটা প্লেটে কিছু নোনতা খাবার ও ক'খানা ছানার সন্দেশ সাজিয়ে বুলাকে দিয়ে তিনি সেটা ওঘরে পাঠিয়ে দিলেন। বুলা পরে এসে চা নিয়ে যাবে। অক্ষয়বাবুর স্ত্রী একটা পরিষ্কার কাচের গেলাসে জল গড়িয়ে নিয়ে মেয়ের পিছনে পিছনে পরিমলের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'একী করছেন কাকিমা', পরিমল চমকে উঠল, প্রতিবাদ করে উঠল। 'না না, এ আপনাদের ভয়ানক অন্যায়—আমার সঙ্গে ভদ্রতা করতে হবে? কতগুলো পয়সা ফেলে দোকান থেকে মিষ্টি এনে—ছি ছি—'

'কিছু না বাবা, কিছুই তোমার জন্য আনা হয়নি।' অক্ষয়বাবুর স্ত্রী এই প্রথম পরিমলের সঙ্গে সরাসরি কথা বললেন, 'শুধু চা খেতে নেই—তাই একটুখানি—'

'ইস্ দেখেছ! কত! এর নাম একটুখানি—আচ্ছা ঠিক আছে', যেন আর গত্যন্তর না দেখে পরিমল প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়ল এবং একটা সন্দেশ হাতে নিয়ে ঘাড় সোজা করে বুলার দিকে তাকাল। 'এই নাও বুলা, তুমিও ভাগ নাও, তোমাকেও একটু খেতে হবে—'

'না, না—সেকী!' লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে বুলা মার পিছনে লুকোতে চেষ্টা করল। কিন্তু

পরিমল তার আপত্তি শুনল না। তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'আমি একলা খাব, এ কখনো হয়—তোমাকে এটা নিতেই হবে।' বুলা দরজার দিকে ছুটে যাচ্ছিল, পরিমল তার হাতটা ধরে ফেলল। এই অবস্থায় কানে মুখে লাল হয়ে উঠে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে ঘন ঘন আন্দোলিত করা ছাড়া বুলা আর কী করতে পারত।

অক্ষয়বাবুর স্ত্রী হাসছিলেন। পরিমল কিছুতেই ছাড়বে না এবং মেয়ে কিছুতেই সন্দেশটা হাতে নেবে না।

'নে, এমন সাধাসাধি করছে তোর দাদা, না নিলে সে দুঃখ পাবে।' অক্ষয়বাবুর স্ত্রী হাসছিলেন বটে, কিন্তু একটু শাসনের সুরও ছিল তাঁর কথার মধ্যে। অগত্যা বুলাকে হাত পেতে সন্দেশটা নিতে হল। কিন্তু পরিমল সেখানেই নিবৃত্ত হল না। প্লেট থেকে আর-একটা সন্দেশ তুলে দরজার দিকে সরে গেল। বুলার ছোটো ভাই নিলয় সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। দশ বছরের বালকের চোখে লজ্জা ও সঙ্কোচের চেয়ে লোভ, কৌতূহল ও আনন্দটাই যে বেশি ফুটে উঠেছিল, তা সকলেই দেখতে পাচ্ছিল।

'ছি ছি,' অক্ষয়বাবুর স্ত্রী এবার আর হাসলেন না। 'সবই দিয়ে দিলে তুমি—প্লেটে আর রইল কী।'

'অনেক আছে কাকিমা—যথেষ্ট আছে।' পরিমল ফিরে এসে চেয়ারে বসল। 'ছোটো ভাইবোনদের ফেলে কি এসব মুখে তুলতে ইচ্ছে করে—কাকাবাবুকে কিছু খেতে দিলেন না?'

'আমি একটু আগে দুধ-খই খেয়েছি—এসব তো হজম করতে পারি না বাবা।' অক্ষয়বাবু হেসে একটু নড়েচড়ে বসলেন।

'আমি চা নিয়ে আসছি।' অক্ষয়বাবুর স্ত্রী ভিতরে চলে গেলেন। সন্দেশ হাতে নিয়ে বুলা আগেই সেখান থেকে পালিয়েছে।

'প্রলয়কে কিন্তু দেখছি না—এখানেই তো ছিল তখন।' পরিমল আর একবার ওপাশের দরজার দিকে চোখ ফেরাল।

'খুব সম্ভব বাজারে গেছে।' অক্ষয়বাবু বিড়বিড় করে বললেন, 'আমার মনে হয়, তোমার কাকীমা শুধু চা-মিষ্টি খাইয়ে তোমায় ছেড়ে দেবেন না আজ—'

'সে কি!' পরিমল অপ্রস্তুত হতে গিয়ে ক্ষীণ হাসল। 'এই খেয়েই তো আমার পেট ভরে গেল, তার ওপর আবার—' তার কথা শেষ হল না, অক্ষয়বাবুর স্ত্রী চা নিয়ে ফিরে এলেন। পরিমলের কথা তিনি শুনতে পেয়েছেন বোঝা গেল। তিনি হাসছিলেন।

'যুবক মানুষ, একটুখানি মিষ্টি খেয়ে পেট ভরে গেল, এ কথা আর যে-ই বিশ্বাস করুক, তোমার মা-খুড়িমারা তা বিশ্বাস করবেন কেন! আমি তোমার মায়ের মতন। দুটি ভাত খেয়ে যাবে এখানে। আমি রান্না চাপিয়ে দিয়েছি।'

'আর একদিন এসে খাব কাকিমা, আজ না।' পরমিল সত্যি অসহায়বোধ করছিল।

'আচ্ছা, আর একদিন এসে খেও, আজও দুটি খেয়ে যাবে। তাতে দোষ হবে না। আমার প্রলয় নিলয়ের মতন তুমিও এ-বাড়ির ছেলে, সুতরাং—'

পরিমল বুঝল, আর আপত্তি করা বৃথা। কিছুতেই তাঁরা তাকে ভাত না খেয়ে যেতে

দেবেন না। বাটনা বাটার শব্দ হচ্ছিল। সে খাবে। নিশ্চয় একটু ভালো-মন্দ রান্না হচ্ছে। তাই ওদিকের রান্নাঘরে বসে কে মশালা পিষছে। কাল বুলার হাতের তেলোয় হলুদের দাগ দেখেছিল পরিমল। মসৃণ সুকুমার হাতের ছবিটা তার মনে পড়ল। পরিমলের হাত থেকে সন্দেশ নিতে গিয়ে কচি হাতখানা কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

অক্ষয়বাবুর সঙ্গে গল্প করে পরিমল এক সময়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। তালগাছের মাথার ওপর দিয়ে রুপোর ডিমের মতন চাঁদ উঠেছে। ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাস বইছে। একটু রাত হয়েছে। চারদিক নীরব। মনে হয়, বস্তির অন্য সব ঘরের মানুষদের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে। আলো নিভিয়ে তারা শুয়ে পড়েছে। কেবল এই ঘরটা আজ এখনও সজাগ। যেন মাংস চাপানো হয়েছে। গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। টালির ঘরের ছোটো বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিলয়ের সঙ্গে পরিমল গল্প করছিল। এবার নিলয় ক্লাস সিক্স-এ পড়ছে। কাছেই স্কুল। ফার্স্ট-টার্মিন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। ইংরেজি আর অঙ্কে ভালো নম্বর পেয়েছে। বাংলা ও ভূগোলে একটু খারাপ করেছে। তা হলেও গত বছর ক্লাসের পরীক্ষায় সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। তাই এ বছর হাফ্-ফ্রী-স্টুডেন্টশিপ পেয়েছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে পরিমল সব জেনে নিচ্ছিল। অবশ্য এতক্ষণ ঘরে বসে অক্ষয়বাবুর সঙ্গে পরিমলের যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তার মধ্যে ছোটো ছেলে নিলয়ের পড়াশোনার প্রসঙ্গও উঠেছিল। অক্ষয়বাবু এই ছেলেকে দিয়ে অনেক কিছু আশা করেন। প্রলয়ের কিছু হল না। দু-দুবার এক ক্লাসে ফেল করেছিল। তার তুলনায় ছোটো ছেলে যে অনেক বেশি 'ইন্টেলিজেন্ট' 'শার্প' অক্ষয়বাবু এখন থেকেই সেটা বুঝতে পারছেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে এবং নিয়মমতো পড়াশোনা করে গেলে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় সে যে খুব ভালো রেজাল্ট্ করবে এ সম্পর্কে অক্ষয়বাবুর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আবার সেই 'স্কুল ফাইন্যাল' 'ভালো রেজাল্ট্'—পরিমলের বুকের ভিতর ধ্বক্ করে উঠেছিল। কতদিন পর অক্ষয়বাবুর মুখে কথাগুলি শুনল সে। সঙ্কুচিত আড়ষ্ট হয়ে, কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বৃদ্ধের মুখের দিকে সে তাকিয়েছিল। তারপর তার সন্দেহ দূর হয়েছে, নিশ্চিন্ত হতে পারল সে। না, সেই নাম তিনি উচ্চারণ করবেন না। যেন নামটা ভুলে গেছেন আজ। কিন্তু ইচ্ছা করে কি তাঁর এই ভুলে থাকা? পরিমল নূতন করে তখন অস্বস্তিবোধ করছিল। তাই তো, কয়েক ঘণ্টা হতে চলল, সন্ধ্যা থেকে সে এ বাড়িতে, কিন্তু বাড়ির একটি মানুষের মুখেও সে মলয়ের নাম শুনল না। কাল তাদের চোখে মুখে অপরিমেয় উদ্বেগ নৈরাশ্য বিষণ্ণতা দেখা গিয়েছিল। আজ একটা সন্ধ্যার মধ্যে সকলেই কেমন প্রফুল্ল নিরুদ্বিগ্ন সহজ হয়ে উঠেছে।

কাজেই পরিমলের বিষণ্ণ ভাবটা কাটল না। যেন তার মনের দিকে তাকিয়ে, তাকে খুশি রাখতে অক্ষয়বাবু, অক্ষয়বাবুর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা হাসিখুশি চেহারা করে রেখেছে। অন্য রকম একটা অপরাধবোধ, একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে পরিমল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ির ছোটো ছেলেটির সঙ্গে কথা বলছিল।

'তোমার কি ঘুম পেয়েছে?'

'না তো।' নিলয় একটু চমকে উঠল, তারপর ফিক করে হাসল। 'এত সকালে আমি ঘুমোই না।'

পরিমল বুঝল, ছেলেটি বুদ্ধিমান। কেননা, সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ছেলেটি হঠাৎ ঢুলছিল। কিন্তু এখন ধরা পড়ে গিয়ে হাসছে। অর্থাৎ হেসে নিলয় প্রতিপন্ন করতে চাইছে তার মোটেই ঘুম পায়নি।

তাই পরিমলও অল্প হেসে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'তোমাদের এদিকটায় খুব মশা?'

'হুঁ।' নিলয় আঙুল দিয়ে মাঠের ওদিকটা দেখাল। 'ওখানে একটা জলা আছে—ওই থেকে যত মশার সৃষ্টি।'

পরিমল দেখতে পেল মাঠের ওদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে জলের ওপর জ্যোৎস্না চিকচিক করছে।

'ভারী সুন্দর লাগছে জায়গাটা! এসো একটু ঘুরে দেখে আসি।'

পরিমলের প্রস্তাবে নিলয় খুশি হল।

'আমিও যাব।' আর একজন আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পরিমল ঘাড় ফেরাল। বুলা।

'তবে তো ভালোই হয়!' পরিমল অল্প শব্দ করে হাসল। 'তিনজনে বেড়াতে বেড়াতে গল্প করা যাবে।'

'কিন্তু তোমরা দেরি করো না। আমার রান্না হয়ে গেছে।' অক্ষয়বাবুর স্ত্রীও বারান্দায় এসেছিলেন। হাসছিলেন তিনি।

দুই ভাইবোনকে সঙ্গে নিয়ে পরিমল মাঠের জল দেখতে অগ্রসর হল।

॥ ২৭ ॥

না, গোঁসাইপাড়া বস্তির সব মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছিল কথাটা ভুল। কিছু মানুষ জেগে ছিল। ঘরের বেড়ার গায়ে গায়ে মিশে কী উঠোন বারান্দার যে-সব অংশে অন্ধকার বেশি, সে-সব জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তারা পরম কৌতূহল নিয়ে অক্ষয় উকিলের ঘরটা দেখছিল। যদি একটা-দুটো কথা শোনা যায়। দারুন আগ্রহ নিয়ে তারা মুহুর্মুহু কান খাড়া করে ধরছিল। তারা জেনে গেছে, আজ সন্ধ্যার দিকে যে-মানুষটি অক্ষয়বাবুর ঘরে এসেছে, সে সাধারণ মানুষ না, একজন খুনী, এই অক্ষয়বাবুর বড়োছেলেকে খুন করেছিল, তারপর দশ বছর জেল খেটে ক'দিন হয় বেরিয়ে এসেছে।

অক্ষয়বাবু বাড়ি বদল করেছেন। তা-ও ক' বছর হয়ে গেল। এ-পাড়ার কেউ কেউ হয়তো শুনেছিল, প্রলয়ের এক বড়ো ভাই ছিল। তার অপঘাত মৃত্যু ঘটেছিল, তাকে খুন করেছিল। কে খুন করেছিল, কোথায় খুন করেছিল অথবা সেই খুনী এখন কোথায়, কেউ বড়ো একটা জানতে চায়নি। কথাটা শুনেছে, তারপর হয়তা ভুলেও গেছে। আবার এমন মানুষ আছে—যারা কোনোদিনই জানত না যে প্রলয়ের এক দাদা ছিল, অক্ষয়বাবুর আর একটি সন্তান ছিল। সেই সন্তানকে অনেকদিন আগে কে মেরে ফেলেছে।

আজ নূতন করে অনেকেই খবরটা শুনল, এবং যারা এই ঘটনা ভুলে গিয়েছিল, তাদের আবার কথাটা মনে পড়ল। তাতেও বিশেষ কিছু এসে যেত না—কিন্তু তারা শুনল, সেই খুনী অক্ষয়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, অক্ষয়বাবুর কাছে ক্ষমা চেয়েছে: অক্ষয়বাবুর

উপকার করতে, এভাবে সেভাবে তাঁকে সাহায্য করতে মানুষটা এখন নাকি ভীষণ ছটফট করছে। কাজেই এমন এক খুনীকে দেখতে কার না কৌতূহল হয়!

খবরটা জানাজানি হয় এভাবে।

পরিমলের জন্য খাবার কিনতে প্রলয় সেই বড়ো রাস্তায় জলধরের দোকানে গিয়েছিল।

জলধরের সঙ্গে প্রলয়ের ইদানীং একটু বেশি জানাশোনা ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, কারণ রোজ সকালে প্রলয় একখানা খবর কাগজ তার দোকানে পৌঁছে দিয়ে আসে। আগে অন্য হকার জলধরকে কাগজ দিত। কিন্তু প্রলয় কাগজ ফেরি করতে আরম্ভ করার পর এই ভদ্রলোকের ছেলেটির কাছ থেকে সে কাগজ নিতে আরম্ভ করে। এ ছাড়া, প্রলয় যখন ছোটো ছিল, তখন তো সে এ-পাড়ায়ই ছিল। তখনই জলধর অক্ষয়বাবুর ছেলেকে চিনত। আজ প্রলয় বড়ো হয়েছে। কাগজ দিতে এসে জলধরের সঙ্গে একটা-দুটো কথাও বলে, যখন কাজ থাকে না, তখন দোকানে এসে জলধরের সঙ্গে একটু গল্প-সল্পও করে যায়ও এবং হয়তো জলধরের সামনেই বিড়িটা সিগারেটটা খায়। তাতে জলধর কিছু মনে করে না। কারণ, প্রলয় এখন সাবালক হয়েছে। হয়তো দু বছর আগে এমন জিনিস দেখলে জলধর চোখ লাল করত কী একটা চড় বসিয়ে দিয়ে প্রলয়কে তৎক্ষণাৎ মুখের বিড়ি-সিগারেট ছুঁড়ে ফেলতে বাধ্য করত।

যাই হোক, আজ প্রলয় ব্যস্তসমস্ত হয়ে দোকানে ঢুকে সিঙ্গাড়া-সন্দেশ কিনছে দেখে জলধর বুঝতে পারল, অক্ষয়বাবুর বাড়িতে আত্মীয়-অতিথি কেউ এসেছে।

'কী ব্যাপার, দু টাকার খাবার কিনে ফেললে, কে এসেছে হে বাড়িতে?'

'পরিমলদা।' তেমনি ব্যস্ততা নিয়ে খাবারের ঠোঙা হাতে প্রলয় দোকান থেকে বেরিয়ে আসত। জলধরের প্রশ্ন শুনে থমকে দাঁড়াল।

জলধর হঠাৎ একটু চিন্তা করল, তারপর প্রলয়ের চোখের দিকে তাকাল।

'পরিমলদা! কোন পরিমল?' যেন জলধর একটু বিস্মিত হল।

'সে অনেক দিনের কথা। তখন আমি এইটুকুন বাচ্চা ছেলে ছিলাম। জগমোহন ডাক্তারের ছেলে দাদার বন্ধু ছিল। আমাদের বাড়িতে খুব আসত।''

'অ্যাঁ!' জলধর এবার আসন ছেড়ে রীতিমতো একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'তাই বল, একডালিয়া রোডের পরিমল তো! হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাল আমি দেখলাম। এই তুমি যেখানটায় দাঁড়িয়েছ, কাল ঠিক ওখানটায় এসে হঠাৎ দাঁড়াল। তখন রাত ক'টা, হুঁ, আটটা বেজে গেছে। তোমাদের বাড়ির ঠিকানা চাইল। বললাম, আগের বাড়িতে নেই, গোঁসাইপাড়ার বস্তিতে আছেন এখন উকিল মশায়। বাড়ি যাবার রাস্তাটাও বলে দিলাম। দাঁড়াল না, তখনই আবার হন হন করে তোমাদের বাড়ির দিকে চলে গেল। কিন্তু আমি ঠিক চিনতে পারলাম, মলয়ের বন্ধু সেই খুনেটা। ওফ্ দ্যাখ, এত বছর পরেও আমি মুখটা দেখেই ধরে ফেলেছি।'

. 'একটু মুটিয়ে গেছে।' প্রলয় হাসল। 'তা না হলে মুখটা তো প্রায় এক রকমই আছে। কাল রাত্রে যখন বাবার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, আমিও দেখেই চিনে ফেললাম।'

জলধর ঘাড় নাড়ল।

'তা মোটা তো হবেই, দশ বছর জেলখানার ফেন-ভাত খেয়ে এসেছে। কবে খালাস পেল? হঠাৎ যে তোমাদের বাড়ি?'

জলধরের কৌতূহল দেখে প্রলয় একটু খুশিই হল। আসলে প্রলয়ের ভিতরে ঘোরপ্যাঁচ কম। প্রকৃতিটা সরল। হড়হড় করে যখন-তখন যার-তার কাছে সব কথা বলে ফেলে। এইজন্য অনেকেই তাকে ভালোবাসে। আবার কেউ কেউ মনে করে ছেলেটা বোকা। যেমন তার বাবা অক্ষয়বাবু। তিনি নিজে ঘোরপ্যাঁচ পছন্দ করেন। প্রলয়ের এই বোমভোলা, সাদাসিধা স্বভাব তাঁকে পীড়িত করে। তাই তিনি প্রায়ই ছেলেকে গাল-মন্দ করেন। 'সকলের কাছে সব কথা বলতে নেই—এদিনে অতিরিক্ত সরল হওয়ার বিপদ আছে—' মাঝে মাঝে প্রলয়কে তিনি সাবধান করে দেন, 'তুমি যেমন সোজা, দুনিয়ার মানুষ কিন্তু তত সোজা না, তোর সরলতা দিয়েই মানুষ একদিন তোকে ঠেসে ধরবে, তখন মজা টের পাবি।'

কিন্তু প্রলয় এই পরিণাম সম্পর্কে কোনোদিন মাথা ঘামায় বলে মনে হয় না। আজও জলধর প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে সব সে বলে দিল।

'এই তো তিন-চার দিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। প্রথমেই কাল আমাদের বাড়ি ছুটে এল। আমরা তো দেখে অবাক। ভয়ও হচ্ছিল খুব। কি জানি, আবার কী মতলব নিয়ে বাড়ি ঢুকছে। কিন্তু পরে দেখলাম, না, সেই মানুষ আর নেই। একেবারে মাটি হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করতেই বলল, বাবার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে। তা বাবা ক্ষমা করলেন, খুব পায়ে-টায়ে ধরল বাবার, কাজেই ক্ষমা না করে তিনি করেন কী, যে-মানুষ গেছে সে তো আর ফিরবে না, তাছাড়া বাবা বুড়ো হয়েছেন, বাতে ভুগে ভুগে যাচ্ছেতাই শরীর হয়েছে—আগের সেই জেদও নেই, রাগও নেই, এখন একটা মানুষ দশ বছর পরে যদি ক্ষমা চাইতে আসে, নিজের দুষ্কর্মের কথা মনে করে অহরহ বুকের ভেতর যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে বোঝা যায়—তাই বোঝা যাচ্ছিল পরিমলদার চোখ দেখে, আমরা না বুঝলেও বাবা বুঝতে পেরেছিলেন, ভীষণ অনুতাপ এসেছে পরিমলদার মনে, তাই বাবা শেষ পর্যন্ত মানুষটাকে ক্ষমাই করলেন, বসতেও বললেন, কুশল-টুশল জিজ্ঞেস করলেন—আর আমরাও দেখলাম, কী সাংঘাতিক বদলে গেছে সেই মানুষ, মনটা কাদার মতন নরম হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ছিল কাল আমাদের ঘরে। মাকেও প্রণাম করল, চা খেতে বলা হল, চা খেল না—তারপর যাবার সময় বাবাকে কুড়িটা টাকা দিয়ে গেল, বলল—আপনার শরীর খারাপ হয়ে গেছে কাকাবাবু, দুধ-টুধ খাবেন।'

'ভালোই হয়েছে।' সব শুনে জলধর ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। 'রেষারেষি রাখা ভালো না, শত্রুতা জিইয়ে রাখাটা খারাপ। ক্ষমা করে উকিলবাবু একটা বুদ্ধিমান মানুষের মতন কাজ করেছেন—নিজে থেকে যখন ডাক্তারের ছেলে ক্ষমা চাইতে এল।'

'হুঁ, আজ আবার এসেছে। কাল বাবার শরীর খারাপ দেখে গেছে কি না, তাই আজও দেখতে এল।'

জলধর আর কিছু বলল না।

আজ পরিমলকে যে টেলিফোন করে আনা হয়েছে, তার কাছে টাকা চাওয়া হয়েছে, প্রলয় একথাটা অবশ্য জলধরের কাছে প্রকাশ করল না।

কিন্তু কথাটা গোপন রইল না।

খাবারের ঠোঙা নিয়ে প্রলয় চলে যাবার পাঁচ মিনিট পর গোঁসাইপাড়া বস্তির আর-একটি মানুষ জলধরের দোকানে এসে ঢুকল। প্রদোষের বাবা অটলবাবু রোজই একবার এ সময় সকালের বাসি খবর কাগজখানা পড়তে হাঁটতে হাঁটতে দোকানে চলে আসেন। কেরানি মানুষ। সকাল আটটায় নাকে-মুখে ভাত গুঁজে অফিসে ছোটেন। সারাদিন সেখানে কলম পেষেন। অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বাজার সওদা করেন, তারপরও বাড়ি ফিরে, কারো অসুখ-বিসুখ থাকলে ডাক্তার কবিরাজের দরজায়, কী ওষুধের দোকানে ছুটোছুটি আছে, প্রদোষের কাছ থেকে তো কোনো কাজে সাহায্য পান না, ছেলে সারাদিন নাটক-নভেলের মধ্যে মুখ গুঁজে আছে, যে কারণে তিনি তার ওপর খুবই বিরক্ত—তাই সারাদিন পার করে সন্ধ্যার পর অবসর পেয়ে সেদিনের পেপারখানার ওপর চোখ বুলোতে অটলবাবু জলধরের দোকানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে জলধর একগাল হেসে বলল, 'খবর শুনেছেন মশাই!'

'কী খবর?' নিরীহ ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ, লোকের সাত-পাঁচ কথার মধ্যে থাকেন না, কোনো রকম হই-চই-এর মধ্যেও যান না, তাছাড়া, একগাদা পুষ্যি নিয়ে দুর্মূল্যের বাজারে অহরহ নিজের সংসারের অভাব-অনটন, আধিব্যাধির খবর শুনেই তিনি অস্থির। জলধরের কথায় অটলবাবু কেমন হকচকিয়ে উঠলেন। প্রথমটায় ভাবলেন, যুদ্ধবিগ্রহের খবর, দাঙ্গাহাঙ্গামা হতে পারে, অথবা রকেটযোগে চন্দ্রাভিযানের খবর বলতে জলধর বুঝি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। হয়তো আজকের কাগজখানার মধ্যেই কোথাও সে-খবর লেখা রয়েছে। এখনও পড়া হয়নি, সবে ভাঁজ খুলে তিনি কাগজের এলেমেলো পৃষ্ঠাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে বসেছেন। 'না, এখনো দেখা হয়নি।' বলে তিনি ব্যস্ত হয়ে কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ছিলেন। জলধর বাধা দিল।

'আরে ওখানে আপনি দেখছেন কী, আমার মুখের দিকে তাকান. খবরটা যে আপনার পাশের ঘরে।'

'কী রকম?' একটু যেন বিরক্ত হয়ে অটলবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। ঘাড় তুলে জলধরের মুখের দিকে তাকালেন। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

জলধর আবার হাসল। তারপর চোখ দুটো গোল করে বলল, 'অক্ষয় উকিলের ঘরে এক সাংঘাতিক আদমি এসেছে। দেখেছেন? শুনেছেন কিছু?'

'না দেখিনি, হ্যাঁ, শুনলাম, প্রদোষের মুখে শুনলাম, উকিলবাবুর বড়োছেলের এক বন্ধু নাকি অনেক দিন পর ওদের বাড়ি দেখা করতে এসেছে। মস্ত বড়োলোকের সন্তান—'

'হ্যাঁ, তা বড়োলোকের সন্তান বটে, গাড়ি বাড়ি আছে—আপনি কি উকলিবাবুর বড়ো ছেলেকে কোনোদিন দেখেছিলেন, সেই ছেলের কী হয়েছিল, জানেন কিছু?'

'না ভাই', অটলবাবু বিনীতভাবে মাথা নাড়লেন। 'আমরা তো এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলাম না, এখন হয়েছি; এখন স্থায়ী-অস্থায়ী সব এক হয়ে গেছে—তা না হলে গোঁসাইপাড়া বস্তির প্রায় সব ক'টা ঘরের মানুষই তো পূর্ব বাঙলার লোক। ওখানে ভিটেমাটি খুইয়ে এখানে এসে আস্তানা গেড়েছি। অক্ষয়বাবুর বড়োছেলেকে দেখিনি, তবে কি না—' একটু আমতা

আমতা করে অটলবাবু বললেন, 'অক্ষয়বাবুর বড়োছেলেকে নাকি কে একটা মানুষ খুন করেছিল, অবিশ্যি এটা শোনা কথা ভাই—সত্য কী মিথ্যা, আমি বলতে পারব না।'

'ঠিকই শুনেছেন মশাই, সত্য খবরই শুনেছেন।' মোটা মানুষ জলধর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছিল। এবার সোজা হয়ে বসল। 'এসব খবর কোনোদিন মিথ্যা হয় না। আমরা তো সব জানি, নিজের চোখে সব দেখেছি। ওই সেই আদমিই আজ অক্ষয়বাবুর বাড়ি এসেছে। প্রলয়ের বড়ো ভাই মলয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, একটা চায়ের দোকানে মলয়কে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার বুকে এত বড়ো একটা ছোরা বসিয়ে দিয়েছিল, সেই রাত্রেই হাসপাতালে ছেলেটা মারা যায়। ফাঁসীই হত পরিমলের, হুঁ, একডালিয়া রোডের জগমোহন ডাক্তারের ছেলে, পরিমল নাম, এখন শুনছি জগু ডাক্তার নারকেলডাঙ্গায় মস্ত বাড়ি ফেঁদে সেখানে বসবাস করছে—বালিগঞ্জ থেকে অনেকদিন আগেই সেই খুনের ঘটনার পরই সরে গিয়েছিল।'

'তারপর?' অটলবাবুর কপালে তিন থাক রেখা পড়েছিল, ভুরু দুটো কপালে উঠে গিয়েছিল। 'হঠাৎ আবার সেই ডাকাতটা আজ অক্ষয়বাবুর বাড়ি এল কেন, এতদিন কোথায় ছিল!'

'এই তো তিন চারদিন হয় জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে, দশ বছর খেটে এসেছে—উকিলের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে, খুব নাকি অনুতাপ এসে গেছে পরিমলের', বলতে বলতে জলধর নিজের আসন থেকে সরে এসে অটলবাবুর বেঞ্চিটার কাছে ঝুঁকে দাঁড়াল, তারপর চাপা গলায় বলল, 'কাল রাত্রে ক্ষমা চেয়ে গেছে, কুড়িটা টাকাও দিয়ে গেছে, উকিলের হাতকাটা ছেলেটা এই মাত্র আমাকে বলে গেল।'

'আজ আবার এসেছে?'

'হুঁ, দুটাকার মিষ্টি কিনে নিয়ে গেল প্রলয়।'.......

অটলবাবু ফ্যালফ্যাল করে জলধরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আর কিছু বলতে পারছিলেন না তিনি।

'কী হল, আপনি দেখছি মশাই একেবারে থ খেয়ে গেলেন, ঠাণ্ডা মেরে গেলেন? ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন কিছু?'

'না, তাই তো, আজ আবার এল কেন!'

'ঐ যে, কুড়িটা টাকা, কুড়ি টাকা পেয়ে উকিল উকিল-গিন্নি গদ্‌গদ হয়ে গেছে—ভয়ানক অভাবের মধ্যে আছে তো ফ্যামিলিটা, প্রলয়ের কাগজ ফেরির রোজগারে কি আর এদিনে এত বড়ো সংসার চলে, তাই আজ আবার আসতে না আসতে দুটাকা খরচ করে মিষ্টি টিষ্টি খাওয়াচ্ছে, খাতির যত্ন করছে।'

'তার মানে ভবিষ্যতে আরো কিছু—'

'হ্যাঁ, মশাই হ্যাঁ, ঐ তো আপনার মাথা খুলেছে—চিন্তাটা হড়হড় করে এসে গেছে। তা না হলে পুত্রশোক ভুলে গিয়ে উকিল মশায় জামাই-আদর করতে লেগে যাবে কেন খুনেটাকে। আর, জগু ডাক্তারের ছেলেও ঝোপ বুঝে কোপ দিতে জানে, আরো বিশ-পঞ্চাশ টাকা উকিলের হাতে গুঁজে দিয়ে যদি এখানে আবার নূতন করে আড্ডা গাড়া যায়—

জানেন না আপনি, প্রলয়ের ভাইকে খুন করার আগে রাতদিন অক্ষয় উকিলের বাড়ি পড়ে থাকত ব্যাটা—'

এবার অটলবাবু কেমন শিউরে উঠলেন। চোখ পাকিয়ে বললেন, 'অ্যাঁ! তবে কি ডাক্তারের ছেলের আবার একটা তেমন কিছু মতলব আছে, আর একটা খুন-জখম—'

'জানি না মশাই।' চোখের পুতুলী দুটো শূন্যে তুলে দিয়ে হঠাৎ দার্শনিকের মতন চেহারা করে ফেলল জলধর। 'আমারও তো সেই প্রশ্ন, খুন জখম না করুক, একটা কুমতলব নিশ্চয়ই আছে, না হলে জেল থেকে বেরিয়েই এখানে আনাগোনা আরম্ভ করবে কেন দুষ্টু।'

'তবে যে বললে একটু আগে, উকিলের ছেলে নাকি বলছে খুব অনুতাপ হয়েছে, বিবেকের দংশন আরম্ভ হয়েছে ডাক্তারের ছেলের, উকিলের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছিল—'

'আরে ধুত্তুরি মশাই'—জলধর ধমক দিয়ে উঠল, 'আপিসে কলম পিষে পিষে আপনার মাথায় আর কিছু নেই—খুন জখম বলাৎকার রাহাজানি করে যাদের অনুতাপ হয় তারা নেংটি পরে সন্ন্যেসী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে, আর অনুতাপের মাত্রাটা বেশি হলে তো কথাই নেই, আত্মহত্যা করে, নয়তো পাগল হয়ে যায়, তা বলে কি আর যার ছেলেকে একদিন খুন করেছিল জেল থেকে বেরিয়ে এসে তার বাড়িতে ঢুকবে, না তার ঘরে বসে মৌজ করে সিঙ্গাড়া রসগোল্লা খাবে।' একটু থেমে জলধর আবার বলল, 'হ্যাঁ উকিলের ছেলে বলে গেছে, জগুডাক্তারের ছেলের মনে খুব দুঃখ হয়েছে, বিবেক-টিবেক এসে গেছে, এসব হল ওদের কথা—উকিল পরিবারের কথা, আসলে কোন্ মতলব নিয়ে সে ও বাড়ি ঢুকেছে তা কে বলবে।'

'না, তুমি ঠিকই বলেছ জলধর',—এবার অটলবাবু মাথা নাড়লেন। 'জেনেশুনে এমন একটা লোককে আবার বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া, না হয় একদিন ঢুকেছিল, তা বলে রোজ আসবে আর তাকে আস্কারা দেওয়া হবে—উঁহু কিছুতেই উচিত না, এর রেজাল্ট ভালো হবে না।'

জলধর তার আসনে ফিরে যেতে যেতে বলল, 'কী হয় শেষ পর্যন্ত দেখুন না—আমার তো মনে হয় অনেক মজা হবে, অক্ষয় উকিলকে আবার মাথায় চুল ছিঁড়তে হবে, বুক চাপড়াতে হবে।'

খবর কাগজখানা আর ভালো করে পড়াই হল না অটলবাবুর। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে কথাটা বললেন। অটলবাবুর স্ত্রী তখন দক্ষিণের ভিটের কনক বউকে গিয়ে বলে দিলেন। কনক বউ তার স্বামী মোহিতকে বলল। মোহিতের মুখ থেকে পুব আর পশ্চিমের ভিটের মানুষগুলি শুনল। তারা বলল তাদের পাশের ঘরের মানুষকে। দশ মিনিটের মধ্যে কথাটা জানাজানি হয়ে গেল। আর তখন দারুণ কৌতূহল ও উৎসাহ নিয়ে গোঁসাইপাড়া বস্তির ছেলে বুড়ো যুবক যুবতী আড়ালে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে অক্ষয়বাবুর ঘরের দিকে চেয়ে রইল। তারা খুনীকে দেখবে, যদি একবার লোকটা বাইরের রোয়াকে এসে দাঁড়ায় কী ভিতরের উঠোনে নামে। এবং সকলেই টের পেল উকিলের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত রান্নাবান্না হচ্ছে। মাংস পাক হচ্ছে। তার অর্থ, কেবল জলধরের দোকানের মিষ্টি খেয়ে খুনেটা বিদায় নিচ্ছে না। ভাত খেয়ে যাবে।

তারপর সকলেই দেখল, তখন অক্ষয় উকিলের ঘরের দরজায় চাঁদের আলো পড়েছে, ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা ডাকাতের মতন লম্বাচওড়া জোয়ান মানুষটা বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কোথায় চলল সে। সঙ্গে ওটি কে? উকিলের ছোটো ছেলে নিলয়। না, কেবল তো নিলয় না, উকিলের মেয়েও আছে। রাত করে ঐ খুনেটার সঙ্গে যুবতী মেয়েকে কোথায় পাঠাচ্ছে উকিল, উকিলের স্ত্রী? চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল বস্তির মানুষগুলির। তাই বলো, মাঠে বেড়াতে যাচ্ছে, চাঁদের আলোয় হাওয়া খেতে চলল বুলা ঐ সাংঘাতিক মানুষটার সঙ্গে। দৃশ্যটা দেখে কারো কারো গায়ে কাঁটা দিল, আবার ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল কেউ।

কিন্তু একজন হাসল না, তার গায়েও কাঁটা দিল না। পাথরের মতন কঠিন বোবা হয়ে আছে সে। তার বুকে ঈর্ষা মনে অস্বস্তি। অন্য মানুষদের থেকে আলাদা হয়ে একলা একটা পাকুড় গাছের অন্ধকার ছায়ায় চুপ করে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা থেকে সব দেখছে সে। প্রলয়দের ঘরের উল্টো দিকে রাস্তার পাশের কাঁচা ড্রেনের ধারে ঝাঁকড়া মাথা পাকুড় গাছটার নীচে মাথা উঁচু মানকচুর জঙ্গলটা চমৎকার আড়াল তৈরি করে রেখেছে। সেখানে দাঁড়ালে প্রলয়দের ঘরের ভিতরটা পরিষ্কার দেখা যায়। অথচ যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে কেউ দেখতে পায় না। ওবাড়ির মানুষ প্রদোষকে দেখল না। প্রদোষ সবই দেখল। তার চেয়ারে বসে তার ফুলদানির ফুলের শোভা দেখতে দেখতে মানুষটা চা মিষ্টি খেল, মাঝখানে বুলার হাতে সন্দেশ তুলে দেওয়া নিয়ে কত সাধ্যসাধনা, বুলাও কি কম রং-ঢং করল, আধো লজ্জা আধো আহ্লাদ নিয়ে মেয়ে কী চোখে সেই মানুষকে তখন দেখছিল তা বুঝবার ক্ষমতা অন্তত এই বস্তির মানুষদের নেই, একমাত্র প্রদোষই বুঝতে পারল সেই চোখের ভাষা। কেননা উপন্যাস লিখবে সে। সেভাবেই সে তার চোখ ও মনকে তৈরি করছে। একটি মেয়েকে নিয়ে সে যত ভাবে, তার চরিত্র নিয়ে সে যত চিন্তা করে এমন আর কে করে এখানে! চা খাবার আগে গুনে গুনে কত টাকা দিল বুলার বাবার হাতে বড়োলোকের ছেলে! সুতরাং এ বাড়িতে মানুষটার খাতির যত্নও সেরকম হবে। প্রদোষ সবই বুঝতে পারছিল। তবু তার বুকের ভিতর একটা কাঁটা খচখচ করছিল। আর তার ডাক পড়ল না বুলাদের ঘরে। তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। অথচ সারাটা বিকেল সে কুলির মতন খেটে মরেছে, এটা টেনে দাও ওটা সরিয়ে দাও সেটা নিয়ে এসো—এখন তার কথা আর কারোর মনে নেই। এক উপন্যাসের হতভাগ্য নায়কের মতন সে বিস্মৃত উপেক্ষিত।

তবু সে সহ্য করছিল।

কিন্তু চাঁদের আলোয় আঁচল উড়িয়ে বেণী দুলিয়ে বুলা যখন ভদ্রলোকের সঙ্গে মাঠ দেখতে চলল তখন প্রদোষের চোখ ফেটে জল এল।

প্রেম যে কান্না আনে প্রতিহিংসা আনে প্রদোষ তা জানে। পর পর কটা উপন্যাসেই সে এ জিনিস পেয়েছে। কিন্তু নিজের জীবনে এই অভিজ্ঞতা লাভ তার প্রথম।

সে কাঁদছিল। আবার তার ইচ্ছা করছিল, একটা ধারালো অস্ত্র হাতে ওদিকে ছুটে যায়। সন্ধ্যার পর মাত্র এই সামান্য দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার মধ্যে তার পৃথিবী যে এমন তিক্ত বিস্বাদ হয়ে উঠবে কে জানত।

॥ ২৮ ॥

জগমোহন স্থির চোখে নতমুখী রমলাকে দেখছিলেন।

তিনি বিস্মিত হলেন, আবার যেন তাঁর কৌতূহলেরও সীমা রইল না। যেন বিষয়টা বুঝতে দু মিনিট সময় লাগল।

'আপনি কি এখন চা খাবেন?' রমলা শ্বশুরের দিকে তাকাল। রাত্রে চেম্বার থেকে ফিরে এসে জগমোহন কোনো কোনোদিন ইচ্ছা হলে একটু চা খান। নিজে থেকেই সেদিন চায়ের কথা বলেন। আবার অনেকদিন বলে কয়েও এ সময় তাঁকে চা খাওয়ানো যায় না। কফিও না। কফি একবারই খান। বেলা তিনটের সময়।

'হুঁ, চা নিয়ে এসো।' পুত্রবধূ মুখ তুলে তাকাতে তিনি চট করে অন্যদিকে চোখটি ফিরিয়ে নিলেন। বললেন, 'কড়া করে একটুখানি চা।' রমলা সঙ্কুচিত হল। এমন বড়ো একটা হয় না। দরুণের মতন শ্বশুর সর্বদাই তার মুখের দিকে সরাসরি তাকান। চোখে চোখ রেখে কথা বলেন। তার অলক্ষ্যে তিনি কোনোদিন তাকে নিরীক্ষণ করেছেন রমলা মনে করতে পারে না।

তাই সে সঙ্কুচিত বিব্রত হয়ে আস্তে আস্তে শ্বশুরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

তার খারাপ লাগছিল।

এখন সে চিন্তা করল, কাজটা তার পক্ষে ভালো হয়নি। শ্বশুর মশায় অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কে জানে, শুনলে স্বামীও অসন্তুষ্ট হবেন। হওয়া উচিত। যদি জগমোহন জিনিসটাকে ভালো চোখে না দেখেন পরিতোষও যে তার ওপর অসন্তুষ্ট হবে এ তো জানা কথা। রাগও করতে পারে। হয়তো রমলাকে কড়া কথা শোনাবে। কড়া কথা শুনবে বলে সে ভয় পাচ্ছে না। জিনিসটার মধ্যে তাঁরা যদি একটা অন্যায় অশোভনতা দেখেন সেটাই ভাবনার কথা।

তাই সে ভাবছে। গ্লানিতে মন ভরে উঠছে।

জগমোহন চমকে উঠেছিলেন কথাটা শুনে। তারপর কৌতূহলী হয়ে যেভাবে একটার পর একটা প্রশ্ন করছিলেন, মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করছিল বুঝি রমলার। তখন এমন একটা চেহারা করেছিলেন শ্বশুর মশায়! 'কখন চাইল? কী করে চাইল? চাকরকে দিয়ে বলে পাঠাল, না কি তোমার কাছে পরিমল নিজেই টাকা চাইল? তারপর? তুমি কী বললে? কী উত্তর দিল সে? আমার কাছে চাইল না কেন জিজ্ঞেস করলে না?'

খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একটা একটা করে প্রশ্ন করছিলেন তিনি। উত্তর দিতে রমলার কষ্ট হচ্ছিল। কেননা, সমস্ত ব্যাপারটা এক সঙ্গে ঘটেছে। এর মধ্যে যে এত সব প্রশ্ন উঠবে রমলা জানত না। জগমোহন সেখানেই থেমে থাকেননি। তার পরেও প্রশ্ন করেছেন। 'আমি বেরিয়ে যাওয়ার কতক্ষণ পরে সে টাকার কথা বলল? সে কি তোমার ঘরে গিয়েছিল? না কি তোমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে—'এবং তার পরেও জগমোহন স্বগতোক্তির মতন করে কথাগুলি বলছিলেন। তাঁর কথার মধ্যে শ্লেষ ছিল কৌতুক ছিল, একটা অদৃশ্য খোঁচাও যেন ছিল। 'আশ্চর্য তো, বাড়িতে আসার পর একদিনও তোমার সঙ্গে সে কথা বলল না, আজ হঠাৎ অক্ষয়ের জন্য তোমার কাছে টাকা চেয়ে বসল!' তার অর্থ, পরিমল অক্ষয় উকিলকে টাকা দিতে গেছে শুনে জগমোহন যেমন বিস্মিত হয়েছেন তেমনি রমলার কাছে টাকা চাওয়া,

তার সঙ্গে পরিমলের কথা বলার মধ্যেও তিনি যথেষ্ট বিস্ময়ের উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। অথচ কথা বলাটা যে কিছু না, সর্বদা রমলা ভাশুরকে দেখছে, তাঁর এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছে, তিনি খেতে বসলে রমলা তাঁকে পরিবেশন করছে—ইচ্ছা করলেই পরিতোষের দাদার সঙ্গে সে কথা বলতে পারে—পরিমলকেও কেউ কথা বলতে বাধা দিচ্ছে না, কিন্তু তিনি স্বল্পভাষী, কথা কম বলেন, হয়তো তেমন করে সরাসরি রমলার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হয়নি। আজ প্রয়োজন হয়েছে, কথা বললেন। এই জন্য জগমোহন বাঁকা কথা বলতে দ্বিধা করলেন না!

বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে রমলা শ্বশুরের জন্য চা করতে বসল। তার অনুতাপ হচ্ছিল। ভাশুর কেন তার কাছে টাকা চাইলেন এবং চাওয়া মাত্র রমলাই বা সেটা বার করে দিল কেন।

মিথ্যা কথা বলতে পারত সে। তার নিজের কাছে টাকা নাই। অথবা পরিতোষকে জিজ্ঞাসা না করে সে টাকা দিতে পারছে না।

কিন্তু কার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলত—পরিতোষের অনুমতি না নিয়ে টাকা দেব না, এমন কথাই বা তখন রমলার মুখ দিয়ে বেরোত কি?

ছবিটা তার মনে পড়ল। গোধূলির আকাশের নীচে একটি বিষণ্ণ মানুষ বাগানে পায়চারি করছে। সঙ্গে একটি শিশু। শিশু আবোল-তাবোল কত কি বকছে। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলতে, তার আজগুবি উদ্ভট সব প্রশ্নের জবাব দিতে, তার মেজাজের সঙ্গে মেজাজ মিলিয়ে চলতে এবেলা যেন বয়স্ক মানুষটি আর উৎসাহ পাচ্ছে না। যেন কিছু একটা গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে আছে।

পরিমলকে তখনই চিন্তিত দেখেছিল রমলা।

অক্ষয়বাবুর মেয়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে মুখটা কেমন যেন গম্ভীর করে শ্বশুর মশায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর অনেকক্ষণ নিজের ঘরে দোর বন্ধ করে ছিল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দীপু জেঠুমণিকে বার বার ডাকছিল। হঠাৎ জেঠুমণির কী হল সে বুঝতে পারছিল না। এই তো একটু আগে তাঁর সঙ্গে তাঁর ঘরে বসে সে মনের সুখে ক্যারাম খেলছিল। পরিমল সাড়া দিচ্ছে না, অথচ দীপু ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছে। দীপুর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে রমলার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তাই তো, এত মেলামেশা এত খেলাধূলা, এক সময় হঠাৎ খেলার সাথিটি এমন গা ঢাকা দেয় কেন। শিশুর মেজাজ বুঝে পরিমল সেভাবে চলতে পারে—অবলীলাক্রমে সে নিজেও এক সময় শিশু হয়ে যায়, কিন্তু জেঠুর মেজাজ বুঝতে সময় সময় দীপুকে যে কী ভীষণ বেগ পেতে হয়! রমলা লক্ষ্য করছিল, সেই মুহূর্ত আবার এসেছে। দীপু বিব্রত হয়ে পড়েছে। ডেকে জেঠুমণির সাড়া না পেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে বন্ধ দরজাটা দেখছে। ছেলেকে কাছে এনে সান্ত্বনা দিতে রমলা তাকে দরজার কাছ থেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছিল। কিন্তু এমন জোরে দীপু চিৎকার করে কেঁদে উঠল যে সঙ্গে সঙ্গে পরিমল দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। ভাইপোকে কোলে তুলে নিয়ে আর ঘরে ঢোকে না, বাগানে নেমে যায়।

কিছুক্ষণ দীপুর সঙ্গে ছুটোছুটি করল, হাসল, কথা বলল, দীপু খুশি হল। তারপর, তখন

জগমোহন গাড়ি নিয়ে চেম্বারে চলে গেছেন, পরিমল আবার গম্ভীর হয়ে উঠল। গভীর চিন্তামগ্ন। কিন্তু তা হলেও দীপু তখন আর তত মন খারাপ করল না। কেননা জেঠুর সঙ্গে সে বাগানে ঘোরাঘুরি করতে পারছে এই যথেষ্ট। জেঠু তাকে পাতা দিয়ে চমৎকার একটা মুকুট তৈরি করে দয়েছে। দীপু তাই নিয়ে ব্যস্ত। কখনো সেটা মাথায় পরছে আবার পরক্ষণেই খুলে ফেলে চোখের সামনে তুলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে জিনিসটার কারুকার্য লক্ষ্য করছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওপর থেকে রমলা সবই দেখতে পাচ্ছিল। তারপর রমলা শ্বশুর মশায়ের ঘরে ঢুকে তাঁর বিছানা টেবিল আলনা গোছগাছ করে রাখছিল। রোজ এ সময় সে যা করে। ঘরের ভিতর অন্ধকার অন্ধকার লাগছিল। আলোটা জ্বেলে দেবে কিনা ভাবছিল। এমন সময় দীপুর হাত ধরে পরিমল দরজায় এসে দাঁড়াল। রমলা ভাবছিল, ভাশুর বুঝি আবার কোথাও টেলিফোন করতে শ্বশুর মশায়ের ঘরে ঢুকতে চাইছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ভুল ভাঙল।

'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে রমলা।' ভাশুর এই প্রথম সরাসরি তার সঙ্গে কথা বললেন, তার নাম ধরে ডাকলেন। প্রথমটায় খুব চমকে উঠেছিল রমলা। তার হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে উঠেছিল। কিন্তু পরক্ষণে সে সহজ স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারল।

না, এই মানুষের সামনে কেউ অশান্ত অস্থির হতে পারে না, অস্বস্তিবোধ করতে পারে না।

তাঁর দৃষ্টিতে অত্যন্ত করুণ এবং গলার স্বর স্নিগ্ধ স্নিগ্ধ এবং কেমন যেন বেদনামিশ্রিত।

আনতমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রমলা অপেক্ষা করছিল, তারপর ভাশুর কী বলেন শুনতে।

'তোমার কাছে যদি একশোটা টাকা থাকে আমায় এখন দাও। অক্ষয়বাবুকে দিয়ে আসি। ভদ্রলোক অসুস্থ। টাকার অভাবে তাঁর চিকিৎসা হচ্ছে না। পরিতোষ বাড়ি এলে আমি বলব।'

রমলা তখনি তার ঘরে গিয়ে টাকা নিয়ে এসেছে এবং নিঃশব্দে ভাশুরের হাতে তুলে দিয়েছে। বস্তুত, মুখে সে একটা কথাও বলেনি। যেন ভাশুর আদেশ করলেন। নীরবে সে তা পালন করল।

তখনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে পরিমল বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে।

রমলা পরে কথাটা চিন্তা করেছে। নিশ্চয় অক্ষয়বাবুর মেয়ে টেলিফোনে টাকার কথা পরিমলকে বলেছিল। সেই জন্য পরিমল তখন এত গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। তার নিজের কাছে টাকা নাই। কারো কাছ থেকে চেয়ে টাকাটা জোগাড় করতে হবে। হয়তো দীপুর সঙ্গে বাগানে বেড়াতে নেমেও পরিমল এ কথাই ভাবছিল। এই জন্য তাকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। তখন জগমোহন বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছে টাকা চাওয়া যায় কিনা, পরিমল নিশ্চয় চিন্তা করেছিল। কিন্তু সঙ্কোচ ভয়—যে জন্যই হোক, বাবার কাছে টাকাটা সে চাইতে পারল না। কেননা অক্ষয়বাবুকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে যাচ্ছে শুনলে জগমোহন কখনও জিনিসটাকে ভালো চোখে দেখতেন না। হয়তো তিনি সরাসরি 'না' বলে বসতেন। অক্ষয়বাবু কি তাঁর পরিবারের মানুষগুলি সম্পর্কে জগমোহন যে আজও প্রবল বিতৃষ্ণা—এমন কি একটা বৈরীভাবই পোষণ করছেন, পরিমল তা বুঝতে পেরেছে। তারপর আর কে আছে

যার কাছে টাকা চাওয়া যায়? পরিতোষ। কিন্তু পরিতোষ বাড়ি নাই। তার ফিরতে রাত হবে। তার অর্থ আজ আর টাকা নিয়ে অক্ষয়বাবুর কাছে যাওয়া হয় না। তাই শেষ পর্যন্ত চিন্তা করে পরিমল রমলার কাছে টাকা চাইতে এল।

কিন্তু তা হলেও রমলা জিনিসটা চেপে রাখল না। শ্বশুর মশায় বাড়ি ফিরতে সে তাঁকে কথাটা বলল। তিনি বাড়ির কর্তা। তাঁকে সব কিছুই বলা উচিত। না হলে সংসারের শৃঙ্খলা থাকে না। অন্তরের শুভ ইচ্ছা বলে হোক কী অক্ষয়বাবুর অনুরোধে পড়ে হোক পরিমল তাঁকে সাহায্য করতে ছুটে গেছে, কিন্তু টাকাটা রমলা ঘর থেকে বার করে দিয়েছে। এ টাকা পরিতোষের। যদি পরিমল নিজের পকেট থেকে অক্ষয়বাবুকে টাকা দিত তো বাড়ির কর্তাকে কিছু জানাবার দরকার পড়ত না রমলার। আর সে ক্ষেত্রে রমলাও হয়তো ব্যাপারটা জানতে পারত না। হ্যাঁ, যদি পরিমল কথাটা গোপন রাখত, এ বাড়ির কাউকে না বলে অক্ষয়বাবুকে সাহায্য করব এমন একটা মনোভাব নিয়ে সেখানে যাওয়া-আসা করত। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াচ্ছে। রাত্রে পরিমল ভাইকে টাকার কথা বলবে। শোনামাত্র পরিতোষ নিশ্চয় রমলাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করবে এবং এমন একটা গুরুতর বিষয় 'বাবাকে' অর্থাৎ শ্বশুর মশায়কে জানানো হয়েছে কিনা—এ ধরনের প্রশ্ন করা পরিতোষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, সংসারের খুঁটিনাটি তুচ্ছ বিষয়গুলিও পরিতোষ জগমোহনের কানে তোলে, না হলে সে শান্তি পায় না। এই অবস্থায় শ্বশুরকে কথাটা না বলা রমলার পক্ষে অপরাধ হত, পরিতোষ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হত—যেন কতকটা এই কারণেও রমলা জগমোহনকে সব বলল। শুনে শ্বশুর তাকে কতরকম প্রশ্নই না করলেন। এখন পরিতোষ এসে আবার কী বলে তার জন্য রমলাকে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। সত্যি, এত খারাপ লাগছিল তার।

পরিতোষ একলা বাড়ি ফিরল না। সঙ্গে গিরিজাকে নিয়ে এল। রাস্তায় দেখা হয়েছে দুজনের। গিরিজা অবশ্য এখানে আসবে মনে করেই তার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েছিল। বাসে পরিতোষের সঙ্গে দেখা। গিরিজাকে দেখে জগমোহন খুশি হলেন।

'কাল তুমি আসনি—কাল তোমাকে খুব আশা করেছিলাম।'

'কাল সকালে এসেছিলাম কাকাবাবু। আপনি তখন বেরিয়ে গেছেন। পরিতোষও বাড়ি ছিল না। তাহলেও আসাটা একেবারে বিফল হয়নি। এই রাস্তার মোড়েই লর্ডের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

'চিনতে পারল তোমাকে?' জগমোহনের কপালে রেখা জাগল। গিরিজা মাথা কাত করল।

'হ্যাঁ, তা পারল বইক।'

'বোস, বোস, দাঁড়িয়ে আছ কেন তোমরা, পরিতোষ তুমিও বোস। তোমাদের দুজনের সঙ্গে জরুরী কথা আছে। একটা ভয়ংকর ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কনসাল্ট করতে চাই। গিরিজা এসে ভালোই হয়েছে।'

রমলা সেখানে ছিল না। শ্বশুরমশায়কে চা দিয়ে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনে সে দরজায় উঁকি দিয়ে পরিতোষ ও গিরিজাকে দেখতে পেয়েছে। তারা এ ঘরে এল না। সোজা জগমোহনের ঘরে চলে গেল। স্বাভাবিক। জগমোহন বাড়ি

থাকতে গিরিজা আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। আজও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল না। এবং শ্বশুরের খাসকামরায় এখন একটি জরুরী মিটিং বসবে রমলা বেশ অনুমান করতে পারছিল। পরশু রাত্রের ঘটনা মনে পড়ল তার। পরিমল বাড়ি ছিল তাই এঁদের জরুরী আলোচনাটা নীচে বসবার ঘরে হয়েছিল। আজ পরিমল নেই। কাজেই ওপরে শ্বশুরমশায়ের ঘরে সভা বসেছে। এখন এঁরা কী নিয়ে কথা বলছেন, আলোচনার মানুষটি কে রমলা তা-ও জানে। বিকেলের ঘটনাটা মনে করে তার বুকের ভিতর টিপটিপ করতে লাগল।

রমলার অনুমান মিথ্যা নয়।

জগমোহন ইতিমধ্যে কথাটা বলে শেষ করলেন।

শুনে পরিতোষ ও গিরিজা স্তব্ধ হয়ে ছিল।

পরিতোষের মুখটা যেন একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

কিন্তু গিরিজার মুখের রং স্বাভাবিক ছিল। প্রথমটায় অবশ্য তার মুখ দিয়েও কথা সরেনি। তারপর তাঁর ঠোঁটের কিনারে এক টুকরো হাসি দেখা দিল।

'এই তো ব্যাপার!' জগমোহন একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলে শরীরের আড়মোড়া ভাঙতে হাত দুটো শূন্যে প্রসারিত করে দিয়ে আবার তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত করে ফেললেন। 'এখন তোমরা বোঝ, ব্যাপারটা কোন্ দিকে গড়াচ্ছে—আমি তো চিন্তা করে কুলকিনারা পাচ্ছিনে।'

পরিতোষের ঠোঁটটা নড়ে উঠল। যেন কী বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ আবার কঠিন আড়ষ্ট হয়ে গেল।

'কী হল!' জগমোহন উৎসুক চোখে ছেলেকে দেখছিলেন। 'যেন কিছু বলতে চাইছিলে তুমি, পরিতোষ?'

'রমলাকে ডাকব?' পরিতোষের গলায় উত্তেজনা প্রকাশ পেল।

'ডোণ্ট বি ইমপেশাণ্ট। যা বলার সে আমাকে বলেছে, এখনই তাকে ডেকে লাভ নেই। তুমিও তাকে কিছু বোলো না। ছেলেমানুষ—এতটা বুঝতে পারেনি। টাকা চেয়েছে, সরল মনে ঘর থেকে সে ওটা বার করে দিয়েছে। বেচারার তেমন একটা দোষ নেই। আর তা ছাড়া টাকাটা এভাবে চাওয়া মাত্র দিয়ে ফেলে সে যে ভুল করেছে, বউমা এখন এটা বেশ বুঝতে পারছে। তার অনুতাপ হচ্ছে—আমি চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম।'

'আমি একটা কথা বলব, কাকাবাবু?'

'বল বল।' জগমোহন গিরিজার মুখের দিকে তাকালেন। 'এখানে তোমাকে চুপ থাকলে তো চলবে না। কিছু মনে করো না, তোমার মামা অক্ষয়বাবু। তুমি আমার চেয়ে ঢের বেশি চেন তাঁকে—এখন তাঁর ভেতরের মতলবটা কী আমায় বলতে পার? আমার তো মনে হয়, ভদ্রলোক পরিমলের কাছে টাকাটা চেয়েছে—মেয়েকে দিয়ে চাইয়েছে। আমার সামনেই তো অক্ষয় উকিলের মেয়ে পরিমলকে টেলিফোনে ডাকল। আমিই প্রথম ফোন ধরেছিলাম।'

'তোমাকে কথাটা বলা হয়নি, বাবা। কালও দাদা অক্ষয়বাবুকে কুড়ি টাকা দিয়ে এসেছে।'

'অ্যাঁ! কী বলছ?' ছেলের দিকে কটমট করে তাকান জগমোহন। 'কখন দিয়ে এসেছে? কাল কোথা থেকে সে টাকা পেল? কই, আমায় তো বলনি তুমি?'

'আজ সকালে দাদা আমাকে কথাটা বলল, তুমি তখন বেরিয়ে গেছ, আমার উঠতে একটু বেলা হল, তারপর তো আমিও বেরিয়ে গেলাম।'

'হ্যাঁ, কাল ওখানে গিয়েছিল সে, আমি শুনেছি। বউমা আমাকে বিকেলে কফি দিতে এসে বলল, পরিমল নাকি কাল অক্ষয় উকিলের কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়েছিল—আজ সকালে তোমার কাছ থেকে বউমা শুনেছে। কিন্তু পরিমল যে কালও টাকা দিয়ে এসেছে, কই, রমলা তো আমায় বলেনি সে কথা।'

পরিতোষ একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল। জগমোহনের গলার স্বর গমগম করে উঠল।

'আমি আপনার বউমাকে টাকার কথাটা বলিনি।'

'কেন বলনি, ওটা আবার চেপে রেখেছিলে কেন?'

'ভাবলাম, সামান্য টাকা, বাড়িতে এটা আর জানাজানি করে লাভ নেই। অক্ষয়বাবুর নাকি শরীর খারাপ যাচ্ছে, তা ছাড়া খুব অভাবের মধ্যেই আছেন ভদ্রলোক, তাই দাদা তাঁকে ফল-টল খেতে কুড়িটা টাকা দিয়ে এসেছে। হাতখরচের জন্য দাদাকে আমি ক'টা টাকা দিয়েছিলাম—সেই টাকা থেকে—'

'তিনি দান করে এসেছেন।' পরিতোষের অসমাপ্ত কথা জগমোহন শেষ করলেন। 'গিরিজা, শুনেছ—শুনলে?'

গিরিজার ঠোঁটে আবার সূক্ষ্ম হাসি দেখা দিল। 'আমাকে পরিতোষ বলেছে—কাল লর্ড কুড়ি টাকা দিয়ে এসেছে।'

জগমোহন চোখ দুটো গোল করে ফেললেন। তাঁর কপালের শিরাটা মোটা হয়ে ফুলে উঠল। 'আজ আবার বাড়ির বউ-এর কাছ থেকে একশো টাকা বার করে নিয়ে তিনি বদান্যতা করতে গেছেন, উদারতা দেখাতে গেছেন।'

'কিন্তু কালকের ওই টাকাটা কিছু না, তা না হয় দিয়ে এসেছে—' পরিতোষ মৃদু গলায় বলল, 'আজকের ব্যাপারটা আমি এখন এসে শুনছি, তাই চিন্তা করছি, জিনিসটা অন্য রকম ঠেকছে—

'কী রকম?' জগমোহন ফোঁস করে উঠলেন। 'পরিষ্কার করে আমায় সব খুলে বল, তুমি এমন চেপে চেপে রাখছ কেন, অক্ষয় উকিলকে টাকা দেওয়ার বিষয় নিয়ে পরিমল কি আর কিছু তোমাকে বলেছে—শরীর খারাপ, অভাব যাচ্ছে, এ সব তো ধরতাই বুলি, অন্য কোনো ব্যাপার কি—'

'না, দাদা আমাকে আর কিছুই বলেনি—এটা আমি সন্দেহ করছি।' পরিতোষ আড়চোখে গিরিজাকে দেখল। 'সেদিন গিরিজা যে কথাটা বলতে চেয়েছিল এখন যেন আমার তাই মনে হচ্ছে—একটু অ্যাব্‌নর্মালিটি, একটু যেন মাথায় গোলমাল—তা না হলে রমলার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে গেল—জিনিসটা কেমন অদ্ভুত লাগছে—তুমি কী বলো গিরিজা?'

গিরিজা কথা বলল না। তেমনি ঠোঁটের কোণায় হাসি ঝুলিয়ে রাখল।

'না না, তা নয়, সে-সব কিছু না।' জগমোহন সজোরে মাথা নাড়লেন। 'সব অক্ষয় উকিলের কীর্তি—আমার ছেলেকে, যে কারণেই হোক, হয়তো তার কোনো উইক্ পয়েন্ট পেয়েছে—ব্ল্যাকমেল করার তালে আছে দুষ্ট—ওকালতি করে জীবনে কিছু করতে পারল

না—কিন্তু শয়তান বুদ্ধিতে যে তার জুড় নেই এ কথা কি আমি জানি না, আমিও তো সারা জীবন বালিগঞ্জে কাটিয়ে এসেছি। নির্ঘাৎ এটা ব্ল্যাকমেলিং-এর ব্যাপার—গিরিজা, তুমি তোমার মামাকে ভালো করে চেন, তোমার মায়ের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বসে আছে, এ কথা তুমি আমাকে ক' দিনই বলেছ—এখন এ ব্যাপারে আমি যা সন্দেহ করছি তা কি মিথ্যা?'

'কাকাবাবু, আপনি রাগ করবেন না। পরিতোষ, তুমি যা বললে তা-ও শুনলাম, আমি কারো পক্ষ টেনে কথা বলছি না, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে জিনিসটা বিচার করছি—অক্ষয়বাবু যেমন আমার মামা, পরিমলও তেমনি আমার বন্ধু, আমার বাল্যবন্ধু, একদিন আমি তাকে খুবই ভালোবাসতাম, ভক্তি করতাম, আমিই তার 'লর্ড' নাম দিয়েছিলাম—সে যাই হোক, যা দেখছি, যা শুনছি—কাল টাকা দিয়ে এসেছে, আজ আবার টাকা নিয়ে লর্ড বালিগঞ্জ ছুটে গেছে—আমি যেন এর মধ্যে একটু সেক্স্-এর গন্ধ পাচ্ছি।'

'কী রকম?' জগমোহনের মুখটা অকস্মাৎ কেমন কালো হয়ে গেল। পরিতোষ রুদ্ধশ্বাস হয়ে গিরিজার কথা শুনছিল। গিরিজাকে দেখছিল। 'জিনিসটা আর একটু পরিষ্কার করে আমায় ভেঙে বল।' জগমোহন কাতর গলায় বললেন, 'গিরিজা, আমার কাছে তুমি কিছু লুকিয়ো না।'

'না, এটা আমার অনুমান, আমার সন্দেহ।' গিরিজার ঠোঁটের হাসিটা বড়ো হয়ে উঠল। 'অর্থাৎ ওখানে আকর্ষণটা কী—আমার পরিবারকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে লর্ড হঠাৎ এতটা উৎসাহিত হয়ে উঠল কেন—নিশ্চয় সেখানে এমন কিছু আছে—এমন কেউ আছে—'

'আর বলতে হবে না, আর বলতে হবে না।' যেন সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতন পরিষ্কার হয়ে গেল জগমোহনের কাছে। 'আমি বুঝেছি—এখন আমি সব ধরতে পারলাম। পরিতোষ—' জগমোহন ছেলের দিকে তাকালেন, 'অক্ষয়ের একটা সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে আছে না? রমলা আমায় বলছিল, তুমি নাকি পরিমলের মুখের শুনেছ—হুঁ, ওই মেয়েই তখন ফোন করেছিল—অর্থাৎ মেয়েকে দেখিয়ে স্কাউণ্ড্রেল অক্ষয় কান মলে আমার ছেলের কাছ থেকে টাকা আদায় করছে, আরো করবে—তুমি কাল সকালেই সুকোমলের কাছে একটা টেলিগ্রাম করে দাও। সে আসুক—আমি তোমার দাদাকে আশ্রমে পাঠিয়ে দিই—না যেতে চাইলে জোর করে আমি তাঁকে এখান থেকে পাঠিয়ে দেব—আবার একটা আগুন জ্বলবে, আবার একটা ভয়ংকর বিপদের দিকে সে এগিয়ে যাচ্ছে—তাকে কিছুতেই কলকাতা রাখা হবে না।' জগমোহন রীতিমতো কাঁপছিলেন। গিরিজা অন্য দিকে চোখ সরিয়ে নিল। পরিতোষ অধোবদন হয়ে রইল।

॥ ২৯ ॥

সকালে জগমোহন চেম্বারে যাবেন, সিঁড়ির সামনে তাঁর গাড়ি দাঁড়ানো, কিন্তু সিঁড়ি থেকে ঘাসের ওপর পা রেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। বাগানের দিকে তাঁর চোখ গেল।

তন্ময় হয়ে একটি মানুষ ওধারের ফুলগুলি দেখছে। পাতার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো সোনার মতন কিছু রৌদ্র মানুষটার মাথার চুলে, কানে, ঘাড়ে এসে পড়েছে। গায়ে একটা গেঞ্জি। তার বাঁ কাঁধের কাছে দুধের মতন সাদা ছোটো একটা প্রজাপতি উড়ছে।

দৃশ্যটা দেখে হঠাৎ জগমোহন একটু মুগ্ধ হলেন।

মানুষটা তাঁকে মুগ্ধ করল না। যেভাবে সে বাগানের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে, তদগতচিত্ত হয়ে ফুল দেখছে, আর তার মাথায় কাঁধে রৌদ্রের সোনালি ছোপ, আর ঘাসফুলের মতন খুদে প্রজাপতিটা—সব মিলিয়ে ছবিটা জগমোহনের ভালো লাগল। তাই গাড়িতে উঠতে গিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন।

কেউ তাকে পিছন থেকে দেখছে টের পেয়ে হোক বা যে-কোনো কারণে হোক পরিমল মাথাটা ঘুরিয়ে এদিকে তাকাল। জগমোহনের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

রুষ্ট হয়ে জগমোহন মুখটা প্রায় ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু পারলেন না। কেমন যেন আটকে গেলেন, এক জোড়া সুবৃহৎ উজ্জ্বল চোখের কাছে ধরা পড়ে গেলেন।

ছেলে হাসছে।

অগত্যা জগমোহনকেও হাসতে হল। মুখের ভিতর একটা তিক্ত স্বাদ নিয়ে তিনি হাসলেন।

'খুব সুন্দর সকাল!'

'হ্যাঁ', জগমোহন ঘাড় নাড়লেন। 'শরতের সকাল, খুবই সুন্দর।'

পরিমল বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াল।

'সূর্যমুখী ফুটতে আরম্ভ করেছে, তাই দেখছিলাম।'

'হুঁ, ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে, ঘাসে পাতায় এখন প্রচুর শিশির জমছে, সূর্যমুখীর সিজন আরম্ভ হল।'

'সংসারে কত সুন্দর জিনিস, আশ্চর্য জিনিস আছে, তাই ভাবছিলাম।' পরিমল আর একবার সূর্যমুখীর ঝাড়ের দিকে চোখ ফেরাল। 'হঠাৎ দেখলে মনে হয়, সবুজ ডাঁটার মাথায় মাথায় বুঝি ছোটো ছোটো কতগুলো সূর্য ফুটে রয়েছে।'

উপমাটা কি জগমোহন উপভোগ করলেন! গলার নীচে কেমন একটা শব্দ করে হাসলেন। 'হুঁ, ভগবান সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করছেন, আবার কদর্য জিনিসও পৃথিবীতে কম পাঠাননি'।

কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না পরিমল। অথবা এমন একটা কথা শুনতে যেন তার মন এসময় তৈরী ছিল না। ফ্যাল ফ্যাল করে জগমোহনের চোখ দুটো দেখল।

'তা তুমি এক কাজ কর না।' ঢোক গিলে মুখের তিক্ত স্বাদটা দূর করতে চেষ্টা করলেন জগমোহন। চট করে অন্য দিকে চোখটা ফিরিয়ে নিলেন। 'ক'দিন সুকোমলের কাছে গিয়ে থাক। খুব সুন্দর জায়গা। এখানে আমার এই ছোটো বাগানে আর ক'টা ফুল দেখতে পাচ্ছ। আশ্চর্য সুন্দর জিনিস যদি দেখতে হয়, আমি তোমাকে ব্রজদুর্লভপুর গিয়ে ক'দিন থাকতে উপদেশ দিচ্ছি—শুনেছি ভয়ানক সুন্দর জায়গা, বিশাল ফুলের বাগান, রাশি রাশি ফুল, অগুণতি পাখি, প্রজাপতি, কত শত গাছ-গাছড়া লতা-পাতা কীট-পতঙ্গ। তোমার ভালো লাগবে!'

'সুকোমলদের আশ্রম?' পরিমল মৃদুস্বরে বলল।

'হুঁ, আশ্রম।' জগমোহন এবার ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। 'তা বলে আশ্রমের গুরুভাই হয়ে সেখানে থাকতে বলছি না তোমায়। চমৎকার অতিথিশালা আছে ওদের। বাইরের লোককেও থাকতে দেওয়া হয়। তোমাকে গেরুয়া কাপড়ও পরতে হবে না, জপ-

তপও করতে হবে না। তুমি শুধু থাকবে—দেখবে। আমি বলছি, সেখানকার নৈসর্গিক দৃশ্যের তুলনা হয় না। মন আপনা থেকে ভালো হয়ে যাবে, এবং সৎসঙ্গও পাবে—সেখানে সবাই সৎকর্মে, সৎচিন্তায় নিযুক্ত। আমার তো মনে হয়, ক'দিন সেখানে থাকলে তুমিও নিজের ভেতর একটা চেঞ্জ—একটা বেশ ভালো রকম পরিবর্তন অনুভব করবে। করতেই হবে।'

পরিমল স্থির চোখে বাবার মুখটা দেখল। কী একটু চিন্তা করল। তারপর অধোবদন হয়ে রইল।

জগমোহন বললেন, 'আমি সুকুকে আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি। আমার চিঠি পেলেই সে এসে যাবে। তুমি তার সঙ্গে চলে যাও।'

'কিন্তু এখানে তো আমি ভালোই আছি,' পরিমল মাটির দিকে চোখ রেখে বলল, 'এখানেও আমার খারাপ লাগছে না—'

'হ্যাঁ, তা হলেও তো একটা স্থানমাহাত্ম্য আছে।' জগমোহনের গলার স্বর একটু রুক্ষ হয়ে উঠল। 'কত বড়ো একজন মহাপুরুষ সেখানে বসে আছেন। স্বামী ঈশ্বরানন্দ—দেশজোড়া যাঁর খ্যাতি—কত শত লোক রোজ তাঁকে দর্শন করতে যাচ্ছে। মহাপুরুষের একটা প্রভাব আছে বইকি। এই জন্যই বলছি যতক্ষণ তুমি সেখানে আছ, তোমার মনে সৎচিন্তা ছাড়া অন্য রকম চিন্তাই উদয় হতে পারছে না।'

পরিমলের মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠল।

'এখানেও আমার মনে কোনোরকম অসৎ-চিন্তার উদয় হয় বলে আমি মনে করি না।'

জগমোহন সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর নরম করে ফেললেন। সামান্য একটু হাসলেন। দাঁত দিয়ে জিভ কেটে বললেন, 'ছি, আমি সেকথা বলছি না—এতকাল কতগুলো ক্রিমিন্যালের সঙ্গে কাটাতে হয়েছিল—কেবল খারাপ ছবি, পৃথিবীর অন্ধকার জিনিসগুলো ক্রমাগত চোখের সামনে তোমাকে দেখতে হয়েছে—তার ফলে নৈরাশ্য, মানসিক অবসাদ, ইংরেজিতে যাকে বলে মেলানকলি—শুধু তোমার কেন, ঐ ধরনের একটা ভয়ংকর পরিবেশের মধ্যে দশ বছর বাস করার পর যে-কোনো মানুষের মনের অবস্থা তাই দাঁড়াবে—সেই জন্য বলছিলাম, একটা বিশুদ্ধ পবিত্র আবহাওয়ায় দিনকতক—'

পরিমল সবেগে মাথা নাড়ল।

'জেলখানায় খারাপ কিছুই আমার চোখে পড়েনি—আপনাদের এটা ভুল ধারণা, বরং—' বেড়ার কাছ থেকে সরে যেতে যেতে সে বিড়বিড় করে বলল, 'সেখানেই আমি আলোর সন্ধান পেয়েছি—সুন্দরকে ভালোবাসতে শিখেছি।'

জগমোহন শেষের কথাগুলি আর শুনতে পেলেন না। তাঁর কপালের শিরাটা ফুলে উঠল। আর একবার বাগানের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে তিনি একটা গরম নিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। মনে মনে বললেন, 'না, এখন আর তোমাকে কিছু বলব না, সুকোমল আসুক। তাকে বুঝিয়ে বলে-টলে তোমাকে এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করতে হবে। একগুঁয়ে মানুষ তুমি—তোমার সঙ্গে জোর-জবরদস্তি করতে গেলে তার ফল ভালো হবে না। গিরিজা ঠিকই বলেছে। কৌশলে তোমাকে করায়ত্ত করতে হবে। সর্প খল খুনী—এদের সামনে উত্তেজনা প্রকাশ

করতে নেই। যে-কোনো মুহূর্তে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এসব জায়গায় মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা ছাড়া উপায় নেই।'

তাই জগমোহন নিজেকে সংযত করলেন। হাতের ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে তিনি গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। কাল রাত্রে তিনি যখন অত্যধিক উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন তখন গিরিজা তাঁকে কথাগুলি বলেছিল। 'লর্ডের সঙ্গে রাগারাগি করাটা সঙ্গত হবে বলে আমি মনে করি না, কাকাবাবু। যদি সত্যি মাথার গোলমাল হয়ে থাকে তো তার সঙ্গে কাজকারবার করতে আপনাকে খুব সাবধানে পা ফেলে অগ্রসর হতে হবে। আর ধরুন, তার মনে যদি একটা দুরভিসন্ধিই থেকে থাকে, যে কারণে অক্ষয়মামার বাড়ির দিকে সে অত্যধিক ঝুঁকে পড়েছে তো সেখানে তাকে বাধা দেওয়া বা নিরস্ত করার বিপদ আছে। নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এ ধরনের মানুষগুলো যখন মরীয়া হয়ে ওঠে, তখন বাধা পেলে তারা এত বেশি ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ হয় যে, সেই বাধা অতিক্রম করতে, পথের কণ্টক দূর করতে হেন কর্ম নেই তারা না করতে পারে।' কথাগুলি বলায় সময় গিরিজার চোখ দুটো গোল হয়ে উঠেছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে জগমোহন কেমন যেন শিউরে উঠেছিলেন। রুদ্ধশ্বাস হয়ে পরিতোষ শুনছিল। ঘরের আবহাওয়াটা থমথম করছিল।

হ্যাঁ, জগমোহন ভয় পেয়েছিলেন। চেহারা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল পরিতোষও রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর গিরিজা চলে গেল। তখনও জগমোহন পাথরের মতন স্থির-নিশ্চল হয়ে নিজের আসনে বসে রইলেন। যেন তখনও গিরিজার কথাগুলি টুকরো টুকরো হয়ে ঘরের বাতাসে ইতস্তত ভেসে বেড়াচ্ছিল। 'উদ্দেশ্য চরিতার্থ, মরীয়া হয়ে ওঠে, হেন কাজ নেই যে এ ধরনের মানুষগুলো করতে না পারে'—উদ্দেশ্য চরিতার্থ বলতে গিরিজা কী বোঝাতে চেয়েছিল বা পথের কণ্টক দূর করতে শেষ পর্যন্ত পরিমল কী করতে পারে, এসব নিয়ে জগমোহন গিরিজাকে একটাও প্রশ্ন করেননি, করতে সাহস পাননি। যেন গিরিজার ইঙ্গিতগুলি যথেষ্ট ছিল, তার অতিরিক্ত কিছু জানবার দরকার ছিল না।

অনেক রাত্রে পরিমল বাড়ি ফিরল। দীনদয়াল তাকে খেতে ডাকল। সে খাবে না, অক্ষয়বাবুর বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছে চাকরকে জানিয়ে দিল। বাড়ির মানুষগুলি সেকথা শুনল। শুনে নীরব হয়ে রইল। জগমোহন নিজের ঘরে বসেই দুটি কোনোমতে মুখে গুঁজে রাত্রির আহার-পর্ব শেষ করলেন। পরিতোষ বা রমলা আর ঘর থেকে বেরোয়নি। তারা খেল কী খেল না, জগমোহন জানতে পারলেন না, খোঁজও নিলেন না। আলো নিভিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। বস্তুত টাকার ব্যাপারটা নিয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে একটা মনোমালিন্য, অশান্তি সৃষ্টি হয়নি, তাই বা কে বলবে। জগমোহন এই নিয়েও কম দুশ্চিন্তা করছিলেনা। অর্থাৎ ক'দিন থেকে, বড়ো ছেলে বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেমন আশঙ্কা করছিলেন, দূর-ভবিষ্যতে আবার না কোনো অঘটন ঘটে, আবার না এই পরিবারের সামনে একটা বিপদ উপস্থিত হয়, শুয়ে শুয়ে জগমোহনের যেন মনে হল, বিপদ ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করে বসে নেই, বিপদ এসে গেছে। বাড়ি নীরব হয়ে গিয়েছিল। নীচে চাকর-দারোয়ানের সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই দুঃসহ স্তব্ধতার মধ্যে জগমোহন বিছানায়

শোয়া অবস্থায়ও কান খাড়া করে রেখেছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, দোতলার করিডোরে ব্যালকনিতে কী বাথরুমে বেশ বড়ো বড়ো আওয়াজ শোনা যাবে। অর্থাৎ এবারের বিপদ চোরের মতন চুপি চুপি আসছে না, জানান দিয়ে আসছে, তার আবির্ভাবের সদম্ভ ঘোষণা ইতিপূর্বে কয়েকবার জগমোহনের কানে এসেছে। কখনো দুমদুম শব্দ করে যে বারান্দা দিয়ে হেঁটে যায়, কখনো দড়াম করে দরজা বন্ধ করে। বাথরুমে ঢুকলে প্রচণ্ড শব্দ করে জলের বালতি ছুঁড়ে ফেলে। এবং এই ধরনের এক-একটা শব্দ যে এবাড়ির শান্ত নিরীহ স্বভাবের মানুষগুলির হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট তা সে ভালো করে জেনে গেছে। তাই জগমোহন ভয়ে তটস্থ। বিপদ যখন স্বমূর্তি ধারণ করবে, তখন এবাড়ির মানুষগুলির অবস্থা না জানি কী হবে। তাই তো, সরযূধামের সব ক'টি মানুষের ভালো-মন্দ চিন্তা করার দায়িত্ব আজও জগমোহনের। দশ বছর আগেও তাই ছিল। বিপদের সবটা ধাক্কা একলা তাঁকেই বুক পেতে নিতে হয়েছিল। কিন্তু সেদিন তিনি অনেক বেশি শক্ত সমর্থ ছিলেন—আজ তিনি দুর্বল, বয়স বেড়েছে, কিন্তু তা হলেও কি তাঁর অব্যাহতি আছে। যুবক হয়েও মেজোছেলে পরিতোষ ভীরু নরম প্রকৃতির মানুষ। এখনও বাবার কাঁধে ভর না দিয়ে সে এক-পা চলতে পারে না। রমলা নিতান্তই ছেলেমানুষ। মেয়েও বটে। আর কে আছে বাড়িতে! একটা দুগ্ধপোষ্য শিশু। সুতরাং সমস্ত ঝুঁকি একা জগমোহনকেই নিতে হবে। একথা জগমোহন যেমন জানেন, তেমনি পরিতোষ, পরিতোষের স্ত্রীও ভালো করেই জেনে গেছে। তাই জগমোহনকে প্রতি মুহূর্তে এত শঙ্কিত সতর্ক—আবার সময় সময় উগ্র অস্থির হতে হচ্ছে। কিন্তু তা হলেও এখানে জবরদস্তি চলবে না। জুলুম চলবে না। গিরিজা দামি কথা বলে গেছে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে যা করবার করতে হবে, না হলে চর্তুগুণ বিপদ আছে। গিরিজা চলে যাবার পর জগমোহন পরিতোষকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, টাকার কথাটা যাতে সে পরিমলকে নিজে থেকে না বলে, রাত্রে তো নয়ই—যদি কাল সকালে পরিমল নিজে থেকে বলে বলুক। কেননা, টাকাটা নেবার সময় রমলাকেও এমন একটা আভাস যখন সে দিয়েছিল। কাজেই অপেক্ষা করতে হবে। 'আশু বাড়িয়ে আপনারা তাকে অনুসরণ করুন, তার ওপর নজর রাখুন, তার মতিগতি বুঝে সেভাবে কাজ করে যাবেন।' তাই তো উন্মাদ, খল ও দুঃশীলের বেলায় সতর্কতাই একমাত্র ঔষধ, কৌশলই একমাত্র অস্ত্র।

সব চিন্তা করে জগমোহন নিজেকে সংযত করেছিলেন। না হলে রাত্রেই তিনি ভয়ংকর রাগারাগি করতেন। পরিমল বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়কে টাকা দেওয়া নিয়ে, সেখানে যাওয়া-আসা নিয়ে তিনি ছেলেকে হাজারটা প্রশ্ন করতেন। তিনি তা করেননি।

আজ ঘুম থেকে উঠে তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর মেজাজ অনেকটা শান্ত, শরতের সকালের এমন নির্মল রৌদ্র পরিচ্ছন্ন আকাশ—মনটা আপনা থেকে ভালো হয়ে ওঠার কথা। তার ওপর বাড়ি থেকে বেরোবার মুখে একটা সুন্দর দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল। খল হোক, উন্মাদ হোক—কেউ যদি মুগ্ধ চোখে প্রস্ফুটিত সূর্যমুখীর ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, আর তার মাথায় কাঁধে সোনালি রৌদ্র চিকচিক করতে থাকে, কানের কাছে প্রজাপতি উড়ে বেড়ায় তো যে-কোনো মানুষ অন্তত তখনকার মতন খলকেও ক্ষমা করবে, উন্মাদকে ভালোবাসবে।

জগমোহন অবশ্য ছেলেকে ক্ষমা করতে বা ভালোবাসতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েননি। দৃশ্যটা দেখে তাঁর ভালো লাগল, এই পর্যন্ত। মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে চেহারাটা প্রফুল্ল রেখে তিনি তাকে দুটো একটা প্রশ্ন করলেন। প্রশ্ন করে ছেলের মনের ভাব জেনে নিলেন। এখান থেকে তাকে সরানো মুশকিল হবে। কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার ইচ্ছা তার আদৌ নেই।

তাই স্বাভাবিক। মুখের প্রফুল্লতা বজায় রেখে জগমোহন সেখান থেকে সরে গেলেন। গাড়িতে বসে সারা রাস্তা গিরিজার কথাটা তিনি চিন্তা করলেন। অক্ষয় উকিলের বাড়িটা পরিমলের কাছে একটা বড়ো আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই আর্কষণ ছেড়ে অন্য কোথাও সে এখন যেতে রাজী হবে না। জোর করেও তাকে ব্রজদুর্লভপুর পাঠানো যাবে না।

হ্যাঁ, আকর্ষণটা কোথায়, মুখ ফুটে গিরিজা তাও বলে ফেলেছে। জগমোহনের কাছে সঙ্কোচ করেনি। এই জন্য জগমোহন মনে মনে পরিতোষের বন্ধুটিকে প্রশংসাই করেছেন। গিরিজা যে সময়ে এতটা স্ট্রেটফরোয়ার্ড হতে পারে জগমোহনের ধারণা ছিল না। উঃ, কী সাংঘাতিক কথা! সেক্স। আঠারো বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে—আর এই জেলফেরত মানুষটা বুড়ো হতে চলল। ত্রিশ বছর বয়স কম কি! জিনিসটা কল্পনা করে জগমোহন শিউরে উঠলেন। একলা গাড়িতে বসেও তাঁর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল।

দীপুর হাত ধরে পরিতোষ বাগানে ঢুকল। পরিমল খুশি হল।

'বেলা হল তোমার ঘুম ভাঙতে।'

'তাই।' পরিতোষও জগমোহনের মতন মুখের প্রফুল্লতা বজায় রাখতে অল্প হাসল। 'একবার ভোরবেলা জেগেছিলাম—তারপর কেমন করে জানি চোখটা জড়িয়ে গেল।'

'জাগার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে না এলে তাই হয়। জেঠু, তুমি আমার কাছে এসো।' পরিমল দীপুর দিকে হাত বাড়াল।

'কাল অনেক রাত হয়ে গেল তোমার ফিরতে?'

'হুঁ তাই।' দীপুর একটা হাত ধরে পরিমল ভাইয়ের দিকে চোখ তুলল। 'ওঁরা কিছুতেই ছাড়লেন না—ভাত খেয়ে যেতে হবে। এত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলেন অক্ষয়বাবু, অক্ষয়বাবুর স্ত্রী—ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত।'

পরিতোষ হঠাৎ চুপ করে রইল।

'যাক গে, তোমাকে কথাটা বলা হয়নি। রাত্রেই ভেবেছিলাম বলব, দেখলাম তুমি শুয়ে পড়েছ—' দীপুর হাতটা ছেড়ে দিয়ে পরিমল তার মাথায় হাত রাখল। কথাটা আরম্ভ করতেই কিন্তু সে লক্ষ্য করল পরিতোষ ঘাড় গুঁজে পায়ের কাছের ঘাস দেখছে, জুতোর ডগা দিয়ে একটা ঘাসের ফলা ছিঁড়ছে। একটু ইতস্তত করে পরিমল বলল, 'হঠাৎ বুলা টেলিফোন করল, তুমি তখন বাড়ি নেই—বাবার কাছে চাইতে সঙ্কোচ হল—শেষটায় রমলার কাছে থেকে টাকাটা নিয়ে গেলাম—হুঁ, একশ টাকা—অক্ষয়বাবুর চিকিৎসা হচ্ছে না পথ্য খেতে পারছেন না—এমনভাবে বলল যে, চুপ করে থাকতে কেমন যেন লাগল—তাই ভাবলাম শ'খানেক টাকা দিলে যদি ভদ্রলোক চিকিৎসাটা চালিয়ে যেতে পারেন—'

'অসুখটা কী?' পরিতোষ মুখ তুলে তাকাল।

'এই বাত-টাত—বুড়ো বয়সের যা ব্যামো—একটু ডায়োবিটিসেরও নাকি দোষ দেখা দিয়েছে—'

পরিতোষ আবার চুপ করে রইল।

'রমলা নিশ্চয় তোমায় বলেছে টাকার কথা?'

'বলেছে।' পরিতোষ চোখ তুলে আকাশ দেখতে লাগল।

'জেঠু, কথা বলো, আজ তুমি এমন চুপ কেন।' পরিমল দীপুর চিবুক ধরে নাড়া দিল। আজ দীপঙ্কর একটু গম্ভীর হয়ে আছে। তেমন করে জেঠুর সঙ্গে যেন মিশতে পারছে না, কথা বলতে পারছে না।

'তা হলে ওঁরা টাকাটা চাননি। তুমি নিজে থেকে দিয়ে এসেছ?'

পরিমল ভাইয়ের চোখের দিকে তাকাল।

'হুঁ, চেয়েছিলও বটে, আবার আমিও গরজ করে দিয়ে এলাম। টাকার অভাবে বাবার চিকিৎসা হচ্ছে না—এ কথাটাই দুবার বলল বুলা—তখন চিন্তা করে দেখলাম—'

'বুলা কি পড়াশোনা করছে?'

'না, পড়াশোনা করলে স্কুলের খরচ চালাবে কে!' পরিমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'পড়ছিল, খরচের অভাবে পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। ছোটো ছেলেটা পড়ছে—খুব ইন্টেলিজেন্ট—ফ্রী-স্টুডেন্টশিপ পেয়েছে তাই পড়া চালিয়ে যেতে পারছে—তা না হলে ওরও—'

'কী দিয়ে ভাত খেলে?'

পরিমল একটু বিব্রতবোধ করল। কেননা পরিতোষ লাফ দিয়ে একটা প্রসঙ্গ ছেড়ে আর একটা প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছিল। তা হলেও সে হাসল।

'মাংস রান্না হয়েছিল।'

'কে রান্না করেছিল—বুলা?'

'না, কাকীমা—অক্ষয়বাবুর স্ত্রী নিজেই রান্না করলেন। বুলা পরিবেশন করেছিল।'

পরিতোষ কথা বলল না।

'সুন্দর মেয়ে—যেমন মিষ্টি চেহারা, স্বভাবটিও তেমনি। একটা পবিত্রতার ছাপ আছে মুখে।' পরিমলের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আর খুব বুদ্ধিমতী।'

'অনেকক্ষণ ছিলে কাল ওখানে।'

'হুঁ, মাঝখানে আবার ওদের বাড়ির পাশের মাঠটায় বেড়াতে গিয়েছিলাম বুলাদের নিয়ে।'

'বুলা ছিল আর কে ছিল, অক্ষয়বাবুর স্ত্রী?'

'না, অক্ষয়বাবুর ছোটো ছেলে, যার কথা এখন বললাম—নিলয়। আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে দুটি ভাইবোনের খুব আনন্দ হচ্ছিল।'

পরিতোষ অল্প হাসল।

'কাল খুব জ্যোৎস্না উঠেছিল। রাতটা সুন্দর ছিল।'

'অনেক দিন পর মাঠের জ্যোৎস্না দেখে আমার এত ভালো লাগছিল।' পরিমল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: 'মাঝখানে খানিকটা জল। চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করছিল—'

পরিতোষ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল।

'তুমি কি ব্রজদুর্লভপুর যাবে?'

'কেন!' চমকে উঠল পরিমল। তার উজ্জ্বল চোখ হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে উঠল। একটু চিন্তা করল। তারপর ঈষৎ হাসল। 'বাবা তা হলে তোমাকেও কথাটা বলেছেন।'

'হুঁ, বলছিলেন, ক'দিন বাইরে থেকে ঘুরে আসুক—সুকুর ওখানে গেলেই ভালো হয়, জায়গাটা সুন্দর, পরিমলের ভালো লাগবে।'

'তা হয়তো লাগবে।' পরিমল কাতর চোখে ভাইয়ের দিকে তাকাল। 'কিন্তু এখন যে আমার যাওয়া হয় না।'

'কেন, কীসের বাধা, তোমার তো এখন অফুরন্ত অবসর—যে কোনো সময় যেখানে খুশি বেড়াতে যেতে পার।' পরিতোষ হাসল।

'তা পারি, তোমাদের মতন আমাকে যখন অফিস-কাছারিতে বেরোতে হয় না। কিন্তু তা হলেও আমি একটা কাজের ভার নিয়েছি, এখন অন্য কোথাও যাব না।'

পরিতোষ ফ্যালফ্যাল করে দাদার মুখটা দেখছিল, কথাটা ঠিক বুঝতে পারছিল না।

'আমি বুলাকে ক'দিন পড়াব, এখন অবশ্য বাড়িতেই সে পড়বে, তারপর দেখা যাক নতুন সেশন আরম্ভ হলে স্কুলে ভর্তি করে দেওযা যায় কিনা—সত্যি এত ভালো মেয়ে—সামান্য খরচের অভাবে পড়াটা বন্ধ হয়ে গেছে, বড়ো দুঃখ হল শুনে।' পরিমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, একটু চুপ থেকে আবার বলল, 'সঙ্গে সঙ্গে নিলয়কেও একটু কোচ্ করব। খুব ইণ্টেলিজেণ্ট ছেলে। ক্লাসের পরীক্ষায় স্ট্যাণ্ড করছে। অক্ষয়বাবু বলছিলেন, যদি বাড়িতে কেউ ওকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেয় তো আরো ভালো রেজাল্ট্ করবে সে, স্কলারশিপ পাবার ছেলে। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় স্ট্যাণ্ড করবে। তিনি নিজে অসুস্থ—চোখ দুটোও গেছে—একটু ছেলেকে নিয়ে বসবেন সেটা আর কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না।'

'না, তা আর কী করে সম্ভব, চোখে গেলে সবই গেল।' যেন প্রসঙ্গটা এখানে শেষ হলেই পরিতোষ খুশি হয়, তার গলার স্বরে অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠল। 'তা হলে তুমি অনেক কাজের ভার নিয়েছ, কলকাতা ছেড়ে কোথাও এখন—'

পরিমল চুপ করে রইল।

'দীপু, এসো!' পরিতোষ ডাকল।

ওপাশে একটা ঝোপের কাছে এক ঝাঁক হলুদ রঙের ফড়িং উড়ে এসেছে। তাই দেখতে পেয়ে দীপু সেখানে ছুটে গেছে। পা পা করে পরিতোষও সেদিকে চলে গেল। পরিমল বুঝতে পারল না ভাই তাকে এড়িয়ে গেল। তার সঙ্গ পরিতোষের খারাপ লাগছিল।

পরিমল আবার ফুলের দিকে চোখ ফেরাল। পুঞ্জ পুঞ্জ লাবণ্যের আগুন নিয়ে সূর্যমুখীরা জ্বলছে। এইমাত্র পরিতোষের কাছে সে যে একটি মুখের সৌন্দর্য, পবিত্র দীপ্তির কথা বলছিল, সূর্যমুখী ফুলের সঙ্গে সেই মুখের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে পরিমল রোমাঞ্চিত হল।

॥ ৩০ ॥

গিরিজা বলার আগে রীণা খবরটা পেয়ে গেল। স্বাভাবিক। সেদিনের সেই খবর কেবল গোঁসাইপাড়া বস্তির মধ্যেই আটকে থাকল না। গোঁসাইপাড়া বস্তির মানুষগুলি নড়া-চড়া করে,

এখানে সেখানে যায়। ধরতে গেলে তাদের মুখে মুখেই খবর এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। তা ছাড়া এমন একটা চমৎকার জায়গায় দোকান খুলে বসে আছে জলধর। কত মানুষ মোড়ের এই মিষ্টির দোকানে আসে। একে তাকে ডেকে ডেকে জলধরও মজার সংবাদ জানিয়ে দিল। কাজেই একটা সকালের মধ্যে যতীন দাস রোডের এ মাথা থেকে আরম্ভ করে ওমাথার সব মানুষ শুনল অক্ষয় উকিলের ঘরে একটা জেল-ফেরত খুনীর যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। সবাই কিন্তু নূতন মানুষ নয়, ভিটেমাটি ছেড়ে আসা রেফুউজি দলের নয়, পুরানো মানুষ, আদি বাসিন্দা বলতে যাদের বোঝায় তাদের সংখ্যা এখানে কম কী। এবং তাদের মধ্যে অনেকেই অক্ষয় উকিলকে চেনে—জগমোহন ডাক্তারকেও চিনত, জগমোহনের ছেলে পরিমল যে মলয়কে খুন করে জেলে গিয়েছিল কথাটা আজও তাদের মনে আছে। তারা সংবাদ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার জগমোহন ডাক্তারের ছেলের অক্ষয় উকিলের বাড়ি আনাগোনা কেন, সকলের মনে এই প্রশ্ন জাগল।

যতীন দাস রোড থেকে খবরটা চলে গেল লেক রোড, সেখান থেকে রাসবিহারী এভিন্যু, তারপর সাদর্ন এভিন্যু, লেক ভিউ রোড, যেন হাওয়ার বেগে ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে খেয়ে সেই খবর-গিয়ে পৌঁছল গড়িয়াহাটা রোড একডালিয়া রোড; কিন্তু মজা এই যে, খবর যত দূরে ছড়াতে থাকে তত সেটা বড়ো হতে থাকে, ওজনে ভারি হতে থাকে, আর তার গায়ে নানা রং চড়তে আরম্ভ করে। এখানেও তাই হল। একডালিয়া রোডের মানুষ যখন খবরটা শুনল তখন সেটা আর সাদামাটা খবর ছিল না। কেবল জেল-ফেরত পরিমল ও অক্ষয় উকিলকে নিয়ে খবর হলে গিরিজার দুই বোন যূথি মল্লি এত আগ্রহ নিয়ে তাতে কান দিত না। না হয় অনুতাপ হয়েছে পরিমলের, মামার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে। এ আর তেমন কী, অনুতাপ হলে অনেকেই এমন করে. কিন্তু তারা খবরের সঙ্গে আরো কিছু খবর শুনল। ঐ যে হালুই দোকানের জলধর গোসাইপাড়া বস্তির অটলবাবুর কাছে সেদিন রাত্রে কথাটা বলতে বলতে হুট করে আর একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছিল, অক্ষয়বাবুর বাড়িতে জগমোহন ডাক্তারের ছেলে 'জামাই আদর' পাচ্ছে—সেই কথাটাই চমৎকার রঙচঙে হয়ে গিরিজার দুই বোনের কানে উঠল—অক্ষয়বাবুকে পরিমল যে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করছে তার একটা প্রধান কারণ বুলা। বুলাকে সঙ্গে করে পরিমল বেড়াতে বেরোয়, এটা ওটা কিনে দেয়, রেস্টুরেণ্টে নিয়ে যায়, জেনেশুনেই অক্ষয়বাবু, অক্ষয়বাবুর স্ত্রী মেয়েকে পরিমলের সঙ্গে এতটা মিশতে দিচ্ছেন—খুব সম্ভব..........

তাই তো, পরিমল এখনো বিয়ে করেনি, আর এদিকে অক্ষয়বাবুর সংসারের এই অবস্থা, এবেলা হাঁড়ি চড়ে তো ওবেলা চড়ে না। বুলারও দিন দিন বয়স বাড়ছে, লেখাপড়া হল না, একটা কাজটাজেও ঢুকতে পারল না। বাপ-মার গলার কাঁটা হয়ে ঘরে কেবল অন্নধ্বংস করছে, এই অবস্থায় বড়োলোকের ছেলে পরিমলকে যদি—

যূথি মল্লির সঙ্গে সঙ্গে গিরিজার মার কানেও কথাটা উঠল। তিনি অপেক্ষা করছিলেন গিরিজা বাড়ি এলে ছেলের কাছ থেকে আসল ব্যাপারটা জেনে নেবেন। তিনি তো ভাইয়ের বাড়ি যাবেন না, যূথি মল্লিকেও সেখানে পাঠাবেন না। গিরিজা বালিগঞ্জ ছেড়ে চলে গেছে, আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে কলকাতায় আছে, তা হলেও মাঝে মধ্যে যখন সে বাড়ি আসে

যতীন দাস রোডের দিকে বেড়াতে টেড়াতে যায়, তখন না হয় ছেলেকে একবার মামার বাড়ি ঘুরে আসতে বলবেন। আগে তো গিরিজা খুবই গেছে ওখানে, তখন মলয় বেঁচে ছিল। মলয় মারা যাওয়ার পরেও যেন দু-একবার গেছে। কিন্তু তারপর থেকে যেন আর সে সেখানে যাচ্ছে না। এমন একটা মুখরোচক খবর শুনলে নিশ্চয় সে একবার মামার বাড়ি উঁকি দিয়ে আসবে। কেবল যে তার মামার মেয়েকে নিয়ে ব্যাপারটা গড়াচ্ছে তা তো না, এককালে পরিমলের সঙ্গে গিরিজার খুবই মাখামাখি ছিল। না হয় সে পুরোনো বন্ধুটির সঙ্গেও একটু কথাটথা বলে আসবে। তার ভিতরের ইচ্ছাটা বুঝতে পারবে। সত্যি, চারদিক থেকে যা সব শোনা যাচ্ছে—কানে আঙুল দেবার মতন। বিয়ে হয়ে গেলে তো ভালোই, কিন্তু তা না হয়ে যদি কেবল ওবাড়ি যাওয়া আসা, ওখানে টাকাপয়সা খরচ করা, মেয়েকে নিয়ে পার্কে ময়দানে বেড়ানো, রেস্টুরেণ্ট সিনেমায় ঘোরাফেরা চলতে থাকে তো কদিন পরে তিনি বাইরে মুখ দেখাতে পারবেন না। না থাক তাঁর ওবাড়ি যাওয়া আসা, লোকে সেসব দেখবে না, বলবে তোমার ভাই, ভাইয়ের মেয়ে বস্তিতে উঠে গিয়ে বস্তির মানুষের মতন কাজকারবার শুরু করেছে। অক্ষয়বাবু যে পুরোনো বাড়ি ছেড়ে বস্তিতে ঘর ভাড়া নিয়ে আছেন গিরিজার মা সে খবর রাখতেন। অধীর হয়ে তিনি ছেলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন, কবে গিরিজা আবার বাড়ি আসবে।

এদিকে যূথি মল্লি কিন্তু চুপ করে রইল না। তাদের জিভ চুলবুল করছিল। এমন খবর কাউকে না বলতে পারলে, এই নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ রসিয়ে রসিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করতে না পারলে শান্তি আছে নাকি।

কিন্তু মেয়েদের মনের খবর গিরিজা জানত, কেবল যে তার বোনেরাই এমন তা নয়, সব মেয়েরই এই স্বভাব। পেটের কথা মুখ দিয়ে বার না করা পর্যন্ত তারা ছটফট করে।

বাড়িতে মা বা বোনেদের কাছে তো নয়ই—পরিমলের এই ব্যাপারটা রীনাকেও এখন বলবে না বলে গিরিজা মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল। কে জানে, বলা যায় না কিছু, একটা অসতর্ক মুহূর্তে রীনা হয়তো কথাটা বিশাখাকে বলে দিল। অবশ্য রীনা বুদ্ধিমতী, এমন একটা খবর হুট করে দিদির কাছে প্রকাশ করবে না। বিশাখা আরো অস্থির হয়ে উঠবে। পরিমলের জন্য তার মাথা খারাপ হয়েছে। সে অপেক্ষা করছে, কান্নাকাটি করছে, জানালা দিয়ে প্রতি মুহূর্তে তাকিয়ে আছে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পরিমল তাকে দেখতে যাবে। অথচ আজ ক'দিন হয়ে গেল, পরিমল বাড়ি এসেছে, গিরিজার কাছ থেকে খবর পেয়ে রীনা তাকে গিয়ে যা বলেছে, তা হলেও মানুষটা যখন বিশাখাকে দেখতে যাচ্ছে না তখন ধরে নিতে হয় গিরিজা অথবা রীনাই মিথ্যা কথা বলছে। পরিমল জেল থেকে ছাড়া পায়নি—বিশাখার মন রাখতে তারা এসব বলছে, আর না হয় বুঝতে হবে পরিমল অন্য মানুষ হয়ে গেছে—বিশাখার স্মৃতি তার মনে থেকে একেবারে মুছে গেছে। এই আশঙ্কাও বিশাখা করছিল বইকি। একটা ধূ-ধূ মরুভূমি বুকে নিয়ে হতাশ-শূন্য চোখে সে বাড়ির সামনের রাস্তাটা দেখত। কিন্তু এই হতাশা বেশি সময় থাকত না। আবার তার বুকে আশার আলো দপ্ করে এক সময় জ্বলে উঠেছে। সেজে-গুজে জানালায় গিয়ে বসেছে। সে আসবে। আবার বিশাখাকে তার মনে পড়তেই হবে। চিরদিনের মতন পরিমল নিষ্ঠুর হয়ে যেতে পারে না। বিশাখা যে তাকে

চেনে। প্রেমিক হিসাবে পরিমলের তুলনা হয় না, তেমনি মানুষ হিসাবেও পরিমলের স্থান যে কত উঁচুতে বিশাখা তার পরিচয় পেয়েছে। একদিন ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। পরিমল নৃশংস হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা হলেও কি একদিনের জন্য বিশাখা তার ওপর থেকে শ্রদ্ধা অনুরাগ হারিয়েছে? প্রেম ঔদার্য ক্ষমা স্নেহ সারল্য কোমলতা—অন্যদিকে সংযম কাঠিন্য তেজ বিক্রম দুরন্ত সাহস ও অপরিসীম মনোবল নিয়ে সে যে একটি সম্পূর্ণ মানুষ, পরম সুন্দর পুরুষ, বিশাখা তা অস্বীকার করবে কেমন করে! এবং বিশাখা বিশ্বাস করে, পরিমল যদি আজ তাকে ঘৃণাও করে—সে অসুস্থ, পরিমলকে দেখতে চাইছে—কথাটা শোনা মাত্র পরিমল ছুটে আসবে। কাজেই তার আশঙ্কা হচ্ছিল, যদি পরিমল জেল থেকে বেরিয়েও আসে গিরিজা তার সঙ্গে দেখা করেনি অথবা দেখা করলেও বিশাখার কথা তাকে বলা হয়নি। বললে পরিমল এমন চুপ করে আছে, মরে গেলেও বিশাখা বিশ্বাস করবে না।

দুদিন ধরে বিড়বিড় করে রীনার কাছে সে এসব বলছিল। 'তা না হয় তোরা আমাকে তার ঠিকানা দে—আমি তার সঙ্গে দেখা করি।' রীনা তার ঠিকানা জানে না। একডালিয়া রোডের বাড়ি ছেড়ে কতকাল জগমোহন ডাক্তার সপরিবারে চলে গেছেন। 'এখন তাঁরা কোথায় শহরের কোন অঞ্চলে বাড়ি নিয়ে আছেন আমি বলতে পারব না'—রীনাকে মিথ্যা কথা বলতে হয়েছিল। জগমোহন ডাক্তারের নারকেলডাঙ্গার নূতন বাড়ির নম্বর সে জানত। গিরিজার কাছ থেকে ডাক্তারের বাড়ির নম্বর, টেলিফোন নম্বর সে জেনে রেখেছিল।

'তবে গিরিজার কাছ থেকে জেনে নে—' বিশাখা সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলেছিল, 'জগমোহন ডাক্তার কোথায় আছেন গিরিজার তো অজানা নেই—'

'আমাকে ওবাড়ির ঠিকানা দিতে চাইছে না।' রীনাকে আর একটা মিথ্যা কথা বলতে হয়েছিল।

'কেন!' ধমকে উঠে প্রশ্ন করেছিল বিশাখা। এবং পরক্ষণে চুপ করে গিয়েছিল।

রীনা বলেছিল, 'ঠিকানা পেলে আমরা হয়তো ওবাড়ি যেয়ে উপস্থিত হব—আমি বা তুমি—তাঁরা এটা পছন্দ করবেন না, গিরিজা বুঝতে পেরেছে—তাই হয়তো ঠিকানাটা সে দিতে চাইছে না—' রীনা এবার সত্য কথা বলেছিল। কিন্তু সত্য বলতে বলতে আবার একটু মিথ্যা জুড়ে না দিয়ে সে পারল না! 'এটা অবিশ্যি আমি অনুমান করছি—আমরা ওবাড়ি গেলে জগমোহন ডাক্তার কী তাঁর ছেলেরা অসন্তুষ্ট হবেন এমন কথা গিরিজা আমাকে মুখ ফুটে বলেনি যদিও।'

শুনে বিশাখা আর একটাও কথা বলেনি। আর কোনো প্রশ্ন করেনি। দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজে চুপ করে বসে ছিল। তার চোখের কোণা বেয়ে জলের ধারা নেমে এসেছিল। রীনার অনুমানটা যে কত বড়ো সত্য হয়ে তার দিদির সামনে উপস্থিত হয়েছিল রীনা তা বুঝতে পারল না। যদি গিরিজা সেখানে থাকত তো সে-ও বুঝতে পারত না।

বিশাখা নিঃসন্দিগ্ধ হতে পেরেছিল। জগমোহন ডাক্তার পরিমলকে তার কাছে আসতে দিচ্ছে না—পরিতোষ দিচ্ছে না। কেন দিচ্ছে না—অথবা বিশাখা, এমন কী রীনাও যদি ও বাড়ি যায় তো তারা রাগ করবে কেন, বিরক্ত হবে কেন এই প্রশ্নের উত্তর বিশাখার চেয়ে আর কে ভালো জানে। রীনা সেসব কিছুই জানে না, গিরিজা জানে না। তাদের অনুমান বিশাখার

আজকের জীবন নিয়ে। স্বামীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে সে চলে এসেছে। তাদের ভয় সেখানে। ডাক্তারের বাড়ির মানুষেরা এ জিনিস ক্ষমা করবেন না, যেমন বিশাখার বাবা মা করেননি।

কিন্তু বিশাখার এই অপরাধ জগমোহন ডাক্তার কী পরিতোষের চোখে কতটুকুন!

তার চেয়ে যে অনেক বেশি অপরাধের কথা তাঁরা একদিন জেনে গিয়েছিলেন। পরিতোষ আগে জেনেছিল। পরিমলের ছায়া হয়ে এই ভাইটি প্রথম থেকে সব কিছু জানত। প্রেমের কুঁড়ি থেকে আরম্ভ করে ফুল ফোটা, তারপর সেই ফোটা ফুলের ভিতর কীটের বাসা বাঁধা। পরিতোষের কাছে পরিমল যে কিছুই গোপন করেনি, পরিমল একদিন বিশাখাকে কথাটা বলেছিল। প্রথম দিকে হাসতে হাসতে বলত, শেষ দিকে চোখে জল নিয়ে বলত। পরিমলের সেই কান্না ও দীর্ঘশ্বাস বিশাখার মনে আছে। তাই এখনো সময় সময় সে চিন্তা করে, পরিমল তাকে একটু বেশি ভুল বুঝেছিল। যাই হোক—পরিতোষ জানত, পরিমলের মতন সে-ও দাদার প্রণয়িনীকে শেষ দিকে চিনে নিয়েছিল এবং তাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছিল—কাজেই বিশাখার অনুমান করতে কষ্ট হয় না, মলয়কে খুন করার পরে মেজো ছেলে বাবাকে সব বলেছিল। জগমোহন সব শুনেছিলেন। অবশ্য মামলা চালাতে গিয়ে তাঁরা যে তাকে অব্যাহতি দিয়েছেন এই জন্য বিশাখা কৃতজ্ঞ। নিশ্চয় পরিমল তাকে অব্যাহতি দিয়েছে। এই জন্যই তো রাতদিন বিশাখা বলে, রীনার কাছেও বলে, পরিমলের মতন মহৎ চরিত্র কারোর হয় না।

হ্যাঁ, আজ বিশাখার নাম শুনলে ঘৃণায় পরিতোষ ও জগমোহন নাকমুখ কুঞ্চিত করবেন, পরিমল বিশাখাকে নিশ্চয় দেখতে আসত, কিন্তু তাঁরা তাকে আসতে দিচ্ছেন না। বিশাখার চোখের জল বাঁধ মানছিল না। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছিল, ঠোঁট কেটে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল। রীনা এই দৃশ্য বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে পারেনি। ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। প্রায় রোজই গিরিজা রীনার মুখে এসব খবর শুনছিল। কাজেই যদি বিশাখা কোনোরকমে জানতে পারে যে পরিমল অক্ষয়বাবুর বাড়ি যেতে আরম্ভ করেছে, অক্ষয়বাবুর মেয়ের সঙ্গে তার মেলামেশা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তো তখন বিশাখার মনের অবস্থা কী দাঁড়াবে গিরিজা সহজেই তা অনুমান করতে পারছিল। এসব চিন্তা করে সে রীনার কাছেও কথাটা প্রকাশ করেনি। বলা যায় কি। কখন কোন অসতর্ক মুহূর্তে—

কিন্তু রীনা কথাটা শুনল। খবরটা শোনার পর থেকে যূথি মল্লির জিভ চুলবুল করছিল—এই নিয়ে আর কারো সঙ্গে আলোচনা না করা পর্যন্ত দু বোন শান্তি পাচ্ছিল না। সেদিন রিচি রোড বেড়াতে গিয়ে তারা তাদের পুরোনো সখী রীনার কাছে পরিমল ও বুলার গল্প করল। হাসাহাসি করল। রীনা গম্ভীর হয়ে সব শুনে গেল।

সেই রাত্রেই রীনা গিরিজার কাছে ছুটে এল। রীনা সব বলতে গিরিজা এমন একটা ভান করল যেন সে এই প্রথম খবরটা শুনছে। রীনার চোখের দিকে তাকিয়ে সে একটা উপেক্ষার হাসি হাসল, বলল, 'গুজব হতে পারে—অক্ষয়-বাবুর কাছে লর্ড ক্ষমা চাইতে গেছে—এটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ঐ এক ফোঁটা মেয়ের সঙ্গে লর্ডের মাখামাখি—এ বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। এটা লোকের বানানো কথা—মানুষ কত কী গুজব রটায়—'

রীনা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা নেড়েছিল।

'অনেকেই বলছে, ও পাড়ার কেউ কেউ নাকি স্বচক্ষে দেখেছে বুলাকে নিয়ে পরিমল জ্যোৎস্নার রাত্রে মাঠে বেড়াতে যায়—বুলাকে নিয়ে সিনেমায় যায়, বুলাকে বইটই কিনে দিয়েছে, আবার মেয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে, পরিমল তাকে পড়ায়—'

'তাতে দোষ কী, ছোটো বোনের মতন দেখছে, অক্ষয়বাবুর মেয়েকে লর্ড স্নেহ করছে—অস্বাভাবিক না কিছু, মলয়ের ছোটো বোন, মলয়ের সঙ্গে লর্ডের একদিন যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল।' গিরিজা ব্যাপারটাকে যতটা সম্ভব হাল্কা করতে চেষ্টা করেছিল।

'উঁহু, তা নয় তা নয়।' চোখ বড়ো করে ভুরু কপালে তুলে রীনা বলেছিল, 'তুমি তো ক'দিনের মধ্যে বালিগঞ্জ যাচ্ছ না। কান পাতা যাচ্ছে না সেখানে, অক্ষয়বাবু, অক্ষয়বাবুর স্ত্রী চেষ্টা করছেন, জগমোহন ডাক্তারের ছেলে যদি বুলাকে বিয়ে করে—কিন্তু তোমার লর্ডের মতিগতি নাকি সুবিধের নয়—ও পাড়ার মানুষ তাই বলছে , একদিন সে খুন করেছিল, তারপর দশ বছর জেল খেটে বেরিয়ে এসেছে—এখন যে সে বিয়ে করে ঘর সংসার পেতে আর পাঁচটি মানুষের মতন শান্তশিষ্ট জীবনযাপন করবে এটা তার কাছে আশা করা অন্যায়। অক্ষয়বাবু, অক্ষয়বাবুর স্ত্রী ভীষণ ভুল করছেন।'

গিরিজা কথা বলছিল না। তেমন করে আর হাসতে পারছিল না। চেহারা গম্ভীর করে রেখেছিল। রীনা চুপ থাকেনি, 'লোকে বলছে, ঐ মেলামেশা পর্যন্ত, বিয়েটিয়ে করবে না পরিমল, মেয়েটাকে নষ্ট করবে, এই মতলব নিয়ে সে ওখানে খুঁটি গেড়েছে, বুলার বাবাকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করছে।'

গিরিজার দু কান লাল হয়ে উঠল। শিক্ষিত মেয়ে রীনা। একটা কলেজে পড়ায়। তার মুখ থেকে এসব কথা বেরোচ্ছে। তার অর্থ, পরিমলকে নিয়ে এমন সব বিশ্রী কথাবার্তা আরম্ভ হয়েছে ও পাড়ায় যে, রীনার মতন মেয়েও বিচলিত হয়ে পড়েছে। সেদিন রাত্রে জগমোহনবাবু এবং পরিতোষের সঙ্গে এই নিয়ে গিরিজার কথা হয়েছিল। মাঝখানে দুটো দিন গেছে। চায়ের ব্যাপারে তাকে একটু বাইরে যেতে হয়েছিল। দুদিন সে কলকাতা ছিল না। আজ সকালে ফিরে এসে পরিতোষকে টেলিফোন করেছিল। পরিমল ব্রজদুর্লভপুর যেতে রাজি হচ্ছে না। সুকোমলকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। আজ পর্যন্ত সেও এসে পৌঁছোয়নি। এদিকে পরিমল অক্ষয়বাবুর বাড়ি নিয়মিত যাচ্ছে। বুলাকে, বুলার ছোটো ভাইকে লেখাপড়া শেখাবার ভার নিয়েছে। এটা ঠিক টিউশানি কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবে এই জন্যই নাকি পরিমল এখন ব্রজদুর্লভপুর কী অন্য কোথাও যাবে না—পরিতোষকে একথা সে বলেছে। তবে অক্ষয়বাবুর ছেলেমেয়েকে যে বিনাপয়সায় পরিমল লেখাপড়া শেখাতে উৎসাহী হয়ে উঠেছে এটা পরিতোষ বেশ বুঝতে পারছে। কারণ ছেলেমেয়ের স্কুলের খরচই যখন ভদ্রলোক চালাতে পারছেন না তখন গৃহশিক্ষককে তাঁর উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবেন কোথা থেকে। কথাটা বলে পরিতোষ টেলিফোনের ওপার থেকে হাসছিল বটে, গিরিজার ভয়ানক রাগ হয়েছিল, দুঃখ হয়েছিল শুনে। পরিমলের মূর্খতার কথাই সে চিন্তা করছিল। যা সে আশঙ্কা করছিল তাই সত্য হতে চলেছে। কিসের ওপর পরিমলের লোভ যে-কোন মানুষ এখন চোখ বুজে বলে দিতে পারে। প্রথম দিন সেই কফি হাউসে বসে গিরিজা লক্ষ্য করেছিল,

লর্ড আর আগের মানুষ নেই, তার কথার মধ্যে তাকানোর মধ্যে একটা ভয়ংকর স্থূলতা প্রকাশ পাচ্ছে। জেল থেকে সে ভালো হয়ে বেরিয়েছে কী মন্দ হয়ে বেরিয়েছে সেদিন বুঝতে গিরিজার কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এখন তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তার দৃষ্টিভঙ্গি কোন্ স্তরে নেমে গেছে। হুঁ, জেলখানার কুসংসর্গ তার চরিত্রের অবনতি ঘটিয়েছে। কিন্তু 'ডেভিল' না হয়ে একটা 'ইডিয়ট' হয়ে সে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে কিনা এমন সন্দেহও দু একবার গিরিজার মনে উদয় হয়েছিল। এখন পরিমল যা করছে তাতে তাকে ইডিয়ট ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে। অক্ষয়বাবুর পরিবারের সঙ্গে বিশেষ করে ঐ বয়সের একটা মেয়ের সঙ্গে তার মেলামেশা বাড়ির মানুষ পছন্দ করছে না, ও-পাড়ার মানুষ ভালো চোখে দেখছে না, এই স্থূল কথাটা কি পরিমল বুঝতে পারছে না? নিশ্চয় এ ক'দিনে মেলামেশাটা অতিরিক্ত বেড়ে গেছে। রীনা কত কী শুনে এসেছে। তা বলে গিরিজা যে এখনি তার মামার কাছে ছুটে যাবে, মামাকে মামিকে সাবধান করে দেবে এমন ইচ্ছা গিরিজার নেই। তারা জেনেশুনে একটা দুষ্ট চরিত্রের মানুষকে যদি বাড়িতে আশ্রয় দেয়, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিতে উৎসাহ পায় তো গিরিজার সেখানে করার কিছু নেই। এই পরিমলের কাছেই তারা চরম আঘাত পেয়েছিল, চূড়ান্ত ক্ষতি করেছিল সে ওই পরিবারটার। এই ক্ষতি তারা আজও সামলে উঠতে পারল না। এখন যদি তারা মনে করে থাকে জগমোহন ডাক্তারের ছেলে সেদিনের ক্ষতি পূরণ করতেই এগিয়ে এসেছে তো তাদের ভুল সংশোধন করে দিতে কে সেখানে ছুটে যাবে। না, গিরিজা যাবে না, মামার প্রতি তার কোনোদিনই সহানুভূতি ছিল না। গিরিজার মা তো অনেকদিন ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। ভুলেও ও-বাড়িতে পা দেয় না। গিরিজার বোনেরাও সেখানে যায় না। মলয় বেঁচে থাকতে গিরিজা ওবাড়ি যেত। মলয় তার বন্ধু এই হিসাবেই সে যেত। মলয় খুন হওয়ার পরও দু একবার তাকে সেখানে যেতে হয়েছে প্রেসক্রিপশানটা উদ্ধার করার জন্য। পরিমলের জন্য তার ভাবনা তো ছিলই, মামলা চালাবার জন্য জগমোহন ডাক্তারকে সাহায্য করতে গিরিজা সেদিন কেমন মরীয়া হয়ে উঠেছিল। আজ আবার ডাক্তারের নূতন করে দুশ্চিন্তা আরম্ভ হয়েছে। এবং দুশ্চিন্তার মূলেও সেই একজন। পরিমল। সত্যি, মানুষটার নাম শুনলেও যেন গিরিজার এখন ঘৃণা হয়। অথচ এই মানুষকে একদিন সে মাথায় করে রেখেছিল। লর্ড বলতে সে অজ্ঞান হত। জগমোহন ডাক্তারকে এবং পরিতোষকেও সে সেদিন বুঝিয়ে এসেছে পরিমলের ব্যাপারে তারা যাতে অস্থির না হয়, মাথা গরম না করে। শয়তান খুনী বা উন্মাদের ওপর জোরজুলুম করতে যাওয়ার বিপদ সম্পর্কেও দুজনাকে সে সতর্ক করে দিয়ে এসেছে। টেলিগ্রাম না করে সুকোমলের কাছে চিঠি দেওয়া হোক, এ দুদিন বরং তারা চিন্তা করে দেখুক বড়ো ছেলে সম্পর্কে অন্যকোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় কিনা, কেন না, চিঠি পেলেও সুকোমল আদৌ আসবে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—পরিমলের ব্যাপারটাকে যে সে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাচ্ছে একথা তারা নিজেরাও বলছে, তা ছাড়া সুকোমল এলেও যে পরিমল ব্রজদুর্লভপুর যাবে না গিরিজা সেদিনই তাদের বলে এসেছিল। আজ তো সে পরিতোষের মুখেই শুনল, পরিমল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে ব্রজদুর্লভপুর বা অন্য কোথাও সে এখন যাবে না। কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাওয়া এখন তার পক্ষে অসম্ভব। তাই তো, অসম্ভবই বটে।

গিরিজা দাঁতে দাঁত ঘষল। রীনাকে সে বলছে বটে ব্যাপারটা কিছুই না, গুজব, এই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই—কিন্তু আসলে যে জিনিসটা উড়িয়ে দেবার মতন নয়—ইডিয়ট আর একটা সর্বনাশের দিকে ছুটে যাচ্ছে—নিজের সর্বনাশ তো বটেই, অক্ষয় উকিলেরও চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে, গিরিজা এখনই তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তাই সে চিন্তা করছে, খল উন্মাদ ও খুনে সম্পর্কে পরিতোষকে, পরিতোষের বাবাকে সে সতর্ক করে দিয়ে এসেছে, কিন্তু ইডিয়ট সম্পর্কে তারা কী করবে সেকথা তো সে বলে আসেনি। বস্তুত গিরিজা নিজেও ভেবে ঠিক করতে পারছে না, মুর্খ অজ্ঞান চৈতন্যলেশহীন লর্ডকে নিয়ে আজ কী করা যায়। জগমোহনের জন্যই তার চিন্তা। এই দুদিনে তিনি নিশ্চয় আরো বেশি উদ্ভ্রান্ত অস্থির হয়ে পড়েছেন। টেলিফোনে কথা বলার সময় গিরিজা ইচ্ছা করেই পরিতোষকে তার বাবার কথা জিজ্ঞাসা করেনি। বুড়ো মানুষটার জন্য গিরিজার এত কষ্ট হয়।

'যাক গে', গিরিজা রীনার দিকে তাকাল। 'তোমার দিদিকে কিন্তু এসব বলো না. এমনি তো মাথাটা নষ্ট হয়ে গেছে—অক্ষয়বাবুর বাড়ি গিয়ে পরিমল এসব করছে শুনলে ভয়ানক শক্ পাবে. তখন আবার কী করে বসে কিছু ঠিক নেই।'

'না, তা কখনো বলা যায়!' রীনা একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। 'মুশকিল হচ্ছে তাকে কী করে বোঝানো যায় যে পরিমল আর সে পরিমল নেই—বিশাখা তার মন থেকে একেবারে মুছে গেছে।'

যার মাথা খারাপ হয়ে গেছে তাকে তুমি কী বোঝাবে।' গিরিজা বড়ো করে একটা নিশ্বাস ফেলল। 'পরিমলকেই কি আমি বোঝাতে পেরেছি—সেদিন কফি খেতে খেতে একটা ঘন্টা বকলাম—বকাই সার হল. ডাফ্ স্ট্রীটের দিকে পা বাড়ানো দূরের কথা. সেই বিকেলেই সে ছুটে গেল অক্ষয় উকিলেব বাড়ি।'

'মেয়েটিকে কি আমি দেখেছি?'

'তা আমি কী করে বলব।' রীনার হাতটা মুঠোর মধ্যে তুলে নিল গিরিজা। 'আগে ওরা যতীন দাস রোডে ছিল, দেখতেও পার, এখন গোসাইপাড়া বস্তিতে আছে।'

রীনা নাক কুঁচকাল।

'ঐ বস্তিগুলোতেই এসব কেলেঙ্কারি বেশি হচ্ছে। একটা জেলফেরত বুড়ো ধাড়ি খুনের সঙ্গে সতেরো বছরের মেয়ে প্রেম করছে।'

গিরিজা চুপ করে রইল।

॥ ৩১ ॥

কিন্তু বিশাখার কিছুই অজানা রইল না। সব খবর সে পেল।

গিরিজা ও রীনা যেমন মনে করত, কাকটিও তার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারছে না. ডাফ্ স্ট্রীটের সেই ছোটো একতলা বাড়ি, একটা ঝাঁকড়া-মাথা লিচু গাছ যে-বাড়িকে আরো বেশি আড়াল করে রেখেছে, সদর রাস্তা থেকে প্রায় চোখেই পড়তে চায় না এবং গিরিজা ও রীনা ছাড়া—তাও তো গিরিজা একদিনই সেখানে গিয়েছিল, বাইরের একটি মানুষ অর্থাৎ বিশাখাকে

চেনে জানে, কাছে বসে দু দন্ড গল্প করতে পারে, আজ পর্যন্ত এমন কেউ ওবাড়ির দরজা মাড়ায় না, তো এই সংসারে কী হচ্ছে না হচ্ছে বিশাখা জানবে কেমন করে?

কিন্তু তবু সে জানল।

হয়তো রীনা এতটা খেয়াল করেনি, বাইরে থেকে কাকটি উড়ে আসছে না, একটি কাক এবাড়িতেই বাসা বেঁধে আছে। কুসুম। বিশাখার ঝি। রীনাই মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল। কসবার ওদিকে ঘর । বালিগঞ্জে রীনার মার কাছে এসেছিল চাকরির খোঁজে। রীনাদের ঝি চাকর ছিল। রীনা তখন ডাফ্ স্ট্রীটের বাড়িতে কুসুমকে নিয়ে আসে। মেয়েটা চালাক-চতুর। স্বভাবটিও মিষ্টি। বিশাখার চেয়ে কয়েক বছরের বড়োই হবে। বিশাখার ভালো লেগেছে কুসুমকে। বিধবা। বারো তেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু ষোল বছর না পুরতেই কুসুমের কপাল ভাঙে। কসবায় বিধবা মা আছে, একটি ভাইও আছে। কিন্তু বিয়ে করে ভাই আলাদা সংসার পেতেছে। বিয়ে না করা পর্যন্ত মাকে বোনকে এই ভাই দেখত। এখন ভাই পর হয়ে গেছে। মা বোনের খোঁজ নেয় না। তাই কুসুমকে চাকরি করতে হচ্ছে। বিশাখার কাছে রীনার কাছে কুসুম নিজেদের সংসারের গল্প করতে করতে একদিন কেঁদে ফেলেছিল। তারপর অবশ্য কোনোদিন আর তাকে কাঁদতে দেখা যায়নি। বরং সর্বদা মুখে হাসি লেগে আছে। পানটা খায় বেশি। পান দোক্তার কৌটোটা সারাক্ষণ হাতের কাছেই রাখে। সে যাই হোক, কুসুমের কাজকর্মও পরিষ্কার। বোঝা যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে সে নিজেও ভালোবাসে। বিশাখার হাট বাজার করা, রান্নাবান্না, ঘর গোছানো—সবই কুসুমের ওপর। এমন একটি ঝি পেয়ে রীনাও নিশ্চিন্ত হয়েছে। নিজে তো সে সব সময় থাকতে পারে না। বিশাখার অসুখবিসুখের বাড়াবাড়ি দেখলেও যে এক রাত এ বাড়ি এসে থাকবে তা অসম্ভব। কুসুমকে পেয়ে রীনার দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে। কুসুম সুন্দরভাবে সব চালিয়ে নিচ্ছে। দরকার মতন ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনা, তাঁর ডিস্পেনসারিতে গিয়ে বিশাখার ওষুধ নিয়ে আসা, কী হঠাৎ আবার একটা কিছুর প্রয়োজন হল, তখন রীনাকে খবর দিতে কুসুমই বালিগঞ্জে ছুটে যায়। তা ছাড়া সপ্তাহে একবার কি দু সপ্তাহ পর একদিন একবেলার ছুটি নিয়ে কুসুম কসবায় মাকে দেখতে যায়, তখনও ফেরার পথে রিচি রোডের বাড়ি হয়ে রীনার সঙ্গে রীনার মার সঙ্গে সে দেখা করে আসে। বড়ো মেয়ের জন্য রীনার মার মন কাঁদে বইকি—কিন্তু স্বামীর জন্য কিছু করতে পারেন না। এমন কী এক আধদিন যে বিশাখাকে এসে দেখে যাবেন তা-ও মিঃ চ্যাটার্জির জন্য সাহস পান না। বড়ো মেয়েকে বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাক, তাকে এ বাড়ির কেউ দেখতে যাবে, তার খোঁজ-খবর নিতে যাবে নীলাদ্রিবাবুর তাতে ঘোর আপত্তি। বিশাখা বাঁচুক মরুক কী জাহান্নামে যাক এ নিয়ে যেন কেউ মাথা না ঘামায়—এমন একটা কড়া নির্দেশ তিনি বাড়িতে দিয়ে রেখেছেন। এখন রীনা যে তার দিদির জন্য এত করছে, সবই লুকিয়ে। রীনার একটা সুবিধে কলেজে পড়াতে যেতে তাকে বাড়ি থেকে বেরোতে হয়। কাজেই রোজই একবার বিশাখার কাছে সে আসতে পারে। রীনার মার সেই সুবিধা নেই। রীনার কাছ থেকে তিনি বড়ো মেয়ের সব খবরই জানতে পারেন, কিন্তু তা হলেও কুসুম এলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো অনেক কথা তিনি জিজ্ঞেস করেন—এখন বিশাখা কেমন আছে, মাথাটা একটু ঠান্ডা হয়েছে কি, নিয়মমতো খাওয়া-দাওয়া করে

কিনা, মা বাবার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করা বা বাড়ি আসবার কথা আর এখন বলে-টলে কি না ইত্যাদি।

গিন্নিমার সবগুলি প্রশ্নের জবাব দিয়েও চা জলখাবার খেয়ে কুসুম সেখান থেকে বেরিয়ে বালিগঞ্জের এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে তার জানাশোনা আরো দু একজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও দরকার মতন একটু গল্পসল্প করে তারপর ডাফ্ স্ট্রীট ফিরে আসে।

ফিরে আসার সময় এঁটোকাঁটার মতন ছুটকো ছাটকা দুটো একটা খবর যে সে মুখে করে না নিয়ে আসে এমন নয়। যেমন বালিগঞ্জের রাস্তায় একটা বুড়ি ট্রামের নীচে কাটা পড়ল, গড়িয়াহাট রোডের মোড়ে একটা বাড়িতে যেন আগুন লেগেছিল, জোর ঘন্টা বাজিয়ে তিন তিনটা দমকল ছুটে গেল, এবার যেন ওপাড়ায় পুজোর তেমন ঘটা দেখলাম না— গোনাগুনতি আটাশখানা ঠাকুর চোখে পড়ল, গত বছর শুনেছিলাম ছাপ্পান্ন খানা।

কিন্তু এসব খবর যত্ন করে কুড়িয়ে নিয়ে আসলেও কুসুম সেগুলি বলে কার কাছে! তার মনিবানী তো আর খবর শুনবার মেজাজ নিয়ে বসে থাকেন না। কখনও হাঁড়ি জামা ছিঁড়ছেন, কখনও কাঁদছেন, মুখ বেজার করে জানালার ধারে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিচ্ছেন। আর না হয় তো শরীর খারাপ করল, এক নাগাড়ে তিনদিন মড়ার মতন বিছানায় শুয়ে থাকলেন। তখন আর গল্প বলে কে, আর সে গল্প শোনেই বা কে।

তবু যদি কোনোগতিকে এক আধদিন বিশাখার মেজাজটা ভালো থাকে, শরীরটাও সুস্থ থাকে—সেদিন কুসুম অনেকদিনের জমানো পুরোনো গল্পগুলি গলগল করে ছাড়তে থাকে। এবং দেখা যায় বিশাখাও বেশ মনোযোগ দিয়ে সব শুনছে—এবার ওপাড়ার পুজোয় মোটে আটাশখানা ঠাকুর দেখে এল কুসুম, গড়িয়াহাট রোডের মোড়ে কার বাড়িটা না জানি আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, এমন ভরদুপুরে বুড়িটা রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ওপর ট্রামের নিচে কাটা পড়ল—তাই তো!

কুসুমের গল্প শুনতে শুনতে বিশাখার প্রকান্ড চোখ দুটো স্থির হয়ে যায়, যেন গোটা বালিগঞ্জের ছবিটা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, রাসবিহারী অ্যাভিন্যু তো একটা রাস্তার নাম, তার সঙ্গে রিচি রোড, লেক রোড, কাঁকুলিয়া রোড, একডালিয়া রোড, ডোভার লেন— দশটা রাস্তা গলি পার্ক লেক মাঠ গাছ আকাশ ও রৌদ্রের দুপুর, জ্যোৎস্নার সন্ধ্যা তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। কুসুমের গল্প শেষ হয়ে গেলে বিশাখা কিন্তু আর তখন ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে থাকে না, চোখ বুজে জানালার গরাদে কপাল ঠেকিয়ে চুপ করে বসে থাকে। বোজা চোখের কোণায় দু ফোঁটা জল টলটল করতে থাকে, দৃশ্যটা দেখে কুসুম এবার দমে যায়। তারপর সে চিন্তা করে, এমন হওয়াটা অস্বাভাবিক না, বাপ-মার কথা মনে পড়েছে দিদিমণির, বাড়ির কথা বালিগঞ্জের কথা মনে পড়ে কান্না পেয়েছে, ওদিকে স্বামীর সঙ্গেও বনিবনা হল না, এদিকে বাপ-মার সঙ্গেও ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে এসে (রীনা এভাবেই কুসুমকে বুঝিয়েছে) একলা ঘর ভাড়া নিয়ে চাকরি করছে, এসব কথা ভেবে ভেবেই তো মাথাটার গোলমাল হয়ে গেল মানুষটার। দু মাস ধরে তো ইস্কুলেও যাচ্ছে না, অসুখ। মনের অসুখটাই যে বেশি, কুসুম বেশ বুঝতে পেরেছে। সেই জন্য দিদিমণির মেজাজ-মর্জি যাতে ভালো থাকে সেদিকে কুসুমের খুব লক্ষ্য। তার নিজের জীবনও তো দুঃখের, স্বামী মরে

গেছে, উপযুক্ত ভাই বিয়ে করে বোনকে মাকে খেতে পরতে দিচ্ছে না, কিন্তু দিদিমণির তো তা না, তার সবাই আছেন, তবু কেমন একলা জীবন, এবং কুসুম ভেবে ঠিক করতে পারে না, এমন গা ভরা যার রূপ সে কেন স্বামীর ঘর করতে পারল না। এক এক দিন কুসুমের ইচ্ছা করে তার মনিবানীকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয় তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী নিয়ে অশান্তি এবং কোনোদিন কি আর তিনি স্বামীর কাছে ফিরে যাবেন না। কিন্তু কুসুমের মনের ইচ্ছা মনেই থেকে যায়, কেননা এটাও সে বেশ বুঝতে পারে মনিবানী কোনোদিনই এই জিনিস তাকে বলবেন না। এ কথা কেউ কাউকে সহজে বলতে চায় না যে।

কিন্তু তা হলেও কুসুম বাইরে থেকে এটা ওটা খবর জেনে এসে যতক্ষণ না দিদিমনিকে বলতে পারে মনে শান্তি পায় না। হলই বা ঝি, সারাক্ষণ মুখ বুজে থেকে কাজ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে সে হাঁপিয়ে ওঠে। বিশাখার সঙ্গে যখন কথা বলার সুযোগ হয় না তখন সে পাশের ঘরের বউটির কাছে গিয়ে একটু গল্প করে আসে। নাম বুঝি প্রীতি—প্রীতিলতা। মানুষটি ভালো। স্বামী একটা প্রেসে চাকরি করে। ফাঁক পেলেই প্রীতিলতাও এসে বিশাখার খোঁজ-খবর নেয়। বিশাখার অসুখ-বিসুখের বাড়াবাড়ি দেখলে তার মাথায় জল দেওয়া বাতাস করা ওষুধটা খাইয়ে দেওয়া—অনেক কিছুই করে মহিলা। দিদির এমন একটি সহৃদয় প্রতিবেশিনী থাকাতে রীনা আরও কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে।

মাকে দেখতে সেদিন আবার কুসুম কসবা গিয়েছিল। ফেরার সময় যখন বালিগঞ্জ হয়ে আসে এবার আর রিচি রোডের বাড়িতে গিয়ে দিদিমণির মার সঙ্গে দেখা করার সময় পেল না। পুরোনো বন্ধুদের মধ্যেও সকলের সঙ্গে দেখা করতে পারল না। একজনের সঙ্গে দেখা করে একটু গল্পটল্প করে এল। কিন্তু সেখান থেকে এমন একটি মূল্যবান সংবাদ সে জোগাড় করে নিয়ে এল যে ডাফ্ স্ট্রীট ফিরে এসে দিদিমণিকে তখনি খবরটা বলতে না পারলে তার ভয়ানক আফশোস হত। অবশ্য রাস্তায় সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, দিদিমণির মেজাজ ভালো নেই দেখলে পাশের ঘরের প্রীতি বৌদিমণিকে খবরটা বলবে, বলতেই হবে। তার কারণ এতই মজার এতই রসালো এই খবর, আবার শুনলে একটু ভয় পাবার মতন চমকে ওঠার মতনও বটে যে, যে-কোনো মানুষকে এটা শুনিয়ে স্বচ্ছন্দে তাক লাগিয়ে দেওয়া যায়। খবরটা শুনে অবধি কুসুমের জিভটা চুলবুল করছিল, হৃৎপিন্ডটাও কেমন ধড়াস ধড়াস করছিল। কত বড়ো বুকের পাটা হলে মানুষ এই কলকাতা শহরে এই বালিগঞ্জের বুকে বসে এমন কাজ করতে পারে! কিন্তু খুনেটার দোষ কী, দোষ সম্পূর্ণ তোদের, তোরা কোন আক্কেলে আবার ওটাকে বাড়িতে ঢুকতে দিলি! কেবল কি ঢুকতে দেওয়া—তাই তো কথায় বলে ঘোর কলি—মানুষের পিত্তি বলে কিছু আর আছে নাকি, তোদের ছেলেকে খুন করল নরপিশাচ—জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসতে না আসতে ওটাকে জামাই আদর করতে শুরু করলি। এমন ঘটনা ত্রিভুবনে কেউ কোনদিন শুনেছে!

বিশাখার মেজাজ সেদিন ভালো ছিল। চান করে চুলটুল বেঁধে সুন্দর একখানা শাড়ি পরে জানালার ধারে বসে ছিল। কুসুম যখন বাড়িতে ঢোকে তখন তার সঙ্গে বিশাখার চোখাচোখি হয়, মায়ের বাড়ি বেড়ানো শেষ করে শ্রীমতী ওবেলা না এসে এ বেলাই ফিরে এল দেখে বিশাখা খুশি হল, তার ঠোঁটের কোণায় হাসি দেখা দিল। দিদিমণির মুখে হাসি

দেখে কুসুমকে আর পায় কে—এক দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল। ভালো শাড়িখানা ছেড়ে যে আটপৌরে কাপড়খানা পরবে সেই সময়ও তার ছিল না। হাঁপাতে হাঁপাতে বালিগঞ্জের টাটকা খবরটা দিদিমণিকে শুনিয়ে দিল। কিন্তু খবর বলা শেষ করে কুসুম একটু হতাশ হল। কই, তেমন করে তো চমকে উঠল না দিদিমণি। ভুরু কপালে তুলল না, চোখও বড়ো করল না। বা উকিল উকিলগিন্নির কান্ড শুনে যে ঘেন্নায় নাকমুখ কুঁচকোবে তাও না। সারা মুখে চুলের মতন একটা রেখাও জাগল না। যেমন জানালা দিয়ে কুসুমকে দেখতে পেয়ে ঠোঁটের কোণায় হাসছিল, তেমন করে হাসতে লাগল। কুসুমের বুকটা দমে গেল। মনে মনে একটু রাগও হল তার। ভাবল, পাগল মানুষ, রামশ্যাম যদুমধুকে নিয়ে তুচ্ছ খবরও তার কাছে যা আর উকিল উকিলের মেয়েকে নিয়ে—খুনেটাকে নিয়ে এত বড়ো সংবাদটাও তার কাছে তাই। যেন এটা একটা ঘটনাই নয়, এমন ঘটনা আকছার ঘটছে. রোজই কিছু এমন খবর তার কাছে এসে পৌঁছোচ্ছে। এখনই পাশের ঘরের বউয়ের কাছে ছুটে যাবে কিনা কুসুম তাও চিন্তা করছিল। প্রীতিলতা জিনিসটাকে কেমন করে লুফে নেবে—কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ মুখের অবস্থাই বা কী দাঁড়াবে কুসুম সহজেই তা কল্পনা করতে পারছিল।

কেবল যে আজ টিয়ে রঙের সিল্কের শাড়িখানাই পরেছে বিশাখা তা নয়। চোখে কাজল পরেছে খোঁপায় দুটো যুঁইফুল গুঁজেছে। রীনার নির্দেশ মতন ফুলওয়ালা রোজ সকালে একবার ঘুরে যায়। অধিকাংশ দিনই বিশাখা ধমকে বকে দোর থেকে লোকটাকে বিদায় করে দেয়। কিন্তু যেদিন মেজাজ ভালো থাকে আগ্রহ করে ফুল কেনে, ফুলের মালা কেনে, তারপর সেই ফুল দিয়ে খোঁপা সাজায়।

তাইতো, কুসুম ভাবল কখন যে তার মনিবানীর মেজাজ ভালো থাকে কখন খারাপ হয় বোঝা মুশকিল। এমনও হতে পারে, দশ মিনিট পার হবে না, চুলের ফুল খুলে ফেলে পা দিয়ে সেগুলি চটকাতে আরম্ভ করবে, পরনের শাড়িখানা কামড়ে কামড়ে ছিঁড়তে শুরু করবে।

এখন অবশ্য সে রকম কোনো লক্ষণ দেখছিল না কুসুম। তাই সে আশা করছিল উকিল বাড়ির খবরটা শুনে দিদিমণি, আর পাঁচটা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যা করত. ভয়ানক চমকে উঠে কুসুমকে এই নিয়ে হাজারটা প্রশ্ন করত, উকিলের মেয়ের কত বয়স হয়েছে, খুনেটারই বা এখন কত বয়স, উকিলের ছেলেকে কবে খুন করেছিল, কতকাল জেল খেটে এসেছে মানুষটা ইত্যাদি কত কী জানতে চাইত।

কিন্তু বিশাখা নির্বিকার নীরব। কেবল ঠোঁটের বাঁ কোণ থেকে হাসিটা ডান কোণে সরে গেল। দেখে কুসুম আর তেমন অবাক হল না। কারণ সে বুঝতে পারল, এটাও মাথা খারাপের একটা লক্ষণ। যেমন ঘরে আগুন লাগছে দেখে পাগল হাসে, শোকের সংবাদ শুনে হাসে। এত বড়ো একটা ঘটনার কথা শোনার পরও বিশাখা দিব্যি হাসছে।

এঘর থেকে বেরিয়ে কুসুম ওঘরে প্রীতিলতার কাছে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। হঠাৎ বিশাখা নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। এক পলক জানালার বাইরে তাকাল, তারপর কুসুমের চোখে চোখ রেখে বলল, 'উকিলের নাম কী জানতে পারলি?'

কুসুমের উৎসাহটা ফিরে এল। চোখ বড়ো করে বলল, 'না, তা তো শুনিনি দিদিমণি, সবাই বলছে উকিল উকিল—ঐ বোধকরি নাম।'

এবার বিশাখার সমস্ত ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে পড়ল!

'আর ঐ যে বলছিস খুন করেছিল মানুষটা, তার নামটা জানতে পারলি?'

কুসুম মাথা নাড়ল।

'না, তাও তো জানা গেল না, দিদিমণি—সবাই বলছে খুনে—যেন ওটাই তার নাম হয়ে গেছে বালিগঞ্জে—আসল নাম নিয়ে কেউ মাথাই ঘামাচ্ছে না দেখলুম।'

এবার বিশাখা ছোটো মেয়ের মতন খিল খিল করে হেসে উঠল।

'তবে তুই খবরটাই কেবল শুনে এলি, কারোর নামধাম পরিচয় কিছুই জেনে আসিসনি!'

কুসুমের মর্যাদায় লাগল। মুখটা কালো করে ফেলল। 'নামধাম তো বড়ো কথা নয় দিদিমণি, এখানে খবরটাই বড়ো, ঘটনাটাই মজার; বিদঘুটে সেই খবর নিয়ে বালিগঞ্জের মানুষ লুফোলুফি করছে—ওদের নামধান পরিচয় জানল না বলে কেউ যে মজা কম পাচ্ছে এমন একজনকেও কিন্তু আমার নজরে পড়ল না।'

কুসুমের চোখমুখের অবস্থা দেখে বিশাখার বুকে হাসির বান ডাকল, হাসির আবেগে সে কাঁপছিল। 'হ্যাঁ, তাই বটে, খবরটাই বড়ো, খবরের মধ্যেই সব মজা।'

জানালার গরাদ ধরে আর সোজা হয়ে বসে থাকতে পারল না বিশাখা।

বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে হাসতে লাগল।

মুখ কালো করে ফেলেছিল কুসুম, কিন্তু তার কান দুটো লাল হয়ে উঠল।

'তা বলে কি আর একটু-আধটু পরিচয় জেনে আসিনি তুমি মনে কর দিদিমণি, তা জেনে এসেছি বই কি। খুনের বাপ ছিল ডাক্তার, এই বালিগঞ্জের ডাক্তার, এখন কোথায় আছে কেউ বলতে পারে না, আর উকিল নাকি গোঁসাইপাড়া বস্তিতে থাকে, উকিলকে কেউ কেউ দেখেছে, উকিলকেও দেখেছে মেয়েটাকেও দেখেছে, হুঁ, সতেরো বছরের মেয়ে—'

'থাক থাক আর পরিচয় দিতে হবে না কুসুম, অনেক হয়েছে।' হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরল বুঝি বিশাখার, চোখে জল এসে গেছে, আর হাসতে পারছে না, যেন হাসতে গিয়ে ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল, চেহারাটা বিকৃত হয়ে উঠল, আর চোখের কাজল ধুয়ে গলে একাকার, খোঁপার ফুল ছিটকে পড়েছে বিছানায়, শাড়ির আঁচল লুটিয়ে পড়ল খাটের বাইরে।

ফ্যালফ্যাল করে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে কুসুম একটা গভীর নিশ্বাস ফেলল। একটা ভয়ংকর বিদঘুটে খবর মজার খবর শুনে দিদিমণি এমন করছে, না কি উকিলটার খুনেটার নামধাম ভালো করে সে জেনে আসেনি বলে দিদিমণি এত হাসল, তারপর কেঁদে এখন খুন হচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারল না সে। তাই তো বলে, পাগলের হাসি পাগলের কান্না, কোন্ কথা শুনে পাগল দুঃখ পায় কোন্ কথায় তার আনন্দ হয় বোঝা মুশকিল। কেননা তার মুখের হাসি চোখের জল মনের স্ফূর্তি বুকের ব্যথা হঠাৎ এক সময় তালগোল পাকিয়ে যায়। একটা থেকে তখন আর একটা আলাদা করা যায় না। পাগলের বুকেও ব্যথা আছে বইকি। দিদিমণির ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কুসুম বারান্দার এধারে পার্টিশান দেওয়া নিজের ছোটো খুপরিতে ঢুকে ধোয়া শাড়ি সায়া খুলে ফেলে আটপৌরে পোশাকটা পরল। এখন কাজের সময়। প্রীতিলতার ঘরে গিয়ে ওবেলা গল্পটা বলবে, মনে মনে সে ঠিক করে রাখল। মাথা

খারাপ মানুষের কাছে কোনো খবর বলে কোনো গল্প বলে যে একবিন্দু সুখ নেই মর্মে মর্মে সে তা উপলব্ধি করছিল।

বসে সে বাসন মাজছিল। তখন বেলা একটা বাজে। আর একটু বেশি। সূর্যটা হেলে গেছে। আশ্বিন শেষ হয়ে কাল থেকে কার্তিক মাস আরম্ভ হল। কার্তিকের সূর্য কাত হয়ে হয়ে আকাশ পাড়ি দেয়। কেবল মনে হয় এখনি বিকেল হবে! হঠাৎ পিছনে জুতোর শব্দ শুনে কুসুম ঘাড় ফেরাল। দিদিমণি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। কুসুম অবাক। আবার সুন্দর করে সেজেছে বিশাখা। এবার চাঁপা রঙের একখানা মুর্শিদাবাদী পরেছে, ছোটো বোন তো আর দামি শাড়ি ব্লাউজ কম এনে দেয় না। পাগল মানুষ, একটা শাড়ি একবেলা পরল কী একদিন পরল, তারপর ছিঁড়ে ফালা ফালা করে রাখল, তবু নূতন নূতন জামা কাপড় আসছে। ছোটো দিদিমণি যে কত ভালোবাসে এই বোনকে কুসুম চোখের ওপর দেখছে। খোঁপায় ফুল। নূতন করে চোখে কাজল বুলোনো হয়েছে, কুসুম তা-ও লক্ষ করল।

'কোথায় যাচ্ছগো দিদিমণি!' কুসুম হাতের বাসন ফেলে রেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

'আমি একটু বেরোচ্ছি।' বিশাখা আবার ঠোঁটের কোণায় হাসল। 'ওপাশের দরজা বন্ধ করে দিয়েছি, আমি এদিক দিয়ে বেরোলাম।'

'তা না হয় বেরোলে, আমি তো রইলাম, কিন্তু—' কাতর চোখে কুসুম দিদিমণির ফ্যাকাশে শুকনো মুখখানা দেখল। 'এখনো শরীরটা তেমন করে সারেনি, রোদ্দুরটাও আছে, আবার না অসুখটা বাড়ে—'

'তোর সে ভাবনা ভাবতে হবে না।' বিশাখা সবটা ঠোঁট হাসি দিয়ে ভরে তুলল। 'সারাদিন ঘরে বসে কত ভালো লাগে—তোর ভালো লাগবে? একটু ঘুরে আসি।'

কুসুম চুপ করে রইল। বিশাখা আস্তে আস্তে গেটের বাইরে চলে গেল।

টের পেয়ে প্রীতিলতা তার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল।

'কোথায় চলল তোর দিদিমণি?

'কী জানি!' হাতের তেলো দুটো শূন্যে ঘুরিয়ে কুসুম প্রীতির চোখের দিকে তাকাল। 'বলল বেরোচ্ছি, কোথায় যাচ্ছে কোনদিকে যাচ্ছে, কিছুই বোঝা গেল না।'

'স্কুলে তো ছুটি নিয়েছে—স্কুলে গেল কি?' প্রীতিলতার চোখেমুখেও একটা উদ্বেগ ফুটে উঠল।

'না না।' কুসুম মাথা নাড়ল। 'দু মাসের ওপর হল ছুটিতে আছে। পরশু আমায় বলছিল, এই ছুটিই ছুটি—আর ইস্কুলে যাবে না, চাকরি করার ইচ্ছে নেই। কাজেই ওখানে যাবে না।'

'তবে কি বালিগঞ্জ যাচ্ছে, মা বাবাকে দেখতে গেল?'

'উঁহু তাও মনে হয় না। ওঁদের ওপর তো সারাক্ষণ রেগে আছে, বলছে আমার মা বাবা অমানুষ—ওদের ভেতরটা পাথরের মতো শক্ত। এমন বাপ মা কারোর হয় না।'

প্রীতিলতা চুপ করে রইল।

'কিন্তু আমি ভাবছি ছোটো দিদিমণির কথা, এসে না রাগারাগি করে, আমায় বকুনি লাগায়—খারাপ শরীর নিয়ে দিদিকে বেরোতে দিলি কেন, বলবে হয়তো।'

কুসুমের কাতর চোখ দুটো দেখে প্রীতিলতার মায়া হল। বলল, 'না, তা বলবে হবে

কেন, আমিও তো দেখলাম, বলব আমরা পই পই করে বারণ করলাম, তবু বেরিয়ে গেল। রীনা আমার কথা বিশ্বাস করবে।'

কুসুম কতকটা নিশ্চিন্ত হল।

'সত্যি, এই পাগলামি করে আবার এই ভালো হয়ে যায়, এমন মানুষকে নিয়ে মুশকিল। একেবারে পাগল হয়ে গেলে তবু বেঁধেছেদে রাখা যায়—কিন্তু এ যে—'

কথা না বলে প্রীতি একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

॥ ৩২ ॥

তাই তো, অন্য কোনো শব্দই সে আর শুনতে পাচ্ছে না।

'কেবল একটা শব্দ তার মগজটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যেন তার মাথার ভিতর কেউ একটা ছুরি শান দিচ্ছে, শনশন শব্দ হচ্ছে। এই শব্দের কাছে অন্য কোনো শব্দ ঘেঁৎতে পারছে না।

এতক্ষণ অটলবাবু বকাবকি করে গেলেন।

প্রদোষ তার ঘরে চুপ করে বিছানায় শুয়ে রইল।

'আটটায় নাকে মুখে গুঁজে আমাকে বেরোতে হল। ফিরি আর এক আটটায়। তোর যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকত। এই সংসারের ওপর এক ফোঁটা মায়া থাকত তো এমন বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরতিস না। পড়ার মধ্যে তো দেখি সময় সময় ক'খানা নাটক নভেলই কেবল পড়া হয়। কলেজের মাইনে মাস মাস দিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পড়ায় বই নিয়ে একদণ্ড তো বসতে দেখি না। হুঁ, খুব তো নবাবের মতন দিন কাটছে, না একদিন বাজার করা না রেশন ধরা। সীমা রেখাকেও একবেলা একটু পড়াতে দেখি না। তোর ভেতরের ইচ্ছাটা কী, উদ্দেশ্যটা কী আমায় বলতে পারিস? ওদিকে রাত বারোটায় ঘরে ফিরিস আর এদিকে বেলা আটটা অবধি পড়ে পড়ে ঘুমোস, শুনছি কদিন ধরে তোর স্নান খাওয়ারও টাইমের ঠিক থাকে না, কোনদিন বেলা দুটো বাজে কোনদিন আড়াইটের সময় ছাড়া কুকুরের মতন ধুঁকতে ধুঁকতে ঘরে ঢুকিস। নিশ্চয় একটা কিছু মতলব নিয়ে আছিস, আমরা বুঝতে পারি না ঠিকই, আমি না তোর মা না—সীমা রেখাও তোকে চিনতে পারছে না—ছোঃ তুই বাড়ির বড়ো ছেলে, তুই করবি তাদের দুঃখ দূর, তুই দেখবি তোর বাপ মাকে, তবেই হয়েছে—'

প্রদোষের এক কান দিয়ে কথাগুলি ঢুকল, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেল।

টিফিনের কৌটো পকেটে পুরে পান চিবোতে চিবোতে অটলবাবু সারাদিনের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রদোষ এবার বিছানায় উঠে বসল। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে আরশিটা তুলে নিয়ে মুখটা একবার দেখল। দাঁতগুলি দেখল, জিভটা দেখল, চোখের ভিতরটাও দেখল। তারপর আরশিটা আবার টেবিলে রেখে দিল। তিনটে নতুন উপন্যাস আনা হয়েছিল। একটা বইয়েরও পাতা উল্টে দেখা হয়নি। উপন্যাসে তার অরুচি ধরে গেছে। বইয়ের বানানো গল্পে বীতস্পৃহা এসেছে। স্বাভাবিক। একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল সে। উপন্যাসের চেয়ে জীবন যে অনেক বেশি কঠিন সত্য ভয়ংকর—এই তিনদিনে সে বেশ বুঝে গেছে!

এবং মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে, এতকাল ধরে যা সে কল্পনা করছিল, চমৎকার চমৎকার বই লিখবে, চটকদার সব গল্প লিখে মানুষকে তাক্ লাগিয়ে দেবে, উপন্যাস-জগতে প্রদোষ দত্ত আলোড়ন সৃষ্টি করবে, সেসব কিছুই তার করা হবে না। শান্ত ভদ্র নিরাসক্ত শিল্পী হয়ে বেঁচে থেকে কেবল কলম চালানো, মানুষের রুচি বুঝে বুঝে রং চড়িয়ে মিথ্যা কতগুলি গল্প তৈরি করে বাজারে ছড়ানোর বিলাসিতা আর যার থাকুক তার শোভা পাবে না। সেই সুখ সেই সৌভাগ্য থেকে ঈশ্বর তাকে চিরদিনের মতন বঞ্চিত করল। তাই সে দিনরাত শুনছে তার মাথার ভিতর কেউ একটা কিছু অস্ত্র শানাচ্ছে, এখনি সেটা একটা নরম নিরীহ হরিণের বুকের ভিতর চলে যাবে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। অথবা গাছের ডালে বসে শিস দেয়, ধবধবে বুক, পাতার রঙের পাখা, টুকটকে লাল ঠোঁট পাখিটার গলা ছিন্ন করে দিয়ে ধারালো ছুরিটা সাঁই সাঁই করে আর একদিকে ছুটে গেল, আর একটা খুন করবে জখম করবে, রক্তের প্রবল তৃষ্ণায় জিভ লকলক করছে।

তিনদিন ধরে প্রদোষ এসব ছবি দেখছে।

কাজেই এত সব দুঃস্বপ্ন নিয়ে সে উপন্যাস লেখে কখন! বরং টেবিলের বইগুলির দিকে চোখ পড়লে ভেংচি কেটে বইয়ের লেখকদের উদ্দেশ করে তার বলতে ইচ্ছা করে, তোমরা জীবনের কতটা দেখেছ, কতটুকু ফোটাতে পেরেছ এসব মনগড়া কাহিনীর মধ্যে! এক প্রেমিকের মগজের ভিতর চব্বিশ ঘণ্টা ছুরি শান হচ্ছে, শনশন শব্দ হচ্ছে, গুঁড়ো গুঁড়ো আগুন উড়ছে এমন কথা কোনোদিন বলতে পারলে না।

কাজেই তোমরা জীবন দেখনি, জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে শেখনি। কঠিন বীভৎস জীবন যদি দেখতে হয় এদিকে তাকাও, আমাকে দেখ।

প্রদোষ হাতে বাড়িয়ে আবার আরশিটা টেনে আনল। জীবন দেখতে নিজের চোখের রং জিভ দাঁত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ঠোঁট দুটো দেখল। এখন তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল না, শুকনো পাতার মতন খসখসে বিবর্ণ ঐ ঠোঁট জোড়া দিয়ে সেদিন দুপুরে একটি মেয়েকে সে চুমো খেয়েছিল।

ঠোঁট দুটো কেটে ফেলতে তার ইচ্ছা করছিল। বা ছুঁচ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্ত বার করে দিতে। তার চোখে জল এসে গেল। জীবন!

'কে!' দরজায় পায়ের শব্দ হতে সে চমকে উঠল। আরশি রেখে দিয়ে চট করে চোখটা মুছে ফেলল। 'সীমা?'

'আমি রেখা।'

'আয় ভেতরে আয়।' প্রদোষ খুশি হল। রেখাকেই মনে মনে সে এখন খুঁজছে। রেখাকে দিয়েই কাজ হচ্ছে। সীমাটা অতিরিক্ত ফাজিল হয়ে গেছে। এটা বড়ো আশ্চর্য! প্রদোষ লক্ষ্য করেছে। পিঠাপিঠি দু বোন। এক বছরের ছোটো বড়ো। সীমার বুঝি এখন তেরো, রেখার বারো। কিন্তু এক বছরের বড়ো হয়ে সীমাটা এত চালাক দুষ্ট হয়ে গেছে, যেন চোখের পলকে দুনিয়ার সব কিছু ও বুঝে ফেলছে। সেই তুলনায় রেখা শিশু—মনটা আজও কত সরল সুন্দর। সব খবর সে রেখার কাছ থেকেই পাচ্ছে। সীমাকে তো কিছু জিজ্ঞাসা করাই দায়; হয় খিলখিল করে কেবল হাসবে, নয়তো হাসি রুখতে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে মাথাটা নিচু

করে রাখবে। অর্থাৎ বুলাদের ঘরের কথা কিছুতেই সরলভাবে ও বলবে না। বলতে চাইছে না। অর্থাৎ ও বুঝে গেছে, পাশের ঘরে সেই মানুষটার যেদিন থেকে আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে, সেদিন থেকে দাদার মাথা গরম। তাই তো, কেন তার দাদার এই দুর্বলতা, কার ওপর দুর্বলতা সীমার যেন আর বুঝতে বাকি আছে কিছু! এই বয়েসেই পেকে ঝুনো হয়ে গেছে মেয়ে। কদিন আগেই প্রদোষ লক্ষ্য করেছে, বুলার সঙ্গে যখন সে কথা বলত—সীমা ধারে-কাছে থাকলে সে খুব হুঁশিয়ার হয়ে যেত, কেন না একরত্তি মেয়ে, এমনভাবে ও দুজনের চোখের দিকে বার বার তাকিয়েছে, যেন দুটি যুবক যুবতীর চোখের ভাষা পড়ার ঐশ্বরিক ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে তার জন্ম হয়েছে। এবং বুলাও টের পেয়ে প্রদোষকে একদিন বলেছিল, 'তোমার এই বোন ভীষণ পেকে গেছে, ওর সামনে আমাকে কিন্তু কিছু বলো না।'

কিন্তু কদিন আর সে বুলাকে কিছু বলতে পারল, সুযোগ পাওয়া গেল কোথায়, প্রেম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ভালোবাসার ফুল সবে ফুটতে আরম্ভ করল—ধূমকেতুর মতন, দুষ্ট গ্রহের মতন একটা জেলফেরত খুনে এসে হাজির হল। তারপর থেকে লোকটা রোজ আসছে, দুবেলা আসছে। কাল তো প্রায় সারাদিন ওদের ঘরে কাটাল। রেখার কাছে সব খবর পাচ্ছে প্রদোষ। বুলাকে পড়াতে আরম্ভ করেছে, কিছু বইটইও নাকি কিনে দিয়েছে, বড়োলোকের ছেলে, অনেক কিছুই করবে। পরশু বুলা ও নিলয়কে বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখিয়ে এনেছে। কেবল ঘরে বসে থাকলে হয় না, তাই ভাই বোনকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবার আগে খুনেটা নাকি অক্ষয়বাবুকে বোঝাচ্ছিল, এত বড়ো শহর, কত কী দেখবার জানবার আছে, ঘুরেটুরে সব না দেখলে জ্ঞান বাড়বে কেন।

শুনে হাসি পেয়েছিল প্রদোষের। ছেলেমেয়েদের জ্ঞান দিতে উকিলের ঘরে মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটল এতকাল পর। দশ বছর যিনি জেলের ভাত খেয়ে এসেছেন! আর কী আক্কেল ওই বুড়োটার—ভেবে পাচ্ছিল না প্রদোষ, সঙ্গে সঙ্গে উকিলগিন্নিরও কি মাথাটা নষ্ট হয়ে গেল! তাদের আঠারো বছরের মেয়ে এখন নূতন করে আবার লেখাপড়া আরম্ভ করবে—অ্যাল্‌জেব্রা এরিথ্‌মেটিক ইতিহাস ভূগোল নিয়ে বসবে। আদি রসের স্বাদ পেতে যে মেয়ে রাতদিন ছটফট করছে, যার চোখের তারায় মদনের শর নাচানাচি করছে? ভালো।

এসব শোনার পর থেকে প্রদোষের মাথার ভিতর ছুরিটা খুব বেশি শনশন করছে আর আগুনের ফুলকি ওড়াচ্ছে। কাল একনাগাড়ে দু ঘণ্টা বুলাকে নিলয়কে পড়িয়ে গেছে। নিলয় কি আর এতটা সময় ছিল। বুলাকেই পড়িয়েছে মাস্টার। ওদের সেই ছোটো ঘর। হাতল-ভাঙা চেয়ার। কেরাসিন কাঠের টেবিল। অন্ধকার অন্ধকার ভিতরটা। ওই ঘরেই তো প্রদোষকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসাত বুলার মা। প্রদোষের সঙ্গে নূতন উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করত, মার পাশে বসে থেকে বুলা শুনত আর ফাঁক পেলে প্রদোষের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসত। তাই তো—সব ভালোবাসা, মন-দেয়া-নেয়া, কান্না বিরহ মেয়ে করায়ত্ত করে ফেলেছিল। কিছুই তার বুঝতে জানতে বাকি ছিল না, পঞ্চান্ন বছরের বুড়ি হয়ে মা কিছুই বুঝত না—প্রদোষ বুঝিয়ে দিলেও প্রত্যেকটা জিনিস মহিলার কাছে তেমনি ধোঁয়াটে হেঁয়ালি থেকে গেছে। দশ বছরের খুকির মতন ড্যাবড্যাবে চোখে প্রদোষের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে—দেখে মাকে অনুকম্পা করত মেয়ে, করুণা করত—মেয়ের চোখের ভাষা মা বুঝত

না, প্রদোষ বুঝত, তার তখন কষ্ট হত মহিলার জন্য—মনে মনে সে বলত, যৌবনেও তুমি প্রেম ভালোবাসা কাকে বলে নিশ্চয় জানতে পারনি। মন্ত্র পড়ে এক রাত্রে উকিল তোমাকে বিয়ে করেছিল, পরদিন থেকে তুমি তার স্ত্রী অর্থাৎ সন্তানধারণের যন্ত্রে পরিণত হয়ে গেলে এবং কালক্রমে মা এবং গিন্নির মর্যাদা লাভ করলে, মনে করলে জীবন ধন্য হল আমার। কিন্তু এ ছাড়াও যে জীবন আছে, জীবনের ভিন্নতর স্বাদ গন্ধ আছে, লীলা আছে, আজ জীবনের অপরাহ্নে পৌঁছে তার চকিত আভাস পেয়ে বিস্মিত ব্যাকুল হয়ে উঠলে। সেদিক থেকে তোমার মেয়ে যে অনেক বেশি সৌভাগ্যশালিনী এ আমি অস্বীকার করব কেমন করে। আমি সৌভাগ্যবান তো বটেই। যৌবনের স্বাদ গন্ধ আমি দুভাবে অনুভব করি। আমি প্রেমিক এবং শিল্পীও বটে।

কিন্তু সেসব চিন্তা এখন দুঃস্বপ্নের মতন মনে হল প্রদোষের।

অক্ষয় উকিলের সেই প্রায়ান্ধকার ছোটো ঘর, হাতলভাঙা চেয়ার, কেরাসিন কাঠের টেবিল—সবই আছে। কিন্তু উপন্যাসের রোমাঞ্চকর পরিবেশ নেই। নায়ক নায়িকা অনুপস্থিত। বরং বলতে পার ও ঘরের লীলাচঞ্চলা যুবতী রাতারাতি বালিকা হয়ে গেছে, সরলা কিশোরী, ইউক্লিডের জ্যামিতির ওপর ঝুঁকে আছে, নায়কের চেয়ারে শিক্ষক, একদিন যে খুন করেছিল জেল খেটেছিল!

না কি এ-ও আর এক উপন্যাস!

তাই তো। প্রদোষ ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছে না, মাথাটা গরম। ভৌতিক কাণ্ডের মতন হঠাৎ সব কেমন উল্টেপাল্টে গেল।

দাদার বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল রেখা।

প্রদোষ অসহায় চোখে বোনের দিকে তাকাল। বারো বছরের মেয়ে আজ তার প্রধান আশ্রয় অবলম্বন।

'গিয়েছিলি ওদের ঘরে?' চাপা গলায় সে প্রশ্ন করল।

রেখা মাথা নাড়ল, চোখ বড়ো করল। প্রদোষ আশ্বস্ত হল। তা হলে সকালেই নূতন খবর নিয়ে এসেছে বোন। 'কী শুনে এলি?'

'এখনি আসবে।'

'আজ এত সকালে কেন? দুপুরের দিকে তো আসে।'

'বুলাদিকে ডাক্তারের কাছ নিয়ে যাবে।'

'ডাক্তারের কাছে!' এবার প্রদোষ চোখ বড়ো করল। 'কী হয়েছে বুলার?'

'বুলাদির নাকি চোখ খারাপ, ভীষণ খারাপ, এতদিন কেউ ধরতেই পারেনি, বুলাদিও নিজেরটা ঠিক বুঝতে পারছিল না, কাল পড়াতে বসে ওর পরিমলদা জিনিসটা ধরে ফেলেছে, তাই আজ চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে, দশটার সময় দুজনে যাবে, চশমা নেবে বুলাদি।'

স্তব্ধ হয়ে শুনল প্রদোষ। হাঁ করে সিলিং দেখতে লাগল। চোখ খারাপ। এতদিন কেউ ধরতে পারেনি। মেয়ে নিজেও বুঝত না তার দৃষ্টি কেমন। আর ঐ চোখ দেখে প্রদোষ কিনা সব ভাষা বুঝে ফেলেছিল। তাই তো, নষ্ট চোখের ভাষা, নকল আয়নার প্রতিবিম্ব।

তেতোমতন একটা ঢোক গিলে বোনের মুখের দিকে তাকাল সে। 'তুই কার কাছে এত খবর শুনে এলি।'

'মাসিমা বলছিল।'

'হুঁ, আর কী বলল?'

'পরিমলের মতন মানুষ হয় না। পেটের ছেলেও এত করে না। চোখ দেখানো, চশমা নেওয়া, সব খরচ পরিমল দিচ্ছে।'

চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল প্রদোষের। রেখা ঠোঁট বেঁকাল।

'বুলাদি তো আমার সঙ্গে কথাই বলল না, যেন খুব একটা অহংকার হয়ে গেছে। দেখলাম সকালেই সাবানটাবান ঘষে মুখ ধুয়ে আয়না চিরুনি নিয়ে বসল চুল বাঁধতে। রোজ তো দেখি এমন সময় কলতলায় বসে বাসন মাজে, উনুন ধরায়। তখন মাসিমা বলছিল, আমার সামনেই বলছিল, তোকে এদিকের কিছু করতে হবে না, এখনি পরিমল আসবে।'

'পরিমল আসবে।' বিড়বিড় করে বলল প্রদোষ। তারপর আবার চুপ করে রইল। খুঁটিয়ে সব খবর বলে শেষ করে দাদার চোখ দুটো দেখছিল রেখা। যেন চোখ দুটো থেকে রক্ত ফেটে বেরোচ্ছে। তার সব খবর অত্যন্ত নির্ভুল নির্ভরযোগ্য, দাদা তার প্রত্যেকটা কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, এই জন্য রেখার মনে সর্বদাই একটা গর্ব রয়েছে। সীমাকে দাদা ডাকে না—ওর কোনো কথাও দাদা বিশ্বাস করতে চায় না।

কিন্তু রেখার আর একটা কথা মনে পড়ে গেল।

'নিলয় বলছিল, আজ শনিবার সকাল সকাল স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। সে বাড়ি এলেই তার পরিমলদা তাকে নিয়ে মাঠের জলায় মাছ ধরতে যাবে। ছিপ বঁড়শি কেনা হয়ে গেছে।'

'হুঁ।' প্রদোষ গলার একটা শব্দ করল। কিন্তু নিলয়কে নিয়ে মাঠের জলায় ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে যাবার পরিকল্পনা তাকে মোটেই বিচলিত করল না। সে একজোড়া চোখের কথাই শুধু ভাবছে। এই চোখ দিয়ে এতকাল যা কিছু দেখা হয়েছে সব ভুল, মিথ্যা। কাজেই চোখের দৃষ্টি সংশোধন করে দিতে শয়তান জেল থেকে বেরিয়েই এখানে ছুটে এসেছে।

'আচ্ছা তুই এখন যা।' চাপা বিকৃত গলায় প্রদোষ বলল, 'কেবল চশমা চোখে পরেই বাড়ি ফেরে, নাকি সেই সঙ্গে শাড়ি গয়নাও কিনে আনে নজর রাখবি।'

খুশি হয়ে ঘাড় কাত করে রেখা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে আয়না চিরুনি নিয়ে তাড়াতাড়ি চুল বাঁধতে বসল, পরিমল আসবে। তাই তো, কেবল কি আমার চোখ, আমার মনও পরিমল ছাড়া আর কেউ এতদিন বুঝতে পারল না চিনতে পারল না।' বদ্ধমুষ্টি দিয়ে নিজের কপাল ঠুকে প্রদোষ আর্তনাদ করে উঠল ঃ 'Frailty, thy name is woman!'

হেমন্তের মধ্যাহ্ন। রৌদ্রের যথেষ্ট তাপ রয়েছে, মাথা ঝিমঝিম করে, কাঠফাটা ভাদ্রের দুপুরের ছবি মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে হাওয়াও আছে। এলোমেলো হাওয়ায় শীতের আমেজ। যেন মনে হয় কমলালেবুর গন্ধে ঠাসা পৌষের নরম দুপুরগুলি প্রায় এসে

গেল। মোটের ওপর পরিমলের খুব ভালো লাগছিল কার্তিকের রৌদ্র হাওয়া মুখে মাথায় নিয়ে ঘুরতে।

তা ঘোরাও কম হয়নি। ধর্মতলায় বাস থেকে নেমে রীতিমতো হেঁটে চোখের ডাক্তারের চেম্বার তাকে খুঁজে বার করতে হল। তারপর আবার চশমার দোকান। বস্তুত এসব জিনিস যে তার আগেও মুখস্থ ছিল এমন নয়। কোনোদিন তার চোখ খারাপ হয়নি, চশমা নিতে হয়নি, বা কোন বন্ধুর চোখ খারাপ হয়েছিল, তাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসতে হয়েছিল এমনও হয়নি। এবং চেম্বার থেকে বেরিয়ে একটা দোকানে চশমা কিনতে ঢুকে যখন সে জানতে পারল যে সেখানেও একজন আই-স্পেশালিস্ট বসে আছেন তখন তার একটু আফশোষ হল। এক জায়গায় চোখ পরীক্ষা এবং চশমা নেওয়া দুইই যখন চলে তখন আলাদা করে চোখের ডাক্তারের চেম্বার খুঁজে বার করার হাঙ্গামাটা পোহাতে হত না।

যাই হোক, বৃষ্টি বাদল নেই কুয়াশা নেই, রৌদ্র হাওয়ায় মেশানো শুকনো খটখটে পরিচ্ছন্ন দুপুরে ফুটপাথ ধরে হাঁটবার সময় ছেলেবেলার কথা তার খুব মনে পড়ছিল। যেন সেদিনের উত্তেজনা উৎসাহটাও ভিতরে ভিতরে হঠাৎ অনুভব করছিল। এই কদিনের মধ্যে এমন আর হয়নি। শরীর মন—দুটোই হাল্কা লাগছে, এটা আজই প্রথম হল। এমন কী এই কদিন যেসব ভারি ভারি চিন্তা তার মনকে বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত করে তুলছিল, বুলার জন্য চশমা কিনতে এসে সব হাওয়ায় তাড়া খাওয়া মেঘের মতন কোথায় পালিয়ে গেল। সরযূধামের বিষণ্ণ পরিবেশ একবারও তার মনে পড়ল না, বা জেল থেকে বেরিয়ে প্রথমদিন বাড়িতে পা দিয়ে এবং তারপর থেকে প্রায় রোজ, প্রতি মুহূর্তে যেমন সে চিন্তা করছিল, 'আমাকে একটা কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হচ্ছে, পুরোনো পৃথিবীটা অবিকল সেরকম রয়ে গেছে, এতদিন জেলে থেকে আমার মধ্যে যে নতুন বোধ ও চেতনা সৃষ্টি হল এই পৃথিবীতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি নষ্ট হয়ে যাবে, এই তো দুদিন আগে একটা মানুষ, নাম গিরিজা, প্রায় অক্টোপাশের মতন আমাকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করেছিল, আমার সমস্ত স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা—সফল সুন্দর হবার বাসনা চুরমার করে দিয়ে একটা খোঁড়া বিকৃত মানুষে পরিণত করে নিজেদের দলে টেনে নিয়ে যেতে কত কী প্রলোভন দেখাচ্ছিল—ভয়ে তার কাছ থেকে আমি সরে এসেছি, পালিয়ে এসেছি, হ্যাঁ, এমন একটা ভয়ও পরিমলকে নির্জীব স্তিমিত করে রেখেছিল। আজ সেসব ভয় দুশ্চিন্তা তার একবারও মনে পড়ল না।

এমন কী, একটা কঠিন পরীক্ষার কথা ভেবে সে যেমন সর্বদা গুনে গুনে পা ফেলছিল, এখন তার মনে হল, সেসব কিছুই করার তার দরকার নেই। সে চিরদিনই সহজ সুন্দর স্বাভাবিক। কার্তিকের হাল্কা ফুরফুরে বাতাসের মতন স্বচ্ছন্দ ভারমুক্ত। কোনোদিন সে দুঃস্বপ্ন দেখেনি—দুর্ভাবনা নিয়ে একটা রাতও জাগেনি। প্রাণচঞ্চল শিশুর জীবন নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিল আজও সে তাই আছে। তার শিস দিতে ইচ্ছা করছিল। বুলার হাল্কা পায়ের চলার সঙ্গে পা মিলিয়ে সে অক্লেশে চলতে পারছিল। অথচ কদিন ধরে তার মনে হচ্ছিল শরীরটা ভার হয়ে গেছে, স্থূলতার জন্য একটু ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটতে হয়, কিন্তু এখন তার মনে হল, এটা তার মনের ভুল, একটি বালকের মতন দিব্যি ছুটে চলা তার অভ্যাস আছে। এতদিন তেমন করে হাঁটা হয়নি বলে জড়তা এসেছিল।

বুলাকে একটু শুকনো দেখাচ্ছে না? কপালের ওপর একটা চুল উড়ে এসেছে, ভুরুর কাছে নেমে এসে চুলটা একটু একটু কাঁপছে। নিশ্চয় ওর পিপাসা পেয়েছে।

'একটু চা খাবে?'

'না, ইস্ দুপুরে চা খায় কে!'

পরিমল একটু থমকে গেল। কেননা প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে ও এমন ভাবে মাথা নাড়ল, চোখের পলক নামিয়ে 'না' বলল, পরিমল বুঝল তার ভুল হয়েছে। যারা চা খাওয়ায় খুব অভ্যস্ত তারাই দুপুরের গরমে চা খেয়ে তৃষ্ণা মেটায়। কিন্তু বুলার সেই পিপাসা, তেমন বিশ্রী চায়ের নেশা না থাকাই তো স্বাভাবিক। একটুখানি মেয়ে। তা ছাড়া চা খেতে হলে এখন একটা দোকানে ঢুকতে হয়। দোকানে বসে চা খেতেও তার সঙ্কোচ হতে পারে। নিজের ভুল সংশোধন করে পরিমল তাড়াতাড়ি বলল, 'তা হলে এসো, ডাব খাওয়া যাক।'

এবার বুলা আপত্তি করল না। রাস্তা ক্রশ করে দুজনে ডাবের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ল।

তাই তো, বুলা যখন খুশি হয়ে ঢক্ ঢক্ করে ডাবের ঠাণ্ডা জল খাচ্ছিল পরিমলের তখন মনে হল, এমন ভুল করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। ত্রিশ বছর থেকে সতেরো বছরে ফিরে যাওয়ার পথে একটু আধটু হোঁচট খেতে হবে জানা কথা। তা বলে হাল ছাড়লে, হতোদ্যম হলে তো তার চলবে না। বাড়িতে পরিতোষের চার বছরের ছেলের সঙ্গে যদি একাত্ম হয়ে সে মিশতে পারে, তার সঙ্গলাভ করে দীপু তৃপ্তি পায়, সান্ত্বনা পায় তো এই সুকুমারমতি বালিকার মনের মতন করে নিজেকে গড়ে তুলতেই বা সে অক্ষম হবে কেন। বুলার অভিভাবক সেজে কী বন্ধু হয়ে তাকে চোখ দেখাতে সে বাড়ি থেকে নিয়ে আসেনি। সে যা চাইছে তা এভাবে ব্যাখা করা যায়। জেলখানার কৃষ্ণচূড়া গাছগুলির দিকে সে সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকত। তার ইচ্ছা করত না কতগুলি ফুল সে কুড়িয়ে নিয়ে আসে বা এমন বর্ণাঢ্য প্রকাণ্ড সমৃদ্ধ গুটি কয়েক গাছ সহ একটি প্রশস্ত ভূমিখণ্ডের মালিক হবার সৌভাগ্য সে অর্জন করে। তার ইচ্ছা করত হাজারটা ফুলের সঙ্গে আর একটি ফুল হয়ে সেও মিশে যায়। তেমনি পবিত্র সুন্দর হবার আকাঙ্ক্ষা। আর একটি ফুল হয়ে যাওয়া। এখানেও তাই। চোখ পরীক্ষার আগে চোখে ওষুধের ফোঁটা নিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে বুলাকে ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। পাশের চেয়ারে বসে পরিমল একটা ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছিল। হঠাৎ ওর দিকে তার চোখ গেল। পুতুলের মতন চুপ করে বসে আছে। মাথাটা একদিকে হেলানো। কাজেই মুখের একটা পাশ সে দেখতে পাচ্ছিল। অত্যন্ত কোমল পরিচ্ছন্ন কয়েকটি রেখা ঃ ভুরুর সূক্ষ্ম প্রান্ত, যেন শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না, চিবুক ও ঠোঁটের নরম বাঁক, ঈষৎ ঢেউ খেলানো ছোট্ট নাসারন্ধ্র, বোতাম ফুলের মতন গোল হয়ে তারপর আস্তে আস্তে গালের কাছে এসে মিশে যাওয়া—চোখের পলক পড়ছিল না পরিমলের, দুদিন আগে ঠিক এমন তন্ময়তা ও নিষ্ঠা নিয়ে জগমোহনের বাগানের সদ্য ফোটা সূর্যমুখীর দিকে সে তাকিয়ে ছিল। তাই তার তখন মনে হয়েছিল, এটা ধর্মতলা, আর একটু দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলে জগমোহনের চেম্বার। একবার বুলাকে নিয়ে সেখানে ঘুরে এলে হয় না? বাবার বসবার জায়গাটা বুলা দেখে আসবে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিমলের হাসি পেয়েছে।

সেদিন তাকে সূর্যমুখীর ঝাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জগমোহনের চোখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছিল। আজও তিনি হাসবেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না ফুলের মতন বিশুদ্ধ নির্মল মন নিয়ে তাঁর ছেলে একটি সতেরো বছরের মেয়ের সঙ্গে রাস্তায় চলাফেরা করছে। তিনি সর্বদাই আতঙ্কগ্রস্ত। পরিমলের ভিতরটা কালো কলুষিত। তার চিত্তশোধনের জন্য অবিলম্বে তাকে আশ্রমে পাঠাতে তিনি উৎসুক। এমন চিন্তা জগমোহনের পক্ষে স্বাভাবিক। এত বড়ো ফুলের বাগান করেছেন, কিন্তু একদিনও ফুল দেখে তিনি আত্মহারা হয়ে উঠেছেন বলে পরিমল মনে করতে পারে না। বা একটি শিশুর হাতে ফুল তুলে দিতে যৌবনেও তিনি কোনোদিন লাফিয়ে গাছে চড়ার কল্পনা করতেন এ বদনাম তাঁকে কেউ দিতে পারবে না। অথচ তিনি ফুল ভালোবাসেন। তেমনি শিশু নাতিটিকেও তো তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। 'দাদু' বলতে অজ্ঞান। কিন্তু দাদুটি আদরের আতিশয্যে হঠাৎ যদি কখনও জগমোহনের কোলে চেপে বসতে চায় তো তাঁর চক্ষু ছানাবড়া হয়ে ওঠে। 'এখনি পোশাক নষ্ট করে ফেলবে—বউমা দীপুকে নিয়ে যাও।' তাঁর আর্তনাদ পরিমলের কানে এসেছে।

অর্থাৎ একটি শিশুকে নিয়েও তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হন। চেম্বারে বসে পরিমল মনে মনে হেসেছিল, আবার একটা গভীর বেদনা তাকে মাঝে মাঝে কেমন মুহ্যমান করে তুলছিল।

॥ ৩৩ ॥

ব্যস্ত জনাকীর্ণ ধর্মতলার ওপর একটা গোলমোহর ফুলের গাছ দেখবে পরিমল আশা করেনি। ডাবের দোকানের সামনে গাছের ঠাণ্ডা ছায়াটা তাকে বেশি মুগ্ধ করল। যেন ট্রামবাস দোকানপসারের ভিড়, পোড়া পেট্রোল ডিজেলের গন্ধ ও কলরবের মধ্যে অরণ্যের স্বাদ—প্রকৃতির গন্ধ পেল সে। একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বুলার মুখের দিকে তাকাল। বুলা শহর বেশি ভালোবাসে নাকি বন, চিন্তা করতে গিয়ে হঠাৎ পরিমল লক্ষ্য করল, ঠোঁট বেয়ে গড়িয়ে আসা এক ফোঁটা ডাবের জল মুক্তার বিন্দু হয়ে বুলার থুতনির তলায় টলটল করছে। হয়তো জলটা মুছে দিতে নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রুমাল বার করতে চেয়েছিল পরিমল; হাতটা পকেটেই থেকে গেল। কেননা তখনি আঁচল দিয়ে বুলা থুতনি মুছে ফেলছে। বুকের ভিতর একটা ধাক্কা অনুভব করল সে। বুঝতে পারল কাজটা নিশ্চয় তার পক্ষে ভালো হত না এখানে, শোভন হত না, এমন একটা প্রকাশ্য জায়গায়—রাস্তার ওপর, প্রকাশ্য কেন, কোথাও হয়তো উচিত হবে না, কোনোদিনই না। কেন উচিত হবে না, কেন এটা অশোভন তা-ও তার বুঝতে কষ্ট হল। তাই একটা উদাস রিক্ততার ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এতটা সময় যে আনন্দের মধ্য দিয়ে কাটছিল একটু যেন মেঘের ছায়া দেখা দিল সেখানে।

দোকানীর দাম মিটিয়ে বুলাকে নিয়ে সে হাঁটতে লাগল। তার ইচ্ছা, একেবারে এসপ্লানেড পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে সেখানে ট্রাম বাস যা হোক কিছু ধরবে।

'তোমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না তো?'

'না, ভালো লাগছে।'

'আমারও ভালো লাগছে।' পরিমল আবার অনেকটা সহজ হতে পারল। 'না, তখন চায়ের কথা বললাম, চা না-ই খেতে—একটা কেক বা একটা ডিম—'

মুখ তুলে বুলা অল্প হাসল।

'আপনি নিশ্চয় ভাবছেন আমার খিদে পেয়েছে—সত্যি পায়নি, এমন অসময়ে কিছু খেতে ইচ্ছে করবে না।'

'না-ই বা করবে কেন।' পরিমল তেমন খুশি হতে পারল না। 'ছেলেমানুষ, এতটা হাঁটাহাঁটি ঘোরাঘুরি হচ্ছে, খিদে পাওয়া তো উচিত।'

'না, পায়নি।' এবার আর মুখ তুলল না বুলা, গলার স্বরটাও স্তিমিত শোনাল। 'এখনি তো বাড়ি গিয়ে ভাত খাব।'

'ডাক্তারবাবু আর একটু সকালে আমাদের ছেড়ে দিলে পারতেন।' পরিমল গম্ভীর হয়ে বলল, 'অবশ্য মাঝখানে আর একটি পেশেণ্ট এসে গেল—তা না হলে হয়তো—'

'আমি জানতাম চোখ দেখিয়ে চশমা নিতে প্রায় দু-দিনের মতন লাগে। যখন স্কুলে পড়তাম আমাদের ক্লাসের একটি মেয়ের চশমা নিতে হয়েছিল। ও যেন তাই বলেছিল।'

'না না।' পরিমল শব্দ করে হাসল। 'সে যাদের চোখের অসুখ থাকে। দু-দিন কেন দু-মাসও লেগে যায়। ততদিন চোখের চিকিৎসা চলে, তারপর কেস বুঝে ডাক্তাররা চশমার ব্যবস্থা দেয়। তোমার তো সেরকম কিছু না। এসব ক্ষেত্রে আজকাল চোখ পরীক্ষা করে সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়ার লিখে দেয়।'

বুলা কথা বলল না। একটু ইতস্তত করে পরিমল বলল, 'চশমাটা পরে নিলে পারতে।'

'না, লজ্জা করে।' মৃদু গ্রীবাভঙ্গি করে বুলা হাসল। 'আমাকে মনে হয় চশমা মানাবে না।'

'কেন!' পরিমল অবাক হল। 'তখন তো বললে ফ্রেমটা তোমার পছন্দ হয়েছে, রংটা ভালো, ডিজাইনটাও সুন্দর—'

'এই দ্যাখো, ইস আমি ফ্রেমের কথা বলছি নাকি।' বুলা অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। 'বরং আর একটু কম দামের ফ্রেম নিলে মোটেই ক্ষতি হত না। আমি তাই চাইছিলাম, দেখলাম আপনি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না।'

'তবে মানায়নি বলছ যে?'

'আমার কথা ধরতে পারেননি।' বুলা আর এক ঝলক হাসল। 'চশমা পরলে আমাকে সত্যি কেমন যেন বুড়ি বুড়ি দেখায়। তখন দোকানে ওটা চোখে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াতে বুঝতে পারলাম।'

হঠাৎ পরিমলের মুখে কথা সরল না। কেমন যেন চিন্তান্বিত দেখা গেল তাকে। মাথা নিচু করে হাঁটছিল তাই। কয়েকটি মেয়ের মুখ তার মনে পড়েছে। সেই কলেজের দিনের তীব্র ধারালো বুদ্ধি-উজ্জ্বল চোখে চশমার ঝলক। যত না বয়স তার চেয়ে অনেক বেশি পাকা সেয়ানা দেখিয়েছে এক একটি মুখ। চশমা চোখে বুলাকেও কি তাই দেখাবে!

যেন দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতে পরিমল তৎক্ষণাৎ হাসল। 'না, তা দেখাবে কেন। প্রথম চশমা পরছ, আয়নায় একটু অন্য রকম লাগছিল মুখটা, তা বলে বুড়ি দেখাবে কেন। আমি তো দেখলাম, মুখের কচি কোমল ভাবটা অবিকল সেরকম ছিল, বরং অতিরিক্ত একটা লাবণ্য যেন বেড়ে গেল তখন।'

পরিমল লক্ষ্য করল না। বুলার কান দুটো ঈষৎ লাল হয়ে উঠল। পরিমল যেন তখন ব্যস্ত হয়ে কাকে ডাকছে।

'এই দাঁড়াও।'

'কাকে ডাকছেন?' বুলা চোখ তুলে সামনের দিকে তাকাল। সুতোর সঙ্গে বেঁধে রং বেরঙের বেলুন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা মানুষ। পরিমল কি তাকেই ডাকছে? তাই তো। বেলুনওলা ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকে তাকাতে পরিমল হাতের ইসারায় তাকে কাছে ডাকল।

'বেলুন দিয়ে কী হবে!' বুলা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

পরিমলও অবাক হল। বুলার চোখ দেখল।

'কেন, তোমার পছন্দ হচ্ছে না? এত সুন্দর রং এক একটার। আমার তো মনে হয় কমলালেবুর রঙের অথবা বেগ্‌নি রঙের দুটো নিলয়ের জন্য নিয়ে গেলেই ভালো হয়, ভয়ানক খুশি হবে সে। আর তোমার? কোন রংটা পছন্দ হয়? অতসীফুল রং না কি—' বেলুনওলা কাছে এসে দাঁড়াতে পরিমল অত্যধিক ব্যস্ততা নিয়ে বেলুনগুলি দেখতে লাগল। 'আমার মনে হয় এটাও তোমার ভালো লাগবে। আশ্চর্য রং। একটু রোদ চড়তে আরম্ভ করলে স্থলকমলের ভেতরের দিকের পাপড়িগুলো ঠিক এই রং ধরে—তাই না?' প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে উচ্ছ্বাস নিয়ে সে বুলার দিকে চোখ ফেরাল। বুলা কিছুই বলছে না। চুপ করে আছে।

'দাও, আমায় চারটে দাও, এই রঙের দুটো ওই রঙের দুটো—কত দাম?' বেলুনওলা দাম বলতে পরিমল মনিব্যাগ খুলে তার হাতে পয়সা তুলে দিল। পয়সা নিয়ে লোকটা সরে গেল।

'কী হল, পছন্দ হচ্ছে না? অতসীফুল রং ভালো লাগছে না?' বুলার দিকে হলদে বেলুন দুটো এগিয়ে দিল পরিমল। 'নিলয়ের দুটো আমার কাছে থাক।' কিন্তু বেলুন ধরতে বুলা হাত বাড়ায় না। মুখ নিচু করে ঠোঁট টিপে হাসে।

'কী হল, হাসছ কেন?' পরিমলের কপালে রেখা জাগল। 'আহা, পছন্দ না হলে বল—লোকটাকে এখনো দেখা যাচ্ছে, ডাকব আবার? অন্য রঙের নেবে।'

মুখ তুলে বুলা এবার শব্দ করে হেসে ফেলল।

'ভীষণ ছেলেমানুষের মতন করছেন আপনি।'

'কেন!' প্রায় আকাশ থেকে পড়ার মতন চোখ করল পরিমল। 'কী হয়েছে, কী করলাম আমি!'

'আমি কি নিলয়ের মতন বেলুন ওড়াব?'

'কেন, তোমার ভালো লাগে না?'

যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পরিমলের কষ্ট হল। 'আমার কিন্তু আজও ভালো লাগে জিনিসটা। দেখলেই কেমন ওড়াতে ইচ্ছা করে বা জানালার কাছে ঝুলিয়ে রাখতে। তাও রাখা যায় কিন্তু।'

'আমারও ভালো লাগত। বেলুন দেখলেই কিনতে ইচ্ছা করত।'

'কবে, কখন?

'যখন ছোটো ছিলাম।'

পরিমল অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল। আঘাত পেল সে। মুখ নিচু করে হাঁটতে আরম্ভ করল। বুলা চুপ করে হাঁটছিল। পরিমল বুঝতে পারল, সব কেমন গোলমাল করে ফেলছে সে। বুলাকে বুঝতে তার কষ্ট হচ্ছে। অথচ দীপুর বেলায় তা হয়নি। শিশুর সঙ্গে নিজেকে কেমন চমৎকার খাপ খাইয়ে নিতে পারল সে। বুলার ভাই নিলয়ের সঙ্গে মিশতেও তার এতটুকু বেগ পেতে হচ্ছে না। আজ যদি বাড়ি ফিরে সময় থাকে, নিলয়কে নিয়ে মাঠের জলায় মাছ ধরতে যাবে। নয়তো কাল। কাল রবিবার নিলয় স্কুলে যাবে না। চকচকে বেগুনি রঙের বেলুন দুটো হাতে পেলে ছেলেটি কেমন খুশি হবে পরিমল এখনই তা অনুমান করতে পারছে। কাল একটা গুল্‌তি তৈরি করে দিয়েছে সে, মহা উৎসাহের সঙ্গে নিলয় পাখি কাঠবিড়াল শিকার করতে লেগে গেছে। কিন্তু বুলা? বস্তুত একদিন সে কত ছোটো ছিল অথবা আজ কতটা বড়ো হয়ে গেল ধরতে না পেরে পরিমল ভয়ংকর অসুবিধায় পড়ছে বার বার। ঠিক তার মতন করে নিজেকেও সে তৈরি করতে পারছে না। তা না হলে একটু আগে মেয়েটির মুখের ডাবের জল মুছিয়ে দিতে পরিমল পকেট থেকে রুমাল বার করতে গিয়েছিল কেন! আবার রুমালটা পকেটেই বা রেখে দিল কেন। সঙ্কোচ? দ্বিধা? বলছিল ও, চশমা পরলে মুখটা বুড়ি বুড়ি দেখায়—কিন্তু পরিমলের কাছে মোটেই তা মনে হয়নি। এদিকে বেলুন কিনে দিতে এই মাত্র যে কথাটা তাকে শুনতে হল তাতে পরিমল আর একটা বড়ো রকম হোঁচট খেল। একদিন আমি ছোটো ছিলাম।

তাই হবে। পরিমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ছোটো ছেলেমেয়েদের মতন যখন-তখন বুলার খেতে ইচ্ছা করে না, ক্ষুধা পায় না, যেহেতু এখন ও বড়ো হয়ে গেছে।

কিন্তু একটা ফুল সকালে যেমন ফুটল দুপুর না গড়াতে সেটা কত বড়ো হতে পারে! সকালের হাল্‌কা গোলাপ-রং রোদের তেজ লেগে কতটা গাঢ় হয়?

যেন অঙ্ক কষে দেখবার মতন।

পরিমল অসহায় বোধ করল। এই ফুলের সঙ্গে তারও যে কিছু হয়ে ওঠার সম্পর্ক রয়েছে। এই তপস্যাই তো সে এতদিন করে এসেছে। তবে কি সে ব্যর্থ হল? ফুল হওয়া তার হল না! দীপু হতে পারে সে, আর একটি নিলয় হয়ে যাওয়া তার পক্ষে কঠিন নয়—কিন্তু বুলা—

তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

প্রথম দিন বুলাকে পড়াতে বসে ওর বইয়ের একটা লেখা চোখে পড়ল পরিমলের। সতেরো বছরের ফুটফুটে মেয়ে বেতের ঝুড়িতে ফল ও দুধের বোতল সাজিয়ে নিয়ে রুগীর সেবা করতে যাচ্ছে। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল-এর গল্প। অন্য গল্প পড়াবার আগে বুলাকে সেই গল্প পড়িয়ে শোনাল পরিমল। আহত রুগ্ন মানুষের চোখে একদিন যে মেয়ে 'এঞ্জেল' হয়ে উঠল।

'এঞ্জেল' শব্দটার অর্থ বুঝতে পারছিল না বুলা। পরিমল বুঝিয়ে দিয়েছিল। আর তার তখন ভয়ংকর ইচ্ছা করছিল আঙুল দিয়ে বুলাকে দেখিয়ে দিয়ে বলে, 'যেমন তুমি। সেই মাধুর্য, কল্যাণশ্রী তোমার চোখে-মুখে—স্ফটিকের মতন স্বচ্ছ মন কোমল হৃদয় নিয়ে তুমিও মানুষকে সুন্দর পবিত্র করে তুলতে পার—যে আহত রুগ্ন তাকে সুস্থ সবল করে তোলার

শক্তি তোমার মধ্যেও রয়েছে। ডার্বিশায়ারের সেই মেয়েটি আবার এসেছে। আমার সামনে বসে আছে। আমিই সেই রুগ্ন আহত মানুষ।'

এঞ্জেলের মূর্তি বুকে গেঁথে নিয়ে পরিমল রাত্রে নারকেলডাঙ্গা ফিরে গেছে। সরযূধামের কোথাও তখন আলোর ছিঁটে-ফোঁটা ছিল না। খুব একটা রাত হয়েছিল কি। তা হলেও সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল, বা দোরে খিল এঁটে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিল। হতে পারে ঘুমের ভান, পরিমল চিন্তা করছিল, তাই সর্বত্র এত অন্ধকার এত নীরবতা। অবাঞ্ছিত মানুষের জন্য কে আর রাত জেগে বসে থাকে। অবশ্য দুদিন আগে থাকতেই পরিমল দেখছিল, রাত্রে সে বাড়ি ফেরার আগেই জগমোহন শুয়ে পড়েছেন। বাবার শরীরটা ভালো নয়, কর্তার শরীর খারাপ করেছে, বাড়ির কারো কারো মুখে সে শুনত। কিন্তু জগমোহন ছাড়া আর সবাই তার জন্য অপেক্ষা করেছে। ঠাকুর চাকর পরিতোষ রমলা। কিন্তু সেই রাত্রে পরিতোষ বা রমলাও আর বসে থাকেনি। তারাও তাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। পরিমল মনে মনে হেসেছিল। জগমোহনের মতন তাদেরও শরীর খারাপ করেছে। এখন থেকে রোজ রাত্রে ফিরে এসে সে সরযূধামের সর্বত্র এমন স্তব্ধ শীতল অন্ধকার দেখতে পাবে। প্রত্যেকটা ঘরের বন্ধ দরজার গায়ে নীরব ঔদাসীন্য নিঃশব্দ উপেক্ষা—হয়তো ঘৃণাও লেখা থাকবে। তা হলেও একটি সহৃদয় মানুষ ওবাড়িতে আছে। দীনদয়াল। দীনদয়াল সিঁড়ির আলো জ্বেলে দিয়েছিল, পরিমলের ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিল। জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুম থেকে ফিরে এসে সে দেখেছিল সেই বুড়োই তার ভাতের থালা নিয়ে এসেছে। ঘুমন্ত নিঃসাড় বাড়িতে নিজের ঘরে বসে পরিমল নিঃশব্দে খেয়ে উঠেছিল। রাগ করেনি সে একটু দুঃখ পায়নি। আশ্চর্য সুখ, অনির্বচনীয় আনন্দে তার মন পূর্ণ ছিল। সুন্দরের দেখা পেয়েছে সে। দেবদূত তার কাছে এসেছে। আর কোনো ক্ষত থাকল না ক্ষোভ রইল না। এখন সে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে উঠবে। অপূর্ণতার অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। এটা এতদিনের তপস্যার ফল। ঈশ্বর তার ডাক শুনেছে। কৃষ্ণচূড়ার মতন রক্তিম হয়ে উঠতে চেয়েছিল সে, সূর্যমুখীর স্বর্ণোজ্জ্বল ছটা নিয়ে জ্বলে উঠতে চেয়েছিল। কিন্তু বাধা ছিল। তারা সরব নয় সচল নয়—গাছের ফুল। সঙ্গ দিতে পারে না। কাজেই আকাঙ্ক্ষা নিয়েও পরিমল এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—অনুপ্রেরণার অভাবে এগোতে পারছিল না। 'আমি এসেছি, আর তোমার ভয় নেই—' কানের কাছে এ কথা বলবার কেউ ছিল না। এখন পরিমল সেই ভাষা শুনছে, আশ্চর্য সুন্দর কণ্ঠস্বর। এখন সে চলতে পারবে।

আলো নিভিয়ে দিয়ে একলা ঘরে পায়চারি করছিল সে।

ততক্ষণে সরযূধামের মানুষগুলি যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুমের ভান করেও আর তাদের জেগে থাকা সম্ভব হয়নি—পরিমল নিঃসন্দিগ্ধ হতে পেরেছিল। সাপের ফোঁসানির মতন লম্বা লম্বা নিশ্বাস অন্ধকারে পাক খেয়ে খেয়ে উঠছিল। যেন সেদিনই সকালে পরিতোষের কাছে আর কিছু টাকা চেয়েছিল পরিমল। হাতখরচের টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল। বালিগঞ্জ যাওয়া-আসার খরচ আছে, বুলার ক'খানা বই কিনে দিতে হবে। কিন্তু টাকা চাইতে পরিতোষ এমন চেহারা করেছিল—এক সঙ্গে কয়েকটা খরচের ফিরিস্তি সে দিয়েছিল, লাইফ ইনসিওরেন্সের দু দুটো প্রিমিয়াম দেওয়া বাকি আছে, ঠাকুর চাকর দারোয়ান—কারোরই

মাইনে দেওয়া হয়নি, ইলেকট্রিক বিলের টাকা দিতে হবে, এদিকে পরিমলের জিনিসপত্র কিনতে বেশ কিছু টাকা বেরিয়ে গেল। বস্তুত মুখটা এমন শুকিয়ে ফেলেছিল মেজোভাই যে, পরিমলের তখন ভীষণ লজ্জা হচ্ছিল, অনুতাপ হচ্ছিল তার কাছে টাকা চেয়ে। অস্বাভাবিক নয়। পরিমল চিন্তা করেছিল। দুদিন আগে রমলার কাছ থেকে একশ' টাকা চেয়ে নিয়ে গেছে সে। তার পর থেকেই তো জগমোহন ছেলের মুখ দেখাই একরকম বন্ধ করে দিয়েছেন—ছেলের মুখ দেখব না, এমন কথা কি আর মুখে প্রকাশ করেছেন তিনি, হাবেভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন পরিমল অন্যায় কিছু করছে, অসঙ্গত তার ব্যবহার, অক্ষয় উকিলকে টাকা দেওয়া—তাঁর বাড়ি যাওয়া-আসা, এদিকে বলে-কয়ে তাকে ব্রজদুর্লভপুর আশ্রমে যেতে রাজি করানো যাচ্ছে না—মনস্তাপের একাধিক কারণ ঘটেছে জগমোহনের, যে জন্য পরিমলকে দেখলেই তিনি সরে সরে থাকছেন। পরিমল বারান্দায় থাকলে তিনি দেরি করে ঘর থেকে বেরোন, সিঁড়িতে আছে টের পেলে তখনি ওপরে না উঠে নীচে বসবার ঘরে অপেক্ষা করেন অথবা বাগানে ঢুকে পায়চারি করতে আরম্ভ করেন। পরিমল বাথরুম থেকে বেরোল কিনা তিনবার খোঁজ নিয়ে তবে তিনি সেদিকে পা বাড়ান—পাছে ছেলের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যায়। আর রাত্রে তো কথাই নেই—পরিমল বাড়ি ফিরল কী ফিরল না, খেল কী খেল না জেগে থেকে খোঁজ নেবার মতন তাঁর স্বাস্থ্য নেই শক্তিও নেই। প্রেসারের রুগী। সকাল সকাল ঘরের আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েন। রাত্রে বড়ো ছেলেকে এড়িয়ে চলার সুবিধা আছে তাঁর। কিন্তু সেদিন সকালে টাকা চাওয়ার পর থেকে পরিতোষও যে দাদাকে এড়িয়ে চলছে পরিমলের বুঝতে কষ্ট হয় না। যেন অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে, বাড়ি থেকে বেরোবার সময়—তাও নিজে না এসে দীনদয়ালকে দিয়ে মাত্র দশটা টাকা পরিমলের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। অপমানবোধ করেছিল কি পরিমল? অপমানবোধ করেনি। তার দুঃখ হয়েছিল। নিজের জন্য সে টাকা চায়নি। চেয়েছিল একটা গরিব পরিবারকে সাহায্য করতে। মেয়েটির পড়া হচ্ছে না। দুটি ভাইবোনকে পড়াবার জন্য তার সেখানে যাওয়া। না হলে রোজ যেতে হত কি? পরিতোষ গম্ভীর হয়ে গেছে—পরিমল কথা না বললে নিজে থেকে সে কিছুই বলছে না। কিন্তু তার পর থেকে সে লক্ষ্য করেছে, দীপুও আর ছুটে ছুটে জেঠুর ঘরে আসছে না। দীপুকে পৌঁছে দিতে রমলা ভাশুরের ঘরের কাছে এসে দাঁড়াত। বাগানে দীপুর সঙ্গে পরিমল খেলা করলে রমলা ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুজনকে দেখত। দীপুকে খুশি করতে পরিমল যদি একটা কিছু অতিরিক্ত ছেলেমানুষি করেছে তো তা দেখে ওপর থেকে রমলা যে হাসত, হাসি লুকোতে কখনও মুখে আঁচল চাপা দিয়েছে পরিমল লক্ষ্য করত। সেদিন একবারও দীপুকে দেখা যায়নি। রমলাকেও না। তারপর রাত্রে বালিগঞ্জ থেকে ফিরে গিয়ে দীনদয়াল ছাড়া সরযূধামের আর একটি প্রাণীকেও জেগে থাকতে দেখল না সে। তাই খেয়ে উঠে নিজের ঘরে পায়চারি করতে করতে পরিমল চিন্তা করেছিল, পরিতোষের কাছে তার স্ত্রীর কাছে আর কোনোদিন সে টাকা চাইবে না। টাকা চাইলে তারা অসন্তুষ্ট হয় এবং এটা বুঝিয়ে দেবার জন্যই পরিতোষ তখন চাকরকে দিয়ে সামান্য দশটা টাকা তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই টাকা বুলার ক'খানা বই খাতা পেন্সিল কিনতেই প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। সামান্য কয়েক আনা পয়সা হাতে ছিল। তাই দিয়ে সে নারকেলডাঙ্গা ফিরছিল। বাসে বসে সে চিন্তা করছিল,

কাল আবার বুলাকে নিলয়কে পড়াতে যেতে হবে, অক্ষয়বাবুকে যখন সে কথা দিয়েছে, অন্তত কটা দিন তো তাকে সেখানে যেতেই হবে—না হলে অত্যন্ত খারাপ দেখাবে। কিন্তু কাল যে ট্রাম বাস-এর ভাড়া দেবার মতন পয়সাও তার হাতে রইল না। হঠাৎ তখন কথাটা তার মনে পড়েছে। তার একটা আংটি ও রিস্টওয়াচ আছে। কলেজে পড়ার সময় জিনিস দুটো সে ব্যবহার করত। যে বছর ম্যাট্রিক পাশ করে সে বছর মা তাকে ঘড়িটা কিনে দেয়, সেই ঘড়ি পরে সে প্রথমদিন কলেজে গেছে। আংটিটাও যেন তার এক জন্মদিনে বাবার কাছে উপহার পেয়েছিল। পরিমল বাড়ি আসার পর পরিতোষ তার বাক্স হাঁটকে দাদার ব্যবহৃত পুরোনো আরো দু একটা জিনিসের সঙ্গে আংটি রিস্টওয়াচও বার করে দেয়। দম দেওয়া হচ্ছিল না, ব্যবহার করা হচ্ছিল না, বাক্সে থেকে থেকে ঘড়িটা অকেজো হয়ে পড়েছিল, ডায়ালের ধারগুলি বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তা হলেও তো মার দেওয়া উপহার—তাঁর স্মৃতি এই ঘড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। পরিমল তার টেবিলের দেরাজে আংটির সঙ্গে যত্ন করে ঘড়িটাও রেখে দিয়েছিল। হ্যাঁ, জেল থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ি ফেরার প্রথম দিনের ঘটনা, সেদিন জগমোহন পরিমলের ঘরে উপস্থিত ছিলেন। জিনিসপত্র গুছানো দেখছিলেন। 'ওল্ড মডেলের জিনিস, আজকাল এসব রিস্টওয়াচ অচল হয়ে গেছে। তা হলেও তোমার মায়ের স্মৃতি। ওটা তোলা থাক। একটা নতুন রিস্টওয়াচ তুমি কিনে নেবে। পরিতোষের সঙ্গে একদিন দোকানে গিয়ে নিজে দেখেশুনে—' বাসে বসে জগমোহনের সেদিনের কথাটা মনে হতে পরিমল গাঢ় নিশ্বাস ফেলেছিল। কদিন আগেও জগমোহনের যে মন ছিল চোখ ছিল, আজ তা একেবারে বদলে গেছে। যাই হোক, পরিতোষকে নিয়ে দোকানে গিয়ে নূতন রিস্টওয়াচ কিনে পরিমলের আবার কোনোদিন তা হাতে পরা হবে কিনা, তা নিয়ে সে মাথা ঘামাচ্ছিল না। অন্য কথা ভাবছিল সে। আপাতত কিছু টাকার জোগাড় হয়ে গেল। না, রিস্টওয়াচ বিক্রি করা হবে না। গাড়িতে বসেই মনে মনে সে ঠিক করে ফেলেছিল, আংটিটা বেচে দেবে। যদি কেউ তাকে তখন প্রশ্ন করত, ঘড়ির ওপর তার মায়া কেন, অচল অকেজো একটা ঘড়ি রেখে সোনার আংটি বিক্রি করবে কেন, তো পরিমল সরাসরি জবাব দিত, যেহেতু বড়ো ছেলের প্রতি জগমোহনের মায়া আকর্ষণ বলতে কিছুই আর নেই তো তাঁর দেওয়া উপহারের ওপর পরিমলের মমতা থাকবে এমন আশা করা অন্যায়। ভালোবাসাই ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখে—স্নেহ স্নেহকে লালন করে। একটা চাপা আক্রোশও যে তার মনের মধ্যে কাজ করছিল পরিমল বেশ বুঝতে পারছিল। খাওয়ার পর একটু সময় পায়চারি করার পর আস্তে আস্তে সে আলো জ্বেলে টেবিলের কাছে সরে গেল। দেরাজ খুলে ওপরের কাগজপত্র সরিয়ে ঘড়ি ও আংটিটা খুঁজল। পাওয়া গেল না। সম্ভবত নীচের দিকের দেরাজে রাখা হয়েছিল। সেটাও সে টেনে খুলল। কিন্তু সেখানেও পাওয়া গেল না। হয়তো কোনো সময় দেরাজ থেকে তুলে নিয়ে জিনিস দুটো পরিমল আলমারির মধ্যে রেখেছিল—তার মনে নেই, তাই আলমারির সব ক'টা তাক সে ভালো করে খুঁজল, বইয়ের র‍্যাক, টেবিলের ওপরটা—ফুলদানিটা এখানে থেকে সরিয়ে ওখানে রাখল, টুকিটাকি জিনিসগুলি নেড়েচেড়ে দেখল, তারপর বালিশের তলা—তোশকের নীচে, এমন কি খাটের নীচটাও সে নুয়ে উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখল। আসলে জিনিস দুটো যে টেবিলের টানা থেকেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে

পরিমল বুঝতে পারছিল। তবু কী জানি, যদি অন্য কোথাও রেখে পরিমল এখন সঠিক জায়গাটা ভুলে গিয়ে থাকে—মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সে এত জায়গা খোঁজাখুঁজি করল। পরিতোষ সরিয়েছে, জগমোহনের নির্দেশ মতন সরাতে পারে অথবা বুদ্ধি করে নিজেও সরিয়ে রাখতে পারে। দাদার আজ টাকার দরকার হচ্ছে কাল টাকার দরকার হচ্ছে। কিন্তু মানুষের কাছে টাকা চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না। এখন জিনিসপত্র বেচে টাকা জোগাড় করা ছাড়া পরিমলের গত্যন্তর থাকবে না। জিনিস দুটো মোটামুটি মূল্যবান, আবার ব্যবহার করা হচ্ছে না, সুতরাং—

হতে পারে এটা জগমোহনের দূরদৃষ্টি বা পরিতোষ নিজের বুদ্ধিবিবেচনা প্রয়োগ করে আপাতত দাদার ঘর থেকে সরিয়ে রেখেছিল। নিজের বাক্সে জিনিস দুটো তুলে রাখতে পারে। যেমন দশ বছর যত্ন করে নিজের কাছে রেখেছিল।

একবার, মাত্র একটু সময়ের জন্য পরিমল ভুরু কুঁচকে কথাটা চিন্তা করেছিল। দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছিল। তারপর শান্ত হয়ে গিয়েছিল। কেননা নিজেকে শান্ত সংযত করার মতন একটা আশ্চর্য সম্পদ বুকে নিয়ে সে বালিগঞ্জ থেকে ফিরে এসেছিল।

তৎক্ষণাৎ আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিল সে। দেখা গেল অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেমন্তের নীলাভ স্বচ্ছ চাঁদের আলোয় জানালা ভেসে যাচ্ছে, যুঁইফুলের মতন মুঠো মুঠো আলো তার বিছানায়ও এসে পড়েছে, কিছু টেবিলে।

সরযূধামের বিষণ্ণ রুগ্ন পরিবেশ সে ভুলে গেল। চাঁদের আলোয় ভরা এই ঘরের মতন নিজের উপলব্ধির জ্যোৎস্নায় আবার সে স্নান করে উঠল। সত্যি, এক এক সময় যেন কী হয়, নিজেকে ভুলে যায়, হারিয়ে ফেলে পরিমল।

কিন্তু আর যেন সে হারাবে না। দৃঢ় অবিচল পায়ে এগিয়ে যাবে। তাকে চালিয়ে নেবার মানুষ এসেছে।

আস্তে আস্তে টেবিলের টানা খুলল। যেখানে ঘড়ি ও আংটি ছিল। কিন্তু আর ঘড়ি-আংটি খুঁজল না সে। প্যাড ও কলমটা বার করল। ইচ্ছাটা এতদিন বুকের ভিতর থেকে ছটফট করছিল, যন্ত্রণা দিচ্ছিল। এবার সেটা মুক্তি পেল। হলদে পাখা নেড়ে আকাশে উড়তে পারল। তার হাত দিয়ে কবিতা বেরোল। আলো জ্বালবার দরকার হল না। যুঁইফুলের মত ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় চমৎকার লিখে যেতে পারল ঃ

অবশেষে মোহানায় এলাম—
অনেক মুখের ভিড় পার হয়ে
তোমাকে পেলাম,
আমার রক্তের গোলাপ সৌরভ ছড়ায়
অশ্রুসিক্ত রাত্রি শেষ—হে আমার প্রেম
সূর্য সমান্তরাল,
প্রীতির উজ্জ্বল তীরে শুভ্র ফেনা রেখে
সমুদ্রে এলাম
তোমাকে পেলাম।

হ্যাঁ, এতটা তদ্‌গতচিত্ত হতে পেরেছিল সে সেদিন রাত্রে, এই মুখ এই ছবি কত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তার মনে। কিন্তু আজ, এখন, ধর্মতলার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল দুস্তর ব্যবধান রয়ে গেছে—হয়তো এই ব্যবধান কোনোদিন ঘুচবে না। হয়তো এই জন্য সে নিজে দায়ি, না কি বুলার দোষে। পরিমল যেমন আশা করছিল, ঠিক ততটা ছোটো হতে পারছে না মেয়েটি, না কি পরিমলই চিরকালের মতন ছোটো রয়ে গেল। দীপু—বড়োজোর নিলয়ের অন্তরঙ্গ হতে পারে সে, তারপর তার কাছে সব দুর্বোধ, সবই অস্পষ্ট?

ফুটপাথের একটা খেলনার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

'আবার কী কিনবেন?' বুলা প্রশ্ন করল।

'নিলয়ের জন্য একটা মাউথ-অর্গান।' বুলার চোখের দিকে না তাকিয়ে ঝকঝকে খেলনাগুলির ওপর ঝুঁকে পড়ল পরিমল।

॥ ৩৪ ॥

এখন দোকানে বেচাকেনা নেই। দুপুর। মাছি ভনভন করছে জলধরের পায়ের কাছে। জলধরের নাক ডাকছে। দুটো বেওয়ারিশ কুকুর দোকানের সামনে ঘুরঘুর করছে। রাস্তার শালপাতাটা শুকছে, ভাঙা ভাঁড়টা জিভ দিয়ে চাটছে। যখন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না তখন তারা উনুনটার সামনে জিভ বার করে দাঁড়িয়ে কেমন যেন ধুক ধুক করে কাঁপছে। লাল জিভ বেয়ে টসটস করে লালা ঝরছে। কাতর লোলুপ চোখে আলমারীর খাবারগুলি দেখছে।

তেমনি আর একটি মানুষ দোকানের সামনে বটগাছের ছায়ায় লম্বা বেঞ্চিটার ওপর এতক্ষণ চুপ করে বসে থেকে কাতর চোখে জলধরের দোকানের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং থেকে থেকে হাই তুলছিল। আলমারির খাবারের দিকে কিন্তু তার মোটেই নজর ছিল না। সে দেখছিল অন্য জিনিস। আলমারির মাথার ওপর দেওয়ালে ঝুলানো প্রকাণ্ড ঘড়িটা। অনেক দিনের ঘড়ি। ওয়ালক্লক্‌। জলধরের বাবা বিপ্রদাস হালুইর জিনিস এটা। আজ অবশ্য ওপরের রং চটে গেছে। কালি-ঝুল মাকড়সার জাল জমে জমে সুন্দর নকশা করা কাঠের ফ্রেমটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। নীচের খোপ অর্থাৎ যেখানে পেণ্ডুলাম ঝুলছে সেই খোপের ওপরের কাচটা কালি-ঝুল ও ধোঁয়ায় এমন হয়েছে যে পেণ্ডুলামটাই আর এখন বাইরে থেকে চোখে পড়ে না। পেণ্ডুলাম দুলছে কী থেমে আছে বোঝা যায় না। অথচ এই জিনিসটা কিন্তু দেওয়াল-ঘড়ির একটা বড়ো আকর্ষণ। হৃৎপিণ্ড বলা যায়। মানুষ চোখ তুলেই যখন দেখতে পায় হৃৎপিণ্ড নড়ছে, পেণ্ডুলাম দোল খেয়ে খেয়ে এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে, ওদিকে থেকে এদিকে আসছে তখন আর তাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে এ-ঘড়ি সজীব সচল। বারোটা দাগের যেখানেই কাঁটা দুটো অবস্থান করুক, সময়টা যে নির্ভুল অকাট্য এ সম্পর্কে তারা নিশ্চিন্ত হতে পারে। তাই জলধরের ঘড়ির পেণ্ডুলাম আছে কী নেই, দুলছে কী থেমে আছে চোখে পড়ে না বলে অনেকের মনেই সংশয় জাগতে পারে, এ-ঘড়ি বন্ধ হয়ে আছে অনেকদিন, তায় আবার ওপরের ও লক্ষ্মীছাড়া চেহারা।

কিন্তু আসলে তো তা নয়। এমন জায়গায় জলধরের দোকান যেখান থেকে ট্রাম ধরতে হয় বাস-এ চাপতে হয়। কাজেই যারা জানে জলধর তার পৈতৃক মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সঙ্গে

আরও একটা কি অমূল্য সম্পদ উপহার পেয়েছে, তারা ট্রাম-বাস ধরবার আগে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার ওয়াল-ক্লক্‌টা দেখে নেবেই—অফিস-মুখো মানুষ, তাদের সর্বদা লেট্‌ হবার ভয় অথবা বাস দেরি করে আসছে, কী সময় মতো ট্রামটা এল না সেই দুশ্চিন্তা। এমন কী কেউ কেউ চট্‌ করে মিষ্টির দোকানের ঘড়ির সঙ্গে নিজের হাতঘড়িটার সময় মিলিয়ে নেয়। উল্টোটাও আছে। আফিস কাছারি সেরে বাড়ি ফেরার পথে এই মোড়েই ট্রাম-বাস থেকে নেমে আবার তারা দুরন্ত কৌতূহল নিয়ে 'অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের' বিখ্যাত ঘড়িটার দিকে তাকায়। এক নজর দেখেই তারা বুঝে ফেলে, আজ একটু সকালে বাড়ি ফিরছে কী দেরি করে ফিরছে—অথবা সকাল সকাল অফিস থেকে বেরিয়েও রাস্তায় কী অসম্ভব দেরি করে ফেলল হতভাগা গাড়িটা।

মিষ্টির দোকানের ঝুলকালি ও মাকড়সার জালে সমাচ্ছন্ন এই ঘড়ির ওপর মানুষের যে কী প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা একথা জলধরের চেয়ে আর কে বেশি জানে। দোকানে বসে থেকে সারাদিন সে এই জিনিস লক্ষ্য করে।

কিন্তু মজা এই যে, আজ জলধরকেও কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়ে দুবার তিনবার ঘড়িটার দিকে তাকাতে হয়েছে।

একবার বেলা দশটার সময়, তারপর বেলা বারোটায়। বারোটা বাজলে দোকানের সামনের দিকের দরজার তিনটা পাট বন্ধ করে দিয়ে একটা-পাট খোলা রাখা হয়। এ সময়টায় খদ্দেরের সংখ্যা কমতে কমতে একটি দুটিতে এসে ঠেকে। কিন্তু তা হলেও আর একটু সময় জলধর দোকানে বসে থাকে—তারপর যখন ঘাড়ির বড়ো কাঁটাটা সাড়ে বারোটার ঘরে এসে লম্বা হয়ে ঝুলতে থাকে তখন সেই একটি পাটও বন্ধ করে দিয়ে জলধর পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পিছনে একটা খোলার চালার নীচে দোকানের কর্মচারীরা নিজেদের ভাত তরকারি রাঁধতে তখন ব্যস্ত। স্নানাহার সারতে জলধরও বাসার দিকে পা বাড়ায়। বউ ভাত নিয়ে বসে থাকবে। যতীন দাস রোডের এই মোড়ের কাছাকাছি একটা গলিতে তার বাসা।

আজ সাড়ে বারোটায়ও জলধরের কেন জানি দোকানের গদি ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছিল না। রাস্তার দিকে চোখ রেখে বাসগুলি আসছে যাচ্ছে মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। এত মনোযোগ দিয়ে বাসের চলাফেরা কোনোদিনই সে লক্ষ্য করে না।

পৌনে একটা বাজতে মুখে একটা বাঁকা হাসি নিয়ে সে উঠে পড়ল। সামনের দরজার খোলা পাটটা বন্ধ করতে যাবে এমন সময় হুড়মুড় করে এসে ভিতরে ঢুকল হাতকাটা প্রলয়। জলধর খুশি হল। যেন এতক্ষণ মনে মনে সে প্রলয়কে খুঁজছিল। প্রলয় এ সময় একবার দোকানে ঢুঁ মেরে যায়। কাগজ ফেরি শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে জলধরের দোকানে ঢুকে সিঙ্গাড়া জিলিপি যাহোক একটা কিছু মুখে গুঁজে এক গ্লাস জল খেয়ে শরীরটা ঠাণ্ডা করে নেয়। তারপর হয়তো বিড়ি ধরিয়ে জলধরের সঙ্গে দুটো একটা সুখদুঃখের কথা বলে।

'আজ দেখছি ভাত খেতে যেতে দেরি করে ফেললে জলধরদা?'

'হুঁ, তোরও তো আজ দেরি হল দেখছি।' জলধর গাল ছড়িয়ে হাসল।

'তা একটু বেলাই হয়েছে।' প্রলয় গম্ভীর হয়ে বলল, 'মাসকাবার পড়ে গেছে, আদায়টাদায় করতে একটু বেশি ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে।'

'তাই তো, আমার খেয়াল ছিল না। আমিও এইবেলা উঠেছি হিসাবপত্রগুলো একটু দেখছিলাম—বেলা হয়ে গেল।' দুবার মাথা নেড়ে জলধর চুপ করল। প্রলয় জিলিপি খেয়ে জল খেল। বিড়ি ধরাল।

'তা ওরা কোথায় গেল বোন?' কথাটা হঠাৎ এখন জলধরের মনে পড়েছে, প্রলয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। 'দেখলাম দশটার সময় দুজন বাসে উঠে গেল।'

'কার কথা বলছ জলধরদা?' প্রলয় ভুরু কুঁচকাল।

'তুই দেখছি কিছুই খবর রাখিস না।' আক্ষেপের সুর কথাগুলো জলধরের গলায়। 'তা তোরই বা দোষ কী—কাকভোরে তো কাগজ ফেরি করতে বেরিয়ে পড়িস তুই আমিই দেখি। বাড়িতে কী ঘটনা ঘটল, কে এখন এল, কে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল তুই অত সব খবর জানবি কেমন করে। সম্ভবও না—'

'না, তা হলেও—' একটা ঢোক গিলে প্রলয় বলল, 'কাকে দেখে উঠলে—আমাদের বাড়ির কাউকে দেখলে?'

'হুঁ, তোর বোন—তোর বোনকে নিয়ে ওই ডাক্তারের ছেলে যেন কোথায় গেল।'

'ঐ তো!' এবার প্রলয়ের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। 'ঠিকই দেখেছ, পরিমলদার সঙ্গে বুলা চোখ দেখাতে গেছে। ধর্মতলার কোনো চোখের ডাক্তারের কাছে চোখ দেখাবে বোন। আমি কাল রাত্রেই কথাটা শুনেছিলাম। বুলার যে চোখ খারাপ আমরা এতদিন ধরতেই পারিনি কেউ—পরিমলদা ঠিক ধরে ফেলল। শত হোক ডাক্তারের ছেলে তো—' প্রলয় দাঁত বার করে হাসল। 'দশটার সময় গেছে—তাই না?'

জলধর ঘাড় নাড়ল।

'ঠিকই দেখেছ তুমি—তোমার এখান থেকে তো রাস্তার সবই দেখা যায়। এই একটা মানুষ দেখলাম, জলধরদা। একবার কথা দিয়ে গেলে কথা রাখবেই, একটু নড়চড় হবার জো নেই। কাল রাতে মুখে শুনলাম, আজ পরিমলদা দশটার সময় এসে বুলাকে চোখ দেখাতে নিয়ে যাবে—ঠিক এল—'

'কিন্তু এখনো বোন ফেরেনি। এই একটু আগেও তো পর পর দুটো বাস ওদিক থেকে এল দেখলাম।'

'তা দেরি হবে বোঝা যাচ্ছে। চোখে ওষুধের ফোঁটা দিয়ে কতক্ষণ বসতে হবে—তারপর তো ডাক্তার চোখ পরীক্ষা করবে—মা বলছিল কাল, একেবারে চশমা নিয়েই আসবে—কাজেই আবার যাবে চশমার দোকানে—হুঁ, দেরি হবারই কথা।'

জলধর সামনের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল। 'দাঁড়া, আমিও বেরোচ্ছি, একসঙ্গে বেরোব।'

প্রলয় দাঁড়িয়ে থেকে আর একটা বিড়ি ধরাল। দরজা বন্ধ করে জলধর ক্যাশবাক্সের চাবিটা পকেটে পুরল ছাতাটা বগলে নিল। তারপর আর একবার ঘড়িটা দেখল। দোকান থেকে বেরোবার সময় কর্মচারীদের দু একটা কাজের কথা বলে পরে প্রলয়ের দিকে ঘাড় ফেরাল। 'আয় প্রলয়।'

দুজন রাস্তায় নামতেই দেখা গেল আর একটা বাস আসছে। ধর্মতলা হয়ে আসা বাস।

কাছেই দুজন বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়িটা দাঁড়াল। দুচারজন নামল উঠল, দুপুরের বাসে ভিড় কম, সঙ্গে সঙ্গে আবার ছেড়ে দিল।

চোখে একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে জলধর প্রলয়ের দিকে তাকাতে প্রলয় হাসল। 'আমি জানি এ-বাসেও আসা হবে না। তোমায় বললাম, অত চট্ করে কি আর এসব কাজ সারা যায়। ডাক্তার কোবরেজের ব্যাপার। দেখি দেখছি করেও রুগীকে দুঘণ্টা ঠিক বসিয়ে রাখবে।'

'তা রাখে।' জলধর ঢোক গিলল, একটু ইতস্তত করল, তারপর বলল, 'আমি ভাবছি অন্য কথা—চোখ দেখানোর খরচ, চশমার দাম—দুটো মানুষের এতটা রাস্তা যাওয়া আসা—তোদের বেশ কিছু পয়সা খরচ করিয়ে দিলে জগু ডাক্তারের ছেলে।'

প্রলয় ব্যস্ত হয়ে মাথা নাড়ল।

'না হে জলধরদা।, বরং উল্টোটাই বল, সব খরচ্ পরিমলদা দিচ্ছে।'

'তাই নাকি, তবে তো ভালোই—ভালো, খুব ভালো কথা।' জলধর মাথা নাড়ল। 'এদিনে কে কার উপকার করে—অথচ দ্যাখ্, মানুষের মতন ইতর বদ জঘন্য প্রাণী ঈশ্বরের পৃথিবীতে দুটো নেই—জগু ডাক্তারের ছেলেকে নিয়ে তোদের নিয়ে কত কী কেচ্ছা গেয়ে বেড়াচ্ছে সব—আমার কানেও দুটো একটা কথা এসেছে—'

'কী রকম?' প্রলয়ের চোখ দুটো হঠাৎ ছোটো হয়ে গেল। 'আমাদের নিয়ে পরিমলদাকে নিয়ে কে তোমাকে কী বলেছে একবার তুমি আমায় বলো তো জলধরদা, নামটা বলো, আগে তো মানুষটাকে চিনে রাখি—'

'আহা, তুই এত উত্তেজিত হলি কেন—' প্রলয়ের কাঁধে হাত রেখে জলধর মোলায়েম গলায় হাসল। 'আমি কি ছাইভস্ম সব কথা বিশ্বাস করি তুই মনে করিস—ঐ তো খাবার খেতে দোকানে আসে, নিজেরাই সব বলাবলি করে—হুঁ, কী, না জগু ডাক্তারের খুনে ছেলেটা এখন সারাদিনই অক্ষয় উকিলের ঝড়ি পড়ে থাকে, ওখানে টাকাকড়ি দেয়—কাল শুনছিলাম একজন বলছিল, খুনেটা ও বাড়িতে রাত্রিবাস পর্যন্ত করতে শুরু করেছে—'

'কী বললে?' জলধর চাপা গলায় কথা বলছিল, কিন্তু প্রলয় রীতিমতো চিৎকার করে উঠল। ফাঁকা রাস্তা, দুপুর, তাই রক্ষা, না হলে তার চিৎকার শুনে সেখানে লোক জড়ো হত। 'আমায় শুধু নামটা বল আমি শালার মাথাটা না নিয়ে ঘরে ফিরছি না, অ্যাঁ, শেষটায় আমাদের ফ্যামিলি নিয়ে এসব যাচ্ছেতাই কেচ্ছা রটিয়ে বেড়াচ্ছে কুত্তার বাচ্চারা—কে কে তোমার দোকানে বসে এসব বলছিল আমায় বলো, এখনি বল, এ পাড়ার মানুষ? আমাদের বস্তির কেউ?'

'আহা, এত উত্তেজিত হলে চলবে না তো প্রলয়। শোন্ শোন্—' জলধর তার কাঁধ ছেড়ে দিয়ে হাত ধরল। 'এসব কথার শেকড় মাথা কিছু আছে নাকি যে, বললাম আর তুই ক্ষেপে গেলি, আর আমায় নাম জিজ্ঞেস করছিস—আমি কি খদ্দেরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি—আমাকে ক্যাশ আগলাতে হয়। কত গণ্ডা আসে বসে খায় গল্পগুজব করে—ওদের গল্পগুজব আমার এক কান দিয়ে ঢোকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়—হুঁ, খদ্দেরের গল্পগুজব আর মাছির ভনভন আমার কাছে সমান—যখন দোকানে খদ্দের থাকে না তখন একা একা বসে থেকে মাছির ভনভন শুনি—এখন যদি বলিস কোন্ মাছিটা ভনভন করছে

তুমি চিনে রেখেছ কি, তো আমি তার কী উত্তর দি বল—' কথা শেষ করে জলধর মিষ্টি একটু হাসল। যেন এবার জলধরের অসুবিধাটা বুঝল প্রলয়, বুঝে মাথা হেঁট করল। কিন্তু তা হলেও ভিতরের উত্তেজনাটা থেকে গেল। যেন তখনো সে কাঁপছিল।

'যা বাড়ি যা—বাড়ি গিয়ে চান করে ভাত খা গে—বলেছি তো, আমি এসব ছাইভস্ম কথা কোনোদিন বিশ্বাস করিওনি—করবও না—আরে এটা তো মানুষের ধর্ম, অপরের ভালো দেখলে বেটাদের চোখ টাটায়—জগমোহন ডাক্তারের ছেলে এভাবে তোদের সাহায্য করছে, তাই এখানে ওখানে সব বসে গেল চুক্‌লি কাটতে, কেচ্ছা বানাতে, বুঝলি না?'

'যাক গে, তোমায় বলে রাখছি জলধরদা, যদি আর কোনোদিন কোনো শালা তোমার দোকানে বসে এসব কথা বলে, তুমি তার মুখটা চিনে রাখবে, নামটা জেনে রাখবে, আমায় বলবে, হুঁ, পাড়ার মানুষ বেপাড়ার মানুষ যে-ই হোক, দেখবে আমি শালাকে জ্যান্ত রাখি কি না—ফ্যামিলির বদনাম অক্ষয় বোসের ছেলে সহ্য করবে না, এ তুমি জেনে রেখো।'

'আচ্ছা, তুই যা, এখন ঘরে যা—আমিও চলি, খিদে পেয়েছে।' জলধর আর দাঁড়াল না। মোটা শরীর নিয়ে থপথপ পা ফেলে বাসার দিকে চলল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল না হাত-কাটা প্রলয় তখনও বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে কী ঘরে ফিরে যাচ্ছে। পুরু ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে সে তার গলিতে ঢুকে পড়ল। ভাত খেয়ে দোকানে ফিরে এসে আবার যখন ঘড়ির দিকে তার চোখ পড়ল তখনও জলধর মনে মনে না হেসে পারল না। আড়াইটা বাজে। দরজার একটা পাট খুলে দিয়ে বটতলাটা দেখল সে, রাস্তাটা দেখল। প্রলয় অনেকক্ষণ চলে গেছে। রাস্তা তেমনি জনমানবশূন্য। ইতিমধ্যে যে দুদিক থেকে দুচারখানা বাস আসা-যাওয়া না করেছে এমন একটা কথাই হতে পারে না। কিন্তু তথাপি, যেন রৌদ্রের রং দেখে, রাস্তার চেহারা দেখে, বটপাতার ঝুরঝুর শব্দ শুনে হাওয়ার গতি লক্ষ্য করে জলধরের মন বলল, ধর্মতলা থেকে মানুষ দুটি ফেরেনি। ফিরতে পারে না, ফেরা উচিতও না। কার্তিকের এমন মাজাঘষা দুপুর, এমন চকচকে নীল আকাশ মাথার ওপর। চৌরঙ্গী ধর্মতলার মতন জায়গায় এদিনে বেড়াতে গেলে সহজে ফিরে আসতে কারই বা ইচ্ছা করে, তা-ও যদি মনের মতন মানুষ সঙ্গে থাকে।

চিন্তা করে জলধর ক্যাশবাক্সটার ওপর মাথা রেখে কাত হল। এবং দু মিনিটের মধ্যে তার নাক ডাকতে শুরু করল, ঠিক সেই সময় রুক্ষ চুল শুকনো মুখ নিয়ে মানুষটি অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের বিখ্যাত প্রাচীন ঘড়িতে কটা বাজল দেখতে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। রৌদ্র সরে গিয়ে বটতলার বেঞ্চিটার ওপর মোটা ছায়া পড়েছে। তাই চুপ করে মানুষটি সেখানে বসে পড়েছে। তারপর একদৃষ্টে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বোঝা যায় সে ক্লান্ত। একটা বসবার জায়গা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েছে। এবং এ-ও সত্য, যদি ভাত খেয়ে এসে জলধর কাত না হত চোখ না বুজত তো এভাবে সে পা ঝুলিয়ে বেঞ্চিতে বসতে সাহস পেত না, দোকানের ঘড়ির দিকেও তাকাতে পারত না। কারণ, জলধর যে তাকে চেনে। জেগে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সে অটলবাবুর ছেলেকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলত ঃ কী হে বাবাজী, তুমি যে এখানে? লেখাপড়া ছেড়ে এমন অসময়ে রাস্তায় ঘুরঘুর করছ? এমন বিরহকাতর চেহারাই বা কেন তোমার? নাওয়া খাওয়া হয়নি? তৃষিত চাতকের মতন কার

জন্য অপেক্ষা করছ, ঘড়ি দেখছ, আর রাস্তায় ট্রাম-বাসের শব্দ হলেই চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাচ্ছ? ব্যাপার কী? ট্রামে চড়ে কে আসবে, বাসে চেপে কে আসবে? নিশ্চয়ই কেউ আসবে, আসতে দেরি হচ্ছে দেখে তুমি যে সাংঘাতিক ছটফট করছ তোমার চোখ দেখলেই বোঝা যায়।

কথাটা মিথ্যা কি, জলধরের কাছে ধরা পড়বার ভয়ে প্রদোষ এতক্ষণ অন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। সেই বেলা এগারোটা থেকে যতীন দাস রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। ওপাশে একটা নূতন ড্রাইং-ক্লিনিং হয়েছে। এতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়েছিল। তার আগে দাঁড়িয়েছিল মুদি দোকানটার সামনে। বেশিক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেননা এই অঞ্চলের প্রায় সবাই অটলবাবুকে, অটলবাবুর কলেজে পড়ুয়া ছেলেকে চেনে। অটলবাবু কিছু একটা বিখ্যাত লোক নন, খুবই সাধারণ মানুষ, সামান্য বেতনের একজন কেরানি। এই জন্যই তো তাঁকে মানুষ বেশি চেনে। দুবেলা ধস্তাধস্তি করে তিনি বাস ধরেন, বাস থেকে নামেন, সওদা নিতে ছুটে ছুটে মুদি দোকানে আসেন, ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি নিয়ে ড্রাইং-ক্লিনিং-এ আসেন, আটটার সময় নাকে মুখে গুঁজে অফিসে যাবেন বলে কাকভোরে থলে হাতে বাজার করতে বেরোন। বড়োলোক হলে তাঁকে মানুষ এত বেশি চিনত কি! বড়োলোকদের এমন কথায় কথায় রাস্তায় দোকানে ছুটোছুটি করতে দেখা যায় না। বাইরের কাজ করতে তাদের চাকর দারোয়ান আছে। দৈনিক খবরকাগজখানা পড়তেও অটলবাবুকে মোড়ের জলধরের দোকানে রোজ সন্ধ্যার পর এসে বসতে হয়। সেই অটলবাবুর ছেলে দু ঘণ্টা রৌদ্র মুখে নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে আর মোড়ে একটা বাস এসে দাঁড়ালেই উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখছে কারা উঠল কারা নামল, তাতে যে-কোনো মানুষের মনে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক, জলধরের মতন তারাও তাকে নানারকম প্রশ্ন করতে পারত। এই ভয়ে প্রদোষ জায়গা বদল করে করে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য জলধরকেই তার ভয় বেশি। জলধরের মতন চতুর মানুষ এই অঞ্চলে কম। সেদিন বুলাকে নিয়ে চা খেতে রেস্টুরেন্টে ঢুকবে বলে প্রদোষ এই রাস্তা দিয়ে না এসে জলধরের দোকানের পিছনের গলিটা দিয়ে এসেছিল, যাতে জলধর তাদের দেখতে না পায়, কেন না একবার দেখে ফেললেই সে টুক্ করে কথাটা সেদিনই সন্ধ্যাবেলা অটলবাবুর কানে তুলত। তা হলেও সেদিন প্রদোষের মনে যথেষ্ট সাহস ছিল, বেপরোয়া হতে পেরেছিল সে, বেপরোয়া হয়ে একটি মেয়েকে নিয়ে রাস্তায় চলবার মতন মনের জোর ছিল তার। আজ তার মনের জোর চলে গেছে, সাহস চলে গেছে। কুঁকড়ে গেছে সে, যেন পরাজিত, অপরাধী—চোরের মতন চুপ করে এখানে বসে ঘড়ি দেখছে, এবং ঘন ঘন রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে ধর্মতলার বাসটা এসে দাঁড়াল কি না। না, সে অপরাধ করেনি, অপরাধ করেছে আর একজন, অপরের অপরাধের কথা চিন্তা করে সে নিজে চোর হয়ে আছে। এমন ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা কে কবে শুনেছে! এত কষ্টের মধ্যেও প্রদোষের কেমন হাসি পেল।

জলধরের ঘড়িতে এখন আড়াইটে। তার অর্থ, সে হিসাব করে দেখল, সাড়ে চার ঘণ্টা। সাড়ে চার ঘণ্টারও বেশি একটি পুরুষের সঙ্গে মেয়েটি ক্রমাগত ঘুরছে। এতটা সময় ধরে একটা লেবুকে কচলালে সেই লেবুর স্বাদ শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায় এ কথা কাউকে বলে দিতে

হবে! কাজেই অক্ষয় উকিলের যুবতী মেয়ের মন আজ কোন্ স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে বুঝতে প্রদোষের কষ্ট হয় না। হয়তো অন্য মানুষ এত চট্ করে জিনিসটা বুঝতে পারবে না। কারণ সমস্ত জিনিসটার ওপর একটা চমৎকার চিনির প্রলেপ রয়েছে। লেখাপড়া শেখানো, জ্ঞানচর্চা, এই জন্য সঙ্গে নিয়ে বাইরে ঘুরে ফিরে এটা ওটা দেখানো। তারপর হঠাৎ চোখ খারাপ, ডাক্তার, চশমা—ওপরটা মিষ্টি, সুন্দর, পরোপকার সারল্য মহত্ত্ব—কিন্তু চিনির বেষ্টনীর নীচে? ভিতরটা? অক্ষয় উকিলের আধুনিক উপন্যাস পড়া নেই, অক্ষয় উকিলের স্ত্রীর অবস্থা আরও খারাপ, রাশি রাশি উপন্যাস পড়া সত্ত্বেও তাঁর কাছে সব কুয়াশা হেঁয়ালি—অথবা আরব্য উপন্যাসের গল্প। অথচ প্রদোষ, যে আধুনিক উপন্যাসের পোকা, আধুনিক একটি ছেলে ও মেয়ের মন যার নখদর্পণে, বাজার চলতি উপন্যাসগুলির চেয়েও আধুনিক উপন্যাস লিখবে বলে এতদিন ধরে যে নিজেকে তৈরি করছিল, ভদ্রমহিলাকে অনেক বুঝিয়েছিল, প্রতিটি লাইন ব্যাখ্যা করে করে সে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে এসব গল্প বাস্তবেও সম্ভব। বাস্তব নিয়েই এসব উপন্যাস—কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি, তাঁর ক্ষমতায় কুলোয়নি আধুনিক একটি মেয়ের বা ছেলের মনের ভিতর প্রবেশ করার। সুতরাং এটা বলাই বাহুল্য যে তিনি ও তাঁর মূর্খ এম-এ বি-এল স্বামী ওপরের চিনির আস্বাদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন।

সেক্স, পারভার্শান—এ সব জিনিস তাঁরা কোনোদিনই বুঝবেন না, আঠারো বছরের মেয়ে উনিশ বছরের যুবকের প্রেম পা দিয়ে ঠেলে স্থূলচর্ম প্রৌঢ়প্রায় একটি মানুষের সঙ্গে কেন বেড়াতে যায় তার অর্থ তাদের বোধগম্য হবার কথা নয়। তাদের ঘরেই যে আরব্য উপন্যাসের চমৎকার মালমশলা আছে এ তাঁরা জানবেন কেমন করে।

প্রদোষ গভীরভাবে কথাগুলি চিন্তা করছিল। হঠাৎ একজন এসে সামনে দাঁড়াতে তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। কেবল তাই না। রীতিমতো চমকে উঠল সে, আজ সে বিষণ্ণ ম্রিয়মাণ—তার মন নানাভাবে ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু তথাপি মুহূর্তের জন্য কেমন আবিষ্ট হয়ে গেল। সাজপোশাক দেখছিল না সে। সাধারণ মানুষ তাই দেখত। কিন্তু শিল্পীর চোখ দিয়ে সে অন্য জিনিস দেখছিল। শুধু রূপ নয়, তারও বেশি কিছু দেখছিল সে, মন্থরগামিনী বিষণ্ণ নদীর ওপর সূর্যাস্তের ছটা পড়লে এমন দেখায় কি! পাতার ফাঁক দিয়ে মহিলার মুখে একটুখানি রৌদ্র এসে পড়েছিল বলে এমন উপমাই প্রদোষের মনে পড়ল। কিন্তু হঠাৎ সে ভেবে পেল না, এঁকে মহিলা বলবে কী যুবতী। হয়তো খাবারটাবার কিছু কিনতে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে হোঁতকামুখো জলধর চোখ খুলে উঠে বসাতে প্রদোষ আর সেখানে বসতে পারল না। বেঞ্চি ছেড়ে দিয়ে বটগাছটার ওপাশে সরে গেল। গাছের মোটা গুঁড়িটা আড়ালের কাজ করল। আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে কথাগুলি সে শুনল। যেন গোঁসাইপাড়া বস্তিটা কোনদিকে জানতে চাইছে মহিলা। জলধর কিছু একটা বলছে।

॥ ৩৫ ॥

প্রচণ্ড শব্দ করে একটা ট্রাক চলে গেল। কাজেই জলধরের কথা বোঝা গেল না। শব্দটা থেমে যাবার পর প্রদোষ আবার কান খাড়া করে ধরল।

কিন্তু আর যেন কেউ কথা বলছে না।

বটপাতার ঝুরঝুর শব্দ হচ্ছে। গাছের ডালে পাখি কিঁচির-মিঁচির করছে। একটি-দুটি করে এবার পাখিরা বাসায় ফিরবে। বেলা প্রায় শেষ হতে চলল। ঠিকই অনুমান করে রেখেছে সে। সন্ধ্যার আগে দুজন ফিরছে না।

কিন্তু এই নিয়ে আর যেন তার মাথা ঘামাতে ভালো লাগছে না। সে অবাক হয়ে ভাবছে, কে এই মহিলা—কোথা থেকে এল, গোঁসাইপাড়া বস্তির খোঁজ করছে—তাতে বোঝা যায়, এদিকে থাকে না।

তার ভয়ানক ইচ্ছা করল আর একবার ভালো করে মানুষটিকে দেখে। যৌবন যখন কলরব করে না, যখন সে স্তব্ধ সমাহিত—নিঃসঙ্গ বিধুরও বলা যেতে পারে—আর সেই সঙ্গে যদি কিছু বিষাদ, কিছু বেদনা এসে তার মধ্যে বাসা বাঁধে, তখন সেই রূপের কাছে আর কোনো সৌন্দর্য—কোনো পার্থিব সৌন্দর্য ঘেঁষতে পারে কী না, প্রদোষ চিন্তা করতে লাগল।

তার যেন মনে হল, এমন নারীই তার উপন্যাসের নায়িকা হতে পারে, হওয়া উচিত, তার অবচেতন মনে এই মূর্তিই সে এতদিন গড়ে তুলছিল, ঠিক বুঝতে পারছিল না, অথবা বুঝতে পারলেও যথার্থ রূপটির আকার দিতে পারছিল না সে, অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিল।

অক্ষয় উকিলের মেয়ে কিছু না। বাজে। ফাজিল ফচকে বলা যায়।

উপন্যাসের নায়িকা হবার ক্ষমতা তার নেই।

সস্তা উপন্যাসের হতে পারে, বাজে উপন্যাসের বাজে নায়িকা। মানুষের মনে কোনোদিন যা দাগ কাটে না, এমনি সময় কাটাবার জন্য পড়া হয় সেসব বই, অথবা বিয়ের উপহার দেবার জন্য যেগুলি বাজারে ছাড়া হচ্ছে।

কিন্তু প্রদোষ সে ধরনের বই লিখতে চায়নি।

সত্যিকারের ইণ্টেলেকচুয়্যাল উপন্যাস সে লিখবে, লিখতে চেয়েছিল। সেই মেয়ে। সেই প্রেম। সেই দৃষ্টি—নিশ্বাস পতনটিও এমন হওয়া চাই। হাতকাটা প্রলয়ের বোন যা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে না।

মহিলার ক্লান্ত নিশ্বাসপতনের শব্দটাও প্রদোষ ভুলতে পারছিল না। হাতের বেঁটে ছাতাটা মুড়ে যখন তার সামনে এসে দাঁড়াল, যেন সেই নিশ্বাসের খানিকটা সৌরভ তার বুকের মধ্যে চলে গিয়েছিল—তার কত কাছে দাঁড়িয়েছিল যুবতী!

তাই তো, হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ করে দেবার মতন রূপ বুলার আছে কি? আর প্রদোষ কি না—

খামকা সময় নষ্ট করল সে, সময় শক্তি উৎসাহ অনুরাগ—ছাইয়ে জল ঢালার মতন।

কিন্তু কে এই মেয়ে—এই যুবতী? বিবাহিত?

এই তো একটু সময় দেখল কি না দেখল, কিন্তু তাতেই তার মনে হচ্ছিল, বিয়ে হলেও বিবাহিত জীবনের সমস্ত চিহ্ন যেন মহিলার সর্বাঙ্গ থেকে মুছে গেছে।

এখন শুধু নিঃসঙ্গতাকে নিয়ে ঘর করছে, বুঝি বিষাদ তার দিবারাত্রির সাথি। চোখ ছলছল করে উঠল প্রদোষের। আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। মুহূর্তের দেখা মনকে এমন অভিভূত আবিষ্ট করে দিল একটি মানুষ।

তাই হয়। কোথায় যেন সে পড়েছিল। আকস্মিক ঘটনার মতন এই জিনিস ঘটে। একজন সারাজীবন ধরে একটি মানুষকে মনে মনে খোঁজে, তার কথা চিন্তা করে, তাকে স্বপ্নে দেখে— তারপর হঠাৎ একদিন তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কোথায় কখন কী অবস্থায় দেখা হবে, আগে থাকতে কিছুই বোঝা যায় না। হেমন্তের দুপুরে একটা বটগাছের নিচে যতীন দাস রোডের মোড়ে এই হালুই দোকানের সামনে প্রদোষ তার দেখা পাবে, এক মিনিট আগেও ভাবতে পেরেছিল কি। তার নায়িকা, স্বপ্নের নারী, তার উপন্যাসের চরিত্র?

কিন্তু জলধর কী বলল কে জানে।

যেন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে যুবতী। যুবতী বলাই ঠিক করল প্রদোষ। যার যৌবন থাকে, তার আটাশ বছরেও থেকে যায়। সেই তুলনায় আঠারো বছরের মেয়েকে বুড়ি দেখাতে পারে। প্রদোষ যেন তখনই হলপ করে বলতে পারছিল, যদি এই মহিলার পাশে এনে দাঁড় করানো যায় তো অক্ষয় উকিলের মেয়েকে নির্ঘাৎ বুড়ি দেখাবে। যেমন ইঁচড়ে পাকা চেহারা!

কিন্তু জলধর কি গোঁসাইপাড়া বস্তির রাস্তাটা বলে দিতে চাইছে না। প্রদোষের কেমন সন্দেহ হল। আশ্চর্য কী, কূটচরিত্রের মানুষ, ভোগাতে চাইছে যুবতীকে। এতটা রাস্তা এসেও গোঁসাইপাড়া কোন্ দিকে ঠিক করতে না পেরে এখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ুক অথবা দাঁড়িয়ে থাকুক বা আর একটু ঘোরাঘুরি করে আরো তিনজনকে জিজ্ঞাসা করে দেখুক। যেন এর মধ্যে একটা রসিকতা আছে। আমি জানি, অথচ বলব না, দিনদুপুরে অন্ধকার হাতড়াবার মতন ঠিকানা খুঁজে মরুক, আমি আমার গদিতে বসে মজা দেখি। এই?

কিন্তু প্রদোষের মনে হল অন্য জিনিস। অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে ছোটোলোক জলধর মহিলাকে তার দোকানের সামনে খামকা দাঁড় করিয়ে রাখছে। ইচ্ছা করে দেরি করছে। আঙুল দিয়ে গোঁসাইপাড়ার ওই রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে এক সেকেণ্ডের বেশি লাগবার কথা নয়। কিন্তু তা তো পাষণ্ড দেখাবে না। তা হলে যে এখনি রূপসী তার দোকানের সামনে থেকে চলে যায়। নিশ্চয় সে আশা করেছিল, মহিলা দোকানে ঢুকবে, একটু খাবার-টাবার খেয়ে জল খাবে, বিশ্রাম করবে। আর ততক্ষণ রাক্ষুসে চোখ দুটো মেলে ধরে ইতরটা ঐ অনিন্দ্য সুন্দর দেহের রূপ-সুধা পান করবে। তার অর্থ, দেহটাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। কামার্ত মানুষ যা করে। দেহ ছাড়া অন্য কিছু যে চিন্তা করার কথাও নয় এ-জাতের মানুষগুলির।

এখানেই জলধরের সঙ্গে প্রদোষের তফাত।

সে শিল্পী। তার চোখে মেয়েদের রূপ কেবল তাদের গায়ের চামড়া ও মাংসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দেহ ছাড়িয়ে অন্য একটা স্তরে এই রূপকে তুলে ধরে কত বড়ো জিনিস, মহৎ জিনিস সে চিন্তা করতে পারে। জলধর পুরুষ। এমন প্রকৃতির মেয়েও আছে যারা দেহ নিয়েই শুধু চিন্তা করে—দেহটাকে বড়ো করে দেখে। অক্ষয় উকিলের মেয়েকেও এই দলে ফেলা যায় নাকি। প্রদোষ ঠিকই ধরেছে। প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছে। নিজের ক্ষীণ দেহ সে অস্বীকার করছে না। তার তুলনায় খুনেটা যে অনেক বেশি সুস্থ সবল, একথা খুবই সত্য। কেমন উঁচু লম্বা চওড়া মজবুত শরীর। এই শরীরই বুলার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। তার কাছে মন কিছু না, হৃদয় কিছু না—প্রেম বলতে সে দেহকে বোঝে—শারীরিক বল

দিয়ে সে ভালোবাসার বিচার করে। যেখানে যত বেশি স্বাস্থ্য, সেখানে তত বেশি অনুরাগ তত বেশি মোহ। তাছাড়া, লোকটার টাকাপয়সাও আছে। অর্থাৎ দুটো মোহ অক্ষয় উকিলের মেয়েকে অন্ধ করে দিয়েছে। তাই তো হবে। মগজ বলতে, ইন্টেলেক্ট্ বলতে যার কিছু নেই সে তো স্থূল জিনিস নিয়েই পড়ে থাকবে।

প্রদোষের চিন্তায় ছেদ পড়ল।

খুট খুট জুতোর শব্দ শুনতে পেল সে। তার হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। যুবতী আসছে। বটতলা ছেড়ে প্রদোষ ফুটপাত ধরে বাঁ-হাতি একটু এগিয়ে গিয়ে একটা লাইটপোস্টের নীচে দাঁড়াল। এখন সে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়াতে পারল। জলধরের দোকানের সামনে সেটা সম্ভব হয়নি। কত আস্তে হাঁটছে মহিলা। ধীরগামিনী লাবণ্যের নদী। উপমাটা আবার তার মনে পড়ল।

রাস্তা ক্রশ করে মহিলা ওদিকের ফুটপাথে উঠে গেল।

তা হলে শেষ পর্যন্ত গোঁসাইপাড়ার রাস্তার হদিস পেয়েছে উল্লুকটার কাছে। ওদিক দিয়েও গোঁসাইপাড়ার রাস্তায় পড়া যায়। প্রদোষ আর দাঁড়িয়ে থাকল না। রাস্তা পার হয়ে উল্টো দিকের ফুটপাথে উঠে গেল। জাহাজের মতন একটা প্রকাণ্ড সাদা বাড়ি ডাইনে রেখে সরু গলিটা ধরে কয়েক পা এগিয়ে গেলেই খোয়া-বিছানো একটা লাল পথ। এই পথ ধরে গোঁসাইপাড়ার বস্তিতে যেতে হলে বেশ কিছুটা হাঁটতে হয়। জলধরের দোকানের উল্টো দিকের গলিটা ধরে সোজা এগিয়ে গেলে চট্ করে বস্তিতে পৌঁছান যায়। সহজ পথটা না বলে জলধর যে কেন ঘুর পথটা বলে দিল, প্রদোষ ভেবে পেল না। এক হিসাবে মন্দ হল না। তবু কিছুক্ষণ মানুষটিকে দেখতে দেখতে সে ও হাঁটতে পারবে। কারণ, তাকেও তো এক সময় বাড়ি ফিরতে হবে। না-হয় আজ এই ঘুরপথেই বাড়ি ফিরল। এখন কথা হচ্ছে, প্রদোষের বস্তির কারো ঘরে যাচ্ছে যুবতী, নাকি বস্তির কাছাকাছি অন্য কারোর বাড়িতে যাবে, প্রদোষ বুঝতে পারছিল না। এইজন্য সে অবশ্য মাথা ঘামাল না। কারণ, বাড়ি পৌঁছলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। তাছাড়া, উত্তর কলিকাতায় থাকে মহিলা, নাকি বেহালা অথবা যাদবপুরের ওদিক থেকে আসছে। নাকি এই বালিগঞ্জের মেয়ে, প্রদোষ তা নিয়েও মাথা ঘামাল না। বালিগঞ্জের মেয়ে হওয়া বিচিত্র কী! গোঁসাইপাড়া বস্তি এমন কিছু একটা বিখ্যাত পল্লী না যে বালিগঞ্জের সব মানুষই তার নাম জানে বা জায়গাটা চেনে। হয়তো গোঁসাইপাড়া শব্দটাই অনেকে শোনেনি। আজও তাদের কাছে নূতন। আর বস্তি তো গড়ে উঠেছে সেদিন। দশ বছর আগেও নাকি ওখানে তাল নারিকেল গাছ আর কাঁটানটের জঙ্গল ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।

বালিগঞ্জের মেয়ে কী বেহালার মেয়ে, কার স্ত্রী, কার কন্যা—এখানেই বা কী প্রয়োজনে আজ হঠাৎ এল, কিছুই প্রদোষের জানবার প্রয়োজন ছিল না। তার দৃষ্টি চিন্তা অনুভব একটা বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। সে শুধু রূপ দেখছে, একটা আইডিয়া—যা নিয়ে তার এতদিনের স্বপ্ন কল্পনা। আমার ইন্‌সপিরেশন, বিদ্যুচ্চমকের মতন আমার ভেতরটা রাঙিয়ে দিতে তুমি আজ এখানে এসেছ, এমন চিন্তাও প্রদোষ করল। নাম-পরিচয় ইতিবৃত্ত কিছুই জানবার দরকার পড়ে না।

কেবল সে চাইছিল, একবার যদি মহিলা ঘুরে দাঁড়াত, তার সঙ্গে একটি কী দুটি কথা বলত, তখন নচ্ছার হালুইটার জন্য তো সেসব কিছুই সম্ভব হল না।

প্রদোষ আশঙ্কা করছিল, দশটা বাড়ির ছায়ায় ঢাকা অন্ধকার মতন গলিটা পার হলে লাল কাঁকরের ফাঁকা রাস্তা আরম্ভ হলেই মাথায় রোদ লাগবে আর সঙ্গে সঙ্গে মহিলা ছাতাটা খুলে মাথা ও কাঁধ ঢেকে পথ চলবে। তখন শুধু পিঠ কোমর ও পা দুটো ছাড়া আর কিছুই প্রদোষ দেখতে পাবে না। জলধর হলে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত। মুখ মাথা কবরী ইত্যাদির চেয়ে বুক পিঠ নিতম্ব জঙ্ঘা তার কাছে অধিক মূল্যবান। এসব মানুষের রুচি, ইচ্ছা এবং দৃষ্টি যে কত নিম্নগামী, এই নিয়ে প্রদোষ নূতন করে আর কিছু ভাবতে এখন উৎসাহ পেল না।

লাল কাঁকরের রাস্তায় নেমে সে খুশি হল।

তাই তো হবে। কার্তিক মাস, তায় আবার বেলা শেষ। রোদের তেজ কোথায়। বরং রোদটা মিষ্টি লাগছিল। হলদে রং ধরাতে উৎসবের আলোর মতন লাগছিল, কাজেই তখনও ছাতাটা হাতেই ঝুলতে লাগল। মাথা মুখ চুল গ্রীবা ঢাকা পড়ল না।

প্রদোষ একটু জোরে পা চালাল। আবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রচুর ধুলো উড়িয়ে ওদিক থেকে একটা লরি আসছিল বলে কি? মহিলাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। লরিটা চলে গেল। কিন্তু মহিলা আর হাঁটছিল না। রাস্তায় এই দুটি মানুষ ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। যুবতী ততক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রদোষের দিকে তাকাল। যেন কিছু জিজ্ঞাসা করবে তাকে। তার হৃৎপিণ্ড দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল। কিন্তু তা হলেও সে একটু একটু করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

'গোঁসাইপাড়া বস্তিটা কোন্ দিকে বলতে পার ভাই?'

'আরো কিছুটা হাঁটতে হবে আপনাকে।' প্রদোষ আস্তে বলল।

'তবে তো অনেক দূর।' যুবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'উঃ, ও লোকটা বলল, কাছেই এই রাস্তা ধরে দুপা এগিয়ে গেলেই বস্তিটা পেয়ে যাব।'

মনে মনে জলধরের মুণ্ডপাত করল প্রদোষ। খামকা ভদ্রমহিলাকে এতটা হাঁটতে হচ্ছে। সহজ পথটা বলে দিলে কখন সেখানে পৌঁছে যেত। মহিলার চোখের দিকে তাকাল সে।

'প্রায় এসে গেছি। আমিও তো যাচ্ছি ও-বস্তি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

'ওমা, তুমিও কি ওই বস্তিতে যাচ্ছ!' যেন একটু অবাক হল মহিলা। প্রশ্নটা করার পর হাঁ করে প্রদোষকে দেখতে লাগল।

একটা ঢোক গিলে প্রদোষ বলল, 'আমি ওই বস্তিতে থাকি।'

'আচ্ছা!' যুবতী কি খুশি হল! চোখ বড়ো করল, ভুরুজোড়া কপালে তুলল এবং সেই সঙ্গে সুন্দর একটা হাসিও ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে দিল।

এত রূপ নিয়ে একসঙ্গে কাউকে হাসতে ও বিস্মিত হতে প্রদোষ আগে কখনও দেখেনি। তাই সে-ও কম বিস্মিত হল না। মুগ্ধ হল সে। তার মুখ দিয়ে কথা সরল না। চোখ বড়ো করে মানুষটিকে দেখতে লাগল।

'তবে তো ভালোই হয়েছে।' যুবতী একটা হাল্কা নিশ্বাস ফেলল। 'আমি মনে মনে এমন একজনকে খুঁজছি।'

'আপনি কি বালিগঞ্জে থাকেন?' প্রদোষ প্রশ্ন না করে পারল না।

'হুঁ, থাকতাম, কোনোদিন থেকেছি'। এই প্রথম শব্দ করে হাসল মহিলা। 'আজ আমি অনেক দূরের মানুষ।'

হাসিটা অন্যরকম মনে হল প্রদোষের। ঘুম থেকে জেগে উঠে কোনো কথা বলার আগে যদি একটি মানুষ হঠাৎ হেসে ওঠে, তখন যেমন তার হাসিটা একটু অদ্ভুত, দুর্বোধ মনে হয়, আর সেই সঙ্গে তার চোখমুখের অবস্থাও কিছুটা অস্বাভাবিক দেখায়, এখানেও প্রদোষ সেই রকম একটা অস্বাভাবিকতা, অবাস্তব কিছু যেন দেখতে পেল। বলতে কী, এভাবে মহিলা শব্দ করে হেসে উঠতে প্রদোষ একটু অস্বস্তি বোধ করল। 'আজ আমি অনেক দূরের মানুষ।' বালিগঞ্জ থেকে সেই জায়গা কতটা দূরে প্রদোষ তা-ও চিন্তা করল।

'এসো ভাই, একটা জায়গায় বসা যাক—তোমার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু জানতে পারব।'

কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল প্রদোষ। মহিলা তার হাত ধরল। তার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবার কথা, তার স্বপ্নের নায়িকা—তার আকাঙ্ক্ষিত নারী অপরূপ হাসি নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—তাকে স্পর্শ করছে, এত সুখ, এত সৌভাগ্য যে তার কল্পনার বাইরে—কিন্তু প্রদোষ ঘামতে লাগল। রীতিমতো একটা ভয় নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে সে রাস্তাটা দেখল। রাস্তা অবশ্য তখনও জনমানবহীন। তা হলেও সে নিশ্চিন্ত হতে পারল না। চেষ্টা করে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সে।

'গোঁসাইপাড়া বস্তিতে কয়েক ঘর মানুষ থাকে—আপনি কাদের বাড়ি যাবেন?'

'অক্ষয় উকিল ওখানে থাকেন না?'

'হুঁ', প্রদোষ আবার চোখ বড়ো করে তাকাল। তারপর চুপ করে রইল।

'এসো ভাই, ওই তো মনে হয় একটা পার্ক দেখা যাচ্ছে—ওখানে বসে আমরা কথা বলব।' মহিলা আঙুল দিয়ে রাস্তার পাশে একটা পোড়ো জমি দেখাল। জায়গাটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ভিতরে গাছপালা আছে।

'পার্ক না।' প্রদোষ মৃদু গলায় বলল, 'পোড়ো জমি। হয়তো কোনোদিন কেউ বাড়ি তুলবে বলে জায়গাটা কিনে রেখেছিল। বাড়ি আর করা হয়নি। অনেকদিন থেকে এভাবে পড়ে আছে।'

'তা হলেও গাছের ছায়া আছে, ঘাস আছে, বসা যাবে। আমি বড়ো ক্লান্ত, বুঝলে—অনেক রাস্তা হেঁটেছি, অনেক দূর থেকে এসেছি।'

গলার স্বরে ক্লান্তি। চোখেও একটা বিষণ্ণতা লেগে রয়েছে। জলধরের দোকানের সামনে প্রথমেই জিনিসটা লক্ষ করেছিল প্রদোষ। এখন আবার নূতন করে ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখখানা দেখল সে। মাঝখানে হঠাৎ হাসছিল বলে প্রদোষ বিব্রত হয়ে পড়েছিল। অস্বস্তি বোধ করছিল। তা না হলে প্রথম থেকেই মানুষটির জন্য একটা বেদনা, একটা প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি মনে মনে পোষণ করে আসছিল সে।

'চলুন, তা হলে ওখানেই বসা যাক।'

প্রদোষ আর আপত্তি করল না। মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে গাছের ছায়ায় ঢাকা জমিটার দিকে এগোতে লাগল।

'অক্ষয়বাবু কদিন হয় বস্তিতে এসেছেন বলতে পার?'

'না, তা বলতে পারব না, মনে নেই।'

প্রদোষের কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে যুবতী হাঁটছিল। প্রদোষ আড়চোখে তার গালের পাশটা একবার দেখে নিয়ে বলল, 'তা ছ-সাত বছর হবে—হুঁ, আমাদের পরেই যেন ওঁরা এসেছিলেন। আমাদের সাত বছর হয়ে গেল ওখানে।'

'দেখছ, কী সুন্দর জায়গা!' বেড়া পার হয়ে দুজন ভিতরে ঢুকল। ঝিঁঝি ডাকছিল। ঘাস পাতার গন্ধ নাকে লাগল। 'এখানে বোস, মনটা কীরকম উদাস হয়ে যায় এসব জায়গায় এলে, তাই না!'

প্রদোষ উত্তর করল না। দামি শাড়িটা নিয়ে যুবতী ঘাসের ওপর হুট করে বসে পড়ল। প্রদোষ ভেবেছিল, একটা রুমাল বা যা-হোক কিছু নীচে বিছিয়ে তার ওপর বসবে. কিন্তু মনে হল, নধর কচি ঘাসের চেহারা দেখে তার ভয়ানক লোভ হয়েছে. তাই কিছু না বিছিয়ে মাটিতে বসে পড়ল এবং নখ দিয়ে দুটো ঘাসের ডগা ছিঁড়ে নাকের কাছে তুলে শুঁকতে আরম্ভ করে দিল। যেন অনেকদিন ঘাস দেখেনি. ঘাসের গন্ধ পায়নি। হয়তো কোনো ফ্ল্যাটবাড়ির ওপরের ঘরে থাকে, চারদিকে ইট-কাঠ ও মাথার ওপর ধু-ধু আকাশ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। রুক্ষ নির্জীব পরিবেশের মধ্যে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই চোখে মুখে এত ক্লান্তি. বিষণ্ণতা। তাই সবুজ ঘাস দেখে হঠাৎ এমন উৎফুল্ল সজীব হয়ে উঠেছে। প্রদোষও মাটিতে বসল।

'তুমি কী কর ভাই?'

'কলেজে পড়ি।'

'কলেজে পড়, বাঃ, ভারী সুন্দর তো!' চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল মহিলার। 'কোন্ ইয়ার এবার তোমার?'

'থার্ড ইয়ার।'

'অ্যাঁ, তুমি থার্ড ইয়ারে পড়? সত্যি বলছ।'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করে উঠল যুবতী. যেন কী ভাবল. ফ্যালফ্যাল করে প্রদোষকে দেখল. থার্ড ইয়ারের একটি কলেজের ছেলের মধ্যে তেমন কিছু বিশেষত্ব খুঁজে পেল কি না. প্রদোষ চিন্তা করতে লাগল। 'তোমাদের সঙ্গে ক'টি মেয়ে পড়ে?' মহিলা প্রশ্ন করল।

'একটিও না।' প্রদোষ উত্তর করল।

'কেন!' যেন মহিলা কিছুটা নিরাশ হল। চোখের উজ্জ্বলতা কমে গেল। 'কো-এডুকেশন নেই বুঝি তোমাদের কলেজে?'

প্রদোষ ঘাড় নাড়ল।

'অক্ষয় উকিলের কথা কী যেন জিজ্ঞেস করছিলেন তখন?'

'ও, ভালো কথা, দ্যাখ, আসল কথাটাই ভুলে গেছি। ভাবলাম, তোমার কাছ থেকে সব জেনে নেব—ওই বস্তি পর্যন্ত হেঁটে যেতে আমার কিন্তু ইচ্ছে করছে না।'

স্বাভাবিক। প্রদোষ চিন্তা করল। যারা ভালো বাড়িতে থাকে, ভালো পাড়ায় থাকে, তাদের বস্তি ভালো লাগে না। আবহাওয়াটাই তাদের খারাপ লাগে। কিন্তু গোবরেও যে পদ্মফুল ফোটে—গোসাইপাড়া বস্তির টালির ঘরেও যে এক শিল্পী বাস করছে, যুবতী যদি জানত।

'হুঁ', মহিলা একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বসল। 'অক্ষয়বাবুর বাড়ির সবাইকে তুমি চেন, তাই না?'

'তা চিনি বইকি—পাশাপাশি ঘর, ওদের আমাদের।' প্রদোষ একটা ঢোক গিলল।

'অক্ষয়বাবুর মেয়েকে চেন? একটিই তো মেয়ে—তাই না?'

প্রদোষ আস্তে মাথা নাড়ল। অস্পষ্ট গলায় বলল, 'চিনি।' কিন্তু বলে ফেলে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। হঠাৎ বুলার কথা জিজ্ঞাসা করা কেন, বুঝতে পারল না সে। তার মুখটা একটু সাদা হয়ে উঠল।

'মেয়েটি পড়ে?'

'পড়ত, এখন পড়ে না, মানে ইস্কুলে পড়ছে না।'

'বাড়িতে পড়ে? নতুন মাস্টার এসে পড়ায়, তাই না?'

প্রদোষ মাথা নাড়ল। একবার তার মনে হল মহিলা হয়তো মিসট্রেস। টিউশানির খোঁজে এসেছে। বুলার মাস্টারের কথা জিজ্ঞাসা করছে। খবরটা জানতে এসেছে সত্যি কেউ ওকে বাড়িতে পড়াচ্ছে কি না। তাই কি? সঙ্গে সঙ্গে নূতন একটা সন্দেহে তার মন ভরে উঠল। কোথায় কোন্ বস্তির গরিব অক্ষয় উকিল, প্রাইভেট টিউটর রাখবার যার ক্ষমতাই নেই—খুনেটা তো ইচ্ছা করে পড়াচ্ছে, নিজের স্বার্থের খাতিরে বিনি পয়সায় পড়াচ্ছে, আর কেমন মেয়েকে পড়াচ্ছে, না কোন্ জন্মে লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে যে কলতলায় বসে বাসন মাজছিল, রান্নাঘরে বসে বাটনা বাটছিল, সেই মেয়ের জন্য বাড়িতে টিউট্রেস রাখা হবে কি না, জানতে এই মানুষ কষ্ট করে এতটা পথ এসেছে, প্রদোষ বিশ্বাস করতে পারল না। মহিলার চোখের দিকে সে তাকিয়ে রইল।

'কেমন পড়ায় মাস্টার, খোঁজ নিয়েছিলে?'

'আমি কেন খোঁজ নেব।' প্রদোষ একটু বিরক্তই হল। কিন্তু তা হলেও মলিন একটু হাসল। 'যাঁরা মাস্টার রেখেছেন, তাঁরাই বুঝবেন ভালো পড়াচ্ছে কী মন্দ পড়াচ্ছে।'

'না, তা হলেও তো তোমাদের পাশের ঘরের মানুষ ওরা। হয়তো তুমি শুনতেও পার।'

'আমি কিছুই শুনিনি।' প্রদোষ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। চেহারাটাও রুক্ষ করে ফেলল। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা বাঁকা হাসি ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে না দিয়ে পারল না সে।

'কী হল? হাসছ!'

'কেমন পড়াচ্ছ মাস্টার শুনিনি—তবে ছাত্রীকে নিয়ে খুব বেড়াচ্ছে, পরশু বোটানিক্যাল গার্ডেন গিয়েছিল, আজ ধর্মতলায় ছাত্রীকে নিয়ে গেছে চোখ দেখাতে।'

'আহা, মেয়েটির চোখ খারাপ বুঝি?'

'ওই আর কী! একটা আছিলা নিয়ে একত্র বেরোনো। কলকাতায় এমন সবারই একটু-আধটু চোখের দোষ থাকে—সারাক্ষণ চোখে ইলেকট্রিক আলো লাগছে যেখানে—'

'না, তা হবে কেন, অছিলা বলছ কেন।' যেন প্রদোষের কথায় একটু আহত হল যুবতী। 'নিশ্চয় দোষ আছে চোখের।'

প্রদোষ চুপ করে রইল। অবাক হচ্ছিল সে, ঠিক এই প্রসঙ্গটা ঘুরে ফিরে এখানে চলে এল, যে কথা সে ভুলে থাকতে চেয়েছিল, ভুলবে মনে করে এমন সুন্দর মানুষটির সঙ্গে এই পোড়ো জমিতে চলে এসেছে।

'আমার খুব ভালো লাগছে শুনে।' যুবতীর চোখ দুটো বুজে এল। 'ছাত্রী ও মাস্টারের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক স্নেহের যোগাযোগ আছে, তাই তো সঙ্গে নিয়ে বেড়াচ্ছে, চোখ দেখাতে গেছে।'

প্রদোষ অবাক হল। চোখের কোণায় জল এসেছে মহিলার। কিন্তু প্রদোষ চেহারাটা বিকৃত না করে পারল না। ভিতরের আক্রোশটা আর কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না।

'হুঁ, মধুর সম্পর্ক কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—তবে মাস্টারটি খুব ভালো লোক নয় কিন্তু—'

'কেন!' চোখ খুলে গেল যুবতীর। কথাটা শুনে বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল বোঝা গেল।

প্রদোষও তেমনি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'ও তো খুনে, একটা মানুষকে খুন করে দশ বছর জেল খেটে এসেছে—এই লোক কত ভালো হবে বুঝতে পাচ্ছেন না?'

এক সেকেণ্ড স্তব্ধ হয়ে রইল মহিলা। কথাটা বুঝতে যতটা সময় লাগল। তারপর হাসতে আরম্ভ করল। এবার প্রদোষ বিস্মিত হল। খিল খিল করে মহিলা হাসছে তো হাসছেন। হাসির ধমকে সুন্দর শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। দেখতে দেখতে হাসির মাত্রা এতটা বেড়ে গেল যে, আর সোজা হয়ে বসে থাকতে পারল না। ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে হাসতে লাগল। প্রদোষ বিব্রত হয়ে পড়ল। এমন অপরিচিত জায়গায়, অপরিচিত লোকের সামনে এভাবে কেউ হাসে! এই অবস্থায় সে কী করবে বুঝতে পারছিল না। মহিলার কী মাথা খারাপ? না হলে 'খুনে' শব্দটা শুনে হাসতে হাসতে ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ার হয়েছে কি। সেখান থেকে প্রদোষ উঠে আসবে কিনা ভাবছিল। কেননা, তার কেমন একটু ভয়ও করছিল। জায়গাটা প্রকাশ্যই বলা যায়। রাস্তায় লোক চলতে আরম্ভ করলেই দৃশ্যটা কারো না কারো চোখে পড়বে। এবং একজন একজন করে শেষটায় সেখানে ভিড় জমে যাবে। অগত্যা প্রদোষ উঠে আসবারই উপক্রম করছিল। হঠাৎ দেখা গেল মহিলার হাসি থেমেছে। আস্তে আস্তে উঠে বসেছে। ততক্ষণে চোখের জলের দাগটা গালে মোটা হয়ে বসে গেছে। হাসির সঙ্গে চোখ থেকে প্রচুর জল বেরিয়েছিল বোঝা গেল। এবং মহিলা নিজেও জিনিসটা বুঝল। আঁচল দিয়ে চোখ গাল মুছে ফেলল। তারপর প্রদোষের চোখে চোখ রেখে বলল, 'শোন ভাই, তুমি তো ছেলেমানুষ,—অতশত বোঝ না—খুনেও মানুষ, তারও ফুলের মতন নরম মন থাকতে পারে, নরম একটি মেয়েকে ভালোবাসতে পারে, পারে না?'

প্রদোষ কথা বলল না। মাথা নিচু করে হাতের নখ খুঁটতে লাগল।

'চলি—' প্রদোষ চমকে উঠল। মহিলা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছে।

'কোথায় যাবেন এখন?' সৌজন্য রক্ষার জন্য প্রদোষকে বলতে হল। চুপ থেকে যুবতী একটু সময় আকাশ দেখল। যেন কী ভাবল। তারপর চোখ নামিয়ে নিস্তেজ বিষণ্ণ গলায় বলল, 'তাই তো, কোথায় এখন যাব বুঝতে পারছি না। ভেবেছিলাম তোমার কাছে ছাত্রী ও মাস্টারের গল্প শুনব, কিন্তু তুমি খুনেটুনে বলে এমন আক্রমণ আরম্ভ করলে মানুষটাকে—'

'না তো', প্রদোষ গলার সুর নরম করল। 'লোকটা একদিন খুন করেছিল—একটা নিষ্ঠুর কাজ করেছিল, এই শুধু বলেছি, আক্রমণ করিনি তাকে।' মহিলা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বুঝতে তার কষ্ট হল না।

'ঐ যথেষ্ট। তোমার মধ্যে হিংসা আছে আক্রোশ আছে—তোমার চোখ দেখে আমি বুঝেছি। মানুষকে ঘৃণা কর তুমি, ভালোবাসতে শেখনি, তোমার ভেতরটা সুন্দর নয়।'

মহিলা আর দাঁড়াল না। তারের বেড়ার ভিতর দিয়ে মাথা গলিয়ে রাস্তায় নেমে গেল।

প্রদোষ ভাবল, যদি মাথা খারাপ তো এত সব ভালো কথা বলে কেন। আর তাই যদি না হবে তো হাসল কেন, হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলল কেন। না কি খুনেটার সঙ্গে যুবতীর কোনো সম্পর্ক আছে, যে তাঁকে এমন করে হাসায় কাঁদায়?

চিন্তা করতে চাইছিল প্রদোষ। কিন্তু তার নিজের খুব খারাপ লাগছিল। হঠাৎ কেমন শূন্য ঠেকছিল চারদিকটা। বুকটা খালি খালি ঠেকছিল।

॥ ৩৬ ॥

সেদিন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলেন না জগমোহন। এইমাত্র তাঁর দিবানিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে। ঘুম থেকে জেগে উঠেই তিনি দুবার জোরে হাঁচি দিয়েছেন, কেশেছেন। এ সময় তিনি তাই করেন। অর্থাৎ এ ঘর থেকে একটু সাড়াশব্দ করে ওঘরে পুত্রবধূকে জানান দেওয়া যে, তাঁর ঘুম ভেঙেছে ও সেই সঙ্গে কফির ইচ্ছা হয়েছে, এখন তুমি কফি নিয়ে আসতে পার। রমলা অবশ্য তিনটে বাজবার আগে থাকতেই তৈরি হয়ে থাকে, তাই হাঁচি কাশি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগমোহনও ওঘরে পেয়ালা পিরিচ ও চামচের টুংটাং শব্দ শুনতে পান এবং এক মিনিট পর সুমধুর কফির ঘ্রাণ তাঁর নাকে আসে। আরও এক মিনিট পর ধূমায়মান কফির পেয়ালা হাতে রমলা ধীরে ধীরে তাঁর ঘরে এসে প্রবেশ করে।

আজ নিয়মভঙ্গ হল।

জগমোহন হাঁচলেন কাশলেন, পেয়ালা পিরিচ চামচ কেটলির শব্দটাও তাঁর কানে এল, কিন্তু কফির পেয়ালা হাতে রমলার পরিবর্তে দীনদয়াল এসে ঘরে ঢুকল। জগমোহনের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হল, মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

'বউমা কোথায়? অন্যদিন হাত বাড়িয়ে সাগ্রহে পুত্রবধূর হাত থেকে পেয়ালাটা তিনি তুলে নেন, আজ তিনি তা করলেন না, যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে চাকরকে প্রশ্ন করলেন, 'বউমা ঘরে নেই?

'হ্যাঁ, বউদিমণি ঘরেই আছেন।' টিপয়ের ওপর কফির পেয়ালা বসিয়ে দিয়ে দীনদয়াল

কর্তাবাবুর মুখের দিকে তাকল। জগমোহন হঠাৎ আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। দীনদয়াল চাপা গলায় বলল, 'মেজবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন।'

'অ, মেজবাবু বাড়ি ফিরেছে! কখন ফিরল?'

'দুটোর সময়।'

টেবিলের ঘড়িটা আর একবার দেখলেন তিনি।

'আচ্ছা তুই এখন যা।'

দীনদয়াল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা তুলে নিয়ে জগমোহন এক চুমুক কফি মুখে তুললেন। আজ ভোরবেলা পরিতোষকে কাজে বেরোতে হয়েছিল। জগমোহনই ছেলেকে ডেকে দিয়েছিলেন। বাইরে কোথায় কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে। পরিতোষকে ডেকে দিয়ে তিনি বাথরুমে গেছেন। পাঁচটার আগেই পরিতোষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। দুটোর সময় সে বাড়ি ফিরেছে। কিন্তু জগমোহন আশা করেছিলেন সন্ধ্যার আগে ছেলের ফেরা হবে না। বাইরে কাজ থাকলে সচরাচর তাই হয়। ভোরবেলা পরিতোষকে বেরোতে হয় এবং ফিরতে সন্ধ্যা হয়, রাতও হয় কোনোদিন। তা হলেও পরিতোষ ঘরে ফিরেছে বলেই যে রমলা নিজে না এসে চাকরকে দিয়ে শ্বশুরমশায়ের কফি পাঠিয়ে দেবে এমন তো কোনদিন হয় না। বউমার হঠাৎ শরীর খারাপ করল, না কি পরিতোষ অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে— একটু উদ্বেগ নিয়ে দ্বিতীয়বার যখন তিনি কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে যাবেন একটা রুক্ষ উত্তেজিত কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এল। জগমোহন সচকিত হয়ে উঠলেন। মেজো ছেলের ঘরের দিকে কান খাড়া করে ধরলেন। তাই তো, পরিতোষের গলার স্বর। রমলাও কথা বলছে। তার গলার স্বরেও যথেষ্ট ঝাঁঝ এবং বিরক্তি রয়েছে। জগমোহন রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দুজনে কথা কাটাকাটি করছে। কলহই বলা যায় এটাকে। কোনো দিন যা হয় না, এই চার বছরের মধ্যে একদিনও যা জগমোহনের কানে আসেনি। তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গোপন মান-অভিমান যে না চলে এমন নয়, জগমোহনের অভিজ্ঞ চোখে সময় সময় জিনিসটা ধরাও পড়ে যায়। কিন্তু এই মান অভিমান এতই সূক্ষ্ম চাপা এবং ক্ষণস্থায়ী যে, অনেক সময় জগমোহন ভাবেন, হয়তো তাঁরই দেখবার বুঝবার ভুল হয়েছিল, আসলে দুজনের মধ্যে কিছুই হয়নি। কিছু না হোক তাই তো তিনি চাইবেন। আবার এ-ও চিন্তা করেন. একটু মনকষাকষি অভিমান অশান্তির ঝড়ঝাপটা লাগা ভালো, না হলে দাম্পত্য প্রণয়ের ভিত শক্ত হবে কেমন করে, অনুরাগের রঙ পাকা হবে কী দিয়ে। কিন্তু আজ যেন—

হঠাৎ জগমোহনের একটা কথা মনে পড়ল।

তখন তিনি চেম্বার থেকে ফিরেছেন। দশটা বেজে গেছে। পোশাক ছেড়ে নাতিকে ডাকতে তিনি হাঁটতে হাঁটতে রমলাদের ঘরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন; যেতে যেতে ঐ একটু সময়ের মধ্যে তিনি যেন দেখলেন বউমা ব্যস্ত হয়ে দুবার বাথরুমের দিকে গেল, আবার যেন সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে বেরিয়েও এল, জগমোহনের সঙ্গে চোখাচোখি হবার আগেই ঘরে ঢুকে পড়ল। দরজায় দীপু দাঁড়িয়ে। জগমোহন নাতির হাত ধরে তাকে কাছে টেনে নিচ্ছিলেন, কিন্তু শিশুকে কেমন যেন আড়ষ্ট গম্ভীর হয়ে থাকতে দেখলেন তিনি। তেমন করে জগমোহনের কোল ঘেঁষে দাঁড়াল না।

'কী হল দাদু, তোমাদের স্নান হয়েছে?' তোমাদের বলতে জগমোহন রমলাকেও বোঝাচ্ছিলেন। দশটার মধ্যে মা ও ছেলের স্নানের পর্ব শেষ হয়ে যায়। জগমোহনের জন্য এ সময় বাথরুম অবসর করে দিতে হয়। কেননা একবার তিনি বাথরুমে ঢুকলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে তাঁর অনেক সময় লাগে। প্রশ্নটা করেছিলেন তিনি এই জন্য যে. নাতিকে তো তিনি অস্নাত দেখছিলেনই, রমলারও স্নান হয়েছে বলে তাঁর মনে হল না। বাথরুমের দিকে সে একবার গেল, ফিরে এল, আবার ঢুকল, আবার বেরিয়ে এল—না কি স্নানের উদ্দেশ্য নিয়ে বউমা ওদিকে ছুটোছুটি করছিল, তারপর জগমোহনকে দেখে ইতস্তত করে ফিরে এসেছে। কিন্তু জগমোহন তো রোজই এ সময় বাড়ি ফেরেন, স্নান আহার ভ্রমণ শয়ন—ঘড়ি ধরে তিনি সব কিছু করেন। যেদিন সময় মতন ফিরতে পারবেন না বোঝেন, চেম্বার থেকে বেরিয়ে হয়তো রুগীর বাড়ি যেতে হবে, সেদিন ফোন করে বউমাকে জানিয়ে দেন, তাঁর ফিরতে দেরি হবে। আধ ঘন্টা কুড়ি মিনিট্ দেরি হবার সম্ভাবনা থাকলেও বাড়িতে খবর দিয়ে রাখেন। তা ছাড়া এতটা সময় মা ও ছেলে কী করছিল? পরিতোষ তো আজ কোন্ ভোরে কাজে চলে গেছে। অন্যদিন তার অফিসের রান্নাবান্নার তদারক করে রমলাকে এদিকে আটকা থাকতে হয়। বড়োছেলেও বাড়িতে ছিল না। নিশ্চয় চা খেয়েই বেরিয়ে গেছে। কদিন ধরে জগমোহন দেখছেন, তার বাড়ি ফেরার বা স্নানাহারের সময়ের কিছু ঠিক থাকছে না। হয়তো কোনোদিন বেলা দুটোর সময় ফিরল, কোনদিন সারাদিন পার করে ফিরল সেই রাত এগারোটায়। যেদিন সকালে বেরোল না, সেদিন দুপুরে ভাত খেয়ে বেরিয়ে গেল, ফিরল দুপুর রাতে। হ্যাঁ, রাত্রে বাড়িতেই ঘুমোয়। এটার ব্যতিক্রম অবশ্য আজ পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু জগমোহন তা-ও আশা করছেন। কোনদিন হয়তো দেখবেন, রাত্রে আর ফিরলই না। তিনি তাই চাইছেন—সরযূধামের আকর্ষণ যদি একেবারে সে কাটিয়ে উঠতে পারে, সেটা তার পক্ষেও ভালো, এ-বাড়ির পক্ষেও মঙ্গলজনক হবে। জগমোহন চুপ করে আছেন। সহ্য করছেন। ধৈর্যের বাঁধ সময় সময় ভেঙে পড়তে চাইছে। কিন্তু গিরিজা পরিতোষ বার বার তাঁকে সতর্ক করে দিচ্ছে, এখন তাকে কিছুই বলবেন না, ঘাঁটাতে গেলে কী করতে কী করে বসবে তার ঠিক কী। বরং এমনিতে যদি এখান থেকে সরে যায় সেটা মন্দ না। যত খুশি সে বাইরে বাইরে থাকুক—এই নিয়ে জগমোহন যেন পরিমলকে একটি কথাও না বলেন। যদি অক্ষয় উকিলের বাড়ি কী আর কোথাও থাকবার-শোবার একটা আস্তানা করে নেয় তো আমাদের আপত্তি করার কোনো কারণ থাকা উচিত নয়। জগমোহন জিনিসটা বোঝেন, কিন্তু তা কি আর এই মানুষ করবে, জগমোহনের সন্দেহ হয়—হয়তো থাকবার-শোবার একটা জায়গা করে নিল—কিন্তু দুবেলা ভাত খাওয়া? বেকার মানুষ। খাবে কোথায়—এই দুর্দিনের বাজারে বসিয়ে বসিয়ে তাকে খেতে দিচ্ছে কে? আর উকিলের তো সেই ক্ষমতাই নেই, আর কারো আছে কী—এবং তাঁর এই ছেলে যে কোনো কাজ-কর্ম করবে, দুটো পয়সা উপায় করবে তার কিছুমাত্র লক্ষণ জগমোহন দেখতে পাচ্ছেন না। তার সে ধরনের কোনো ইচ্ছাই নেই—হয়তো যোগ্যতাও নেই। না থাকা স্বাভাবিক। দশ বছর জেলের তৈরি ভাত খেয়েছে। আজ জেল থেকে বেরিয়ে নিজের অন্নসংস্থানের কথা চিন্তা করে রাতারাতি সে কর্মঠ হয়ে উঠবে এটা আশা করা যায় না। সুতরাং—

তা হলেও জগমোহন চুপ করে আছেন। ধৈর্য ধরে আছেন। ছোটোছেলে কিছুতেই এ ব্যাপারে মাথা গলাতে চাইছে না। প্রথম থেকেই জিনিসটা এড়িয়ে যাচ্ছে। চিঠি লেখা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সে এল না, বা হ্যাঁ-না একটা উত্তরও দিল না। জগমোহন মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন, যদি এ সপ্তাহেও সন্ন্যাসী ছোঁড়া না আসে তো তিনি নিজে ব্রজদুর্লভপুর যাবেন। যেতেই হবে তাঁকে। স্বামী ঈশ্বরানন্দের সামনে ছেলেকে ডাকিয়ে নিয়ে তিনি সব কথা বলবেন। তাঁর বিপদের কথা ঈশ্বরানন্দও জানুক। হোক না ছেলে সন্ন্যাসী, তার জন্মদাতা বিপন্ন—বার বার তাকে এ কথা বলা সত্ত্বেও, বিপদে পড়ে পিতা তার সাহায্য যাচ্ঞা করছে এই জিনিস বুঝেও সে এমন নীরব নিস্পৃহ থাকতে পারে কি না—বা তার গুরু তাকে এভাবে পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘনের অধিকার দিয়েছেন কি না ঈশ্বরানন্দের মুখ থেকে জগমোহন স্বকর্ণে এ কথা শুনে আসবেন, জেনে আসবেন। হুঁ, তখন তিনি বুঝবেন ঈশ্বরানন্দ কত বড়ো স্বামীজী—জগতের মুক্তিদাতা সেজে বসে আছেন—কিন্তু কার্যত তিনি মানুষের উপকার করতে কতটা হাত বাড়ান দেখা যাবে। পরিমল এই আস্তানা ছাড়বে জগমোহন কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। দুনিয়ার কুমতলব মাথায় নিয়ে সে বাউন্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াবে সত্য, কিন্তু খেতে-শুতে ঠিক এখানেই আসবে। তার অর্থ, সরযূধামের একটা অকল্যাণ না ঘটিয়ে সে কিছুতেই ছাড়বে না। এবং জগমোহনও কিছুতেই তাকে বলতে পারবেন না, 'এ-বাড়ি ছেড়ে তুমি চলে যাও।' হ্যাঁ, ভয়। এই প্রকৃতির মানুষকে দিয়ে নানা রকম ভয় আছে বলেই তো গিরিজা, পরিতোষ তাঁকে চুপ থাকতে বলছে। কিন্তু খুব বেশিদিন কি তিনি চুপ থাকতে পারবেন? পারা উচিত নয়। আবার—কাজেই জগমোহনকে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরানন্দর শরণাপন্ন হতে হবে। অন্তত তাঁর এই বিশ্বাস আছে—ছোটোছেলে দায়িত্ব এড়াতে পারে, কিন্তু তিনি যদি সব কথা খুলে স্বামীজিকে বলেন, স্বামীজি নিশ্চয়ই তাঁর এই বিপদে তাঁকে সাহায্য করবেন। ঈশ্বরানন্দ চুপ করে থাকবেন না। হয়তো তিনি নিজেই একটা অধোগামী জেল-ফেরত মানুষের চরিত্র সংশোধনের দায়িত্ব নেবেন। তিনি লেখাপড়া জানা সন্ন্যাসী। অশিক্ষিত সন্ন্যাসী হলে জগমোহন আশা ছেড়ে দিতেন। না, জগমোহন যে একদিন ব্রজদুর্লভপুর যাবার ইচ্ছা রাখেন, গিরিজা বা পরিতোষকে আজও তিনি বলেননি। এটা তাঁর ভিতরের ইচ্ছা। নিরুপায় দেখলে তাঁকে সেখানেই ছুটে যেতে হবে।

যাই হোক, জগমোহন কিন্তু তখন, পরিতোষের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পুত্র-বধূর কথাই চিন্তা করছিলেন। ছেলেও নির্জীব হয়ে আছে—মাকেও যেন বেশ একটু উদ্‌ভ্রান্ত, অন্যমনস্ক দেখলেন তিনি—মুখখানা ভার ভার।

'কী হয়েছে দাদু, বড়ো চুপচাপ আজ?' নাতির চিবুক ধরে তিনি নাড়া দিতে দীপু মুখ নিচু করে কেমন যেন একটা লাজুক হাসি হাসল। এবং কিছু একটা বলতে গিয়ে যেন থেমে গেল। 'হুঁ, বল, কী হয়েছে—মার শরীর খারাপ করেছে?' জগমোহন নাতির গালের কাছে মুখ নিয়ে গেলেন। অত্যাধিক আদর পেয়ে শিশুর আড়ষ্ট ভাবটা একটু কাটল। দাদুর চোখের দিকে তাকিয়ে সে ফিক করে হাসল। সঙ্গে সঙ্গে জগমোহনের মুখের সামনে কচি হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে একটা আঙুল দেখিয়ে বলল, 'দাদু, মা আংতি—', জগমোহন তৎক্ষণাৎ বুঝে গেলেন, নাতি আংটির কথা কিছু বলছে, রমলার আংটি?

'হুঁ, কী হয়েছে আংটি শুনি?' খপ্ করে নাতিকে কোলে তুলে নিলেন জগমোহন। দীপু আঙুল দিয়ে বাথরুম দেখিয়ে দিল। কিছু একটা আঁচ করে জগমোহন তৎক্ষণাৎ রমলাকে ডাকলেন। রমলা দরজার পাশে এসে দাঁড়াতে তিনি রীতিমতো একটা উদ্বেগ নিয়ে পুত্রবধূকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন। 'দীপু আংটির কথা কী বলছে, বউমা?'

'কিছু হয়নি।' মৃদু গলায় পুত্রবধূ জবাব দিল।

কিন্তু জগমোহন শুধু এই শুনে চুপ করে থাকবার পাত্র নন। দরজার চৌকাঠের কাছে এগিয়ে গেলেন।

'হাত দিয়ে বাথরুম দেখাচ্ছে দীপু, বলছে মার আংটি? তুমি কি ওখানে আংটি হারিয়ে এসেছ?'

'না-তো।' বিব্রত হতে গিয়েও রমলা স্বাভাবিক হাসল। 'আমার মনে ছিল না, কাল ওটা খুলে রেখেছিলাম, তখন বাথরুমে দীপুর জামায় সাবান মাখাচ্ছিলাম, ও কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, আমার খালি আঙুল দেখে ও চেঁচামেচি করছিল, মা তোমার আংটি? আমারও হঠাৎ কেমন খট্‌কা লাগল, সাবান মাখাতে গিয়ে আঙুল থেকে ওটা খুলে পড়ে গেল বুঝি?'

'তারপর?'

'তারপর মনে পড়ল, বাক্সে তুলে রেখেছি।'

শুনে জগমোহনের মুখে হাসি ফুটেছিল। 'তা হলেও তখন তুমি নিশ্চয় জিনিসটা ওখানে খোঁজাখুঁজি করেছিলে?'

কথা না বলে রমলা ঘাড় কাত করল।

'তবে আর আমার দাদুর দোষ কী, সে ভাবল, বাথরুমে আংটি হারিয়ে মা খোঁজাখুঁজি করল, তার পরও যখন ওটা তোমার হাতে দেখছে না—নিশ্চয়ই হারিয়েছে—'

'না, আছে।'

'যাক গে—আমি ভাবলাম কী জানি—' জগমোহন নিশ্চিন্ত হয়ে নাতিকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে ওখান থেকে সরে আসতে আসতে বলেছিলেন, 'তা তোমাদের আজ এত বেলা কেন—এখনো স্নান-টান হয়নি—'

'ওই একটু কাচাকাচি করতে দেরি হয়ে গেল—' পিছন থেকে রমলা বলেছিল, 'আপনি বাথরুমে যান—আমরা পরে যাব।'

জগমোহন খুশি হয়ে নিজের ঘরে এসে গায়ে তেল মাখতে বসেছিলেন।

এখন কথাটা মনে হতে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তবে কি নাতির কথাই সত্য? আসলে বউমা হাতের আংটি হারিয়েছে, আর তাই নিয়ে পরিতোষ চেঁচামেচি করছে? আশ্চর্য কি। মেয়েদের গায়ের জিনিস হারিয়ে গেলে পুরুষ ক্ষুব্ধ হয়, কুপিত হয়। জগমোহনের জীবনেও একবার-দুবার এমন ঘটনা ঘটেছে। পরিতোষের মা ঠিক এমনি বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে কানের একটা রিং হারিয়ে ফেলেছিল। জগমোহন খুব বকাবকি করেছিলেন স্ত্রীকে। পরে অবশ্য জিনিসটা বাথরুমেই পাওয়া গিয়েছিল। তবে কি আজ রমলাও ঠিক এই কারণে পরিতোষের গালমন্দ শুনছে? কিন্তু রমলাও তো চুপ করে থাকছে না! সরযূ চুপ ছিল। স্বামীর গালমন্দ খেয়েও কোনোদিন তার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোত না। সব স্ত্রীই এক রকম হয় না। কপালে অজস্র কুঞ্চন নিয়ে জগমোহন পেয়ালার বাকি কফিটুকু কোনো রকমে

গলাধঃকরণ করে উঠে দাঁড়ালেন। জিনিসটা যেন ক্রমেই বাড়ছে। দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি চড়া গলায় ছেলেকে ডাকলেন, 'পরিতোষ!'

'যাই বাবা!' যেন বাবার ডাকের অপেক্ষায় ছিল পরিতোষ। সঙ্গে সঙ্গে সে জগমোহনের ঘরের দরজায় ছুটে এল।

'ভেতরে এসো, ভেতরে এসো'—জগমোহন ছেলেকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন। 'বোস।' ছেলে বসবার আগেই অবশ্য তিনি নিজের আসনে বসে পড়লেন। 'এত উত্তেজিত দেখাচ্ছে কেন তোমাকে, কী হয়েছে শুনি?'

ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল পরিতোষের। যেন হঠাৎ কথা বলতে তার অসুবিধা হচ্ছিল। জগমোহন স্থির চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন।

'কী নিয়ে তোমাদের ঝগড়া হচ্ছিল? বোস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

কিন্তু পরিতোষ বসল না।

'আমায় বলতে আপত্তি আছে কিছু?' জগমোহন ফের প্রশ্ন করলেন।

'না।' পরিতোষ বাবার মুখটা একবার দেখল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যেন কিছু একটা ভেবে নিল নিজের মনে। তারপর জগমোগহনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বেশ একটু ধরা গলায় বলল, 'তোমার বউমা আংটি হারিয়েছে।'

'অ্যাঁ, তা হলে সত্যি জিনিসটা হারিয়েছে!'

'তখন আমি বউমাকে জিজ্ঞেস করলাম। দীপু আমায় বলল। তবে তো ওর কথাই সত্যি। তাই তো, শিশু কখনো মিথ্যা বলে না।' উত্তেজিত হতে গিয়েও জগমোহন কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলেন। পরিতোষ বাবার দিকে চোখ ফেরাল।

'আমি কিন্তু কাল রাত্রেও ওর হাতে আংটি দেখিনি।'

'আরে তাই তো তখন আমায় বলল বউমা—বাক্সে তুলে রেখেছে।' জগমোহন আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

'মিথ্যা কথা।' পরিতোষের গলার স্বর গমগম করে উঠল।

'আস্তে—আস্তে—' জগমোহন উঠে গিয়ে দরজার পাট দুটো ভেজিয়ে দিয়ে এলেন। তিনি চান না এ ধরনের কথাবার্তা বাড়ির চাকর-দারোয়ানের কানে যাক। 'হুঁ, তারপর? তুমি কী করে বুঝলে বউমা মিথ্যা কথা বলছে বাক্সে তা হলে আংটি নেই?'

'না, আমি কাল রাত্রে ততটা খেয়াল করিনি, ভাবলাম খুলে রাখতে পারে, এখন ফিরে এসে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর ওর বাক্স খুঁজে দেখলাম।'

'তা হলে তো কালই হারিয়েছে জিনিসটা, বাথরুমে হারিয়েছে কি? এখন বউমা কী বলছে?' জগমোহনের চোখের তারা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

পরিতোষ নীরব। তার মুখের পেশী ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছিল। জগমোহন ভাবতে লাগলেন, তারপর কী বলবেন।

'তা আর করবে কী।' একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন তিনি। 'হারিয়েছে হারিয়েছে—এই নিয়ে রাগারাগি করে লাভ নেই। মেয়েরা তাই বলে প্রথমটায়—খুলে রেখেছি, তুলে রেখেছি—হারিয়ে গেছে স্বীকার করতে চায় না, পাছে আমরা গালমন্দ করি। বউমা ভয় পেয়ে আমার কাছেও কথাটা গোপন করতে চেয়েছিল।'

'বাবা!'

জগমোহন ছেলের চোখ দুটো দেখলেন। কেমন লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। অথচ দুই চোখ ছলছল করছে। যেন ক্রোধ কান্না একসঙ্গে ফেটে পড়তে চাইছে।

'কী বলছ, কী বলতে চাও তুমি?' কেমন যেন ভয় পেলেন তিনি পরিতোষের চেহারা দেখে। 'তুমি বোস, বসে আমার সঙ্গে কথা বল।' আঙুল দিয়ে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন জগমোহন।

'ঠিক আছে, বসতে হবে না।' দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে পরিতোষ হঠাৎ কেমন করে যেন হাসল, তারপর বাবার দিকে তাকাল। 'বিয়ের সময় এই আংটি দিয়ে তুমি তাকে আশীর্বাদ করেছিলে, মনে আছে?'

'হ্যাঁ, মনে আছে, কেন মনে থাকবে না। হ্যামিলটনের বাড়ি থেকে নিজে পছন্দ করে আমি এই আংটি কিনে এনেছিলাম। পাথরটার জন্য অনেক দাম পড়েছিল।'

পরিতোষ মুখ তুলে আবার দেওয়াল দেখতে লাগল। রক্তবর্ণ চক্ষু ছল-ছল করছে। অথচ ঠোঁটের আগায় কঠিন শীতল একটা হাসি ঝুলছে। এই হাসি যে দুঃখের পরিতাপের ক্ষোভের ক্রোধের, জগমোহনের বুঝতে কষ্ট হল না।

'কিন্তু এই নিয়ে মাথা গরম করে তো লাভ নেই পরিতোষ। হারিয়ে ফেলেছে বেচারা, এখন করবে কী। চিরকালই কিছু সব জিনিস আমরা ধরে রাখতে পারি না। কিছু কিছু হারাতে হয়। সংসারের এই নিয়ম—'

'তুমি আধ্যাত্মিক কথা টেনে আনছ বাবা—এ সব সুকোমলের কথা। কিন্তু সংসারটা যে আরো অনেক বেশি কঠিন, জটিল এবং কুৎসিতও, এত ঘা খাবার পর নিশ্চয় তুমি অস্বীকার করতে পার না।'

তেতো মতন একটা ঢোক গিললেন জগমোহন।

'তবে কি তুমি বলতে চাইছ বউমা ওটা হারায়নি?'

'না। পরিতোষ আবার ঘনঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

'তবে কী করল সে ওটা, কোথায় রাখল—কাকে দিল—কাউকে দিয়েছে তুমি সন্দেহ করছ?'

'নিশ্চয়।'

'কাকে দিতে পারে!' যেন ছেলের চোখের ভিতর জগমোহন সেই মানুষটাকে খুঁজলেন। 'চুপ করে আছ কেন, বল।'

হাতের মুঠ দৃঢ় করে পরিতোষ একটা গরম নিশ্বাস ফেলল।

'কিন্তু বউমাকে দিয়ে তুমি এমন একটা সন্দেহই বা করছ কেন?' জগমোহন বিড়বিড় করে বললেন। 'আংটিটা তো সে হারাতেও পারে, আমরা কি জিনিস হারাই না।'

'না, হারায়নি, আমি তার চোখ দেখে বুঝতে পারছি।'

তাই তো, স্ত্রীর চোখ দেখে স্বামী তাকে বুঝতে পারে, স্বামীর চোখ দেখে স্ত্রী স্বামীকে বুঝতে পারে, অন্য মানুষ পারে কি! হয়তো পারে না। যদি পারত তো, আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো মানুষটার চোখ দেখে বিচারক রায় দিতে পারতেন লোকটা দোষি কী নির্দোষ, সাক্ষী-প্রমাণের দরকার পড়ত না। কেবল চোখ দেখে স্বামীই বুঝি স্ত্রীকে বিচার করে, স্ত্রী স্বামীকে।

তাই তো। জগমোহনও বিবাহিত। সরযূর চোখের মধ্যে তিনি পুঞ্জ পুঞ্জ ভালোবাসা দেখতেন, কঠোর পতিব্রতা। কিন্তু যদি তিনি স্ত্রীর চোখে উলটো জিনিস দেখতেন? যদি কোনো স্বামী তাই দেখে তো তার দেখার মধ্যে ভুল আছে এ কথা গলা বড়ো করে তৃতীয় ব্যক্তি বলতে পারে কি? এখানে জগমোহন তৃতীয় ব্যক্তি। রমলার চোখের মধ্যে পরিতোষ যদি কিছু দেখে থাকে তো তার সেই দেখা সরাসরি নাকচ করে দেবেন তিনি কোন্ সাহসে। যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে জগমোহন চুপ করে রইলেন। এতক্ষণ তাঁর কপালে একটার পর একটা শুধু রেখা জাগছিল। এবার কপালের শিরাটা মোটা হয়ে ফুলে উঠল।

পরিতোষ আস্তে আস্তে পায়চারি করছিল। তার চোখ জবার মতন লাল কেন, আবার তা ছলছল করছে কেন, দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে এইমাত্র সে হাসছিল কেন, সব তিনি এখন নূতন করে চিন্তা করছিলেন।

'বুঝলে বাবা,' ছেলে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। 'একজন অক্ষয় উকিলের বাড়িতে উদারতা মহানুভবতা দেখাচ্ছে—আর একজন দেখাচ্ছে এখানে।'

'পরিতোষ!' জগমোহন চাপা গলায় গর্জন করে উঠলেন।

'হ্যাঁ, বাবা, এখানে আমার ধারণাই ধারণা, আমার সন্দেহই সব—তুমি কেউ না, তুমি তোমার বউমার ভেতরটা কতটুকু দেখেছ?'

তৃতীয় ব্যক্তি। জগমোহনের মুখটা কালো হয়ে গেল। যেন এ ব্যাপারে আর একটা কথা বলতেও ছেলে তাঁকে নিষেধ করছে।

'সেদিন ভাশুরকে টাকা বার করে দিল। আজ হাতের আংটি খুলে দিয়েছে।' পরিতোষ কথাটা বলে ফেলল।

'কিন্তু টাকার কথাটা বউমা সেদিন স্বীকার করেছিল। নিজে থেকেই তো আমাকে বলল।'

'হ্যাঁ, বলেছিল, যে নিয়েছিল সেও আমায় বলেছিল। কিন্তু এখন বলার বিপদ আছে দুজনেই জানে। সেদিন ঘর থেকে এভাবে টাকা নিয়ে গেল বলে আমরা বিরক্ত হয়েছি, অসন্তুষ্ট হয়েছি—তোমার বউমাও বুঝেছে, বড়োছেলেও বুঝেছে। এখন আর আমি ঘরে টাকা রাখছি না। তোমার কথা মতন ও-ঘর থেকে বড়দার ঘড়ি-আংটি সরিয়ে রেখেছি। কাজেই আজ যদি আবার অক্ষয় উকিলকে সাহায্য করার দরকার হয়ে পড়ে তো এ-বাড়ির কার কাছে এসে তোমার বড়োছেলে হাত পেতে দাঁড়াবে এটা তুমিও অনুমান করতে পার।'

'কিন্তু রমলা যে তার ভাশুরকেই আংটিটা দিয়েছে তেমন তো কোনো প্রমাণ পাচ্ছ না তুমি। পেয়েছ কি?'

'প্রমাণ!' পরিতোষ আবার সেই ইস্পাতের মতন কঠিন ঠান্ডা হাসি ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে দিল। 'প্রমাণ তোমার বউমার একজোড়া চোখ। না, তুমি সেই চোখের ভাষা কী করে বুঝবে। সেটা আমি বুঝব—কোথায় তার দুর্বলতা, কেনই বা—'

'পরিতোষ!' আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জগমোহন ছেলের হাত চেপে ধরলেন। 'চোখে যা দেখনি, কানে যা শোননি—উপযুক্ত সাক্ষী-প্রমাণ যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে কেবল সন্দেহের ওপর ভর করে এমন একটা বিশ্রী জিনিস টেনে আনার বিপদ আছে—এর পরিণাম যে কী ভয়ঙ্কর তুমি বুঝতে পারছ না?'

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পরিতোষ একটু দূরে সরে দাঁড়াল।

'আমি তো খারাপ—কুৎসিত কিছু ইঙ্গিত করছি না, বাবা। বরং ভাশুরের সঙ্গে ভ্রাতৃজায়ার একটা পবিত্র সুন্দর সম্পর্কের কথা এখানে বলা হচ্ছে। তোমরা যাকে ঘৃণা করছ, তোমাদর চোখে যে দুরাচার পাপী সেই মানুষ রমলার চোখে মহৎ উজ্জ্বল দেবতুল্য। হ্যাঁ, তাই সেদিন বলছিল তোমার বৌমা, বড়দার ওপর আমরা অন্যায় করছি, অবিচার করছি—কাজেই, প্রমাণ চাইছ. এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কিছু আছে কিনা একবার চিন্তা করে দেখো।'

জগমোহন দু হাতে মুখ ঢাকলেন।

॥ ৩৭ ॥

তাই চিন্তা করছিল রমলা। কেবল মানুষের অভিশাপ কুড়াতে হতভাগ্য পরিমল এই পৃথিবীতে এসেছে। রমলার মনেও কি একটা বিশ্রী সন্দেহ থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছিল না? চেষ্টা করেছে সে সন্দেহটা যাতে কোনো মতেই মনের মধ্যে এসে বাসা বাঁধতে না পারে। কিন্তু তবু যেন সে পারছিল না, একটা কালো কুৎসিত সন্দেহের কাছে তাকে হার মানতে হয়েছিল, আর তখন তার দুই চোখ জলে ভরে উঠেছিল।

কাল বিকেলে, তারপর সমস্ত রাত সে ছটফট করেছে, কেঁদেছে। ভোরের দিকে মন একটু শান্ত হয়েছিল। কেননা তখন সে বুঝতে পেরেছিল, এখানে সে অসহায়, এ-বাড়ির বাতাসে সন্দেহের বীজাণু ছড়িয়ে আছে, সেই জিনিস রমলার মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছিল। আসলে এই সন্দেহের বিষ ছড়াচ্ছে তার শ্বশুর জগমোহন, স্বামী পরিতোষ—তবু তো তাঁরা কথাটা শোনেননি। শুনলে জটিল হয়ে উঠত দুজনের চোখ, রুদ্ধশ্বাস হয়ে সঙ্গে সঙ্গে রায় দিত; পরিমল, পরিমল জিনিসটা তুলে নিয়ে গেছে—যে খুন করতে পারে সে চুরিও করতে পারে, বরং খুনের চেয়ে চুরি সহজ। সহজ হোক কঠিন হোক, এই কাজ সে করতই, এমন হীন জঘন্য কাজ করতেই সে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে। জগমোহনের দুর্ভাগ্য তাঁর সন্তান হয়ে সে এই সংসারে এসেছে, পরিতোষের দুর্ভাগ্য, এই মানুষ তার অগ্রজ। ছোটো ভাইয়ের স্ত্রীর গায়ের গয়না কুড়িয়ে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেটা হজম করার দুর্লভ প্রতিভা এ বাড়িতে এই একটি মানুষ ছাড়া আর কার আছে। তাই রমলা ভয় পেয়ে চুপ করে ছিল।

আংটি হারায়নি। বাক্সে তুলে রেখে দিয়েছে। শ্বশুরকে একথা বলতে হয়েছে। স্বামীকেও তাই বলেছে। কেননা জিনিসটা হারিয়েছে জানাজানি হলে অনেক কথা উঠত। কখন হারাল কীভাবে হারাল। কাল বিকেলে গা ধোয়ার সময় হাত থেকে আংটি খুলে পড়ে গিয়েছিল। তা না হয় পড়ে গেল, সাবান-টাবান মাখতে গিয়ে অসাবধানে আঙুল রগড়াচ্ছিল, তখন হয়তো—জগমোহন তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করতেন, তুমি বেরিয়ে আসার পর বাথরুমে কে ঢুকেছিল? পরিমল গিয়েছিল। রমলাকে উত্তর দিতে হত। বেশ তো, পরিমল তো যাবেই, বাড়িতে থাকলে এ সময় সে একবার বাথরুমে যায়—কিন্তু আংটি যে আঙুলে নেই কখন তুমি টের পেলে, বাথরুমে থাকতে থাকতে কি শূন্য আঙুলটা তোমার চোখে পড়ল? না, রমলাকে উত্তর দিতে হত, তা হলে তো অমি তখনই খুঁজতাম। যখন হাতের দিকে চোখ পড়ল তখন আবার চট্ করে বাথরুমে ফিরে গিয়ে জিনিসটা খুঁজে দেখা সম্ভব হল না। তখন পরিতোষের দাদা ভিতরে মুখ হাত ধুচ্ছিল। তারপর? পরিমল বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে

তুমি সেখানে গিয়েছিলে কি? রমলাকে ঘাড় নাড়তে হত। গিয়েছিল সে, কিন্তু আংটি আর খুঁজে পায়নি।

তবে জিনিসটা কোথায় গেল?

সঙ্গে সঙ্গে পরিতোষের চোখ দুটো কুটিল হয়ে উঠত। যদি কারো হাত না লাগবে—দেখতে পেয়েই তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে না ফেলবে তো বাথরুম থেকে এ জিনিস যাবে কোথায়? যদি জলনিকাশের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে থাকে? উঁহু, পরিতোষ ব্যস্ত হয়ে মাথা নাড়ত। তার নিজের হাতের তৈরি বাড়ি—বাথরুম কিচেন পায়খানার কোথায় কটা ছিদ্র আছে, জল বেরোবার জন্য কোন দিকে কটা পাইপ বসানো হয়েছে সব তার মুখস্থ। নূতন বাড়ির নূতন বাথরুম। চমৎকার ফ্লোর। এতটুকু ময়লা আবর্জনা জমতে পারে না, ভিতরের জল সরবার জন্য একটা ছিদ্র রাখা হয়েছে বটে, কিন্তু সেই ছিদ্রপথে বোতামটাও যাতে গলে বেরিয়ে যেতে না পারে সেভাবে পাইপের মুখে তারের জাল লাগানো রয়েছে। বাথরুম যখন তৈরি করা হয় তখন কি পরিতোষ জানত না যে, তার স্ত্রী একদিন এখানে স্নান করবে গা ধোবে—স্নানের সময় কানের রিংটা গলার নেকলেসটা কী হাতের আংটিটা টুক করে এক সময় খুলে পড়ে যাওয়া বিচিত্র না, কিন্তু তা হলেও জিনিসটা কোনোমতেই যাতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে যেতে না পরে সেভাবে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সুতরাং—

তবে কি রমলা অন্য কারো নাম বলত? ঝি চাকর দারোয়ান? বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর ঝি চাকরদের কেউ বাথরুমে ঢুকেছিল? চাকর দারোয়ান অবশ্য ওপরের বাথরুম ব্যবহার করে না, তাদের স্নান পায়খানার জায়গা নীচে। কিন্তু তা হলেও দীনদয়ালকে বাথরুমে ঢুকে জগমোহনের অথবা পরিতোষের ছেড়ে আসা কাপড়টা গামছাটা ধুয়ে কেচে আনতে হয়, থালাটা গেলাসটা ধুতে, বাইরে আলাদা কল থাকা সত্ত্বেও, ঝি চাকরেরা সময় সময় বাথরুমে ছুটে যায়। কিন্তু কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রমলা বুকের ভিতর একটা ধাক্কা অনুভব করেছে। নিজের ওপর ঘৃণা হল। স্বামী ও শ্বশুর যে তখন ঝি-চাকরদের খামকা সন্দেহ আরম্ভ করবে, এমন কি আংটি বের করে দেবার জন্য তাদের ওপর চাপ দেওয়াও আশ্চর্য না। বিনাদোষে বেচারারা নিগ্রহ গঞ্জনা ভোগ করবে। না, তা হয় না।

নিরুপায় হয়ে রমলা ভাবছিল কী করা যায়। আংটি খুঁজে না পেয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে সে ঘরে ঢুকছিল, জুতোর শব্দ শুনে চমকে উঠে করিডোরের দিকে ঘাড় ফেরাতে ভাশুরকে দেখতে পেল। সেজেগুজে বেরোচ্ছে পরিমল। সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে যাচ্ছে। মুহূর্তে রমলার অন্তরাত্মা ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। যেন চিৎকার করে তার বলতে ইচ্ছা হল, ঐ তো সেই মানুষ যে আমার আংটি কুড়িয়ে পেল, অথচ টুঁ শব্দটি না করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এখনি দোকানে গিয়ে যে-কোনো দামে জিনিসটা বেচে দেবে। তারপর টাকা নিয়ে ছুটবে বালিগঞ্জ অক্ষয় উকিলের বাড়ি—হয়তো সেই সঙ্গে কম দামের আর একটা আংটিও কিনে নিয়ে যাবে। দামটা এখানে বড়ো কথা নয়, উপহারটাই আসল। অক্ষয় উকিলের বাচ্চা মেয়েকে উপহার দিতে যাচ্ছে। তাই তো রোজ পরিতোষের মুখে শুনছে রমলা, মেয়েটার ওপর ভীষণ লোভ হয়েছে তার জেলফেরত দাদার। দুষ্টু পারভার্ট অপবিত্র শয়তান—তুমি আমার আংটি ফিরিয়ে দাও—তুমি ছাড়া আর কে নেবে জিনিসটা, তুমিই তো এইমাত্র বাথরুম থেকে বেরিয়ে

এসেছ—এখানি ফিরিয়ে দাও, না হলে আমি ফোন করে পুলিসে খবর দেব—চোর আমার গায়ের গয়না নিয়ে পালিয়ে গেল! উত্তেজিত হয়ে রমলা রেলিং-এর কাছে ছুটে গেল। আর দেখা গেল না চোরকে। ততক্ষণে সব কটা সিঁড়ি পার হয়ে সে নীচে অদৃশ্য হয়েছে। রমলা তৎক্ষণাৎ ব্যালকনিতে ছুটে গেছে। সেখানে দাঁড়ালে সদর রাস্তা দেখা যায় কিন্তু সেদিকে চোখ পড়তে তার সমস্ত উত্তেজনা প্রগল্‌ভতা দ্বেষ রাগ চঞ্চলতা এক ফুঁয়ে নিভে গেল। তাই তো, কী দেখছে সে, কাকে দেখছে। কোথায় সেই চোর, শয়তান। হেমন্তের সোনালি আলোয় ভরা নীল আকাশের নীচে একটি সুন্দর মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। শিশুর সরল কৌতূহল তার দুই চোখে। অবাক হয়ে হয়ে রাস্তার দুপাশের রাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়া গাছগুলি দেখছে, থমকে দাঁড়াচ্ছে কখনো, কান পেতে পাখিদের কিচিরমিচির শুনছে। তারপর আবার হাঁটছে। বোঝা যায় পাখির কলরব হেমন্তের বেলা শেষের নরম রৌদ্র উর্ধ্বশির গাছের সারি পাতার মর্মর তার অত্যন্ত প্রিয়, মনে হয় তার ভিতরটা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন পবিত্র, তাই এত সব সুন্দর জিনিসের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে মিশিয়ে দিতে চাইছে। পারছে না। তেমন করে আকাশের আলো গাছের সবুজের সঙ্গে একাত্ম হতে গিয়ে বাধা পাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে, চঞ্চল শিশু পাখির মতন আকাশে উড়তে গিয়ে যেমন বাধা পায়—তারপর ম্লান হতাশ চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে উড়ন্ত পাখিটাকে দেখে। যেন সেই বিষণ্ণতা হতাশা এই মানুষটির চোখে।

রমলার চোখে জল এল। কে বলবে এই মানুষ সরযূধামে থাকে, জগমোহনের সন্তান, পরিতোষের ভাই? তার পরিচয় ঐখানে, রৌদ্র-ছায়ার চিকরিকাটা আলপনা মাথায় পিঠে নিয়ে পাখির গান শুনতে শুনতে যে পথ চলছে। মানুষটিকে আর দেখা যাচ্ছিল না। রমলা ঘরে ফিরে এল। নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হচ্ছিল তার। ছি, ছি, আংটি হারানো তারপর বাথরুমে গিয়ে জিনিসটা খুঁজে না পাওয়ার সঙ্গে পরিমলকে সে জড়াতে চেয়েছিল কোন্ সাহসে—পরিমল কখনো এ কাজ করবে না।

তখনই রমলা ঠিক করে ফেলল, তার আংটি হারায়নি, বাক্সে তুলে রেখেছে। কিন্তু তা হলে হবে কী, একটা সন্দেহের রন্ধ্র বন্ধ করতে গিয়ে রমলা দেখল আর একটা সন্দেহ ফণা তুলে ধরেছে। সব কটা বাক্স খুঁজে দেখল পরিতোষ। কোন্ বাক্সে রেখেছিলে, মনে নেই? না, রমলা উত্তর করেছিল, মনে থাকলে আমি নিজেই টুক করে জিনিসটা বার করে তোমাকে দেখাতে পারতাম। তাই তো, ট্রাঙ্ক, সুটকেশ ওয়াড্রব উল্টেপাল্টে জিনিসপত্র ছত্রখান করে পরিতোষ শেষটায় হাল ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মিথ্যা কথা, বাক্সে তোলা হয়নি ঐ জিনিস। তবে হারিয়ে ফেলেছি—যেন নিরুপায় হয়ে রমলা উত্তর করেছিল। পরিতোষ মাথা নেড়েছিল, তা-ও না। কাউকে দিয়ে দিয়েছ বিয়ের আংটি। কাকে দেব—এ তুমি কী বলছ। রমলার দুই চোখ জ্বালা করে উঠেছিল। আমি যা বলছি তা একবর্ণও মিথ্যা নয়। পরিতোষের ঠোঁটের আগায় ইস্পাতের মতন কঠিন শীতল হাসিটা তখন থেকে উঁকি দিতে শুরু করেছিল। মাঝে মাঝে তুমি এমন উদারতা দেখিয়ে থাক, যেমন সেদিন চাওয়ামাত্র ভাশুরকে একশ টাকা বার করে দিলে। তুমি কী বলছ, কী বলতে চাও—রমলা চিৎকার করে উঠেছিল। কিন্তু তখন জগমোহনের ডাক শুনে পরিতোষ ছুটে ওঘরে চলে গেছে। পাথরের মতন স্থির স্তব্ধ

হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রমলা। তারপর তার চোখে মুখে একটা কঠিন সংকল্প, দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাব ফুটে উঠল। মনে মনে সে বলল, হ্যাঁ, দিতাম বৈকি, পরিমল এসে আমার কাছে যদি আবার হাত পাতত আমি 'না' বলতে পারতাম না, মানুষটার টাকার দরকার, আমার কাছে টাকা নেই, বিয়ের আংটি তাকে দিতাম। আরো কিছু গয়না দিতাম। কেবল অক্ষয়বাবুকে সে সাহায্য করছে বলে নয়, বুলাকে এটা ওটা কিনে উপহার দিচ্ছে বলেই তাকে আমার দিতে হত।

অন্য দিন হলে পরিতোষকে কথাটা বোঝাতে পারত না রমলা। আজ পারবে।

তার চোখের সামনে এখন একটা আলো জ্বলছে। কাল বিকেলে এই আলো প্রথম জ্বলে উঠল। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে যখন সে রাস্তার সেই বয়স্ক শিশুটিকে দেখল, বলা যায় তখনই রমলার মধ্যে একটা নূতন বোধ, একটা নূতন দৃষ্টি জন্ম নয়। যে পিপাসা নিয়ে পরিমল আকাশের আলোর দিকে তাকাচ্ছে, যে আকুলতা নিয়ে পাখির গান শুনছে, সেই তৃষ্ণা সেই আকুলতা নিয়ে সে বালিগঞ্জ ছুটে যাচ্ছে। স্বাভাবিক। একটি আঠারো বছরের শুভ্র পরিচ্ছন্ন যৌবন তার হৃদয়ে দোলা দিয়েছে। চোখে হেমন্ত অপরাহ্নের লালাভ-রৌদ্রের স্বপ্ন, রক্তে এক ঝাঁক পাখির কিচিরমিচির, নিশ্বাসে কৃষ্ণচূড়ার পাতার মর্মর—তার অন্তরে যদি গোলাপ কলির মতন সুন্দর পবিত্র একটি কুমারী গান গেয়ে না উঠবে তো সে পরিপূর্ণ হবে কেমন করে!

কিন্তু জগমোহন ও পরিতোষের স্থূল দৃষ্টিতে এটা লোভ, পাপ।

রমলা তা ভাববে কেন। কেন জানি হঠাৎ নিজের কুমারী বয়সের কথা তার মনে পড়ল। সেই আশ্চর্য এক একটা দিন। ভোরের আলো দেখে হৃদয় চমকে উঠছে, সন্ধ্যা-তারার দিকে তাকালে দুই চোখ ছলছল করে উঠত।

পরিমলের সৌন্দর্য-সাধনাকে সে মনে মনে প্রণাম না জানিয়ে পারল না। এটা কি প্রেম, রমলার মনে হল, প্রেমের চেয়েও বড়ো কিছু। সুন্দরের মধ্যে শিল্পী নিজেকে খুঁজছে, রূপের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে সে নবজীবন লাভ করবে। এখানেই তার সাধনার সিদ্ধি, প্রেমিক পরিমলের উত্তরণ। বিশাখার প্রেমের মধ্যে প্রাপ্তির আশা করেছিল সে। প্রেমের বিনিময়ে প্রেম লাভ। কিন্তু আজ যেন তার পাওয়ার কিছু নেই, শুধু দিয়ে যাওয়া। আকাশের আলোর মধ্যে পাখির গানের মধ্যে সদ্য প্রস্ফুটিত যৌবনের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে সে সাথর্ক হতে চায়। রমলার মনে হচ্ছিল আজ যদি তার এই রূপ-পূজার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়ায় তো পরিমল বুঝি তার বুকে ছুরি বসাবার আগে নিজের বুক পেতে দেবে। বলবে, আগে আমার বুকের গান স্তব্ধ করে দাও, তারপর তুমি তোমার অন্তরের গান শুনো।

সেদিন ঘুমন্ত পরিমলের চোখের কোণায় জলের ফোঁটা দেখতে পেয়েছিল রমলা, কান্নার কারণ খুঁজতে গিয়ে অনেক কিছু ভাবতে হয়েছিল তাকে। আজ সে বুঝতে পারল কেন এই কান্না, কীসের জন্য কান্না।

জগমোহনের ঘরে পরিতোষের গলা গমগম করছিল। তার অভিযোগের শেষ ছিল না।

রমলা বিচলিত হল না।

স্বামী ও শ্বশুরের কাছে সে মিথ্যা কথা বলছে। কিন্তু একটা প্রকাণ্ড সত্য তার বুকের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে, তাই মিথ্যার গ্লানি তাকে একটুও স্পর্শ করল না। দীপু ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। রমলা তার দুধ গরম করতে বসল।

গিরিজাকে ফোন করে জানিয়ে দিল রীনা। খবরটা শুনে গিরিজা দুশ্চিন্তায় পড়ল। তাই তো, কোথায় যেতে পারে বিশাখা! শনিবার বেলা দুটোয় রীনার স্কুল ছুটি হয়ে যায়। সেদিন একটু বেশি সময় সে ডাফ্ স্ট্রীটের বাড়িতে থাকতে পারে। বিশাখার ঘরের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখে, ময়লা শাড়ি জামাগুলি ধোপাবাড়ি পাঠিয়ে দেয়, আলমারি টেবিলটা সাজিয়ে রাখে। বিশাখার তো এসব খেয়াল থাকে না, জিনিসপত্র টানছে নামাচ্ছে বার করছে, তারপর ব্যবহার করুক না করুক, যেখানে খুশি সেখানে ফেলে রাখছে ছড়িয়ে রাখছে।

কিন্তু দিদিকে আজ ঘরে দেখতে না পেয়ে রীনা খুবই অবাক হল। কদিনের মধ্যে মানুষটা বেরোচ্ছে না, হঠাৎ আজ কোথায় গেল। স্কুলে যাবে না। ছুটিতে আছে।

কুসুম বলল, 'আমি বার বার শুধোলাম, কোথায় যাচ্ছ দিদিমণি—বলল, একটু কাজ আছে, এখনি ফিরছি।'

পাশের ঘরের প্রীতিলতাও রীনাকে তাই বলল। 'অসুস্থ মানুষ, বললাম, এই রোদ্দুরে কোথায় বেরোচ্ছেন, কিন্তু আমার কথার কোনো উত্তর দিলেন না—আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।'

কুসুম বলল, 'আমার মনে হয় মা ঠাকরুনকে দেখতে গেছে বড়দিমণি।'

রীনা সব শুনল, শুনে চুপ করে রইল। অবশ্য কুসুমের মুখে রীনা এর আগের ঘটনাটুকুও শুনল। বালিগঞ্জ থেকে ফিরে এসে কুসুম বিশাখার কাছে সেই খুনে ও অক্ষয় উকিলের বাড়ির গল্পটা বলেছিল—শুনে বিশাখা কেমন করে হেসেছিল, হাসতে হাসতে শেষটায় তার চোখ দিয়ে কত জল গড়াতে আরম্ভ করেছিল। শুনে রীনা গম্ভীর হয়ে গেল। কুসুমকে কিছু বলল না, কেননা অনিষ্ট যা হবার হয়ে গেল, এত সাবধান থেকেও তারা শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারল না, যেন অমোঘ নিয়তির মতন বিশাখার কানে কথাটা উঠল।

তারপর আর রীনা সেখানে অপেক্ষা করেনি। বেরিয়ে গিরিজাকে একটা ফোন করে দিয়ে তখনি বালিগঞ্জের বাস ধরেছে। যতীন দাস রোড, এমন কী গোঁসাইপাড়া বস্তিটা পর্যন্ত রীনা খুঁজে এল। বিশাখাকে দেখতে পেল না। তারপর সে রিচি রোড ফিরে গেছে। কী জানি সত্যি যদি বিশাখা মাকে দেখতে যায়। কিন্তু সেখানেও বিশাখা ছিল না। বাড়িতে এসব কিছুই বলল না রীনা। চুপ করে আবার সেখানে থেকে বেরিয়ে এসেছে।

এভাবে রীনা যখন বালিগঞ্জের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বিশাখাকে খুঁজছিল তখন গিরিজার কাছে জগমোহন টেলিফোন করলেন ঃ 'আমি ভয়ংকর বিপদে পড়েছি—আমার সঙ্গে দেখা করবে, জরুরী কথা আছে।' গিরিজা তাঁকে আশ্বাস দিল, এখন সে যেতে পারছে না, সন্ধ্যার পর নিশ্চয়ই দেখা করবে। টেলিফোন নামিয়ে রেখে গিরিজা কিন্তু জগমোহনের বিপদের কথা মোটেই ভাবছিল না, চিন্তা করছিল রীনার জন্য, মাথা-পাগলা বোনটার জন্য বেচারাকে

কী ভীষণ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। কিন্তু এ সমস্ত অশান্তি ও দুর্ভোগের মূলে যে মানুষটি রয়েছে গিরিজা তার কথাই বেশি ভাবল। পারভার্ট, স্কাটড্রেল লোফার। মনে মনে অনেক কিছু গালিগালাজ করল সে পরিমলকে। ঘৃণা তো বটেই—ক্রমশ যেন একটা আক্রোশ গিরিজার মনে দানা বেঁধে উঠছিল। একদিন তার এত প্রিয় ছিল যে লর্ড, আজ গিরিজা চিন্তা করছে, লোকটাকে কী করে জব্দ করা যায়, বেশ ভালোমতন শিক্ষা দেওয়া যায়। বালিগঞ্জের দু চারটি গুণ্ডা প্রকৃতির ছেলের সঙ্গে তার জানাশোনা আছে। তাদের লেলিয়ে দেওয়া যায় কিনা এমন চিন্তাও সে করল। অক্ষয় উকিলের বাড়ি যাওয়া পরিমলের বন্ধ করতে হবে। ওই দরজা বন্ধ হলে বিশাখার কাছে সে ফিরে আসতে পারে। আসবেই। কামুক—নারীমাংসলোলুপ, নারী-সঙ্গ ছাড়া যে জগমোহনের বড়ো ছেলে একদিনও থাকতে পারবে না এ-সম্পর্কে গিরিজা এখন নিঃসন্দিগ্ধ হতে পেরেছে।

॥ ৩৮ ॥

'একটু শীত শীত করছে।'

'তা তো করবেই, কার্তিকের হিম পড়তে আরম্ভ করেছে।' বুলার চোখের দিকে তাকাল সে। ফোলা ফোলা চোখ। হয়তো সবে ঘুম থেকে উঠে এসেছে বলে এমন দেখাচ্ছে, পরিমল ভাবল। কিন্তু বাঁ চোখের কোণাটা বেশ লাল হয়ে আছে না? করমচার কথা মনে পড়ল পরিমলের।

'তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে।'

'কী করে বুঝলেন?' বুলা পাল্টা প্রশ্ন করল।

গম্ভীর হয়ে পরিমল অন্য দিকে চোখ ফেরাল। 'বোঝা যাচ্ছে, তোমার চোখ মুখ দেখে আমি বুঝতে পারছি।'

ঝপ্ করে নিলয় বলল, 'কাল রাত্রে ও খুব কেশেছিল, পরিমলদা।'

'তাই নাকি? তবে তো—' পরিমল বলতে আরম্ভ করেছিল।

নিলয়কে ধমক লাগাল বুলা।

'তুই চুপ কর—উঃ সারারাত বাবু কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত যেন শুনেছিলেন, আমি কেশেছিলাম—' তারপর পরিমলের চোখে চোখ রেখে সে হাসল। 'একটু ও বিশ্বাস করবেন না ওর কথা, ভীষণ বানিয়ে বলতে পারে।'

'কে? আমি? আমি বানিয়ে বলছি—' নিলয় ক্ষেপে গেল, বেঞ্চির ওপর পা গুটিয়ে জানালা ঘেঁযে কুঁজো হয়ে বসেছিল, দিদির কথায় তার আত্মসম্মানে লেগেছে বোঝা গেল, ক্রুদ্ধ উত্তেজিত হয়ে পিঠ টান করে বসল।

'না না, ও বানিয়ে বলবে কেন,' নিলয়কে সান্ত্বনা দিতে পরিমল তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল। তারপর বুলার দিকে ঘাড় ফেরাল। 'নিশ্চয় দু'একবার কেশেছিলে। তুমিই বা এ কথায় এত চটছ কেন—'

পরিমলের কথা ভালো করে শেষ হল না। বুলা খুক্ করে কেশে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মুখে আঁচল চাপা দিল। কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হল না। বরং চাপা পড়ে কাশির ধমকটা

বেড়ে গেল। দু'তিনবার তাকে জোরে কাশতে হল। মুখটা লাল হয়ে উঠল বুলার। কাশির জন্য নয়। এভাবে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল বুলা।

'কেমন, হয়েছে তো!' নিলয় বেজায় খুশি। চোখ বড়ো করে দিদির দিকে তাকাল। 'কে সত্যবাদী কে মিথ্যাবাদী ঈশ্বর তা সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দিলেন।'

নিলয়ের ঈশ্বরভক্তি পরিমলকে মুগ্ধ করল বইকি।

কিন্তু তা হলে বুলা চুপ করে থাকল না।

'আমার একটুও ইচ্ছে ছিল না তোকে সঙ্গে আনি—মাও বারণ করেছিল—এসে আমার সঙ্গে কেবল ঝগড়া করছিস।'

'আহা আমি যেন ওর সঙ্গে এসেছি—' নিলয় ভেংচি কাটার মতন মুখ করল। 'পরিমলদা আমায় নিয়ে এসেছে।'

ভাইবোনের ঝগড়া পরিমল উপভোগ করল। তা হলেও সে এদিক ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল—কামরাটা একরকম ফাঁকা। ওধারের একটা বেঞ্চিতে দু তিনজন যাত্রী বসে আছে। নিজেদের মধ্যে কী নিয়ে যেন গল্প হচ্ছে। পিছনের একটা বেঞ্চিতে এক বৃদ্ধ কানে মাথায় মাফলার জড়িয়ে চুপ করে বসে খবর কাগজ পড়ছে। পরিমল নিশ্চিন্ত হল। এত সকালে আর ট্রেনে চেপে গাঁয়ের দিকে যাচ্ছে কে। বরং ওদিকে—কলকাতার দিকে যে সব ট্রেন যাচ্ছিল সেগুলিতে যাত্রীর ভিড়। তাই তো হবে। ভালো করে রাত না পোহাতে যেখানে হাটবাজার কলকারখানা এবং আরও হাজার-রকম কাজ কারবার আরম্ভ হয়ে যায়। এখন ক'টা বাজে? সোওয়া সাতটা, পরিমল অনুমান করল। নিলয় ও বুলার মাথার পিছনে জানালার ওপারে লাল টকটকে সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছে। কত কাছে মনে হয়—কত নীচে এখনো। ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। আলতার মতন লাল টলটলে রোদ জানালা দিয়ে বুলার ও নিলয়ের মাথার কাঁধে এসে পড়েছে। জানালার দিকে ওরা যতবার মুখ ফেরাচ্ছে দুজনের গাল চিবুক কান টুকটুকে লাল হয়ে উঠছে। আর বার বার তাদের বাইরের দিকে তাকাতেও হচ্ছিল। গভীর উৎসাহ নিয়ে ভাইবোন সবুজ মাঠ ধানক্ষেত খড়ের ঘর বনবাগিচা গোরু'মোষ পাখি ফড়িং প্রজাপতি দেখছিল। এসব দেখতেই তারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। পরিমল তাদের নিয়ে এসেছে। নিলয় ধান ক্ষেত দেখেনি, বুলা নাকি আজও মাছরাঙা পাখিটা চিনতেই পারল না—বালিগঞ্জে মাছরাঙা নেই। শুনে অক্ষয়বাবু ও অক্ষয়বাবুর স্ত্রী হাসাহাসি করেছিলেন। অক্ষয়বাবু বলছিলেন, ক' বছর আগেও এই বালিগঞ্জের আশেপাশেই ধানেক্ষেত দেখা গেছে—মাছরাঙ্গা পানকৌড়ি বিস্তর চোখে পড়ত। খানা ডোবা মাঠ বন কত ছিল! এখন সব অদৃশ্য হয়েছে। বাড়ি গাড়ি, চওড়া চওড়া রাস্তা, পার্ক দোকান আর ইলেকট্রিক আলো নিয়ে বালিগঞ্জ এখন স্বপ্নপুরী—আগের চেহারা থাকলে ওরা সবই দেখত পেত। পরিমলের সামনেই এসব কথা হচ্ছিল। তারপর ঠিক হয়েছে, পরিমল নিলয় ও বুলাকে একদিন ট্রেনে করে বালিগঞ্জের দু তিনটা স্টেশন পরেই কোনো একটা গ্রামে নিয়ে গিয়ে ধানক্ষেত মাছরাঙা ইত্যাদি দেখিয়ে আনবে।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল বাসে করে ওদিকটায় যাওয়া হবে। টালিগঞ্জের খাল পার হয়ে

একটু এগিয়ে গেলেই ক্ষেত খানাডোবা দেখা যাবে। কিন্তু বুলা ও নিলয় তৎক্ষণাৎ বায়না ধরেছিল, তারা রেলগাড়ি চড়ে বেড়াতে যাবে। ট্রামবাস তো বলতে গেলে রোজই তারা দেখছে চড়ছে' রেলগাড়ি চেপে যদি গাঁয়ের দিকে না গেল তো বেড়িয়ে মজা কোথায়। অক্ষয়বাবু শেষটায় তাতেই রাজি হন। অবশ্য বুলার মা প্রথম থেকেই ছেলেমেয়েদের কথায় সায় দিয়ে আসছিলেন। অক্ষয়বাবু সবদিক চিন্তা করে পরে বলেছিলেন, বেশ তাই হবে, শহরের এটা ওটা তো ওরা দেখছেই—পরিমলের জন্যই অবশ্য দেখা হচ্ছে। তা ছোটোখাটো ট্রেনজার্নি ভালোই হবে। সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে—দুপুরের আগের ফিরে আসবে। দুপুরে পরিমল এখানে খাবে।

পরশু বিকেলে এসব কথা হচ্ছিল। আজ মুসলমানদের কী একটা পরব উপলক্ষে নিলয়ের স্কুল ছুটি। এই জন্য আজই তারা বেড়াতে বেরোবার সুযোগ পেল। ভোর পাঁচটায় পরিমলের ঘুম ভেঙেছিল। তখন জগমোহন প্রাতর্ভ্রমণ করতে বেরোচ্ছিলেন। পরিমলকেও তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়। নারকেলডাঙ্গা থেকে বালিগঞ্জ তো কম দূর নয়। বাসে করে অতটা পথ আসতেই এক ঘণ্টার বেশি লেগে গেছে। সাড়ে ছটায় বুলা ও নিলয়কে নিয়ে অক্ষয়বাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরিমল যখন বালিগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছয় তখন প্রায় সাতটা বাজে। অক্ষয়বাবুর স্ত্রী পরিমলকে একটু চা না খাইয়ে ছাড়বেন কেন। তাই সেখানে একটু দেরি হয়ে গেল। অক্ষয়বাবুর স্ত্রী কাল রাত্রেই নিলয়কে দিয়ে কাদের একটা ফ্লাস্ক চেয়ে এনেছেন। একটু বেলায় পরিমল যাতে রাস্তায় আবার একটু চা খেতে পারে সেই ভেবে ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা করে দিয়েছেন। কেবল কি চা, সবাই রাস্তায় খাবে বলে শেষ রাত্রে উঠে পরটা, আলুর দম—এসবও তৈরি করেছেন তিনি। খাবার এবং চায়ের ফ্লাস্কটা বুলার নূতন প্লাস্টিকের ঝুড়িটার মধ্যে বসিয়ে দিয়ে সেটা নিলয়ের হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু নিলয় ঝুড়িটা বয়ে নিতে প্রথমটায় আপত্তি করেছিল বলে অক্ষয়বাবুর স্ত্রী ছেলেকে ভীষণ ধমক লাগিয়েছিলেন—তোমার যেয়ে কাজ নেই, রাস্তায়ও এমন গোলমাল করবে—হয়তো বুলার সঙ্গে ঝগড়া করতে শুরু করবে—হয়তো পরিমলের কথাবার্তাও শুনতে চাইবে না। অত্যন্ত অবাধ্য হয়েছ তুমি। নিলয় আর আপত্তি না করে তৎক্ষণাৎ ঝুড়িটা তুলে নিয়েছিল।

ট্রেনে উঠে নিলয়ের হাত থেকে খাবার ঝুড়িটা নিয়ে পরিমল সেটা বাঙ্কের ওপর বসিয়ে দিয়েছে। সেদিন বুলার চশমা কিনতে গিয়ে পরিমল বুলা ও নিলয়ের জন্য আরো কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনে ফেলেছিল। সেগুলি বয়ে আনবার সুবিধার জন্য ধর্মতলা থেকে সবুজ রঙের সুন্দর ঝুড়িটাও কেনা হয়েছিল। সেটার দিকে হঠাৎ চোখ পড়তে পরিমলের এখন কথাটা মনে পড়ল এবং এইমাত্র বুলা যে ছোটো ভাইকে বলছিল, মা তাকে তাদের সঙ্গে আসতে দিতে চাইছিলেন না—তাও যে ওই ঝুড়িটা কেন্দ্র করে অক্ষয়বাবুর স্ত্রী নিলয়কে কথাটা বলেছিলেন পরিমলের তা-ও মনে পড়ল।

জানালার পাশে একটা বেঞ্চিতে ভাইবোন বসেছে। পরিমল ভিতরের দিকের একটা বেঞ্চিতে বসেছে। তাই দুজনকে মুখোমুখি সে দেখতে পাচ্ছিল।

কিন্তু পরিমল জানে না, পরিমলের সঙ্গে নিলয়ের বেড়াতে আসা নিয়ে নয়, বুলার আসা নিয়ে আর একজন ভয়ংকর আপত্তি তুলেছিল। রাত্রে বাড়ি ফিরে কথাটা শোনা মাত্র প্রলয় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল। 'তোমরা কি পাগল হয়ে গেছ মা!' মাকেই বলেছিল সে। বুলার সেই ছোটো ঘরটায় অক্ষয়বাবুর স্ত্রী তখন ছেলেমেয়েরা কোন শাড়ি পরে কোন জামাপ্যান্ট পরে সকালে উঠে পরিমলের সঙ্গে বেড়াতে যাবে সেগুলি বেছে ঠিক করে এক জায়গায় গুছিয়ে রাখছিলেন। প্রলয় হনহন করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। এবং পাশের ঘরে অক্ষয়বাবুও যাতে শুনতে পান সেভাবে গলা উঁচু করে সে বলেছিল, 'নিলয় বলছে কাল নাকি তারা রেলগাড়ি চড়ে ডাক্তারের ছেলের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে, তোমরাই নাকি অনুমতি দিয়েছ—তাই জিজ্ঞেস করছি, তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?' অক্ষয়বাবুর স্ত্রী কথা বলছিলেন না। মুখ নিচু করে হাতের কাজ শেষ করেছিলেন। কারণ পরিমলের সঙ্গে বুলার বেরোনো নিয়ে প্রলয় দুদিন ধরে ভীষণ রাগারাগি আরম্ভ করেছে। অক্ষয়বাবুর স্ত্রী প্রতিবাদ করতে গেলে ছেলে তাঁকে পাল্টা গালিগালাজ করছে, যা তা শুনিয়ে দিচ্ছে। 'তুমি তো মা নও, ডাইনি! মা হলে মেয়ের ইষ্টকামনা করতে—এভাবে একটা লম্পটের সঙ্গে যখন তখন যেখানে খুশি সেখানে মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে না—'

কাল আবার এমন কিছু শুনতে হবে ভয়ে অক্ষয়বাবুর স্ত্রী চুপ করে ছিলেন। আগের দিন অক্ষয়বাবু প্রলয়ের কথার জবাব দিয়েছিলেন। কালও যে ছেলের কথাগুলি তিনি শুনছিলেন না এমন সন্দেহ করার কোনো কারণ ছিল না। কেননা একটু আগে তাঁকে খই-দুধ খেতে দিয়ে অক্ষয়বাবুর স্ত্রী বুলার ঘরে এসে ওদের জামাকাপড় গুছোচ্ছিলেন। খাওয়ার পরেই অক্ষয়বাবু কিন্তু শুয়ে পড়েন না। সারাদিনই তো বিছানায় শুয়ে বসে কাটান। এই জন্য রাত্রে তাঁর চোখে ঘুম আসতে অনেক দেরি হয়। স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েন, ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ে—তিনি জেগে থাকেন, বিছানায় শুয়ে ছটফট করেন, তারপর আবার উঠে বসেন, তামাক খান, সংসারের কথা চিন্তা করেন। কাজেই বুলার মা যেমন আশা করেছিলেন, পাশের ঘর থেকে প্রলয়ের কথার উত্তর যথাসময়ে পাওয়া গেল। 'হ্যাঁ, আমাদের মাথা খারাপ হয়েছে, তুই চুপ কর—তোর মাথার ওপর এখনো দু-দুটো মানুষ আছে, কাজেই কার সঙ্গে বুলা বেরোল না বেরোল তা নিয়ে তোর মাথা না ঘামালেও চলবে।'

'কিন্তু বাইরে যে কান পাতা যায় না।' এ ঘর থেকে প্রলয় পাল্টা জবাব দিল। 'তোমরা তো আর ঘরের বাইরে যাও না, তা হলে বুঝতে কী সব কথাবার্তা হচ্ছে গোঁসাইপাড়া বস্তির তিন নম্বর ঘরের মানুষগুলোকে নিয়ে—'

বস্তির তিন নম্বর ঘরের বাসিন্দা অক্ষয়বাবু। কিন্তু তাঁর ঘর নিয়ে পরিবার নিয়ে লোকে কী বলাবলি করছে, এই জন্য যে তিনি মোটেই ভাবিত নন তাঁর কথা থেকেই বোঝা গেল। 'বলুক না—কার কী বলার আছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করছি—আমার যখন পথ্য চলছিল না, চিকিচ্ছে চলছিল না, তখন কোথায় ছিল এতসব লোকজন। আর তুই যে লম্পট লম্পট করছিস, তার পায়ের নখের যুগ্যি হবার ক্ষমতা আছে তোর? কোনোদিন কি চোখ মেলে একবার তাকিয়ে দেখেছিলি বুলার আইসাইট দিন দিন খারাপ হচ্ছে, চোখ দেখিয়ে শিগ্‌গীর

চশমা না নিলে মেয়েটা অন্ধ হয়ে যেত? দেখাবি কী, ভাইবোনের জন্য কত তোর মায়া-মমতা তা কি আমায় বলে দিতে হবে। একদিন ওদের একটু বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, কী ওদের জন্য হাতে করে কিছু একটা নিয়ে আসা—কই আমি তো দেখলাম না কোনোদিন, বাইশ বছরের ঢেঁকি হয়েছিস!'

এ ঘরে প্রলয় চুপ করে ছিল।

'এই তো শীত আসছে, ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে—আজ ক' বছর আমার র‍্যাপার ছিঁড়ে গেছে, একটা গরম জামা নেই—বুলার মা বুঝি পরশু পরিমলকে বলেছিল, কাল এতগুলো টাকা খরচ করে আমার পশমের চাদর ফ্লানেলের সার্ট নিয়ে এসেছে—সন্তান হয়ে তুই এটা করবি? কস্মিনকালেও না, আর করবি কোথা থেকে—তোর যে ক্ষমতাই নেই—'

এ ঘরে অক্ষয়বাবুর স্ত্রী চোখ তুলে ছেলের মুখ দেখছিলেন। প্রথম থেকে বুলা মার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বাবার কথা শুনছিল। দাদাকেও দেখছিল। বাবার কথা শুনে দাদা আর শব্দ করবে না বলে সে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল পাশের ঘরের দিকে চোখ ফিরিয়ে মুখটা বেঁকিয়ে প্রলয় কেমন করে জানি হেসে উঠে বলল, হ্যাঁ তা তো করবেই, তার যে ভয়ানক স্বার্থ আছে এখানে—মধু আছে এ বাড়িতে, একটু ভালো করে খরচপত্তর না করলে তোমরাই বা তাকে আমল—'

'বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে স্কাউন্ড্রেল—' অক্ষয়বাবু গর্জন করে উঠলেন। প্রলয়ও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'দুটিতে একত্তর বেরিয়ে গিয়ে কী করছে না করছে তুমি দেখছ? তুমি তো আঁতুড় হয়ে বিছানায় পড়ে আছ। চশমা কিনতে গিয়ে সেদিন সারাটা দিন তোমাদের এত বড়ো মেয়ে বাইরে কাটিয়ে এল—তা ছাড়া আজ বোটানিক্যাল গার্ডেন কাল দক্ষিণেশ্বর পরশু বেলুড়—বাব্বা বেড়াবার কী ধুম—কাল আর ধারে কাছে না—আরো দূরে যাচ্ছে, আরো নির্জন জায়গায়—গাঁয়ে চলেছে, কলকাতার একটি প্রাণীও যাতে দেখতে না পায়—'

'শূয়ার ইডিয়েট—' অক্ষয়বাবু হাঁপাচ্ছিলেন। 'জেলায় ধরা কাকে বলে জানিস না, পাণ্ডু রোগী? চোখ মুখ হলদে হয়ে যায়—দুনিয়ার সব কিছু সে হলদে দেখে—তোর অবস্থাও তাই হয়েছে—'

'একলা আমি কেন, দুনিয়ার সবাই দেখছে, সবাই একথা বলছে, অক্ষয় উকিলের মেয়েটাকে জগুডাক্তারের খুনে ছেলেটা হয়ে বানিয়ে ছাড়বে—' যেন এতটা চেঁচিয়ে প্রলয়ও হাঁপাতে আরম্ভ করেছিল, হাঁপাতে হাঁপাতে বলছিল, 'এখন এসব কথা ভালো লাগবে না তোমাদের, যাক না দুদিন, সর্বনাশটা হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকেছে—এখন আসন গেড়ে বসবে, নাকের জলে চোখের জলে এক হবার দিন এসেছে তোমাদের—দেয়ালে মাথা ঠুকে মরবে—এই বলে রাখলাম—' প্রলয় আর সে ঘরে থাকেনি, টলতে টলতে বেরিয়ে গিয়েছিল। অক্ষয়বাবুর স্ত্রী হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। বুলার মুখটা কালো হয়ে গিয়েছিল। দাদা বেরিয়ে যেতে সেও স্বস্তিবোধ করেছিল।

'ইস্ কী সব আজেবাজে কথা বলতে আরম্ভ করেছে দাদা—' ফিসফিস করে মাকে বলেছিল সে।

'বলবেই তো', অক্ষয়বাবুর স্ত্রী উত্তর করেছিলেন, 'যত বাজে লোকের সঙ্গে ওর

মেলামেশা—ভালো লোকের সঙ্গে মিশলে ভালো কথাই শুনে আসত, ঘরে এসে ভালো কথাই আমাদের শোনাত—'

'এত খারাপ লাগছিল কথাগুলো—এমন ভালো মানুষ পরিমলদা—তাঁকে নিয়ে কিনা—' বুলার কালো চোখ দুটো ধূসর হয়ে উঠেছিল, যেন একটা অসহায়তা ফুটে উঠেছিল তার তাকানোর মধ্যে, 'তোমায় বলতে কী মা, আর যেন পরিমলদার সঙ্গে বেরোতে সাহস পাব না, লজ্জাও করবে।'

'তুই থাম দিকিনি।' অক্ষয়বাবুর স্ত্রী মেয়েকে ধমক দিয়েছিলেন। 'কে ভালো মানুষ কে খারাপ মানুষ—আমি হয়তো চিনতে না পারি, মুখ্যুসুখ্যু—তোর বাবা কত বড়ো পণ্ডিত, তায় আবার চল্লিশ বছর ওকালতি করে হাড় পাকিয়েছেন—তাঁকে তো কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না—পরিমল যদি খারাপ মানুষ হত তো তার চোখ দেখে কথাবার্তা শুনে কর্তা প্রথমদিনই ধরে ফেলতেন।'

তাই তো, কথাটা ভাবল বুলা, আবেগে তার গলার স্বর ভারি হয়ে উঠল। চোখ দুটো কেমন ছলছল করছিল।

'এত ভালো কথা বলেন তিনি, কী ভীষণ নরম মন, আমার সঙ্গে, এমন কী নিলয়ের সঙ্গেও যেন কেমন ভয়ে ভয়ে কথা বলেন, পাছে আমরা দুঃখ পাই অসন্তুষ্ট হই।'

'অতিরিক্ত ভালো বলেই লোকে তার নামে এত নিন্দে গেয়ে বেড়াচ্ছে—ঝোঁকের মাথায় কবে একটা কাজ করে ফেলেছিল—কিন্তু কই, আমরা তো মনে রাখিনি, আমাদেরই সন্তান ছিল মলয়—পরিমল তার স্বভাব দিয়ে ব্যবহার দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করে ফেলেছে—'

বুলা চুপ করে রইল। কাল সকালে বুলার বেড়াতে যাবার পোশাক মা বেছে রাখলেন। 'এই শাড়িটা পরে যাবি, এই ব্লাউজ।' হলদের ওপর কালো বুটি ছিটানো শাড়ি—হাল্কা নীল রঙের ব্লাউজ। শাড়ি জামার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বুলা ঘাড় নাড়ল। এবারও কথা বলল না। ভাবছিল সে। কেবল তার দাদা প্রলয়ই নয়, আর একটা মানুষ পরিমলদা সম্পর্কে যা-তা বলছে। মুখে বলবার সাহস কোথায়। চিঠি দিয়েছে। চিঠির উত্তর দেয়নি বুলা। উত্তর দিতে হলে বুলাকেও একটা চিঠি লিখতে হয়। কিন্তু এমন মানুষের কাছে চিঠি দিতে তার ঘেন্না হয়। যদি সাহস থাকে বুলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলুক না প্রদোষ তার কী বলার আছে। পরশু সন্ধ্যাবেলা রেখার হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। আর কদিন ধরে কেমন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রথমটায় বুলা ঠিক বুঝতে পারেনি প্রদোষ এমন করছে কেন। অথচ সেদিন চায়ের দোকানে কত সাহস দেখিয়েছিল। বুলা অবশ্য এটাকে সাহস বলে না। বলা-কওয়া নেই—টুপ্ করে চুমু খাওয়া। কিন্তু সেজন্য বুলা তো রাগ করেনি। কিন্তু পরদিন থেকে এমন চুপসে গেল কেন সাহসী পুরুষ। এখন বুলা বুঝতে পারছে, পরিমলদার জন্য এমন করছে সে। ভয়ানক হিংসা তার মনে, ছোটো মন। পরিমলদা এবাড়ি আসছে তার সহ্য হচ্ছে না, কালকের চিঠিতে তো সব পরিষ্কার হয়ে গেল। উঃ চিঠি লেখার কী ধরন, কী ভাষা! এমন যার ভাষা, এমন খারাপ-চিন্তা যার মনে সে আবার উপন্যাস লিখতে চাইছে। এত কাঁচা হাতের লেখা উপন্যাস কেউ পড়বে না। ছিঁড়ে কুটি কুটি করে উনুনের আগুনে ফেলে দেবে। চিঠির মধ্যে এমন একটা কথা লিখেছে—কাল সারারাত বুলা ঘুমোতে পারেনি, যতবার কথাটা ভেবেছে তার বুকের ভিতর সিরসির করে উঠেছে। চিঠিটা অবশ্য তখনি সে পুড়িয়ে

ফেলেছিল। কিন্তু তা হলে হবে কী—সেই পোড়া চিঠির ভিতর থেকে যেন কথাগুলি উঠে এসে তার মগজ কামড়ে ধরছিল। তাই মাথা ধরেছিল। তাই রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। পরে উঠে জল খেয়েছে, কানে ঘাড়ে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়েছে। তারপর দুর্ভাবনা ভুলতে কুচিন্তা দূর করতে মানুষ যেমন জোর করে ঠাকুর-দেবতার নাম করে—সুন্দর কিছু চোখের সামনে কল্পনা করে, তেমনি পরিমলদার শান্ত চোখ দুটো, মুখের মিষ্টি হাসিটা, ছেলেমানুষের মতন তাঁর তাকানো, কথা বলা, এমন কি সময় সময় অবুঝ শিশুর মতন একটা কাজ করে ফেলে পরে লজ্জা পেয়ে হতাশ হয়ে ফ্যালফ্যাল করে যেভাবে মানুষটা আকাশের দিকে তাকায়, আর তখন তাঁর সামনে যে থাকে সেই দৃশ্য দেখে তার মন যেমন কান্নায় ভরে ওঠে, মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে শিশুর মতন তাঁকে আদর করতে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, তেমন কিছু কান্না ও মায়াভরা ছবি, পবিত্র এক একটা দৃশ্য কল্পনা করতে করতে বুলা ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর তার ঘুম ভাঙেনি। জাগল সেই সকালে। রোদ উঠে গিয়েছিল। পাখি ডাকছিল। তারপর কাল সারা দিন এবং আজ একবারও প্রদোষের কুৎসিত কথাগুলি তার মনে পড়েনি। এখন দাদার এসব কথা শুনে পুড়িয়ে ফেলা চিঠির কালো অক্ষরগুলি তার চোখের সামনে কৃমির মতন কিলবিল করছিল। খুনেটা সাধু সেজে আছে, বুকের ভিতর একটা ক্ষুধার্ত নেকড়ে লুকিয়ে রেখেছে, সুযোগ খুঁজছে, তোমার ওপর লাফিয়ে পড়বে, তোমার কচি মাংস ছিঁড়ে খাবে, তারপর এখান থেকে যাবে। নেকড়ের ক্ষুধা এখনো টের পাচ্ছ না।

যা, খেয়ে শুয়ে পড় গে—সকাল সকাল উঠতে হবে। মা বলছিলেন।

বুলার একবার ইচ্ছা করছিল প্রদোষের চিঠির কথা মাকে বলে দেয়। চিঠিতে সে কী সব লিখেছে। দাদা শুধু লম্পট বলেছে, আর তো কিছু বলেনি, শুধু বলেছে পরিমলদার সঙ্গে সে বেরোচ্ছে বলে লোকে নিন্দা করছে— এই নিয়ে দাদা রাগারাগি করছিল। কিন্তু এই বস্তির একটি ছেলে এত জানাশোনা তাদের, কতদিন এই ঘরে এসেছে, এই চেয়ারে বসে সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে ভালো ভালো কথা বলে গেছে—তার বুকের ভিতর কত বিষ লুকোনো ছিল মা একবার জেনে রাখুক। কিন্তু বুলা বলেনি। পরিমলদার সঙ্গে বেড়াতে যেতে মা তাকে সাহস দিচ্ছে এবং বাবার তাতে অনুমোদন রয়েছে বলে শুধু নয়, নিজের মধ্যেই বুলা সাহস—একটা শক্তি অনুভব করছে—তাই প্রদোষের কথা সে অগ্রাহ্য করতে পারছে, চিঠির কথাগুলি ভুলে থাকতে পারছে। এখনি আবার ভুলে যাবে। খেয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটি মানুষের করুণ চোখ মিষ্টি হাসি আশ্চর্য নরম ব্যবহার ও হঠাৎ ছেলেমানুষের মতন একটা কাজ করে ফেলে থতমত খেয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকানোর ছবিটা কল্পনা করতে করতে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়বে। জাগবে সেই ভোর ছটায়। তখন তারা স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরবে।

ভাইবোনের ঝগড়া মিটে গেছে। এখন দুজনের খুব ভাব। জানালার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তারা মাঠ দেখছে গাছ দেখছে—দিগন্তের নীলাভ ধূসর রেখা পিছনে সরে যাচ্ছে। হু হু করে রেলগাড়ি ছুটছে। সূর্যটা বুঝি আর একটু ওপরে উঠল। জানালার রোদ সরে গেছে। নিলয়ের কোমর ও পা দুটো কেবল দেখা যাচ্ছে, বাকি সবটা শরীর বাইরে।

'এত ঝুঁকবে না।' পরিমল বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না, স্তব্ধ হয়ে আর একটা পিঠ ও কোমর দেখতে লাগল। হলুদের ওপর কালো বুটি ছড়ানো, একটা উজ্জ্বল আভা, যেন চিতাবাঘের পিছনটা দেখছে সে, না, নধরকান্তি হরিণ—নিজেকে সংশোধন করল পরিমল। একটা গোপন ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলল।

'আমরা কিন্তু এই স্টেশনে নেমে পড়ব।' আস্তে বলল সে। ভাইবোন চমকে উঠে জানালার ওপার থেকে পিঠ মাথা গুটিয়ে এনে ঘুরে বসল।

'এরি মধ্যে এসে গেলাম!' বিস্ময় কৌতূহল হতাশা ও ক্ষোভ মেশানো সুর দুজনের। 'আমরা ভাবলাম আরো—আরো অনেক স্টেশন পার হয়ে তবে সেখানে যাব।'

পরিমল কথা বলল না।

গাড়ির গতি মন্থর হয়ে গেল।

॥ ৩৯ ॥

পিছনে বেতঝোপ। যেন ঝোপের ভিতর থেকে একটা ডাহুক ক্রমাগত ডাকছিল। হঠাৎ চুপ করে গেল। একটা প্রকাণ্ড ডুমুর গাছ ডালপালা ছড়িয়ে আছে। মাথার ওপর সবুজ পাতার সমারোহ। যখন অন্য সব গাছ হলদে হয়ে এল, আসন্ন শীতের ভয়ে নির্জীব, কদিন পর পাতা ঝরতে আরম্ভ করবে, সেখানে একটা ডুমুর গাছ সর্বাঙ্গে যৌবনের সতেজ লাবণ্য নিয়ে হেমন্তের রৌদ্রে প্রাণ খুলে হাসছে—কেমন বিসদৃশ মনে হয়।

পরিমলই জিনিসটা লক্ষ্য করল। আর একজনের লক্ষ্য করার কথা নয়। জীবন নিয়ে যৌবন নিয়ে, বার্ধক্য জীর্ণতা নিয়ে চিন্তা করার সময় হয়নি তার।

কোনোদিন হবে কিনা পরিমল তাও ভাবল। এমন মানুষ তো সংসারে আছেই। যৌবন জরা তারুণ্য শৈশব—কোনো কিছু নিয়েই মাথা ঘামায় না। যখন যে-অবস্থায় পৌঁছয় সেটাকেই স্থির সত্য অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেয়। স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়। তারা সুখী—সুখী বইকি। বার্ধক্যে এসে যৌবনের জন্য ক্ষোভ করে না, দীর্ঘশ্বাস ফেলে না। একদা জরাগ্রস্ত হবে ভেবে কৈশোরের উচ্ছল সুন্দর দিনগুলি দুশ্চিন্তায় কালো মন্থর করে তোলে না। সব বয়সই তাদের কাছে সুন্দর। তারা শৈশবেও সুখী প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েও সুখী। সুখী ও নিশ্চিন্ত। যেমন জগমোহন। অমিত তেজ বিক্রম উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে যৌবনে যতটা সুখী ছিলেন আজ বৃদ্ধ হয়েও যেন তার চেয়ে কম সুখী নন। তা না হলে উঠতে বসতে হ্যাপি ওল্ড এজ কথাটা তিনি বলতেন কি। অবশ্য এর সঙ্গে আর একটা শর্ত জুড়ে দেন তিনি। সুস্থ থাকলে—শরীরটা ফিট রাখতে পারলে মানুষ সব বয়সেই সুখী হয়।

কথাটা কি সত্য? সুস্থ থাকাই কি সব? কেবল স্বাস্থ্য ও শরীরই সুখের মাপকাঠি? পরিমল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হয়তো জগমোহনের দলের মানুষই সংসারে বেশি। যেমন পরিতোষ। সুখী, অত্যন্ত সুখী। তার এই বয়স নিয়ে স্বাস্থ্য নিয়ে, চাকরি-স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অন্য কোনো বয়সের কথা এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলে চেহারা দেখে মনে হয় না। যেমন গিরিজা। প্রথম যৌবনে চঞ্চলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার সীমা ছিল না। কত বছর পর সেদিন দেখা। তেমনি চপল ফুর্তিবাজ হাল্কাপ্রাণ রয়ে গেছে। পরিমল তা হতে পারছে কি। এতক্ষণ একটা সর্ষে ক্ষেতের কাছে

গুলতি হাতে নিয়ে নিলয় ছুটোছুটি করছিল। সর্ষে-ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছে। তাই ওদিকটা হলদে হয়ে গেছে। চোখ ঝলসে যায়। সর্ষে ক্ষেত যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে যেন আকাশটা ওপরের দিকে উঠে গেছে। মাথার ওপর স্বচ্ছ নীল আকাশ. নীচে হলুদের আস্তরণ। নিলয়কে ছোট্ট একটা পাখির মতন দেখাচ্ছিল। তারপর সে আরও দূরে সরে গেছে। সাঁই সাঁই করে এক ঝাঁক পানকৌড়ি উড়ে যাচ্ছিল। নিলয় নিশ্চয় তাদের দেখতে পেয়েছে। গুলতি বাগিয়ে পানকৌড়ি শিকার করতে ক্রমাগত সে ছুটছিল। একটা কালো ফুটকির মতো দেখাচ্ছিল তখন তাকে। তারপর সেই ফুটকিও অদৃশ্য হল। তাই পরিমল চিন্তা করছিল। ঐ কিশোরের সঙ্গে সে কতটা মিশতে পারল? একটা জায়গায় তাকে থামতে হল। তারপর কিশোর তার নিজের জগতে চলে গেছে। সেখানে পরিমলের প্রবেশ নিষেধ।

কিন্তু এখানে ডুমুর গাছের ছায়ায় চোখ ফিরিয়েও কি সে সান্ত্বনা পেল। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে বুলা ঝুড়ি থেকে খাবার কৌটো ফ্লাস্ক এবং আরও টুকিটাকি কি সব বার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নরম ফর্সা দুটো হাত, ফুলের কলির মতন সরু সরু আঙুল, ছোট্ট মাথা, সবুজ ঝকঝকে নূতন পাতার মতন দুটো কান, সরু করে কাটা আপেলের টুকরোর মতন একটুখানি কপাল—দাঁড়িয়ে থেকে আড়চোখে পরিমল কয়েকবার দেখল। দেখা শেষ করে নিজের হাতটা প্রসারিত করল, আঙুলগুলি দেখল, মোটা মোটা গিঁট, কর্কশ চামড়া. স্থূল প্রাচীন রোমশ বিবর্ণ। তবে কি এখানেই ব্যবধান. শরীরটাই বাধা—গাছের ছায়ায় যে বসে আছে তার সঙ্গে সমুদ্র থেকে উঠে আসা একটা ঝিনুকের তুলনা দেওয়া চলে। শুভ্র চিকন নিষ্কলঙ্ক পবিত্র। পৃথিবীর মাটির দাগ লাগেনি। বড়ো বেশি নূতন। তাই পরিমলের ভয় করছিল। এখানেও সে হেরে যাবে। নিলয়ের মতন এই মানুষটিও তাকে এক সময় বাতিল করে দেবে। সেদিন ধর্মতলার রাস্তার ভিড়ের মধ্যে সে ঠিক করতে পারছিল না কতটা ছোটো হতে পারল সে, আর আমের মুকুলের মতন ধানের শীষের মতন আনকোরা এক ফোঁটা এই মানুষ কতখানি সেয়ানা সপ্রতিভ স্থিরবুদ্ধিসম্পন্না হতে পেরেছে। তুলনা করতে গিয়ে পরিমল অস্বস্তিবোধ করেছিল। কেবল মন না—যেহেতু তার ক্ষুধা পাচ্ছিল না, যখন তখন খেতে ইচ্ছা করছিল না, বেলুন ভালো লাগছিল না, তাই মনের মতন তার ওই ছোট্ট শরীরটাও কেবল পরিণত নয়—কতটা প্রাচীন জীর্ণ হতে চলল দেখতে জানতে পরিমলের ভয়ানক কৌতূহল হচ্ছিল। পরিমলকে সে বার বার হারিয়ে দিচ্ছিল. 'ভীষণ ছেলেমানুষী করছেন আপনি—' কয়েকবারই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছিল না বুলা? অবাক হয়ে গিয়েছিল পরিমল। তারপর সে ভাবল. নিশ্চয় রাস্তার এত মানুষ, গাড়িঘোড়া. দোকানপাট, কলরব—চারদিকের এত চোখ সন্দেহ ঈর্ষার মধ্যে পরিমলের দৃষ্টি বুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে, আঠারো বছরের একটি মেয়ের ইচ্ছা ভাবনা ভালো-লাগা মন্দ-লাগা বিচার করতে গিয়ে সে পদে পদে ভুল করছে। এবং নিজেকেও সে ভালো বুঝতে পারছে না। বাইরের কৃত্রিমতা মানুষের সরল বিচারবুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। নিশ্চয় পরিমল এই কদিনেই অসরল হয়ে গেছে—সহজ চিন্তা স্বাভাবিক বোধ তার আর আসছে না। জেলখানায় এমন দুর্ভোগ তাকে পোহাতে হয়নি। সেখানে সে অনেক বেশি সহজ সরল হয়ে উঠেছিল। এই জন্যই তো তার উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল। ক্রমশ সে পরিচ্ছন্ন সুন্দর হচ্ছে। আলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু সেদিন বুলা

বেলুন দুটো কিছুতেই যখন হাতে নিতে চাইল না, পরিমল তখন ঠিক করল ওই আলোর ফুল থেকে—সুন্দর মানুষটি থেকে সে কত দূরে আছে বুঝতে হলে তাকে নিয়ে লোকালয়ের বাইরে মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়াতে হবে। যেখানে তৃতীয় ব্যক্তি অনুপস্থিত। তাই তো, ধর্মতলার সেই গোলমোহর ফুল গাছের ছায়ায় ডাবের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বুলা যখন ঘাড় কাত করে আকাশের দিকে থুঁতনি তুলে ডাব খাচ্ছিল আর পরিমল কাছে দাঁড়িয়ে, তখন সেই ডাবওয়ালা কেমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে দুজনকে দেখছিল, যেন পরিমলের সঙ্গে বুলার সম্পর্কটা স্থির করতে না পারার অস্বস্তি নিয়ে লোকটা ঐ একটু সময়ের মধ্যেই ভীষণ ভুগতে আরম্ভ করেছিল। বেলুনওলার চোখেও এমন সন্দেহ ও কৌতূহল দেখেছিল পরিমল। তেমনি চশমার দোকানের সেই রোগা ও ছিপছিপে কর্মচারীটি। যেন হাঁপানির দোষ আছে মানুষটার, যতবার সে শ্বাস ফেলছিল একটা মৃদু ঘড়ঘড় শব্দ পরিমলের কানে আসছিল। মরা মাছের মতন ঘোলাটে চোখ দুটো তুলে কয়েকবারই বুলাকে দেখছিল। তারপর যেন কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে পরিমলকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এটি আপনার কে হয়?' অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল পরিমল। কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করতে পেরেছিল কি সে। সৌম্য শান্ত থেকে তাকে উত্তর দিতে হয়েছিল, 'আমার ছাত্রী, আমি তার গৃহশিক্ষক।' চোখের ডাক্তার সরাসরি কিছু প্রশ্ন করেনি, কিন্তু তার চোখেও যে একটা সূক্ষ্ম সন্দেহ উঁকি-ঝুঁকি মারছিল পরিমল কয়েকবারই লক্ষ্য করেছে। ডাক্তার প্রশ্ন করলে সেখানেও পরিমলকে একই উত্তর দিতে হত: 'সে ছাত্রী, আমি শিক্ষক।' কিন্তু এই কি আসল পরিচয়? মিথ্যা কথা বলতে হয়েছে তাকে। কাজেই এত সব চোখের সামনে এত সব প্রশ্নের সামনে নিজেকেও সে বিচার করতে পারছে না, সহজ দৃষ্টি দিয়ে আর একজনকেও ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না। দেখার মধ্যে ভুল থেকে যাচ্ছে। বাড়িতেও তো তাই। অক্ষয়বাবুর চোখে, তাঁর স্ত্রীর চোখে সে নিছক প্রাইভেট টিউটর নয় যদিও, আর একটু কাছের মানুষ—বুলার দাদার বন্ধু, সুতরাং অভিভাবক স্থানীয় একজন। অভিভাবক স্নেহাকাঙ্ক্ষী দায়িত্বসম্পন্ন একটি বয়স্ক মানুষ। তাই বার বার হতাশ হয়েছে পরিমল। তাই এখানে ছুটে এসেছে। যেখানে অফুরন্ত রৌদ্র নীল আকাশ গাছের ছায়া পাতার শব্দ পাখির ডাক আর মেঠো হাওয়া ছাড়া আর কিছুই নেই। ধর্মতলার মানুষগুলি এখানে অনুপস্থিত, গোঁসাইপাড়া বস্তির একটি প্রাণীও তাদের দেখছে না—এত কাছের মানুষ অক্ষয়বাবু, তাঁর স্ত্রী, তাঁদের দৃষ্টিও এখানে পৌঁছোচ্ছে না। পরিমল এখন অবারিত উন্মুক্ত। অপরের সন্দেহ কৌতূহল নিরসনের জন্য কোনোরকম কৃত্রিম আবরণ দিয়ে নিজেকে তার ঢাকতে হচ্ছে না। কিন্তু—

তাই সে ভাবছিল। তবু বাধা থেকে যাচ্ছে—যেন মুক্ত আকাশের নীচে নির্জন গাছের ছায়ায় ব্যবধানটা আরো দুস্তর দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠে মুখব্যাদান করে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

তবে এতদিন কীসের সাধনা সে করল!

লোকচক্ষুর সামনে যে বাধা ছিল সেটাকে সে ক্ষণস্থায়ী দুর্বল হাল্কা কৃত্রিম ইত্যাদি কত কী আখ্যা দিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিত।

কিন্তু এখন দেখছে, সে নিজেই একটা প্রকাণ্ড বাধা হয়ে নিজের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার এক পা এগোবার ক্ষমতা নেই। সূর্যমুখীর মতন কৃষ্ণচূড়ার মতন উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য

হয়ে উঠতে চেয়েছিল সে। আজ তার মনে হল তার সেই চাওয়াটাই মিথ্যা। দীপুর মতন শিশু হয়ে যেতে পারে সে—নিলয়ের মতন নিষ্পাপ চঞ্চল বালক হবার ক্ষমতা রাখে এমন একটা অহংকার তার মনে ছিল। এখন দেখল একটা মূঢ় অহংকার ভিতরে পুষে সে বৃথাই আস্ফালন করছিল। আসলে সে যা তাই আছে, যেখানে দাঁড়াবার সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে. এক চুল অগ্রসর হতে পারেনি।

তবে আর কীসের আশা!

ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলল পরিমল। ডুমুর গাছের ছায়ার দিকে যতবার তার চোখ যাচ্ছিল ততবার সে বাধা পেয়েছে—তার আঙুলের মোটা গিঁঠ, শুকনো বিবর্ণ নখের সারি, হাতের রোমশ অমসৃণ চামড়া বার বার তাকে বাধা দিয়েছে। হ্যাঁ, শরীর—শরীরের কাছে মন বাধা পেল। আঠারো বছরের যৌবনের আলোয় নিজেকে দীপ্ত উদ্ভাসিত করার স্পর্ধা করেছিল সে, এই জন্য এখন তার লজ্জার অনুশোচনার সীমা রইল না। না, কোনোদিন বুলার সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে না সে। তার আলোর ফুল হওয়ার স্বপ্ন সফল হবে না।

অথচ, ভেবে সে অবাক হল, কাল রাত্রেও বালিগঞ্জ থেকে ফিরে গিয়ে একটা আশ্চর্য কবিতা লিখে ফেলেছিল সে। তখন মধ্য রাত্রি। সরযূধাম নিস্তব্ধ। সবাই ঘুমোচ্ছিল, অথবা ঘুমের ভান করে আলো নিভিয়ে চুপ করে শুয়ে ছিল। কদিন ধরে যেমন করছে। কিন্তু কাল এসব নিয়ে একবারও সে চিন্তা করেনি। রাত ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়েছে। দূরে যাবে, নির্জন কোনো জায়গায়, যদি নদী থাকে তীরে ধারে বসবে তারা, নয়তো বনের ধারে গাছের ছায়ায়। কুয়াশার ভিতর দিয়ে আকাশের তারা চেনা যায় কি? একটি তারা আগুনের ফুল হয়ে জ্বলছে, না কি ঠাণ্ডা নিষ্প্রাণ রুপোর যে চুমকি হয়ে আকাশের গায়ে ঝুলছে, বুঝতে হলে তোমাকে কুয়াশার ঊর্ধ্বে যেতে হবে, অথবা যতক্ষণ না কুয়াশা কাটে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু আর অপেক্ষা করতে পারছিল না পরিমল। অক্ষয়বাবু, অক্ষয়বাবুর স্ত্রীর, গোঁসাইপাড়ার এত সব মানুষ---যা তারা দুজন যখন রাস্তায় বেরোচ্ছে তখন রাস্তার মানুষগুলি তাদের দিকে তাকাচ্ছে, দেখছে। এত সব চোখ--এমন ঘন গভীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টির কুয়াশার মধ্যে পরিমলের চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। তাই দূরে যাওয়া—লোকচক্ষুর বাইরে গিয়ে দাঁড়ানো। তা না হলে সে বুঝবে কেমন করে ওই মেয়ে আগুনের ফুল হয়ে জ্বলছে, না কি শীতল প্রাণহীন একটি রুপোর বোতাম ছাড়া আর কিছুই নয়—এবং পরিমল নিজেকেও চিনবে তখন। নিজেকেও তার চেনা দরকার। তা না হলে আগুনের ফুল থেকে সে কতটা দূরে আছে জানবে কেমন করে। নক্ষত্রলোকে তাকে পৌঁছতে হবে যে। উৎফুল্ল হয়ে সে বালিগঞ্জ থেকে ফিরছিল। অক্ষয়বাবু ও অক্ষয়বাবুর স্ত্রীর অনুমোদন আছে। বুলা তার সঙ্গে বাইরে যাচ্ছে। নিলয় সঙ্গে থাকবে। থাকলই বা। পরিমল যখন সরযূধামের বাগানে ঢুকে সূর্যমুখীর ঝোপের সামনে দাঁড়ায়, তখন ফড়িংটা প্রজাপতিটা তার ডাইনে বাঁয়ে উড়ে উড়ে বেড়ায় না? একটি প্রজাপতির চেয়ে নিলয় কি বেশি সচেতন? কাজেই পরিমল নিশ্চিন্ত ছিল। হ্যাঁ, নিলয়ও সঙ্গে যাবে। একটা মনোহর ছবি তার চোখের সামনে ভাসছিল। যেন সেই ছবিটাই ক্রমে একটা কবিতার মতন হয়ে গিয়ে তার মগজের কোষে কোষে গুঞ্জন তুলছিল। বাস থেকে নেমে একরকম ছুটতে ছুটতে সে সরযূধামে

পৌঁছেছিল। যে তার জন্য জেগে থাকে, অপেক্ষা করে সেই বুড়ো দীনদয়ালই গেট্ খুলে দিয়েছিল। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে সে ওপরে উঠে গিয়েছিল। দীনদয়ালকে বারান্দার বা সিঁড়ির আলো জ্বালাতে হয়নি। তার আগেই পরিমল নিজের ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিয়েছিল। বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বুড়ো কী ভেবেছিল কে জানে। কিন্তু এসব চিন্তা করার তার মোটেই সময় ছিল না। টেবিলের টানা খুলে কলম ও প্যাড বার করে তখনি সে লিখতে বসল। রাস্তায় আসতে আসতে মনে মনে কবিতাটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এখন যেন মন থেকে সেটা সে শুধু কপি করে গেল। চাঁদ বেঁকে গিয়েছিল। তা হলেও কিছু জ্যোৎস্না তার টেবিলে খাটের মাথায় নদীর স্থির জলের মতন টলটল করছিল। কাজেই কালও তাকে আলো জ্বালতে হল ন। তার যেন মনে হচ্ছিল, বাতির আলোয় এই কবিতা লেখা যায় না। আসলে কোনো কবিতাই লেখা যায় না। লেখা উচিত নয়। কাগজ-কলমের ব্যাপারটাই যান্ত্রিক। মনের গভীরে অন্ধকারেই কবিতা লুকিয়ে থাকতে ভালোবাসে। ধমণীর রক্তপ্রবাহে ঢেউ তুলে তুলে, হৃৎপিণ্ডে দোলা দিয়ে দিয়ে কবিতা তার আপন খেয়াল নিয়ে থাকতে চায়—লেখার আকারে রূপ দিতে গেলে কবিতার কিছু না কিছু ক্ষতি হয়। ছাপানো কবিতার বই দেখলে তার দুঃখ হয়। যেন ঘা-খাওয়া জখম হওয়া কবিতার সারি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে। যদি লিখতেই হয় একান্ত সংগোপনে এ জিনিস লিখে ফেলতে হবে। কাউকে দেখানো বা পড়ানো চলবে না। কোনোদিন ছাপতে দেওয়া হবে না। গোপন প্রেমের মতন নিজের কাছে রেখে এ জিনিস লালন করতে হবে। আর তা-ও কি টেবিল চেয়ারে বসে কড়া ইলেকট্রিক আলোর নীচে বসে লেখা—না, তা নয়। বাগানের ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় বসে লিখতে পার—নদীর ধারে, নির্জন বনের ছায়ায়, অথবা শীতের রোদ্দুর পিঠে নিয়ে কোন মাঠের কিনারে বসেও। হ্যাঁ, একান্তই যদি আত্মার গোপনতম কান্না দীর্ঘশ্বাস গান অথবা আনন্দকে শারীর রূপ দিতে চাও তো ওভাবে ওই পরিবেশের মধ্যে না লিখলে কবিতার জখম রক্তপাত অনিবার্য। কারণ লেখা হয়ে যাবার পর তুমি নিজেই বুঝতে পারবে যে-কবিতার পিঠে চড়ে বীরদর্পে তুমি স্বর্গের দরজা পর্যন্ত ঘুরে এসেছিলে এখন তার কী চেহারা হয়েছে! লিখতে গিয়ে তোমারও অধঃপতন ঘটল, কবিতারও আর কিছু অবশিষ্ট রইল না।

যাই হোক, কাল রাত্রে কবিতাটা লিখে ফেলার পর সে পড়ে দেখল। ভালোই লাগল। হয়তো যতটা দেবে বলে সে মনে করেছিল ততটা দেওয়া হল না, কিন্তু তা হলেও প্রথমে মনে মনে, তারপর উচ্চারণ করে পড়ল সে :

বৃষ্টি পড়ছিল—বসন্তের প্রথম বৃষ্টি,
অজস্র মুকুল ও কিশলয়ের গন্ধে
আমোদিত উচ্ছ্বসিত :
ভীরু চুম্বনের আস্বাদ নিয়ে
রোমাঞ্চিত কিশোর ফাল্গুন—
আস্তে আস্তে শিরীষ গাছটার নীচে
এসে দাঁড়াল সে, আমার হাত ধরল
বৃষ্টি ও ঈষদুষ্ণ হাতের স্পর্শ এক হয়ে গেল—

অথবা বলা যায়,
যেন আমি সেই পুরাতন
কৃষ্ণাভ শিরীষ বৃক্ষ—
জীর্ণ বাকলের তলায় লুক্কায়িত উদ্বৃত্ত
কিছু তাপ ছিল
সিক্ত কম্পমান লতাটিকে
সব বিলিয়ে দিলাম—
বৃষ্টি পড়ছিল, বসন্তের প্রথম দ্রবণ
কাদার মতন নরম নারী—
কচি ঘাসের গন্ধ
ঘাস ফড়িং-এর সবুজ সুষমা
নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল,
কালক্ষেপ করিনি আমি
বিশুদ্ধ দিন বা মুখর রৌদ্রের অপেক্ষা না
করে তাকে গড়ে তুললাম,
আমার অপূর্ণতা দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ করলাম—

কঠিন হীরকোজ্জ্বল
অমোঘ মন্ত্র ঈশ্বরের পায়ে নিবেদন করে
ধন্য হলাম—
বৃষ্টি পড়ছিল—সৃষ্টির প্রথম ক্রন্দন।

॥ ৪০ ॥

আর একটা কবিতা প্রায় এসে গিয়েছিল। সেটাও সে লিখে ফেলত। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একটা দুশ্চিন্তা আরম্ভ হল তার। বস্তুত এই একটা বাজে চিন্তাই সময় সময় তাকে বিচলিত করে তোলে। না হলে অন্য কোনো দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা সে আমল দেয় না। খরস্রোতা নদীর মতন সে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্য দুর্ভাবনা যে না আসে তা নয়, কিন্তু সেসব পিছনে ফেলে রেখে সে অক্লেশে লক্ষ্যের দিকে ছুটে যেতে পারছে। একমাত্র টাকার চিন্তাটাই তাকে বাধা দেয়, যেন পিছনে টেনে ধরে। ভয় পায় তখন, আর বুঝি সেই নীল নয়নাভিরাম মহাসমুদ্রের দেখা পেল না, অসীমের কাছে আত্মসমর্পণ করার আগেই তার গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। তার মৃত্যু ঘটল।

কিন্তু তাও হচ্ছে না, ঈশ্বর হতে দিচ্ছেন না, যেদিকে তিনি পথ নির্দেশ করে দিয়েছেন সেদিকে সে এগিয়েও যাচ্ছে সত্য।

যেন ঈশ্বরই তার পথের পাথেয় জোগাচ্ছেন

দুর্ভাবনা আসছে, আবার তা কেটেও যাচ্ছে। স্বয়ং ভগবানই যে সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছেন, পরিমল মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করে। প্রথম দিন চাওয়া মাত্র রমলা টাকাটা বার করে

দিল। এখন সে বুঝতে পারছে জগমোহনের কাছে চাইলে এক সঙ্গে এত টাকা কখনই তিনি দিতেন না, পরিতোষও দিত না। এ টাকা অক্ষয় উকিলের বাড়ি যাচ্ছে জানতে পারলে তারা মুখ বেঁকাত। তাই তো, তখন পর্যন্ত যার সঙ্গে সে একটা কথাও বলেনি, ভাইয়ের স্ত্রীর কাছে কিনা প্রথম হাত পাতল। ঈশ্বরের নির্দেশ না থাকলে এমন হয় কখনও? কিন্তু মাত্র একশ টাকা সাহায্য পেয়ে অক্ষয়বাবুর কী হবে। তাঁর সংসার-তরণীর যে হাজারটা ফুটো। আর সে-সমস্ত ফুটো বন্ধ করবার জন্য তিনি এতকাল একজনের আশায় বসে ছিলেন। জগমোহনের বড়ো ছেলে জেল থেকে বেরিয়ে আসুক। তাই তো, তাঁর সব ক্ষতি পূরণ করবে বলে জেল থেকে বেরিয়ে পরিমলও সকলের আগে সেখানেই ছুটে গেল। ক্ষতিপূরণ না করলে যে তারও মুক্তি নেই। যদি টাকা দিয়ে সাহায্য করতে না পারে তো পরিমলকে রক্ত দিতে হবে। রক্ত দিয়ে তাকে সেই মহামুক্তি কিনতে হবে, সেই নীল নয়নাভিরাম মহাসিন্ধুর হাতছানি—অনন্ত সৌন্দর্য তাকে ডাকছে। অভাবের কথাগুলি অক্ষয়বাবু আস্তে আস্তে বলছেন, কিছু বলছেন তিনি নিজে, কিছু বলছেন তাঁর স্ত্রী। বুলার চোখ দেখানো, চশমা নেওয়ার কথাটা অবশ্য পরিমল নিজে থেকেই বলেছিল। সেদিনই বুলার মা বললেন, গরম জামাকাপড়ের অভাবে বুলার বাবা কষ্ট পাচ্ছেন, তাদের সকলের লেপ তোষক তো কবেই ছিঁড়েছে—কিন্তু কর্তার জন্য কিছু গরম কাপড়চোপড় কেনা না হলে এবারের শীতে মানুষটাকে আর বাঁচানো যাবে না। পরিমল তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করেছিল, এ জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না, আমি যখন এসে গেছি—

একটা আশ্বাস পেলে মানুষ আর একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে চায়। —তাই তো, তুমি ছাড়া আমাদের আছে কে, অক্ষয়বাবুর স্ত্রী দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু যেন ভেবে নিয়ে তখনই আবার বললেন, আর একটা কথাও তোমাকে না বলে পারছি না বাবা, অনেকদিন হয়ে গেল একজনের কাছ থেকে আমি দুশ টাকা ধার করেছিলাম, এই সংসারের জন্যই করেছিলাম—অভাবের ছিদ্র বন্ধ করতে আমি কি আর কম চেষ্টা করি—লোকের কাছে আমাকে হাত পাততে হয়, ঋণ করতে হয়। ভেবেছিলাম প্রলয় আস্তে আস্তে টাকাটা শোধ করতে পারবে—কর্তার কানে আমি এই ঋণের কথা আজও তুলিনি—কিন্তু আমার ছেলের যেমন রোজগার, কোনোদিনই সে দেনা শোধ করতে পারবে না, তাই ভাবছি—ভদ্রমহিলা সেদিন ভালো করে কথাটা শেষ করার আগেই পরিমল তাঁকে কথা দিয়ে ফেলেছিল, আপনি আর এ নিয়ে একটুও মাথা ঘামাবেন না, সামান্য টাকা—দু একদিনের মধ্যেই সেটা শোধ করার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি শোধ করব।

কথা দিয়ে এল সে সত্য, কিন্তু ওখানে থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বাসে বসে মনে মনে সে হিসাব করে দেখল, বুলার চোখ দেখানো চশমা কেনা থেকে আরম্ভ করে অক্ষয়বাবুর গরম জামাকাপড় এবং তার ওপর দুশ টাকা—একত্র যোগ করে অঙ্কটা মোটামুটি ভালোই দাঁড়াচ্ছে।

খুবই দুশ্চিন্তা আরম্ভ হল তার। কোথা থেকে টাকা জোগাড় করবে। বাড়ি থেকে টাকা আনতে পারবে না সে, তা ছাড়া বাড়ির কারো কাছে চাইবে না মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে। আগের দিন পরিতোষের কাছে টাকা চেয়ে সে অপদস্থ হয়েছে। চাকরের হাত দিয়ে তার

কাছে সামান্য দশটা টাকা পাঠানো—কিছুতেই সে ভুলতে পারছিল না। তা হলে এখন উপায়? টাকার চিন্তায় রাত্রে ভালো ঘুম হল না—কিন্তু রাত্রি প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন মনে একটা জোর পেল সে। টাকা জোগাড় হয়ে যাবে। অক্ষয়বাবুর স্ত্রীকে যেমন কথা দিয়ে এসেছে সে সেভাবে কথা রাখতেও পারবে। কোথা থেকে টাকা আসবে, কে তাকে টাকা দিচ্ছে একবারও এই নিয়ে আর সে মাথা ঘামাল না। তাই তো তার বিশ্বাস আরও দৃঢ়মূল হল সেদিন। ঈশ্বর তাকে পথের নির্দেশ দিচ্ছেন—তিনিই পাথেয় জোগাবেন। এবং সেদিন বিকেলেই অক্ষয়বাবুর বাড়ির মোটামুটি সব খরচ সব দাবী মেটাবার মতন টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। বিপদ কাটল।

কিন্তু পরশু রাত্রে দু নম্বর কবিতাটা (দু নম্বর না, আসলে তিন নম্বর, কারণ ইতিমধ্যে দুটো কবিতা সে লিখে ফেলেছিল) লিখতে গিয়ে তার হাতের কলম আড়ষ্ট হয়ে গেল। আবার দুশ্চিন্তা আরম্ভ হল। এবারের দুশ্চিন্তাটা যে অন্যবারের তুলনায় ওজনে ভারি সে বেশ বুঝতে পারছিল। কেননা এবার টাকার অঙ্কটা বেশ মোটা। স্বয়ং অক্ষয়বাবু পরিমলকে কানে কানে কথাটা বলেছিলেন। ঘরে আর কেউ ছিল না তখন। বুলা ও নিলয়কে গ্রাম দেখিয়ে আনবে পরিমল, ট্রেনে চড়ে যাবে তারা, অক্ষয়বাবু শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব অনুমোদন করলেন, হাস্টমনেই তিনি সম্মতি দিলেন, বুঝতে পেরে অক্ষয়বাবুর স্ত্রী ও বুলা খুশি হয়ে পরিমলের জন্য চা করতে পাশের ঘরে চলে গেল, নিলয় বুঝি পড়শিদের কাছে কথাটা রাষ্ট্র করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—অক্ষয়বাবু সেই ফাঁকে, সেই নীরব নির্জন মুহূর্তে অত্যন্ত গোপনীয় এবং জরুরী কথাটা পরিমলকে বললেন। না, তাঁর স্ত্রী আজও জানেন না, ছেলেমেয়েরা জানে না, তিনি দেনার দায়ে ডুবে আছেন, এর ওর কাছ থেকে তাঁকে সময় সময় টাকা ধার করতে হয়েছে, এত বড়ো একটা পরিবার তো হাওয়া খেয়ে বাঁচতে পারে না, চাল চাই, ডাল চাই—তেল, নুন, কাঠ, কেরোসিন—সবই তাঁকে কিনে খেতে হয় হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ওদিকে বাস থেকে পড়ে গিয়ে হাতে চোট লেগে প্রলয় হাসপাতালে পড়ে রইল—ঐ সময়টাই তাঁকে বেশি ঋণ করতে হয়েছিল—কিছু শোধ করেছিলেন, মাঝখানে সুস্থ হয়ে উঠে আদালতে যেতে আরম্ভ করেছিলেন—কিন্তু বিধি বাম, আবার তিনি ব্যারামে পড়লেন, এবং সেই পড়াই পড়া, আর তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেন না, আজও হাজার টাকার ওপর তাঁর দেনা রয়ে গেছে। অবশ্য দু একজন বন্ধুর কাছ থেকেই তিনি অসময়ে টাকাটা চেয়ে এনেছিলেন, তাঁরা তাঁকে টাকার জন্য চাপ দিচ্ছেন না সত্য, কোনোদিন টাকা চেয়ে চিঠি দেওয়া, লোক পাঠানো—সেসব কিছুই করছেন না সদাশয় বন্ধুরা, চুপ করে আছেন সহ্য করছেন—কিন্তু অক্ষয়বাবু চুপ করে থাকবেন কেমন করে? তিনি যে খাতক—অধমর্ণ, দুশ্চিন্তায় রাত্রে তাঁর ঘুম হয় না, তাঁর একমাত্র ভাবনা কী করে ঋণ শোধ করবেন, এদিকে শরীরের যে অবস্থা, যে-কোনো সময় যে-কোনো দিন তিনি চোখ বুজতে পারেন—ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে অক্ষয়বাবু পরিমলের হাত চেপে ধরেছিলেন, 'আজ তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই বাবা, এই দায় থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার কর—তুমি অনেক করছ—হ্যাঁ তোমার ঋণ, তোমার ঋণ আমি আমার অন্তরের স্নেহ দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে শোধ করছি, তুমি আমার ছেলের চেয়েও বেশি—ছেলে যদি উপযুক্ত হয় সক্ষম হয়,

বাপ তার কাছে কতটা আশা করতে পারে তোমার নিশ্চয়ই অজানা নেই, কাজেই এই বুঝে যদি—'

পরিমল প্রতিজ্ঞা করে এসেছিল, হয়তো দু একদিনের মধ্যে পারবে না সে, তা হলেও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকাটা সে শোধ করবে—হাজার টাকার দেনার দায় থেকে অক্ষয়বাবুকে মুক্ত করবে। কথাটা শোনামাত্র অক্ষয়বাবুর অবশ শীর্ণ হাত দুটো বুঝি ভয়ংকর সবল শক্ত হয়ে উঠেছিল। সেই হাত দিয়ে তিনি পরিমলকে কাছে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তাঁর চোখ বেয়ে আবার জলের ধারা গড়াতে আরম্ভ করেছিল। এটা যে আনন্দাশ্রু পরিমল বুঝতে পেরেছিল।

হাতের কলমটা নামিয়ে রেখে তাই সে ভাবছিল তখন। অক্ষয়বাবুর চেহারা, চোখের জল তার চোখের সামনে ভাসছিল। বুলাকে নিয়ে সে নির্জনে যাবে, মাঠ বন দেখাতে যাবে—প্রস্তাবটা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো হাজার টাকার ঋণের কথা বলবেন, পরিমল কি তাতে বিস্মিত হয়েছিল। না। অক্ষয়বাবুর সব দায়দায়িত্ব পরিমল নিজের কাঁধে তুলে নেবে, তাঁর সকল ক্ষতি সে পূরণ করবে—এই সৎসাহস এই সদিচ্ছা নিয়েই তো সে সেখানে ছুটে গিয়েছিল। তা না হলে তাঁরাই বা তাকে ছেলের চেয়ে বেশি আপন মনে করবেন কেন, অন্তরে পর্বতপ্রমাণ স্নেহমমতা ভালোবাসা ও ক্ষমা নিয়ে এতদিন পরিমলের জন্য অপেক্ষা করবেন কেন। সবই ঠিক। সব সঙ্গত ও স্বাভাবিক মনে হয়েছিল তার, কেবল সে ভাবছিল, হাজার টাকা জোগাড় করবে কোথা থেকে।

চাঁদটা ততক্ষণে আরো বেঁকে গিয়ে একটা ঝাঁকড়া মাথা কড়িগাছের পিছনে ঢাকা পড়েছিল। জানালার ওপারটা হঠাৎ অন্ধকার অন্ধকার লাগছিল। পরিমলের মনে হল, ভগবানই বুঝি এভাবে তার চোখের সামনের আলো নিভিয়ে দিলেন। আর তিনি তাকে পথ দেখাবেন না, সমস্যার সমাধান করে দিতে আর তিনি এগিয়ে আসবেন না। স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে আকাশে ডালপালা ছড়ানো কালো কিম্ভূতকিমাকার গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। অথবা এমনও হতে পারে, ঈশ্বর তাকে পরীক্ষা করছেন। এ পর্যন্ত তিনি আলো দেখিয়ে এসেছেন, পথ দেখিয়ে এসেছেন, এবার পরিমল একলা এগিয়ে যাক, চেষ্টা ও ইচ্ছার সঙ্গে নিজের বল বুদ্ধিও প্রয়োগ করে দেখুক, কতটা সে চলতে পারে। তাই কি?

কিন্তু কী করতে পারে সে।

লোকের বাড়ি সিঁদ কাটতে পারবে না। ডাকাতি করবার সাহস এবং মেধাও তার নেই। ছিনতাই রাহাজানি তাকে দিয়ে চলবে না। ভিক্ষা করতে পারবে না সে। কার কাছে গিয়ে হাত পাতবে? তার আজ একটিও বন্ধু নেই। পুরোনো বন্ধুদের চেনে না সে। এতকাল অন্য একটা জগতে ছিল। এখন সে নূতন অপরিচিত। হাত পাতলে-রাস্তার মানুস এক-আধ পয়সা করে ভিক্ষা দেবে সত্য। কিন্তু হাজার টাকা কারো কাছে চেয়ে পাবে কি?

উপার্জন করার ক্ষমতাও নেই তার। চাকরি করে না সে। ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার হলে তবু কথা ছিল। এই বিদ্যা নিয়ে সে কী চাকরি করবে। তা না হয় করল। হাজার টাকা জমাতে কয়েক বছর লেগে যাবে যে।

হ্যাঁ, একটা জিনিস সে ভালো পারে।

কোথাও কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে আনতে পারে। যেমন আগের দিন বিকেলে বাথরুম থেকে জিনিসটা কুড়িয়ে এনেছিল। তাই তো তার বিশ্বাস ছিল। এভাবে ঈশ্বর তাকে এমন কিছু পাইয়ে দেবেন না কি। কুড়িয়ে পাওয়া মাত্র জিনিসটা দোকানে নিয়ে গেলে তারা তার হাতে হাজার টাকা তুলে দেবে। যেমন সেদিন সেই কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস নিয়ে যেতে দোকানদার খুশি হয়ে সেটা কিনে নিল। পরিমলও হৃষ্টমনে সেই টাকা দিয়ে বুলার চোখ দেখাল, চশমা কিনল, অক্ষয়বাবুর র‍্যাপার গরম শার্ট মোজা মাফলার কিনে দিল এবং যেমন তাঁর স্ত্রী চেয়েছিলেন, কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি ঋণের সেই দশ টাকা তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পেরে পরিমল নিশ্চিন্ত হতে পারল।

এতসব খরচপত্র করেও কটা টাকা বেঁচেছিল। তাই তো পরিমল উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল বুলা ও নিলয়কে নিয়ে রেলগাড়ি চড়ে বেড়াতে যাবে।

কিন্তু বেড়াতে যাবার কোনোরকম উত্তেজনা আনন্দ যেন থাকছিল না। পরিমল গম্ভীরভাবে অক্ষয়বাবুর গোপন ঋণের কথাই শুধু চিন্তা করছিল। জানালা থেকে সরে এসে অন্ধকার ঘরে পায়চারি করল। তারপর এক সময় আলো জ্বালল। আলো জ্বেলে অনুসন্ধানী চোখ নিয়ে ঘরের মেঝেটা দেখতে লাগল, যদি কেউ কোনো জিনিস ফেলে যায়, কুড়িয়ে নেবে সে, এমন জিনিস পাওয়া চাই অন্তত হাজার টাকা মূল্য দিয়ে তার কাছ থেকে কেউ জিনিসটা কিনে নেবে। না, তারপর আর এমন থোক টাকার দরকার পড়বে না পরিমলের, কারণ সে বিশ্বাস করে এটাই অক্ষয়বাবুর বড়ো ঋণ, শেষ ঋণ—ঋণ থেকে মুক্তি পেল অক্ষয়বাবু শান্তিতে মরতে পারবেন। এবং সেই সঙ্গে পরিমলেরও মুক্তি। তারপর আর তার এগিয়ে যাবার পথে কোনো বাধা থাকবে না। বুলা ও নিলয়কে নিয়ে তখন সে আরও দূরে যেতে পারবে, আরও নির্জনে, যেখানে আকাশ গভীর নীল, বাতাস অনেক বেশি স্বচ্ছ, রৌদ্র আরও সুন্দর। তারা সমুদ্রের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে।

কিন্তু এখন? পাতি পাতি করে পরিমল ঘরের মেঝেটা খুঁজল। খুঁজে হতাশ হল। টেবিলের তলা খাটের নীচ ঘরের আনাচকানাচ-সমস্ত জায়গা খুঁজল সে। একটা সূঁচও কেউ ফেলে রাখেনি। তাই তো হবে। পরিমল একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। বরং এ ঘর থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে নেওয়ার দিকেই এ বাড়ির মানুষের ঝোঁক চেপেছে। ঘড়ি আংটি কদিন আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। এতক্ষণ ঘর অন্ধকার করে রেখেছিল সে। আলো জ্বালবার পর বুঝতে পারল, কেবল আংটি না, আরও কিছু জিনিস এ ঘর থেকে অদৃশ্য হয়েছে। পিতলের ওপর মিনা করা সুদৃশ্য ফুলদানিটা টেবিলে নেই, কবিতা লেখার সময় টেবিলল্যাম্পটা জ্বালবে কিনা চিন্তা করছিল সে, কিন্তু যদি সত্যি সেটা জ্বালতে চাইত তো তখনই তার চোখে পড়ত ল্যাম্পটাও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কঙ্কালের মতন শূন্য বইয়ের র‍্যাকটা দাঁড়িয়ে আছে। একটা বইও নেই। তার জন্যই সব নূতন বই কেনা হয়েছিল, পরিতোষ বলেছিল না? আলনার দিকে চোখ পড়তে সে দেখল সুতির জামা কাপড়গুলি ঝুলছে সেখানে, সিল্কের চাদর পাঞ্জাবি অদৃশ্য হয়েছে। আর কী নেই, এ ঘর থেকে আরও কীসব সরিয়ে নেওয়া হয়েছে খুঁটিয়ে দেখতে একটুও ইচ্ছা হল না তার। কেবল তার মনে হচ্ছিল ঘরের দেওয়ালগুলি বড়ো বেশি শূন্য উলঙ্গ হয়ে গেছে। তার অর্থ ফ্রেমে বাঁধানো কতগুলি ল্যান্ডস্কেপ টাঙিয়ে ঘর

সাজানো হয়েছিল। ছবিগুলি রাখাও নিরাপদ নয় ভেবে তারা নিয়ে গেছে। নিজের মনে সে হাসল। ঘড়ি আংটির মতন বই ছবি টেবিলল্যাম্প ফুলদানি জামা কাপড়—সবই দোকানে বেচে দেওয়া যায়। হাতে পয়সা নেই যার তার ঘরে এসব কেউ রাখে?

কুড়িয়ে পাওয়ার মতন কুটোটিও এখানে থাকবে না তার বোঝা উচিত ছিল।

তা হলে কী করা যায়? নীচে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে সে চিন্তা করল। তারপর এক সময় কান খাড়া করে ধরল। দীর্ঘ মন্থর শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ কানে আসছিল না। এ সময় ঘুমের ভান করেও যে কেউ জেগে থাকতে পারে না বুঝতে পেরে সে কতকটা আশ্বস্ত হল।

হ্যাঁ, সে চাইছে ওদিকে করিডোরটা খুঁজে দেখতে, বাথরুমের ভিতরটা একবার ভালো করে দেখে আসতে। রান্নার জায়গাটাও একবার খুঁজে দেখতে দোষ কী! সে-ঘরের দরজায় তালা দেওয়া হয় না, রাত্রে উঠে বাথরুমে যাবার সময় কদিনই সে লক্ষ্য করেছে, এমনি শিকল তোলা থাকে।

তার ঘর তো পরিত্যক্ত শূন্য মহাশ্মশান করে রেখেছে। যদি কেউ কোনো জিনিস ভুল করে বা অসাবধানতা বশত ফেলে রেখে যায় তো সেসব জায়গা খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। মানুষের আনাগোনা বেশি, সেসব জায়গায় কিছু কুড়িয়ে পাওয়া সম্ভব।

সেই বিশ্বাসটা একটু একটু করে তার ফিরে আসছিল। সে যে অক্ষম দুর্বল অসহায়, নিজে থেকে কিছুই সংগ্রহ করতে পারবে না, ঈশ্বর জানেন । সুতরাং নিশ্চয়ই তিনি কিছু পাইয়ে দেবেন তাকে।

মন স্থির হল। হতাশার ভাবটা কাটল। এখুনি গিয়ে টেবিলে বসলে আর একটা কবিতা লিখতে পারে সে। তার অর্থ, চিত্তের প্রশান্তি মানসিক দৃঢ়তা ফিরে এসেছে তার। এটা শুভলক্ষণ। ঈশ্বর বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তিনি তাকে ছেড়ে যাননি। তিনি আছেন। এবং পরীক্ষা করলেন মাত্র। নিজের ঘরে কিছু না পেয়ে সে ক্লান্ত বিষণ্ণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল।

পরীক্ষাও ঠিক নয়, ঈশ্বর তাকে দেখিয়ে দিলেন কত অপ্রিয় অবাঞ্ছিত সে এখানে. আস্তে আস্তে কেমন রিক্ত নিঃস্ব করে দিচ্ছে তারা তাকে। তারপর একদিন জগমোহন বড়ো ছেলেকে আঙুল দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে বলবেন, 'বেরিয়ে যাও।'

যেমন সুকোমল। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে আজ ঈশ্বরকে খুঁজছে। তাই তো করতে হবে পরিমলকে। সব কিছু না ছাড়লে পরমকে সে পাবে কেমন করে। সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় নিরবলম্ব না হলে সুন্দর তাকে ধরা দেবে কেন। সে নিজেও যে অসুন্দর অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আর দেরি করল না, দরজা খুলে নিঃশব্দ পায়ে সে বারান্দায় বেরিয়ে এল। এমন না যে সে চুরি করতে যাচ্ছে। পড়ে থাকা জিনিস কুড়িয়ে আনবে। কিন্তু তা হলেও অত্যন্ত সন্তর্পণে, কোনো রকম শব্দ না করে তাকে রান্নাঘর বাথরুমের দিকে এগোতে হবে। রাত্রে তার দরজা জানালার শব্দ হলে, কী একটু জোরে বারান্দা দিয়ে যদি সে হেঁটে যায় তো জগমোহন আজকাল, যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে, চোর ঢুকেছে, এমন একটা আতঙ্ক ও অস্বস্তি নিয়ে 'কৌন হ্যায়' 'কৌন হ্যায়' বলে চেঁচামেচি শুরু করে দেন। এটা যে ইচ্ছাকৃত, এত রাত্রে পরিমল ছাড়া আর-কে বাড়িতে ঢুকবে বা মুখ হাত ধুতে ওদিকের বারান্দা পার হয়ে বাথরুমে যাবে বুঝতে পেরেও তিনি এমন চেঁচামেচি করেন। যেন সরযূধামের মানুষগুলিকে

তিনি জানিয়ে দিতে চান, বুঝিয়ে দিতে চান এই মাত্র যে মানুষটি বাড়িতে ঢুকল কি সিঁড়ি বারান্দা পার হয়ে গেল, সে চোর ডাকাতের মতোই ঘৃণ্য এবং ভয়ঙ্কর।

বারান্দা পার হাবার আগেই পরিমল মাঝপথে থমকে দাঁড়াল। ধূসর জ্যোৎস্নারেখার মতন একটি মূর্তি ওপাশের করিডোর ধরে এগিয়ে আসছিল। তার গতি অত্যন্ত নিঃশব্দ এবং মন্থর। মন্থর যে সরু প্যাসেজটা পার হয়ে আসতে প্রায় দু মিনিট লেগে গেল। যেন ঘাড় ঘুরিয়ে নিজের পিছনটাও দেখছিল সে দু একবার। একটা কিছু মতলব—কোনরকম গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়েই যে ছায়ামূর্তি অত্যন্ত সতর্কভাবে পিছন সম্মুখ দেখতে দেখতে পরিমলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল বোঝা যাচ্ছিল।

পরিমল অস্বস্তি বোধ করল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মানুষটিকে চিনতে পারল। রমলা। কিন্তু উদ্দেশ্য কী? এত রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভাশুরকে কিছু বলতে চাইছে ও? কী বলবে? ওঘরে পরিতোষের নাক ডাকছিল তাও পরিমলের কানে আসছিল।

কেমন ভয় হল তার। রমলা সামনে এসে দাঁড়াবার আগে নিজের ঘরে ফিরে যেতে পারলে ভালো লাগত পরিমলের।

যেন তখনই সে আন্দাজ করতে পারছিল, রমলা অন্ধকারে এভাবে তার কাছে আসছে কেন।

'কে—'

'আমি।'

'রমলা!'

কথা না বলে রমলা ঘাড় কাত করল।

'এত রাত্রে? তুমি ঘুমোওনি?'

'একটু দরকার ছিল আপনার কাছে।'

'আমার কাছে? হঠাৎ? পরিতোষ ঘুমোচ্ছে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ—' যেন একটু ইতস্তত করল রমলা বলতে, 'এইজন্যই এলাম।'

'আমাকে কিছু বলবে?' সংশয় কাটছিল না পরিমলের, ভয়টা আর তত ছিল না যদিও, কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করছিল সে। 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আপনাকে একটা জিনিস দিতে এলাম।'

'কেন! কী জিনিস?' বিস্মিত হল পরিমল, কাগজে মোড়া কিছু একটা রমলা তার দিকে বাড়িয়ে দিতে সেটা সঙ্গে সঙ্গে সে হাতে নিল। হাতে নিয়ে জিনিসটা অনুভব করতে লাগল।

'দেবতাকে কিছু দিয়ে মানুষ তৃপ্তি পায়, আনন্দ পায়—আমার সেই তৃপ্তি সেই আনন্দ।'

পরিমল কথা বলতে পারছিল না। একটা কিছু মূল্যবান উপহার তার হাতে এসেছে সে বুঝতে পারছিল। বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল সে।

'আপনার টাকার দরকার, আমার কাছে টাকা নেই, তাই গায়ের এই জিনিসটা দিলাম, আপনার কাজে লাগবে।' আবেগে উত্তেজনায় রমলা কাঁপছিল, অন্ধকারেও টের পাচ্ছিল পরিমল।

'কিন্তু পরিতোষ রাগ করবে, জানতে পারলে তোমার শ্বশুর ভয়ানক রাগারাগি করবেন- একটা অদ্ভুত আবেগ উত্তেজনা পরিমল নিজের মধ্যেও অনুভব করছিল। একটু থেমে আবার বলল, 'তা ছাড়া সবাই আমাকে ঘৃণা করে, তাদের চোখে আমি.......'

'আমি আপনাকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি', ভাশুরকে কথা শেষ করতে দিল না রমলা, 'তারা রাগ করবে বলে আমি আপনাকে কিছু দিতে পারব না, চুপ করে থাকব, অমন দুর্বল মন আমার নয়।' আর দাঁড়াল না রমলা, আস্তে আস্তে আবার ওদিকের অন্ধকারে ফিরে গেল।

॥ ৪১ ॥

ঘরে এসে পরিমল ত্রস্ত হাতে মোড়কটা খুলে ফেলল। একটা নেকলেস। আগুনের শিখার মতন জ্বলজ্বল করছিল। এটা কি রমলা সর্বদা গলায় পরত, না বাক্সে তোলা ছিল, ঠিক মনে করতে পারল না সে। ভাইয়ের স্ত্রীর গলার দিকে আজ পর্যন্ত কবার আর সে তাকিয়েছে! হয়তো কোনো সময়ই তেমন করে তাকায়নি।

অন্য কথা ভাবছিল সে। তার চোখ মুখ দীপ্ত প্রসন্ন হয়ে উঠল। জিনিসটা গ্রহণ করতে গিয়ে সংকোচ ও সংশয়ের শেষ ছিল না। সব কেটে গেল।

রমলা কি এটা তাকে দিয়েছে? পরিমল অন্যভাবে চিন্তা করল, সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে জিনিসটা বিচার করল। এবং এভাবে বিচার করাই তার কাছে শোভন ও সঙ্গত মনে হল। ঈশ্বর রমলার হাত দিয়ে এই হার তার হাতে পৌঁছে দিয়েছেন। এখনও পৃথিবীর কিছু কিছু মানুষের মধ্যে দয়া মায়া সহানুভূতি প্রভৃতি জিনিসগুলি রয়ে গেছে।

এবং সেদিনও তাই তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল। গা ধুতে গিয়ে রমলা আংটিটা হাত থেকে খুলে বাথরুমে রেখে এসেছিল, ভাশুর এসে নিয়ে যাবে।

তাই তো, বিয়ের আংটি আঙুলে কামড় খেয়ে লেগে থাকে, এই জিনিস সহজে খুলে পড়ে যাবার নয়। হারিয়ে যাবার নয়।

এতটা সফল হয়েছিল সে, এতদূর অগ্রসর হয়েছিল। ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রেখে চলতে পারছে বলে তা হয়েছিল। তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস সূর্য হয়ে জ্বলছিল।

কিন্তু এখন এই ডুমুরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কেমন নিষ্প্রভ নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিল সে, অত্যন্ত দুর্বল লাগছিল নিজেকে। তার যেন মনে হচ্ছিল নিলয়ের সঙ্গে পানকৌড়ি শিকার করতে ছুটে যাবার চেষ্টা করলে তবু কিছুটা সফল হওয়া যেত।

'পরিমলদা!'

'বল।'

গাছের ছায়ার দিকে চোখ ফেরাল না সে, জোর করে রৌদ্রের দিকে হলুদ ফুলের ঢেউয়ের দিকে চোখ দুটো ধরে রাখল পরিমল। পিছনের ঝোপে ঘুঘুটা আবার ডাকতে আরম্ভ করল।

'আমি কিন্তু চা ঢালছি।' বুলা তাড়া দিল। 'এবার পিঁপড়ে ধরবে আপনার খাবারে।'

শালপাতায় খাবার সাজিয়ে বুলা আরো দুবার ডেকেছে।

ঘাসের ভিতর থেকে পিঁপড়ে বেরোচ্ছিল যেন।

'নিলয় আসুক।'

পরিমল একটা দলছাড়া পানকৌড়িকে অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যেতে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে বুলার কথার জবাব দিল সে। 'তুমি খেয়ে নাও— তোমার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।'

'ধ্যেৎ, একলা খাওয়া যায় না।'

'তবে নিলয় আসুক।'

'ও কি এখন আসবে—শিকার নিয়ে মেতে গেছে।'

'তাই তো দেখছি, আমি তখন থেকে তাকিয়ে রয়েছি—দেখাই যাচ্ছে না শ্রীমানকে।'

'আসবে ঠিকই এসে যাবে—' একটু বুঝি ভাবল বুলা, বলল, 'ওদিকটায় নিশ্চয় একটা বড়ো জলা-টলা আছে।'

এবার পরিমলকে ঘাড় ফেরাতে হল। নিলয় যেদিকে গেছে বুলা সেদিকে আঙুল তুলে ধরেছে।

'হবে হয়তো', বিড়বিড় করে পরিমল বলল, 'জলের গন্ধ পেয়েই পানকৌড়িরা ওদিকে ছুটেছে।' আঙুলের মাথাটা টুকটুকে লাল হয়ে আছে বুলার, আলতা পরেছিল পায়ে? গালে রুজ মেখেছিল? মুখে পায়ে সেরকম কোনো রঙের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু। তবে কি ওর মনের রং উপচে পড়ে খানিকটা আঙুলের ডগায় উঠে এসেছে। এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, বোঝা যাচ্ছিল না, দিগন্তবিসারী নির্জন প্রান্তর, অফুরন্ত রৌদ্র, আশ্চর্য নীল আকাশ দেখে খুশিটা আর এখন ধরে রাখতে পারছে না ও।

স্বাভাবিক। সেই তুলনায় একটি পুরুষ কেমন স্তিমিত বিষণ্ণ গম্ভীর হয়ে আছে। মাঠ ও রৌদ্র পিছনে রেখে গাছের ছায়ার দিকে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়াল পরিমল। একটা শুকনো ঢোক গিলে আস্তে আস্তে বলল, 'বেশ একটু ভাবনায় পড়ে গেছি নিলয়ের জন্য।'

'আসবে, এসে যাবে, আপনি বসে ততক্ষণ চা খান।'

'কিন্তু যদি ও না আসে? যদি হারিয়ে যায়!'

চমকে উঠল বুলা। কালো চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল। 'হারিয়ে যাবে! কেন?' এক সেকেন্ড পরিমলের চোখের দিকে তাকাল সে।

পরিমল অল্প হাসল।

'না, বলছি যদি হারিয়ে যায় তোমার তখন একটু একটু ভয় করবে।'

'কেন, সেকী!' শব্দ করে হাসল বুলা। 'আপনি আছেন কী করতে। ভয় করবে তবু?'

পরিমল কথা বলল না। চোখ তুলে নধরকান্তি ডুমুর পাতাগুলি দেখতে লাগল।

'আর হারাবেই বা কেন।'

মাঠের দিকে চোখ ফেরায় বুলা। আঁকাবাঁকা পথ নেই, গলি-ঘুঁজি কিছু নেই—খোলা পরিষ্কার মাঠ ধু-ধু করছে। একটু এগিয়ে এলেই তো ও আমাদের দেখতে পাবে।'

'হ্যাঁ, যদি দেখতে না পায়—সেকথাই বলছি। মনে কর অন্য দিকে চলে গেল, আমাদের এদিকের মাঠে আর ফিরতে পারল না। ধু-ধু মাঠ অনেকটা সমুদ্রের মতন—অনেক সময় দিক ঠিক থাকে না।'

এবার যেন ও একটু ভাবনায় পড়ল। ফুলের মতন কাঁচা কচি মুখখানা শক্ত হয়ে গেল। ওদিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে এনে কিছুতেই এদিকে—পরিমলের দিকে তাকাতে পারছিল না। শরবিদ্ধ পাখি ছটফট করছে দেখে কেউ কেউ যেমন বেদনা পেয়েও হাসে, চোখের জলের পরিবর্তে ভিতরের দুঃখটাকে হাসি দিয়ে ঢেকে রাখতে ভালোবাসে, পরিমলও তেমন করে

হাসতে লাগল, অবশ্য শব্দ না করে। এ-জাতের হাসির শব্দ কম হয়—অনেক সময় হয় না। 'কি হল, সত্যি তা হলে ভয় পাচ্ছ?' পরিমল আর হাসল না।

বুলা চোখ ফেরাল।

'আমরা কি এগিয়ে যাব—সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকব!'

'আমার মনে হয় না খুব কাজ হবে—এতক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে সে। কাছাকাছি কোথাও থাকলে এক-আধবার দেখা যেত।'

'তা হলে চলুন আমরাও এদিকে ওদিকে এগোতে থাকি।' বুলা উঠে দাঁড়াল।

পরিমল খপ করে তার হাত ধরল। অপ্রস্তুত হতে গিয়েও বুলা হাসল।

'কী হল, আমরা যাব না?'

'কোথায় ?'

'নিলয়কে খুঁজতে?'

'কেন, তোমার ভয় করছে?'

'কীসের ভয়?' বুলার হাসি নিভে গেল যদিও। হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল না। তবু পরিমল মুঠ শক্ত করল। বুলা চুপ।

'কী হল, কথা বলছ না?' পরিমল তার হাতে অল্প ঝাঁকুনি দিল।

মাটির দিকে চোখ নামাল ও।

'আমার দিকে তাকাও।'

'বলুন।' অস্পষ্ট ধরা গলা, একটু-একটু কাঁপছিল বুলা। চোখ তুলল না।

'আমার দিকে তাকাও তুমি।' পরিমল চিৎকার করে উঠল। শব্দটা মাঠের ওপর দিয়ে দূরে ভেসে গেল। দুজন কথা বলতে আরম্ভ করার সময় থেকে ঘুঘুটা থেমে গিয়েছিল। তারপর আর একবারও ডাকেনি। পৃথিবীটা কেমন শূন্য নির্জীব মনে হচ্ছিল। যেন প্রচুর রৌদ্র, মেঠো হাওয়া ও সর্ষে ফুলের আশ্চর্য মিষ্টি গন্ধ থাকা সত্ত্বেও একটা বোবা নিশুতি রাত আরম্ভ হয়েছে সেখানে। বুলা তখনও ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে। আড়ষ্ট হয়ে আছে। কাঠের মতন শক্ত লাগছিল ওর হাতটা। পরিমল হাত ছেড়ে দিল।

'কী হল!' বুলা চোখ তুলল, একটু যেন সহজ নিশ্বাস ফেলল। আঁচলটা কাঁধ থেকে প্রায় খসে পড়েছিল। ঠিক করে নিল। যেন এবার তার প্রশ্ন করার পালা, অবাক হবার পালা। 'পরিমলদা!' আস্তে ডাকল ও।

পরিমল মাঠের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

'কথা বলছেন না কেন?' বুলা অসিহষ্ণু হয়ে উঠল। 'কীসের ভয় বলছিলেন?'

প্রশ্নের উত্তর দিতে পরিমল আবার যখন ওর দিকে তাকাল, বুলা চমকে উঠল। এত বড়ো মানুষটার দুই চোখ জলে ভরে গেছে। কিন্তু বিস্ময়ের ভাবটা আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে বুলা চেপে যেতে পারল। ফিক করে হাসল।

'ওকি! হঠাৎ আপনি মন খারাপ করছেন?'

'আমি হেরে গেছি।' পরিমলও হাসল, নীচের ঠোঁটটা কাঁপছিল, দুঃখ লুকোতে একটু আগে যেমন হেসেছিল। 'আমি তোমার কাছে হেরে গেলাম বুলা।'

'কেন!' বুলার হাসির শব্দ বড়ো হল। 'আমরা কি পাল্লা দিয়ে ছুটছিলাম, কে আগে ছুটে

এসে ডুমুর গাছটা ছুঁতে পারে? না কি আড়াআড়ি করে পাখি শিকার করছিলাম, কে কত বেশি পানকৌড়ি মাটিতে ফেলতে পারে?'

'সেখানে অবশ্য তুমি হেরে যেতে।' গম্ভীর গলায় পরিমল বলল, 'সেসব প্রতিযোগিতায় আজও আমায় হুট করে কেউ হারিয়ে দেবে বিশ্বাস করি না।'

'তা তো নয়ই।' পরিমলের বলিষ্ঠ সুন্দর শরীরের দিকে প্রসন্ন চোখে তাকাল মেয়েটি। আরতির আলোর মতন তার চোখের তারা উজ্জ্বল ও বড়ো হয়ে উঠল। একটু সময় কথা না বলে ও চুপ করে রইল। তারপর একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'তবে আর হার হল বলছেন কেন, আপনাকে কে হারাতে পারে।' অত্যন্ত মিষ্ট শোনাল বুলার গলা।

'তুমি, তুমি, তুমি।' রুক্ষ কঠিন গলায় পরিমল সঙ্গে সঙ্গে আবার চিৎকার করে উঠল। শব্দটা বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ল। ভয় পেয়ে ঝোপের ভিতর থেকে ঘুঘুটা উড়ে বেরিয়ে গেল বলে মনে হল। বেত ডগাগুলি নড়ে উঠল। 'তুমি যে ভয় পাচ্ছ লুকোতে পারছ কি—পারছ না।' পরিমল এবার ওর হাত ধরল না, সরু কাঁধ দুটো সবল শক্ত হাতে চেপে ধরল। 'বলো, আমার কথার উত্তর দাও, এদিকে তাকাও।'

ভীত বিহ্বল আড়ষ্ট চোখ তুলে বুলা পরিমলের মুখের দিকে তাকাল, যেন না তাকিয়ে উপায় ছিল না, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মানুষটা, চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে, নাকের ছিদ্র ফুলে উঠেছে। ঘন গরম নিশ্বাস ফেলছে। এমনও চিন্তা করল বুলা, যেন কথা না শুনলে এখনই তার কাঁধ ছেড়ে দিয়ে পরিমলদা তার গলাটা টিপে ধরবে। তার ইচ্ছা করছিল পিছনে হাত বাড়িয়ে ডুমুর গাছটা আঁকড়ে ধরে, একটা কিছুর আশ্রয় নেয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বুলা আগের মতন আর-একবার হাসতে চেষ্টা করল। পারল না। ঠোঁট দুটো ঈষৎ প্রসারিত হল মাত্র। এবং বিড়বিড় করে শুধু বলতে পারল, 'ইস, এমন ছেলেমানুষ হয়ে যান আপনি এক-এক সময়।'

'তাই তো,' তেমন আর চিৎকার করল না পরিমল, তা হলেও গলার স্বরটা বিকৃত অস্বাভাবিক শোনাল, 'আমি ছেলেমানুষ, বারো বছরের নিলয়ের চেয়েও ছোটো, চার বছরের একটি শিশুর মতন অবুঝ অশান্ত, এই জন্যই আমাকে তোমার এত ভয়—'

'না তো,' বুলা মাথা নাড়ল, খুব খারাপ লাগল তার, আবার পরিমলদার চোখে জল দাঁড়িয়েছে। অন্য দিনও তিনি ছেলেমানুষী করেন, কিন্তু আজকের ছেলেমানুষী সম্পূর্ণ অন্যরকম, কথা, তাকানো বড়ো অস্বাভাবিক। এভাবে তিনি আর একদিনও তার হাত চেপে ধরেননি, কাঁধে হাত রাখেননি; তাছাড়া এমন হু-হু করে কেঁদে ওঠা! ভয় তো করছিলই, কষ্টও হচ্ছিল বুলার। আজ এখানে এই মানুষটির পরিবর্তে যদি আর-একটি মানুষ এসে দাঁড়াত, প্রদোষ, আর এই গম্ভীর নির্জনতা, এমন অদ্ভুত সুন্দর গাছের ছায়া, কাকপক্ষীটিও দুজনকে দেখছে না, কী সাংঘাতিক ব্যাপার করে তুলত সে? কতবার যে ওই ছেলে চুমু খেতে চেষ্টা করত, চুমু খাওয়া, গায়ে হাত দেওয়া, জামাটা খুলে ফেল, ওটা সরিয়ে দাও, কত কী যে আব্দার করত, বুলা অবশ্য সেখানে কঠিন হতে পারত, ধমক দিত প্রদোষকে। হুঁ, চড়-চাপড়টাও চট করে তার হাতে আসে বইকি, নিলয়কে কি এখনও কম মারধর করে সে—মোটের উপর বেশি ফাজলামি আরম্ভ করলে প্রদোষকে গালমন্দ দেওয়া, চড়-চাপড়

দেওয়া—ও্কে জব্দ করতে কিছুই বাদ রাখত না বুলা, এবং পারতও জব্দ করতে, ভালোমতন শিক্ষা দিতে। আর সেক্ষেত্রে একটা সুবিধা ছিল, প্রদোষকে বোঝা যেত, সে কী চাইছে তার চোখ দেখে আয়নার ভিতরের ছবির মতন সব পরিষ্কার করে ফেলত বুলা। কিন্তু এখানে মুশকিল, মানুষটার অনেক বয়স, তার দাদা প্রলয়—প্রলয়ের চেয়েও বয়সে এক-আধ বছরের নয়, সাত-আট বছরের বড়ো এই ভদ্রলোক। তা তো হবেই, তাদের সকলের বড়ো দাদা, মলয়ের বন্ধু ছিলেন যিনি এককালে। বড়দার চেহারাটা ভালো করে বুলা মনেই করতে পারছে না। এইটুকু বাচ্চা মেয়ে ছিল সে। তারপর তো চিরকালের মতন বড়দা তাদের ছেড়ে চলে গেল। এই মানুষটিই খুন করেছিল। সে যাই হোক, তারপর তো কত বছর কেটে গেল। দশটা বছর জেল খেটে বেরিয়ে এসেছে পরিমলদা। প্রথম যেদিন বাবার সঙ্গে দেখা করতে তাদের বাড়ি গিয়েছিল, সেদিন এঁর চেহারা দেখেই বুলা বুঝেছিল, খুন করা এই মানুষের স্বভাব নয়—একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছিল। খেলার সাথিরা পরস্পর ঝগড়া করে, মারামারি করে। ঢিল ছুঁড়ে একজন আর-একজনের মাথা ফাটিয়ে দেয়, রক্তপাত ঘটায়। আসলে যে হাতের ঢিল এমন মারাত্মক একটা অস্ত্রে পরিণত হয়ে খেলার সাথিটিকে জখম করবে, যে ঢিল ছুঁড়ল, সে হয়তো ধারণা করতে পারল না, পরে তার অনুতাপ হল, দুঃখ হল বন্ধুর জন্য, কাঁদলও—এ-ও তেমনি। না, অন্তত আর যা-ই ভাবুক, এই মানুষকে দেখে বুলার একদিনও মনে হয়নি তিনি খুন করেছিলেন বা ভবিষ্যতে আবার এমন একটা কাণ্ড করবেন। বরং উল্টোটাই মনে হয়েছে। অত্যন্ত দয়াবান, নরম প্রকৃতির মানুষ। শান্ত ভদ্র পরিচ্ছন্ন মন। এবং কেমন যেন খেয়ালি, বেশ একটু আত্মভোলা।

কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। ভয়ংকর কষ্ট হচ্ছিল বুলার পরিমলদাকে বুঝতে। ছেলেমানুষী কথাটা সে মুখে বলল বটে, কিন্তু এ ঠিক সেই জিনিসও নয়। ভয়ানক দুর্বোধ হেঁয়ালি ঠেকছে বয়স্ক মানুষটাকে—বস্তুত কী চাইছেন তিনি—আর তাঁর মনের কথাটাই বা কী, হঠাৎ এমন অদ্ভুত আচরণ কেন, কতক্ষণ হয় নিলয় এখান থেকে সরে গেছে? দশ মিনিটের বেশি হবে না। এতক্ষণ বেশ হাসছিলেন, গল্প করছিলেন, নিলয় চলে যাবার পর থেকে কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন, মাঠের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, দুবার চা খেতে ডাকা হল, কিন্তু যেন শুনেও শুনলেন না। কিছু একটা নিয়ে যে খুব চিন্তা করছিলেন, বুলা বুঝতে পারছিল, নিলয় কখন ফিরবে, এই জন্য তিনি তেমন ভাবছিলেন কি, তাই বললেন বটে, কিন্তু বুলার মনে হল, নিজের কথাই তিনি বেশি ভাবছিলেন, যেন কী একটা বিষয় নিয়ে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে আচমকা এই প্রশ্ন ঃ তোমার ভয় করছে? বলতে বলতে বুলার হাত চেপে ধরা, কাঁধ চেপে ধরা, দেখতে দেখতে দু চোখ জলে ভরে উঠল, বুলা তাকে হারিয়ে দিচ্ছে—

এবং বুলা এ-ও অস্বীকার করছে পারছে না, বাবা ও দাদা ছাড়া অন্য সব পুরুষের চোখে, বিশেষ করে যাদের বয়স সতেরো-আঠারো পেরিয়ে গেছে—নিচে সতেরো-আঠারো ওপরে পঞ্চাশ-ষাট—হয়তো তারও বেশি, ষাট অতিক্রম করেছে এমন বৃদ্ধের চোখেও বুলা একটা জিনিস ঝলসে উঠতে দেখেছে, হয়তো পৃথিবীর সব মেয়েকেই পুরুষের চোখের ভিতর এই বিদ্‌ঘুটে ঝলসানিটা জীবনে অন্তত কয়েক লক্ষ বার দেখতে হয়েছে। কোনো কোনো চোখ

একবার মাত্র ঝলসে উঠে পরক্ষণে নিভে যায়—কারো চোখ দেশলাইয়ের কাঠির আগুনের মতন দু মিনিট বিনিয়ে বিনিয়ে জ্বলতে থাকে—তারপর পুড়ে ছাই হয়ে যায়! কিন্তু এমন চোখ বুলা দেখেছে, মশালের মতন জিনিসটা জ্বলেই চলেছে—কোনোদিন নিভবে বলে মনে হয় না; সেদিন চায়ের দোকানের অন্ধকার মতন খুপরির ভিতর ঢুকেই প্রদোষের চোখ ঝলসে উঠতে দেখেছিল বুলা। আর তখন তার মনে হয়েছিল, প্রদোষ বুঝি এবার থেকে সত্যিকারের পুরুষ হতে চলল, এতদিন খেলার সাথির মতন, প্রতিবেশী বালকের মতন ছিল, তাদের ঘরে এসেছে বসেছে গল্প করেছে, বুলার মার সঙ্গে কথা বলেছে, বাবার সঙ্গে কথা বলেছে, দরকার মতন তাঁদের ফাই-ফরমাশ খেটেছে—কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না তার মধ্যে; সে যে পুরুষ, মেয়ে দেখলে জ্বলে উঠতে পারে, সেদিন চায়ের দোকানে ঢুকে বুলা প্রথম বুঝতে পারল—অবশ্য জিনিসটা সে বাড়তে দেয়নি, অত্যন্ত গম্ভীর কাঠ-কাঠ হয়ে ছিল বলে চুমো খাওয়ার পর প্রদোষ কেমন যেন দপ্ করে নিভে গেল।

হ্যাঁ, ঠিক সেই আগুন, সেই বিদ্যুৎচমক এই খেয়ালি আত্মভোলা বয়স্ক মানুষটির চোখেও বুলা দুবার দেখল, যখন তার কাঁধের ওপর শক্ত হাত দুটো দিয়ে চাপ দিল, যেন কাঁধ ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার গলা চিবুক টিপে ধরার উপক্রম করল, গরম গরম নিশ্বাস ফেলল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠল এবং তার মনে হল, অন্য সব পুরুষের চোখের তুলনায় এই চোখের আগুন সহস্রগুণ প্রখর উজ্জ্বল, মাথা ঝিমঝিম করছিল বুলার, আগুনের ঝলকটা তাকে কেমন অন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কোনোমতে সামলে উঠল। হয়তো চোখে জল দেখেই বুলা সামলে উঠতে পারল, তার নিজের চোখ তখনও ঠাণ্ডা হয়েছে, কিন্তু আগুন নিভে গেলেও পরিমলদার চোখের রঙ মুহুর্মুহু পাল্টাচ্ছে, ঘোর রক্তবর্ণ হঠাৎ পাটকিলে হয়ে গেল, তারপর ফ্যাকাশে হলুদ, তারপর বরফের মতন সাদা, তারপর নীল, নীলাভ পাণ্ডুর—আশ্বিনের আকাশে সন্ধ্যার মেঘ যেমন বার বার রঙ বদলায়: কী চাইছে মানুষটা? 'না, ভয় করবে কেন?' সাহস করে বুলা এক সময় বলল, 'সেদিন তো একলা আপনার সঙ্গে প্রায় সারা দুপুর ধর্মতলার রাস্তায় ঘুরে এটা-ওটা কিনলাম, আমার তো একটুও ভয় করেনি।'

'সেদিন নিলয় ছিল না'—পরিমল গম্ভীর গলায় বলল, 'কিন্তু রাস্তায় দোকানে অগুণতি মানুষের ভিড় ছিল, কলরব ছিল। এত নির্জনতা ছিল কি? এমন বোবা শূন্য মাঠ বন?'

'না, তা ছিল না।' ভয়ে ভয়ে বুলা মাথা নাড়ল। তার ইচ্ছা করছিল সেই মুহূর্তে নিলয় এসে যাক, হয়তো নিলয়কে দেখতে সর্ষে ফুল বোঝাই বিশাল প্রান্তরের দিকে চোখ ফেরাতে চেয়েছিল—পরিমল বাধা দিল, ধমক দিয়ে উঠল।

'আমার দিকে তাকাও।'

'বলুন', বুলা তবু ঠোঁট টিপে হাসছিল। যেন আর কিছু করার নেই, নিরুপায় নিঃসহায়, কুটো ধরে কোনোমতে টিকে থাকার মতন ঐ মিষ্টি হাসিটুকু অবলম্বন করে ও দাঁড়িয়ে থাকতে চাইল।

পরিমল মাথা ঝাঁকাল, অত্যধিক মাথা ধরলে মানুষ যেমন করে। তারপর স্থির হয়ে বুলার চোখে চোখ রাখল।

'জান আমি এখন তোমাকে যা খুশি তা করতে পারি?'

'না, পারেন না,' দৃপ্ত কঠিন গলায় বুলা উত্তর করল।

'কেন পারি না?'

'সবাই সব কিছু পারে না।'

'তার অর্থ?' চোখ দুটো ছোটো হয়ে গেল পরিমলের। হঠাৎ এক সেকেণ্ড চুপ করে রইল।

মুখ নামিয়ে পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁটতে লাগল বুলা, যখন মুখ তুলল দেখা গেল দুই চোখ জলে ভরে গেছে। চোখে জল, অথচ মুখে সেই মিষ্টি হাসিটুকু নিভতে দিচ্ছিল না ও, বলল, 'অন্য সব পুরুষের সঙ্গে আপনার মিল নেই।'

'কেন নেই?'

আর যেন উত্তর খুঁজে পেল না বুলা। চুপ করে-রইল।

'কথা বল।' পরিমল ধমক দিল।

বুলা দুহাতে মুখ ঢাকল।

'বল বল, তোমাকে বলতেই হবে।' ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছিল পরিমলের, আবার কঠিন শক্ত হাত দুটো তুলে বুলার নরম সরু কাঁধ দুটো সে চেপে ধরল। যেন কঠিন চাপে বুলার কাঁধের হাড় মুড়মুড় করে ভেঙে যাচ্ছিল। যন্ত্রণায় অস্ফুট চিৎকার করে উঠল সে।

'বল বল, আমি কে, আমি কী—' উন্মাদের মতন পরিমল মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

॥ ৪২ ॥

তবু এতদিন ভালো ছিল। চুপ করে ঘরে বসে থাকত বিশাখা। জানালার গরাদে কপাল ঠেকিয়ে লিচুগাছের ছায়ায় ঢাকা রাস্তাটা দেখত। কখনও কাঁদত, কখনও হাসত। এখন সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরছে। আগে যখন বাইরে গেছে তখন চাকরি করতে গেছে। সারাদিন স্কুলে কাটিয়েছে। এখন সকাল দুপুর বিকেল কাটছে বালিগঞ্জের রাস্তায় রাস্তায়। কখনও হাঁটছে, বিড়বিড় করে নিজের মনে কিছু বলছে, কখনও দেখা গেল একটা গাছের নীচে চুপ করে দাঁড়িয়ে পাখি দেখছে, গাছের পাতা দেখছে, নিজের মনে হাসছে, এবং বিড়বিড় করে আবার যেন কী বকছে।

তবু ভালো, বাড়িতে ঢুকছে না। বাবা-মার সামনে যাচ্ছে না। বা অন্য কারো বাড়িতেও না। তা হলে লজ্জার শেষ ছিল না, ভয়ও যথেষ্ট ছিল তাতে। এদিক থেকে বিশাখা নিজেই বেশ সচেতন বোঝা যায়। বাবা মা তো নয়ই, পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা আছে এমন রাস্তায় কখনও সে হাঁটবে না। তাই রীণা কিছুটা নিশ্চিন্ত।

যদি নীলাদ্রিবাবু কী তাঁর স্ত্রীর চোখে পড়ত, বড়ো মেয়ে এভাবে বালিগঞ্জের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কী পরিচিত কেউ কথাটা তাঁদের কানে তুলত তো তাঁরা ভয়ানক রাগারাগি করতেন, রীণাকেই চাপ দিতেন, তোর দিদিকে ঘরে বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা করবি, নয়তো রাঁচি-টাঁচি কোথাও পাঠিয়ে দে, ওটার মাথার ঠিক নেই, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে এসে এভাবে যে একলা একটা বাড়িতে থাকে তার মাথা যে একদিন খারাপ হবে আমরা জানতাম।

অর্থাৎ দিদিকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেওয়া ও এভাবে আলাদা একটা বাড়িতে রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত বাবা মা রীণাকেই গালমন্দ দিতেন। এমনি তো বড়ো মেয়ের জন্য লজ্জায় তাঁদের মাথা কাটা যাচ্ছে, তার ওপর এখন এভাবে পাগলের মতন রাস্তায় ঘুরে বাপ-মার মুখে আরও খানিকটা কালি লেপে দেওয়ার কী অর্থ আছে। রীণাকে অনেক কথা শুনতে হত।

এই জিনিস এখনও হয়নি। তা হলেও রীণাকে কি কম সাবধান থাকতে হচ্ছে। মাথা-খারাপ মানুষ। রাস্তায় বেরিয়ে কখন কী করে বসে ঠিক কী। কিছু না করুক, সময় সময় যেমন আকাশের দিকে চোখ তুলে দিয়ে নিজের মনে বকতে বকতে গাড়িঘোড়া ভর্তি এক একটা রাস্তা পার হয় তখন গাড়ির নীচে চাপা পড়তে বা কতক্ষণ। রোজ শহরে এভাবে কত অ্যাক্সিডেণ্ট হচ্ছে।

আর রীণা তো দেখছে না, কখন দিদি ডাফ্ স্ট্রীটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বালিগঞ্জে চলে এল। কখন বা বাড়ি ফিরল। হয়তো সারাদিন ফিরলই না। অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় একটা পার্কের বেঞ্চিতে বসে হয়তো দুপুরটা কাটিয়ে দিল। রীণাকে কাজে বেরোতে হয়। কলেজে পড়াতে যেতে হয়। সকালে তার পক্ষে সম্ভব হয় না ডাফ্ স্ট্রীট ছুটে যাওয়া। কলেজ সেরে একবার ওখানে উঁকি দিয়ে আসে। জানা কথা দিদি ঘরে থাকবে না। কুসুম বা প্রীতি বউয়ের নিষেধ শুনতে বিশাখার বয়ে গেছে। সুতরাং আজও যে সে বালিগঞ্জের রাস্তায় ঘুরতে গেছে বুঝতে রীণার একটু কষ্ট হয় না। রীণা তখন বালিগঞ্জ ছুটে যায়। কিন্তু বালিগঞ্জ কিছু একটুখানি জায়গা নয় যে, সেখানে ছুটে যাওয়া মাত্র বিশাখাকে খুঁজে বার করা যাবে। একদিন হাঁটতে হাঁটতে রীণা লেক পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। সেখানে একটা গাছতলায় বিশাখাকে দেখতে পাওয়া গেল। তখন ভরদুপুর। ছোটো বড়ো অগুনতি ঢেউয়ের মাথায় ঝকমকে রৌদ্রের মুকুট পরে লেকের কালো জল নাচানাচি করছিল। চারদিক ফাঁকা ধূ ধূ করছে। ঘাসের ওপর চুপ করে বসে তন্ময় হয়ে বিশাখা বুঝি সেই দৃশ্য দেখছিল। রীণা ধমক দিয়ে দিদিকে সেখানে থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এমন অসময়ে কেউ লেকের হাওয়া খেতে বেরোয়! একদিন বিশাখাকে পাওয়া গেল যতীনদাস রোডের মোড়ের কাছে। বাস থেকে সবে বুঝি তখন নেমেছিল। রীণাকে দেখতে পেয়ে একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়তে চেয়েছিল বিশাখা। রীণা সেখান থেকে দিদিকে ধরে আনে। আর একদিন তাকে দেখা গিয়েছিল একডালিয়া রোডের মুখে। রীণার বুকের ভিতর ধড়াস করে উঠেছিল। জগমোহন ডাক্তার তো ওপাড়া ছেড়ে চলে গেছে কোন জন্মে, পরিচিতদের মধ্যে আর কেউ থাকুক বা না থাকুক, একটু এগিয়ে গেলেই গিরিজাদের বাড়ি। গিরিজার দুই বোনকে রীণার সবচেয়ে বেশি ভয়। যদি সেদিন দৈবাৎ যূথী মল্লি বিশাখাকে এভাবে রাস্তায় ঘুরতে দেখতে পেত তো তারা ঐ একটা ঘটনা নিয়েই হাজারটা গল্পের ফুলঝুরি তৈরি করে ফেলত। আর সে সব গল্প দিনের পর দিন লোকের কাছে বলে বেড়াবার লোভ তারা কিছুতেই সংবরণ করতে পারত না। তারা জেনে গিয়েছিল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পরিমল বালিগঞ্জে অক্ষয় উকিলের বাড়ি আনাগোনা করছে— আবার পরিমলের সঙ্গে বিশাখার যে একদিন গভীর প্রেম ছিল তা-ও তারা জানত। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর এ পর্যন্ত বিশাখাকে বালিগঞ্জে কেউ দেখতে পায়নি। ডাইভোর্সের কথাটা তারা গিরিজার মুখে শুনেছিল। আজ হঠাৎ বালিগঞ্জের রাস্তায় এমন উদাসিনীর বেশে

বিশাখা ঘুরছে কেন? কী খুঁজছে সে, কাকে খুঁজছে—যূথী মল্লি তখনই মাথা খাটিয়ে একটা চমক লাগানো গল্প তৈরি করে ফেলত, তারপর সেই গল্প ছড়িয়ে দিত বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ ভবানীপুর বেহালায়। নাচ গান থিয়েটার জলসা জয়ন্তী নিয়ে সারা বছর দুই বোন মেতে আছে। তাই সারা দক্ষিণ কলিকাতা জুড়ে আছে তাদের অসংখ্য বন্ধু ও বান্ধবী। রীণা ভয়ানক রাগ করেছিল সেদিন। 'তোমাকে আর ঘরে থেকে বেরোতে দেওয়া হবে না। বেঁধে রাখতে হবে। আর জায়গা পেলে না মরতে, শেষটায় একডালিয়া রোড ছুটে এলে। এখানে কারা থাকে জান না?'

বিশাখা ফ্যালফ্যাল করে ছোটো বোনের মুখ দেখছিল। কেননা, এই প্রথম তাকে বেঁধে রাখার কথা শুনল সে। যেন তাই একটু সময় চুপ করে কী ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আমার মাথা কি এতই খারাপ হয়েছে রীণা, ঘর বেঁধে রাখার অবস্থা হয়েছে!'

'অনেকটা তাই। এ পাড়ায় যূথী মল্লি থাকে তোমার মনে রাখা উচিত—ওরা তোমায় এভাবে রাস্তায় ঘুরতে দেখলে যা-তা বলতে আরম্ভ করবে, পরচর্চা পরনিন্দা ওদের ভয়ানক প্রিয়।'

'আমার মনে ছিল না রীণা, মাথার ভেতরটা সময় সময় এমন গোলমাল হয়ে যায়।' কাতর চোখে বোনের চোখের দিকে তাকিয়ে বিশাখা বলেছিল, 'তোর গিরিজার বোনেরা যে এ পাড়ায় আছে সত্যি ভুলে গিয়েছিলাম—আমি এসেছিলাম ওদের পুরোনো বাড়িটা একবার দেখে যেতে।'

এবার রীণার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। পরিমলদের পুরোনো বাড়ির কথা বলছে বিশাখা। ও-বাড়ির সঙ্গে যে অনেক স্মৃতি জড়ানো রয়েছে। তাই রীণা তখন চিন্তা করল, বালিগঞ্জের এখানে ওখানে অসংখ্য স্মৃতির টুকরো ছড়িয়ে আছে। স্মৃতিরোমন্থনের পালা চলেছে এখন বিশাখার, তাই সেদিন দুপুরে লেকের ধারে চুপ করে বসে ছিল—আর একদিন দেখা গিয়েছিল যতীনদাস রোডের মোড়ে বাস থেকে নামতে, আজ এসে পড়েছে একেবারে একডালিয়া রোডের মুখে। কিন্তু সব স্মৃতির মূলে যে মানুষটি রয়েছে, সরাসরি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারছে না বিশাখা। তা হলে তাকে যে নারকেলডাঙ্গা জগমোহন ডাক্তারের বাড়ি যেতে হয়, এখানে অক্ষয় উকিলের বাড়ি যেতে হয়।

কিন্তু সেসব বাড়ি বিশাখা যাবে কেমন করে। গিরিজার মতন রীণাও ঐ একটা কারণই ধরে রেখেছে। স্বামীকে ছেড়ে এসেছে বিশাখা। এই লজ্জা এই হীনতাবোধ তাকে বার বার বাধা দিচ্ছে।

কিন্তু সবটাই বুঝি স্মৃতিরোমন্থন নয়, রীণা সেদিন চিন্তা করেছিল, অক্ষয়বাবুর বাড়ি কী নারকেলডাঙ্গা না গিয়ে যদি পরিমলকে দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়, বা পরিমল যখন ঘন ঘন বালিগঞ্জ আসছে—তার সঙ্গে রাস্তায়ও দেখা হয়ে যেতে পারে—এমন একটা ক্ষীণ আশা বুকে নিয়ে বিশাখা বুঝি এই অঞ্চলে হাঁটাহাঁটি করছে।

রীণার অনুমান সত্য, পরিমলকে একদিন দেখল বিশাখা। মানুষটাকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই যে তার আনন্দের সীমা ছিল না রীণা সেদিন তার প্রমাণ পেল, কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা রূঢ় সত্য তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। একডালিয়া রোডের মোড় থেকে বিশাখাকে যেদিন ধরে এনেছিল রীণা, তার ঠিক একদিন পরেই আবার দিদিকে সে খুঁজে

বার করল যতীন দাস রোডের পিছনে একটা ছোটো পার্কের মধ্যে। তখন প্রায় সন্ধ্যা। একটা বেঞ্চিতে বসে আছে বিশাখা। চার পাঁচটি ছোটো ছেলেমেয়ে তাকে ঘিরে কলরব করছে। যেন বিশাখা খুব ভাব জমিয়েছে তাদের সঙ্গে। শিশুরা হাসছিল চিৎকার করছিল। একটা ঝোপের পিছনে দাঁড়িয়ে রীণা ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। ছোটো ছেলেমেয়েদের চিরদিনই ভালোবাসে তার দিদি। কিন্তু সেদিন যেন বিশাখার শিশুপ্রীতিটা অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল। এত বড়ো একটা খাবারের ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে সে বসে আছে, আর একটা দুটো করে খাবার তুলে শিশুদের বিলোচ্ছে। তারা ধাক্কাধাক্কি করছে, ঠেলাঠেলি করছে, উৎসাহ ও আনন্দের আতিশয্যে এক একটি শিশু বিশাখার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, 'আমায় এটা দাও,' 'ওকে ওটা দিলে আমি কিন্তু পেলাম না,' 'উহুঁ আমার সন্দেশটা ছোটো ছিল, এবার একটা সিঙ্গাড়া দাও—' 'বারে, তুমি ওকেই দুবার দিচ্ছ আমার দিকে তাকাচ্ছ না—' 'দিচ্ছি, সবাইকে দেব'—বিশাখা বলছিল, 'তোমরা এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, রোজ আমি এখানে আসব আর তোমাদের পেট ভরে সন্দেশ খাওয়াব।' হঠাৎ এই ভোজের আয়োজন কেন, রীণা বুঝতে পারছিল না। সন্দেশ খেয়ে তৃপ্ত হয়ে একটি মেয়ে চুপি চুপি বিশাখার পিছন দিকে এসে তার শাড়ির আঁচলে হাতখানা মুছে খিলখিল করে হাসতে হাসতে পার্ক থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে অবশ্য সে ঘাড় ঘুরিয়ে বার বার বলে গেল, 'তুমি কিন্তু রোজ আসবে, আমি এখানে বিকেলে খেলা করতে আসি।' 'আসব, নিশ্চয় আসব', বিশাখা হাত তুলে তাকে আশ্বাস দিল। তখনও অন্য শিশুরা বিশাখাকে ঘিরে আছে। এবার আর একটা মজার দৃশ্য রীণার চোখে পড়ল। আগের শিশুটির মতন আর একটি ছোটো ছেলে চুপি চুপি বিশাখার পিছনে এসে একটা কাঠির মাথায় খানিকটা ধুলো তুলে বিশাখার মাথায় ছুঁড়ে দিল। এবার একটি মেয়ে, অপেক্ষাকৃত বয়সে বড়ো, সম্ভবত ছেলেটির দিদি, ছোটো ভাইয়ের কান মলে দিল। 'এই পিণ্টু, এমন করছিস কেন রে, মিষ্টিফিষ্টি খেলি—এখন বাঁদরামী আরম্ভ করে দিলি!' প্রায় সমবয়সী আর একটি মেয়ে তৎক্ষণাৎ অভিযোগের সুরে বলল, 'সত্যি, তোর ভাইটা এমন অসভ্য—মাথায় ধুলো ছড়িয়ে দিল, পাগল হলেও মানুষটা খুব ভালো, কতগুলো পয়সা খরচ করে আমাদের সন্দেশ সিঙ্গাড়া খাইয়ে দিল।'

'হ্যাঁ গা, তুমি কোথায় থাক?' আগের মেয়েটি বিশাখাকে প্রশ্ন করল। বিশাখা মিষ্টি করে হাসল।

'আমি তো এখানে থাকি না ভাই, দিল্লী থাকি।'

'দিল্লীতে তোমার কে আছে?' দ্বিতীয় মেয়েটি প্রশ্ন করল।

'তার আগে জিজ্ঞেস কর বিয়ে হয়েছে কিনা।' প্রথম মেয়েটি দ্বিতীয় মেয়েটির হাতে একটু চাপ দিল। 'এখানেই বা কার কাছে এসেছে, জেনে নে।'

'তোমার কি বিয়ে হয়েছে?' দ্বিতীয় মেয়েটি বিশাখার মুখের কাছে গলা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এখানে কার কাছে এসেছিলে?'

বিশাখা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। আকাশের দিকে চোখ তুলে কী যেন ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তোমরা এখনো অনেক ছোটো, এসব কথা জানতে নেই, যেদিন বড়ো হবে সেদিন সব বলব। সবই তোমরা জানতে পারবে।'

'আহা, ততদিন কি আর তুমি এখানে থাকবে—তুমি তো দিল্লী চলে যাবে।' শিশুর দল এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। বিশাখার উত্তর শুনে তারা মোটেই খুশি হল না।

'বল বল, না বললে তোমার জুতো পাবে না।' একটি শিশু বিশাখার চটি জোড়া পা দিয়ে চেপে ধরল।

'বল বল, না বললে তোমার ব্যাগ পাবে না।' একটি শিশু বিশাখার কোলের কাছে ছোঁ মেরে ব্যাগটা তুলে নিল। আর একজন ছাতাটা সরিয়ে নিল। 'ছাতাও পাবে না তুমি—আমাদের কথায় উত্তর না দিলে তোমার সব কিছু আমরা কেড়ে নেব।'

কিন্তু কাউকে কোনো রকম বাধা দিচ্ছিল না বিশাখা। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে সব দেখছিল। তারপর এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমরা আমাকে পাগল ঠাওরেছ, কিন্তু সত্যি কি আমি পাগল, তা হলে কি তোমাদের এত আদর করে খেতে দিতাম।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি পাগল, পাগলী', সেই বাঁদর ছেলেটি আবার খানিকটা ধুলো বিশাখার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। আর সহ্য হল না রীণার। ছুটে গিয়ে তাদের সামনে দাঁড়াল। তারপর চোখ বড়ো করে বলল, 'এই, কী হচ্ছে এসব।'

ভয় পেয়ে শিশুরা থমকে গেল।

'তোমরা কোথায় থাক?' রীণা এক এক করে সকলের মুখ দেখল ও ওদের হাত থেকে বিশাখার ছাতা ব্যাগ উদ্ধার করল। 'কেন একে জ্বালাতন করছিলে, দাঁড়াও এখনি প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে তোমাদের বাবা মাকে বলব।'

'না, দিদিমণি।' সকলের বড়ো মেয়েটি করুণ গলায় বলল, 'আমরা খেলা করছিলাম, মিছিমিছি একে এসব বলছিলাম, নামটাম বলতে চাইছে না, পরিচয় দিচ্ছে না, তাই—ছাতা ব্যাগ কিছুই নিতাম না। সত্যি।'

দ্বিতীয় মেয়েটি বলল, 'কদিন ধরে রোজ ইনি একবার এ রাস্তায় বেড়াতে আসেন, পার্কে এসে বসেন, আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। আজ কেন জানি খুব খুশি হয়ে আমাদের মিষ্টি খাইয়ে দিলেন।'

'তাই বুঝি সবাই মিলে পাগল পাগল বলছিলে,' গলার স্বর একটুও নরম করল না রীণা, 'আমি তো দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম, তোমরা এত অসভ্য! তোমাদের চেয়ে বয়সে কত বড়ো ইনি খেয়াল রাখ?'

শিশুর দল অধোবদন হয়ে রইল।

'যাও বাড়ি যাও, আর কোনো দিন এঁকে এভাবে জ্বালাতন করছ দেখলে আমি ঠিক তোমাদের বাবা মাকে গিয়ে বলে দেব—তখন মজা টের পাবে।'

আর দাঁড়াল না তারা, সুড় সুড় করে পার্ক থেকে বেরিয়ে গেল।

দিদির দিকে ঘুরে দাঁড়াল রীণা।

'আর কী, এখন তো রাস্তার পাগল হয়েছ—এবার থেকে ঘরে আটকে না রাখলে মুশকিল হবে, বুঝতে পারছ?'

'না রে রীণা', বিশাখা ম্লান হাসল, 'ওরা এমনি আমার সঙ্গে মজা করছিল, ছেলেমানুষ অতশত কী বোঝে।'

'ছেলেমানুষ তো বটেই, সব কটিকে তো আমি চোখে দেখলাম, পাঁচ থেকে আট দশ-

এর কোঠায় বয়স; কিন্তু তা হলেও ওরা বুঝে ফেলেছে, চিনে গেছে তুমি যে রাস্তার পাগল, তোমার মাথার ঠিক নেই।'

'আহা, তুই এসেই এমন রাগারাগি আরম্ভ করলি, শোন, আজ ভারি মজার একটা ব্যাপার হয়েছে।'

'আর মজার ব্যাপার আমার শুনে কাজ নেই—এবার বাড়ি চল, অনেক মজার জিনিসই তো চোখে দেখলাম, মিষ্টি খেয়ে আঁচলে হাত মুছল, ঠেলাঠেলি করে গায়ের ওপর এসে পড়ল ক'বার। মাথায় ধুলো ছিটিয়ে দিল—ছিছি, আরো কত কী দেখতে হবে আমাকে—এই রিকশা—' রাস্তা দিয়ে একটা রিকশা যাচ্ছিল, রীণা হাত তুলে ডাকল।

'করুক করুক, বাচ্চা সব, কী বোঝে ওরা—তাই আমি কিছু বলিনি—' বেঞ্চি ছেড়ে বিশাখাও উঠে দাঁড়াল, হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, আজ ওকে দেখলাম রে রীণা, উঃ কতকাল পর দেখলাম!'

কার কথা বলছে! রীণা চমকে উঠল প্রথমটায়, তারপর বুঝল। পরিমলকে দেখেছে। তাকে দেখতেই তো কদিন ধরে পাগল হয়ে দিদি রাস্তায় ঘুরছে। 'তখনো একটু একটু রোদ ছিল, কপালে গালে শেষ বেলার হলদে রোদ লেগে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল মানুষটাকে, আমি তোকে বোঝাতে পারব না রীণু, মনে হচ্ছিল যেন আমার চোখের সামনে দিয়ে কোনো স্বর্গের দূত যাচ্ছে, এমনি তো চিরকাল সুন্দর—আজ যেন দেখলাম, এত বছর পরে আরো সুন্দর হয়েছে আরো রূপবান হয়েছে সে।'

রীণা কথা বলছিল না। পার্ক থেকে বেরিয়ে দুজন রিকশার কাছে এসে দাঁড়াল।

'এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল', বিশাখা হাত তুলে দেখাল, 'রিকশা করে তারা ওদিকে—গোঁসাইপাড়া বস্তির দিকে চলে গেল।'

'বাড়ি গিয়ে শুনব, এবার তুমি গাড়িতে উঠে বসো তো লক্ষ্মীমেয়ের মতন।' গম্ভীর গলায় রীণা বলল, 'এখন তোমার একটা কথাও শুনব না।'

'উঃ, তুই যদি ওকেও দেখতিস, পরিমলের পাশে যে বসে ছিল, আমার কতবার ইচ্ছা হয়েছিল, দুজনকে যেন এক সঙ্গে দেখি, তাই কদিন ধরে কেবল ঈশ্বরকে ডাকছিলাম, ঈশ্বর আমার মনোবাসনা আজ পূর্ণ করল—' রিকশায় উঠবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না বিশাখার। আবেগের আতিশয্যে ছোটো বোনের একটা হাত চেপে ধরল। 'শোন রীণা, ডালিমের কচি ফুল দেখেছিস, সবে কুঁড়ি ফেটে বেরিয়েছে।? তেমনি কাঁচা কোমল লাবণ্যে গড়া সেই মূর্তি—না, না, মূর্তি তো নয়, এইটুকুন একটু পুতুল, যেন সবে ছাঁচ থেকে তুলে আনা হয়েছে, একেবারে নতুন ঝকঝকে একটি মুখ। হ্যাঁ, কিশোরীই বলা যায়—সতেরো আঠারো বছরের মেয়েকে যুবতী বলতে আজ এই বয়সে এমন যেন বাধো বাধো ঠেকে বিশাখার। যাক গে, কী বলছিলাম, হ্যাঁ, পার্কের ঐ বেঞ্চিটায় চুপ করে বসে ছিলাম আমি, রিকশাটা ওদিকের ওই বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হল। তখন ভাবলাম, চিন্তা করলাম, এই চেয়েছিল পরিমল, একটি পুতুল। ভালোবাসার রঙ লাগিয়ে লাগিয়ে হৃদয়ের তাপ ঢেলে ঢেলে পুতুলকে সে প্রতিমা করে তুলবে। সে যে আর্টিস্ট। শুধু ভালোবেসেই তৃপ্ত থাকবার মানুষ নয়। ভালোবাসার সঙ্গে নিজেরে সাধ স্বপ্ন কল্পনা মিশিয়ে নিজের মতন করে একটি মেয়েকে গড়ে তুলবে—যা সে চেয়েছিল চিরদিন—'

'উঃ, এত বক বক করছ রাস্তায় দাঁড়িয়ে।' রীণার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ছিল। 'তুমি বাড়ি যাবে কিনা বলো।' যেন দিদিকে জোর করে রিকশায় তুলে দিতে সে তার বাহুমূল ধরে জোরে নাড়া দিল। 'এখনই ভিড় জমতে আরম্ভ করবে। না কি তাই তুমি চাও।'

ধমক খেয়ে বিশাখা গাড়িতে চেপে বসল। রীণা উঠে পাশে বসল। অনেক দূরের পথ। কোথায় বালিগঞ্জ, কোথায় ডাফ্ স্ট্রীট। তা হলেও বিশাখা যেমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, পাগলের মতন বকতে আরম্ভ করেছে. এই অবস্থায় তাকে নিয়ে ট্রামে বাসে চলতে রীণা সাহস পাচ্ছিল না, ট্যাক্সি চোখে পড়লে না হয় একটা ট্যাক্সি ডাকা যাবে, মনে মনে সে ঠিক করে রাখল।

'বুঝলি বোন', রিকশা চলতে আরম্ভ করতে বিশাখা আবার মুখ খুলল। 'ওদের যখন আর দেখা গেল না, রিকশাটা চোখের আড়ালে চলে গেল তখন কেন জানি হঠাৎ দুজনের উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানালাম। যেন মনে হল আমি বিশুদ্ধ হয়েছি, পবিত্র হয়েছি, মন্দিরে বিগ্রহ দেখার পর মনের যে অবস্থা হয়, আমার যেন তাই হয়েছিল।'

আবার একটা ধমক দিতে বোনের মুখের দিকে তাকাতে রীণা নিজেই চুপ করে গেল। একটা নরম ঢোক গিলল। একটা সূক্ষ্ম কান্না তার গলার কাছেও তিরতির করে উঠল। রাস্তার আলোর ঝলক পড়েছিল বিশাখার মুখে। আজ বুঝি গাঢ় করে চোখে কাজল বুলিয়েছিল। তাই দু ফোঁটা জল মুক্তার বিন্দু হয়ে চোখের কিনারে টলটল করছিল, রিকশাটায় একটু ঝাঁকুনি লাগতে জলের ফোঁটা দুটো টুপ করে ঝরে পড়ল। রীণা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'শোন্ রীণা, তারপর পার্ক থেকে বেরিয়ে গেলাম, কী করে যে ভেতরের আনন্দটা প্রকাশ করব ঠিক করতে পারছিলাম না। তখন মোড়ের একটা মিষ্টির দোকানে ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি এক ঠোঙা খাবার কিনলাম। পার্কে ফিরে এসে, পাঁচ ছ'টি শিশু সেখানে খেলা করছিল, পেট ভরে তাদের মিষ্টি খেতে দিলাম।'

'বেশ করেছিলে।' রীণা আস্তে বলল, অনেকটা নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল, 'কী অসভ্য ছেলেমেয়ে।'

'আমি কি ওদের এসব দেখছিলাম, কী করছিল না করছিল তারা। আমি যে অন্য ছবি দেখছিলাম রীণা, আমার মাথার ভেতর সেই দৃশ্য বার বার ঘুরে ফিরে আসছিল।' বিশাখা সুন্দর করে হাসল।

রীণা কথা বলল না।

'অনেক দিন পর একটা কবিতা মনে পড়ছে—তোমাদের জামাইবাবু, দিল্লীর সেই অধ্যাপক ভদ্রলোকের মুখে শুনতাম—যাই বলিস রীণা, মানুষটা কিন্তু মোটেই খারাপ ছিল না, তোকে আরো কদিন বলেছি, সব দোষ আমার—' হাত দিয়ে কপাল ঠুকছিল বিশাখা, রীণা তার হাত চেপে ধরল।

'কী করছ এসব, তুমি কি বুঝতে পারছ না এটা রাস্তা, প্রকাশ্য জায়গা, যা-তা বলবে মানুষ—'

যেন আবার একটু স্থির হল সংযত হল বিশাখা। শান্ত গলায় বলল, 'আচ্ছা তা হলে কবিতাটাই শোন্—বিয়ের পর রোজ রাত্রে ওর মুখে শুনতাম, বিছানায় শুয়ে শুয়ে অধ্যাপক আবৃত্তি করত ঃ

If Love were what the rose is,
And I were like the leaf........

'ইস, চুপ করো চুপ করো।' রীণা চাপা গলায় দিদিকে ধমকাতে আরম্ভ করল। রিকশাটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। ট্রাফিক বন্ধ। সামনে লাল আলো জ্বলছে। আগে পিছনে সারি সারি অসংখ্য গাড়ি দাঁড়িয়ে। আর ঠিক এমন সময় কিনা বিশাখা হাত নেড়ে সুর করে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করছে! লজ্জায় রীণার মাথা কাটা যাচ্ছিল।

॥ ৪৩ ॥

রীনার মুখে সব শুনল গিরিজা। মুখটা কালো করে ফেলল সে। কী উত্তর দেবে বুঝতে পারছিল না।

রীনা বলল, 'আমাদের কারোর নিষেধ ও শুনবে না, তা ছাড়া পরিমলকে যখন একবার দেখতে পেয়েছে, আর বিশাখাকে আটকানো যাবে না, বালিগঞ্জের রাস্তায় সে ছুটে যাবেই। সেদিন যে কত কষ্ট হয়েছিল সেখান থেকে তাকে ফিরিয়ে আনতে। কাল আমি ভয় দেখিয়ে বলেছিলাম, 'তোমার ঘরের দরজায় তালা দেব না ঠিকই—কিন্তু বাড়ির বাইরে যাতে না যেতে পার তার ব্যবস্থা করব, সদর বন্ধ থাকবে, সেখানে আমি তালা ঝুলিয়ে রাখব।'

'তাতে কী বলল সে?' গিরিজা ভুরু কুঁচকাল।

'আমাকে মারতে আসে, কুসুম বাধা দিতে গিয়েছিল, কুসুমকে কামড়ে আঁচড়ে যা করল, তারপর সে কী ভীষণ চিৎকার, গেট বন্ধ করে রাখলে আমি ঘরের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরব, বিষ খাব, গায়ে স্পিরিট ঢেলে পুড়ে মরব—'

'জঘন্য ব্যাপার।' গিরিজার চেহারাটা বিকৃত হয়ে উঠল।

'তাই বলছিলাম', রীনা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'এভাবে তাকে ঘরে ধরে রাখা যাবে না। কথাটা বলতেই সে এমন ভায়লেন্ট্ হয়ে উঠল—'

'না না, এভাবে তুমি বিশাখাকে আটাকাতে পারবে না', ব্যস্ত হয়ে উঠল গিরিজা। 'গেট্ বন্ধ করতে গেলে তালাচাবি দিতে গেলে যা-তা কাণ্ড করে বসবে সে. হ্যাঁ. স্যুইসাইড করতে পারে বইকি, বাড়িতে কুসুম থাকবে, কুসুমকে শুধু আঁচড় কামড় না, কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করতে পারে—খুন করতে পারে অথবা সামনে আর কেউ থাকলে তাকেও যে—মাথার যখন ঠিক নেই—'

'কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আমার পক্ষে সব সময় তাকে চোখে চোখে রাখা সম্ভব না, আর রোজ কলেজ থেকে বেরিয়ে একটা মানুষকে এই রাস্তায় সেই পার্কে খুঁজে বেড়ানো—এত খারাপ লাগে, কিন্তু না করে উপায়ও নেই, কাল তো দেখলাম, বাচ্চাগুলো তার মাথায় ধুলো দিচ্ছে, ঠেলাঠেলি করে গায়ের ওপর পড়ছে, আঁচলে এঁটো হাত মুছছে—এবং আমার ভয়, জিনিসটা আরো বাড়বে, এসব জিনিস ক্রমশ বেড়ে যায়, আজ এই পার্কে বসেছিল. কাল বসবে অন্য পার্কে, সেখানে মাত্র পাঁচটি শিশু থাকবে না, হয়তো দেখা যাবে পঁচিশটি ছেলেমেয়ে জুটে গেছে, পরশু দেখা যাবে বাচ্চাদের সঙ্গে বয়স্করাও যোগ দিয়েছে। পাগল দেখলে কেবল্ শিশুরাই আনন্দ পায় না, বুড়োরাও সেখানে ভিড় করে দাঁড়ায়।'

'হুঁ, গিরিজা মাথা ঝাঁকাল, 'আর সেই পাগল যদি যুবতী হয়, দেখতে ভালো হয়— আমার তো মনে হয় এবার থেকে বালিগঞ্জের বখাটে রকবাজ ছোঁড়াগুলো বেশি জ্বালাতন করতে আরম্ভ করবে বিশাখাকে—'

গিরিজা যে ক্রুদ্ধ হয়ে বিরক্ত হয়ে এমন একটা মন্তব্য করল রীনা বুঝতে পারল। একটু সময় চুপ থেকে বলল, 'এভাবে যখন তখন রাস্তায় ঘোরা, পার্কে বসা, লেকের ধারে ছুটে যাওয়া—আমার তো মনে হয় এবং সেটাই আমার সবচেয়ে বেশি ভয়, আজকালের মধ্যেই বাবার কানে কথাটা উঠবে—মা শুনবে। বিশাখাকে তো তারা হাতের কাছে পাচ্ছে না, আর পেলেও মাথা খারাপ মেয়েকে তারা কী বলবে—কতটা বলবে, তখন সব দোষ পড়বে আমার ওপর, আমাকে তারা—'

রীণার চোখ ঝলছল করে উঠল।

গিরিজার মুখে কতগুলি ভাঙাচুরা রেখা জাগল। রীণার দুশ্চিন্তা উদ্বেগ ও কষ্টের কথা চিন্তা করেই যে সে বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছে বোঝা যাচ্ছিল। হাতের মুঠ দৃঢ় করে গিরিজা টেবিলটা দুবার ঠুকল, কঠিন চাপা গলায় বলল, 'দ্যাট্ স্কাউন্ড্রেল—আজ যদি অক্ষয় উকিলের বাড়ি ছুটে ছুটে না যেত তো বিশাখাই কি এভাবে রোজ সেখানে ছুটত—বই, এতদিন তো যায়নি—'

পরিমলের কথা বলছে গিরিজা। রীনা ঘাড় কাত করল। 'তাই, আজ যদি বিশাখা বালিগঞ্জে না গিয়ে শ্যামবাজার কী অন্য কোথাও, ধরা যাক পরিমলদের নারকেলডাঙ্গার রাস্তায়ই এভাবে পাগলের মতন ঘুরে বেড়াত তো একটুও ভাবতাম না, কেননা সেসব জায়গায় নিন্দা কুৎসা আমাদের ততটা পেত না, কিন্তু বাড়ির কাছে একেবারে ঘরের দরজায়—'

'তাই তো বলছি, স্কাউন্ড্রেলটা যে কত দিক দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করছে, কত ভাবে সর্বনাশ করছে—গোড়ায় ভেবেছিলাম নিতান্তই একটা ইডিয়ট, একটা বাচ্চা মেয়ের জন্য এই বয়সে তার জিভ দিয়ে লালা গড়াতে শুরু করল। এখন দেখছি ইডিয়টও বটে—ডেভিলও বটে বিশাখার এই প্রেমাস্পদটি। তুমি জান না, ওখানে, নারকেলডাঙ্গার বাড়িতে কী ভয়ঙ্কর সর্বনাশের আগুন জ্বেলে দিয়েছেন এই মহাপুরুষ, আমাদের লর্ড, যাকে একদিন শ্রদ্ধা করতাম।'

'কী করেছে সেখানে?' রীনার চোখ গোল হয়ে গেল।

'পরিতোষের স্ত্রী।' গিরিজা নাক কুঁচকাল। 'পরিমল ছাড়া জগৎ সংসার তার চোখে এখন অন্ধকার।'

'ধেৎ, তা হয় কখনো!' রীনা সবেগে মাথা নাড়ল। 'ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী—ভাশুর, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'বিশ্বাস করতে কি আমারই ইচ্ছা করে'—গিরিজা গলার নীচে হাসল। 'কিন্তু এর নাম সেক্স—এ জিনিস অনেক কিছু হওয়ায়, তুমি বিশ্বাস কর না এমন অনেক কিছু করায়।'

'আমার গা গুলাচ্ছিল শুনে। কিন্তু শুনতে হল। কাল সকালে ডাক্তার ফোন করে আমাকে তাঁর চেম্বারে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সব খুলেমেলে বললেন তিনি। নিজের ছেলে, ছেলের বউ, কিন্তু কিছুই গোপন করলেন না। কোনোদিনই অবশ্য করেন না। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথা, পারিবারিক খুঁটিনাটি বিষয়—সবই তিনি আমাকে বলেন। আজ নয়, সেই

যেদিন থেকে ওঁর ছেলেদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আর সেই সুবাদে আমি ওবাড়ি যাওয়া আসা করতে শুরু করলাম। ডাক্তার আমাকে, কেন বলতে পারব না, চিরদিন বড়ো বেশি বিশ্বাস করেন।'

'কীরকম লাগছে শুনতে', রীনা বিড়বিড় করে বলল, 'উঃ, হঠাৎ এমন মতিগতি হল রমলার! ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছিল, ডাক্তার তোমাকে কিছু বললেন?' গিরিজার চোখের দিকে তাকাল সে।

এক সেকেন্ড চুপ থেকে গিরিজা বলল, 'ভাশুরের হাতে গায়ের গয়নাগুলো একটা একটা করে তুলে দিচ্ছে।'

'অ্যাঁ, সত্যি! কেন?' রীনা রুদ্ধশ্বাস হয়ে রইল।

'কেন এ প্রশ্ন নিরর্থক—তবে এটা বোঝা যাচ্ছে দ্যাট উয়োম্যান ক্যান নাও স্যাক্রিফাইস এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং ফর পরিমল। এখানেই তো শয়তানের বাহাদুরি। দু দিন হল জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ি এসেছে, এসেই মহিলাকে কাত করে দিয়েছে।'

'ছি ছি, ওর স্বামী কী বলছে, পরিতোষ?'

'তার সঙ্গে আমার দুদিন দেখা হচ্ছে না—ডাক্তারের মুখে যা শুনলাম, প্রথম দিন স্ত্রীর আঙুলে আংটি দেখতে না পেয়ে পরিতোষ তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আংটি কোথায়, রমলা নাকি বিরক্ত হয়ে বলেছিল বাক্সে তুলে রেখেছে, বস্তুত তখনই পরিতোষের মনে কেমন সন্দেহ হয়, হবেই, স্ত্রী যদি পরপুরুষের দিকে আকৃষ্ট হয় তো সেই জিনিস পৃথিবীর আর সবাইকে ফাঁকি দেওয়া যায়—কিন্তু স্বামীর চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। নিশ্চয় তেমন কিছু একটা স্ত্রীর চোখে মুখে দেখতে পেয়েই পরিতোষের সন্দেহ জেগেছিল। তৎক্ষণাৎ ঘরের বাক্সপেটরা খুঁজে দেখল সে, আংটি নেই। বিয়ের আংটি ছিল নাকি ওটা।'

'তারপর?'

'খুব ঝগড়াঝাটি হল দুজনের।'

'কী রকম বুদ্ধি, কী রকম আক্কেল মেয়েটার। আংটি দিয়েছে, আর কী দিয়েছে?'

'পরশু রাত্রে গলার নেকলেসটা খুলে দিয়েছে।'

'আচ্ছা?' রীনার ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। 'নিশ্চয় গলার হার দেখতে না পেয়ে পরিতোষ জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় সেটা, আর রমলা এবারও বাক্সে তুলে রাখার কথাই বলেছিল স্বামীকে, তাই কি?'

'না।' গিরিজা গম্ভীর গলায় বলল, 'অত বোকা মেয়ে সে নয়। তাই তো বলছিলাম, ডেভিল—শয়তান কত দ্রুত কত তাড়াতাড়ি একটি মেয়েকে করায়ত্ত করতে পারে, বশ করে ফেলে। অসীম ক্ষমতা রাখে সে। স্থান কাল বয়স—কিছুই সে গ্রাহ্য করে না। নারীমাংসলোলুপ। একদিন তোমায় বলেছিলাম। চোখের নিমেষে মামার মেয়ের মাথাটা কেমন নষ্ট করে দিল। কদিন ওবাড়ি গিয়েছে দুষ্ট? শুনছি ওইটুকুন মেয়ে ইতিমধ্যেই প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। প্রেম তো একটা পোশাকি কথা—শৌখিন নাম, মূল জিনিসটাই হল সেক্স। ওখানে অক্ষয় উকিলের মেয়ে, এখানে একেবারে নিজের ভাইয়ের স্ত্রী, আর একজনের মাথা তো আগেই নষ্ট হয়েছে—তোমার দিদি। ভেবেছিল বিয়ে করে শান্ত নিরিবিলি সুখের জীবন কাটাবে, যে-

মানুষ খুন করে তার সংস্রব থেকে দূরে সরে থাকবে। কিন্তু পারল কি? সেই সুন্দর সুখের নীড় ভেঙে দিয়ে চলে এসেছে বিশাখা। শয়তান তাকে টানছে। দুর্বার তার আকর্যণ। তাই তোমার দিদির এই পরিণতি, কাজেই—হ্যাঁ, কী বলছিলে, নেকলেস-এর কথাটাও গোপন করতে চেষ্টা করেছিল কিনা রমলা, না তা সে করেনি, ভাশুরকে হাতের আংটি খুলে দিয়ে তবু যেটুকু ভয় সঙ্কোচ দ্বিধা লজ্জা তার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল তারপর আর সেটুকুও রইল না, অর্থাৎ ততক্ষণে বিষের ক্রিয়া পুরোপুরি আরম্ভ হয়ে গেছে, বুক শক্ত করে ফেলেছে, কলজে পুরু হয়ে গেছে সাধ্বীর, তাই স্বামী ও শ্বশুরের মুখের ওপর বলতে পারল, হ্যাঁ, জিনিসটা আমি তাঁকে দিয়েছি, দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছি। পরিমলের রোজগার নেই, হাত খরচের সামান্য একটা দুটো টাকাও নেই, তাই রমলার বিবেক বলছিল এ সময় একটা কিছু দিয়ে ভাশুরকে সাহায্য করতে, নগদ টাকাপয়সা পরিতোষ ঘর থেকে সরিয়ে ফেলেছিল, তাই রমলা গলার হার খুলে দিল।'

রীনার চোখের পলক পড়ছিল না।

'পরিতোষকে একথা বলতে পারল সে! এমন কড়া রাশভারি মেজাজের শ্বশুর জগমোহন ডাক্তার—তাঁর মুখের ওপরও এভাবে বলতে সাহস পায় ওবাড়ির ছেলের বউ!'

'সে কথাই ডাক্তার বলছিলেন আজ আমায়—পাপের পায়ের শব্দ শুনছিলেন তিনি সরযূধামের সিঁড়িতে বারান্দায় ছাদে করিডোরে, হুঁ, যেদিন থেকে বড়ো ছেলে বাড়ি ঢুকল, মাঝরাত্রে জগমোহনের ঘুম ভেঙে যায়, ধড়মড় করে তিনি বিছানায় উঠে বসেন, তারপর একটা ভয়ংকর আতঙ্ক নিয়ে কান পেতে থাকেন, কারা ফিসফিস করে কথা বলছে, হাত ধরাধরি করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে, নীচে নামছে বারান্দায় হাঁটছে, যেন হঠাৎ এক সময় ছাদ থেকে সেই সব শব্দ নীচে ভেসে আসছে।'

গিরিজা থামল। রীণা বড়ো করে একটা নিশ্বাস ফেলল।

—'শব্দটব্দ কিছু না, এসব তাঁর মনের জিনিস, বাড়িতে অশুভ ছায়ারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আসলে তিনি ভুলতে পারছেন না বড়ো ছেলে একটা জঘন্য কাজ করেছিল, নরহত্যার মতন পাপ তো আর কিছু নেই, পরিমল যতদিন জেলে ছিল চোখের বাইরে ছিল ততদিন ভেতরের অস্বস্তিটা যাহোক তবু কিছুটা চাপা ছিল, এখন সেই মুখ আবার চোখের সামনে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেদিনের ভয় দুশ্চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। কেবলই তিনি ভাবছেন এর পর পরিমল না জানি আবার কী করে বসে—কোন্ দুর্ঘটনা আকস্মিক বিপদ তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়।'

'তুমি বিশ্বাস করবে না, আজ সকালে তাঁর চেম্বারে গিয়ে আমি যেন তাঁকে হঠাৎ চিনতে পারছিলাম না। যেন এই একটা দুটো দিনের মধ্যে তাঁর শরীর অর্ধেক ভেঙ্গে পড়েছে। শীর্ণ ফ্যাকাশে লাগছিল মুখটা। গলার আওয়াজটা পর্যন্ত ছোটো হয়ে গেছে, নরম হয়ে গেছে, যেন একটা বড়ো রকম অসুখে ভুগে উঠছেন ভদ্রলোক।'

'আঘাত পেয়েছেন খুব। অথচ বাড়ির মধ্যে ছেলের বৌকেই তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন, তোমার মুখে যা শুনি। চব্বিশ ঘণ্টা কেবল রমলা রমলা। এখন এই মহিলার ভেতরটা যে এমন তা কি বুড়ো জানতেন—সত্যি, মানুষকে চিনতে দেরি

হয়—মানুষ নিজেকে এমন চমৎকার ঢেকে রাখতে পারে, এত সুন্দর মুখোশ পরে থাকে, পৃথিবীর আর কোন জীব তা পারে না।'

'পুরুষের তুলনায় এ ব্যাপারে মেয়েদের কৃতিত্বটা একটু বেশি নয় কি!' প্রশ্ন করতে গিয়ে কী ভেবে গিরিজা চুপ করে রইল।

রীণা বলল, 'আর ভাবছি তোমার বন্ধুটির কথা, কেননা রোজই তো তুমি বল, এই জগতে দুটো জিনিসই পরিতোষ চিনে রেখেছে—স্ত্রী আর চাকরি। এর বাইরে আর কিছু সে জানত না, জানতে চায়ওনি।'

'বেচারার জন্য ভীষণ দুঃখ হচ্ছে।' রীণার হাতটা কোলের কাছে টেনে নিল গিরিজা। 'কিন্তু অত্যন্ত নার্ভাস—দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। জগমোহন তাই বলছিলেন আজ আমায়। খুব ঝগড়াঝাটি লাফালাফি করেছিল প্রথমটায়, কমলাকে এখনই বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবে, ডাইভোর্স করবে, এমন একটা ভাব—তারপর নাকি নির্জীব হয়ে গেছে, কারো সঙ্গে কথা-টথা বলছে না, যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ছেলেটাকে নিয়ে একতলার বারান্দায় চুপ করে বসে থাকে অথবা বাগানে পায়চারি করে। শুনলাম কাল ও পরশু রাত্রে নীচের একটা ঘরে শুয়েছিল। প্রথমদিন দীপুকে নিয়ে বুঝি শুয়েছিল। মাঝরাত্রে উঠে দীপু মার জন্য কান্নাকাটি আরম্ভ করাতে আবার তাকে ওপরে দিয়ে যায়—তা-ও নিজে কমলার ঘরে ঢোকেনি, জগমোহনকে দিয়ে ছেলেকে তার মার কাছে পাঠিয়ে দেয়—দ্বিতীয় রাত্রে একলাই নীচে শুয়েছিল। ছেলেকে আর ডাকেনি।'

'উঃ, এই একটা লোক এসে এ-বাড়ির সংসারটায় অশান্তির আগুন জ্বেলে দিল।' দেওয়ালের দিকে চোখ ঘুরিয়ে রীণা একটা যেন নিজের মনে বলল, 'আমার তো মনে হয় অন্য কোথাও একটা ঘর টর ভাড়া করে অথবা হোটেলে মেসে যদি তার থাকবার ব্যবস্থা করে দেন, ডাক্তার , সেটাই সবচেয়ে ভালো হত।'

গিরিজা হাসল।

'বড়ো ছেলেকে বাড়ি ছেড়ে চলে যাও বলবার সাহস জগমোহন ডাক্তারেরও আছে কি। পরিতোষের মতন তিনি ভীরু দুর্বল প্রকৃতির নন ঠিকই, চিরদিনই বেশ কড়া শক্তধাতের মানুষ। সহজে কিছুতে ঘাবড়ান না, নুয়ে পড়েন না। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনিও নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। কর্তব্য ঠিক করতে পারছেন না। ডেভিলকে সবাই ভয় পায়। তা-ও, তোমায় বলেছি, ছোটোছেলেকে দিয়ে খুনেটাকে ব্রজদুর্লভপুর পাঠাবার চেষ্টা করেছিলেন, পারলেন না, ওই আর এক স্বার্থপর শয়তান ছেলে, কিছুতেই জেল ফেরত দাদাটির দায়িত্ব নিতে চাইছে না। এই জন্যই সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসীর ওপর আমার কোনোদিন শ্রদ্ধা নেই—আসলে ওরা নিজেকে ছাড়া আর কাউকে চেনে না।'

একটু চুপ থেকে গিরিজা আবার বলল, 'যাকগে, এখন কথা হচ্ছে, বিশাখাকে ঘরে আটকে রাখা যাবে না, রাখতে যাওয়ার বিপদ আছে, ঐ একদিনের ঘটনা দিয়েই বুঝতে পেরেছ। যেমন সে বেরোচ্ছে বেরোতে দাও—খুশি মতন বালিগঞ্জের রাস্তায় ঘুরে বেড়াক—এখন যদি নিতান্তই তোমার বার-মার কানে কথাটা ওঠে তো করা কী। তোমাকে সহ্য করতে হবে। কিন্তু আমার মনে হয় তার আগেই আমি একটা ব্যবস্থা করতে পারব—'

অর্থাৎ অক্ষয় উকিলের বাড়ি পরিমলের যাওয়া-আসা বন্ধ করা। পরিমলকে তখন বিশাখার কাছে ফিরে আসতে হবে। যেন আর একদিনও রীণাকে এমন একটা আভাস দিয়েছিল গিরিজা। কিন্তু সেটা কেমন করে সম্ভব রীণা বুঝতে পারছিল না। হ্যাঁ, যদি গিরিজা তার মামা অক্ষয়বাবুকে অক্ষয়বাবুর স্ত্রীকে জগমোহনের বড়োছেলে সম্পর্কে সাবধান করে দেয়। কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেল না কি। তা ছাড়া কত বছর গিরিজা ও-বাড়ি যায় না। রীণা জানে। মামার সঙ্গে তাঁদের কারোর সদ্ভাব নেই। অক্ষয়বাবু ও অক্ষয়বাবুর পরিবার সম্পর্কে কোনোরকম সহানুভূতি সমবেদনা গিরিজার বা তাদের বাড়ির আর কারোর আছে বলে মনে হয় না। গিরিজা নিজেও সময় সময় তা বলে। অক্ষয়বাবু বিপদে পড়ুক কী বুলা উচ্ছন্নে যাক এই জন্য মোটেই সে চিন্তিত নয়—তার দুশ্চিন্তা বিশাখাকে নিয়ে রীণাকে নিয়ে। সুতরাং পরিমল সম্পর্কে অক্ষয়বাবুকে যে সে কিছুই বলবে না রীণা তা-ও অনুমান করতে পারছিল।

'তোমার কলেজের বেলা হল।' হাতের ঘড়ি দেখল গিরিজা। রীণা উঠে দাঁড়াল।

'আমি আর বসব না।'

গিরিজাও উঠে দাঁড়াল।

'চল, তোমাকে বাসে তুলে দি।'

রীণা কথা বলল না। গিরিজার ঘর থেকে বেরিয়ে তার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে লাগল।

'স্কাউন্ড্রেলটার নাকমুখ থেঁতো করে দেওয়া যায়—' গিরিজা দাঁতে দাঁত ঘষল। 'তবে যদি অক্ষয়বাবুর বাড়ি যাওয়া তার বন্ধ হয়।'

কথাটা রীণা শুনল। কেমন যেন শিউরে উঠল।

লর্ড বলতে একদিন যে অজ্ঞান হত তার মুখে এমন একটা নিষ্ঠুর উক্তি! রীণার কিন্তু ভালো লাগল না।

যেন একথা আজ পরিতোষের মুখ দিয়ে বেরোলে তবু কিছুটা সঙ্গত মনে হত। গিরিজার নয়।

এই জন্যই কি হঠাৎ, কারণটা ঠিক বুঝতে পারল না রীণা, কিন্তু টের পাচ্ছিল সে, শয়তান খুনে নারীমাংসলোলুপ জেনেও মানুষটার জন্য তার মনে একটা সূক্ষ্ম বেদনা, একটু সহানুভূতি জাগল। খুব অল্প সময়ের জন্য যদিও। যেন ঘুরে দাঁড়িয়ে গিরিজাকে তখনই তার বলতে ইচ্ছা করল, শারীরিক আঘাত করে একটা মানুষকে শাস্তি দেওয়ার কোনও অর্থ হয় না। এটা অত্যন্ত নিন্দার জিনিস, কাপুরুষের কাজ।

এমন কী সিঁড়ির শেষ ধাপ পার হয়ে সে গিরিজার দিকে ঘুরেও দাঁড়াল। কিন্তু অন্য কথা বলল।

'রাস্তায় নেমে আর দরকার নেই তোমার। ওপরে যাও।'

গিরিজা আশ্চর্য হল না বা অন্য কিছু ভাবলও না। বরং প্রফুল্লমুখে রীণাকে বিদায় দিতে হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরতে গিয়েছিল। তার আগেই অবশ্য রীনা বাস স্টপের দিকে ছুটে গেল।

সেদিন সন্ধ্যার পর জগমোহন ডাক্তারের চেম্বার একেবারে ফাঁকা ছিল। এমন বড়ো হয় না। রুগীর সংখ্যা এমনিতে কম ছিল, কিন্তু যাও দু-একজন ডাক্তার-সাহেবের সঙ্গে 'বেশ একটু সময় নিয়ে' কথা বলবার আশায় অপেক্ষা করছিল তাদেরও সংক্ষেপে একটা-দুটো উপদেশ ও ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে এক রকম জোর করেই যেন জগমোহন বিদায় করলেন। নির্জনতা চাইছিলেন তিনি, নিভৃতি খুঁজছিলেন। একটু সকাল হলেও কোনো কোনোদিন এমন সময়ও তিনি বাড়ি ফেরেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা করছে না। কোথায় যাবেন। সরযূধাম আর তাঁকে আকর্ষণ করছে না। সেখানেও তার কামরা যথেষ্ট নির্জন ফাঁকা—তিনি না ডাকলে কেউ সে ঘরে যাবে না। কিন্তু তা হলে হবে কি, চিমনির ব্যবস্থা না থাকলে যেমন এ ঘরে উনুন ধরালে পাশের ঘরে গলগল করে ধোঁয়া ঢোকে, কেবল পাশের ঘর কেন, দেখতে দেখতে গোটা বাড়িটাই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তেমনি সরযূধামের একটা ঘরের অশান্তির পুঞ্জ পুঞ্জ কালো ধোঁয়া সমস্ত বাড়ি অন্ধকার করে ফেলেছে। শ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। জগমোহন অস্বস্তিবোধ করেন সেখানে। একলা নিজের ঘরে বসেও ছটফট করেন। কতক্ষণে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়বেন। কাল থেকে এটা হয়েছে, যেন সেই শ্বাসরোধী পরিবেশ থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর চেম্বার এই আশ্রয়ে চলে আসেন। এখন এই চেম্বারই তাঁর আশ্রয় অবলম্বন নির্ভর, যা-ই বলা যাক। আসেন সকাল সকাল, এবং যতটা সম্ভব দেরি করে এখান থেকে বেরোন। চুপ করে বসে থাকেন। তবু এখানে তিনি মুক্ত স্বাধীন স্বচ্ছন্দ। ইচ্ছা করলেই হাসতে পারেন, মানুষের সঙ্গে গল্প করতে পারেন। চিকিৎসার বিষয় ছাড়াও কত বিষয় আছে আলোচনা করার। আবহাওয়া, বাজার দর, রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব। রোগ ওষুধপথ্য বাদ দিয়ে ডাক্তাররা যখন অন্য জিনিস নিয়ে রুগী বা রুগীর আত্মীয়দের সঙ্গে আলোচনা করেন, তখন তারা যে খুশি হয় জগমোহন এটা লক্ষ্য করেছেন। তাই তো হবে, রোগের সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ক রয়েছে, ওষুধপত্র পথ্যাপথ্যের মধ্যে বাধা-নিষেধের ইঙ্গিত রয়েছে—অধিকক্ষণ এসব আলোচনা শুনলে মানুষ হাঁপিয়ে ওঠে—অন্য প্রসঙ্গ পেলে তারা হাল্কাবোধ করে, সহজ নিশ্বাস ফেলে অন্তত কিছুক্ষণ রোগ মৃত্যু ও জীবনের কঠোরতার কথা ভুলে থাকতে পারে।

জগমোহনও তো কদিন ধরে তাই চাইছিলেন। মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারলে খুশি হতেন, হাল্কা বোধ করতেন। তিনি তখন বুঝতে পারতেন আজও আলো হওয়া রৌদ্র মেঘ ফুলের সুবাস গাছের সবুজ পাখির গানের মতন সুখাদ্য সুনিদ্রা আরাম বিশ্রাম নিশ্চিন্ততা ইত্যাদি পুরোপুরি রয়ে গেছে, হাত বাড়ালেই তিনি সে সব পান, উপভোগ করতে পারেন। কেবল অনিদ্রা অশান্তি দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকাই জীবন নয়, প্রতিনিয়ত সন্দেহ সংশয় ও দাম্পত্য কলহের শ্বাসরোধকারী একটা জঘন্য পরিবেশের মধ্যে কোনো রকমে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার অর্থ জীবন নয়। তার বাইরেও জীবন আছে। চোখ মেলে এই সহজ স্বাভাবিক জীবন দেখবার লোভেই তিনি তাড়াতাড়ি চেম্বারে চলে আসেন। কিন্তু এলে হবে কী, যেন দুশ্চিন্তার অশান্তির অদৃশ্য হাত এখানেও ছুটে এসে তাঁর জিভটা চেপে ধরে আড়ষ্ট করে দেয়, চোখ অন্ধ করে দেয়—মানুষের সঙ্গে তিনি কথা বলতে পারেন না, তাদের দিকে তাকাতে পারেন না। তারা চলে

গেলে তবু কতকটা স্বস্তিবোধ করেন। তাই সকাল সকাল তাদের বিদায় করতেও আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

কিন্তু তারপর? একলা চুপচাপ বসে থাকলে অন্য রকম যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। সরযূধামের সেই দৃশ্যগুলি তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। পরিতোষ স্নান করল না, খেল না, পোশাক পরে কাজে বেরিয়ে গেল। রমলা নীরব উদাসীন। স্বামীকে সাধাসাধি করতে, যেমন আগে দেখা গেছে, ত্রাস নিয়ে উদ্বেগ নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল, এখন আর তা করছে না। যেমন কাঠের মতন শক্ত হয়ে ঘরে বসে ছিল তেমনি বসে রইল। অর্থাৎ তার মনের ভাব এই, সে অন্যায় করেনি, অপরাধ করেনি, বরং অপরাধটা পরিতোষের। একটা কুৎসিত সন্দেহ ভিতরে পুষে সে যদি জ্বলেপুড়ে মরতে থাকে থাকুক। এই জন্য রমলা দায়ি নয়। স্বামীর এই অহেতুক রাগ অভিমান সে গ্রাহ্য করে না। অন্তত স্বামীকে সে তাই বুঝতে দিতে চায়। কিন্তু এতক্ষণ যে সে স্থির নীরব উদাসীন ছিল পরিতোষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পর বুঝি তার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হল, এবার রমলার রাগ অভিমানের পালা শুরু হয়। স্নান করল না, খেল না, ঘর গুছোবার নাম করে জিনিসপত্র ছোঁড়াছুড়ি আরম্ভ করল, দুটো কাচের গ্লাস ভাঙল, ঝনঝন শব্দ হল, ট্রাঙ্ক সুটকেশ বার বার খোলা হচ্ছে বন্ধ করা হচ্ছে, একটা কিছুর বায়না নিয়ে দীপু মার কাছে ছুটে গিয়েছিল, ঠাস ঠাস করে ছেলের গালে চড় বসিয়ে দিল রমলা, এমনি। অবোধ অসহায় শিশু কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মার এই দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতেই হয়তো দাদুর কাছে ছুটে যাচ্ছিল সে, দেখা গেল পিছনে রমলাও ছুটছে, এবং হয়তো জগমোহনের চোখের সামনেই তার ঘরের দরজা থেকে ছেলেকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে রমলা। জগমোহন স্থির থেকে সব দেখলেন, একটা কথা বলতে পারলেন না। তার কারণ পুত্রবধূর তখনকার উগ্র অস্থির রণচণ্ডী মূর্তি—জগমোহন আগে যা কোনোদিন দেখেননি। মাথায় কাপড় নেই, অবিন্যস্ত চুলের রাশি পিঠময় ছড়ানো, লাল চোখ দুটো ফুলে আছে, অনেকক্ষণ কাঁদলে যা হয়, অথবা অত্যধিক ক্রোধ অভিমান ভিতরে পুষলে মেয়েদের চোখের এই চেহারা হয় কিনা জগমোহন তাও চিন্তা করলেন, কেননা নিজের স্ত্রীর এমন চোখ তিনি কোনদিন দেখেননি। বেঁচে থাকতে সরযূ কি আর স্বামীর ওপর রাগ অভিমান করেনি। কিন্তু সেই রাগ অভিমানের জাত আলাদা ছিল—স্ত্রীর ওপর অবিশ্বাস ও সন্দেহ নিয়ে স্বামী দুদিন তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ রেখেছে, তার হাতের বাড়া ভাত খাচ্ছে না, তার ঘরে শুচ্ছে না এসব জিনিস সরযূ কল্পনা করতে পারত! তাই আজ বাড়িতে যা হচ্ছে, দেখে জগমোহনের মাথা ঝিমঝিম করে। তিনি চোখ বুজে থাকেন, মুখ বুজে থাকেন, তৃতীয় ব্যক্তি, কাউকে কিছু বলার অধিকার তার নেই।

তবু দিনের চেহারা এক রকম। রাত্রির চেহারা আরও দুঃসহ আরও করুণ। রমলা দোতলার ব্যালকনিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আকাশের জ্বলন্ত তারা দেখছে। নীচের ঘরে পরিতোষের বিছানা পাতা হয়েছে। চাকর এসে বিছানা দিয়ে গেছে। কিন্তু তখনই শুয়ে না পড়ে জানলায় দাঁড়িয়ে পরিতোষও যেন আকাশের তারা দেখছে। শিশুটি কাঁদছে। যখন মার ঘরে শোয় তখন বাবার জন্য কাঁদে, বাবাকে খোঁজে। বাবার কাছে থাকলে মার জন্য চিৎকার জুড়ে দেয়—মাকে দেখছে না তো সে ঘরে। মা কোথায়? এই দৃশ্য তার কাছে সম্পূর্ণ নূতন।

জগমোহন নিজের ঘরে বসে ছবিটা কল্পনা করেন, তারপর নাতির একটানা কান্নার শব্দটা যখন তাঁকে অধৈর্য করে তোলে তখন তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।

কিন্তু তারপর? কাকে তিনি বোঝাতেন, কে তাঁর কথা শুনত। প্রথম রাত্রে তিনি পুত্রবধূকে বোঝাতে গিয়েছিলেন, 'নাতি এভাবে কেঁদে খুন হচ্ছে, চাকর দারোয়ানরা এখনো জেগে—তারাই বা কী মনে করছে।' কিন্তু ছেলের কান্না শুনে রমলা যে মোটেই বিচলিত নয় এটা প্রমাণ করতে আকাশের দিকে চোখ রেখে রূঢ় কঠিন গলায় উত্তর করেছিল, 'তা আমি কী করব—আমি তো অন্যায় করিনি, যে অন্যায় করছে আপনি তাকে গিয়ে বোঝান, তাকে বলুন।'

মাথা নিচু করে জগমোহন সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে গিয়েছিলেন। পরিতোষকে বলতে সেও তেমনি রূঢ় কঠিন গলায় উত্তর করেছিল, 'এ ব্যাপারে তুমি মাথা গলাতে এসো না বাবা; তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জগমোহন ওপরে উঠে এসেছিলেন।

কাজেই কাল রাত্রেও শিশুর কান্না শুনে তিনি ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তারপর আর এক পা অগ্রসর হতে পারেননি। একটা ঘরের বন্ধ কপাটের ওপর চোখ পড়তে আর্ত অসহায় গলায় বলে উঠেছিলেন 'শয়তান, শেষ পর্যন্ত এই সংসারে তোরই জয় হল, আনন্দমোহন হেরে গেলেন।' এবং এও সত্য ঘরটা শূন্য ছিল বলে হয়তো জগমোহন উচ্চারণ করে কথাগুলি বলতে পেরেছিলেন। পরিতোষের স্ত্রীর গলার হার নিয়ে শয়তান সেই যে কাল সকালে বাড়ি ছেড়ে গেছে তারপর আর সারাদিন ফেরেনি। রাত্রেও না।

॥ ৪৪ ॥

দুপুরের পর থেকে অক্ষয়বাবুর স্ত্রী মুখটা কালো করে ফেলেছিলেন। ক্রমেই তিনি কেমন অস্থির ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন। অক্ষয়বাবু খুব ধমক দিয়েছিলেন স্ত্রীকে। প্রলয় গর্জন করছিল। হই-হই করে একথা সেকথা বলতে আরম্ভ করেছিল। অক্ষয়বাবু আঙুল দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে প্রলয়কে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন। বস্তুত তাদের ফিরতে দেরি দেখে সেই বেলা একটা থেকেই প্রলয় নানারকমম মন্তব্য করতে শুরু করেছিল। ছেলের কথাগুলি শুনতে মোটেই ভালো লাগছিল না অক্ষয়বাবুর স্ত্রীর, কিন্তু অন্য দিনের মতন তেমন করে যেন তার সব কথা উড়িয়েও দিতে পারছিলেন না। ছেলে যেভাবে বলছিল, এক-আধবার যেন সেসব কথা বিশ্বাস করতেও তাঁর ইচ্ছা করছিল। তা হলেও প্রথমটায় মন শক্ত করে রেখেছিলেন তিনি 'বারোটার ট্রেনে ফিরে আসবে বলে গেছে বলে যে ঠিক ঐ ট্রেনেই ফিরতে পারবে, তার ঠিক কী—ট্রেনের গোলমাল হতে পারে, বেড়াতে বেরিয়েছে যখন একটু দূরেও তো চলে যেতে পারে—' ছেলেকে বোঝাচ্ছিলেন তিনি। বস্তুত ছেলেকে বোঝাবার নাম করে কথাগুলি বলে অক্ষয়বাবুর স্ত্রী বুঝি নিজের মনকেই প্রবোধ দিচ্ছিলেন, আর বার বার দরজায় উঁকি দিয়ে সদর রাস্তাটা দেখছিলেন। তারপর যখন তিনটা বেজে গেল, তখন আর যেন স্থির থাকতে পারলেন না। বিনিয়ে বিনিয়ে, বলতে গেলে একরকম কাঁদো কাঁদো গলায় স্বামীর কাছে কথাটা তুলতে আরম্ভ করেছিলেন, 'বুঝতে পারলাম না, তিনটে বেজে গেল,

এখন পর্যন্ত ওরা—'। 'চুপ করো চুপ করো।' অক্ষয়বাবু ধমক দিয়েছিলেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, বাবা যাতে শুনতে পায়, দাঁত বার করে প্রলয় হাসতে হাসতে বলছিল, 'এমন আস্কারা পেয়েছে মেয়ে, একটা কেলেঙ্কারী না বাধিয়ে ছাড়বে না—আমার তো মনে হয়—' অক্ষয়বাবু চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'কুপুত্র কুলাঙ্গার, বেরিয়ে যা, এখনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা'। ধমক খেয়ে হাসি বন্ধ করেছিল প্রলয়, কিন্তু কথা বন্ধ করেনি। পাশের সেই ছোটো ঘরটায় বসে সে ক্রমাগত বকে যাচ্ছিল, 'একটা লম্পটের সঙ্গে উঠতি বয়সের মেয়েকে ভিড়িয়ে দিয়েছে বাবা মা, আহা, কী বুদ্ধি! তা বাবা মাকে তো আর রাস্তায় বেরোতে হয় না; বেরোতে হয় আমাকে—শালা রাজ্যের যত মানুষ আমাকেই জিজ্ঞেস করবে, কী হল তোর বোনের? জগু ডাক্তারের ছেলে সেই যে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেল, আর তো মেয়ে ফিরছে না—' 'তোর মাথায় বজ্রাঘাত হোক, তুই তো বাস থেকে পড়ে গিয়েছিলি, চাকার তলায় চলে গেলি না কেন, তখনি তো তোর প্রাণটা বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, বেঁচে এলি কেন, এমন ছেলেকে ঈশ্বর বাঁচিয়ে রাখল কেন—' 'তাই তো?' প্রলয় উত্তর করেছিল, 'ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়ে রাখল কেন, রাখে কেষ্ট মারে কে—কিন্তু এখন ঐ ঘোলা চোখ দিয়ে উল্টোটা দেখবে—মারে কেষ্ট রাখে কে, শাড়ি জুতো পরিয়ে সাজিয়েগুজিয়ে মেয়েকে বুড়ো বানরটার সঙ্গে বাইরে পাঠালে, ভেবেছ এই তো ফিরে এল বলে, উঁহু আর আসবে না, জোড়া পাখি ঠিক উড়াল দিয়েছে—সেই তালেই ছিল দুজন, আর কী, আর একটু পরেই তো সন্ধে হবে, বেলা বারোটায় যারা ফিরত তারা যদি এখনো না ফেরে তো এ থেকে কী ধরে নেওয়া যায় একবার মাথা খেলিয়ে চিন্তা করলেই কারণটা বুঝতে পারবে।' অক্ষয়বাবুর স্ত্রীর আর সহ্য হচ্ছিল না। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলছিলেন, 'তোর কি মাথার গোলমাল হয়ে গেল প্রলয়, এমন সব অলক্ষুণে কথা তোব মুখ দিয়ে বেরোয় কেন আমি তো বুঝতে পারছি না। ট্রেনের গোলমাল হতে পারে, তিনজনের একজন রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, বা পরিমল ওদের নিয়ে যেখানে গেছে যদি তার কোনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ সেখানে দেখা হয়ে যায় তো সেই বন্ধুর বাড়ি গিয়ে ওঠাও তাদের বিচিত্র নয়, হয়তো তাই হবে, দুপুরে সেখানে নাওয়া খাওয়া করেছে, বিশ্রাম করেছে, হয়তো বিকেলের ট্রেন ধরে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ফিরে আসবে।' ভিতর থেকে অক্ষয়বাবু চেঁচিয়ে বলছিলেন, 'ফের তুমি ওই পাঁঠাটার সঙ্গে কথা বলছ, কোনোরকম যুক্তিতর্কের ধার ধারে নাকি ওটা, যা খুশি তাকে বলতে দাও, তারপর বুলা ফিরে আসুক, ছোটোবোনকে দিয়ে যদি আমি হারামজাদার কান না মলাই তো আমার নাম—'

'তাছাড়া নিলয়ও সঙ্গে গেছে, ছোটোভাইটাকে ফেলে রেখে বুলাই বা কোন্‌দিকে যাবে শুনি?' এবার অক্ষয়বাবুর স্ত্রী গলার স্বরটা নীচের খাদে নামিয়ে এনেছিলেন। কেননা হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, এটা বস্তিবাড়ি, এঘর ওঘরের মানুষ কান পেতে থাকতে পারে। 'ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে আবোলতাবোল বকছিস, শুনতে পেলে লোকে তোকেই যা-তা বলবে, মায়ের পেটের বোন, এক আধদিন বাড়ি থেকে বেরোল আর অমনি তুই তার নামে—অ্যাঁ, এতসব বাজে কথা নোংরা কথা, কই, আগে তো শুনিনি তোর মুখে কোনোদিন।' গলার ভিতরটা ক্রমেই শুকিয়ে আসছিল অক্ষয়বাবুর স্ত্রীর, সামান্য একটু রোদ গাছের মাথায় দেখা যাচ্ছিল,

দেখতে দেখতে যে সন্ধ্যা হয়ে যাবে এ-ও সত্য, প্রলয় যদি কিছু না-ও বলত, এখন পর্যন্ত ছেলে মেয়ে দুটো বাড়ি ফিরল না দেখে নানারকম দুশ্চিন্তা ভয় কিছুতেই তিনি চেপে রাখতে পারতেন না, এদিকে অক্ষয়বাবুকে কিছু বলতে গেলে তিনিও চেঁচামেচি করে উঠছেন। একটু চুপ থেকে অক্ষয়বাবুর স্ত্রী যেন অনেকটা নিজেকে সান্ত্বনা দিতেই ছেলেকে উদ্দেশ্য করে চাপা গলায় বললেন, বুলা আমার মেয়ে, আমি ওর গর্ভধারিণী। তুই যে পাগলের মতন এসব বলছিস, সন্দেহ করছিস মেয়েটাকে, আমাকে না বলে কোনোদিকে এক পা ওর এগোবার ক্ষমতা আছে নাকি তুই মনে করিস? কক্ষনো এমন কাজ সে করবে না, সেই সাহসও হয়নি প্রবৃত্তিও হবে না। উঁহু অন্তত আমি যদ্দিন বেঁচে—কর্তা যদ্দিন বেঁচে, বেলাইনে পা বাড়াবে এমন মেয়েই সে নয়, আমি মরে গেলেও এ জিনিস বিশ্বাস করব না।'

তেমনি দাঁত বার করে, যদিও এবার আর ততটা চেঁচিয়ে নয়, কারণ অক্ষয়বাবুর স্ত্রী ফিসফিস করে 'আস্তে' 'আস্তে' শব্দ দুটো বার বার উচ্চারণ করছিলেন, প্রলয় বলল, 'বাজে কথা নোংরা জিনিস আবার মুখ দিয়ে কি আর সাধে বেরোয়—তোমার মেয়ে যার সঙ্গে বেরিয়েছে তার সম্পর্কে তোমরা কতটা জেনেছ কতটা শুনেছ বল তো? হ্যাঁ, তোমাদের বড়ো ছেলেকে সে খুন করে জেল খেটে এসেছে, তা খুন করলে বা জেল খাটলেই যে মানুষ খারাপ হয়ে যায় আমি তা বলছি না। তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইতে এল, তোমরা তাকে ক্ষমা করলে, ভালো কথা, তারপর কিছু টাকাকড়ি তোমাদের হাতে দিয়ে তোমাদের মন গলিয়ে ফেলল সে। কিন্তু তার স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে কিছু খোঁজ নিয়েছিলে কি? একটা লম্পট, পাষন্ড ছাড়া আর কিছু নয় গুপ্ত ডাক্তারের ছেলে। হাঁ, আমি জেনেছি। আর একটা মেয়ে, খুব সম্ভব এই বালিগঞ্জেরই মেয়ে—তার মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে এই পাষন্ড। এখন রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে সেই পাগলী। যদি তোমরা মেয়েটাকে দেখতে চাও তোমাদের দেখাতে পারি। ভদ্রঘরের মেয়ে, বেশ সেজেগুজেও থাকে; কিন্তু থাকলে হবে কী ভেতরটা একেবারে ফোঁপরা হয়ে গেছে। বোঝা যায় তোমাদের গুপ্ত ডাক্তারের ছেলে মেয়েটার এমন সর্বনাশ করেছে। পরিমলের নাম করে ও কখনো হাসে, কখনো কাঁদে।'

অক্ষয়বাবুর স্ত্রী খুব একটা মনোযোগ দিতে পারছিলেন না ছেলের কথায়। তাঁর মন ক্রমেই আরো বেশি চঞ্চল হয়ে উঠছিল। ঘন ঘন বাইরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। গাছের মাথার রোদটুকু মিলিয়ে গেছে। তা হলেও যেটুকু শুনলেন তাতে বেশ একটু অবাক হয়ে পরে প্রলয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

'মেয়েটার কি বিয়ে হয়েছিল না?' গম্ভীর হয়ে বলল, 'হয়তো হয়েছিল, কিন্তু সে খোঁজ নিয়ে আমাদের দরকার কী। যদি বিয়েও হয়ে থাকে, বোঝা যায় ওই পাষন্ডর জন্যই স্বামীর ঘর ছেড়ে সে চলে এসেছে—কেননা যদি স্বামীর সঙ্গে একত্র থাকত তো এভাবে রাস্তায় ঘুরত না, স্বামী নিশ্চয়ই খোঁজ নিত, পাগল হলেও বউকে অন্তত ধরে বেঁধে ঘরে আটকে রাখতে চেষ্টা করত—আর যদি বিয়ে না হয়ে থাকে তো, বুঝতে পারছ, হারামজাদা কোন ধরনের সর্বনাশ করে ছেড়েছে মেয়েটার।' এক দলা থুথু ফেলল প্রলয়।

'তুমি এখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্কেলটার কথা শুনছ।' অক্ষয়বাবু ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন। কেননা প্রলয় যতই আস্তে বলুক, অক্ষয়বাবু সবই শুনছিলেন, কেবল মা না, বাবার

কানেও যাতে কথাগুলি যায় সেভাবেই প্রলয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে এসব বলছিল। অক্ষয়বাবু চিৎকার করে স্ত্রীকে বললেন, 'আমার জুতোটা তুলে নিয়ে ওর মুখের ভেতর ঠেসে দাও, তা না হলে তো ওর মুখ বন্ধ হবে না। রাস্তার যত সব ষণ্ডামার্কা ইয়ারদের সঙ্গে ওর রাতদিন আড্ডা—কাগজ ফেরি করে, তার বন্ধুবান্ধব কেমন হবে বুঝতে পারছ না— তাদের মুখে যা শুনছে তাই এখানে এসে ঢালছে—'

'বটে', প্রলয় গর্জন করে উঠল, 'রাস্তায় শুনব কেন, এখানেই শুনেছি, এই বাড়ির একটি ছেলে নিজের চোখে মেয়েটাকে দেখে এসেছে, ডাকব তাকে?'

'কার কথা বলছিস।'

'প্রদোষ।' মার দিকে তাকাল প্রলয়। 'ডাকব তাকে?'

'না না, তাকে ডেকে দরকার নেই।' অক্ষয়বাবুর স্ত্রী ভুরু কুঁচকালেন, অটলবাবুর ছেলেটিকে তিনি স্নেহ করতেন, কিন্তু ইদানীং একটা কারণে তিনি তার ওপর অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছেন। পরিমল যেদিন বুলাকে নিয়ে চশমা কিনতে বেরিয়েছিল সেদিন—কি তার পরদিন প্রদোষ ওইটুকুন ছেলে নিলয়কে এমন একটা বাজে কথা বলেছিল, ঠাট্টা করে বলুক আর যেভাবেই বলুক, পরিমল ও বুলাকে নিয়ে কথাটা বলেছিল এবং কথাটা খুবই আপত্তিকর, মুখ কালো করে পরে নিলয় মার কাছে এসে নালিশ করেছিল। শুনে অক্ষয়বাবুর স্ত্রী চুপ করে ছিলেন। প্রদোষকে ডেকে তিনি আর কথাটা জিজ্ঞাসা করেননি। এ সম্পর্কে বুলাকে তো নয়ই, অক্ষয়বাবুকেও তিনি কিছু বলেননি। একটা জিনিস তিনি বুঝে গিয়েছিলেন। যেন পরিমল ঘনঘন এ বাড়ি আসছে দেখে প্রদোষের বেশ একটু হিংসাই হচ্ছে। কেননা তারপর থেকে এ বাড়ি সে আসছে না। নাটক উপন্যাসের চরিত্র তিনি কম বোঝেন, কিন্তু যাদের তিনি চোখে দেখেন যাদের সঙ্গে মেলামেশা আলাপ পরিচয় আছে তাদের হাবভাব চালচলন দেখলে কথাবার্তা শুনলে তারা যে কী প্রকৃতির মানুষ বুঝে নিতে তাঁর একটুও কষ্ট হয় না। বুলার সঙ্গে ভাব করবার জন্য কটা মাস ধরে কি কম চেষ্টা করছিল ঐ ছোঁড়া। তিনি সবই বুঝতেন চোখে দেখতেন, মুখ ফুটে কিছু বলতেন না, নিতান্তই পাশের ঘরের মানুষ তারা, তাঁর কাছে ছেলেটি আসছে, তাঁকে এ বই সে-বই এনে পড়তে দিচ্ছে, দরকার মতো তিনিও তার ওপর এ কাজ সে কাজের ভার দিচ্ছেন—তা ছাড়া ছেলেটির চালচলনের মধ্যে তেমন কিছু আপত্তিকর তাঁর চোখে ঠেকত না। কিন্তু এখন তিনি বুঝতে পারছেন, ওই ছেলের মনে বিষ আছে, পরিমলের এ বাড়ি আসাটা সে মোটেই সহ্য করতে পারছে না, তখন বুলার সঙ্গে কথা বলার অসুবিধা হচ্ছে, বয়স্ক মানুষ পরিমল—বুলার সঙ্গে লেখাপড়ার কথাই বেশি বলে, তাকে নিয়ে এখানে ওখানে বেড়াতে যাচ্ছে, তাই প্রদোষের এত হিংসা। আর সেদিন সে নিলয়কে যে কথা বলে ঠাট্টা করল তাতে জিনিসটা খুবই পরিষ্কার হয়ে গেছে। ঐ ছেলে যে এখন পরিমলের নিন্দা গেয়ে বেড়াবে, কোথায় কোন মেয়েকে দেখে এসে রঙ ফলিয়ে প্রলয়ের কানেও কথাটা তুলবে এ তো খুবই স্বাভাবিক। একটু সময় চুপ থেকে অক্ষয়বাবুর স্ত্রী প্রলয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অনেকটা যেন নিজের মনে বলতে লাগলেন, 'ওই ছেলে সারাদিন নাটক নভেল নিয়ে থাকে, একদিন তো আমায় বলল সে নিজেই একটা উপন্যাস লিখে ফেলবে, কাজেই তার মাথায় ঐসব জিনিস ছাড়া তো আর কিছু নেই—

সব মানুষকেই বইয়ের লেখা চরিত্রগুলোর মতন দেখছে, কোথায় একটা মাথা-খারাপ মেয়েকে দেখে এসে গল্প তৈরি করে ফেলল, কী, না পরিমলের সঙ্গে ঐ মেয়ের ভাব ছিল ভালোবাসা ছিল, এখন আর পরিমল তার দিকে তাকাচ্ছে না, কাজেই পাগলের মতন সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে---আমি একটুও বিশ্বাস করি না ওই ছোঁড়ার কথা। পরিমল সে ধরনের মানুষই নয় আর মেয়ের সঙ্গে ভাব করবার ভালোবাসার খেলা খেলবার সময়ই বা পেল কোথায়, কলেজে পড়তে পড়তে তো মলয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে একটা বিচ্ছিরি কান্ড বাধিয়ে দশ বছর জেল খেটে সেদিন বেরিয়ে এল। আর এখন তো কথাই নেই, কত গম্ভীর শান্ত হয়ে গেছে—কী সুন্দর বুদ্ধি বিবেচনা, কে বলবে তার ত্রিশ বছর বয়স—দেখলে মনে হবে পঞ্চাশ বছরের বুড়োটি, তেমনি কথাবার্তা, জ্ঞানগম্যিই বা কত রাখে। কে জানে, হয়তো এতকাল জেল খেটে এসেছে, কারো সঙ্গে তেমন মিশতে-টিশতে পারেনি, মনটা একেবারে বদলে গেছে—কেমন যেন একটা ধর্মচিন্তা এসে গেছে। কদিন দেখে আমি যতটা বুঝেছি, সংসারে ভালো দিকটাই এখন কেবল দেখতে চাইছে, চিনতে চাইছে, লোকের উপকার করা, একটি মেয়ে পয়সার অভাবে পড়তে পারছে না, তাকে গরজ করে লেখাপড়া শেখানো—হুঁ, তোদের মতন ফাজিল ফক্কড় চালিয়াৎ ছেলে হলে পঞ্চাশ বছরের বুড়ি আমি পেটের মেয়েকে তার সঙ্গে মিশতে দিতাম আর একলা বাইরে ছেড়ে দিতাম কিনা—'

আবার প্রলয়ের দাঁত ক'টা বেরিয়ে পড়ল।

'ছেড়ে তো দিয়েছই, খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে এখন ফুরফুর করে মনের আনন্দে উড়ছে—কে ওকে বাধা দিচ্ছে আমি বাধা দিচ্ছি? আমার কী গরজ। তারপর ঠ্যালা সামলাবে, মেয়ের সর্বনাশটা করে জগু ডাক্তারের ছেলে যখন আবার নতুন ক্ষেতের ধান খেতে অন্য দিকে মুখ ফেরাবে আর পাগল হয়ে মেয়ে ফ্যা-ফ্যা করে রাস্তায় ঘুরবে, সেদিন মজা টের পাবে---ফকিরের কথা বাসি না হওয়া তক কেউ কি বিশ্বাস করতে চায়—কেউ না।'

'গর্দভ, পাঁঠা, ছাগল, গোরু কোথাকার—' অক্ষয়বাবু ভিতর থেকে ফুঁসে উঠলেন। 'মাথায় যদি ছটাক পরিমাণ বুদ্ধি থাকত তো এ ধরনের কথা তোর মুখ দিয়ে বেরোত না। এই মাথা নিয়ে তুই জগমোহনের ছেলেকে বিচার করবি—না তোর বাবা-মাকে বিচার করবি, আর তুমিই বা গাধাটার সঙ্গে এত কথা বলছ কেন আমার মাথায় আসছে না, দরজাটা বন্ধ করে দাও, ঠান্ডা আসছে—আর শুয়োরটাকে বলে দাও, যেখানে খুশি সে যেন নিজের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে—কাল থেকে যেন তার মুখ আমাকে আর না দেখতে হয়—'

কিন্তু অক্ষয়বাবুর স্ত্রী কিছু বলার আগেই প্রলয় দুবার মাথা ঝাঁকিয়ে 'আচ্ছা দেখা যাবে, বেশ তো, আমার ব্যবস্থা আমি খুব করতে পারব, তারপর দেখা যাবে কত ধানে কত চাল হয়, ইত্যাদি বলতে বলতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। অন্য দিন হলে অক্ষয়বাবুর স্ত্রী ছুটে গিয়ে ছেলেকে রাস্তা থেকে ধরে আনতেন। কর্তার সঙ্গে ছেলের মতের অমিল হয়েছে, কথা-কাটাকাটি হয়েছে, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা' ইত্যাদিও একাধিকবার শুনতে হয়েছে প্রলয়কে এবং তখন, সত্যি যেন বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে, এমন একটা ভান করে প্রলয় দরজার বাইরে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়বাবুর স্ত্রী তার হাত চেপে ধরেছেন, কর্তাকেও বুঝিয়েছেন, যেন তখন একমাত্র মার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রলয় গায়ের জামাটা খুলে ফেলেছে

এবং অক্ষয়বাবুও আর উচ্চবাচ্য না করে অন্তত সেদিনের মতন চুপ থেকেছেন। কিন্তু আজ অবস্থাটা অন্য রকম। রাত হয়ে গেল। এই তো একটু আগে পর পর দুটো ট্রেন চলে গেল। ট্রেনের শব্দ শোনার পর থেকে অক্ষয়বাবুর স্ত্রী প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলেন, ওরা এখনি এসে যাবে—কিন্তু এল না। প্রলয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পরও চুপ করে দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি বাইরের অন্ধকার ও কুয়াশা দেখতে লাগলেন। এমন কী, অক্ষয় বাবু যে বার বার বলছিলেন, কপাট দুটো ভেজিয়ে দাও, ঠান্ডা আসছে, কার্তিকের হিমটা গায়ে লাগা খারাপ—তা-ও তাঁর কানে ঢুকছিল না। বুকের ভিতর একটা ঢিবঢিব শব্দ হচ্ছিল, কানের ভিতর ঝিঁঝি করছিল। তাঁর ইচ্ছা করছিল একবার হাঁটতে হাঁটতে রেল স্টেশনে চলে যান। কিন্তু সেখানে গিয়েও যে কিছু ফল হবে না, স্টেশন পর্যন্ত এসে পৌঁছলে বাড়ি আসতে তাদের আর কতক্ষণ, সেকথাও চিন্তা করলেন তিনি। ইতিমধ্যে তিন-চারবার 'ওরা এখনো এসে পৌঁছল না কেন', 'এত দেরি হবার কারণ কী', 'সন্ধ্যা উতরে গেল, অথচ'— ইত্যাদি বলতে গিয়ে অক্ষয়বাবুর কাছে জোর ধমক খেয়েছেন। কাজেই চতুর্থ-বার আর তাঁর সামনে গিয়ে কথাটা তুলতে সাহস পাচ্ছিলেন না। অন্ধকার মুখ করে দাঁড়িয়ে সত্যি এবার তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু বিছানায় বসে অক্ষয়বাবু জিনিসটা টের পেলেন। 'তোমাদের যে ঈশ্বর কী দিয়ে তৈরি করেছেন!' ভেংচি কাটার মতন মুখটা বেঁকিয়ে বিকৃত গলায় অক্ষয়বাবু বকতে আরম্ভ করলেন, 'কথায় কথায় চোখের জল ফেলা, মেয়েছেলের মতন অলক্ষ্মী সংসারে আর কিছু আছে! যত অমঙ্গল, অশুভ ডেকে আনতে তোমাদের জুড়ি নেই। গেছে বেড়াতে, যা হোক একটা কারণে ফিরতে দেরি হচ্ছে—রাস্তায় বেরোলে কত কারণ থাকতে পারে সেখানে আটকে যাবার, ট্রেনের পথ, পায়ে হেঁটে কিছু ওরা আসছে না যে, ইচ্ছামতন ছুটলাম আর বাড়ি এসে গেলাম। আরে হেঁটে আসতে হলেও তো মানুষকে একটু সময় একটা জায়গায় দাঁড়াতে হয়, গাছের ছায়া দেখলে লোভ হয় খানিকটা জিরিয়ে নিই, ধারে-কাছে ফুলের বাগান, ফলের বাগান থাকলে সেদিকে চোখ ফিরিয়ে এটা-ওটা দেখতে দেখতেও তো কতটা সময় চলে যায়, জল তেষ্টা পেলে নদী পুকুর কোথাও আছে কিনা খুঁজতে হয়—গেল আরো কিছু সময়—নদী পুকুর না থাকলে মানুষের দরজায় গিয়ে জল চাইতে হয়, হঠাৎ একটা মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেলে তার সঙ্গে গল্প করতে করতে কতটা সময় চলে যায়—একটা মানুষকে হেঁটে আসতে হলেও পথে দেরি হবার অনেক কারণ ঘটে—সেসব কারণ আমরা চোখে দেখি না, এবং অঙ্ক কষে আগে থাকতে সেগুলো ঠিক করে রাখাও আমাদের সাধ্যের বাইরে। আর এটা ট্রেন জার্নি। সময় মত স্টেশনে এসে পৌঁছানো গেল না, বসে থাক আবার দেড় ঘন্টা, হয়তো এবেলা ঘনঘন ট্রেন ছাড়া হয় না ওদিক থেকে, আপিস-কাছারি করতে, হাট-বাজার করতে মানুষ ওবেলা কলকাতা ছুটে আসে—এখন তাদের ফেরার পালা, এখন ঘনঘন ট্রেন ছাড়াবে শেয়ালদা থেকে—গেল এক কারণ, ট্রেন মিস করা। তাছাড়া, যদি কোথাও একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে থাকে তো ওদিকের আপ-ডাউন সব ক'টা গাড়ি হয়তো দেরি করে ছাড়বে, লাইন পরিষ্কার-না হওয়া তক একটি গাড়িও পাস করতে দেওয়া হবে না, গেল দু' নম্বর কারণ। তারপর, হ্যাঁ, এইমাত্র তুমিও তা গাধাটাকে বোঝাচ্ছিলে, রাস্তায় যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে—আমি অবশ্য তা একবারও মনে করি না। কেউ অসুস্থ হয়নি।

সবাই সুস্থ আছে। হ্যাঁ, ঐ যে আর-একটা কারণ বললে, যদি কারো সঙ্গে—কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—তার সম্ভাবনা যদিও খুবই কম, এতকাল জেলে ছিল, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই, সবাইকে ভুলে গেছে, সেদিন তো তোমার সামনেই বলছিল, পুরোনো কোন বন্ধুকে দেখলে সে হঠাৎ চিনতে পারবে না, চিনতে পারলেও পুরোনো বন্ধুত্বের সূত্র ধরে তার সঙ্গে আবার যে তেমন করে মেলামেশা, সেটা তার পক্ষে সম্ভব হবে না, বন্ধুটিকে বরং এড়াবার চেষ্টাই করবে সে। বলছিল অবশ্য কয়েকটা কারণেই, কথাটা আমি পরে চিন্তা করেছি, ভেতরে একটা কমপ্লেক্স এসে গেছে, অভিমানও রয়েছে মনে, সমাজপ্রীতি, বন্ধুপ্রীতি ইত্যাদির ওপর যেন আজ আর তেমন শ্রদ্ধা নেই তার, এসব জিনিসের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, অস্বাভাবিক কিছু না, একটা অপরাধ করেছিল সে, আদালতের চোখে দোষি সাব্যস্ত হল, কঠোর দণ্ড দেওয়া হল তাকে, কিন্তু আমরা তখন কেউ তলিয়ে দেখলাম না, যখন কাজটা করেছিল সে, তখন তার মনের অবস্থা কেমন ছিল, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কাজটা করেছিল, না কি এ ধরনের উত্তেজনা আসতে পারে পর পর এমন কতগুলো কারণ ক্রমাগত জমতে জমতে তারপর একদিন—তাছাড়া, সে অপরাধপ্রবণ মানুষ কি না, রক্তপাত ঘটাতে পারলে তার মনে আনন্দ হয় কি না, নাকি প্রকৃতিতে সে ভীরু, খুন দেখলে ভয় পায়—খুটিয়ে সব বিশ্লেষণ করিনি আমরা। আজকাল ওসব দেশে এই নিয়ে নানারকম গবেষণা চলেছে। হয়তো আসলে পরিমল তাই—ভীরু অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু একথা জোর দিয়ে বলতে সেদিন সমাজের মানুষ এগিয়ে যায়নি, কী দলবদ্ধ হয়ে তার বন্ধুরা প্রতিবাদের ঝড় তোলেনি। হয়তো পরিমল তাই আশা করেছিল। আজ যদি সে অসামাজিক হয়, বন্ধুবিদ্বেষী হয় তো দোষ দেব কেমন করে। এই নিয়ে আরো অনেক কিছু বলবার আছে। মানুষের গড়া আইনের মধ্যে যে কত ভুল-ত্রুটি অসংলগ্নতা থাকে, যাক, যে কথা বলছিলাম—না, আত্মীয় বন্ধুর দেখা পেলেই যে পরিমল তার সঙ্গে ভিড়ে যাবে, তার বাড়ি গিয়ে উঠবে, সেখানে নাওয়া খাওয়া ও বিশ্রাম করবে আমার তো মনে হয় না। হ্যাঁ, তবে যদি অন্য কোনও দিকে বেড়াতে গিয়ে থাকে, ঠিক তো বলা যাচ্ছে না, তারা কি সোনারপুর বারুইপুর স্টেশনে নামবে, না আর একটু দক্ষিণে এগিয়ে যাবে। বেড়াতে গেলে তাই হয়। মাইল মেপে সময় মেপে বেড়াবার আনন্দ থাকে না—মেজাজ খারাপ থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই হয়তো বেড়ানো শেষ করে মানুষ ঘরে ফেরে—মেজাজ ভালো থাকলে আর একটু সময় নিয়ে আরো খানিকটা পথ অগ্রসর হয়ে এটা-ওটা দেখতে দেখতে—'

অক্ষয়বাবু যখন স্ত্রীকে এসব বোঝাচ্ছিলেন, তখন বাইরে পায়ের শব্দ হল, ক্ষীণ হালকা একটিমাত্র জুতোর শব্দ। 'ওরা যেন এসেছে, আলোটা ধর', অক্ষয়বাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, মেরুদাঁড়াটা টান করে যতটা সম্ভব সোজা হয়ে বসতে চেষ্টা করলেন। অক্ষয়বাবুর স্ত্রী আলো ধরবার কথা ভুলে গিয়ে তখনি দরজার বাইরে ছুটে গেলেন। 'না তো', আর্তনাদের মতন সুর করে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'একলা নিলয়কে দেখছি—আর দুজনকে তো দেখছি না।' 'আসছে, ওরা পেছনে আসছে'—অক্ষয়বাবুর চঞ্চলতা বেড়ে গেল। সামনের দিকে ঝুঁকতে গিয়ে ধপ করে আবার তিনি বিছানায় বসে পড়লেন। একটু বুঝি ব্যথাও পেলেন। হয়তো এই কারণেই চেহারা ও গলার স্বরটা বিকৃত হয়ে উঠল। 'তুমিও যেমন, এমন অস্থির

হয়ে পড় কথায় কথায়—একলা নিলয় আসবে কেন—ওদের ফেলে রেখে একা ও ফিরতে পারে কখনো—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই নিলয় বারন্দায় উঠে এল।

'ওরা কোথায়!' অক্ষয়বাবুর স্ত্রী রীতিমতো চিৎকার করে উঠলেন। 'বুলাকে পরিমলকে তো দেখছি না, কীরে নিলয়?'

নিলয় কথা বলছিল না। মাকে এত অস্থির উত্তেজিত দেখে সম্ভবত সে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরে অক্ষয়বাবু ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'নিলয় ঘরে আয়।'

নিলয় ঘরে ঢুকল। পিছনে অক্ষয়বাবুর স্ত্রী। অন্ধকারে বোঝা যায়নি। আলোটার সামনে দাঁড়াতে দেখা গেল মুখখানা শুকিয়ে গেছে ছেলের, খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে।

'ওরা কোথায়? তোর দিদি, পরিমল?' অক্ষয়বাবু ভুরু কুঁচকে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। বুলার সেই সবুজ রঙের ঝুড়িটা নিলয় নিয়ে এসেছে। ঝুড়ির ভিতর ফ্লাস্কটা শোয়ানো রয়েছে। বোঝা যায়, ওটা এখন শূন্যগর্ভ। 'কী হল, চুপ করে রইলি কেন। ওটা হাত থেকে নামিয়ে রাখ।' অক্ষয়বাবুর গলার স্বর অতিমাত্রায় রুক্ষ হয়ে উঠল।

অক্ষয়বাবুর স্ত্রী ছেলের হাত থেকে ঝুড়িটা তুলে নিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখলেন। কিন্তু এক সেকেন্ডের জন্যও তিনি ছেলের মুখের দিক থেকে চোখটা সরিয়ে নিতে পারছিলেন না। রুদ্ধশ্বাস হয়ে অপেক্ষা করছিলেন উত্তরটা শুনবেন বলে।

'ওরা আসেনি।' নিলয় আস্তে বলল।

'আসেনি মানে? কোথায় ওরা?' অক্ষয়বাবু ঢোক গিললেন। অক্ষয়বাবুর স্ত্রী ধপ করে মাটিতে বসে পড়লেন।

'ওরা, তা হলে আজ ফিরছে না?' অক্ষয়বাবু কেন জানি গলার স্বরটা সঙ্গে সঙ্গে বদলে ফেললেন—অতিরিক্ত শান্ত সংযত হয়ে গেলেন। 'দোরটা ভেজিয়ে দে।'

নিলয় ঘুরে দাঁড়িয়ে খোলা পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিল। যেন স্বামীকে হঠাৎ এত স্থির গম্ভীর হয়ে উঠতে দেখে অক্ষয়বাবুর স্ত্রীর মুখটা আরো বেশি ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাঁর গলায় আবার কান্নার সুর শোনা গেল।

উঃ, তবে তো আমার প্রলয়ের কথাই ঠিক হল, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তো সে তাই বলছিল—'

'তুমি দেখছি আমায় পাগল করে দেবে—তুমি কি চুপ করতে পার না, ব্যাপারটা শোনার আগেই আবার চেঁচামেচি শুরু করে দিলে। নিলয়—' অক্ষয়বাবু ছেলেকে কাছে ডাকলেন। 'এখানে আয়, আমার পাশে এসে বোস। বসে কথা বল।'

'আমি একটু জল খাব বাবা! ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে।'

'খেয়ে নে, জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নে।' অক্ষয়বাবু জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন। যেন তাঁরও জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে কিছু বললেন না।

॥ ৪৫ ॥

অক্ষয়বাবু কিন্তু সেদিন ছোটো ছেলের মুখে সব শুনে শেষ পর্যন্ত উত্তেজিত ও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন।

নিলয় যা বলল তা সংক্ষেপে এই : পানকৌড়ি শিকার করতে সে বেশ কিছুটা দূরে চলে যায়। কিন্তু ছুটে যাওয়াই সার হল, একটা পাখিও সে ফেলতে পারল না। তখন বেলা যথেষ্ট হয়েছিল। মাথার ওপর সূর্যটা জ্বলছিল। চারদিক শূন্য—রৌদ্র হাওয়া আর মাঠবোঝাই ঝকঝকে সরষে ফুল ছাড়া আর যেন সেই জগতে কিছু ছিল না। মাঝে মাঝে ধুলোর ঘূর্ণি উড়ছিল। কেমন একটু ভয় ভয় করছিল তার। পানকৌড়ির ঝাঁকটা দেখতে দেখতে নীল আকাশের কোনদিকে মিলিয়ে গেল। এতটা ছুটোছুটি করে নিলয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার ইচ্ছা করছিল একটা গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে একটু জিরিয়ে নেয়—কিন্তু একটা গাছও তার চোখে পড়ছিল না। অবশ্য গাছ দেখতে পেলেও একলা একটা গাছতলায় বেশিক্ষণ সে বসতে পারত কিনা সন্দেহ ছিল। তার ভয় ভয় করত। চতুর্দিকে কোথাও ঘরবাড়ি নেই, একটা মানুষ চোখে পড়ছে না, একটা গোরু মোষ ছাগল পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না—কেবল রৌদ্র আর হলুদ ফুল আর এলোমেলো বাতাস, এমন দৃশ্য জীবনে সে কোনোদিন দেখেনি। এদিকে শিকারও মিলল না, মন খারাপ করে সেই কড়ি গাছটার কাছে যখন সে ফিরে এল তার বুকের ভিতর ধড়াস করে উঠল। দুজনের একজনকেও গাছতলায় দেখতে পেল না সে। কোথায় গেল ওরা। তার যেন হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছা করল। ঝুড়িটা পড়ে আছে। ঘাসের ওপর ফ্লাস্কটা জলের কুঁজোটা পড়ে আছে। শূন্য শালপাতার ঠোঙাগুলি বাতাসে ফরফর করে উড়ছিল। হঠাৎ গাছের পিছন দিকে বেতঝোপের কাছে একটা কুকুর চোখে পড়ল তার। একটা শালপাতার ঠোঙার ভিতর মুখ ডুবিয়ে চপচপ করে খাবার খাচ্ছে। চপচপ শব্দটা শুনতে পেয়েছিল বলে তার চোখ সেদিকে গিয়েছিল। তখন সে বুঝতে পারল ঐ কুকুরটাই ঝুড়ির ভিতর থেকে ঠোঙাগুলি তুলে নিয়ে সব খাবার সাবাড় করেছে—এবং আর যেটুকু বাকি ছিল হয়তো তাকে দেখতে পেয়েই ঠোঙাটা সরিয়ে নিয়ে ঝোপের কাছে গিয়ে খাচ্ছে। তাই তো! এসব এভাবে ফেলে রেখে তারাই বা কোথায় যেতে পারে? ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকটা দেখতে লাগল সে। তারপর তার মনে হল, নিশ্চয় তার ফিরতে দেরি দেখে দুজন তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। তখন গাছতলা থেকে সরে এসে মাঠে নেমে প্রথমে 'দিদি' 'দিদি' তারপর 'পরিমলদা' 'পরিমলদা' করে খুব জোরে ডাকতে আরম্ভ করল। কোনোদিক থেকে সাড়া পাওয়া গেল না। কী করবে ঠিক করতে পারছিল না সে। তার মনে হল তারা দিক্ ভুল করেছে। যেদিক দিয়ে সে ফিরে এসেছে সেদিকে না গিয়ে দুজন অন্য পথে চলে গেছে, তা না হলে মাঝপথে তাদের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যেত।

রৌদ্র মাথায় নিয়ে মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে এদিক ওদিক দেখছিল সে। এভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটল। গরমে পিপাসায় তার মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। তখন সে ঠিক করল গাছের ছায়ায় ফিরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকবে, তারা ফিরে না আসা তক তাকে যখন অপেক্ষা করতে হবে তখন খামকা আর রোদে পুড়ে লাভ কী। বলতে কী, দিদির ওপর পরিমলদার ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল তার। তখনই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর কোনোদিন এই দুজনের সঙ্গে সে বেড়াতে বেরোবে না, তার যেন একবার মনে হল তারা ইচ্ছা করে, তাকে খোঁজবার ছল করে, দূরে কোথাও চলে গেছে। দিদির

সঙ্গে তো কথা বলা বন্ধই করবে সে, দরকার হলে ভবিষ্যতে পরিমলদার সঙ্গেও আর সে কথা বলবে না। তা ছাড়া এ-ও মনে মনে ঠিক করে ফেলল সে, বাড়ি গিয়ে, মাকে না, মা সব সময় দিদির দিকটা বেশি দেখে, বাবাকে বলবে, সারা রাস্তা দিদি তার সঙ্গে কেবল ঝগড়া করছিল, তার কোনো দোষ ছিল না, যেহেতু সে তাদের সঙ্গে বেড়াতে গেছে এই জন্য দিদি তাকে এত হিংসা করছিল। সব শুনে বাবা নিশ্চয় দিদিকে আচ্ছা করে বকুনি লাগাবে, হয়তো এমনও হতে পারে, দিদিকে আর বাড়ি থেকেই বাবা বেরোতে দেবে না। দিদি যদি আর বেরোতে না পারে তো কেমন মনমরা হয়ে যাবে, মুখটা কেমন কালো করে রাখবে, ছবিটা তখনই সে কল্পনা করতে পারছিল।

কল্পনাটা তাকে আনন্দ দিচ্ছিল। এমন কী ভিতরে ভিতরে সে বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তার যেন মনে হচ্ছিল, কেবল দিদি নয়, পরিমলদার ওপরও প্রতিশোধ নেবার একটা চমৎকার সুযোগ এসেছে—তাকে একলা ফেলে দুজন কোথায় চলে গিয়েছিল; কথাটা শুনলে বাবা পরিমলদার ওপরও অসন্তুষ্ট হবে। এবং দিদিকে যদি আর বাড়ি থেকে বেরোতে না দেওয়া হয় তো পরিমলদারও যে মন খারাপ হয়ে যাবে এ বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। হুঁ, এতদিন সে মনের মধ্যে জিনিসটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেনি, কিন্তু তখন তার মনে হচ্ছিল, পরিমলদা দিদিকে বেশি ভালোবাসে। নিলয়কে অবশ্য গুলতি-টুলতি তৈরি করে দেয়, এই খেলনা সেই খেলনা দোকান থেকে এনে দেয়, কিন্তু তা হলেও দিদির ওপর পরিমলদার যত টান নিলয়ের ওপর ততটা নয়। যে-কোনো মানুষ সাদাচোখে এটা দেখতে পেত, তাই একটা সূক্ষ্ম আক্রোশ তার বুকের মধ্যে এতকাল লুকোনো থাকলেও সেই অজানা অচেনা জায়গায় হঠাৎ নিজেকে এমন নিঃসঙ্গ অসহায় হয়ে পড়তে দেখে সেটা যেন ক্রমেই বড়ো হতে লাগল, বাড়তে আরম্ভ করল। দিদির ওপর পরিমলদার পক্ষপাতিত্বটা এর আগে আর কোন্‌দিন কোন্ অবস্থায় তার চোখে পড়েছিল মনে করতে চেষ্টা করছিল সে। এভাবে তার মধ্যে হিংসা ও আক্রোশ যখন বেড়েই চলল তখন মানুষের গলার শব্দ শুনে সে চমকে উঠে ঘাড় ফেরাতে একসঙ্গে দুজনকেই দেখতে পেল। দিদি আগে পরিমলদা পিছনে—একরকম ছুটতে ছুটতে তারা তার দিকে এগিয়ে আসছিল। দূর থেকেই সে লক্ষ্য করল দিদির চুলে সাদায় লালে মেশানো কটা সুন্দর ফুল গোঁজা রয়েছে এবং ঠিক সেই ফুলের এত বড়ো একটা তোড়া পরিমলদার হাতেও রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা অনুভব করল সে। তারা কোথায় গিয়েছিল, কোনদিকে গিয়েছিল, তাকে খুঁজতে গিয়েছিল কী এমনি বেড়াতে গিয়েছিল—এসব কথা চিন্তা করার আগে ফুলের চিন্তাটা তাকে পীড়িত অস্থির করে তুলল। সে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না, দিদি নিজের হাতে ঐ ফুল মাথায় গুঁজেছিল কী পরিমলদা তাকে ওভাবে সাজিয়ে দিয়েছিল। তার যেন মনে হচ্ছিল পরিমলদা আদর করে বুলার চুলে ফুল গুঁজে দিয়েছে। হয়তো হাতের তোড়া থেকে কিছু ফুল খুলে নিয়ে বুলাকে সাজিয়েছে। মাথাটা গরম হয়ে গেল তার। ইচ্ছা করছিল সেখান থেকে ছুটে কোনদিকে সে পালিয়ে যায় কোথাও, যাতে তারা আর তাকে খুঁজে না পায়। বস্তুত দুজন যে তাকে খুঁজতে যায়নি, ফুল তুলতে গল্প করতে অন্যদিকে চলে গিয়েছিল তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। বাবাকে এ কথাটাও বলা হবে। আক্রোশে রাগে দু

চোখে সে অন্ধকার দেখছিল। ততক্ষণে তারা তার কাছে এসে গিয়েছিল। তাদের মুখের দিকে তাকাতে তার ইচ্ছা করছিল না।

সত্যি সে যে কতখানি অবিচার করেছিল, অন্যায় করেছিল পরিমলদার ওপর দিদির ওপর! কথাটা চিন্তা করে পরে তার খুব কষ্ট হয়েছে। ভীষণ ভুল করেছিল সে দুটি মানুষকেই। যাই হোক, তার ভুলটা ভেঙে গেল। নিজের ওপর সে খুশিই হল। তার তখন মনে হল ক্রোধ হিংসা আক্রোশের মতন খারাপ জিনিস পৃথিবীতে আর কিছু নেই। এ-সব জিনিস মানুষের মনকে অত্যন্ত ছোটো করে দেয় হৃদয়কে সংকীর্ণ করে তোলে। ভিতরে হিংসা থাকলে মানুষ কখনও ভালোটাকে ভালো দেখে না, তার চোখে তখন সাদাও কালো ঠেকে। কিন্তু নিলয় বেঁচে গিয়েছিল। ঈশ্বর তাকে ওতটা নীচ সংকীর্ণ হতে দিলেন না। এটা ঈশ্বরের দয়াই বলতে হবে। দুজনের ওপর অভিমান করে রাগ করে সে মাটির দিকে চোখ রেখে কাঠের মতন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা ছিল, তাদের মুখের দিকে একবারও তাকাবে না, তাদের সঙ্গে কথাও বলবে না। কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখতে পারল না সে, অভিমান টিকল না। পরিমলদা তার মাথায় হাত রাখল, সঙ্গে সঙ্গে তাকে মুখ তুলে তাকাতে হল, তার তখন মনে হল, স্বয়ং ঈশ্বর যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আশ্চর্য স্নেহমাখা সুন্দর দুটি চোখ মেলে পরিমলদা তাকে দেখছিল। 'এই নাও তোমার ফুল।' ফুলের তোড়াটা নিলয়ের হাতে তুলে দিল পরিমলদা। বলল, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ? তোমাকে খুঁজতে গিয়ে আমরা যে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।' অভিমান নয়, লজ্জায় নিলয়ের মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছিল না। পাখি শিকার করতে গিয়ে খামকা এতটা সময় নষ্ট করেছে সে, অথচ একটা পাখিও মেরে আনতে পারল না, এদিকে তাকে খুঁজতে গিয়ে দুজন রৌদ্র মাথায় নিয়ে মাঠে মাঠে কত ঘোরাঘুরি করেছে। 'তোকে ফিরতে না দেখে আমাদের যে কী ভয় হচ্ছিল।' বুলা বলল, 'আমি তো প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম।' দিদির চোখের দিকে তাকিয়ে নিলয় চমকে উঠেছিল। যেন এই প্রথম দিদিকে চিনতে পারল সে। দিদি যে তাকে কত ভালোবাসে, তা এর আগে এত স্পষ্ট উজ্জ্বল হয়ে ওই কালো চোখ-জোড়ার মধ্যে আর কোনোদিন ফুটে উঠেছিল কিনা মনে করতে পারল না নিলয়। তার ইচ্ছা করছিল দিদিকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে, চুমু খেতে। ক'বছর আগে মা যেমন তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করত, চুমু খেত। বৃষ্টিধোয়া আকাশের মতন সুন্দর পরিচ্ছন্ন লাগছিল বুলার চোখ। না কাঁদলে মানুষের চোখ এত সুন্দর হয় না নিলয় বুঝতে পারল। দিদি তার জন্য সত্যি কেঁদেছিল। আর এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কিনা তাকে হিংসুক, স্বার্থপর কত কী মনে মনে বলতে আরম্ভ করেছিল। 'বুঝলি নিলয়, তোকে খুঁজতে গিয়ে আমরা একটা খুব সুন্দর জায়গায় চলে গিয়েছিলাম। কত ফুল ফুটে আছে। বুনো ফুল সব। এই জাতের ফুল পরিমলদার বেশি পছন্দ হল। তোর জন্য নিয়ে এসেছি।' নিলয় ফুলের তোড়াটা দুবার নেড়েচেড়ে দেখার পরে দিদির চুলের ফুলগুলির দিকে তাকাল। বনদেবীর মতন দেখাচ্ছিল বুলাকে। 'আমার ইচ্ছা করছিল না ওখান থেকে চলে আসি, কিন্তু তোকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না, মনটা খারাপ ছিল। তাড়াতাড়ি চলে এলাম। পরিমলদা বলছিল, আরো দূরে গেলে আরো সুন্দর জায়গা দেখতে পেতাম।' দিদির কথা শুনে নিলয় চোখ ঘুরিয়ে পরিমলদাকে দেখছিল। মিটিমিটি হাসছিল মানুষটা। বুলার

সঙ্গে সঙ্গে এই মানুষকেও কত ভুল ভাবতে আরম্ভ করেছিল নিলয়। কিন্তু পরিমলদার মধ্যে যে কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব, যেমন একে বেশি ভালোবাসা ওকে কম ভালোবাসা কম আদর করা, এ-সব জিনিস থাকতে পারে না, তার কাছে বুলা যতখানি নিলয়ও ততখানি, একটা সাধারণ ঘটনা—দুজনকে ভাগ করে বনের ফুল উপহার দেওয়ার মধ্যেই তার প্রমাণ পেল নিলয়। তার মনে আর সন্দেহ রইল না। পরিমলদা হাতে যেমন তার জন্য ফুলের তোড়াটা নিয়ে এসেছে, তেমনি বুলাকেও নিজের হাতে ফুল দিয়ে সাজিয়েছে। ঈর্ষার পরিবর্তে একটা তৃপ্তির—আনন্দের ভাব জাগল নিলয়ের মনে। 'পরিমলদা, আমরা কি এখনি ফিরে যাব, স্টেশনে গিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরব?' বুলা প্রশ্ন করেছিল। পরিমলদা তেমনি হাসতে হাসতে উত্তর করেছিল, 'তোমরা যা বলবে তাই হবে' বলেই নিলয়ের দিকে তাকিয়েছিল। বুলা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়েছিল, 'এখনো অনেক বেলা পড়ে আছে পরিমলদা, আমরা আর একটু বেড়াব—ওদিকে এগিয়ে গেলে অনেক কিছু দেখবার আছে। বুঝলি নিলয়।' নিলয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে দিদি বলেছিল, 'বনের ভেতর ঢুকে আমরা ফুল তুলছিলাম দেখে এক বুড়ো খুব খুশি হয়েছিল, পাগলের মতন দেখতে, ওখানে ওই কাঁটাজঙ্গলের ভেতর মানুষটা একলা কী করছিল কে জানে, তবে আমরা কষ্ট ক'রে—আমি অবশ্য কিছুই করিনি, পরিমলদাই কাঁটার ভেতর হাত ঢুকিয়ে সব ফুল তুলছিলেন, দুবার তাঁর হাত ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল—হ্যাঁ, যেন এই দৃশ্যটাই বুড়োকে বেশি মুগ্ধ করেছিল, হাঁ করে কতক্ষণ আমাদের দেখল, তারপর দেখে আস্তে আস্তে বলল, এত পরিশ্রম করে এভাবে গায়ের রক্ত ঝরিয়ে বুনো ফুল তুলতে আমি আর কাউকে দেখিনি—তোমাদের প্রথম দেখলাম, বুঝলাম সুন্দর জিনিস তোমরা কত ভালোবাস, ভগবান তোমাদের সুখী করবেন। কথাগুলো বলে বুড়ো একটু চুপ থেকে পরে আবার বলল, বনের ফুল তুলতে যদি কষ্ট করে এতটা পথ এলে তো আরো খানিকটা তোমরা এগিয়ে যাও—দেখবে পৃথিবীতে আজও কত ভালো জিনিস, সুন্দর জিনিস আছে। তোমরা নিশ্চয় শহর থেকে এসেছ, তোমাদের দেখেই বুঝতে পেরেছি, শহরের মানুষ—একথা বলে আবার একটু চুপ করে থেকে বুড়ো কী যেন ভেবেছিল, তারপর মুখটা বেঁকিয়ে বলেছিল, আমিও শহরে ছিলাম, এখন শহরের নাম শুনলে থুথু ফেলতে ইচ্ছে করে। অনেক বুদ্ধি খরচ করে, অনেক পয়সা খরচ করে মানুয শহর গড়তে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারল না। শহরটাকে নরককুণ্ড বানিয়ে ফেলল, তাই সেখান থেকে পালিয়ে যেখানে মাঠ বন আকাশ যেখানে নিরীহ পশুপাখিরা আছে তাদের কাছে চলে এসেছি—পরিমলদার চোখের দিকে তাকিয়ে বুড়োটা এ-সব বলছিল—আমি লক্ষ্য করছিলাম, কথাগুলো শুনতে শুনতে পরিমলদা কেমন অভিভূত হয়ে পড়লেন। বুড়োর সব কথা আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু কথাগুলো যে খুবই মূল্যবান এটুকু বুঝেছিলাম—বনের ভেতর দিয়ে বুড়ো কোথায় যেন চলে গেল। পরিমলদা আমার দিকে তাকিয়ে তখনই বলেছিলেন, আমারও আর শহরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না, বুড়োর মতন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পারলে বেঁচে যেতাম।' দিদির কথা শুনে নিলয়ের বুকের ভিতর কেমন করে উঠেছিল, জঙ্গলের সেই বুড়োটাকে দেখতে তার ভীষণ ইচ্ছা করছিল। পরিমলদার হাত ধরে সে বলেছিল—এভাবে যদি আমরা তিনজনে মাঠে বনে ঘুরে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম! শুনে পরিমলদা তখন হেসে

বলেছিল, 'তা কি হয়—তোমাদের এখন লেখাপড়া শেখায় সময়, তা ছাড়া বাড়ি ফিরে না গেলে বাবা-মা তোমাদের জন্য কত চিন্তা করবেন।'

এই পর্যন্ত শুনে অক্ষয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা লাভ হল তোদের—ঘর থেকে বেরোলেই নানা জিনিস চোখে পড়ে, কত কী জানা যায় শেখা যায়, হুঁ তারপর? নিশ্চয় সেই বুড়োর কথা শুনে তোরা আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলি?' নিলয় ঘাড় কাত করেছিল। সেই কড়ি গাছের নীচে যেখানে তারা প্রথম বিশ্রাম করেছিল জায়গাটার নাম বিষ্ণুপুর। সেখান থেকে তারা মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে পূব-দিকে চলে যায়। অনেকটা রাস্তা হাঁটতে হয়েছিল। সূর্য প্রায় হেলে পড়েছিল। তারপর তারা যে গ্রামে পৌঁছল তার নাম মাধবপুর। খুব সুন্দর জায়গা। এক পীরের দরগা আছে সেখানে। সঙ্গেই একটা প্রকান্ড দিঘি। এতবড়ো দিঘি তারা আর কোনদিন দেখেনি। দিঘিতে কত পদ্ম গাছ! সারাটা ভাদ্র-আশ্বিন মাস নাকি এত ফুল ফুটে থাকে যে, দীঘির জল দেখা যায় না। এটা কার্তিক মাস। তা হলেও কিছু কিছু পদ্মফুল তারা দেখতে পেয়েছিল। দিঘির পশ্চিম-পাড়ে দরগা, পূব-পাড়ে একটা শিবমন্দির। হাজার বছরের পুরোনো মন্দির। দরগাটাও নাকি খুব পুরোনো। মাঝখানে পদ্মবন রেখে এ দুটো প্রাচীন জিনিস আজও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। ঘুরে ঘুরে মন্দির ও দরগা দেখা শেষ করে তারা দিঘির পাড়ে একটা গাছতলায় যখন বিশ্রাম করতে বসল, তখন সূর্য অস্ত যায়। পরিমলদা কেমন যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল। একটু আগে, যখন তারা মন্দিরের বাইরে এসে ফুলের বাগানটা দেখছিল তখন একটা মানুষ পরিমলদাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে কী যেন বলছিল। তারপর থেকে পরিমলদা আর ভালো করে দু ভাই-বোনের সঙ্গে কথা বলতে পারছিল না, চুপ থেকে কেবলই ভাবছিল। সূর্য ডুবে গেল। দিঘির জলের লাল রঙটা মুছে গিয়ে কালো রঙ ধরল। পরিমলদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুলাকে বলল, 'আমি আজ আর যাচ্ছি না, তোমরা চলে যাও, এগিয়ে গেলে বাঁধানো সড়ক পাবে, শুনেছি সেখানে সাইকেল রিকশাও রয়েছে। রিকশাওলাকে বললেই তোমাদের রেল স্টেশনে পৌঁছে দেবে। সাতটা দশ-এ একটা ট্রেন আছে। ওই ট্রেনে তোমরা বালিগঞ্জ যেতে পারবে। এই নাও, তোমাদের রিকশা-ভাড়া টিকিট এই টাকায় হয়ে যাবে।' পরিমলদা পকেট থেকে টাকা বার করেছিল।

'সে কী, তা হয় কখনো!' বুলা ও নিলয় একসঙ্গে বলে উঠল, 'আপনাকে একলা ফেলে রেখে আমরা কেন যাব—তা হয় না।'

'কিন্তু আমাকে যে আরো দূরে যেতে হবে—' পরিমলদা অল্প হেসে বলল, 'শুনলাম আরো দক্ষিণে এগিয়ে গেলে হৃদয়পুর বলে একটা জায়গা আছে—সেখান নাকি আরো সুন্দর জিনিস দেখবার আছে। তোমাদের তো বিষ্ণুপুর-মাধবপুর দেখা হল—এবার দুটি ভাই-বোন বাড়ি ফিরে না গেলে বাবা-মা ভয়ানক চিন্তা করবেন। বরং চল, আমি তোমাদের ট্রেনে তুলে দিচ্ছি। একবার ট্রেনে চাপলে আর ভয় কী। দেখতে দেখতে বালিগঞ্জ এসে যাবে। বালিগঞ্জ স্টেশনে নেমে আবার একটা রিকশায় চেপে বাড়ি চলে যাবে। এই টাকায় হয়ে যাবে।'

বুলা চুপ করে ছিল।

নিলয় বলল, 'বাবা-মা আমাদের জন্য চিন্তা করবে—কিন্তু আপনার জন্য কি চিন্তা করবে না, আমার বাবা-মা তো করবেই, জিজ্ঞেস করবে কোথায় ফেলে এলি তোদের পরিমলদাকে, আপনার বাবাও যে আপনার জন্য খুব চিন্তা করবেন।'

'ইস্, খুব পাকা কথা বলতে শিখেছে আমাদের নিলয়।' নিলয়ের পিঠে হাত রেখে পরিমলদা আবার একটু সময় চুপ করে ছিল। তারপর অন্ধকার হয়ে আসা আকাশের দিকে চোখটা ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বলেছিল, 'না রে, আমার জন্য কেউ চিন্তা করবে না। আমি যদি আর কোনোদিনও বাড়ি ফিরে না যাই—আমার জন্য কেউ ভাববে না।'

শুনে নিলয় ও বুলার মুখ দিয়ে হঠাৎ কথা বেরোচ্ছিল না। তারা বুঝতে পেরেছিল, জেল-ফেরত মানুষ পরিমলদা—নিশ্চয় এই জন্য বাড়িতে কেউ তেমন ভালো চোখে তাঁকে দেখ তে পারছে না—তা না হলে একথা বলবেন কেন, আর কোনোদিন ফিরে না গেলেও বাড়ির মানুষ তাঁর জন্য ভাববে না। তাই মনে অভিমান আছে—তাই ওই পাগল বুড়োটার মতন ঘরবাড়ি ছেড়ে দূরে—আরো দূরে চলে যেতে চাইছেন—হৃদয়পুর থেকে আবার কোন্‌দিকে যাবেন কে জানে। হয়তো বুড়োটার মতন বাকি জীবন বনের ফুল দেখে, পাখি দেখে কাটিয়ে দেবেন। .

'তার চেয়ে এক কাজ করলে হয় না পরিমলদা?' একটু চিন্তা করে পরে বুলা বলেছিল, 'আমরা যদি কেউ ফিরে না যাই বাড়িতে সবাই চিন্তা করবে সত্যি, নিলয় না হয় আজ ফিরে যাক। আমরা তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি। বালিগঞ্জ যাবার অনেক যাত্রী পাবে—তাদের সঙ্গে চলে যাবে। তারপর ওখানে পৌঁছে ট্রেন থেকে নেমে গেলে আর ভয় কী। ও ঠিক বাড়ি যেতে পারবে—'

'তারপর? তুমি কোথায় যাবে!' পরিমলদা প্রশ্ন করেছিল।

'আপনার সঙ্গে যাব, হৃদয়পুর যাব।' একটু শক্ত হয়ে উত্তর করেছিল বুলা।

'না, তা হয় না।' পরিমলদা মাথা নেড়েছিল।

'কেন হবে না!' বুলার গলার স্বরটা কেঁপে উঠেছিল। নিলয় বুঝতে পারছিল একটু অভিমান, যেন কান্নার মতন একটা কিছু এবার চেপে রাখতে গিয়ে দিদির গলার স্বরটা এমন হয়ে গেল। দিদির প্রস্তাব শুনে প্রথমটায় সে খুশি হতে পারেনি। পরিমলদার সঙ্গে দিদি হৃদয়পুর যাচ্ছে, সে যাচ্ছে না। একটু রাগই হয়েছিল তার। কিন্তু পরক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে গেল, দিদির ওপর আরএক ফোঁটাও রাগ রইল না তার।

কেননা, এমন একটা প্রস্তাব করা ছাড়া বুলার উপায় ছিল না যে। 'আপনার সঙ্গে আমাকে যেতেই হবে।' তখনও কাঁপা গলায় বুলা বলছিল।

'তারপর কী হবে!' পরিমলদা ফের প্রশ্ন করেছিল, যেন বুলা এমন জিদ করছে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। একটু থেমে থেকে আবার বলেছিল, 'নিলয়কে নিয়ে তুমি বাড়ি ফিরে যাও, আমার ফিরতে কদিন দেরি হবে।'

'এই জন্যই তো বলছি আপনাকে একলা ছেড়ে দেব না।' দু হাতে মুখ ঢেকে বুলা কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। 'আপানি আর কোনোদিনই ফিরবেন না—ফেরার ইচ্ছা নেই।'

নিলয় তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল। দিদি কেন এমন জিদ করছে বুঝতে পারল সে, বলল, 'তাই ভালো পরিমলদা, আমাকে ট্রেনে তুলে দিন। আজ বরং আমিই ফিরে যাই। তবেই

আর বাড়িতে কেউ চিন্তা করবে না। ওঁদের বলব, আপনারা হৃদয়পুর বেড়াতে গেছেন, ফিরতে একদিন দেরি হবে, সবাই চিন্তা করবে বলে পরিমলদা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।' মনে মনে দিদির বুদ্ধির প্রশংসা না করে সে পারল না। পরিমলদাকে একলা ছেড়ে দিলে আর হয়তো ফিরে আসতেন না। সঙ্গে বুলা গেছে। বুলাকে বালিগঞ্জে পৌঁছে দিতে তাঁকে ফিরে আসতেই হবে।

'নিশ্চয় নিশ্চয়'—নিলয়ের কথা শুনে অক্ষয়বাবু মাথা নেড়েছিলেন। 'সঙ্গে গিয়ে বুলা ভালো করেছে, হ্যাঁ, এমন একটা আশঙ্কা আছে বইকি, হয়তো বাড়ির লোকের ব্যবহারে আত্মীয়স্বজনের আচরণে একটা হতাশা, বৈরাগ্যের ভাব এসেছে পরিমলের মনে, বলা যায় না, এক ভাই সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে—সুতরাং সেও যদি আর ফিরে না আসে—কিন্তু ফিরে না এলে আর কারো মনে দুঃখ না হোক, আমি যে ভয়ানক দুঃখ পাব—আমি যে তাকে আমার নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি ভালোবেসে ফেলেছি, কাজেই তাকে ফিরিয়ে আনতে—বুলা ঠিক কাজ করেছে , বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। হুঁ, তারপর? তোকে ওরা ট্রেনে তুলে দিল, সঙ্গী নিশ্চয় পেয়েছিলি, কলকাতা বালিগঞ্জ আসবার আবার সঙ্গীর অভাব। আর না পেলেও ক্ষতি ছিল না, ট্রেনে চাপলেই হল। একটানে বালিগঞ্জ। তারপর স্টেশন থেকে আমাদের গোঁসাই-পাড়া বস্তির রাস্তাটা তো তোদের কাছে জলভাত—রাত দুপুরে আসতেও ভয় পাবার কথা নয়।'

নিলয় চুপ থেকে হাতের নখ খুঁটছিল।

'ওরা কি আজই হৃদয়পুর যাত্রা করবে, তোকে কিছু বলল?'

বাবার মুখের দিকে তাকিয় নিলয় মাথা নাড়ল।

'আজ রাতটা বোধ করি মাধবপুর থেকে যাবে—' অক্ষয়বাবু এবার যেন কতকটা নিজের মনে বললেন, 'খুব সম্ভব কাল ভোরবেলা রওনা হবে—যদি হৃদয়পুর থেকে আবার ওরা কোথাও যায় তো দুপুরে ফেরা হবে না, ফিরতে ফিরতে সেই বিকেল—সন্ধ্যা, হয়তো সন্ধ্যার ট্রেন ধরে বালিগঞ্জ এসে পৌঁছোতে কাল রাত আটটা নটা হয়ে যাবে—তাই হয়, নেশা পেয়ে গেলে ভ্রমণটা ঠিক এক জায়গায় একটা দুটো জিনিস দেখে শেষ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না। তখন ইচ্ছা করে আর একটু দূরে যাই, আরো দু চার জায়গা ঘুরে যেখানে যত দর্শনীয় জিনিস আছে দেখে শেষ করে তবে ঘরে ফিরি।'

'কোনোদিনই ওরা আর ঘরে ফিরবে না—তোমার মেয়েকে নিয়ে জগু ডাক্তারের ছেলে পালিয়ে গেল।'

অক্ষয়বাবু চমকে উঠলেন। নিলয় ছাড়াও যে ঘরে আর একজন ছিল তিনি প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন। দেওয়ালে পিঠ রেখে কাঠের মতন শক্ত হয়ে বসে থেকে তাঁর স্ত্রী এতক্ষণ ছেলের কথা শুনছিল। গলার আওয়াজ শুনে অক্ষয়বাবু সেদিকে চোখ ফিরিয়ে চাপা গলায় গর্জন করে উঠলেন, 'চুপ কর চুপ কর—ওই পাঁঠাটার মতন তুমিও দেখছি আবোলতাবোল বকতে আরম্ভ করলে।'

'না, না না—আমি যা ভেবেছি তাই ঠিক, প্রলয় যা বলে গেল তাই ঠিক।' হাতের তেলো দুটো শূন্যে ঘুরিয়ে অক্ষয়বাবুর স্ত্রী, এবার আর কাঁদো কাঁদো সুরে নয়, কেমন যেন একটা বিকৃত হাসির মতন শব্দ তুলে কড়িকাঠের দিকে চোখ রেখে বললেন, 'সবটাই ওদের একটা

চাল, একটা ষড়যন্ত্র—ষড় করেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল দুটিতে—যা হোক একটা কিছু বলে-টলে ছোটো ভাইটাকে মাঝপথ থেকে বিদায় করে দিয়ে হারামজাদী ওই খুনেটার সঙ্গে পালিয়ে গেল।'

'গেছে আপদ গেছে।' অক্ষয়বাবু মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন। 'বিয়ে দেবার ক্ষমতা যখন নেই সারা জীবন গলায় ঝুলিয়ে রেখে ভাত-কাপড়ের খরচ জুগিয়ে মরতে হত না?—যা তো নিলয়, একটু বাইরে যা'—নিলয় উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে অক্ষয়বাবু অবার রুক্ষ কঠিন গলায় বললেন, 'এই কদিনে কতগুলো টাকা দিয়ে গেছে ডাক্তারের ছেলে একবার হিসাব করেছ? তোমার দুশ' আর কাল আমাকে কী জিনিস হাতে ধরে দিয়ে গেছে চোখেই তো দেখলে। এখন আমি ওটা বিক্রি করছি না, তোমার ঐ দুশ' টাকা থেকেও একটি আধলা ভাঙ্গা হবে না। সবটাই ধরে রাখব। সংসার খরচ যেভাবে চলে চলুক—শুনেছি এখনো খোঁজ করলে কসবার ওদিকে ছশ' সাতশ' করে কাঠা পাওয়া যায়। দু কাঠা আড়াই কাঠা কিনে ফেলে রাখব। সময়ে কাজ দেবে।'

'উঃ, তুমি কী নিষ্ঠুর কী স্বার্থপর!' অক্ষয়বাবুর স্ত্রী দু হাতে মুখ ঢাকলেন।

অক্ষয়বাবু সে কথা গায়ে মাখলেন না। বরং হাসবার ভঙ্গি করে শুকনো ঠোঁট দুটো প্রসারিত করে ধরে বললেন, 'অনেক ঘোলা জল খাওয়া হয়েছে গিন্নি, তারপরও যদি বুড়ো বয়সে তোমার মুখ থেকেই এ কথা বেরোয় তো আর আমার বলবার কিছু থাকে না। হুঁ, এখন মেয়ের জন্য শোক আরম্ভ হল তোমার!'

॥ ৪৬ ॥

ঘরের দেওয়ালে টিকটিকিটা যেমন ওত পেতে থাকে, তারপর এক সময় খপ করে শিকারটিকে মুখে তুলে নিয়ে সরে পড়ে তেমনি এতক্ষণ বাইরে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে অক্ষয়বাবুর ঘরের বেড়ার গায়ে কানটি চেপে ধরে অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করছিল। তারপর খবরটা শোনা মাত্র আর এক সেকেন্ড সেখানে অপেক্ষা করল না। বলতে হয়, চমৎকার খবরটা একরকম মুখে তুলে নিয়ে অন্ধকার গলিটা পার হয়ে ছুটতে ছুটতে সে সদর রাস্তায় আলোর নীচে এসে দাঁড়াল। তারপর হাঁপাতে আরম্ভ করল। বস্তুত, শিকার যদি মুখের অনুপাতে বড়ো হয় তো সেটাকে নিয়ে টিকটিকিকে ভয়ানক বেগ পেতে হয়, জীবটাকে বধ করা চর্বণ করা গলাধঃকরণ করার হাঙ্গামা কম না, পটু-বিচক্ষণ শিকারী একসময় বেসামাল হয়ে পড়ে, হাঁসফাঁস করে। কে জানে হয়তো নিজেকে বিপন্ন বিপর্যয়গ্রস্তও মনে করতে আরম্ভ করে শেষটায়! তেমনি প্রদোষের মনে হচ্ছিল খবরটা তার পক্ষে বড়ো, ভয়ানক বড়ো, যেন সেটাকে সামাল দেওয়া তার পক্ষে কষ্ট হচ্ছে, ছটফট করছিল সে, হাঁসফাঁস করছিল—আর কাউকে ভাগ না দিয়ে একলা তার পক্ষে এতবড়ো একটা খবর জীর্ণ করা যে মুশকিল সে বেশ বুঝতে পারছিল। কিন্তু কাকেই বা ভাগ দেবে। এ জিনিস ভাগাভাগি করে যে ভোগ করারও নয়। অথচ খবরটা সংগ্রহ করতে বেচারাকে আজ সারাদিন কত পরিশ্রম করতে হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে শুনেছিল খুনেটার সঙ্গে ভাই বোন বেড়াতে চলে গেছে। ওদের বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে নাকি তারা কোন্ একটা

গাঁয়ের দিকে বেড়াতে গেছে। সেটাও বড়ো খবর ছিল। কিন্তু তা হজম করা প্রদোষের পক্ষে তেমন কষ্ট হয়নি। বেড়াতে যাওয়ার খবর তো কদিন ধরেই শুনছে। শুনতে শুনতে জিনিসটা গা-সওয়া হয়ে গেছে তার। আজ না হয় ট্রেনে চড়ে গেছে। তা হলেও অস্বস্তি কম ছিল না। সকালে তারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ধারে কাছে কোনো একটা গাঁয়ে যাবে অনুমান করে নিয়েও ঠিক তখনই স্টেশনে না গিয়ে ঘন্টা তিনচার পর অর্থাৎ এবার ওদের ফিরে আসার সময় হল চিন্তা করে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। তখন বেলা ন'টা দশটা। ন'টা দশটা থেকে বেলা দুটো আড়াইটা পর্যন্ত বালিগঞ্জ স্টেশনে সে অপেক্ষা করেছিল। দুবার ভেন্ডারের কাছ থেকে চা কিনে খেয়েছিল। চারবার স্টেশন মাস্টারের ঘরে দরজায় উঁকি দিয়ে দেওয়ালে টাঙানো বড়ো ঘড়িটা দেখেছিল। আর বাকি সময়টা রৌদ্র মাথায় নিয়ে পাথরের টুকরো ছড়ানো দীর্ঘ বিস্তৃত সাপের গায়ের মতন কুচকুচে কালো রেললাইন দুটোর দিকে তাকিয়ে থেকে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলেছিল। কত গাড়ি এল গেল। কিন্তু তাদের ফেরার নাম নেই। ক্রমশ তার মাথাটা গরম হয়ে উঠছিল। তবে তো বেশ দূরেই বেড়াতে গেছে। ধরতে গেলে সারাদিনের জন্য, বেশ জমকালো একটা প্রোগ্রাম নিয়ে উকিলের ছেলেমেয়ে আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। না, এমন নয় যে, তারা ফিরে এসেছে ট্রেন থেকে নামছে— এই দৃশ্য দেখতে পেলে প্রদোষের দেহমন জুড়িয়ে যেত, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাড়ি ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্তমনে সে স্নান করত ভাত খেত। স্নান খাওয়া কদিন থেকেই সে ভুলেছে। স্নান খাওয়া ঘুম সেই সঙ্গে লেখাপড়া বাবা মা ভাই বোন বাড়ি ঘর—তা বলে কি সে রাস্তায় ঘুরে নিরম্বু উপবাস থেকে গাছতলায় রাত্রিবাস করে দিন কাটাচ্ছে, তা নয়, বাড়িও যাচ্ছে ভাতও খাচ্ছে বাবা মা ভাই বোনকেও চোখের সামনে দেখছে—কিন্তু এসবের সঙ্গে যেন তার খোলসটারই শুধু সম্পর্ক—ভিতরের মানুষটা অর্থাৎ প্রদোষ বলতে যাকে বোঝায় সে যেন অন্য একটা জগতে চলে গেছে। সেখানে খাওয়া ঘুম বিশ্রামের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বাবা মা ভাই বোন থাকুক মরুক তাতে কিছু যায় আসে না। সেই শূন্য অন্ধকার জগতে এক ব্যর্থ হতাশ প্রেমিক নিরন্তর মাথা কুটে মরছে। কখনো চোখের জল ফেলছে, কখনো তিক্ত হাসি হাসছে। আর হাসি কান্নার ফাঁকে ফাঁকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে চিন্তা করছে এই নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকথার প্রতিশোধ তুলতে তাকে কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। বুদ্ধি ঠিক করতে পারছে না সে—সঠিক উপায়টি খানিকটা এগোয়, তারপর পিছোতে আরম্ভ করে, আবার তখন নূতন পথের কথা চিন্তা করে। চিঠি দিয়ে কাজ হয়নি। অক্ষয় উকিলের সেয়ানা মেয়ে চিঠি চিবিয়ে খেয়ে হজম করে ফেলেছে। অথচ এমন কথা আর কোনো মেয়েকে লিখলে কবে সে সাবধান হয়ে যেত—অন্তত চক্ষু লজ্জার খাতিরেও এ ধরনের একটা লম্পট খুনের সঙ্গে মেলামেশা কদিন বন্ধ রাখত। লম্পটকে ভয় না করুক, লোকনিন্দাকে তো ভয় করত ঠিকই। কিন্তু উকিলের মেয়ের সে বালাই নেই। উকিলের মেয়ের নেই, উকিলের নেই, উকিলের বউটারও লোক-নিন্দার লোকলজ্জার ভয়ডর বলতে কিছু নেই। এতবড়ো একটা দাদা—যেন বাতাস খেয়ে এতদিন বেড়ে উঠেছে, কথায় বলে বুদ্ধির ঢেঁকি, না হলে কাগজ ফেরি করে ভাত খায়! এমন জলজ্যান্ত টাটকা একটা খবর প্রদোষের কাছ থেকে শুনল, একটা মেয়েকে পাগল করে দিয়ে ডাক্তারের ছেলে এবাড়ি এসে ভিড়েছে, এবার

তোমার বোনটাকেও পাগল করে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে তারপর এখান থেকে যাবে, কথাটা শুনল—কিন্তু কী হল, এক কান দিয়ে ঢুকল আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেল—গায়ে মশা মাছি বসলেও মানুষ এর চেয়ে বেশি ব্যস্ত হয় বিরক্ত হয়, কিন্তু এটা যেন একটা গায়ে মাখার মতন খবরই নয়। এই নিয়ে দুশ্চিন্তা করার উদ্বেগবোধ করার কিছুই নেই। অন্য কোনো দাদা হলে খুনেটাকে দ্বিতীয় দিন বাড়িতে ঢুকতে দিত না। তাই প্রদোষ চিন্তা করে—একটা পরিবারের সব কটা মানুষ—বাপ ছেলে গিন্নি—তিন তিনটে বয়স্ক মানুষ এমন চোখ কান বুজে থাকতে পারে এ বড়ো সাংঘাতিক কথা। সেদিন উকিলের ছোটো ছেলেটাকেও খোঁচা দিয়ে জিনিসটা জানিয়ে দিয়েছিল প্রদোষ। যদি বাড়ির লোকের চেতনা ফিরে আসে, যদি তারা আর খুনেটার সঙ্গে বুলাকে মিশতে না দেয়—কিন্তু যে কে সে, আফিং খেয়ে ঘুমিয়ে আছে সব। ডাক্তারের ছেলে যেমন আসছিল তেমনি আসছে, খাতিরযত্ন পাচ্ছে, আর ফাঁক বুঝে বুঝে মেয়েটাকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। খোঁচাটার মধ্যে বিষ কি কম ছিল। ঐটুকুন ছেলের পক্ষে তা হজম করা শক্ত ছিল। নিশ্চয় বাড়িতে গিয়ে সব বলে দিয়েছিল। কিন্তু বললে হবে কী। তাদের কাছে এই বিষ আজ অমৃত। তার অর্থ বদমায়েসটা কাঁড়িকাঁড়ি টাকা ঢালছে সেখানে। মেয়ে সতী রইল কী অসতী হল তা তাদের দেখবার দরকার নেই। টাকার চেয়ে মিষ্টি পৃথিবীতে আর কিছু আছে নাকি? কাজেই প্রদোষ বুদ্ধি ঠিক করতে পারছে না। বাড়ির লোককে এভাবে-সেভাবে সাবধান করে দিয়েও যখন কিছু কাজ হল না তখন এই জিনিস বন্ধ করতে সে আর কী করতে পারে! অবশ্য এই জিনিস বন্ধ করার নৈতিক দায় নিয়ে যে সে বসে আছে এমন নয়। আসলে চোখের সামনে এতবড়ো একটা ব্যাপার ঘটছে, সে সহ্য করতে পারছে না। তবু যদি জিনিসটার মধ্যে প্রেম থাকত রোমাঞ্চ থাকত, সৌন্দর্য বলে কিছু থাকত তো বলার কিছু ছিল না। কিন্তু অক্ষয় উকিলের মেয়েকে নিয়ে ডাক্তারের ছেলে যা করছে, কুৎসিত উলঙ্গ কামনা, ভোগের ঢালাও কারবার ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু আছে বলে সে বিশ্বাস করে না। আর, সেদিন সে একটা চুমু খেয়েছিল বলে মেয়ের সে কী রাগ, চোখমুখেরই বা কী অবস্থা করেছিল! যেন ওটা একটা চায়ের দোকান না হলে প্রাদোষের গায়ে থুথু ছিটিয়ে দিত। তাই তো, প্রদোষ রীতিমতো ভয় পেয়েছিল, এমন একটা শুচিতা শুভ্রতার বিজ্ঞাপন গায়ে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন উকিল-কন্যা! এখন?

এই জিনিসটাই আজ দেখতে চেয়েছিল সে। রোদে পুড়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, ট্রেনের কামরা থেকে যখন তারা বেরিয়ে আসবে তখন তাদের চোখে মুখে, তাদের বলতে ঐ কামচারিণী বিড়ালতপস্বিনীর মুখটাই এক নজরে দেখে পরীক্ষা করতে চেয়েছিল সে, একবার দেখলেই প্রদোষ বুঝে নিত, গাঁয়ের মাঠেঘাটে বনবাদাড়ে সারাদিন কাটিয়ে আসবার উদ্দেশ্যটা কী ছিল। তাই তো, একটি মানুষ যখন সুন্দরকে ভালোবাসে সুন্দরের ধ্যান করে মহৎ ভাবনার মধ্যে সারাক্ষণ নিজেকে ডুবিয়ে রাখে, তার চোখে মুখে আপনা থেকে সেই জিনিস ফুটে ওঠে। তেমনি উল্টোটাও আছে, পাপের কথা ব্যভিচারের কথা, অবাধ বিহার বল্গাহীন যৌনাচারের আদ্যোপান্ত ছবি ঐ একই মুখে তুমি দেখতে পাবে। এমন কী দুর্গন্ধটা পর্যন্ত তোমার নাকে লাগবে।

তবে কি সেই পাপের ছবি দেখতে কুৎসিত গন্ধ পেতে প্রদোষ স্টেশনে ছুটে গিয়েছিল? অনেকটা তাই। কেউ তাকে এ প্রশ্ন করলে হাত দিয়ে নিজের কপাল দেখিয়ে সে বলত আমার নিয়তি আমাকে আজ এ-পথে টেনে নিয়ে এসেছে। এখন আমি কৃমির কিলবিল দেখতে ভালোবাসি, পচা গন্ধের ওপর আমার অগাধ লোভ, চব্বিশ ঘন্টা নারীদেহ রতিক্রীড়ার কথা চিন্তা করছি, যে-পথে পাপ অন্ধকার অসুস্থতা ছড়িয়ে আছে সেই পথে আমার আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে। স্বীকার করতে তার কোনো বাধা নেই, পরশু সন্ধ্যার পর সে কালীঘাটের দিকে চলে গিয়েছিল। অন্ধকার গলির ভিতর একটা মেয়ের ঘরে দিব্যি ঢুকে পড়েছিল। কাল সন্ধ্যার পর সে একটা শুঁড়িখানায় ঢুকে দু আউন্স দিশি মদ খেয়ে বেরিয়ে এসেছিল। অথচ কদিন অগেও জিনিসগুলিকে সে কত ঘৃণা করত। বেশ্যাবাড়ি যাওয়া মদের দোকানে ঢুকে মদ খাওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়। বা এর আগে কোনো দিন সে এসবের নাম শোনেনি এমন নয়। এক সঙ্গে স্কুলে পড়েছে এক সঙ্গে বড়ো হয়েছে এমন ক'টি বন্ধু তার এই বালিগঞ্জেই আছে—আজ অবশ্য তারা আর লেখাপড়া করে না, রকে বসে আড্ডা দেয়, রাস্তায় সুন্দর মেয়ে দেখলে মুখের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে সিটি মারে, ফ্লাস খেলে চোলাই মদ খায় মেয়েমানুষের বাড়ি যায়। তাদের কাছে জিনিসগুলি জলভাত। তাদের সঙ্গে দেখা হলে যে প্রদোষ মুখ ঘুরিয়ে রাখে তা-ও নয়। দরকার হলে একটি দুটি বখাটে বন্ধুর সঙ্গে বসে সে গল্পসল্পও করে, তারা কবে কোথায় গিয়েছিল কী করেছিল মন দিয়ে শোনে কেননা এই শ্রেণীর বন্ধুদের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা একদিন সে কাজে লাগাবে, সে যখন উপন্যাস লিখতে চাইছে জীবনর অন্ধকার দিকটাও উপেক্ষা করার নয়, কেবল গঙ্গাজল তুলসীপাতা খেয়ে পৃথিবীর সব মানুষ কিছু বেঁচে থাকে না। কিন্তু সে অন্য জিনিস। অভিজ্ঞতার পুঁজি বাড়ানোর জন্য গল্প শোনা। কিন্তু ভিতরে একটা হাহাকার নিয়ে একটা বিকৃত ক্ষুধা নিয়ে মদ খাওয়া বেশ্যার ঘরে ঢোকা! একটি বন্ধুর সঙ্গেই অবশ্য সে গিয়েছিল। বন্ধুটি খুবই খুশি হয়েছিল। কিন্তু সে তো জানে না কত দুঃখ পেয়ে কতটা আঘাত পেয়ে প্রদোষ এ সব রাস্তায় পা বাড়াতে আরম্ভ করেছে। তার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে, সমস্ত সৌন্দর্যবোধ ধূলিসাৎ হয়েছে, রুচি হৃদয়ের কোমলতা—কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। একটা মেয়ে তাকে এমন করেছে, যাকে সে ফুলের মতন পবিত্র মনে করত। তার হৃদয়ে প্রেমের আলো জ্বেলে দিত এই অনাঘ্রাত কুসুমকলি। কিন্তু পবিত্র কুসুম যখন পাপড়ি মেলে ধরল দেখা গেল ভিতরে পোকা কিলবিল করছে। আর কার জন্য সব কটা পাপড়ি মেলে ধরা? একটা লম্পট একটা ক্রিমিন্যালের জন্য।

কাজেই নিয়তির পরিহাস ছাড়া প্রদোষ এটাকে আর কী ভাবতে পারে। হ্যাঁ, তার ভাগ্য তাকে এভাবে ঠাট্টা করে চলেছে। আর একটা দৃষ্টান্ত সেদিন এক আশ্চর্য রূপসীর সঙ্গে রাস্তায় তার দেখা হল। ভাবল সে, এই আমার স্বপ্নের নায়িকা আমার আইডিয়া, ইন্‌স্পিরেশান, আমি যে অক্ষয় উকিলের বাজে মেয়েটাকে ভালোবাসতে গিয়ে বিপথগামী হতে চলেছিলাম, আজ তার অবসান ঘটল। ঈশ্বর আমকে আরও বড়ো কাজ মহৎ কাজের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আমি শিল্পী। আমি সৃষ্টি করব। উপন্যাস লিখব। তাই হঠাৎ ভরদুপুরে জলধরের দোকানের সামনে নির্জন পথে ধীরগামিনী এই যুবতীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে আমাকে

প্রেরণা জোগাবে উৎসাহ দেবে। আর আমার ভয় নেই। আমি বেঁচে গেলাম। উকিলের মেয়ের জন্য দুশ্চিন্তা করে আমাকে শরীরপাত করতে হবে না। আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। আবার আমি সুস্থ সুন্দর হয়ে উঠব। যে কাজের জন্য ভগবান আমাকে পাঠিয়েছেন, তার জন্য আমি নূতন করে নিজেকে তৈরি করতে আরম্ভ করব। কিন্তু তারপর সে কী দেখল! আর আইডিয়া—স্বপ্নের কবিতা প্রেরণার উৎস বাতাসে মিলিয়ে গেল। যে মানুষটিকে মনে মনে সে পূজা করতে আরম্ভ করেছিল দেখা গেল সেই মানুষটিও মোটেই সুস্থ নয়, বিকৃতমস্তিষ্ক। তা-ও কার জন্য এই বিকৃতি উন্মাদনা। সেই লম্পট খুনেটার জন্য! যেন গালে একটা চড় খেল প্রদোষ। তারপরও ভদ্রমহিলাকে সে বালিগঞ্জের রাস্তায় ঘুরতে দেখেছে। হাসে কাঁদে। কখনও একটা গাছতলায় দাঁড়ায়, নয়তো কোনো পার্কে ঢুকে চুপ করে বসে থাকে। কাল না পরশু এই যতীন দাস রোডের একটা পার্কে ঢুকে কতগুলি বাচ্চা ছেলেমেয়েকে মিষ্টি খাইয়েছিল। তারা তার মাথায় ধুলো দিল, খাবার খেয়ে তার আঁচলে হাত মুছল। দূরে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে প্রদোষ সব দেখছিল। বাচ্চার দল যখন বাড়াবাড়ি করছিল তখন এক পা এক পা করে প্রদোষ ওদিকে এগোতে আরম্ভ করে, কিন্তু মাঝপথে থেমে যায়—আর একটি যুবতী—বেশ ফিটফাট চেহারা, মনে হল যেন মহিলার বোন, কোনো দিক থেকে ছুটে এসে বাচ্চাদের ধমক দিয়ে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়, তারপর পাগল দিদিকে নিয়ে একটা রিকশা করে চলে যায়।

কাজেই, প্রদোষ চিন্তা করে দেখেছে, তার সব কিছুই বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, যেন বিকৃতি ছাড়া এই জীবনে তার আর কিছু পাওনা নেই। তাই আনন্দ পেতে প্রেরণা পেতে সুন্দরের দিকে আলোর দিকে সে আর হাত বাড়াচ্ছে না। কে জানে, যদি তার নিয়তি আবার তাকে পরিহাস করে! বরং যেখানে অন্ধকার যেখানে অসুস্থতা—

হ্যাঁ, ঐ যে অক্ষয় উকিলের বাড়ি যে জিনিস ঘটছে তা সে সহ্য করতে পারছে না তার অর্থ কী! তার জিভ দিয়ে টসটস করে জল পড়ছে। এই ভোজ, এই বিকৃতির উৎসব থেকে সে বাদ পড়ে যাচ্ছে। যত সে জিনিসটা ভাবছে তার ক্ষুধা তার কামনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। গাঁয়ের নির্জন বনে-প্রান্তরে উৎসব আনন্দ শেষ করে তারা যখন ফিরে আসবে তখন তাদের চোখেমুখে, বিশেষ করে উকিলের মেয়ের চোখে, সম্ভোগের চিহ্ন কতটা লেগে আছে দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারছিল না বলে প্রদোষ রৌদ্র মাথায় নিয়ে স্টেশনে অপেক্ষা করেছিল। তারপর ক্ষুণ্ণ হয়ে সে বাড়ি ফিরে আসে। দুপুরে ভাত খেয়ে আবার সে বেরোয়। এবার আর স্টেশনে না গিয়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে দরজার কাছে একটা বেঞ্চিতে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে যদি তারা ফিরে আসে এই রাস্তা ধরে বাড়ি যাবে। কিন্তু তখনও এল না। তার মন খুব ছটফট করছিল। অনেকক্ষণ বসে থেকে পরে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে রেল স্টেশনের দিকেই আবার সে এগোতে আরম্ভ করে। সেখানে পৌঁছে লেভেল ক্রশিং-এর বেড়াটার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। একটার পর একটা আলো জ্বলা ট্রেনগুলি আসছিল যাচ্ছিল। যদি তারা আর ফিরে না আসে! কথাটা তার একবার মনে হয়েছিল। আর উল্লাসে হৃৎপিণ্ডটা সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠেছিল। ঈশ্বর যেন তাই করে। মনে মনে সে বলেছিল, আর যেন ভগবান তাদের

বাড়ি ফিরিয়ে না আনে। তা হলে উকিল উকিলের বউ এবং হাতকাটা প্রলয় খুব জব্দ হয়। খুনেটাকে নিয়ে বুলাকে নিয়ে পাড়ার লোক কদিন থেকে ফিসফাস গুজগাজ করছে, উকিল পরিবারের মুখের ওপর কেউ কিছু বলছে না সত্য, কিন্তু তা হলেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাড়ার মানুষ যেসব কথা বলছে, আর কোনো পরিবার হলে লজ্জায় তারা মুখ দেখাতে পারত না। কিন্তু উকিলের বাড়ির সব কটা মানুষের গায়ের চামড়া গন্ডারের চামড়া—নিন্দার হুল তো ভালো, বল্লমের খোঁচাও তাদের গায়ে লাগে না। আর, চক্ষুলজ্জা থাকবে কী, চোখের চামড়া বলতে কিছু নেই। কিন্তু এবার মজা টের পাবে। আহা, যদি ওরা আর ফিরে না আসে! প্রদোষ কালীঘাট গিয়ে জোড়া পাঁঠা দিয়ে পুজো দেবে। তখন তো আর রেখে ঢেকে বলার কিছু থাকবে না। মুখের ওপর সবাই বলতে পারবে ছাত্রীকে নিয়ে মাস্টার পালিয়েছে। এমনটা যে হবে আমরা আগেই জানতাম।

কিন্তু তা কি হবে! উল্লাসটা চরমে পৌঁছবার আগেই দপ্ করে সেটা নিভে গেল। সঙ্গে যে উকিলের ছোটো ছেলেটা গেছে। ওটাকে নিয়ে দুজন আর পালাবে কোথায়। কাজেই ফিরে ঠিক আসবেই। আজ যদি না-ও ফেরে কাল সকালে ফিরবে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রদোষের বুকের ভিতর চড়চড় করে উঠল। রাত্রে মেয়ে বাড়ি না ফিরলে অক্ষয় উকিলের বাড়ির মানুষ যে একটুও চিন্তিত হবে না তাও প্রদোষ ভালো করেই জানে। এবং যারা গেছে তারাও কাল ফিরে এসে যা-হোক একটা অজুহাত দেখাবে। লাস্ট ট্রেন ধরব ভেবেছিলাম, সেটা মিস করাতে রাতটা ওখানেই থেকে যেতে হল—অথবা অমুকের হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে পড়ল, বা—

উকিল উকিলের বউ যা শুনবে তাই মেনে নেবে। কিন্তু সারারাত বাইরে কাটিয়ে পরদিন দুজনের বাড়ি ফেরা—প্রদোষের মাথার ভিতর নূতন করে আগুন জ্বলতে লাগল। চোখের সামনে সব কিছু সে অন্ধকার দেখছিল। কী করবে হঠাৎ ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। তখনি পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখল মাত্র দুটো টাকা আছে। বই কিনবে বলে বাড়ি থেকে কিছু টাকা চেয়ে এনেছিল। আজ নয়—পরশুর কথা। বই কেনা হয়নি। সেই টাকার প্রায় সবটাই কালীঘাট গিয়ে এবং মদ খেয়ে খরচ করে ফেলেছে। আর আছে মাত্র দু টাকা। এবং খুচরো দুচার আনা। কিন্তু আজ যে আর তার বাড়ি ফেরা হবে না। দু আউন্স না, পুরো একটা পাঁইট আজ তাকে খেতে হবে। আর রাত কাটাতে হবে বেশ্যার ঘরে। বুড়ি হোক কচি হোক বেশ্যা হলেই হল। কেননা বাড়ি গিয়ে সে ঘুমোতে পারবে না। তার চোখে ঘুম আসবেই না। সারারাত তাকে বিছানায় ছটফট করতে হবে। আর চোখের সামনে দেখবে সেই ছবি। একটা জঙ্গলের কাছে ঘাসের ওপর বুলা উলঙ্গ হয়ে ধাড়ী শয়তানটার সঙ্গে শুয়ে আছে। নিলয় তো দুধের শিশু। শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। তার জন্য কিছু আটকাবার কথা নয়।

লেভেল ক্রশিং পিছনে রেখে স্টেশন ছেড়ে সে চলে আসছিল। যদি কোনো বন্ধুর কাছ থেকে দু চার পাঁচ টাকা ধার পাওয়া যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটা গাড়ি এসে স্টেশনে দাঁড়ায়। ইচ্ছা ছিল না। তাহলেও সে ঘুরে দাঁড়াল। আর দু মিনিট অপেক্ষা করতে ক্ষতি কী। বলা যায় না, হয়তো এই ট্রেনে তারা ফিরে এসেছে। একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে লোহার

বেড়ার ওপারে প্ল্যাটফর্মের খোলা জায়গাটার ওপর চোখ রাখল সে। কিছু যাত্রী ট্রেন থেকে নামল, কিছু উঠল। নামল কম, উঠল বেশি। ট্রেন ছেড়ে দিল। প্ল্যাটফর্মের ভিড় পাতলা হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রদোষ। তেমন বয়সের কোনো মেয়েই তার চোখে পড়ল না। নানা বয়সের পুরুষ আছে। কিন্তু পুরুষ তো সব নয়। সব কিছু নির্ভর করছে অক্ষয় উকিলের যুবতী মেয়ের রাত্রে ঘরে ফেরা নিয়ে। তথাপি চোখের দৃষ্টি চোখা করে গেট্-এর দিকে সে নজর রাখল। মোটঘাট নিয়ে, অথবা খালি হাতে যাত্রীরা প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসছে। হঠাৎ তার বুকটা ঢিব করে উঠল। উকিলের ছোটো ছেলে না? হ্যাঁ, নিলয়। একটা ঝুড়ি হাতে ঝুলিয়ে জুতোর ঠুকঠুক শব্দ তুলে গেট্ পার হয়ে রাস্তায় নেমে গেল। আর দুজন তবে পিছনে আসছে। প্রদোষ ব্যস্ত হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আবার গেট্-এর দিকে চোখ রাখল। পাঁচ মিনিট দশ মিনিট—পনেরো মিনিট একভাবে স্থির হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। তার মাথাটা ঘুরছিল। ব্যাপারটা কী। আর দুটি মানুষকে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ ছুটে গিয়ে রেলিং ঘেঁসে দাঁড়াল সে। রেলিংএর ফাঁক দিয়ে চোখ গলিয়ে ভিতরটা দেখল। প্ল্যাটফর্ম একেবারে ফাঁকা। লাঠি ভর দিয়ে এক বুড়ো ধুঁকতে ধুঁকতে ওদিক থেকে এদিকে আসছে। আর কোনো মানুষ চোখে পড়ছে না। তবে কি ওরা আগে বেরিয়ে গেছে! ঠিক নজর রাখতে পারেনি সে? ছুটতে ছুটতে প্রদোষ রাস্তায় এসে দাঁড়াল। রাস্তায় জগমোহন ডাক্তারের ছেলে বা বুলার মতন কাউকে দেখা গেল না। নিলয়কেও দেখা যাচ্ছিল না। সম্ভবত ইতিমধ্যে ট্যাক্সি রিকশা যাহোক একটা কিছু চেপে তারা এগিয়ে গেছে। প্রদোষ আর এক সেকেণ্ড সেখানে দেরি করেনি। কিন্তু বাড়ি পৌঁছে তার মনে হল অক্ষয় উকিলের ঘরটা বড়ো বেশি চুপচাপ। এমন চমৎকার জার্নি শেষ করে ছেলে মেয়ে ঘরে ফিরেছে। আমোদ-আহ্লাদ হৈ-চৈ শোনা যাবে সে আশা করছিল। ব্যাপার কী! সবাই এমন চুপ করে কেন, কেমন সন্দেহ জাগল তার মনে। পা টিপে টিপে উকিলের শোবার ঘরের পিছনের বেড়াটার কাছে গিয়ে অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে, কান পেতে থাকল। চাপা গলায় অক্ষয় উকিল ছোটো ছেলের সঙ্গে কথা বলছিল। কিন্তু তা হলেও কিছু কিছু কথা প্রদোষের কানে এল। তারপর উকিলের স্ত্রীর কান্না। উকিলের ধমক। তখন জিনিসটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল।

হ্যাঁ, খবরের মতন খবর বটে, কিন্তু খবরটা পেয়ে তেমন উল্লসিত হয়ে উঠতে পারছিল না কেন সে। প্রদোষ অবাক হল। অথচ একটু আগে স্টেশনে দাঁড়িয়ে এমন একটা কিছু যাতে ঘটে এই জন্য সে মনে মনে ঈশ্বরকে ডেকেছিল। কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা মানত করেছিল। এখন তার মনে হচ্ছিল সে চলতে পারছে না, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, পা দুটো অবশ লাগছে। যেন দৃষ্টিটাও ঝাপসা ঠেকছে। মদ খাওয়া বা কোনো মেয়ের ঘরে যাওয়ার কথা তার কিন্তু আর একবারও মনে পড়ল না। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া বইছিল। রাস্তার আলোগুলির যেন ঝিমোনি এসেছে। রাস্তাটাও ফাঁকা। একটু রাত হলে, বিশেষ করে ঠাণ্ডার রাত্রে এদিকের রাস্তাটা একটু তাড়াতাড়ি ফাঁকা হয়ে যায়। এখন কটা বাজে! হয়তো আটটা, সাড়ে আটটা। কিন্তু প্রদোষ ভেবে পাচ্ছিল না, এত বড়ো একটা খবরের বোঝা মাথায় নিয়ে সে কোন্ দিকে এগোচ্ছে। তার মাথাটা টন্‌টন করছিল।

খবরটা ক্রমশ এত ভারি ঠেকছিল, তার মনে হচ্ছিল এত চাপ সে সহ্য করতে পারবে

না। যেন আর কারো মাথায় বোঝাটা চাপিয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিলে ভালো হত। কিন্তু পরক্ষণে তার মনে হল, না, অতি অল্প সময়ের জন্যও এই খবর অন্য মানুষের কাছে গচ্ছিত রাখা চলবে না, কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না সে। এ জিনিস একান্ত করে তার। চোখে জল আসুক কী মুখে হাসি ফুটুক, এই বোঝা তাকেই বইতে হবে। তাই যেন কেমন বিমূঢ় হতাশ হয়ে রাস্তার পাশের অস্পষ্ট ম্রিয়মাণ আলোগুলি দেখতে দেখতে সে হাঁটছিল। জেল-ফেরত খুনেটার সঙ্গে বুলা সত্যি পালিয়ে যাবে ভাবতে তার বুকের ভিতরটা চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। তবু তাকে মুখ বুজে থাকতে হচ্ছে। আর তখন কিনা স্টেশনে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল, এমন কিছু ঘটলে পাড়ার মানুষ তো বটেই, গোটা শহরের মানুষের কাছে জিনিসটা সে রাষ্ট্র করে দেবে, এখন তার মনে হল, যদি আর কেউ এ খবর জানতে পারে তো লজ্জা ও অপমানটা তাকেই বেশি বিঁধবে।

'ও মশাই শুনুন!'

প্রদোষ চমকে উঠল। ঘাড় ফেরাল।

'কাকে ডাকছেন?'

'আপনাকে, এতক্ষণ ডাকছি, শুনতে পাচ্ছেন না?'

'আমি শুনিনি।' প্রদোষ অপ্রস্তুত হল। তার পিছনে আসছিল মানুষ দুটি। কিন্তু তারা যে তাকে ডাকছিল তা সে বুঝতে পারেনি। দুজনের হাতে ঘড়ি, গায়ে টেরিলিনের জামা, কালো রঙের প্যাণ্ট পরনে, পায়ে চকচকে ছুঁচালো জুতো। হাতে সিগারেট জ্বলছে প্রদোষের সামনে এসে দাঁড়াল তারা। যুবক, তা হলেও প্রদোষের চেয়ে তাদের বয়স বেশি।

'আপনি গোঁসাইপাড়া বস্তিতে থাকেন?' একজন প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?'

'পরে বলব।' আর একজন সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, 'আপনি কতক্ষণ আগে বালিগঞ্জ রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলেন না?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো!' প্রদোষ একটা ঢোক গিলল। যেভাবে প্রশ্ন করছে, যেন তারা পুলিশের লোক, বিরক্ত হয়ে সে দুজনের মুখের দিকে তাকাল।

'বলব, সবই বলছি।' প্রথম যুবক অল্প শব্দ করে হাসল। 'আপনি হাবুলের ফ্রেণ্ড? হাবুল নন্দী?'

প্রদোষ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। 'হ্যাঁ' 'না' কিছু বলল না। কাল হাবুলের সঙ্গেই মদের দোকানে ঢুকে সে মদ খেয়েছিল এবং তখন ঝোঁকের মাথায়, নেশার মুখে হাবুলের কাছে মনের দুঃখটা প্রকাশ করে ফেলেছিল। এই জন্য পরে তার খুব অনুতাপ হয়েছিল। এ কথা কোনোদিন কাউকে বলবে না বলে মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিল। তবে কি তারা হাবুলের কাছ থেকে জিনিসটা শুনেছে এবং সে এতটা সময় বুলার জন্য বালিগঞ্জ স্টেশনে কাটিয়ে এল অথচ বুলা এল না টের পেয়ে এখন আবার তার কাছে ছুটে এসেছে তার ব্যর্থ প্রেমের ইতিহাসটা আর একটু ভালো করে শুনবে বলে? তাই হবে। অপরের 'লভ অ্যাফেয়ার' নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা, এর মধ্যে নাক ঢোকানো মানুষের স্বভাব সে কি জানে না! তার গলার কাছটা কেমন তেতো তেতো ঠেকছিল।

'চলুন মশাই, একটা পাঁইট খেতে খেতে গল্প করা যাবে।' দ্বিতীয় যুবক প্রদোষের কাঁধে হাত রাখল।

'হ্যাঁ, তাই ভালো।' আর একজনও প্রদোষের আর একটা কাঁধে হাত রাখল। প্রদোষ কিছু বলবার আগেই তারা তাকে ধরে একরকম জোর করে টেনে নিয়ে চলল। হঠাৎ এমন একটা বিপদে পড়বে তার ধারণা ছিল না।

॥ ৪৭ ॥

সেদিন রাত্রে একটা ঝড় উঠল। রুগীদের বিদায় করে দিয়ে জগমোহন যখন চুপ করে চেম্বারে বসে ছিলেন তখন থেকেই ঝড়ের সূচনা। তিনি প্রথমটায় টের পাননি। তবে অনুকূল একবার এসে বলেছিল পশ্চিম দিকে আকাশটা খুব লাল হয়ে আছে, যেন থেকে থেকে কেমন একটা গরম হাওয়াও বইছে। ঝড় উঠতে পারে। কম্পাউণ্ডারের কথায় জগমোহন তেমন কান দেননি। অনুকূল অবশ্য তখনই আবার বিড়বিড় করে বলছিল, কার্তিক মাস এটা, কার্তিকে কি তেমন ঝড়টড় হয়! সেদিকে মনোযোগ থাকলে জগমোহন অবশ্য তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করে বলতেন, নিশ্চয় হয়, আমার বাবা আনন্দমোহন যে বছর মারা যান সে-বছর কার্তিক মাসে কত বড়ো ঝড় হয়ে গেল, কলকাতা বন্দরের তেমন একটা ক্ষতি হয়নি, কিন্তু ডায়মণ্ড হারবার, ক্যানিং, লক্ষ্মীকান্তপুর—ওদিকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চলটার ওপর দিয়ে ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে গিয়েছিল। কত ঘর বাড়ি নষ্ট হল, গাছপালা পড়ে গেল, গোরু ছাগল হাঁস মুর্গি যে কত মারা পড়ল, কোনো কোনো জায়গায় মানুষও মরেছিল, চারশো জেলে ডিঙ্গি যে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার তো আর খোঁজই পাওয়া গেল না কাগজে লিখেছিল। হুঁ, চৈত্র-বৈশাখে যে ঝড় হয় অর্থাৎ যাকে আমরা কালবৈশাখী বলি, কোনো কোনো বছর আশ্বিন-কার্তিকের ঝড় তার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক হয়।

কিন্তু আজ অনুকূলের কথায় কান দিলেও বুঝি জগমোহন ঝড় নিয়ে এত কথা বলতেন না। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি অনুকূলের কথাগুলি শুনতেন এবং চুপ করে থাকতেন। এইদিকে তখনও থেকে থেকে তাঁর টেলিফোন গর্জন করে উঠছিল। ক্ষিপ্র হাতে তিনি রিসিভারটা তুলে ধরেছিলেন এবং সংক্ষেপে একটা দুটো কথা বলে তৎক্ষণাৎ আবার সেটা হাত থেকে নামিয়ে রাখছিলেন। আমি এখনি বাড়ি চলে যাচ্ছি, আজ আর হচ্ছে না। অর্থাৎ যে কোনো প্রকারে রুগীদের ঠেকিয়ে রাখা। আবার যেন কেউ এসে না চেম্বারে হানা দেয়। কিন্তু একথা বলার পরও কি তিনি চেম্বার ছেড়ে চলে যেতে পারছিলেন? পারছিলেন না। উঠি উঠি করেও যেমন বসে ছিলেন বসে রইলেন। কোথায় যাবেন তিনি—সরযূধামের শান্তি বিশ্রাম শেষ হয়ে গেছে। বরং চেম্বারে বসে থেকে তিনি যেন তাঁর অদৃশ্য রুগীদের সঙ্গেই মনে মনে টেলিফোনে কথা বলে চলেছিলেন ঃ আমার চেয়ে বড়ো রুগী আজ আর কেউ নেই, আমার চিকিৎসা করে কে? তোমাদের তো আমি অনেক দেখেছি, অনেক ওষুধ খাইয়েছি, ইনজেকসন দিয়েছি, পথ্যাপথ্যের নির্দেশ দিয়েছি, এখন তোমরা আমার একটা ব্যবস্থা কর—চিকিৎসক হয়ে আমি নিজের রোগ সারাতে পারছি না; উঁহু মৃত্যুভয় আমার নেই, আমি জানি এ রোগে আমি মরব না, বরং আরও দীর্ঘ দিন বেঁচে থেকে যন্ত্রণাভোগ

করব, ভয়টা এখানে। এই জঘন্য রোগ আমাকে মরতে দেবে না, পাছে মরে শান্তি পাই তাই সতর্ক প্রহরীর মতন সর্বদা আমাকে আগলে রেখেছে—

এই পর্যন্ত চিন্তা করে জগমোহন থমকে দাঁড়ান, যেন তখন আর কল্পিত রুগীদের সঙ্গে না, নিজের সঙ্গে কথা বলেন তিনি, নিজের দিকে তাকান। সত্যি কি তা হলে তিনি মৃত্যু চান? যদি এই মুহূর্তে মৃত্যু এসে তাঁর সামনে দাঁড়ায় তো তিনি কি হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা করতে পারবেন? শরবিদ্ধ পাখির মতন অকথ্য যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করছেন সত্য, কিন্তু যদি মৃত্যু এসে তাঁকে ডাকে তো সেই যে কথায় বলে 'এক মিনিটের নোটিশে' সব ছেড়েছুড়ে—এত পরিশ্রম করে গড়ে তোলা সংসার, এতদিনের অর্জিত সম্পদ, এতকালের প্রিয় পরিচিত মুখগুলি পিছনে ফেলে রেখে তিনি কি চলে যেতে রাজি হবেন? একবারও তাঁর চোখে জল আসবে না, একটাও দীর্ঘশ্বাস পড়বে না?

প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জগমোহন রীতিমতো ঘামতে আরম্ভ করলেন, তাঁর কপালের রগটা ফুলে উঠল। একটা কঠিন সমস্যা সন্দেহ কী। এতকাল তিনি মানুষের জীবন নিয়ে—জীবনের চেয়েও বেশি মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করেছেন—কেন না মৃত্যুব সঙ্গেই তো তাঁর যাবতীয় শত্রুতা, সংগ্রাম। মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে, সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে তাকে রোধ করতে হবে। বধ করতে হবে। আশ্চর্য, মৃত্যুকে বধ করা, মৃত্যুর মৃত্যু ঘটানো—কতদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে তিনি ভেবেছেন, মানুষ মৃত্যুঞ্জয়ী হবে কবে, আনন্দমোহন যেমন বলতেন আধ্যাত্মিক অর্থে মৃত্যুকে জয় করা নয়—রীতিমতো চিকিৎসা করে ওষুধ খাইয়ে, বিজ্ঞানের সমস্ত কলাকৌশল [illegible] করে সশরীরে একটি মানুষকে অমর করে রাখা—সেই দিন কি আসবে না—

অর্থাৎ চিকিৎসক হয়ে বিজ্ঞানের উপাসক হয়ে যে-জগমোহন চিরদিন মৃত্যুর সঙ্গে বৈরিতা করে এসেছেন, নিজেকে মৃত্যু-বিদ্বেষী জেনে কেবল জীবন স্বাস্থ্য আয়ু ও আরোগ্যের পূজা করে এসেছেন, আজ হঠাৎ তিনি মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, মৃত্যুকে ভালোবাসবেন বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, একথা শুনলে মানুষ বিশ্বাস করবে কি? তারা হাসবে না?

মানুষের চোখে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তোলার ভয়ও তাঁর কম কী। হয়তো ইতিমধ্যে তারা হাসতে আরম্ভ করেছে। রুগীরা তাঁর কাছে আসতে না আসতে তিনি তাদের তাড়িয়ে দিলেন, টেলিফোনে তারা কথা বলতে চাইছিল, তা-ও তিনি ভালো করে কারো কথার উত্তর দেননি; কই, এমন তো ছিলেন না তিনি। দুঃখ যত বড়ো হোক, বেদনা যত গভীর হোক—শোক সন্তাপ হতাশা অন্তর্দাহ এই জীবনে তাঁকে কম ভোগ করতে হয়েছে কি, কিন্তু কোনোদিন তিনি কর্তব্যে অবহেলা করেননি। রোগের প্রতি রুগীর প্রতি এমন তাচ্ছিল্য ঔদাসীন্য? আর যাকে দিয়ে হোক, জগমোহনের কাছ থেকে এ জিনিস আশা করা যায় না। ব্যক্তিগত দুঃখের চেয়ে রোগের যন্ত্রণা রুগীর কাতর কান্না তার কাছে চিরদিন বড়ো ছিল। আজ সব ভুলে গিয়ে তিনি এমন আত্মকেন্দ্রিক আত্মসর্বস্ব অনুদার অসামাজিক হয়ে উঠবেন ভাবতেও কেমন লাগে।

বস্তুত চিন্তাটা যখন এ-খাতে বইতে শুরু করে তখন জগমোহনের মধ্যে একটা আলোড়ন একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। মেরুদণ্ড টান করে তিনি সোজা হয়ে বসেন, হাতের মুঠ দৃঢ়তর করেন। অন্য কাউকে না, যেন তিনি নিজেকে হঠাৎ আঘাত করতে প্রস্তুত হন, ভিতরে একটা ধিক্কার অনুশোচনা এসেছে, যে কেউ তখন তাঁর মুখের দিকে তাকালে জিনিসটা টের পেত—

কিন্তু তাকাবে কে? তাঁর সামনে তখন কেউ ছিল না। বেয়ারাটা দুদিনের ছুটি নিয়েছে। রুগীরা চলে গেছে। আছে একমাত্র অনুকূল। কিন্তু সে-ও তখন অন্য কাজে ব্যস্ত। ছুটোছুটি করে ওদিকের দরজা জানালা ঠাস ঠাস করে বন্ধ করছিল। এদিকে আসতে সাহস পাচ্ছিল না। হাজার ঝড়ঝঞ্ঝা বৃষ্টি শিলাপাত হলেও ডাক্তার অনুমতি না দিলে কখনই সে তাঁর কামরার একটা দরজা জানালাও বন্ধ করতে সাহস পাবে না। অতীতে এমন ঘটনা ঘটেছে। সেদিনও বুঝি বেয়ারাটা ছুটিতে ছিল অথবা অন্য কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিল। জগমোহনের কপালে রোদ লাগছে দেখে বুদ্ধি করে অনুকূল পশ্চিমের জানালার একটা পাল্লা টেনে দিতে গিয়েছিল, জগমোহন ধমক লাগিয়েছিলেন। আর একদিন—বৃষ্টির ছাট আসছিল, টেবিলের কাগজপত্র ভিজে যাবে আশঙ্কা করে অনুকূল ছুটে গিয়ে দক্ষিণের দরজাটা বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল, জগমোহন রীতিমতো ভেংচি কেটেছিলেন, অবশ্য পরক্ষণে তিনি হেসেও ফেলেছিলেন ঃ 'আমার সুবিধে-অসুবিধে আমি বুঝব, দরকার হলে দরজা জানালা আমিই বন্ধ করতে পারি, বন্ধ করতে পারি খুলতেও পারি, হাত দুটো এখনো বাতে অসাড় হয়ে যায়নি, বুঝলে।' অনুকূল লজ্জা পেয়েছিল এবং তারপর থেকে ভয়ানক হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছিল। ঘরের দরজা জানালা খুলে রাখা বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে জগমোহন যে অতিমাত্রায় খুঁতখুতে কিছুতেই সে তা ভুলত না। কাজটা যদিও বেয়ারার, সে-ই দরজা জানালা খোলে এবং সময় মতো সেগুলি বন্ধ করে। তা হলেও সময় সময় অনুকূলকেও হাত লাগাতে হয় বইকি।

যেমন সেদিন সন্ধ্যার পর। ঝড়টা প্রায় এসে গিয়েছিল, অনুকূল তখনও ইতস্তত করছিল ডাক্তারের কামরায় ঢুকবে কিনা, ঠিক সেই মুহূর্তে জগমোহনের সামনের পিছনের এ-পাশের ও-পাশের সব কটা জানালার পাল্লা প্রচণ্ড শব্দ করে নড়ে উঠল, ঘূর্ণি হাওয়ার মতন কোথা থেকে এত এত ধুলোবালি সঙ্গে নিয়ে একটা জোরালো হাওয়ার ঝাপটা ভিতরে ঢুকে জগমোহনের টেবিলের কাগজপত্র উড়িয়ে ছড়িয়ে একাকার করে দিল। কিন্তু তখনই হাওয়াটা থামল না, আবার এল, আবার কাগজপত্র উড়ল, দেওয়ালে টাঙানো ছবি ও ক্যালেণ্ডারগুলি পতপত খটখট শব্দ করে উল্টে-পাল্টে দেওয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেতে লাগল, এবং চোখের নিমেষে ফ্রেমে বাঁধানো বড়ো ল্যাণ্ডস্কেপটা মেঝেয় ছিটকে পড়ে চুরমার হয়ে গেল, আর ঘনঘন বিদ্যুৎচমক বজ্রপাতের শব্দ।

যেন এতক্ষণ পর জগমোহনের সংবিৎ ফিরে এল। দরজার দিকে চোখ ফেরালেন। অনুকূল দাঁড়িয়ে আছে। হাঁপাচ্ছে।

'কী হল অনুকূল?' জগমোহনের কণ্ঠস্বর কিন্তু শান্ত।

'ঝড় উঠেছে।' বলতে বলতে অনুকূল ভিতরে ঢুকল। 'পাল্লাগুলো বন্ধ করে দেব?'

'বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ ঝড় উঠল অর্থ কী।' জগমোহন ঈষৎ হাসলেন এবং একটু যেন অবাক হয়ে অনুকূলের দিকে তাকালেন। অনুকূল ততক্ষণে জানালার দিকে ছুটে গেল।

'দাঁড়াও', জগমোহন ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'বাইরের চেহারাটা আমি একবার দেখব।' অর্থাৎ জানালা বন্ধ করতে এখনও তাঁর আপত্তি। অনুকূল বিস্মিত হল।

'ধুলো বালি কাঁকর কত কী উড়ে আসছে দেখতে পাচ্ছেন না।'

'তা হলেও ঝড়টা আমি দেখব, ঝড় দেখতে আমি ভালোবাসি।' জগমোহন জানালার

ওপর ঝুঁকে পড়ছিলেন, অনুকূল তাঁকে ধরে ফেলল। তা হলেও ডাক্তার সামনের দিকে গলাটা বাড়িয়ে দিলেন। জানালার পাল্লার দুটো কাচ ভেঙে গেছে, ধপাস ধপাস করে কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে সেটা বাড়ি খাচ্ছিল। অনুকূল প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করছিল ভাঙা কাচের টুকরো ছিটকে এসে চোখে-মুখে পড়বে। জগমোহন অবিচল অনমনীয়। কিছুতেই জানালা থেকে সরে আসবেন না। কিন্তু বাইরের চেহারাটা কি কিছু বুঝতে পারলেন তিনি। ধুলো আর অন্ধকারে জগৎ-সংসার একাকার হয়ে গেছে। এটা যে কলকাতা শহর ধর্মতলা কে বলবে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল আর তখন মনে হচ্ছিল শত শত যুগ আগের বিলুপ্ত বিধ্বস্ত এক নগরীর ইট-কাঠের কঙ্কালগুলি হঠাৎ দাঁত বের করে হেসে উঠে পরক্ষণে আবার অন্ধকারের গর্ভে বিলীন হচ্ছে। আর কেমন একটা সোঁ সোঁ শব্দ। যেন কোথায় কোন্ দিকে সব ভেঙে চুরমার করে দিয়ে দৈত্যের মতন ভয়ংকর কিছু একটা উদ্দাম বেগে ছুটে আসছে। কিন্তু তেমন কিছু এল না যদিও। হাওয়ায় উড়ে এসে ঘরে ঢুকল বড়ো বড়ো কটা জলের ফোঁটা।

'বৃষ্টি আরম্ভ হল, এবার হাওয়ার জোর কমবে।' অনুকূল বিড়বিড় করে বলল।

জগমোহন মাথা নাড়লেন।

'হল না, বরং বল, হাওয়ার জোর কমে যাচ্ছে, এবার বৃষ্টি আরম্ভ হবে।'

'এখন পাল্লা দুটো টেনে দি?' অনুকূল উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। 'সব ভিজে যাচ্ছে।'

'আঃ, দাঁড়াও দাঁড়াও!' জগমোহন তেমনি স্থির নির্বিকার। দেখতে দেখতে তাঁর জামা ভিজে গেল, চুল ভিজে গেল। ফুলের পাপড়ির মতন টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটা ছুটে এসে তাঁর মুখে মাথায় কপালে পড়ছিল। তাঁর নাক কান ও চিবুক বেয়ে জলের ধারা নীচে গড়াতে লাগল। 'ওহো, কী শান্তি, কী আনন্দ! বুঝলে অনুকূল—'

অনুকূল বুঝতে পারে, ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ পেয়ে শিশুর মতন তিনি পুলকিত হয়ে উঠেছেন। 'সংসারে এখনো কিছু কিছু জিনিস খাঁটি আছে, পবিত্র আছে, যেমন রৌদ্র বৃষ্টি মুক্ত বায়ু—এসব কোনোদিন কৃত্রিম হবার নয়, নষ্ট হবার নয়—তাই এরা আমায় এত আনন্দ দেয়—'

'কিন্তু রৌদ্র বৃষ্টি হাওয়াও আর বেশিদিন খাঁটি থাকবে পবিত্র থাকবে মনে হয় না—যে-হারে চারদিকে অ্যাটম বোমা ফাটানো হচ্ছে, শুনছি বিষ ইতিমধ্যে অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে, কাকাবাবু।'

জগমোহন চমকে উঠে ঘাড় ফেরালেন। গিরিজা। তাঁর মুখ দিয়ে হঠাৎ কথা সরল না। আস্তে আস্তে তিনি জানালার কাছ থেকে সরে এলেন। অনুকূল তৎক্ষণাৎ পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিল। ডাক্তারের আর সেদিকে নজর ছিল না। চোখ বড়ো করে তিনি ক্রমাগত গিরিজাকে দেখছিলেন।

'কী ব্যাপার! এই ঝড়জলের মধ্যে তুমি হঠাৎ?'

'হ্যাঁ, একটু দরকারে আসতে হল।' গিরিজা ছুটে এসেছে বোঝা গেল। ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছিল। 'আপনার মাথায় জল কাকাবাবু, মাথাটা মুছে ফেলুন। জামাটা খুলে ফেললে ভালো হয়।'

'ও কিসসু হবে না, জামা খুলতে হবে না, বোস বোস।' তিনি নিজের আসনে বসলেন। গিরিজা আর-একটা চেয়ারে বসল। 'তুমিও তো শুকনো নেই দেখছি। চুল ভিজে গেছে, জামা ভিজে গেছে।'

গিরিজা কথা না বলে পকেট থেকে রুমাল বের করে মাথা মুছল। অনুকূল তোয়ালে এনে দিতে জগমোহন তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছলেন। দুজনের একজনও গায়ের জামা খুললেন না।

গিরিজা বলল, 'আমার দোকান থেকে এখানে আসতে তো দু মিনিট—ভাবলাম ছুটে চলে আসতে পারব।'

'ইতিমধ্যে ঝড় উঠল?'

'না, ঝড়ের মধ্যেই রওনা হয়েছিলাম, ভাবলাম তা না হলে আপনাকে হয়তো পাব না। চেম্বার বন্ধ হয়ে যাবে। এমন হুট করে জল আরম্ভ হবে বুঝতে পারিনি। তা হলেও খুব একটা ভিজিনি। আপনাদের বিল্ডিং-এর কাছে এসে গেলাম যখন তখন বৃষ্টিটা নামল।'

নিশ্চয় জরুরী কোনো কথা নিয়ে গিরিজা দুর্যোগের মধ্যে চলে এসেছে। নয়তো কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারত। সকালে বাড়ি যেতে পারত অথবা তিনি চেম্বারে এসে বসলে তখন দেখা করতে পারত। জগমোহন উৎসুক হয়ে গিরিজার চোখ দুটো দেখছিলেন।

কিন্তু গিরিজা তখনও কিছু বলছিল না। জগমোহন অগত্যা ঘাড়টা ঈষৎ কাত করে কৌতুকের সুরে বললেন, 'হ্যাঁ, কথাটা তুমি মিথ্যা বলনি। জল রৌদ্র বাতাসও ওরা পলিউট না করে ছাড়বে না। রেডিওঅ্যাকটিভ—'

কিন্তু গিরিজার যেন আর সেই প্রসঙ্গের ধার দিয়েও যাবার ইচ্ছা নেই। তাই জগমোহনও সঙ্গে সঙ্গে থেমে যান। অতিরিক্ত গম্ভীর দেখাচ্ছিল পরিতোষের বন্ধুকে। একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল সে। এদিক-ওদিক তাকাল। কেমন একটু ইতস্তত করল। তারপর আবার চুপ করে রইল। জগমোহন বুঝতে পারলেন। অনুকূল পাশে দাঁড়িয়ে।

'তুমি পাশের ঘরে যাও অনুকূল।' জগমোহন গম্ভীর গলায় বললেন। অনুকূল চলে গেল। এই জিনিস এখানে অহরহ ঘটছে। কম্পাউণ্ডারের সামনেও রুগীর কিছু বলতে আপত্তি আছে দেখলে জগমোহন কম্পাউণ্ডারকেও সরিয়ে দেন। কিন্তু গিরিজা যে রুগী নয়—রোগের গোপন কথা বলতে ঝড়ের মধ্যে ছুটে আসেনি অনুকূল হয়তো তা বুঝল না।

অনুকূল চলে যেতে গিরিজা একটু ঝুঁকে বসল।

'বল, কী বলছিলে তুমি।' জগমোহন গলার মৃদু শব্দ করলেন।

'লর্ড তা হলে আজও ফিরল না?'

'না, চারটের পর আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। তখনো তো ফিরতে দেখলাম না।' গিরিজা আবার চুপ করে রইল।

'তুমি কি বালিগঞ্জ গিয়েছিলে?' জগমোহন ভুরু কোঁচকালেন।

'কেন বলুন তো!' গিরিজা কপাল কোঁচকাল। 'পরিতোষের দাদা অক্ষয় উকিলের বাড়িতে আছে কি না খোঁজ নিতে, এই তো?'

জগমোহন মাথা নাড়লেন।

'না না, সে-খোঁজ নিতে তুমি সেখানে যাবে কেন, লাভ কী, কেননা, এটা তো আমরা সবাই বুঝে গেছি, স্কাউণ্ড্রেলটা ও-বাড়ি শিকড় গেড়েছে, কাল সারাদিন এল না, রাত্রে ফিরল না—আজও সারাদিন তার দেখা নেই, কিন্তু আমি ভাবছি, তার রুচি, মনোবৃত্তিটা কেমন।

যার ঘরে নিয়মিত হাঁড়ি চড়ে না, তার ঘাড়ে এভাবে আশ্রয় করে কাঁদন সে থাকবে। আজ না-হয় একটা নিরীহ মেয়ের কাছ থেকে ছলে বলে কৌশলে—যেভাবেই হোক, দু-পদ গয়না আদায় করে তারপর সেই জিনিস দিয়ে অক্ষয় উকিলকে তুষ্ট রাখছে—কিন্তু তারপর? যখন মধু ফুরোবে? তোমার মামা যে খুব একটা সহৃদয় ব্যক্তি নন তোমার চেয়ে তা আর কে ভালো জানে। কিন্তু আমার মনে হয়, মধু ফুরোবারও অপেক্ষা করবে না উকিল। তার আগেই হতভাগাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে—হুঁ, যখন দেখবে আর কোনো টাকাকড়ি, গয়নাগাটি সরযূধাম থেকে টেনে নিতে পারছে না দুষ্ট, কী বলছ?'

'লর্ড সেখানে নেই।' গিরিজা গম্ভীর গলায় বলল, 'কাল মর্নিং-এর ট্রেনে পালিয়েছে।'

'অ্যাঁ,' জগমোহন গিরিজার হাত চেপে ধরলেন। 'পালিয়েছে অর্থ কী—পালিয়ে কোথায় গেছে, হঠাৎ এভাবে পালানোর উদ্দেশ্যটা কি!'

'মামার মেয়েটাকে নিয়ে ইলোপ করেছে।'

জগমোহনের বাক্যস্ফূর্তি হল না। চক্ষু-তারকা স্থির করে গিরিজার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'কাল সকালে মামার ছোটো ছেলে ও বুলাকে নিয়েও লর্ড বেড়াতে বেরিয়েছিল, বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে। তারপর সোনারপুর না কোথায় নেমে পড়ে তিনজন। রাত্রে ছোটো ছেলে একলা ফিরে এসেছে। ওরা দুজন ফেরেনি।'

'আজও ফেরেনি?'

'না।'

জগমোহন আবার গম্ভীর হয়ে রইলেন।

গিরিজা বলল, 'আমার মামা অবশ্য জিনিসটা চেপে রেখেছেন। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, লর্ড মেয়েটাকে নিয়ে ইলোপ করেছে।'

'উঃ, একটা দুধের মেয়ে! এ যেন বিশ্বাস করতেও কেমন লাগছে।' জগমোহন মাথায় হাত রাখলেন। যেন কী করবেন হঠাৎ কিছু ঠিক করতে পারছিলেন না। [illegible] আসন ছেড়ে দ্রুত পায়চারি করতে পারলে তাঁর ভালো লাগত। কিন্তু উঠতে পারলেন না। তাঁর মনে হল, দশমণ পাথর কেউ তাঁর দেহের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। 'তুমি কি আজ বালিগঞ্জ থেকে খবরটা শুনে এলে?'

গিরিজা মাথা নাড়ল।

'আমি যাইনি সেখানে। এক বন্ধুর কাছে খবর পেলাম। এবং এর মধ্যেই বালিগঞ্জের অনেকেই জিনিসটা জেনে ফেলেছে।'

'কিন্তু অক্ষয় ব্যাপারটা চেপে রেখেছে [illegible] পুলিসে খবর দিচ্ছে না [illegible] নাকি লোক-জানাজানির ভয়, লোক-নিন্দার ভয়।'

'না, তা নয়। এ-জিনিস যে কখনো চাপা থাকবে না, সে তো জানা কথা—মামা কি আর এই সহজ কথাটা বোঝে না। তা হলেও অক্ষয় বোস চুপ করে গেছে। জিনিসটার জন্য কালার দিতে চেষ্টা করবে, পুলিসের হাঙ্গামায় যাবে না। ভাবছে, এক দিকে ভালোই হল। মেয়েকে বিয়ে দিতে হত—এবং হাতে যখন পয়সা নেই সেটাই বা কবে সম্ভব হত তার কিছু স্থিরতা ছিল না—কাজেই যদ্দিন মেয়ে ঘরে থাকত ভাত-কাপড় দিতে হত—

তার চেয়ে, হোক না খুনে লম্পট, একজনের সঙ্গে মেয়ে যে সরে পড়েছে, সেটাই বড়ো কথা, আমার মামা এতে ক্ষতি কিছু দেখছে না, জিনিসটাকে বরং লাভজনকই মনে করছে।'

'উঃ, কী সাংঘাতিক কথা, কী জঘন্য দৃষ্টিভঙ্গী—' জগমোহনের চোখ দুটো ছোটো হয়ে গেল, নাকের ডগাটা কুঁচকে রইল। 'আমি মনে করি, ওটাও একটা লোদ্সাম ক্রিয়েচার, হুঁ, ঐ অক্ষয়টা—যাকে বলে ঘৃণ্য জীব।'

গিরিজা কথা বলল না।

'কিন্তু আমি এই জিনিস সহ্য করব কেমন করে, এই অন্যায়, এই পাপ—হুঁ, আমি আমার ছেলের দিকটাই বলছি, অক্ষয় তার মেয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা, পদস্খলন, পাপ, ব্যভিচার, হজম করতে পারে করুক, বাট্ আই নেভার—' জগমোহন কাঁপছিলেন।

'আপনি এতটা উত্তেজিত হবেন না কাকাবাবু। উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই।'

'না না, আমি ভাবছি, তাকে কি কেউ গুলি করে মেরে ফেলতে পারে না—হুঁ, ঐ ক্রিমিন্যালটাকে, না, আমার একটুও দুঃখ হবে না, এক ফোঁটা জল বেরোবে না আমার চোখ দিয়ে, আমি হাসব, গিরিজা, যদি আজ শুনি, অন্যায় ও দুর্নীতি সহ্য করতে না পেরে আমার ছেলেকে কেউ ধরাধাম থেকে সরিয়ে দিয়েছে। আমি সেই লোককে পুরস্কার দেব—তাকে অভিনন্দন জানাব। সমাজের উপকার করবে সে, একটা বড়ো কাজ করবে।'

গিরিজা চুপ থেকে হাতের নখ খুঁটতে লাগল। যেন ইতিমধ্যে বৃষ্টিটা ধরে গিয়েছিল। নীচে রাস্তায় ট্র্যাফিকের শব্দ শোনা গেল।

॥ ৪৮ ॥

অন্যদিন দুর্যোগ মাথায় নিয়েই জগমোহন বাড়ি ফিরতেন। সরযূধামের মানুষগুলি কেমন আছে না জানা পর্যন্ত তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না।

আজ তাঁর মনের অবস্থা অন্য রকম। তাঁর যেন মনে হচ্ছিল বেশ তোড়জোড় করে আরম্ভ হয়েও ঝড়টা এমন চট করে আবার থেমে গেল কেন। যদি তারপর একটু বৃষ্টিই হল তো পৃথিবী ভাসিয়ে দেবার মতন, মানুষের ঘরবাড়ি ডুবিয়ে দেবার মতন ভয়ংকর বর্ষণ হল না কেন, হুঁ, সেই সঙ্গে প্রবল বজ্রপাত, করকাপাত এবং ভূমিকম্প। অর্থাৎ প্রলয়ের মতন একটা কিছু হওয়া উচিত ছিল। তবে তিনি খুশি হতেন, নিশ্চিন্ত হতেন।

দারোয়ান গেট খুলে দিল। গাড়িটা ভিতরে ঢুকিয়ে জগমোহন সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেলেন।

যেন তিনি আসছেন বা এখনি এসে যাবেন টের পেয়ে দীনদয়াল তাঁর ঘর খুলে দিয়ে আলো জ্বেলে রেখেছে।

কদিন ধরে তাই হচ্ছে। নীচে দারোয়ান ওপরে চাকর। এ ছাড়া আর একটি প্রাণীকেও তিনি একতলা বা দোতলার সিঁড়িতে, বারান্দায় বা কোনো ঘরের দরজায় জানালায় তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে দেখতে পান না।

এই নিয়ে তিনি বিষণ্ণ হয়েছেন, ব্যথিত হয়েছেন। চাপ চাপ দীর্ঘশ্বাস তাঁর বুক ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। আজ বরং উল্টোটাই তাঁর মনে হচ্ছিল। মানুষ দেখবেন কী, যদি তিনি

এখানে এসে দেখতেন শেয়াল-কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে, শকুন ডাকছে, প্রাসাদোপম সরবৃধামের একটা ইটের চিহ্নও কোথাও চোখে পড়ছে না, বিস্তীর্ণ কাঁটাঝোপ আর মনুষ্য কঙ্কাল বোঝাই হয়ে বিশাল শ্মশানভূমি থমথম করছে তো তিনি খুশি হতেন; তিনি বুঝতে পারতেন তাঁর চারদিকে যা-কিছু রয়েছে সবই সত্য ও নির্ভরযোগ্য. প্রহেলিকা বলতে কিছু নেই. আবরণ ও মুখোশ পরে আছে এমন সন্দেহ অন্তত এখানে তিনি কাউকে দিয়ে করেন না।

দারোয়ানকে তাঁর খারাপ লাগছিল। বৃদ্ধ দীনদয়ালের কর্তব্যপরায়ণতা তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল।

এই দুটি বিশ্বস্ত মানুষকে আজ এখানে দেখতে না পেলে যেন তিনি সুখী হতেন।

পোশাক পরিবর্তন করার আগে, বাইরে থেকে ঘরে ঢুকে রোজ যা করেন, টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন জগমোহন। এবেলা ডাকে কোথা থেকে কী সব চিঠিপত্র এল এক নজরে দেখে নেওয়া। সকালেও চেম্বার থেকে ফিরে এসে তিনি সবকিছু করার আগে ডাকটা দেখে নেন।

চমকে উঠলেন জগমোহন। একটা খামের ওপর চোখ পড়ল তাঁর। পেপারওয়েট চাপা দিয়ে অন্য সব চিঠিপত্রের গাদা থেকে আলাদ করে রাখা হয়েছে ওটা এবং কভারটা ইতিমধ্যে ছেঁড়াও হয়ে গেছে! কিন্তু জগমোহনের নামে এ চিঠি আসেনি। ওপরে 'বউদি' কথাটা লেখা রয়েছে. নীচে অবশ্য জগমোহনের নাম আছে। তা না হলে চিঠি এ ঠিকানায় আসবে কেমন করে। কিন্তু খামটা হাত দিয়ে তুলতে তিনি ইতস্তত করলেন। একবার তাঁর মনে হল হাতের লেখাটা পরিচিত. পরক্ষণে আবার মনে হল, এ হাতের লেখা তিনি কোনোদিন দেখেননি। দৃষ্টিটা আর একটু সূক্ষ্ম করলেন তিনি, তারপর চিনতে পারলেন, সুকোমলের হাতের লেখা। তাই তো এই বাড়ির বউদির কাছে সে ছাড়া আর কে চিঠি লিখবে। কিন্তু এই চিঠি এখানে কেন? না কি শুধু ছেঁড়া কভারটাই পড়ে আছে। চিঠির মালিক চিঠিটা নিয়ে গেছে। জগমোহন হাত বাড়িয়ে খামটা তুলে নিলেন। আঙুল ঢুকিয়ে ভিতর থেকে ভাঁজ করা দুটো কাগজ বের করলেন। একটার ওপর 'বাবা' আর একটার ওপর 'বউদি' লেখা রয়েছে। এখন জগমোহন বুঝলেন, একই খামে দুজনের কাছে চিঠি লিখেছে সন্ন্যাসী ছেলে। কিন্তু জগমোহন তার কাছ থেকে চিঠি প্রত্যাশা করছিলেন কি? পর পর দুখানা চিঠি লিখে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে অগত্যা তিনি আশ্রমের ঠিকানায় টেলিগ্রাম করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন. টেলিগ্রাম পেয়ে সে নিশ্চয় বাবার সঙ্গে দেখা না করে পারবে না। তিনি যে অত্যন্ত বিপন্ন! আশ্চর্য, তারপরও কিনা মাত্র একখানা চিঠি লিখেই সন্ন্যাসী তার কর্তব্য শেষ করতে চাইছে। জগমোহন তাড়াতাড়ি কাগজের ভাঁজটা খুলে ফেললেন। তারপর রুদ্ধশ্বাসে চিঠির সবটা আগাগোড়া পড়ে ফেললেন। একবার পড়ে কোনো অর্থ উদ্ধার করতে পারলেন ন। তাই দ্বিতীয়বার পড়লেন। পড়তে পড়তে তাঁর ঠোঁট দুটো বেঁকে উঠল, নাকের ডগাটা কুঁচকে রইল। পড়া শেষ করে কাগজটা দলামোচা করে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেবেন কিনা চিন্তা করছিলেন। যেন হঠাৎ তখনকার মতন কথাটা ভুলে থেকে দ্বিতীয় চিঠিখানা. অর্থাৎ রমলার কাছে যেখানা লেখা হয়েছে খুলে পড়তে আরম্ভ করলেন। পড়তে আরম্ভ করেই অবশ্য শেষও হয়ে গেল। মাত্র কয়েকটি কথা। ভাষাটিও সরল। এ চিঠির বক্তব্য বুঝতে তাঁর একটুও

কষ্ট হল না। লিখেছে—বউদি, আশা করি ভগবানের কৃপায় তোমরা কুশলে আছ। এখানে আমরা একটা বড়ো কাজে হাত দিয়েছি। তাই খুব ব্যস্ত। কলকাতা যাবার সময় পাচ্ছি না। আমাদের আশ্রমে একটা মাল্‌টি পারপাস স্কুল খোলা হচ্ছে। স্কুলের বাড়িটাও আমরা নিজেরাই তৈরি করছি। মাটি কাটা, ইট পোড়ানোর কাজ সবে শেষ হল। ভিত কাটা হয়েছে। এবার গাঁথনির কাজ আরম্ভ হবে। আমাদের সকলকেই এইজন্য খুব পরিশ্রান্ত করতে হচ্ছে। তা হলেও কাজটার মধ্যে আমরা যে কী গভীর আনন্দ পাচ্ছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। যে-কোনো বড়ো কাজ, সৎ কাজের মধ্যে আনন্দ আছে। বাবাকেও এই সঙ্গে একটা চিঠি দিলাম। তাঁর হাতে চিঠিটা দিও। আমার প্রণাম রইল। দীপুকে আমার স্নেহাশীষ দিও। ইতি তোমাদের স্নেহের সুকু।

কিন্তু রমলা তার চিঠি এখানে রেখে গেল কেন? খামটা তার নামে এসেছে, সুতরাং সেটা ছেঁড়ার অধিকারও তার আছে। জগমোহনের চিঠিখানা টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে ছেঁড়া খাম সমেত নিজের চিঠিখানা রমলা তার ঘরে নিয়ে গেলে পারত। দুখানা চিঠিই শ্বশুরের টেবিলে রেখে যাওয়ার অর্থ কী? অর্থ খুঁজে বার করতে অবশ্য জগমোহনকে বিশেষ বেগ পেতে হল না। জগমোহনের কাছে যে চিঠি লেখা হয়েছে তাতে কতগুলি বড়ো কথা, লম্বা কথা ছাড়া আর কিছু নেই। কেবল বক্তৃতা দিয়ে চিঠিটা ভরানো হয়েছে। এবং এগুলি পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয় বলে জগমোহন মনে করেন। এ-সব তত্ত্বকথা তো তিনি সন্ন্যাসী ছোঁড়ার মুখে অনেক শুনেছেন। যে জন্য তাকে এখানে আসতে বলা, তার সঙ্গে এ-সব কথার সম্পর্ক কী। শিগগির মহাপুরুষ আসতে পারবেন কিনা বা বর্তমানে তিনি সেখানে এমন কী গুরুতর কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন তার কিছুমাত্র উল্লেখ নেই এ-চিঠিতে। রমলার চিঠিতে কাজের কথাটা বলা হয়েছে। আশ্রমের জমিতে স্কুল খোলা হবে। এখন বাড়িটা তৈরি হচ্ছে। মাটি কাটা ইট পোড়ানো নিয়ে শ্রীমান অতিমাত্রায় ব্যস্ত। শ্বশুর যাতে জিনিসটা জানতে পারেন, বুঝতে পারেন, তাঁর সঙ্গে সুকোমল দেখা করতে পারছে না বলে তিনি যাতে আর অহেতুক উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ না হন, তাই রমলা নিজের চিঠিখানাও এই টেবিলে রেখে গেছে। ভালো। মনে মনে পুত্রবধূর সুবুদ্ধির সুবিবেচনার প্রশংসা করলেন তিনি। কিন্তু তা বলে কি জগমোহনের সব রাগ জল হয়ে গেল, আর তাঁর হতাশ ও ক্রুদ্ধ হবার কারণ রইল না, এবার থেকে তিনি নিশ্চিন্ত ও প্রফুল্লমনে দিন কাটাতে পারবেন? কিন্তু রমলা কি জানে না তাঁর শ্বশুর যে বিপদে পড়েছে, যে ভয়ংকর সমস্যার মধ্যে পড়ে আহার-নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করতে বসেছে, সন্ন্যাসী ছেলে সেখানে ইট পোড়াক কী মাটি কাটুক তাতে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না, বিপদ ঠিকই থেকে গেল, সমস্যার বিন্দুমাত্র সমাধান হল না! হয়তো রমলার তাই ধারণা। সুকোমলের এখানে আসার সঙ্গে জগমোহনের সংকট ও সমস্যাগুলির কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। তাই হবে। শ্বশুর যে সংকটে পড়েছে, সমস্যায় পড়েছে, পরিতোষের স্ত্রী এই মোটা কথাটাই স্বীকার করতে চাইছে না। স্বাভাবিক। স্বামী ও শ্বশুর এ-বাড়ির বড়ো ছেলেকে যে-চোখ দিয়ে বিচার করছে রমলা কিছুতেই ভাশুরকে সেভাবে দেখছে না। দেখবে না। তার চোখে পরিমল ধার্মিক মহাপুরুষ। সন্ন্যাসী ছোঁড়াও আজ আবার চিঠিতে ওই একই ধরনের বক্তৃতা শোনাতে চেষ্টা করেছে। কী তার ভাষা, অন্তঃসারশূন্য সব কথা! দলামোচা

করা চিঠিটা জগমোহন আবার চোখের সামনে মেলে ধরলেন। এক-একটা লাইন পড়তে গিয়ে তিনি হোঁচট খেয়ে পড়ছিলেন। লিখেছে ঃ "বড়দা যে শিল্পী ও সুন্দরের উপাসক আমার এই বিশ্বাস আজও অটুট রয়েছে। রূপ ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে তিনি প্রাণের বিপুল প্রবাহ ও বিচিত্র প্রকাশ উপলব্ধি করতে চাইছেন। তাঁর জীবনে একটা প্রচণ্ড বেগ ও উদ্দামতা প্রথম থেকে আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন। হয়তো তরুণ বয়সে, যৌবনের আদিতে এই প্রচণ্ড বেগ ধারণ করা মানুষটির পক্ষে সম্ভব হয়নি। একটা অপরাধের মধ্য দিয়ে সেটা তখন প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যে-সাধনা জীবনকে সৌন্দর্যে আলোকে রসে মাধুর্যে পরিপূর্ণ করে নবমুক্তির মধ্য দিয়ে বিকশিত করে তোলে, পরিমল সেই পথে অগ্রসর হতে পেরেছেন। জেল থেকে বেরিয়ে বড়দা বাড়ি আসার পর প্রথম যেদিন তাঁকে দেখলাম, সেদিনই আমি তাঁর চোখ দুটোর মধ্যে সেই তপস্যার ফলশ্রুতি—দিব্যজীবনের জ্যোতির্লেখা লক্ষ্য করেছিলাম। তাই বলছিলাম কেবল যে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও বৈরাগ্যের পথেই জীবনের সাধনা করতে হবে এ কথা সত্য নয়। বড়দা তা করেননি। জীবনরসিক কবির মতন পরিমল রূপ, রস ও আনন্দকেই পেতে চেয়েছেন—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'। আপনি তাঁকে নারী-মাংসলোলুপ বলেছেন, কামচারী বলেছেন। বলতে পারেন। কিন্তু আমি বলব, তাঁর মধ্যে লোলুপতা নেই। তাঁর প্রথম যৌবনেই এ জিনিস প্রকটভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি প্রেমের প্রত্যাশী, প্রীতির ভিখারী। হ্যাঁ, নারীর প্রেম। এই প্রেমেই যে অমৃত—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্—এই অমৃত লাভের জন্যই তাঁর জীবনের দীর্ঘ পথপরিক্রমা—জানি না পথের শেষে তিনি পৌঁছোতে পারবেন কি না—কিন্তু তাঁর......."

জগমোহন আর পড়তে পারলেন না। তাঁর কপালের রগ দুটো দপদপ করছিল। চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলেন। রমলা কি এই চিঠি পড়েছে। নিশ্চয় পড়েছে। নিজের হাতে সে যখন খাম ছিঁড়েছে—

কেমন যেন উত্তেজিত ক্ষিপ্র হয়ে উঠলেন জগমোহন। লম্পট যে পথের শেষে প্রায় পৌঁছে গেছে, গিরিজার মুখে একটু আগে যা শুনে এলেন, অক্ষয়ের বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে কাল থেকে উধাও হয়েছে—ফলাও করে খবরটা পুত্রবধূকে শোনাতে তিনি ছুটে ঘর থেকে বেরোলেন।

কিন্তু বারান্দায় এসে তাঁর মনে হল, ওপরটা যেন বড়ো বেশি নির্জন স্তব্ধ হয়ে আছে। মৃত্যুপুরীর মতন মনে হচ্ছে। জেগে তো কেউ নেই-ই, ঘুমিয়ে আছে বলেও মনে হল না। তা হলে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যেত। জগমোহনের রীতিমতো ভয় করতে লাগল। ভূতপ্রেত পিশাচ দানবের ভয় কাকে বলে তিনি জানেন না। এই অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে ঘটেনি। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হল তাঁর ভয় করছে, তিনি বুঝি কোনো শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছেন, অশুভ অশরীরী ছায়ারা তাঁর চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘামতে আরম্ভ করলেন তিনি। একটু আগে যেমন চিন্তা করেছিলেন, সরযূধামের পরিবর্তে এখানে ঝোপঝাড় শকুন শেয়াল নরকঙ্কাল দেখতে পেলে তিনি প্রীত হতেন নিশ্চিন্ত হতেন, এখন কি তাই সত্য হল! কিন্তু তা হলেও তাঁর ভয় করবে কেন, তিনি তো ভয় পাবার ছেলে নন। তাঁর ভিতরটা খুব শক্ত—

তাই যেন দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলতে ভয় দূর করতে গলার স্বরটা হঠাৎ রুক্ষ করে তিনি

চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বউমা!' দুবার তিনি বৌমাকে ডাকলেন। কেউ সাড়া দিল না। তৃতীয়বার তিনি নাতিকে ডাকলেন, 'দাদু দাদু!' এবারও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কেবল তাঁর গলার স্বরটাই করিডোরের দেওয়ালে বাড়ি খেয়ে মোটা গমগমে একটা আওয়াজ হয়ে তাঁর কানে ফিরে এল। অপ্রস্তুত হলেন তিনি। কেমন একটু সন্দেহও হল মনে।

পরিতোষের ঘরের দিকে এক পা দু পা করে এগিয়ে এলেন। বন্ধ দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালেন। প্যাসেজের বড়ো আলোটা জ্বালা হয়নি। তাহলে অবশ্য আগেই দেখতে পেতেন মেজো ছেলের ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে।

তাই তো! হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি। কোথায় গেল ওরা। রমলা, দাদু?

তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে পড়ল, যদি মা ও ছেলে আজ নীচে গিয়ে থাকে? পরিতোষের ঘরে? হয়তো অভিমান ভেঙেছে রমলার, পরিতোষেরও বুঝি রাগটা কমেছে। হয়তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা আপস-রফা হয়ে গেছে সন্ধ্যার দিকে। আশ্চর্য কী! একতলার ঘর থেকে বিছানাপত্র টেনে আনতে হবে ভেবে পরিতোষ আর ওপরে আসেনি, রমলাই ছেলেকে নিয়ে নীচে শুতে গেছে। আসবার সময় জগমোহন পরিতোষের ঘরের আলো নেভানো দেখে এসেছিলেন। দুদিন ধরে তাই হচ্ছে। একতলার ঘরে আলাদা শুতে আরম্ভ করার পর থেকে ছেলে সকাল সকাল শুয়ে পড়ছে। রাত দুটো আড়াইটা পর্যন্ত জেগে আলো জ্বেলে ক্রাইম নভেল পড়া যার অভ্যাস। স্বাভাবিক। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি মনোমালিন্য চলেছে। এই অবস্থায় গল্পের বই পড়ার উৎসাহ থাকে না।

যাই হোক, জগমোহন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলেন। যদি এদের মধ্যে গোলমালটা মিটে যায়।

তাই তিনি আর নীচে নামাটা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন না। কথাটা যদি রমলাকে বলতে হয় কাল সকালে দিনের বেলায় বলা যাবে। অপ্রীতিকর সংবাদটা তাদের কাছে আজ না হয় না-ই পৌঁছল। দুজনের মিলন হয়েছে এটাই তাঁর কাছে পরম লাভ। অন্তত এদিক থেকে আজ রাতটা তিনি শান্তি পাবেন। একটু যদি ঘুমোতে পারেন।

চুপ করে বারন্দায় দাঁড়িয়ে কথাটা তিনি চিন্তা করলেন সত্য। কিন্তু আবার খুব যেন একটা নিশ্চিন্তও হতে পারছিলেন না। এক পা এক পা করে সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর নীচে অন্ধকারের দিকে গলা বাড়িয়ে গম্ভীর চাপা গলায় ডাকলেন; 'দীনু—দীনদয়াল!' দীনদয়ালকে জিজ্ঞাসা করলে সবই তিনি জানতে পারবেন। বউমা নিজে থেকে নীচে গেছে, না কি পরিতোষ এসে ডেকে নিয়ে গেছে। অবশ্য দুটোই সমান কথা। কিন্তু তা হলেও এ ক্ষেত্রে, এতটা মন কষাকষি যেখানে চলছিল, মুখ দেখাদেখি প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেখানে কার রাগ আগে পড়ল, কে প্রথম বশ্যতা স্বীকার করল জানতে জগমোহনের আগ্রহ এবং একটু কৌতূহল হচ্ছিল বইকি।

'কে, দীনু?' পায়ের শব্দ শুনে তিনি ঘাড় সোজা করলেন।

'আমি, পরিতোষ।' বাবার সামনে ছেলে স্থির হয়ে দাঁড়াল। জগমোহন বিব্রতবোধ করলেন। হঠাৎ পরিতোষ উঠে আসবে তিনি আশা করেননি।

কাজেই রমলার নীচে শুতে যাওয়ার কথাটা সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে তিনি যেন সাহস পেলেন না। একটা ঢোক গিলে মৃদু গলায় বললেন, 'ওরা শুয়ে পড়েছে মনে হয়, আমার দাদু, বউমা?'

'ও, এ কথাই তুমি এত রাত্রে জানতে চাইছ।' ভাঙামতন একটা হাসির শব্দ তুলে পরিতোষ বলল, 'তুমি তো ফিরেছ অনেকক্ষণ, আমি শুনেছি, টের পেয়েছি—তা তোমার খাওয়া হয়েছে?'

'না।'

'এতক্ষণ কী করছিলে?'

জগমোহনের মুখ দিয়ে কথা সরল না। ছেলের হাসির শব্দ, রেলিং-এ পিঠের ভর রেখে তাঁর হেলে দাঁড়ানোর ভঙ্গি , কেমন বিমূঢ় হয়ে রইলেন তিনি। সন্ন্যাসী ছেলের কাছ থেকে তিনি চিঠি পেয়েছেন, কিছুক্ষণ আগে গিরিজা তাঁর চেম্বারে দেখা করে পরিমল সম্পর্কে যে খবরটা বলে গেল, অনেক কিছু পরিতোষকে বলার ছিল। পরিতোষকেই তো সব বলতেন তিনি। অথচ কিছুই বলা হল না। তাদের দাম্পত্য কলহটাই বড়ো হয়ে জরুরী হয়ে জগমোহনের চোখের সামনে ঝুলছিল। অন্য সব কথা তিনি ভুলে রইলেন।

পরিতোষ বলল, 'বউমাকে খুঁজছ, তোমার বউমা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।'

'কী বলছ!' জগমোহন হঠাৎ অতি মাত্রায় সচকিত হয়ে উঠলেন, রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় গেছে, আমার দাদু কোথায়!'

'কোথায় গেছে বলতে পারব না, বিকেলে তুমি বেরিয়ে যাবার পর তোমার বউমাও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল দেখলাম, তোমার নাতিকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে।'

'নাতিকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে!' বিড়বিড় করে বললেন তিনি, 'তোমাকে কিছু বলে যায়নি?'

'না।'

'তুমি কিছু জিজ্ঞেস করলে না?'

'কেন করব, কী অধিকার আছে তাকে আমার কিছু জিজ্ঞেস করার, পাখির মতন যত্রতত্র সে উড়তে পারে—সেই স্বাধীনতা তার আছে। একটা সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে গেল।'

'আশ্চর্য!' জগমোহন রীতিমতো হাঁসফাঁস করতে আরম্ভ করলেন, 'এটা কেমন কথা হল, এমন তো কথা ছিল না, তখন বউমা আমায় তো কিছুই বলল না। কোথায় যেতে পারে—শ্রীরামপুর ওর দাদার কাছে গেছে কি?'

রমলার দাদা সেখানকার হাসপাতালের বড়ো ডাক্তার। জগমোহনের বন্ধুর ছেলে অবনীভূষণ। সেই সূত্রে ঐ পরিবারের সঙ্গে এই পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক। রমলার বাবা বছর তিন হয় পরলোকগত হয়েছেন। আশেপাশে তাদের আর তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন নেই রমলা বেড়াতে যেতে পারে। যেতে হলে একমাত্র দাদার ওখানে শ্রীরামপুর।

'তুমি আমায় অবাক করছ বাবা।' পরিতোষের গলার ভাঙা হাসিটা এবার আর্তনাদের মতন শোনা'ল। 'বার বার আমায় প্রশ্ন করছ, কোথায় গেছে, কোথায় যেতে পারে? আমি কী তার মালিক যে আমাকে বলে যাবে—আমি শ্রীরামপুর চললাম কী অমুক জায়গায় যাচ্ছি? আমিও তা আশা করি না, আর তুমিই বা এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন, যেখানে খুশি সেখানে যাক, যেখানে ভালো লাগে সেখানে গিয়ে রাত কাটাক—তার জন্য—'

'আস্তে—আস্তে।' জগমোহন হিসহিস করে উঠলেন। 'চাকর দারোয়ানরা এখনো জেগে।'

পরিতোষ যেমন চেঁচিয়ে বলছিল, তাঁর কান গরম হয়ে উঠল। তাঁর যেন মনে হচ্ছিল দীনদয়ালকে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও ওপারে উঠে আসছিল। যেন সিঁড়ির মাঝপথে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। 'এসো, আমার ঘরে এসো, ঘরে বসে কথা বলবে।'

কিন্তু পরিতোষ নড়ল না বা গলার স্বর ছোটো করল না। 'না না, লজ্জা করার আর আছে কী, বউ যদি তোমাকে আমাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারল, তো আমরাই বা চুপ থাকব কেন, রেখে ঢেকে কথা বলব কেন !'

'আচ্ছা, হবে, সব কথা ঘরে গিয়ে হবে, তুমি এসো।' ছেলের হাত ধরতে বাকি রাখেন জগমোহন।

'তুমি যাও, তুমি গিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়ো।' পরিতোষ রেলিং-এর গায়ে শরীরটা আর কিছু বেশি ছেড়ে দিল। 'এই নিয়ে—একটা বাজে স্ত্রীলোকের বিষয় নিয়ে আর বেশি কিছু তো বলার নেই—সব কথা এখানেই শেষ হয়ে গেল।' আর আর্তনাদ না, ভাঙা হাসিটাই নূতন করে তার গলায় চাড়া দিয়ে উঠল। 'আসল কথা কী জান বাবা, পরিমল দুদিন ধরে বাড়ি আসছে না, তোমার পুত্রবধূর চোখে সে দেবতা, দেবতারও বেশি, তাই এ বাড়ি তার কাছে শূন্য অন্ধকার মনে হচ্ছিল, হুঁ, আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, তাকে না দেখে রমলা হাঁপিয়ে উঠছিল, তাই বাক্সটাক্স গুছিয়ে এখান থেকে চলে গেল।'

জগমোহন দাঁতে দাঁত ঘষলেন। ক্রূর চাপা গলায় বললেন, 'পরিমল কলকাতায় নেই, তুমি শুনেছ কি?'

'শুনেছি, সন্ধ্যাবেলা গিরিজা আমায় টেলিফোনে সব বলেছে।'

জগমোহন চুপ করে রইলেন।

'টেলিফোনে একথাও বলল গিরিজা, শিগগির না লর্ডের ডেডবডি আমাদের দেখতে হয়, এমন আশঙ্কা করছে সে।'

'কেন! কীরকম?' জগমোহন চঞ্চল হয়ে উঠতে গিয়েও পরক্ষণে স্থির হয়ে রইলেন, শক্ত হয়ে রইলেন।

'খুবই স্বাভাবিক।' পরিতোষ বলল, 'একটার পর একটা পাপ করে যাচ্ছে তোমার বড়ো ছেলে, পাপের পুরস্কার মৃত্যু—কাজেই গিরিজা যা আশঙ্কা করছে, উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

'তাই তো!' জগমোহন তেতোমতন একটা ঢোক গিললেন। যেন হঠাৎ অত্যধিক বিচলিত হয়ে পড়ছিলেন তিনি। কিন্তু তখন চেম্বারে তিনিও কি গিরিজাকে বলেননি, পরিমলকে কেউ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলে তিনি খুশি হন নিশ্চিন্ত হন, হত্যাকারীকে তিনি পুরস্কার দেবেন ! অথচ গিরিজা যে আগে থাকতেই এমন একটা আশঙ্কা করে বসে আছে জগমোহন তখন বুঝতে পারেননি, গিরিজা তাঁকে বুঝতে দেয়নি। পরিতোষ যেমন বলছে, তাঁর সঙ্গে দেখা করার আগেই গিরিজা পরিতোষকে টেলিফোনে সব বলছিল। 'তাঁর নিয়তি তাকে বার বার এপথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।' জগমোহন একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেললেন। 'অক্ষয় উকিলের মেয়েকে সে সিডিউস করেছে বলে এবার আর একটি প্রেমিক যে গোপনে ছুরি শানাচ্ছে না তাই বা কে বলবে।'

'কিন্তু আমার ঘরটা সে এমন করে ভেঙে দিয়ে গেল কেন বুঝতে পারছি না।' পরিতোষের ভাঙা হাসিটা এবার বিকৃত বীভৎস হয়ে জগমোহনের কানে বাজল।

'আমার মনে হয় বউমা তার ভুল বুঝতে পারবে—ঘর ছেড়ে যাবে কোথায়, নিশ্চয় সে ফিরে আসবে।' ছেলেকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিলেন তিনি. কিন্তু তার আগেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে পরিতোষ। রেলিং এর কাঠে কপালটা ঠুকতে আরম্ভ করল।

'কী মুশকিল কী মুশকিল!' জগমোহন আবার হিসহিস করে উঠলেন। 'চাকরবাকর আছে বাড়িতে. তারা কী ভাবছে বল তো—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই পরিতোষ টলতে টলতে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

॥ ৪৯ ॥

কত বয়স হবে ছেলেটির? আঠারো উনিশ। তা-ও না। আরও কম। সতেরো। হয়তো সতেরো বছর পুরে দু-এক মাস. তার বেশি কিছুতেই নয়।

নিজের বয়সের হিসাবটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সে। কাল পর্যন্ত. কাল রাত বারোটা পর্যন্ত তার বয়স সতেরো বছর তিন মাস সাত দিন হল। মার মুখে শুনেছে—রাত্রি বারোটায় বুলা ভূমিষ্ঠ হয়। যাকে বলে নিশুতি রাত। রোজ রাত্রে বিছানায় শুয়ে তার জন্মের সন মাস তারিখ থেকে আরম্ভ করে সেই রাত পর্যন্ত তার বয়সটা ঠিক কত হল আঙুলের কড় গুণে গুণে সে হিসাব রাখে। একদিনও ভুল হয় না। একটা অভ্যাসের মতন দাঁড়িয়ে গেছে এটা।

দিনের বেলা, সকালের হালকা আলোয় অমূল্যকে দেখা মাত্র তার মুখের ভিতর ছলাৎ করে উঠল। দেখেই সে বুঝতে পারল, তার বয়সের একটি ছেলে। সতেরো। কম নয়—বেশি তো নয়ই। যেন আয়নায় নিজেকে দেখছিল বুলা। তার পুরুষ সংস্করণ। বুলা যদি ছেলে হত তো এই হত, ঠিক এমন দেখতে হত কি? তাই অমূল্য এত চমকে দিয়েছে তাকে। একটা সিরসির অনুভব করল সে বুকের মধ্যে। সুখের সিরসির এবং দুঃখেরও। ছেলে হতে পারল না বলে দুঃখ। অথবা সে যে মেয়ে হয়ে জন্মেছে সেই সুখ সেই তৃপ্তির শিহরণ। সমবয়সী একটি ছেলেকে দেখলে সব মেয়ের মনের অবস্থা এই হয় কি না বুলা বুঝতে পারছিল না। অথবা, বুলা ভাবছিল. তাকে দেখে অমূল্যর মনের অবস্থা কেমন হচ্ছে কে জানে। সে কি তাকে ভাবছে? অথবা সে যেমন, বলতে গেলে চোখের পলক না ফেলে অমূল্যর মাথার কালো থোকা থোকা চুল, পরিষ্কার ঝকঝকে চোখ. বাঁশির মতন নাক, টানা ভুরু. ঈষৎ টোল খাওয়া চমৎকার থুঁতনি ও নাকের নীচের এখনও তেমন কালো হয়নি, শুঁয়োপোকার আঁশের মতন ধোঁয়াটে বাদামী রং ধরে কেবল গজাতে আরম্ভ করেছে. আশ্চর্য গোঁফের রেখাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল. অমূল্য কি তেমন করে তাকে দেখছিল। বুলার মনে হল, তার বয়সের একটি মেয়ের চুল চোখ নাক চিবুক খুঁটিয়ে দেখবার সময় পাচ্ছে না অমূল্য। কেবল হাসছে. কথার খই ছিটোচ্ছে. অনর্গল হাত পা ছুঁড়ছে, তড়বড় করছে। অস্থির চঞ্চল। চৈত্রের এলোমেলো হাওয়ায় তরুণ অশ্বত্থ গাছটা যেমন করে। একই বয়সের একটি ছেলে ও মেয়েতে এই তফাৎ। এই ভাবনাটাও বুলাকে বেদনা দিচ্ছিল। আবার পুলকিতও হচ্ছিল সে। এমন পুরুষ কি সে দেখেছে, তার উল্টো ছায়া. আর সেই ছায়া তার এত সামনে এত কাছে। রাত্রে ভালো বুঝতে পারেনি, মন্দিরে তো নয়ই—পরিমলদা কার

সঙ্গে না কার সঙ্গে কথা বলছে, বুলা ভালো করে ফিরেও তাকায়নি। মনে করেছিল বয়স্ক একটা মানুষ—পথে ঘাটে এমন তো কত মানুষ আছে, যারা গায়ে পড়ে আলাপ করে পরিচিত হতে চায়। পরিমলদার সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলছিল সেই মানুষ। এবং তারপর বুলা লক্ষ্য করছিল, পরিমলদা গম্ভীর হয়ে গেছে। ভালো করে তার সঙ্গে বা নিলয়ের সঙ্গে কাথা বলছে না। একটা কী খুব ভাবিছল যেন। তারপর তাঁর হৃদয়পুর যাবার প্রস্তাব, আর সেই সঙ্গে বুলাকে নিলয়কে কলকাতা ফিরে যেতে বলা। ভাগ্যিস বুলা কিছুতেই রাজি হয়নি। নিলয়কে ট্রেনে তুলে দিয়ে পরিমলদার সঙ্গে সে যখন আবার সেই পদ্মদিঘির পাড়ে মন্দিরের কাছে ফিরে এল, দেখল সেই মানুষটা দিঘির পাড়ে ঘাসের ওপর বসে আছে। তুলোর আঁশের মতন পাতলা ফিনফিনে একটু জ্যোৎস্না উঠেছে তখন। মানুষের চোখ মুখ খুব ভালো চেনা যায় না, কিন্তু মানুষটাকে বোঝা যায়। তাদের দেখতে পেয়ে সেই মানুষ উঠে দাঁড়াল। হ্যাঁ. এই অমূল্য, তখন তাদের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সে। বুলা বুঝতে পারল, মানুষটার বয়স খুবই কম, ছেলেমানুষ।

কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। এই অমূল্য যে কত সহজে মানুষকে কাছে টেনে নেয়, আপন করে নেয় একটু সময়ের মধ্যেই বুলা বুঝতে পেরেছিল। তার সঙ্গে একটাও কথা বলছিল না সে, সব কথা হচ্ছিল পরিমলদার সঙ্গে বুলা শুধু শুনছিল। আশ্চর্য গলার স্বর ছেলেটির। যেন বুলার মনে হল, পরিমলদার সঙ্গে সে-ই কথা বলছে, হঠাৎ বুঝি সে পুরুষ হয়ে গেল। বুলা কিন্তু অনেকদিন চেষ্টা করেছে, যদি সে পুরুষ হত তো তার গলার আওয়াজটা কেমন শোনাত, তাই একলা ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে পুরুষ কল্পনা করে সে কথা বলেছে। তার হাসি পেত তখন। কিছুতেই যেন ঠিক আওয়াজটি বেরোচ্ছে না, অর্থাৎ জিনিসটা তার মনের মতন হচ্ছে না। তখন সে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। কাল রাত্রে অমূল্যর গলার স্বর শুনে সে চমকে উঠল। তার মনে হল এতদিন পর তার লুকোনো গলার স্বরটা, অর্থাৎ হুবহু যেমনটি হলে' তার ভালো লাগত, মনের মতন হত, ঐ ছেলেটির গলা থেকে বেরোচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে গভীর আত্মীয়তা অনুভব করল ছেলেটির সঙ্গে। তারপর থেকে তো ক্রমাগত তাকে দেখছে, তার কথা শুনছে। হৃদয়পুরের রাস্তাঘাট খারাপ। জায়গা সুন্দর। দেখবার মতন। কিন্তু সেখানে পৌছবার পথ মোটেই ভালো নয়। কাজেই রাত্রে রওনা না হওয়াই ভালো। অমূল্য বলছিল, রাতটা আপনাদের এই মাধবপুরেই থেকে যেতে হচ্ছে। ভোরবেলা আবার বেরিয়ে পড়বেন। পরিমলদা ইতস্তত করছিলেন, তাই তো, রাত্রে এখানে থাকবার জায়গা কোথায়—শহর বন্দর নয় যে হোটেল-টোটেল পাওয়া যাবে—

পরিমলদার কথা শেষ হবার আগেই অমূল্য হেসে উঠেছিল। সে কী! হোটেলে থাকতে যাবেন কোন দুঃখে। আমি আছি কেন, আমার বাড়ি চলুন। সেখানে থাকবার চমৎকার জায়গা আছে। 'আমার বাড়ি' কথাটা শুনে বুলার ভীষণ হাসি পেয়েছিল। ঐটুকুন ছেলের বাড়ি! তাই তো, তারই বাড়ি বটে। দুটো কাঁঠালগাছ ও একটা আমগাছ নিয়ে এক টুকরো জমির ওপর একটি মাত্র ঘর। বাঁশের বেড়া টিনের চাল। একটা কেরাসিনের ডিবি জ্বলছে ভিতরে। সংসারে বিধবা মা আর এই ছেলে। তা মা-ও বুড়ো হয়েছেন, চোখে ভালো দেখতে পান না। ছেলেকেই সব দেখতে হয় করতে হয়। সংসারে একমাত্র পুরুষ। অমূল্যকে দুধের শিশু

রেখে তার বাবা মারা যায়। বোন আছে একটি। অমূল্যর বড়ো। বিয়ে হয়ে গেছে। অমূল্যর বাবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি। দিয়েছিলেন মামা। মামাই এতদিন এই সংসার দেখছিলেন। বছর দুই হল তিনিও দেহ রেখেছেন। ছ-সাত বিঘা ধানি জমি আছে। প্রায় দশ বিঘার মতন রেখে গিয়েছিল তার বাবা। বোনের বিয়ে দিতে কিছু জমি বেচে দিতে হল। সে যাই হোক, জমিজমা বাড়িঘর—এসবের ওপর অমূল্যর কিন্তু কোনো আকর্ষণ নেই। কাল রাত্রে হাসতে হাসতে একসময় পরিমলদাকে বলছিল সে, মা যতদিন আছে ততদিন এসব—তারপর মা চোখ বুজুক, সব বেচেটেচে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়বে। ঘুরে ঘুরে দেখবে। ঘুরেবেড়ানোই তার আনন্দ। নেশা। ফাঁক পেলেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে, আজ বিষ্ণুপুর যাচ্ছে, কাল হৃদয়পুর—আরও দূরে। দূরই তাকে হাতছানি দেয় বেশি। এই বয়সেই সে তিনবার সাগরে গেছে। সাগর মেলার দিনগুলি এলে আর সে ঘরে থাকতে পারে না। ভয়ানক ছটফট করে তার মন। যতক্ষণ না বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে কিছুতেই সে শান্তি পায় না। উঁহু, ধর্ম-কর্ম বা পুণ্য অর্জনের লোভ নেই—তার কৌতূহল তার আগ্রহ লক্ষ লক্ষ মানুষ—মানুষের মুখ, আর সাগরের বুকের শত কোটি ঢেউ। দুটো এক হয়ে মিলে যে ছবি তৈরি হয় সেই ছবি দেখতে বার বার পাগল হয়ে সে সেখানে ছুটে যায়। ছেলে যখন কথাগুলি বলছিল বিধবা বুড়ি চুপ থেকে শুনছিল। সেই ছোট্ট টিনের ঘরে মাটিতে মাদুর বিছিয়ে চার জনের শোবার জায়গা করা হয়েছিল। এ-পাশে বুড়ি মা আর বুলা, মাঝখানে একটু ফাঁক রেখে ওধারের বেড়া ঘেঁসে অমূল্য ও পরিমলদা। কতক্ষণ আর ঘুমিয়েছিল তারা। অতিথিদের পেয়ে অমূল্যর সে কী আনন্দ। একটু সময়ে পরিচয়ে কেউ এত অন্তরঙ্গ উৎসাহী হয়ে উঠতে পারে! হয়তো পরিমলদা ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে তার আয়নার মতন ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন একটি মন ও হ্রদের মতন স্বচ্ছ টলটলে প্রশস্ত হৃদয়টির পরিচয় পেয়েছিলেন। কথা ফেলতে পারেননি। রাতটা অমূল্যর বাড়িতে থেকে যাওয়া স্থির করলেন। আধ মাইল দূরে তার বাড়ি। অমূল্য তখনি স্টেশনের রাস্তায় ছুটে গিয়ে রিকশা ডেকে আনতে চেয়েছিল। পরিমলদা বারণ করলেন। রিকশা ডাকতে হলে অমূল্যকে এক মাইল পথ ছুটে যেতে হয়। 'তার চেয়ে এইটুকুন পথ আমরা দিব্যি হেঁটেই চলে যাব, কেমন পারবে না, তোমার কষ্ট হবে?' ঘাড় ঘুরিয়ে বুলার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন পরিমলদা। বুলা তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করেছিল। 'চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে—জ্যোৎস্নার মধ্যে হাঁটতে ভালো লাগবে।' অমূল্যর সামনে বুলা এই প্রথম কথা বলেছিল। তা হলেও তার কথার মধ্যে কোন রকম জড়তা ছিল না। বরং একটা কিছু বলবার জন্য ভিতরে ভিতরে সে ভয়ানক উসখুস করছিল। পরিমলদা সুযোগ করে দিলেন। এতক্ষণ সমবয়সী একটি ছেলের গলার স্বর বুলা শুনছিল। এবার তার নরম মিষ্টি মেয়েলি গলাটা কেমন শোনায় শুনতে তার নিজেরই খুব কৌতূহল হচ্ছিল।

যা হোক, তার কথা শুনে পরিমলদা খুশি হয়েছিলেন। অমূল্য খুশি হয়েছিল কিনা বোঝা গেল না। এক পলক বুলাকে দেখে সে আগে আগে হাঁটতে আরম্ভ করল। পরিমলদার সঙ্গে বুলা পিছনে হাঁটছিল। বাড়ি পৌঁছে অমূল্য অতিথি আপ্যায়নে লেগে গেল। এক মিনিট দেরি না করে কাঠ বাঁশ জোগাড় করে তখনি উনুন ধরিয়ে দিল। ভাত রান্না করল, ডিমের ঝোল রান্না করল। পরিমলদাকে তো নয়ই, বুলাকেও সেসব কাজে হাত লাগাতে দিল না। এক

হাতে সে সব করছিল আর কথা বলছিল। তার কথার শেষ ছিল না। বিষ্ণুপুর মাধবপুর এবং চারপাশের আরও দশটা গাঁয়ের কথা। তারপর তার তিনবার সাগরমেলা দর্শনের দীর্ঘ কাহিনী, কত রং কত ছবি সে সব কাহিনীর মধ্যে। তার কথা শুনতে শুনতেই যেন রাতটা একরকম কেটে গেল। পরিমলদার মতন তার মা-ও কেন চুপ থেকে সব শুনছিল, নিজে একটাও কথা বলেনি, বুলা এখন বুঝতে পারছে। ছেলের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা, অমূল্য যা করে আনন্দ পায় তাতেই তাঁর আনন্দ। তিনি চোখ বুজলে অমূল্য বাড়ি ঘর জমিজমা বেচে দিয়ে যদি পথে বেরিয়ে পড়ে তাতে তাঁর একটুও দুঃখ থাকবে না। স্বর্গে থেকে বুড়ি তাকিয়ে দেখবে নদীর স্রোতের মতন নীল আকাশের পাখির মতন শরতের স্বচ্ছ লঘু মেঘের মতন তাঁর ছেলে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানুষ দেখছে; তাই তো, নদীর স্রোতকে কে বাধা দেয়, আকাশের পাখিকে কে খাঁচায় পোরে? অমূল্য যদি স্থিতি না চায় বন্ধন না চায় তো মা তাকে বেঁধে রাখবে কেন। মার চেয়ে ছেলেকে কে আর বেশি চেনে। তাই অমূল্যর সব কথায় বুড়ির সম্মতি সকল ইচ্ছায় অনুমোদন রয়েছে, বুলা বুঝতে পেরেছিল।

পরিমলদাও বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন এবং তার মার মতন অমূল্যকে এক রাতের পরিচয়েই চিনে ফেলেছিলেন। তাই সকালের আলো ফুটতে বুলাকে নিয়ে পরিমলদা যখন বেরিয়ে পড়বার জন্য তৈরি হলেন তখন দেখা গেল অমূল্যও জামা কাপড় পরে তৈরি, সেও সঙ্গে যাবে।

বুলা একটু অবাক হয়েছিল।

পরিমলদা হেসে বলেছিলেন, 'অমূল্য আমাদের সঙ্গে যাক। সে থাকলে আমাদের সুবিধা হবে। রাস্তাঘাট ভালো চেনা আছে তার। তোমার আপত্তি আছে?'

আপত্তি! বুলা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না, এই ছেলেও তাদের সঙ্গে হৃদয়পুর যাচ্ছে। এত খুশি হয়েছিল সে যে হঠাৎ পরিমলদার কথার উত্তর দিতে পারছিল না। অল্প হেসে ঘাড়টা ঈষৎ কাত করে কেবল মাটির দিকে তাকিয়ে থেকেছিল।

'আমি তোমাদের গাইড হব।' অমূল্য বলছিল, 'হৃদয়পুর থেকে যদি আর কোথাও যেতে হয় আমিই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।'

বুলা বুঝতে পারল, রাত্রে যখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন পরিমলদার সঙ্গে অমূল্যর কথা হয়েছে, সেও সঙ্গে যাচ্ছে। চোখ তুলে এই প্রথম সে সরাসরি অমূল্যর চোখের দিকে তাকাল তা ছাড়া রাত্রে কি আর চোখের আসল রং বোঝা যায়। ইচ্ছা থাকলেও ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে তার চোখের ভিতরটা সে ভালো বুঝতে পারেনি, যা না বুঝলেই চলছিল না বুলার। চোখ চিনতে না পারলে পুরুষের সবটুকুই যে অচেনা অজানা হয়ে রইল। তাই তখন, সকালের ফুটফুটে আলোয়, অমূল্যর চোখের দিকে তাকানো মাত্র, যেমন তার গলার স্বর শুনে হয়েছিল, বুলার বুকের মধ্যে অনেকগুলি ছোটো ছোটো ঢেউ খেলা করে উঠল। তার মনে পড়ল কবে যেন কোথায় এক ধরনের দোপাটি ফুল দেখেছিল। সাদা রঙের পাপড়ির ধারে ধারে গোলাপি ছিট। লাল নয়, গাঢ় লাল ছিটা রয়েছে পরিমলদার চোখে। তা-ও সুন্দর। কিন্তু ভয় করে। যেমন সন্ধ্যার আকাশের রক্ত রং দেখলে ভয় করে—একটা রহস্যের দোলা

লাগে বুকে, আবার ভালোও লাগে। কিন্তু সকালের নির্মল গোলাপ আকাশ? তার সবটুকুই জানা, একটুও রহস্য নেই, অথচ চোখ ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছা করে না, যত দেখি ভালো লাগে, শুধু তাই নয়, মনে হয় একটু একটু করে আকাশের ওই গোলাপি আভা আমার মধ্যে প্রবেশ করে আমার ভিতরটাও এমন করে দিচ্ছে। এতটুকু মলিনতা থাকতে দিচ্ছে না, কোনোরকম ভয় ভাবনাও কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। কেবল একটা ফুল ফোটার আনন্দ জাগছে মনে।

তাই হয়েছিল বুলার অমূল্যর চোখের দিকে তাকিয়ে।

যেন একটু বেশি সময় তার চোখ দুটো দেখছিল সে, চোখের আশ্চর্য রঙ দেখছিল। পরিমলদা জিনিসটা লক্ষ্য করেছিলেন। এবং তিনি যে খুশি হয়েছিলেন বুলা বুঝতে পেরেছিল। তাঁর মতন বুলাও অমূল্যকে চিনতে পেরেছে, তাকে ভুল করছে না।

ভুল করবে কী, বুড়ি মাকে প্রণাম করে তিনজন বাড়ি থেকে যখন বেরোয় তখন রৌদ্র ওঠেনি, আকাশ বাতাস ঠান্ডা ছিল, চারদিকে পাখিদের অশ্রান্ত কূজনগুঞ্জন চলছিল, তখন থেকে তারা দুজন, অমূল্য ও বুলা পাশাপাশি হয়ে, রীতিমতো কাঁধ মিলিয়ে হাঁটছিল আর অনর্গল কথা বলছিল। যেন কেউ কাউকে পিছনে ফেলতে অথবা আগে চলতে দিতে রাজি নয়। তা হলে কথা বলার অসুবিধা হবে। তেমন কী কথা এতকাল দুজনের মধ্যে জমে ছিল, আজ দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটি মুখ খুলে গেল, ফোয়ারার মতন সেসব কথা ছিটকে ছিটকে বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই, থামতে চাইছে না, এবং কেউ কাউকে থামতেও দিচ্ছে না তারা নিজেরাও বুঝতে পারছিল না। তুচ্ছ কথা, কিন্তু তা-ই কত মূল্যবান মনে হচ্ছিল দুজনের কাছে। 'ওটা কি দোয়েল!' 'ধেৎ, চন্দনা। পাখি তুমি একদম চেন না।' 'এটা কুলগাছ?' 'না শ্যাওড়া গাছ। দেখছ না পাতার রঙ কালচে সবুজ, পাতাটা একটু ভারি, কাঁটা নেই, কুলের কাঁটা আছে। পাতার রং হালকা সবুজ।' 'ঘাসফুল নীল হয়?' 'নীল হয় সাদা হয়—সোনালি লাল ঘাসফুলও আমি তোমায় দেখাতে পারি।' 'দেখাও।'

পরিমল পিছনে। ইচ্ছা করে দূরত্ব রক্ষা করে হাঁটছে। দুজনকে দেখতে দেখতে পথ চলছে সে। তাই তো, সমান বয়সের দুটি ছেলেমেয়ে পরস্পরের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব খুঁজে পেয়েছে, মুখের ছায়া, হয়তো তারা তাদের স্বভাবের রঙটিও আর একজনের মধ্যে দেখতে পেল। তাই এত মিল এত নিবিড়তা। তা না হলে বুলা এইটুকু পথ চলতে কতবার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাত—একি আপনি মোটেই হাঁটতে পারছেন না, আপনার নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছে, আবার কোথাও একটু বসে জিরিয়ে নিলে হত না পরিমলদা? কিন্তু এখন সেকথা চিন্তা করারও সময় নেই তার, পিছনে তাকাবার কথাই ভুলে গেছে।

কিন্তু তা বলে কি পরিমল রাগ করছে, অভিমান করছে! মোটেই না। যদি বুলা ঘাড় ফিরিয়ে একবার এদিকে তাকাত তো দেখতে পেত তার পরিমলদার চেহারা কত বদলে গেছে। রাত ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সে নূতন মানুষ হয়ে গেছে।

তাই। পরিমল এখন নিশ্চিন্ত নির্ভয়। আর তার হেরে যাবার ভয় নেই। কাল সকালে বিষ্ণুপুরের মাঠে সেই নির্জন গাছতলার ছবিটা এখনও দুঃস্বপ্নের মতন তার মনে জেগে আছে। এক ফোঁটা মেয়ের কাছে সে হেরে গিয়েছিল। আর সেই গ্লানি চাপতে কত অসংযত

অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল সে। যেন ফুলটাকে আমি বুঝতে পারছি না, চিনতে পারছি না, তাই নখ বসিয়ে চিরে চিরে দেখতে হবে ভিতরটা কেমন, এই? কিন্তু তা না হয় ভিতর দেখল, কিন্তু শতবার নখ দিয়ে চিরে কী মুঠোয় নিয়ে চটকালেও যে জিনিস বোঝা যায় না চেনা যায় না তার কী হল? ফুলের রঙ গন্ধ? তাও বোঝা যায়। চোখ আছে। চোখ দিয়ে রঙ বিচার করা যায়, নাক দিয়ে গন্ধ পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু তার লাবণ্য, কমনীয়তা, তার নারীত্ব?

এ জিনিস হাতের মুঠোয় নিয়ে জয় করা যায় কি? তখন পরিমল ভয় পেয়েছে, হতাশ হয়েছে, আর এক সেকেন্ড গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস পায়নি, নিলয়কে খোঁজবার নাম করে মাঠে মাঠে ছুটে বেড়িয়েছে। বুলাও পিছনে ছুটছিল। স্বাভাবিক। সে-ও ভয় পেয়েছিল লজ্জা পেয়েছিল। অথচ কিছুক্ষণ আগেও এসব জিনিসের নামগন্ধও সে জানত না। নিজের ভয় ও লজ্জা পরিমল তার মধ্যে সংক্রমিত করেছিল। কিছুতেই সে স্বাভাবিক হতে পারছিল না। বুলাও না।

মাথার ওপর সূর্য জ্বলছিল। ভিতরে অনুশোচনা, হতাশার কান্না। হঠাৎ একটা বন দেখতে পেল তারা। কাঁটার ভিতর হাত ঢুকিয়ে পরিমল ফুল তুলল। সেই ফুল দিয়ে বুলাকে সাজাল। বুলা খুশি হল। পরিমল পরিতৃপ্ত হল। এভাবে ফুল নিয়ে মেতে থেকে একটু আগের ভয়ংকর অপ্রীতিকর ঘটনাটা দুজন ভুলে থাকতে চেষ্টা করল; কিন্তু কতক্ষণ? বন থেকে বেরোবার পর আবার সেই দিগন্ত বিসারী প্রান্তরের অবিচ্ছিন্ন ঘন রৌদ্র ও অপার নৈঃশব্দ্য হাঁ করে দুজনকে গিলতে এল। কড়িগাছের চেহারাটা মনে পড়তে পরিমলের কেমন বমি আসছিল, দূর থেকে নিলয় সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে না পেলে কিছুতেই গাছটার কাছে সে ফিরে যেতে পারত না। বুলাও না। পরিমল লক্ষ্য করছিল বুলা বার বার সেদিক থেকে চোখটা ফিরিয়ে নিচ্ছিল। বলতে কী, বেতঝোপের কাছে আধবেঁকা গাছটাকে একটা কুৎসিত প্রশ্ন চিহ্নের মতন মনে হচ্ছিল। যেন অনন্তকাল ধরে ওটা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। আর থেকে থেকে মেঠো হাওয়া সঙ্গে গলা মিলিয়ে হো হো করে কদর্য হাসি হাসছে।

আর তারা সেখানে দেরি করেনি। যেন যত শিগগির সম্ভব সর্ষেফুল বোঝাই থমথমে জায়গাটা ছেড়ে চলে যাওয়া যায়। নিলয়কে নিয়ে তখনি তারা মাধবপুরের রাস্তা ধরেছে। পরিমল তখন থেকেই কথাটা চিন্তা করছিল। আবার এ-ও আশঙ্কা করছিল, বুলা রাজি হবে না। নিলয় ও সে কলকাতা ফিরে যাবে আর পরিমল এখানে থেকে যাবে এ প্রস্তাব বুলা কিছুতেই শুনবে না। কেননা তা হলে তো বোঝা গেল পরাজয়টা পরিমলের মধ্যে শিকড় গেড়েছে, লজ্জা ভয় কাটিয়ে ওঠা কোনোদিন আর তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং কোনোদিন হয়তো বুলাদের কাছে তার ফিরে যাওয়া হবে না। তা হলে যে বুলাও সারা জীবন ভুগবে। তার মধ্যে যে ভয় ত্রাস হতাশা ও গ্লানি সংক্রামিত হয়েছিল সেগুলি চিরদিনের মতন বেঁচে থেকে তাকে পীড়ন করবে। আর সে স্বাভাবিক হতে পারবে না। ভেবে সে কেঁদে ফেলেছিল। নিলয়ের সঙ্গে তার ফেরা হবে না, পরিমলের সঙ্গে হৃদয়পুর যাবার জন্য জিদ ধরল।

যাই হোক, ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলতে হবে, মাধবপুরের মন্দির থেকে বেরোবার মুখেই অমূল্যকে পেয়েছিল পরিমল। ছেলেটির চোখ দেখে সে বুঝতে পেরেছিল আর তার ভয়

নেই। বিপদ কেটে গেছে। দুর্যোগের ঘনঘটা কেটে গিয়ে অমল ধবল জ্যোৎস্নায় আকাশ পৃথিবী ভরে উঠল। পরিমল পুলকিত হল। কিন্তু তখনই আনন্দটা প্রকাশ করল না সে। সংযত হয়ে রইল। বুলার জন্য অপেক্ষা করল। আগে সে তাকে দেখুক চিনুক বুঝুক। অমূল্যকে দেখা মাত্র যে বুলা আনন্দে ফেটে পড়বে এ তো জানা কথা। পরিমল জানত। আশ্বিনের রৌদ্রে গাছের ডালিম ফেটে চৌচির হয়ে মুক্তার মতন লাল দানা ভিতর থেকে ঝিকিয়ে উঠতে দেখেছে সে।

সেই হাসি এখন বুলার চোখে মুখে। তাই পরিমল নিঃশঙ্কচিত্তে হাঁটতে পারছে, এগোতে পারছে। তাকে এগিয়ে যেতেই হবে। বিশেষ এতটা পথ বুলা তার সঙ্গে এসেছে। আর তো তার পিছন ফেরার উপায় নেই। মনে আছে, বাড়ি এসে প্রথম দিন ঘরে ঢুকেই সে তার টেবিলে গোলাপ দেখেছিল। জলের অভাবে দুদিন পর সেই গোলাপের তোড়া শুকিয়ে গিয়েছিল। পরিমল গ্রাহ্য করেনি। কেননা, শুকিয়ে ঝরে পড়ার জন্যই পরিতোষ ছুরি দিয়ে বাগান থেকে ডালসুদ্ধ ফুলগুলি কেটে নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু এই ফুল শুকিয়ে গেলে পরিমল বাঁচবে কেমন করে! তার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে।

এই জন্যই অমূল্যকে সঙ্গে আনা। অমূল্য বর্ম হয়ে তাকে রক্ষা করছে। বুলাকেও। অমূল্যর পাশে তার বয়সের মেয়েটিকে মনে হচ্ছিল এক ফালি জ্যোৎস্না। বুলার পাশে ঠিক তার বয়সের ছেলেটিকে দেখাচ্ছিল এক ঝলক রৌদ্র। জ্যোৎস্না ও রৌদ্র পাশাপাশি হয়ে মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটছে। আর তাই দেখতে দেখতে পরিমল অগ্রসর হচ্ছে। এই সুখের বুঝি তুলনা হয় না। এভাবে অনন্তকাল ধরে সে হাঁটতে পাবে। তারা আগে, সে পিছনে।

একসময় তারা স্থির হয়ে দাঁড়াল। ঘাড় ঘুরিয়ে পরিমলকে দেখল। পরিমল হাসল।

'কী হল? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?'

'আপনার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।'

'মোটেই না, মোটেই না। দিব্যি হাঁটছি তো, তোমরা গল্প করতে করতে চলছিলে, তাই দেখে দেখে আমি বেশ এগোতে পারছি।'

যেন দুজনকে গল্প করে আগে আগে চলতে না দেখলে আরো অনেক বেশি পিছনে পড়ে থাকত সে। হয়তো কোথাও বসে পড়ত। তাই কী বলতে চাইছিল পরিমল?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বুলা একটু যেন কি ভাবল।

'আপনার কিন্তু চা খাওয়া হয়নি, পরিমলদা।' এতক্ষণ পর কথাটা তার মনে পড়েছে. অমূল্যদের বাড়িতে চায়ের ব্যবস্থা ছিল না।

'আপনি কি এখন চা খাবেন?' অমূল্য সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল।

'এখানে চা পাবে কোথায়!' পরিমলের হাসির মধ্যে কিছুটা হতাশা ফুটল।

'কেন, ঐ যে দূরে ক'টা টিনের চালা দেখা যাচ্ছে, ওটা নফরগঞ্জের বাজার, আমরা এখন নফরগঞ্জের ওপর দিয়ে চলেছি। ওখানে চা পাওয়া যাবে।'

'তাই ভালো, চলুন পরিমলদা, চা না খেয়ে হাঁটতে আপনার কষ্ট হবে।' অমূল্য যেদিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাচ্ছিল বুলা সেদিকে তাকাল। 'খুব একটা দূরে নয় বাজার, মনে হচ্ছে।' অস্ফুট গলায় বলল সে।

'না, না।' অমূল্য উৎসাহে ঘাড় নাড়ল। 'ওদিকের ওই মাঠটা পার হলেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাব—মাঠ কোনাকোনি হেঁটে গেলে কতক্ষণ আর!'

পরিমল আপত্তি করল না। এবার তিনজন একসঙ্গে হাঁটছিল। 'তা ছাড়া, আর আধ ঘণ্টা তিনপো ঘণ্টার মধ্যেই আমরা হৃদয়পুর পৌঁছে যাচ্ছি।' অমূল্য আড়চোখে পরিমলকে দেখল। 'এখন ক'টা বাজে, দাদা?'

পরিমল চোখ তুলে সূর্যের দিকে তাকাল। 'তা ন'টা সাড়ে ন'টা হবে।' অমূল্য রাত থেকেই তাকে 'দাদা' ডাকতে আরম্ভ করেছে। বুলার মতন 'পরিমলদা' ডাকলে জিনিসটা আরও বেশি সুন্দর হত কিনা, সে বুঝতে পারছিল না।

'তা হলে তো দেখা যাচ্ছে, দুপুরের মধ্যেই আমাদের হৃদয়পুর দেখা শেষ হয়ে যাবে. ওবেলা কি আমরা কলকাতা ফিরে যাব, পরিমলদা?' যেন বুলা হঠাৎ চিন্তিত হল, যেন একখণ্ড মেঘ তার মুখের ওপর থমকে দাঁড়াল।

পরিমল হাসল। 'সেটা অমূল্য ঠিক করবে—সে যদি আরো দূরে যেতে চায়—' আর কিছু বলল না পরিমল। বুলা তাতেই খুশি হল, উজ্জ্বল হল, মুখের ওপর থেকে মেঘের ছায়াটা সরে গেল, গর্বের দৃষ্টি নিয়ে সে অমূল্যকে দেখছিল। অমূল্য কথা বলছিল না।

তিনজন হাঁটতে লাগল।

॥ ৫০ ॥

পৃথিবীর আহ্নিক গতির এতটুকু ব্যত্যয় ঘটেনি. নিয়মিত ঘুরছিল সেটা। আর তার কোথায় কী ঘটছিল না ঘটছিল প্রাজ্ঞ ঋষির মতন স্থির অবিচল দৃষ্টি মেলে ধরে কার্তিকের নীল নির্মেঘ প্রকাণ্ড আকাশটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

যেমন নফরগঞ্জের বাজারে চমৎকার চায়ের দোকানটিতে বসে পরিমল চা খাচ্ছিল আর আরামে আমেজে তার চোখ দুটো এক সময় বুজে আসছিল। খড়ের চালাঘর। তিন দিক খোলা। তাই ঠাণ্ডা ছায়া ও মাঠের ফুরফুরে হাওয়া উপভোগ করতে পরিমলের কোনো বাধা ছিল না। গাঁয়ের দোকান তো এমনটি হবে। ভিড় থাকবে না কলরব থাকবে না, কোনোরকম জাঁক এখানে তুমি আশা করতে পার না। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ, ওধারে উনুনে চায়ের জল ফুটছে, এধারে কাচ লাগানো একটা টিনে ইট রঙের কখানা টালি বিস্কুট, একটা টিনে মুড়ি ও আর একটা টিনে কিছু ছোলাভাজা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। চেয়ার টেবিল এখানে বেমানান ঠেকত। পরিমল একটা আমকাঠের তক্তার ওপর বসে চা খাচ্ছিল। দু পাশে আড়াআড়ি করে বাঁশ পুঁতে তার ওপর তক্তাটা বিছিয়ে চমৎকার বেঞ্চি করা হয়েছে। তাই তো, মাথার ওপর ইলেকট্রিক পাখা ঘুরছে কী তারস্বরে রেডিওগ্রাম বাজছে দেখলে পরিমল এখানে বসে চা খেয়ে এমন তৃপ্তি পেত না। মেঠো হাওয়ার চেয়ে মিষ্টি আর কী আছে, রেডিওগ্রামের গান বাজনার চেয়ে পাখির কিচিরমিচির [illegible] অনেক [illegible] উপভোগ্য। তার পায়ের কাছে ঘুরে ঘুরে দুটো চড়ুই ও একটা শালিক খুঁটে খুঁটে মুড়ি বিস্কুটের গুঁড়ো খাচ্ছে। তারা ফুরুৎ করে উড়ে যাচ্ছে, আবার এসে দোকানে ঢুকছে। যেন কারা মুড়ি-বিস্কুট সহযোগে চা খেয়ে গেছে, কিছু গুঁড়োটুড়ো তখনও মাটিতে পড়ে ছিল। বাজার বলতে ঠিক এই ধরনের

আরও দু চারখানা চালাঘর। আম-জামের ছায়া মাথায় নিয়ে এপাশে ওপাশে দাঁড়িয়ে। একটা দোকানে ডাল নুন তেল হলুদ লঙ্কা বিক্রি হচ্ছে মনে হয়। আর একটা চালাঘর যে মাটির হাঁড়ি কলসি গামলা ইত্যাদিতে বোঝাই হয়ে আছে পরিমল এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। বুলা চা খেয়েছে। অমূল্য খায়নি। চা খাওয়া তার অভ্যাস নেই। বুলা কিন্তু একচুমুকে চা-টুকু গিলেই উঠে পড়েছে। অমূল্যর সঙ্গে বাজার দেখতে বেরিয়েছে। 'আপনি ততক্ষণ এখানে বিশ্রাম করুন, আমরা ওদিকটা একটু ঘুরে দেখে আসি।' যাবার আগে অমূল্য বলে গেছে। পরিমল সানন্দে সম্মতি দিয়েছে। তাই তো, তার এখানে চা খেতে আসা মানেই যে বিশ্রাম করা, ঠাণ্ডা ছায়ায় একটু সময় বসে যাওয়া, অমূল্য যদি এই ভেবে বুলাকে এটা ওটা দেখাতে নিয়ে গিয়ে থাকে তো পরিমল তাকে দোষ দেবে নাকি। একটুও না। তাকেও না বুলাকেও না। এই অঞ্চলের ছেলে, এখানকার পথঘাট হাটবাজার সম্পর্কে অমূল্য যত ওয়াকিবহাল সেই তুলনায় পরিমল প্রায় কিছুই জানে না। তা ছাড়া মূল জায়গা অর্থাৎ হৃদয়পুর দেখতে তো তিনজন একসঙ্গেই যাচ্ছে। এখন পথ চলতে চলতে পথের পাশের ছোটোখাটো জিনিসগুলি দেখতে যদি বুলার ইচ্ছা হয় তো অমূল্য থাকতে পরিমলদাকে টানাটানি করে কষ্ট দেওয়া কেন। তার চেয়ে পরিমলদা চুপচাপ বসে খাঁটি গোরুর দুধ ও আখি গুড় দিয়ে তৈরি চমৎকার চা-টুকু তারিয়ে তারিয়ে খাক। মনে মনে অমূল্য ও বুলার সুবিবেচনার প্রশংসা করে পরিমল ভাঁড়ের বাকি পানীয়টুকু নিঃশেষ করে পরিতৃপ্তির ঘন ঢেকুর তুলল। তা ছাড়া সে চিন্তা করল, অমূল্যর মতন বুলারও তো চা খাওয়ার অভ্যাস ছিল না। চশমা কিনতে বেরিয়ে চা না খেয়ে সে ডাব খেয়েছিল। ইদানিং পরিমলদার সঙ্গে ঘুরে চায়ের অভ্যাস হয়েছিল। এখন বুঝি নিয়মরক্ষার খাতিরে যা-হোক একটুখানি গলায় ঢেলে অমূল্যর সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

অমূল্য এসে গেছে, কাজেই অভ্যাসটা যে চট করে ছেড়ে দেবে পরিমল বুঝতে পারল। এই চিন্তাটাও তাকে শান্তি দিল। অমূল্যর অভ্যাসগুলি তো বুলা অনুসরণ করবে। লতা যেমন আলোর দিকে গলা বাড়ায় মুখ বাড়ায়, অন্ধকারে কুঁকড়ে থাকে।

বুলার চোখেমুখে এখন আলো ঝলমল করছে। অমূল্য এসে রাতারাতি এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। বুলাকে দেখে মনে হচ্ছে ফুলের সবকটা পাপড়ি খুলে গেছে। লাবণ্য ও গরিমা নিয়ে বসন্তের বাতাসে ফুল যেমন থরথর করে কাঁপে, সেই কম্পন শিহরণ বুলার মধ্যে কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছে পরিমল। আমকাঠের বেঞ্চির ওপর পা ঝুলিয়ে বসে দুজনকে সে দেখতে পাচ্ছিল। হাঁড়ি কলসির দোকানটার সামনে তারা একটু সময় দাঁড়িয়েছিল, তারপর এগিয়ে গেছে মুদি দোকানের সামনে, তারপর বুঝি ছুটে গেছে জামাকাপড়ের দোকান দেখতে, কিন্তু কোথাও বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি। দোকানপাট দেখতে তাদের তেমন উৎসাহ থাকবে কেন, তবু যা-হোক দু-চারটি মানুষের আনাগোনা আছে যে ওখানে। তারা কথা বলছিল, হাসছিল, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আশ্চর্য সুন্দর দুটি মানুষকে দেখছিল, তাই দুজন পালিয়ে গেল দূরে। ওটা বুঝি অক্ষয়বট, ঘাসের ওপর এতটা ছায়া ছড়িয়ে প্রকাণ্ড গাছটা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, কত শাখা প্রশাখা ঝুরি শিকড়, আর পাতার সমারোহটা দেখবার মতন। ওই গাছতলায় দাঁড়ালে যে পাতার সরসর শব্দ ও অসংখ্য পাখির কিচিরমিচির ছাড়া অন্য কিছু শোনা যাবে না

পরিমল বেশ অনুমান করতে পারছিল। তার ইচ্ছা করছিল সেখানে ছুটে যায়। কিন্তু লোভ সংবরণ করল। অমূল্য ও বুলা হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। নির্জনতা উপভোগ করছে। অবাক হয়ে বটের লম্বা ঝুরি ও মোটা শিকড়গুলি দেখছে। হয়তো কান পেতে পাতার শব্দ পাখির ডাক শুনছে। পরিমল এখন সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে তাদের তন্ময়তা ভেঙে যাবে, নির্জনতাটা আর তেমন করে তারা উপভোগ করতে পারবে না। তাই তো, নির্জনতা তো সে-ও চেয়েছিল, পেয়েছিল। কিন্তু সব দিক থেকে জিনিসটা যেন কেমন হয়ে গেল। অলক্ষুণে কড়িগাছটার কথা চিন্তা করলে এখনও তার বুকের ভিতর ধড়াস করে ওঠে।

এ-ও সেই গাছতলা। ঘন ছায়ায় হাত ধরাধরি করে পরম নির্ভয়ে দুটিতে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের আকাশ পৃথিবী আজও রৌদ্রে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওখানে আগুনের আঁচটি লাগছে না। তারা টের পাচ্ছে না, আকাশে বাতাসে এখন কত জ্বালা কত তৃষ্ণা!

অথচ পরিমলের গাছতলা পুড়ে ছাই হয়ে যেতে চেয়েছিল। কেমন করে আগুন ধরে গিয়েছিল। দাউ দাউ করে উঠেছিল লেলিহান শিখা। ভয় পেয়ে পরিমল চিৎকার করে উঠল, বুলা কেঁদে ফেলল, এখন সেই ছায়া কত স্নিগ্ধ রম্য উপাদেয়। এক জোড়া লাল ফড়িং দুজনের মাথার ওপর নেচে নেচে ঘুরছে। একটা কাঠবিড়াল ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের লেশমাত্র নেই কারো মনে। বুলা ও অমূল্য আর একটু ঘুরে গেছে। গাছের মোটা গুঁড়িটার জন্য দুজনকে আর দেখা গেল না। পরিমল আর একটু চায়ের কথা বলল। দুটিতে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। পরে তিনজন একসঙ্গে আবার হৃদয়পুরের রাস্তা ধরবে।

তাই তো, বেলা দশটায় নফরগঞ্জের বাজারে খড়ের চালার ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে পরিমল যখন পরম তৃপ্তির সঙ্গে চা খাচ্ছিল ঠিক সেই সময়টায় একটি মানুষ মাথায় চনচনে রোদ নিয়ে বুকে তৃষ্ণা নিয়ে নারকেলডাঙ্গার রাস্তাটা ধরে ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁটছিল। বিশাখা। মুখখানা শুকিয়ে গেছে। চোখ দুটো বসে গেছে। মাথার চুল মলিন বিস্রস্ত। দুদিন আগেও রাস্তার মানুষ অন্তত তিনবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে না দেখে শান্তি পেত না। গোঁসাইপাড়া বস্তির অটল দত্তর ছেলে প্রদোষ যেমন প্রথম দিন বিশাখাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল বিস্মিত হয়েছিল, 'স্বপনচারিণী' 'লাবণ্যের নদী' ইত্যাদি অনেক কিছু মনে মনে বলে ফেলেছিল, তেমনি আজ পর্যন্ত পথচারী কত মানুষ যে বিশাখাকে রাস্তায় এভাবে চলতে দেখে অভিভূত হয়েছে, অবাক হয়েছে এবং তার রূপলাবণ্য তার অপূর্ব দেহভঙ্গিমার বর্ণনা করতে গিয়ে কত কী উপমা উদাহরণ তাদের মনে এসেছে তা বুঝি লিখে শেষ করা যায় না।

কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে বিশাখাকে দেখলে তারা বিশ্বাস করত না এই মানুষ সেই মানুষ। এই দুটো দিনের মধ্যে তার শরীর এত ভেঙে গেছে, চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। চেনা যায় না। অবশ্য তারা কেউ জানত না বিশাখার শরীর এখন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। বাইরের রৌদ্রের উত্তাপ মানুষকে আর কত পোড়াতে পারে জ্বালাতে পারে। ভিতরের তাপ নিয়ে বিশাখা জ্বলে জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে। অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। চোখ মেলে তাকাতে পারে না এমন। কিন্তু তবু পথঘাট দেখে তাকে চলতে হচ্ছে, গাড়ি-ঘোড়ার ওপর নজর রেখে সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। সেই কত দূর থেকে হাঁটতে আরম্ভ করেছে সে, নারকেলডাঙ্গার রাস্তাটা তো আর

একটুখানি নয়। তাছাড়া অসুবিধা, পুরোনো রাস্তার দুধারে পর পর নম্বর মিলিয়ে যেমন বাড়ির সারি দাঁড়িয়ে আছে, একটা নম্বর দেখলে আর একটা নম্বর কোথায় হবে অনুমান করা শক্ত হয় না, এখানে তা হবার উপায় নেই। ঘরদুয়ার ভেঙে সবে ডেভলাপ করা হয়েছে জায়গাটা। নূতন নূতন প্লট নিয়ে বাড়ি তৈরি হচ্ছে। একটা বাড়ি যদি এখানে চোখে পড়ল তো আর একটা বাড়ি সেই দূরে, হয়তো আধ মাইল হেঁটে গেলে তবে তোমার চোখে পড়বে। কাজেই বাড়ির নম্বর জেনেও কিছু লাভ নেই। জগমোহন ডাক্তারের বাড়ির নম্বরটা অবশ্য বিশাখা নিজেই টেলিফোন গাইড দেখে খুঁজে বার করেছে। গিরিজা বা রীণা কোনোদিন তাকে নম্বরটা বলতে চায়নি। কিন্তু তখনও কি আর বিশাখা জানত না, যার নামে টেলিফোন আছে তাঁর বাড়ির নম্বর রাস্তার নামটাও পাশে লেখা থাকবে। কিন্তু সেদিন ইচ্ছা করে যেন বিশাখা টেলিফোন গাইডের পাতা ওল্টায়নি। প্রয়োজন ছিল না। সে তো আর ডাক্তারের বাড়ি যাচ্ছে না। বরং ডাক্তারের ছেলে যখন রোজ বালিগঞ্জে পড়াতে যায়, বালিগঞ্জের রাস্তায় হয়তো মানুষটাকে দেখা যেতেও পারে। তাই তো দেখেছিল বিশাখা। কিন্তু এভাবে দূর থেকে মানুষটাকে না দেখলেও কি সে অক্ষয় উকিলের বাড়ি যেত, যেত না, কোনোদিন যাবেও না। কাল সারাদিন অন্তত চারবার গোঁসাইপাড়া বস্তির রাস্তাটায় ঘুরে এসেছে সে, কিন্তু বস্তির কাছে যায়নি। দেখতে হয় দূর থেকেই তাকে দেখবে। আগের দিন যেমন দেখেছিল। কিন্তু কোথায় সেই মানুষ। সকাল গেল, দুপুর গেল, কোনদিক দিয়ে বিকালটাও কেটে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল। বাচ্চাগুলি জ্বালাতন করবে ভয়ে পার্কে ঢোকেনি।

চুপ করে ওদিকের রাস্তার পাশে একটা বাদাম গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু কোথায় পরিমল! বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল বিশাখার। বড়ো আশা করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। আগের দিন যদি তাকে না দেখতে তো এতটা অস্থির বুঝি সে হত না। কদিন ধরে তো বালিগঞ্জের পথে পথে ঘুরছিল, মানুষটাকে দেখেনি একরকম ভালোই ছিল, কিন্তু দেখে ফেলার পর এ কী যন্ত্রণা আরম্ভ হল!

রাত নটা পর্যন্ত বাদাম গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে ছিল সে। পা দুটো টনটন করছিল। যেন তখনই গায়ে জ্বরটা এল। রীনার সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু রাগ করে রীনা দিদিকে পৌঁছে দিতে কাল আর ডাফ্ স্ট্রীট আসেনি। সেখান থেকেই ঝগড়া করে বাড়ি ফিরে গেছে। যাবার সময় শাসিয়ে গেছে, আর সে বিশাখার খোঁজ নেবে না, বিশাখা বাঁচুক মরুক, রীনা ভুল করেও তাকে দেখতে যাবে না। অনেক করেছে সে বোনের জন্য, কিন্তু এখন দেখছে পাগলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গেলে তাকেও পাগল হতে হবে। ছি ছি, বিশাখাকে বালিগঞ্জের মানুষ ভুলে যেতে পারে, কিন্তু রীনাকে সবাই জানে চেনে, এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রোজ সে ঝগড়াও করতে পারবে না আর পাগলকে ধরে বেঁধে ঘরে নিয়ে যেতে তার পিছনে ধাওয়াও করতে পারবে না। লজ্জায় তার মাথা কাটা যায়। আর ডাফ্ স্ট্রীটের বাড়িতেও বিশাখাকে যখন আটকে রাখ যাবে না, সেখানে সে ঝিয়ের সঙ্গে মারামারি করবে, বাধা দিতে গেলে পাশের ঘরের মানুষকে গালিগালাজ করবে—তার চেয়ে পাগল নিজের খুশিমতন চলুক, ট্রামবাসের নীচে চাপা পড়ে মরুক। তাছাড়া যেমন খারাপ শরীর নিয়ে রাতদিন বাইরে ঘোরাঘুরি—রাস্তায়ই তার মৃত্যু, আর যদি না-ও মরে পাগলামিটা দিন দিন যেমন বেড়ে

যাচ্ছে, এই বালিগঞ্জের মানুষই পুলিশে খবর দিয়ে তাকে পাগলাগারদে পুরবার ব্যবস্থা করবে। সেদিন যদি বিশাখা ঠাণ্ডা হয়। এবং রীনারও হাড় জুড়োবে।

রেগে গিয়ে এত কথা বলেছিল রীনা কাল।

কিন্তু বিশাখা একটা কথাও বলেনি। অন্যদিন সে ছোটো বোনকে বুঝিয়েছে সান্ত্বনা দিয়েছে, রীনা মিছিমিছি তার দিদিকে নিয়ে এত সব আশঙ্কা করছে। রাস্তায় চলবার সময়ে বিশাখা যথেষ্ট সতর্ক হয়ে পা ফেলে, গাড়ি ঘোড়ার দিকে তার নজর আছে, তা ছাড়া শরীরটা একটু ভালো বলেই তো বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, আর রীনা যে পাগলামির ভয় করছে তা-ও তার কল্পনার বাড়াবাড়ি কেননা বিশাখা কোনোদিনই এমন কাজ করবে না যা দেখে লোকে হাসবে, কী সবাই মিলে ধরে বেঁধে তাকে পাগলাগারদে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। আর রোজ রীনা দিদিকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য এমন ছুটে ছুটে আসছেই বা কেন? বিশাখা ঠিকই এক সময়ে বাড়ি ফিরে যাবে, রাস্তায় পার্কে সে কিছু রাত কাটাবে না। কাল বিশাখা চুপ করে ছিল, কথা বলতে তার ইচ্ছা করছিল না। শরীর তো খারাপ লাগছিলই মনটাও যেন ছাই হয়ে গিয়েছিল। রীনা যা খুশি বলে গেল, বিশাখা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল, তারপর নিজেই একটা ট্যাক্সি ডেকে ডাফ্ স্ট্রীট ফিরে এসেছিল। এগারোটা বেজে গিয়েছিল ঘরে ফিরতে। রাত্রে ঘুম হয়নি। কেবল বিছানায় ছটফট করেছে। একদিকে জ্বরের ঘোর, অন্যদিকে পরিমলকে দেখতে না পাওয়ার হতাশা। সে যাই হোক, আজ ভোরবেলা আবার রীনা গিয়ে হাজির। বিশাখা একটু অবাক হয়েছিল। না, মুখে সে যা-ই বলুক, ভিতরে রাগ অভিমান যতই পোষণ করুক, দিদির বাসায় যে রীনা না গিয়ে পারবে না বিশাখা সেই সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু অবাক হয়েছিল সে, এত সকালে তো রীনা কোনোদিন ডাফ্ স্ট্রীট যায় না। কিন্তু দিদিকে যে একটা অত্যন্ত মূল্যবান খবর বলতে অন্ধকার থাকতে সে ছুটে যাবে বিশাখা কেমন করে জানত।

খবরটা শুনে প্রথমটায় সে কেমন থতমত খেয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণে হি-হি করে হেসে ফেলেছিল। অর্থাৎ বিশাখা যাতে আর বালিগঞ্জ ছুটে না যায় তাই বুদ্ধি করে রীনা এমন চমৎকার একটা খবর তৈরি করে দিদিকে উপহার দিতে এসেছে। রীনা গম্ভীর হয়ে উত্তর করেছিল, বেশ তো যদি তার কথায় বিশাখার বিশ্বাস না হয় তো বালিগঞ্জ গিয়ে ও-পাড়ার যে কোনো একজনকে সে জিজ্ঞেস করুক, তবেই সব জানতে পারবে। এখনি চলে যাক, রাত্রে হয়তো দু চারজনই শুধু খবরটা জেনেছিল, কিন্তু আজ সকালের মধ্যে বালিগঞ্জের ঘরে ঘরে সে খবর পৌঁছে গেছে।

রীনা আর দাঁড়ায়নি। তখনি বেরিয়ে গেছে।

পাথরের মতন স্থির স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বিশাখা কথাটা চিন্তা করছিল। তাই তো, এ জিনিস যে সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। এ কেমন করে সম্ভব। পৃথিবীর যে-কোনো মানুষ এ-কাজ করতে পারে, কিন্তু পরিমল—

চোখের কোণায় জল দাঁড়িয়েছিল বিশাখার। রাস্তায় ছুটে গিয়ে চিৎকার করে রীনাকে ডেকে তার বলতে ইচ্ছা করছিল, না না, এভাবে তুই তার সম্পর্কে আমার মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পারবি না রীনা, কিছুতেই পারবি না, এ তোদের ষড়যন্ত্র, তোর এবং গিরিজার।

নিশ্চয় গিরিজাই এই কূটবুদ্ধি তোকে দিয়েছে। চেষ্টাচরিত্র করে পরিমলকে যখন কিছুতেই আমার সঙ্গে দেখা করানো তোদের ক্ষমতায় কুলোল না তখন তোরা মাথা খাটিয়ে ছাত্রী ও মাষ্টারকে দিয়ে একটা অপূর্ব মিথ্যা গল্প তৈরি করে তারপর আমাকে শোনাতে এসেছিলি। যাতে ঘৃণায় ধিক্কারে আমার মন পূর্ণ হয়ে ওঠে, যাতে তাকে দেখতে আর আমি বালিগঞ্জ ছুটে না যাই, কোনোদিন আর পরিমল নামটাও যাতে উচ্চারণ না করি, এই? কিন্তু তোরা শুনে রাখ, আমি তাকে যত ভালো চিনেছিলাম জেনেছিলাম পৃথিবীর আর কেউ তাকে চিনতে পারেনি বুঝতে পারেনি। না, একজন পেরেছিল, পরিতোষ—বেশ তো এই গল্প তোরা পরিতোষকে গিয়ে শোনা—সে তোদের মুখে থুথু ছিটিয়ে দেবে। হুঁ, পরিমলের নামে এই মিথ্যা কলঙ্ক কিছুতেই সে সহ্য করবে না—খবরটা বলামাত্র সে তোদের গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেবে, তোকে এবং গিরিজাকেও, হোক না সে পরিতোষের বন্ধু। বন্ধুকেও সে তখন ক্ষমা করবে না এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

তখন আর পাথরের মতন কঠিন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি বিশাখা। বুকের ভিতর ভূমিকম্পের আলোড়ন চলছিল তার, উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল। জামাকাপড় বদলাবার কথা একবারও তার মনে হয়নি, যেমনটি গায়ে ছিল তাই নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল, এখনি সে বালিগঞ্জ চলে যাবে কিনা, সরাসরি গোঁসাইপাড়া বস্তিতে গিয়ে অক্ষয়বাবুর বাড়ি খোঁজ নিলে কেমন হয়—পরিমল সত্যি তাদের মেয়েকে নিয়ে বাইরে কোথাও গিয়েছে কিনা, কোথায় গিয়েছে, কাল তাদের ফিরে আসার কথা ছিল, ফিরল না কেন, না কি সবটা খবরটাই মিথ্যা? মেয়ে বাড়িতেই আছে, মাস্টারের সঙ্গে কোথাও সে বেরোয়নি?

কিন্তু চিন্তা করতে গিয়ে বিশাখা কেমন যেন থমকে গেল। তাই তো, সে যে তাদের মেয়ের এবং সেই সঙ্গে মাস্টারের খোঁজ নিতে যাচ্ছে—সে কে, কোথা থেকে এসেছে, জগমোহন ডাক্তারের ছেলেকে সে চেনে কেমন করে—যদি মলয়ের বাবা বিশাখাকে প্রশ্ন করেন? করা খুবই স্বাভাবিক। অক্ষয়বাবু কোনোদিন তাকে দেখেছিলেন বা তাকে চিনতেন বলে বিশাখা মনে করতে পারল না বা মলয়ের ছোটো ভাইয়েরাও তাকে কোনোদিন দেখেছিল কিনা, এবং সেদিন তারা কত বড়ো ছিল সেসব কিছুই আজ আর তার মনে নেই। তাই তো, ও বাড়ির মানুষ তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে কী উত্তর দেবে ভেবে বিশাখা রীতিমতো অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। তা ছাড়া একটা সঙ্গত পরিচয় না দিয়েই বা সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে কেমন করে। পরিচয় না দিলে তাদের মনে একটা কৌতূহল থেকে যাবে, একটু অন্যরকম সন্দেহ সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র না—কই, পরিমল তো কোনোদিন তার এমন কোন আত্মীয়া বা বান্ধবীর কথা তাদের কাছে এতদিন বলেনি। এটা খুবই স্বাভাবিক, আজ জেল থেকে বেরিয়ে অক্ষয়বাবুর বাড়ি গিয়ে পরিমল হঠাৎ বিশাখার কথা বলবে না, বলার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। মলয় বেঁচে থাকলে অন্য জিনিস হত, মলয়ের সঙ্গে বিশাখার ঘনিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু মলয়ের বাবা-মার কাছে কী ভাইবোনদের কাছে পরিমল—

কাজেই এভাবে আজ ওবাড়ি গিয়ে তার হাজির হওয়ার ফলটা দাঁড়াবে অন্য রকম। পরিমল সম্পর্কে তাঁদের ধারণা বদলাতে পারে—তারা কী ভাববে না ভাববে বিশাখা তলিয়ে

দেখতে চায় না, সে শুধু দেখবে, তাদের মনে সন্দেহের এতটুকু চিড় না লাগে, ওবাড়ির মানুষের চোখে পরিমল স্বচ্ছ নির্মল সুন্দর থাকুক এই ইচ্ছা বিশাখার চেয়ে আর কে বেশি অন্তরে পোষণ করে—

কাজেই বিশাখার ওখানে যাওয়া হবে না। আর পরিমল আজ ওবাড়ি গেল কী গেল না দেখতে জানতে সারাদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার ধৈর্যও বিশাখার নেই, হয়তো বিকেল—সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে ওপাড়ার রাস্তায় ঘুরতে হবে, পার্কে গাছতলায় বসে অপেক্ষা করতে হবে—না, এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে সারাদিন কাটানো আজ আর তার পক্ষে সম্ভব নয়, এখনি, এই মুহূর্তে বিশাখা জানতে চাইছে পরিমল কলকাতায় আছে কী বাইরে গেছে—কাল বালিগঞ্জে তাকে সে দেখল না, যদি পরিমল অসুস্থ হয়ে থাকে? কাল যায়নি, আজও হয়তো ছাত্রীকে পড়াতে যাবে না। এটাই সত্য—এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক।

হুট করে বিশাখার মাথায় চিন্তাটা এল। তখনি রাস্তার পাশের একটা দোকানে ঢুকে টেলিফোন গাইডটা চেয়ে নিয়ে খুঁজে খুঁজে সে জগমোহন ডাক্তারের নামটা বার করল। বাড়ির নম্বর রাস্তার নাম পেয়ে গেল। দোকান থেকে বেরিয়ে সে নারকেলডাঙ্গার বাস ধরল।

তাই তো, বিশাখা মরীয়া হয়ে নারকেলডাঙ্গা ছুটে চলেছে। সে জানে, জগমোহন ডাক্তার তাকে দেখলে নাক কুঁচকাবে, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে, পরিতোষ ক্রুদ্ধ হবে, উত্তেজিত হবে, হয়তো দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে চাকর দারোয়ান ডেকে তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে উদ্যত হবে, তবু একবার সেখানে যেতে হবে তাকে। পরিমল বাড়ি আছে কী অন্য কোথাও গেছে, সে সুস্থ কী অসুস্থ তাকে জানতে হবে, দেখতে হবে। না না, তার অপমান লাঞ্ছনা আজ কিছু নয়। সব মাথা পেতে নিতে বিশাখা প্রস্তুত—কিন্তু আর একটি মানুষের দুর্নাম কলঙ্ক কিছুতেই সে সহ্য করবে না। এ জিনিস কিছুতেই সে বিশ্বাস করবে না, 'বুঝলি রীণা', হাতের কাছে রীণাকে পেলে সে আর একবার চিৎকার করে বলত, 'পরিমল দুর্বল নয় ভীরু নয়, চুরি করে লুকিয়ে প্রেম করা কাকে বলে সে জানে না, একটি মেয়েকে সে ছিনিয়ে নেবে জয় করবে—তার জন্য দরকার হলে রক্তপাত ঘটাতে সে দ্বিধা করবে না, অতীতেও করেনি, অত্যন্ত সোচ্চার তার প্রেম, তাই বলে বাপ-মার চোখে ধুলো দিয়ে মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া—অন্য মানুষ হলে বিশ্বাস করতাম, কিন্তু তাকে দিয়ে নয়—আর বার বার তুই কিনা বললি অক্ষয় উকিলের মেয়েকে নিয়ে পরিমল পালিয়ে গেছে, ইলোপ করেছে—ছি ছি—'

বাসটায় অসম্ভব ঝাঁকুনি লাগছিল। এদিকে সমস্ত শরীরে ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা। মাথাটা বুঝি ছিঁড়ে পড়ছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বিশাখা সব যন্ত্রণা ক্লেশ কতক্ষণ সহ্য করে থাকল। বাস থেকে নেমে অনেকখানি হাঁটা। রৌদ্র। চা-টুকু পর্যন্ত ভালো করে খেতে পারেনি। চা নিয়ে বসেছিল, সেই মুহূর্তে রীণা গিয়ে মাথায় বজ্রাঘাত করল। শরীরটা কোনোরকমে টেনে টেনে সরযূধামের গেট্-এর কাছে প্রায় এসে গেল সে। কিন্তু তখন যেন আর তার পা সরছিল না। গেট্-এর মাথায় ফরগেট্-মি-নট্ লতিয়ে দেওয়া হয়েছে, দূর থেকে সে দেখল, দেখে বুঝল এটাই জগমোহন ডাক্তারের বাড়ি। এই লতা-ফুল ডাক্তারের অত্যন্ত প্রিয়। একডালিয়া রোডের বাড়ির গেট্-এর মাথায়ও এই জিনিস ছিল। আশ্চর্য, বাড়িটা বাঁয়ে রেখে রাস্তার

ডান পাশ ধরে একটু একটু করে এগোতে এগোতে বিশাখা চলে গেল সেই কবরখানার কাছে, সরযূধাম পিছনে পড়ে রইল। যেন কিছুতেই তার সাহসে কুলোল না ওবাড়ি ঢুকতে। তার মাথায় একটা অন্য চিন্তা এসে গিয়েছিল তখন। ওখানে তো কেবল জগমোহন ডাক্তার আর পরিতোষ নয়, আর একটি মানুষ আছে, একটি মেয়ে, পরিতোষের স্ত্রী।

তাই ছবিটা অন্যরকম হয়ে বিশাখার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। তাকে তারা অপমান করবে, পরিতোষের স্ত্রী দাঁড়িয়ে দেখবে। আর একটি মেয়ের সামনে অপমানটা বিশাখা যেন সহ্য করতে পারবে না, গায়ে লাগবে।

কবরখানার সামনে দাঁড়িয়ে কথাটা সে ভাবতে লাগল। কী করা যায়। অনেকক্ষণ ভেবে ভেবে আবার সে উল্টোদিকে ঘুরে হাঁটতে আরম্ভ করল। এবার সরযূধাম ডাইনে পড়ে থাকল। এগোতে এগোতে চলে এল সে একটা ছোটো দোকানের সামনে। কানাইয়ের পান সিগারেটের দোকান। এই দোকান থেকে রোজ ডাক্তারের সিগারেট যায় বিশাখার জানবার কথা নয়।

তা হলেও, বিশাখা ভাবল, বাড়ির কাছে দোকান, লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো সে বলতে পারবে, ডাক্তারবাবুর বড়োছেলে বাড়ি আছে কী বাইরে কোথাও গিয়েছে বা এমনও হতে পারে, আজ অথবা কাল পরিমলকে এই রাস্তা দিয়ে সে হেঁটে যেতে দেখেছে—তবেই হয়ে যায়, শুধু এই একটা কথা জানতে পারলেই বিশাখা সন্তুষ্ট হয়—আর কিছু জানবার তার দরকার পড়বে না। নিশ্চিন্ত মনে সে ঘরে ফিরে যায়।

ভাবল সে কথাটা, কিন্তু আশ্চর্য, ভাবতে ভাবতে এক সময় পানের দোকানটাও পার হয়ে গেল। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সাধারণ একটা দোকানির সঙ্গে কথা বলতে তার রুচিতে কেমন বাধল।

তারপর আর কী, রাস্তার দু ধারে আবার ফাঁকা মাঠ, পোড়ো জমি, অথবা নূতন একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে, ট্রাক থেকে চূণ বালি নামানো হচ্ছে, মিস্ত্রীরা কাজ করছে, কুলির দল হই-হই করছে, অথবা কোথাও ছাগল-গোরু চরে বেড়াচ্ছে। বুকটা হু-হু করে উঠল বিশাখার। এতক্ষণ শরীরের যন্ত্রণা ছিল, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছিল, এখন যেন সব বোধ লোপ পেয়ে গেল।

রাস্তার ডান দিকে ছোটো একটা পার্ক। চমৎকার রেলিং ঘেরা। প্রচুর ছায়া আছে ভিতরে। ওখানে বসে একটু জিরিয়ে নিতে পারে সে। চরকির মতন সাদা গেট্টা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিশাখা ভিতরে ঢুকল।

কিন্তু চুপ করে নিরিবিলি বসে থাকবে তার উপায় কী? গাছের ছায়ায় পেরাম্বুলেটার রেখে আয়া দুজন ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে গল্প করছিল। নূতন মানুষ দেখে তারা আস্তে আস্তে বিশাখার কাছে সরে এল। ওদিক থেকে দুটি শিশুর হাত ধরে এক ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়ালেন। যেন ওখানে কী হয়েছে দেখতে, উত্তর কোণা থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল এক বুড়ি ঝি। সঙ্গে আধ ডজন বাচ্চা। একটা ভিড় জমে গেল। সকলের চোখে কৌতূহল, সকলের মুখে একটা-দুটো করে প্রশ্ন ঃ কোথা থেকে এসেছেন, এ পাড়ায় তো আর কোনদিন দেখিনি, কাকে খুঁজছেন, কত নম্বর বাড়ি, ভদ্রলোকের নাম কী, আপনি কোথায় থাকেন, আপনি কি.....

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে বিশাখার চুল, কপাল সিঁথি, তারপর তার শরীর, তারপর তার চোখের

দিকে খর দৃষ্টি হানল তারা। তারপর তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। প্রথমটায় বিশাখা গম্ভীর হয়ে রইল, তারপর অন্য দিকে চোখটা ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করল, তারপর অত্যধিক প্রশ্নের চাপে অল্প একটু হাসল এবং পরমুহূর্তে আবার নীরব থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। 'বুঝতে পারছ দিদি?' বর্ষীয়সীদের মধ্যে একজন আর একজনকে চোখ টিপে প্রশ্ন করছিল। কিন্তু তারা বুঝবার আগে শিশুর দল বুঝে ফেলেছিল। পা দুটো তেতে গিয়েছিল বিশাখার। জুতো জোড়া খুলে রেখেছিল। একটি শিশু নির্ভয়ে একপাটি জুতোর ভিতর পা গলিয়ে দিয়ে খিলখিল করে হাসতে আরম্ভ করল। আর একজন তার আঁচল ধরে টানল, আর একটি শিশু ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এল এতটা চূণ-সুরকি। বিশাখা উঠে আর-একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। শিশুর দল চিৎকার করতে করতে সেখানে ছুটে গেল।

তখন জগমোহন ডাক্তার গাড়ি নিয়ে কোথা থেকে ফিরছিলেন। তিনি বুঝতেই পারলেন না, একটা পাগল মেয়েকে ঘিরে শিশুরা পার্কের ভিতর হই-হল্লা করছে। নিজের ভাবনা নিয়ে তিনি অতিমাত্রায় বিব্রত, বিক্ষুব্ধ ছিলেন।

পরিতোষও তখন কাজে বেরিয়েছিল। মোড়ে গিয়ে বাস ধরবে বলে ঘাড় গুঁজে রাস্তা ধরে হাঁটছিল। ক্লান্ত, বিষণ্ণ চোখ দুটো তুলে একবারও সে পার্কের দিকে তাকাল না। সেখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে দেখল না। আর ওদিকে তাকালেও বিশাখাকে সেদিন সে চিনতে পারত কিনা যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

॥ ৫১ ॥

কুকুর যেমন অপরাধের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে একটা জায়গায় একটু সময় থমকে দাঁড়ায় তারপর আবার ছুটতে থাকে তেমনি রৌদ্র মাথায় নিয়ে গরম হাওয়ার ঝাপটা চোখেমুখে নিয়ে দুটি মানুষ ছুটতে ছুটতে প্রথমটায় সেই কড়িগাছটার নীচে এসে দাঁড়াল। ঘাড় ঘুরিয়ে তারা এদিক-ওদিক দেখল। পায়ের কাছে কটা শুকনো বিবর্ণ শালপাতার ঠোঙা পড়ে আছে। আর একটা জিনিস তাদের চোখে পড়ল। ওটা কী? একজন নুয়ে আঙুল দিয়ে জিনিসটা তুলল। ধুলোয় মাখামাখি হয়ে আছে একটা কালো ফিতা। চুলের রিবন? বিড়বিড় করে বলল সে। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রচণ্ড শব্দ করে হেসে উঠল। শব্দটা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল।

'মেয়েটাকে ঘাসের ওপর শুইয়েছিল।'

'হুঁ, শোয়াবার জন্যই তো শালা বাড়ি থেকে বার করে এনেছে।'

'তা তো বুঝলাম।' প্রথম ব্যক্তি এবার চোখ তুলে দূরের মাঠ দেখল। কিন্তু মাধবপুরের রাস্তাটা কোনদিকে ঠিক করা যাচ্ছে না তো।'

'ওটা কী।' দ্বিতীয় ব্যক্তি অস্পষ্ট একটা পথের রেখা দেখতে পেল। পায়ে চলা পথ। মাঠ কোণাকোণি সোজা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। 'আমার যেন মনে হয় ওই রাস্তা।'

'তবে ওদিকেই এগোনো যাক।' দুজন মাঠে নেমে পড়ল। তাদের গায়ে টেরিলিনের জামা, পরনে কালো প্যান্ট, পায়ে ছুঁচলো জুতো। রৌদ্রটা খাড়া হয়ে মাথায় লাগছিল এবার। দুজনেই পকেট থেকে রুমাল বের করে কান মাথা জড়িয়ে নিল।

'কিন্তু আমার মনে হয় শালা মাধবপুরে নেই—কাল রাত্তিরেই মেয়েটাকে নিয়ে ওখান থেকে সরে পড়েছে—কী যেন জায়গাটার নাম বলছিল বস্তির সেই ছোঁড়া, হুঁ. হৃদয়পুর—হয়তো এখন সেখানে আছে।'

'বলা যায় না।' দ্বিতীয় ব্যক্তি মাথা নাড়ল। 'হয়তো আজও মাধবপুরেই রয়ে গেছে। অমুক জায়গা দেখতে যাবে তমুক জায়গা দেখতে যাবে—সবই চাল, হয়তো একটা কথাও সত্য নয়, উকিলের বাচ্চাছেলেটাকে একথা সেকথা বলে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে আর কী।'

'তবে তো তাদের মাধবপুর না থাকাও সম্ভব—হৃদয়পুরও যায়নি, হয়তো আর কোথাও সরে গেছে।'

'তা তো বটেই।' দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘাড় নাড়ল, 'এবং এটাই বেশি সম্ভব, কেউ খোঁজ পাবে না, জানবে না, পুলিসের ভয় আছে তো। যদ্দিন পারে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে। মেয়ে ভাগিয়ে এনেছে—কাজেই ব্যাটা খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলবে।'

'কিন্তু আমরা খুঁজে বার করব।' প্রথম ব্যক্তি কাঁধে ঝাঁকুনি দিল। 'যেখানেই লুকিয়ে থাকুক চাঁদ, গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আমরা গিয়ে ঠিক জায়গায় হাজির হব। আপাতত মাধবপুর যাওয়া যাক—ওখানে গেলে একটা ট্রেস পাওয়া যেতেও পারে।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কিছু বলল না। হন হন করে দুজন মাঠ পার হতে লাগল।

প্রদোষের বন্ধু হাবুলের সঙ্গে তাদের জানাশোনা ছিল। হাবুলের কাছ থেকে তারা প্রথম গোঁসাইপাড়া বস্তির অক্ষয় উকিলের মেয়ে আর মেয়েকে যে পড়াচ্ছিল, সেই মাস্টারটা সম্পর্কে কিছু কিছু কথা জানতে পেরেছিল। এক সঙ্গে মদ খেতে বসে প্রদোষ তো হাবুলকে অনেক কিছুই বলে ফেলেছিল সেদিন। তাই কাল রাত্রে তারা সরাসরি প্রদোষকে পাকড়াও করে তাদের আড্ডায় নিয়ে যায়। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা ভালোই ছিল। আগের দিন হাবুলের সঙ্গে বসে স্রেফ আদা-নুন ও সিদ্ধ ছোলা দিয়ে মদ খেয়েছিল। কাল চাট ছিল পাঁঠার ঘুগনি, ডিমের বড়া, ভাজা ইলিশ। প্রদোষ খুশি হয়েছিল। আগের দিন মাত্র দু আউন্স আড়াই আউন্স গলায় ঢেলে দোকান থেকে সে বেরিয়ে এসেছিল। কাল নূতন আড্ডায় বন্ধুদের সঙ্গে বসে বেশ কিছুটা সময় লাগিয়ে পুরো আধ পাঁইট দিব্যি খেতে পেরেছিল। নেশাটাও জোর হয়েছিল। আর নেশা হলেই প্রদোষ তার দুঃখের কথা বলে। কালও ভকভক করে সে অনেক কথা বলে ফেলেছিল। এবং প্রচুর চোখের জল ফেলেছিল। অক্ষয় উকিলের মেয়ের সঙ্গে তার প্রণয় ছিল। খুব কাছাকাছি এসেছিল তারা দুজন। এমন কী একদিন চায়ের দোকানে বসে সে যে বুলাকে চুমু খেয়েছিল আবেগের আতিশয্যে নূতন বন্ধুদের কাছে কাল তা-ও বলে ফেলেছিল। তারপর হঠাৎ কিনা একটা লম্পট কোথা থেকে উড়ে এসে তার চোখের মণিকে থাবা মেরে তুলে নিয়ে গেল। তা ছাড়া সবচেয়ে দামি খবরটা সে কাল বন্ধুদের শুনিয়ে দিল। একটু আগে অক্ষয় উকিলের ঘরের বেড়ার গায়ে কান পেতে সে সব শুনে এসেছিল। ছাত্রীকে নিয়ে লম্পট মাস্টারটা পালিয়েছে। বেড়াবার নাম করে কোথায় তারা বিষ্ণুপুর মাধবপুর গিয়েছিল, সেখান থেকে আর ফিরে আসেনি। উকিলের ছোটো ছেলেটা ফিরে এসে বাবাকে সব বলছিল। বুলাকে নিয়ে লম্পট খুব সম্ভব হৃদয়পুর চলে

গেছে। বন্ধুদের কাছে ব্যাপারটা খুলে বললে তারা তাকে সাহায্য করবে, খুঁজে-পেতে তার 'চোখের মণিকে' উদ্ধার করে এনে দেবে এবং লম্পট মাস্টারটাকে মারধর করে কেবল বালিগঞ্জ কেন এই কলকাতা শহর থেকে তাড়িয়ে দেবে এমন একটা আশ্বাস সে কাল তাদের কাছ থেকে পেয়েছিল। তাই কোনো কথা সে গোপন করেনি।

বস্তির ছেলেটার কাছে খবরটা পেয়েই আজ তারা মাধবপুরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। এখন প্রদোষ জানত না যে তার এই সদ্য পরিচিত বন্ধু দুটি কদিন থেকে উকিলের বাড়ির মাস্টারটার ওপর নজর রাখছিল। লোকটা খুন করেছিল, জেল খেটেছিল, এই পর্যন্ত তারা জানত, আর শুনেছিল তার বাপ বড়োলোক ডাক্তার—পরিমল সম্পর্কে এর বেশি খবর তারা রাখত না, রাখবার তাদের দরকারও ছিল না। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল, সুযোগমতন লোকটাকে পেলে বেশ দু ঘা বসিয়ে দেবে এবং তাকে শাসিয়ে দেবে আর যাতে কোনোদিন সে বালিগঞ্জে কোনো বাড়িতে, কোনো মেয়েকে তো নয়ই, কোনো ছেলেকেও পড়াতে না আসে। সে লোক ভালো নয়, ক্রিমিন্যাল, তার কাছে লেখাপড়া শিখে ছেলেমেয়েরা তো মানুষ হবেই না, বরং তাদের মাথাটা সে বিগড়ে দেবে, কাজেই—

কাঁকুলিয়া রোডের নিবারণবাবুর কাছে থেকে তারা এই নির্দেশ পেয়েছিল। নিবারণবাবুর আদেশ উপদেশ মেনে চলতে তারা সর্বদাই উদ্‌গ্রীব। তিনি তাদের 'মনিব' 'প্রভু' বা 'বাপ-মা' বলা চলে। তারা রকে বসে আড্ডা দেয়, মদ খায়, মেয়েমানুষের বাড়ি যায়, গুণ্ডামি করে এমন দুর্নাম তাদের আছে, যে কারণে বালিগঞ্জের কিছু কিছু মানুষ তাদের দু-চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু এই জন্য তারা মোটেই দুঃখিত নয়, লজ্জিত নয়। নিবারণবাবু তাদের কাছে যথেষ্ট। তিনি অর্থবান, গাড়ি বাড়ি আছ, পলিটিক্‌স্ করেন। দু-দুবার ইলেকশনের সময় তাঁর জন্য তারা প্রচুর খেটেছিল, তা ছাড়াও এ-ব্যাপারে সে-ব্যাপারে তিনি এই কটি 'রকবাজ' ছেলেকেই ডাকেন, তাদের সাহায্য নেন, এবং তিনিও তাদের খুশি রাখতে সর্বদাই ব্যস্ত, কাজেই বালিগঞ্জের রাম শ্যাম যদু মধু গোছের মানুষদের তারা বড়ো একটা গ্রাহ্য করে না, তারা তাদের সুনজরে দেখল কী কু-নজরে দেখল এই নিয়ে তাদের মোটেই মাথাব্যথা নেই। এখন কথা হচ্ছে যে, অক্ষয় উকিলের চেয়ে যে আর একটি মানুষের উৎসাহটা বেশি এবং যেহেতু লোকটি নিবারণবাবুর বন্ধুস্থানীয়, বন্ধুর অনুরোধক্রমে তিনি তাঁর পাড়ার কটি অনুগত ছেলেকে ডেকে এই কাজের ভার দিয়েছেন তারা তা জানে না। হয়তো গিরিজাকে তারা ভালো করে চেনেও না। আর এখন তো গিরিজা বালিগঞ্জ ছেড়ে একরম চলে গেছে বলা যায়।

হ্যাঁ, গিরিজা। কিন্তু গিরিজাই কি গোড়ায় ভেবেছিল জগমোহন ডাক্তারের বড়ো ছেলের ব্যাপারে সে সত্যিই এতটা 'সিরিয়াস' হয়ে উঠবে। হয়তো প্রথমটায় এমন একটা ক্ষীণ ভাবনা তার মাথায় এসেছিল। পরিমলকে যদি কেউ শাসিয়ে দিত, 'মারধরের' ভয় দেখাত তা হলে হয়তো কথায় কথায় সে আর বালিগঞ্জ অক্ষয় উকিলের বাড়ি ছুটে যেত না। ওই দরজা বন্ধ হলে—বুলার মোহ কেটে গেলে বিশাখার কাছে সে ফিরে আসবে। বিশাখার কষ্ট, তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা—তার চেয়েও বেশি, বোনের জন্য রীনার হয়রানি গিরিজাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তুলছিল। এদিকে বড়ো ছেলের ব্যবহারে জগমোহন ডাক্তার ক্ষুব্ধ বিব্রত, পরিতোষ অসন্তুষ্ট। বাড়ি থেকে টাকাকাড়ি নিয়ে অক্ষয়বাবুর পরিবারকে সে সাহায্য করছে।

তা-ও টাকাকড়ি নেবার পদ্ধতিটা কী! শেষ পর্যন্ত রমলার গায়ের গয়না। মানুষটার ওপর গিরিজার ঘৃণা ও বিদ্বেষ ক্রমেই বেড়ে চলছিল। কিন্তু তা হলেও সেই ভাবনাটাকে সে আমল দেয়নি। কথাটা মনে হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে ঝেড়ে ফেলেও দিয়েছে। কারো কথা শুনছে না পরিমল, কারো অনুরোধ রাখছে না, কারো মনের দিকে তাকাচ্ছে না, নিজের ইচ্ছা রুচি—অশোভন একগুঁয়েমিটাই তার কাছে বড়ো, সবই সত্য, কিন্তু তা হলেও তার চরিত্র সংশোধনের জন্য তাকে শারীরিক আঘাত করা, আঘাতের ভয় দেখানো—গিরিজা কেমন যেন শিউরে উঠত। এই লর্ডকেই কি সে একদিন মাথায় নিয়ে নাচত! দেবতার মতন তাকে ভালোবাসত ভক্তি করত? তার প্রতিটি কথা হাসি চলাফেরা, তার দৃষ্টিভঙ্গি রুচি মেজাজ আধুনিকতা, তার প্রেম প্যাশন গিরিজাকে মুগ্ধ বিস্মিত করত? আর সেই মানুষকে আজ সে কী চোখে দেখছে। চোখে জল এসে গিয়েছিল গিরিজার। যেন একদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে লর্ডকে শাস্তি দেবার কথাটা চিন্তা করতে গিয়ে নিজের সঙ্গে রীতিমতো সে যুদ্ধ করেছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর ধৈর্য রাখতে পারল না। তার শিক্ষা সুরুচি সুস্থ জীবনবোধ তার নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠল। বন্ধুপ্রীতি হেরে গেল। পরিমলকে বিচার করতে গিয়ে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নটাই বড়ো হয়ে উঠল। বিশেষ যেদিন সে জগমোহন ডাক্তারের মুখে তাঁদের পারিবারিক অশান্তির কথা জানতে পারল। পরিতোষদের দাম্পত্য জীবনে চিড় ধরিয়ে দিয়েছে পশু। মানুষ এত নোংরা হতে পারে, এমন বিকৃত কুৎসিত ইচ্ছা বুকের ভিতর লালন করতে পারে—গিরিজার যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। সেদিন নূতন করে সে শিউরে উঠল। ওদিকে বিশাখার চোখের জল, এদিকে বুলাকে নিয়ে রাতদিন পরিমলের বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানো। তবু এই জিনিসগুলি প্রায় সহ্য হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরিতোষ ও রমলার ব্যাপারটা শোনার পর আর সে স্থির থাকতে পারেনি। সেদিনই কাঁকুলিয়া রোডের নিবারণের সঙ্গে কথা বলে সে সব ঠিক করে এল। আর সেদিনই যেন রীনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাগে দুঃখে গিরিজা ভিতরের আক্রোশটা মুখে প্রকাশ করে ফেলেছিল। 'স্কাউন্ড্রেলটার নাক মুখ থেঁতো করে দেওয়া যায়'—হয়তো গিরিজার চোখে মুখেও একটা হিংস্রতা নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠেছিল তখন। তার কথা শুনে রীনা যে বিস্মিত হয়েছিল আহত হয়েছিল, মেয়ের চেহারা দেখে গিরিজা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমি দায়ি নই, আমি কেউ না—রীনা চলে যাওয়ার পর গিরিজা যেন হাসতে হাসতে অদৃশ্য রীনাকে এবং জগতের অন্য সমস্ত যুবতীকে প্রবোধ দিয়েছিল, সান্ত্বনা দিয়েছিল—পাপ নিজেই নিজের পথ তৈরি করে পরিণামের দিকে এগিয়ে যায়, পরিমল তার নিয়তি রুখবে কেমন করে!

কেননা সেই মুহূর্তে গিরিজা নূতন করে উপলব্ধি করেছিল জগতের সমস্ত নারীকে বশ করার মোহগ্রস্ত করার ক্ষমতা রাখে ঐ শয়তান। রীনাকেও। পরিমলের সংস্পর্শে গেলে রীনার অবস্থাও আজ বিশাখার মতন, রমলার মতন, অক্ষয় উকিলের মেয়ের মতন হত। গিরিজার মাথার ভিতর ঈর্ষার আক্রোশের চাপা আগুনটা তখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল।

এবং তারপর জন্মদাতা জগমোহনের মুখেও তো গিরিজা স্বকর্ণে শুনল, ঐ ক্রিমিন্যালটাকে কেউ গুলি করে মেরে ফেলতে পারে না?

তাই, পৃথিবী তার প্রাত্যাহিক গতিপথে নিয়মিত ঘুরছিল, আর পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছিল রক্তচক্ষু মেলে সূর্যটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

যেমন বাচ্চাগুলির যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে বিশাখাকে এক সময় পার্কের ঠাণ্ডা ছায়া ছেড়ে আবার রাস্তার রৌদ্রে ছুটে আসতে হয়েছিল। রাস্তায় এসে ভাবছিল, তবে কি বালিগঞ্জ চলে যাবে সে. সেখানেই না হয় একটা গাছতলায় সারাদিন বসে থাকবে, সন্ধ্যার দিকে ওদিকের রাস্তায় মানুষটাকে যদি দেখা যায়। হয়তো ছাত্রীকে পড়াতে যাচ্ছে পরিমল তখন, কী বেড়ানো শেষ করে ছাত্রীকে নিয়ে রিকশা করে বাড়ি ফিরছে দেখতে পাওয়া যাবে। নারকেলডাঙ্গায় এসেও কিছু সুবিধা হল না যে।

কিছু ঠিক করতে পারছিল না বিশাখা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবছিল। আর স্থির বিষণ্ণ একটি মূর্তি সরযূধামের জানালায় চুপ করে দাঁড়িয়ে অনেকৃক্ষণ মেয়েটিকে দেখছিল। পাগল। রমলা বুঝতে পেরেছিল। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে দুবার এল গেল—তারপর যেন পার্কে ঢুকেছিল। সেখানে বসতে পারল না। শিশুগুলি গায়ে ধুলোবালি দিচ্ছিল, আঁচল ধরে টানাটানি করছিল। বুড়ি আয়া ও ঝিয়ের দল কাছে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল, হি-হি করে হাসছিল। কাদের মেয়ে—কাদের বউ। রমলা চিন্তা করছিল। তাই তো, তার নিজের মন ভালো ছিল না, অন্য দিন হলে তখনি দীনদয়ালকে কী দারোয়ানকে পাঠিয়ে দিত, বাচ্চাগুলি যাতে তাকে এভাবে যন্ত্রণা না করে বলে দিতে। এত কষ্ট হচ্ছিল রমলার মেয়েটির জন্য। নিয়তি মানুষকে কোথায় টেনে নিয়ে আসে, ভাবতে ভাবতে রমলা কিন্তু আবার নিজের ভাবনায় ফিরে এসেছিল, তার নিয়তিও বুঝি তাকে নিয়ে খেলছে। সে ঠিক করে ফেলেছিল, এখানে আর তার থাকা হবে না, অন্তত কদিনের জন্য এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, কোথায় যাবে, শ্রীরামপুরে দাদার কাছে? কাল থেকে কথাটা চিন্তা করছিল। আজ হঠাৎ চোখের সামনে একটা আলোর ঝলক দেখতে পেয়েছিল সে।

তাই তো, এত অশান্তির মধ্যে, এই কদিনের ভেতর একবারও কিন্তু কথাটা তার মনে হয়নি।

একলা পারবে না সে সেখানে যেতে? খুব পারবে। সুকোমলের মুখে কতবার তো শুনল। রেল স্টেশনের নাম জগৎবল্লভপুর। সেখানে ট্রেন থেকে নেমে বাস-এ চড়ে ব্রজবল্লভপুরের আশ্রমে যেতে হয়। অবশ্য বাস থেকে নেমে মাঝখানে দেড় দু মাইল পথ হাঁটতে হবে। সে কিছু না। রমলা একদিন যাবে বলে সুকোমল গোরুর গাড়ি রাখবার কথা বলেছিল। কেননা অতদূর সাইকেল রিকশা যায় না। তা হোক, দু মাইল পথ রমলা খুব হাঁটতে পারবে। হ্যাঁ ব্রজবল্লভপুর। সুকোমল বলে ব্রজদুর্লভপুর। ওটাই নাকি ওই গ্রামের আদি নাম। আশ্রমের লোকেরা ওই নামটাই আবার চালু করবার চেষ্টা করছে। চিঠিপত্র অবশ্য ব্রজবল্লভপুর ঠিকানায় দিতে হয়।

যাই হোক, রমলাকে একবার সেখানে যেতেই হবে। এ বাড়ির মানুষ তাকে বিচার করতে পারবে না। একটা অন্ধ আবর্তের মধ্যে পড়ে গিয়ে দুটি মানুষ ঘুরপাক খাচ্ছে। রমলাকে কেন, পৃথিবীর কোনো মানুষকেই বুঝি বিচার করবার ক্ষমতা তাদের নেই। হয়তো একদিন ছিল। আজ তারা নিজেদের বিচার করতে গিয়েও ভুল করছে। আশ্চর্য, জগমোহনও এমন

হয়ে যাবেন রমলার যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। মুখে না বললেও হাবেভাবে কি তিনিও বোঝাতে চাইছেন না যে রমলা অন্যায় করেছে, অপরাধ করেছে। তাই তো, কী অন্যায় করেছে সে, তার অপরাধ কতটা একবার ঠাকুরপোকে গিয়ে সে সরাসরি জিজ্ঞাসা করবে। তার কাছে বিচার চাইবে। সমস্ত আবিলতা থেকে মুক্ত যে মানুষ সে ছাড়া তো এ জিনিসের বিচার হবে না। হতে পারে না।

বিকালের ট্রেনেই জগৎবল্লভপুর রওনা হবার জন্য সে তৈরি হল। না, কাউকে বলা হবে না। না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। দুঃখে অভিমানে লজ্জায় ক্রোধে তার চোখ দুটো তখন বাইরের প্রখর রৌদ্রের মতন জ্বলজ্বল করছিল। এবং সেদিন বাড়ি থেকে বেরোবার আগে এক সঙ্গে সুকোমলের দুখানা চিঠি পেয়েছিল সে। একটা তার নিজের, একটা শ্বশুরের। দুখানা চিঠিই জগমোহনের টেবিলে রেখে গিয়েছিল রমলা।

সেই দুপুরে রমলা যখন সরযূধামের একটা জানালায় দাঁড়িয়ে আর একবার বাইরের দিকে তাকিয়েছিল পাগল মেয়েটাকে আর সে দেখতে পায়নি। বিশাখা বুঝি সত্যি বালিগঞ্জে ফিরে যাচ্ছিল। বাস ধরতে ততক্ষণে মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বালিগঞ্জ যতীন দাস রোডের মোড়ে জলধরের মিষ্টির দোকানের সেই পুরোনো ঘড়িতে তখন একটা বেজে গিয়েছিল। রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। গাড়ি ঘোড়া আর তেমন চলছিল না। একটা কাক দোকানের সামনের অশ্বত্থ গাছটার নিচের দিকের ডালে বসে তারস্বরে চিৎকার করছিল। দোকানের ভিতর ঘাড় গুঁজে চুপ করে বসে ছিল অক্ষয় উকিলের বড়ো ছেলে প্রলয়। একটা রাত্রির মধ্যে প্রলয়ের চেহারাটা যে কী খারাপ হয়ে গিয়েছিল চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারত না। যেন তার কথা বলারও শক্তি ছিল না। ক্লান্ত বিধ্বস্ত। যেন অনেক চেঁচামেচি ও আস্ফালন করার পরও কিছু ফল হল না দেখে পাথরের মতন বোবা হয়ে গিয়েছিল মানুষটা। আর চোখ গোল করে স্থূল মাংসল হাত দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জলধর তাকে বোঝাচ্ছিল, 'তুই কান্নাকাটি করে করবি কী, বোন যদি কুলে কালি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারল, আর তাই দেখে বাপ যদি এখনো নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে পারে তো তোর তো কিছু করবার থাকে না। আমি তো মনে করি তুই আর ওদের দিকে তাকাবি না, ওরা খেল কী খেল না তোর দেখবার দরকার নেই, একটা ঘর-টর দেখে তুই সেখানে চলে যা, নিজে যখন রোজগার করিস একলা পেটের জন্য তোর ভাবনা নেই, ওই নরককুণ্ডের মধ্যে থাকবি না—এতকাল তো সাহায্য করেই এসেছিস......বরং এখন একটা বিয়েটিয়ে করে তুই তোর নিজের মতন করে সংসার সাজিয়ে—'

আর একজন কান পেতে শুনছিল। হাতকাটা প্রলয়ক জলধর কী সব উপদেশ দেয় শুনতে দুখানা জিলিপি দিয়ে একটু জল খাবার নাম করে অটল দত্তর ছেলে দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল। কথাগুলি বোঝা যাচ্ছিল না। ভয়ানক ফিসফিস গুজগুজ করে জলধর কথা বলছিল। তা হলেও কী নিয়ে যে প্রলয়কে এ সময় উপদেশ দেওয়া হচ্ছে বুঝতে বেগ পেতে হয়নি প্রদোষের।

হাতকাটাকে আজ সবাই উপদেশ দেবে। আর এমন মুখ চুণ করে মাটির দিকে চোখ রেখে বসে বসে সে সকলের উপদেশ শুনবে। তাই তো, এই বিপদের সময় পাড়ার মানুষ যদি উকিলের ছেলেকে উপদেশ না দেয় সান্ত্বনা না দেয় তো আর কবে দেবে।

কথাটা চিন্তা করে এবং প্রলয়ের মুখের অবস্থা দেখে প্রদোষের ভীষণ হাসি পাচ্ছিল' জিলিপিটা কোনো রকমে মুখে পুরে পয়সাটা একরকম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দোকানের সামনে থেকে সে সরে এল। তার মুখ থেকে যে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে সে নিজেও টের পাচ্ছিল। কাজেই ওখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয় বুঝে সে চলে এল। একটু আগে হাবুলের সঙ্গে এক জায়গায় গিয়ে বেশ খানিকটা চোলাই গলায় ঢেলে এসেছে। চোখ দুটো ছলছল করছিল। তা হলেও এই এক-দু দিনের মধ্যে তার সাহসটা যে বেশ বেড়ে গেছে সে বেশ বুঝতে পারছিল। দুদিন আগে মুখে এমন গন্ধ নিয়ে জলধরের দোকানের সামনে দাঁড়ানো দূরে থাক, এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতেও সে সাহস পেত না।

কেন তার সাহস বেড়েছে, কে তার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে একথাটাও বুঝি আজ জোর গলায় মানুষের কাছে বলতে পারবে সে।

পা দুটো বেশ টলছিল। জলধরের দোকান পিছনে রেখে ফুটপাথ ছেড়ে সে রাস্তায় নামল।

আর ঠিক তখন তার চোখে পড়ল উল্টোদিকের ফুটপাথ ধরে একজন হেঁটে যাচ্ছে। নেশার চোখ, তার ওপর রৌদ্রের গাঢ় রং, রাস্তাটাও নির্জন, মানুষটিকে দেখা মাত্র প্রদোষের হৃৎপিণ্ড দুলে উঠল। কেননা একটু আগে চোলাই খেতে গিয়ে হাবুলের সঙ্গে এই মানুষটিকে নিয়ে সে অনেক সরস আলোচনা করেছে। তাই তো, তার 'আইডিয়া' শূন্যে মিলিয়ে গেছে, 'স্বপ্ন' চুরমার হয়ে গেছে, 'চাঁদের আলো' 'ফুলের গন্ধ'—সব এখন বাজে, অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে, তা ছাড়া এগুলি সত্য নয়, চরম নয়, অক্ষয় উকিলের মেয়ে তাকে এটা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে—সত্য হল মানুষের শরীর, মনের ব্যাপারটা একটা ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়, এবং এই গূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পেরে উকিলের মেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা একটি পুরুষের শরীর জড়িয়ে শুয়ে থাকবে বলে, থাকবার সুবিধা হবে বলে মাস্টারটাকে নিয়ে একেবারে পালিয়ে গেল, তাই হাবুল তাকে বোঝাচ্ছিল, 'হোক না পাগল, থাক না মাথার ছিট—মেয়েটার শরীরটা তো আর মিথ্যা হয়ে যায়নি, য়েমন রূপ বলছিস, বাগানের ভেতর সুযোগ পেয়েছিলি, জড়িয়ে ধরতে পারতিস, আমি হলে ঠিক ওই পাগলীকে রেপ্ করে ছেড়ে দিতাম।'

'এই যে, শুনুন!' প্রদোষ পিছন থেকে ডাকল।

বিশাখা ঘাড় ফেরাল। ভুরু কোঁচকাল। কিন্তু দাঁড়াল না।

'শুনুন—' প্রদোষ উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'ডাকছি, শুনতে পাচ্ছেন না?'

সেই দোতলা বাড়ি ডাইনে রেখে বিশাখা, যেমন আর একদিন এগিয়ে গিয়েছিল, সরু গলিটার ভিতর ঢুকে পড়ল। তবে তো আজও গোঁসাইপাড়া বস্তির দিকে যাচ্ছে পাগলী। চিন্তা করে প্রদোষের হৃৎপিণ্ডের রক্ত রীতিমতো নাচতে শুরু করল। হুঁ, এই দুপুরে ওদিকটা আরো বেশি ফাঁকা থাকে, কটা নেড়িকুত্তা ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। পা দুটো বেশ ভালোরকম টলছিল প্রদোষের, তা হলেও ছুটতে আরম্ভ করল। যেন একবার হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও কোনোমতে টাল সামলে নিল।

'কী চাইছ তুমি?' বিশাখা রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করল। এবার শক্ত হয়ে দাঁড়াল। মদ খেয়েছে ছেলেটা বুঝতে পারল।

'আমি যে আপনাকে খুঁজছি—হি-হি।' প্রদোষ তার মুখের সামনে, প্রায় শরীর ঘেঁষে দাঁড়াল। কথাগুলি জড়ানো। 'মাইরি ভয়ানক জরুরী কথা ছিল আপনার সঙ্গে—'

'সরে দাঁড়াও।' আঁচল দিয়ে নাকটা চেপে ধরল বিশাখা। এবং প্রদোষকে সরতে বলে নিজেই এক পা পিছনে সরে দাঁড়াল।

'কী, আপনি রাগ করছেন, আমার মুখ থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে বুঝি? মাইরি, এইটুকুন খেয়েছি, বিশ্বাস করুন।'

'পথ ছেড়ে দাও।' বিশাখা ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখল। রাস্তা আগলে দাঁড়িয়েছিল প্রদোষ। 'আমার শরীর খারাপ, বিরক্ত করো না।' বিশাখা আঁচল দিয়ে কপাল মুছল, তারপর আবার সেটা নাকে চেপে ধরল।

'হি-হি।' প্রদোষ হাসল। 'তা তো দেখেই বুঝতে পারছি, মুখখানা শুকিয়ে গেছে, ঠোঁট দুটো শুকনো দেখাচ্ছে, আহা, কমলা লেবুর কোয়ার মতন কেমন পুষ্ট টুসটুসে ঠোঁট দেখেছিলাম সেদিন, অসুখ করেছে বুঝি?'

হঠাৎ কথা বলল না বিশাখা। মাথার যন্ত্রণাটা একটু কমেছে। কিন্তু ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছিল। দাঁড়াতে পারছিল না।

'শরীরটা যখন ভালো নেই, ওই ছায়ায়—ওই তো সেদিনের বাগানটা'—আঙুল দিয়ে প্রদোষ রাস্তার পাশে বেড়া দেওয়া পড়ো জমিটা দেখাল। 'ওখানে বসে একটু বিশ্রাম করলে ভালো হত না কি। এখন আর ধারেকাছে বাচ্চাটাচ্চাগুলো নেই, আপনাকে কেউ যন্ত্রণা করবে না, মাইরি।'

'উঃ এত কথা বলছ তুমি।' বিশাখার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ছিল। 'যেদিকে তুমি যাচ্ছিলে যাও—আমাকে বিরক্ত করো না, সরে দাঁড়াও।'

'হি-হি'—ধমক খেয়েও প্রদোষ হাসছিল। 'আমার ওপর খামকা রাগ করছেন—আমি কি আপনার গায়ে কোনোদিন ধুলো দিয়েছি, না আঁচল ধরে টেনেছি, আমি আপনাকে সে-চোখে দেখি না, চলুন ছায়ায় গিয়ে বসি. গোঁসাইপাড়া বস্তির সেই ছাত্রীর কথা মনে নেই আপনার? আর সেই খুনে মাস্টার? যার কথা শুনে সেদিন হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন?' প্রদোষ টেনে টেনে হাসছিল!

বিশাখা এবার চমকে উঠল। নূতন করে ছেলেটিকে খুঁটিয়ে দেখল। 'ও, তুমি সেই বস্তির ছেলেটি না? কলেজে পড়—মদ খেয়ে এমন দশা—'

'একটুখানি খেয়েছি মাইরি, বিশ্বাস করুন, চলুন ঐ গাছতলায়, একটা ভয়ানক মজার খবর আছে সেই ছাত্রী আর মাষ্টারের, তাজ্জব বনে যাওয়ার মতন খবর হি—হি।'

'কী হয়েছে ভাই?' গলার স্বর নরম হয়ে গেল বিশাখার, আঁচলটা আর নাকে ধরে রাখতে পারল না।

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে এ গল্প বলা যায় না।' প্রদোষ আর দ্বিধা না করে বিশাখার হাত চেপে ধরল। 'ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে খবরটা শুনবেন, তবে তো আরাম পাবেন মজা পাবেন। চলুন।'

'আচ্ছা আচ্ছা, যাচ্ছি ভাই, ওখানে বসেই শোনা যাবে—আমার হাত ছেড়ে দাও লক্ষ্মীটি।' বিশাখার দুই চোখে কাতরতা ফুটল। যেন হঠাৎ অসহায় হয়ে পড়ল সে, দুর্বল হয়ে পড়ল, রাগ করতে পারল না, ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখল।

পাগল রাজি হয়েছে দেখে প্রদোষ খুশি হল।

'কেউ নেই, কেউ দেখছে না আমাদের।' বিশাখার কানের কাছে মুখ দিয়ে সে ফিসফিস করে উঠল। 'ওখানটা আরো নির্জন আরো নিরিবিলি। জঙ্গল হয়ে আছে।'

মদের গন্ধে নাক জ্বলে যাচ্ছিল, হৃৎপিণ্ড পুড়ে যাচ্ছিল বিশাখার, তবু ছেলেটিকে বাধা দিল না, দেবার শক্তি ছিল না তার, অবাক হয়ে গিয়ে মজার খবরটা কী হবে সে ভাবতে আরম্ভ করল। পোড়ো জমির দিকে তাকে টেনে নিল চলল প্রদোষ। তারপর বেড়া ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকল।

'দেখুন কী চমৎকার ঠাণ্ডা ছায়া, মখমলের মতন নরম ঘাস, আর এই দেখুন আলকুশি আর রাংচিতার ঠাসবুনন চারদিকে।' আহ্লাদে দুই চোখ নৃত্য করছিল প্রদোষের।

'তাই তো দেখছি।' বিড় বিড় করে উঠল বিশাখা, 'এবারে ওদের খবরটা বলো।'

'বসুন, ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসুন, চেহারাটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে দুদিনে।' প্রদোষ জোর করে তাকে বসিয়ে দিল।

'আমি বড়ো ক্লান্ত, অনেক পথ হেঁটেছি।' বিশাখা বলল, 'জ্বরে আমার গা পুড়ে যাচ্ছে।'

উত্তেজনায় প্রদোষের বুকের ভিতর দুবদুব শব্দ হচ্ছিল, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিল।

'কই দেখি! তাই তো।' ঘাসের ওপর হাঁটু গেড়ে বসল সে। বিশাখার কপালে হাত রাখল, গলার কাছটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল। 'ইস্ হাত পুড়ে যায়।'

'এবার খবরটা বলো, আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছি না।' বিশাখা শিশুর মতন আকুল হয়ে উঠল।

'বলব, বলছি।' প্রদোষ এদিক ওদিক তাকাল, তারপর বিশাখার চোখ দুটো দেখল। 'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে খবরটা শুনে সেদিনের মতন আজ আবার হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়বেন, তারপর কাঁদবেন, সেদিনের চেয়েও বেশি কাঁদবেন। প্রদোষ জোরে হেসে উঠল।

'না, না, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি আজ আর কাঁদব না?' একটু ভেবে নিয়ে বিশাখা বলল, 'কাঁদব না—আজ হাসবও না।

'সে কী! তবে কী করবেন।' অবাক হবার মতন চেহারা করে প্রদোষ দুহাতে বিশাখার কাঁধ দুটো চেপে ধরল।

'উঃ, তুমি কি আমায় পাগল পেয়েছ।' আর্তনাদের মতন একটা সুর করল বিশাখা। 'আমি পাথর হয়ে থাকব, তুমি বলো, তুমি বলো।'

'ওরা পালিয়ে গেছে।' দুবার বিশাখার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল সে। বিশাখা শব্দ করল না নড়ল না। পাথরের মতন বোবা কঠিন হয়ে রইল। তাই চেয়েছিল প্রদোষ। আর কালবিলম্ব করল না। যেন পাথরটাকে মাটিতে শুইয়ে দিল সে, পাগল মেয়েটাকে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল। তারপর পাথরের আবরণ সরাবার মতন নির্দয় কঠিন হাতে তার গায়ের কাপড় খুলে ফেলল। বিশাখা দু হাতে চোখ ঢাকল।

পৃথিবী ঘুরছিল। সূর্য কাত হয়ে গিয়েছিল। তা হলেও জ্বলজ্বলে চোখ মেলে সব দেখছিল।

কালো প্যান্ট সাদা শার্ট পরা মানুষ দুটি তখন মাধবপুর পৌঁছে গিয়েছিল।

আর নফরগঞ্জের বাজারে সেই চায়ের দোকানে দুজনের জন্য অপেক্ষা করে করে পরিমল শেষটায় তক্তাটার ওপর শুয়ে পড়েছিল, তারপর অকাতরে ঘুমোচ্ছিল।

কাঁটা ফুটল অমূল্যর পায়ে। যন্ত্রণায় উঃ করে উঠল।

'কী হল!' চমকে উঠল বুলা, অমূল্যর মতন ধপ্ করে সে-ও মাটিতে বসে পড়ল।

মুখ বিকৃত করে অমূল্য পা-টা বাড়িয়ে দিল। বুলা সেটা নিজের কোলের ওপর টেনে নিল। তারপর সরু লম্বা দুটো আঙুল একত্র করে—সাঁড়াশির মতন করে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে অমূল্যর পায়ের কাঁটা টেনে বার করল।

অমূল্যর মুখে হাসি ফুটল। তা হলেও এক ফোঁটা রক্ত বেরোল। কুঁচ-ফলের মতন লাল ফোঁটাটা বুলার হাতের তেলোয় টলটল করছিল। তাই যেন অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখছিল বুলা। হাতটা চোখের সামনে তুলে ধরেছে।

'কী হল?' অমূল্য পা গুটিয়ে সোজা হয়ে বসল। কিন্তু তার আগেই বুলা কাজটা সেরে ফেলল। জিভ দিয়ে হাতের রক্তটা চেটে খেল।

অমূল্য প্রথমটায় স্তম্ভিত, তারপর খিলখিল করে হেসে উঠল। বুলা একটু লাল হয়ে পরক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে গেল। হাসতে লাগল।

'নোনতা নোনতা লাগছে না?' অমূল্য নাকের ডগাটা কোঁচকাল। যেন বুলাকে এভাবে রক্ত খেতে দেখে তার একটু ঘৃণার ভাব হল।

'সামান্য।' বুলা তখনও মুখের ভিতর জিভটা চুষছিল। অমূল্যর রক্তের স্বাদ নিচ্ছিল।

'সব মানুষের রক্তের এক স্বাদ।' অমূল্য গম্ভীর হয়ে বলল।

'তাই কী? আমার মনে হয় না।' বুলা মাথা নাড়ল। 'আমি অবিশ্যি বলতেও পারব না, আর কারো রক্তের স্বাদ নিইনি।'

'কেবল আমারটা নিলে?' অমূল্য চোখ বড়ো করল।

'হুঁ, আর আমার নিজেরটা খেয়ে দেখেছি, হাতে মাছের কাঁটা বিঁধে সেদিনও রক্ত বেরিয়েছিল।'

'কেমন লাগল, দুটো স্বাদ এক?' অমূল্য ঝুঁকে বসল। তার চোখে চোখ রেখে বুলা থুঁতনি নাড়ল।

'রঙ স্বাদ—সব এক।' নিবিড় গাঢ় গলায় সে উত্তর করল।

'কিন্তু আমার মনে হয় তোমার রক্ত আরো উজ্জ্বল আরো সুন্দর।'

'ধেৎ!' বুলা ধমক দিল। 'অবিকল তোমার রক্তের রঙ। দাঁড়াও দেখাচ্ছি—'

'কি করবে!' অমূল্য চমকে উঠল। তার পায়ের কাঁটাটা ঘাসের ওপর যত্ন করে রেখে দিয়েছিল বুলা। সেটা তুলে নিয়েছে। অমূল্যর ভুরু কপালে উঠল। তার ভয় দেখে বুলা খিলখিল করে হাসল।

'আমার আঙুল চিরে রক্ত বার করে তোমাকে দেখাব।'

'দরকার নেই।' তার হাতে চেপে ধরল অমূল্য। 'আমি তো অবিশ্বাস করছি না—শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম........'

'আমাদের কিছুই অমিল নেই—সব মিলে যাচ্ছে।' আদর করে অমূল্যর মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিল বুলা। অমূল্য কথা বলল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

'কী দেখছ এমন করে?' বুলা তার কপালে চুমো খেল।

'আমাকে দেখাচ্ছি, তোমার চোখের তারায় আমার মুখ ভাসছে।'

বুলা চুপ করে রইল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

'কী দেখছ এমন করে?' অমূল্য শুধাল।

'বুলাকে।' বুলা ফিসফিসে গলায় উত্তর করল। 'তোমার কালো চোখের তারায় বুলার ফরসা মুখ ভাসছে।

'জলে যেমন পদ্ম ভাসে। তাই না?'

বুলা কথা বলল না। অমূল্যও চুপ করে রইল। সকাল থেকে অনেক কথা বলেছে তারা। এখন গাছের ছায়া লম্বা হতে আরম্ভ করেছে। যেন আর কিছু তাদের বলার ছিল না। সব কথা ফুরিয়ে গেছে, সব কিছু জানা হয়েছে। এখন শুধু চুপ করে থাকা, একজনের চোখের ভিতর আর একজনকে অনুভব করা।

কিন্তু তবু কথা থেকে যায়। যে জিনিস ভাববার কথা নয় কদাকার উটের মতন সেটা গলা বাড়িয়ে দিয়ে দুজনের মুখের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। অন্য প্রশ্ন, ভিন্ন প্রসঙ্গ।

বুলা একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল।

'কী ভাবছ?' অমূল্য তাকে বুঝতে পারছিল। তবু জিজ্ঞাসা করল।

'আমাদের রক্ত এমন উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন টলটলে থাকবে না একদিন।' বুলার চোখে কাতরতা ফুটল।

'যেদিন আমরা আরো বড়ো হব, বুড়ো হতে থাকব সেদিন?' অমূল্যও কম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হল না।

কথা না বলে বুলা মাথা নাড়ল। একটা ভয়ের ডেলা তার গলার কাছে ঠেকে আছে, তাই কথা বলতে পারছে না, অমূল্য বুঝল।

'সেদিন আমাদের রক্ত গাঢ় হতে থাকবে, সন্ধ্যার আকাশের ভয়ংকর রঙ ধরবে, অন্ধকার হয়ে যাবার আগে যেমন হয়?' বিড়বিড় করে বলল অমূল্য, 'এই ভয়?'

বুলা তথাপি নীরব।

কিন্তু অমূল্য থামল না। নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না সে। ভয়ের সবটা চেহারা না দেখা পর্যন্ত ভয়টাকে সে ভাঙবে কেমন করে। কতক্ষণ বুলা এমন বোবা হয়ে থাকবে! অস্বস্তি নিয়ে অমূল্য এদিক-ওদিক তাকাল।

'আমার মনে হয়, তুমি ঐ মানুষটির কথা ভেবে এমন মন খারাপ করছ।'

'কোন্ মানুষটাকে দেখে।' বুলা চমকে উঠল।

অমূল্য মৃদু হাসল। 'তোমার পরিমলদাকে দেখে। একদিন তাঁর মতন হয়ে যাব দুজন— একটু একটু করে ভোরের আলোর গোলাপি আভা আমাদের রক্ত থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

বুলা শিউরে উঠল। দু-হাতে চোখ ঢাকল। অমূল্য তার চুলের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে চুপ করে রইল। একটু ভাবল। তারপর সান্ত্বনার সুরে বলল, 'এইজন্যই তখন আমরা সরে এলাম সেখান থেকে, মানুষটা বিশ্রাম করুক; হয়তো ঘুমোবে, মনে হচ্ছিল যতক্ষণ তাঁর কাছে থাকব, তাঁর ক্লান্তি আমাদের পাবে, আমি হাই তুলব, তাঁর ঘুম দেখে তোমার ঘুম পাবে। তোমায় নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এলাম।'

'আমার মনে হয়, তিনি তখনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।' বুলা আস্তে বলল।

'এখনো ঘুমোচ্ছেন।' অমূল্য উত্তর করল।

'আমরা কি এখন তাঁর কাছে ফিরে যাব?'

'আর একটু ঘুমোতে দাও তাঁকে, আর একটু বিশ্রাম করুক।'

'আমরাও বিশ্রাম করছি এখানে গাছতলায়।'

অমূল্য ঘাড় কাত করল।

'তাঁর বিশ্রাম ও আমাদের বিশ্রামে কত তফাৎ।'

'আমরা যে দুজন আছি।' বুলা বলল।

'সঙ্গী পেলেও এক সময় তাঁর নাক ডাকত।' অমূল্য জবাব দিল। আশ্চর্য, বুলা প্রতিবাদ করতে পারল না।

এমন অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য একটা স্বপ্ন দেখল পরিমল তখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। স্বপ্নের মধ্যে শোনা দুজনের এসব কথা। আর স্বপ্নের মধ্যে সে যেন খুব কাঁদল। তার যেন মনে হচ্ছিল, চড়ুই দুটো মাটি ছেড়ে উড়ে এসে তার শিয়রের কাছে বসেছিল তখন, তার মাথার চুল ঠোকরাচ্ছিল। আর গাঁয়ের দুটি চাষি হাঁটু পর্যন্ত ধুলো নিয়ে খাঁটি গোরুর দুধ ও গুড় দিয়ে তৈরি চা খেতে খেতে শহরের বাবুটিকে দেখছিল। বাবুটি যে দুঃস্বপ্ন দেখছিল, তার চোখের কোণায় জল দেখে তারা বুঝতে পেরেছিল। 'আহা, দুঃখের স্বপ্ন না দেখলে কি ঘুমের মধ্যে এমন করে কাঁদে।' নিচু গলায় তারা বলাবলি করছিল। 'মানুষটার বউ মরে গেছে, বউকে স্বপ্ন দেখছে।' একজন বলছিল।

এ-ও স্বপ্ন। স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখা। একটা মিথ্যার মধ্যে আর একটা মিথ্যার ছবি। কেননা, যখন তার ঘুম ভাঙল চোখ মেলে নফরগঞ্জের সেই দোকানে কোনো চাষিকে সে দেখেনি। চড়ুই দুটোও তার শিয়রের কাছে ছিল না। মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে তারা মুড়ি-বিস্কুটের গুঁড়ো খাচ্ছিল। জেগে থাকতে যেমন দেখছিল। আর ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোণায় আঙুল বুলিয়েছিল পরিমল। এক ফোঁটা জল ছিল না। শুকনো খটখট করছিল দুটো চোখ।

এমন হাসি পাচ্ছিল তার স্বপ্নটার কথা ভেবে। বরং ঘুম ভাঙতে চোখ খুলে সে কী দেখল। দুটো ফুল তার মুখের ওপর নুয়ে আছে। দুটি সুন্দর মুখ। বুলা অমূল্য। অধীর আগ্রহ নিয়ে পরিমলকে দেখছিল। তাদের চোখে খুশি ঝলমল করছিল। রৌদ্র বেঁকে গিয়েছিল। পাতার ফাঁক দিয়ে বাঁকা রোদের টুকরোগুলি চালার ভিতর ঢুকে দুজনের মুখে এস পড়েছিল। তাই মুখ দুটো আরো বেশি সুন্দর লাগছিল।

যদি স্বপ্ন সত্য হত তো তাদের মুখে কি সে হাসি দেখতে পেত। বিষণ্ণ গম্ভীর দেখাত দুজনকে। ক্লান্তির অসহিষ্ণুতার ছাপ চোখে-মুখে লেগে থাকত।

তখনি পরিমল গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেছিল। এমন কী, অমূল্যর পায়ের দিকেও সে সতর্ক চোখে তাকিয়েছিল। যদি কাঁটা ফুটে পা ক্ষত হত তো পায়ের পাতা এমন সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে মাটিতে চেপে ধরে ছেলে দাঁড়িয়ে থাকত না. একটা পা একটু তুলে ধরে রাখত বা যখন হাঁটতে আরম্ভ করেছিল সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটত।

না, একটুও খুঁড়িয়ে হাঁটছে না অমূল্য, পরিমল এখন আবার দেখছে। তারা আগে আগে চলেছে। সে পিছনে। ইচ্ছা করে সে পিছনে হাঁটছে। দুজনকে দেখতে দেখতে অগ্রসর হচ্ছে। তখন যেমন হাঁটছিল।

নফরগঞ্জের বাজার থেকে বেরোতে দেরি হয়ে গেল। পরিমলের জন্যই দেরি হল। এমন হুট করে সে ঘুমিয়ে পড়বে বুঝতে পারেনি। আর তারাও তাকে ইচ্ছা করে ডাকেনি। দুজন অপেক্ষা করছিল, আপনা থেকে পরিমলদার যখন ঘুম ভাঙবে, তখন তিনজন রওনা হবে। তা ছাড়া হৃদয়পুর তো প্রায় এসে গেছে। চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে অমূল্য আঙুল দিয়ে দূরের নীলাভ ধূসর কটা গাছ ও একটা মঠের চূড়া দেখাচ্ছিল। 'কাজেই এত তাড়াহুড়া করার কিছু নেই। দেখতে দেখতে আমরা হৃদয়পুর পৌঁছে যাবে।' পরিমলের দিকে তাকিয়ে অমূল্য হাসছিল। তৎক্ষণাৎ বুলা বলছিল, 'আর হৃদয়পুরে নাকি দেখবার মতন তেমন কিছু নেই, তবে হ্যাঁ জায়গাটা সুন্দর, সেখানকার মাটি আকাশ গাছপালা—মানে প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো উপভোগ করার মতন, তাই না অমূল্য?' অমূল্যর দিকে আড়চোখে তাকিয়েছিল বুলা। কথাটা যে অমূল্য তাকে বলেছিল পরিমল বুঝতে পেরেছিল। তখন দোকান থেকে বেরিয়ে গিয়ে হৃদয়পুর নিয়ে তারা আলোচনা করেছিল। স্বাভাবিক। বুলার কথা শুনে পরিমল উৎসাহের সঙ্গে মাথা নেড়েছিল। 'না থাক দেখবার মতন তেমন কিছু, ঐ যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা বলছ—সেটাই তো সব, সেই জিনিসই তো আমরা বেশি উপভোগ করব, মনে নেই কাল বিষ্ণুপুরের সেই কাঁটাবনে পাগলটা কী বলেছিল, মানুষের হাতের গড়া জিনিস তার দু চোখের বিষ, এত সাধ করে শহর গড়তে গিয়ে, ঘরবাড়ি রাস্তা নর্দমা তৈরি করতে গিয়ে একটা নরক বানিয়ে ফেলল।' বুলা চুপ করে ছিল। পরিমল বলেছিল, 'পাগলের কথা শুনে আমরা হৃদয়পুর ছুটে যাচ্ছি। নামটাও সুন্দর। সেখানকার আকাশ মাটি যে সুন্দর হবে তাতে সন্দেহ কী।'

অমূল্য ঠোঁট টিপে হাসছিল। মাটির দিকে চোখ ছিল তার।

পরিমল সেখানেই থেমে থাকেনি। বলেছিল, 'অমূল্যও আমার মতন। প্রকৃতিকে সে ভালোবাসে। তাই তো বার বার সে সাগর দেখতে ছুটে যায়। তাই না অমূল্য? আমাদের হৃদয়পুর নিয়ে যাবার উৎসাহ তোমারও কিছু কম না।'

অমূল্য তখন চোখ তুলে প্রথম বুলার দিকে তারপর পরিমলের দিকে তাকিয়েছিল। যেন কিছু ভাবছিল সে। তারপর গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'বুলা বলছে বিষ্ণুপুর মাধবপুরের আকাশ মাটিও সুন্দর, গাছ গাছের ছায়া রৌদ্র বাতাস উপভোগ করার মতন, শুধু তাই দেখতে হৃদয়পুর বেশি সময় থেকে লাভ নেই।'

পরিমল হঠাৎ কথা বলেনি। বুলার চোখ দুটো দেখছিল। তার যেন মনে হচ্ছিল শান্ত কোমল সেই চোখ আজ অতিমাত্রায় অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আগে যা ছিল না। তার অর্থ অমূল্যর মনের আবেগ স্ফূর্তি উদ্দামতা অস্থিরতা বুলাকে পেয়েছে। অমূল্যর চোখের ভিতর প্রতি মুহূর্তে ঢেউ জাগছে। সারাক্ষণ সেখানে ঝড় বইছে। বাঁধন ছেঁড়ার নেশা। কেবল ছুটে চলার ব্যাকুলতা। এই দেশ যদি দেখা হল তো আর এক দেশে চল, এই আকাশ দেখলাম, এখন অন্য আকাশ দেখব। তাই কি! তাই, পরিমল তখনই বুঝতে পারল, হৃদয়পুরের আকাশ মাটি রৌদ্র ছায়া নক্ষত্র অন্ধকার দেখে এবারের মতন যাত্রা শেষ করে বাড়ি ফিরে যেতে বুলার মন চাইছে না। অন্য আকাশ তাকে টানছে, অন্য দেশের মাটি জল আলো অন্ধকার হাতছানি দিচ্ছে।

পরিমল খুশি হল নিশ্চিন্ত হল। বুলাকে আর একবার ভালো করে দেখল। আর বুলার পাশে দাঁড়ানো তার পুরুষ-ছায়া অমূল্যকে। অমূল্যর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিমলের মন পূর্ণ

হয়ে উঠল। তাই তো বুলাকে নিয়ে যখন সে বাড়ি থেকে বেরোয় তখন বুঝতে পারেনি কত দূরে ছিল সে—আঠারো বছরের একটি কোমল প্রাণ আর এই নরঘাতক, যার বয়স এখন ত্রিশের ঘরে, দশ বছর যে জেল খেটে এসেছে, জেলে থেকে পৃথিবীর যাবতীয় পাপ ও অপরাধের কথা যে শুনে এসেছে—দুটি জীবনের মধ্যে ব্যবধান কতটা বুঝতে না পেরে তারা দুজনই হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই বিষ্ণুপুরের মাঠে ঝড় উঠল। অমূল্য এসে ব্যবধান সরিয়ে দিচ্ছে দূরত্ব ভেঙে দিচ্ছে। ফুল আর আশ্চর্য গরিমা নিয়ে চোখ মেলে তাকিয়েছে। আর পরিমল টের পাচ্ছে, তার বুকের ভিতর আমোদিত হয়ে, ফুলের সৌরভে সে ভরে উঠছে। এই সাধনাই তো সে করে এসেছে। পরিমল পুরোনো জগতে ফিরে যেতে চাইছে না। বুলাও চাইছে না।

'বেশ তো, বেশি সময় হৃদয়পুর না থেকে তারপর আমরা কোথায় যাব সেখানে গিয়ে ঠিক করব, অমূল্য ঠিক করবে।' বুলার চোখে চোখ রেখে পরিমল হাসল।

বুলা হাসল। তার চোখের পলক নেচে উঠল।

অমূল্য আরও দূরে নিয়ে যাবে, সেখানে আকাশের রঙ অন্য রকম, বাতাসের স্বাদ আলাদা, রৌদ্রের গন্ধ নক্ষত্রের গান—কোনোটাই বিষ্ণুপুর মাধবপুর বা হৃদয়পুরের সঙ্গে মিলবে না, কথাটা চিন্তা করে বুলা যে পুলকিত হয়ে উঠবে এ খুবই স্বাভাবিক।

'তোমরা এগোও।' পরিমল বলেছিল, 'আমি পেছনে আছি।'

তারপর থেকে দুজন হাত ধরাধরি করে আগে আগে চলেছে। অনর্গল কথা বলছে। পরিমল পিছনে হাঁটছে। আর থেকে থেকে সে চিন্তা করছে স্বপ্নটার কথা। যেন তখনও আর একবার দৃষ্টিটা সূক্ষ্ম করে অমূল্যর পা দেখছিল সে, তার হাঁটা লক্ষ্য করছিল। যদি সত্যি তার পায়ে কাঁটা বিঁধত রক্ত ঝরত তো সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন এমন নেচে নেচে চলতে পারত না। মাঝে মাঝে থামতে হত, হয়তো একটু হেঁটে পায়ের যন্ত্রণায় আবার সে বসে পড়ত।

আর বুলা। একবার পুরুষের রক্তের স্বাদ পেলে কোনো মেয়ে এমন সহজ স্বাভাবিক থাকতে পারত কি! তখন সে হিংস্র হয়ে উঠত। একাধিক পুরুষের রক্তে স্নান করার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তাকে পেয়ে বসত। ফুলের মতন ঐ মেয়েটিকে দেখলে এখন তা কে বিশ্বাস করবে। পরিমল বিশ্বাস করতে পারল না। অমূল্যর হাত ধরে বুলা হাঁটছে, কথা বলছে। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে ঘাড় কাত করে শিশুর সরল দৃষ্টি নিয়ে সঙ্গীকে দেখছে। যদি অমূল্যর গায়ের এক ফোঁটা রক্ত, স্বপ্নের সেই বিশ্রী জিনিসটা যতবার মনে পড়ছে পরিমল শিউরে উঠছে, বুলা চোখে দেখত তো এভাবে সে ছেলেটির হাত ধরে হাঁটতে পারত না। তার হাত স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার বুলার মধ্যে রক্তের তৃষ্ণা জাগত। অমূল্যর হাত কামড়ে দিয়ে রক্ত বার করত, আর সেই রক্ত আবার সে জিভ দিয়ে চাটতে আরম্ভ করত, লজ্জা সঙ্কোচ ঘৃণা ভয় কিছুই তার থাকত না।

বস্তুত একটা কুৎসিত ঘুমের স্বপ্ন মানুষের জাগ্রত কল্পনাকেও যে কত আবিল অসুন্দর করে তোলে পরিমল তার প্রমাণ পেল। এমন একটা স্বপ্ন সে দেখতে গেল কেন! তার খুব দুঃখ হচ্ছিল। নিজের জন্য এবং ঐদুটি অপাপবিদ্ধ কিশোর কিশোরীর জন্য। রক্ত জিনিসটা এমন। দুশ্চিন্তা আতঙ্ক সন্দেহ কুটিলতার জন্ম দিতে এর জুড়ি নেই। এক ফোঁটা রক্তের জন্য আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কত ক্ষুধা তৃষ্ণা, কত হিংসা ও পাপের সৃষ্টি হয়েছে।

অবশ্য কারণটা যে পরিমল বুঝতে পারছিল না এমন নয়। এই স্বপ্ন—দুঃস্বপ্ন পরিমলকে তার অপূর্ণতা ও ব্যর্থতার কথাই আবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল। ঘুমের মধ্যেও যাতে সে কথাটা ভুলে না থাকে। যেমন সে এগিয়ে যাচ্ছে সেভাবে তাকে এগোতে হবে। মুহূর্তের বিস্মৃতি ও অসতর্কতা তাকে পিছনে ঠেলে দেবে। সাধকের জীবন সৈনিকের জীবন।

এবার পরিমল সন্তুষ্ট হল। দুঃস্বপ্ন দেখারও প্রয়োজন আছে মানুষের জীবনে। নিজের ওপর আর সে রাগ করল না, মন খারাপ করল না। তুমি সুস্থ সক্ষম হয়ে বেঁচে আছ। এক রাত্রে স্বপ্ন দেখলে রুগ্ন পঙ্গু অথর্ব হয়ে বিছানায় শুয়ে আছ। মৃত্যু তোমার শিয়রে অপেক্ষা করছে। জেগে উঠে কি দুঃস্বপ্নের কথা ভেবে তুমি মন খারাপ করবে হতাশ হবে। তা নয়। বরং অতিরিক্ত আশা নিয়ে উদ্যম নিয়ে নিজের দিকে ফিরে তাকাবে, আরও উজ্জ্বল উন্নত স্বাস্থ্যর অধিকারী হবার দীর্ঘায়ু হবার দৃঢ় সংকল্প তোমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।

স্বর্গের আলো তোমার মুখে এসে পড়েছে, সেই মুহূর্তে যদি অন্ধকার নরকের স্বপ্ন দেখ তো এই আশা নিয়েই কি তুমি বুক বাঁধবে না যে অন্ধকারটা মিথ্যা, আলোটাই এখানে সত্য। অন্ধকার ও আলোর পার্থক্য মনে রাখবার জন্য তোমার এমন একটা অবাঞ্ছিত স্বপ্ন দেখার প্রয়োজন ছিল।

তেমনি পরিমলের এই দুঃস্বপ্ন। সে সফল হচ্ছে পূর্ণ হচ্ছে। সিদ্ধির দরজায় পৌঁছে গেছে।, স্বপ্নের ভিতর দিয়ে ঈশ্বর তার অপূর্ণ অতীত, তার ব্যর্থতার ছবি আর একবার মনে করিয়ে দিল। পার্থক্যটা বুঝিয়ে দিল।

পার্থক্য! শব্দটা সে দুবার মনে মনে উচ্চারণ করল। বিষ্ণুপুরের মাঠের প্রতপ্ত জ্বালা আর নফরগঞ্জের বাজারে স্নিগ্ধ প্রশান্তি!

হৃষ্ট মনে পরিমল হাঁটতে লাগল।

তারা একটু বেশি এগিয়ে গেছে না!

এবার সে জোরে পা চালাল। হৃদয়পুর এসে গেছে। নীলাভ ধূসর গাছগুলির প্রত্যেকটি ক্রমেই সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট অবয়ব নিয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠছে। গাছের মাথায় রৌদ্র ঝলমল করছে। পাতাগুলি কাঁপছে। এখন আর শুধু মঠের চূড়া না, বেদিটাও দেখা যাচ্ছে। যেন কত যুগ আগের পলস্তরা খসে পড়ছে। জীর্ণ কঙ্কালের চেহারা ইটগুলির, আঙুল দিয়ে গোনা যায়।

হেমন্তের অপরাহ্ন। আকাশের আলো দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল। তারপর এক সময় দপ্ করে তা-ও নিভে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল।

কিন্তু তাতে খুব একটা ক্ষতি হল না। হৃদয়পুরে দেখবার মতন কিছুই নেই, সাধারণ একটা মন্দির মসজিদও চোখে পড়ল না। মানুষের ঘর বাড়িও যেন ছিল না, ভূতুড়ে চেহারার একটা মঠ, যেটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল, সেটাও কটা গাছপালা নিয়ে গ্রামের সীমানার বাইরেই থেকে গেল। মঠ পার হয়েই তো তারা গ্রামে ঢুকেছিল। তারপর আর কী, কাঁটাগুল্মে আচ্ছন্ন নির্জন ধূ-ধূ প্রান্তর মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে রয়েছে। এখানে-ওখানে দুটো একটা তাল খেঁজুর গাছ ছাড়া তেমন আর কোনো বড়ো গাছও চোখে পড়ল না। চতুর্দিকে একটা রিক্ততার ছাপ। যেন কত কাল এখানে চাষ-আবাদ হয়নি। না, হয়নি, অমূল্য বলছিল, পর

পর ক'বছর মড়ক হয়ে গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে। পাশাপাশি দুটো গ্রামেরই এক অবস্থা। হৃদয়পুর কাঞ্চনপুর শ্মশান হয়ে গেছে। যে দু-চারজন বেঁচে ছিল তারাও শেষটায় গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আর ফিরে আসেনি।

পরিমল হেসেছিল। এই জন্যই বুঝি বিষ্ণুপুরের সেই পাগল হৃদয়পুরের এত সুখ্যাতি করল। শ্মশানের চেয়ে সুন্দর পবিত্র স্থান আর কী আছে। কাজেই জায়গাটা একবার ঘুরে দেখে এসো।

পরিমলের কথা শুনে বুলা হেসেছিল। অমূল্যও হেসেছিল। দুজনই বুঝতে পারছিল, পরিমলদা হতাশ হয়েছে—হৃদয়পুরের আকাশ মাটির চেহারার মধ্যে দীনতা, একটা বিষাদের ছায়া ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। চারদিকে তাকিয়ে মনে ভার হয়ে ওঠে। দীর্ঘশ্বাসের মতন থেকে থেকে হাওয়া বইছিল আর প্রান্তরের ধূসর বিবর্ণ কাঁটাবন থর থর করে কাঁপছিল। একঘেয়ে ঝিঁঝির ডাক সেই কখন থেকে শোনা যাচ্ছিল। অন্ধকার হতে না হতে শেয়াল ডাকতে আরম্ভ করল।

আকাশে তারা দেখা গেল না। কুয়াশার মতন অস্পষ্ট ফ্যাকাশে একটু জ্যোৎস্না উঠল। সেই জ্যোৎস্না মুমূর্ষুর মুখের ক্লান্ত হাসির মতন করুণ ও ভয়ংকর মনে হতে লাগল। তার চেয়ে গাঢ় অন্ধকার রাত্রি ভালো ছিল। নক্ষত্রগুলি জ্বলজ্বল করত। মাটির চেহারা যেমন হোক, আকাশে কিছু উত্তাপ, কিছু প্রাণ ছড়িয়ে আছে বোঝা যেত। কিন্তু হৃদয়পুরের সবই বোবা মৃত।

ঠিক হল রাতটা কোনোমতে কাটিয়ে ভোর বেলা তারা বেরিয়ে পড়বে। অন্ধকারে কাঁটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে বুলার কষ্ট হবে। তা না হলে রাত্রেই তিনজন বেরিয়ে পড়ত। ধারেকাছে রিকশা বাস কিছুই পাবার উপায় নেই। আর যদি ট্রেন ধরতে হয় তা-ও প্রায় চার মাইল রাস্তা হাঁটতে হবে। পরিমল রাজি ছিল, অমূল্য তো পা বাড়িয়ে আছে, কিন্তু বুলার দিকে তাকিয়ে তারা নিবৃত্ত হল। বুলা অবশ্য ক্ষুণ্ণ হল। বার বার সে বলছিল রাত্রে হাঁটতে তার কোনো কষ্ট হবে না। অমূল্য যদি হাঁটতে পারে তো সে পারবে না কেন। কথাটা শুনে পরিমল মনে মনে হেসেছিল। অর্থাৎ অমূল্যর বয়সটাই দেখছিল বুলা, সে মেয়ে অমূল্য পুরুষ—এই জিনিসটা সে একবারও মাথায় আনতে চাইছিল না। স্বাভাবিক, পরিমল চিন্তা করল, সমবয়সী ঐ ছেলেটিকে নিজের ছায়া ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না বুলা। অমূল্য যা পারবে সে-ও তা পারবে। বুলার এই মন-খারাপ-করাটা পরিমল উপভোগ করল। যা হোক, তাকে বোঝানো হল, পরিমল ও অমূল্য দুজনই বোঝাল। সূর্য ওঠার অপেক্ষা করবে না তারা, একটু ফরসা হলেই আবার হাঁটতে আরম্ভ করবে। এই শ্মশান ছেড়ে তারা চলে যাবে। 'শ্মশান' শব্দটা বার বার উচ্চারণ করছিল বুলা; এই জন্যই তার মন খারাপ, এক মিনিট এখানে অপেক্ষা করতে সে রাজি নয়। কিন্তু উপায় কী? অবশ্য এই জন্য পরিমল ভিতরে ভিতরে লজ্জিত ছিল। অপরাধটা তার। নফরগঞ্জের চায়ের দোকানে এতটা সময় সে ঘুমিয়ে না কাটালে তারা কখন এখানে চলে আসতে পারত, তারপর রৌদ্র থাকতে থাকতে আবার এখান থেকে বেরিয়ে পড়ত। শ্মশানে রাত কাটাবার কোনো প্রশ্নই উঠত না।

রাত্রিবাসের মতন একটা আশ্রয় মিলল। গ্রামের পুব সীমানায় একটা ভাঙা মতন টিনের ঘর। তা এক রাত্রির তো ব্যাপার। অমূল্য খুঁজেপেতে ঘরটা আবিষ্কার করল। বাতাসে চালটা খটখট শব্দ করে নড়ছিল। দরজা জানালা কিছুই ছিল না। অমূল্য বলছিল, গাঁয়ের এদিকটায়

হালে নূতন করে কিছু মানুষ আসতে আরম্ভ করেছে। তারা চাষ-আবাদ করছে, নূতন ডেরা বেঁধেছে। দু-চারটি পরিবার, আঙুলে গোনা যায়, সম্ভবত বাস্তুহারা। টিনের ঘরটা আগের দিনের। মড়কের ভয়ে যারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল কী যারা মারা পড়েছিল তাদের কোনো পরিবার এঘরে থাকত। বাস্তুহারারা কিন্তু এ-ঘর ব্যবহার করতে সাহস পায়নি। তবে দরজা জানালা যে তারা খুলে নিয়ে গেছে এবং একটা দুটো করে চালের টিনও সরাতে আরম্ভ করছিল বোঝা যায়। 'তা হোক, আমরা এখানে রাত কাটাতে পারব, মড়কের আমলের ঘর বলে আমাদের একটুও ভয় করবে না, বরং মাইলের পর মাইল জুড়ে কালচে রঙের কাঁটাবন আর মরা মাছের চোখের মতন সাদাটে জ্যোৎস্নাটা আর দেখতে পারছি না, আমার গা বমি করছে—' বুলা বলছিল, 'তবু যা হোক একটা আশ্রয় মিলল।' ঘর দেখে সে খুশি হয়েছিল। খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে বুলার যে ভালো লাগছিল না, ভয় পাচ্ছিল, অসহায়বোধ করছিল, পরিমল ও অমূল্য দু'জনই বুঝতে পেরেছিল। তাই যেন অমূল্য শেষটায় মরীয়া হয়ে কাঁটার ভিতর দিয়ে ছুটোছুটি করে ঘরটা খুঁজে বার করেছে। অমূল্য সঙ্গে না থাকলে বুলা ও পরিমলকে যে ভয়ানক বিপদে পড়তে হত সন্দেহ ছিল না। করিৎকর্মা ছেলে। নিজেই হাত লাগিয়ে চট-পট্ ঘরের ভিতরটা পরিষ্কার করে ফেলল, একটা আলো জোগাড় করে নিয়ে এল। তারপর সে বেরিয়েছে চাল ডাল নুন কাঠ জোগাড় করতে। দিনের বেলা তেমন কিছু খাওয়া হয়নি কারো। 'এখানে রাত্রিবাস যখন কপালে লেখা আছে, তখন আর রান্নাবান্না করতে ক্ষতি কী।' অমূল্যর প্রস্তাব শুনে বুলা ও পরিমল এক সঙ্গে আপত্তি তুলেছিল। 'আর এই কাঁটার ভেতর তোমাকে ছুটোছুটি করতে হবে না—নফরগঞ্জের বাজার থেকে চিড়ে-মুড়ি আনা হয়েছে, তাই বসে বসে চিবোনো যাবে।' পরিমলের চেয়ে বুলাই যেন বেশি আপত্তি করছিল। তার সমবয়সী একটি ছেলে এত কষ্ট করছে আর সে দিব্যি হাত পা গুটিয়ে বসে আছে, বুলার এটা সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু অমূল্য কারো আপত্তি শুনল না। 'চিড়েমুড়ি আবার একটা খাদ্য', বলে দাঁত বের করে হেসে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে। 'একলা তোমার এত সব বয়ে আনতে অসুবিধা হবে, আমি সঙ্গে যাব।' বুলা বলেছিল, কিন্তু অমূল্য তাতেও রাজি হয়নি। 'তোমার পায়ে কাঁটা বিঁধবে—আর তা ছাড়া পরিমলদা একা একা এমন একটা ভুতুড়ে ঘরে বসে থাকবে নাকি—তাঁর ভয় করবে না?'

যেন অমূল্যর এই শেষ কথাটাই দুজন বসে বসে চিন্তা করছে এখন। একটা ভাঙা ইটের ওপর কেরাসিনের লম্ফটা বসিয়ে দিয়ে গেছে অমূল্য। খোলা দরজা দিয়ে মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝাপটা ঘরে ঢুকছে। বাতির শিখাটা কাঁপছে দুলছে। দপ্ করে একসময় না আলোটা নিবে যায় তাই লম্ফটা আগলাবার মতন করে দুজন ঘন হয়ে মেঝের ওপর বসে আছে। তা হলেও হাওয়া লেগে আলোটা এক একবার নড়েচড়ে উঠছিল আর তখন উল্টোদিকে বেড়ার গায়ে বুলার মাথা ও পিঠের কালো ছায়াটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল, বড়ো হয়ে উঠছিল। পরিমল কয়েকবার জিনিসটা লক্ষ্য করেছে। নিশ্চয় আর একটা বেড়ার গায়ে পরিমলের ছায়া পড়ে এভাবে সেটা কাঁপছিল নড়ছিল। কিন্তু বুলা যে একবারও সেদিকে চোখ ফেরাচ্ছে না, সেদিকে কেন পরিমলের দিকেও তাকাচ্ছে না, চুপ করে কেবল বাতির শিখাটা দেখছে, পরিমল লক্ষ্য করছিল। অমূল্যর কথা চিন্তা করছে সে, পরিমল বুঝতে পারছিল, চাঁদের ফালির মতন

সরু ললাটে চিন্তার রেখা দেখা দিয়েছে, যে জিনিস আগে কখনও পরিমলের চোখে পড়েনি। অবশ্য অমূল্যর কথা পরিমল নিজেও ভাবছে। কিন্তু বুলার ভাবনার গভীরতাটা যেন বেশি। অমূল্য কখন ফিরবে, চাল ডাল জোগাড় করতে কতটা পথ আবার তাকে হাঁটতে হবে—চিন্তার কথাও বটে। কিন্তু—

'তুমি কি অমূল্যর কথা ভাবছ?' পরিমল প্রশ্ন করল।

'কেন বলুন তো!' বুলা চমকে উঠল। পরিমলের দিকে চোখ তুলল।

'কিছু একটা চিন্তা করছ দেখতে পাচ্ছি।' পরিমল হাসতে চেষ্টা করল। বুলা গম্ভীর হয়ে বাতির শিখার দিকে চোখ নামাল।

'আমি নিলয়ের কথা ভাবছি।' একটু পরে বলল সে।

'সে কী! সে তো কাল কখন বাড়ি পৌঁছে গেছে।' পরিমল বিস্মিত হল। 'হঠাৎ নিলয়কে মনে পড়ছে?'

বুলা চুপ করে রইল।

'তা হলে বাড়ির কথা ভাবছ। বলো?' পরিমল ঈষৎ ঝুঁকে বসল।

বুলা নখ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে লাগল।

'এই! আমার দিকে তাকাও।'

বুলা চোখ তুলল না।

'তুমি কি আমার দিকে তাকাবে না!'

মাটিতে আঁচড় কেটে চলল বুলা।

'শোন!' পরিমল তার কাঁধে হাত রাখল।

'উঃ, আজ আবার আপনি—'

'হ্যাঁ, বলো বলো—আজ আবার আমি.....কী বলছিলে বলো?'

বুলা কঠিন হয়ে রইল। কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে আনল পরিমল।

'অদ্ভুত মেয়ে!' বিড়বিড় করে বলল সে।

'কেন, একথা বলছেন কেন।' বুলা ভুরু কোঁচকাল। যেন রুষ্ট হল কথাটা শুনে। স্থির চোখে পরিমলকে দেখল। পরিমল চুপ।

'হ্যাঁ, এই তো তাকাচ্ছি আপনার দিকে, বলুন এবার কী বলবেন।'

তার গলার স্বরের দৃঢ়তা শুনে পরিমল স্তম্ভিত হল।

'হ্যাঁ, আমি অমূল্যর কথা ভাবছিলম—এই তো জানতে চাইছেন আপনি?'

পাথরের মতন শক্ত হয়ে গেল পরিমলের চোয়াল চিবুক। চোখের পলক পড়ছিল না। এক সেকেন্ড। তারপর সে হেসে উঠল।

আর একটা হাওয়ার ঝাপটা ঘরে ঢুকল। আলোটা কেঁপে উঠল। বেড়ার গায়ে বুলার গোল ছায়াটা নড়ে উঠল। পরিমল আর ঝুঁকে থাকল না, সোজা হয়ে বসল।

'আমি তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, হঠাৎ নিলয়ের ভাবনা ভাবছ শুনে অবাক লাগছিল।'

'নিলয়ের কথাও ভাবছি।'

'কি রকম?' পরিমলের মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠল।

'উঃ আপনি এত খোঁচাতে পারেন মানুষকে।' বুলা মাটির দিকে চোখ নামাল। নরম চোয়াল দুটো কঠিন হয়ে উঠেছে। তীক্ষ্ন চোখে পরিমল লক্ষ করল।

'আমার দিকে তাকাও।' খুব একটা চিৎকার করতে পারল না কিন্তু সে।

'আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, আমায় একটু চুপ থাকতে দিন।' হাঁটুর ভিতর বুলা মুখ গুঁজল।

পরিমল বিমূঢ় হয়ে গেল। তার বুকের ভিতর চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। কোথায় সিদ্ধি! বড়ো যে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল স্বর্গের আলো তার মুখে এসে পড়েছে। আনন্দে নাচতে নাচতে লম্বা পা বাড়িয়ে হৃদয়পুরের দিকে এগিয়ে এসেছিল। এসে কী দেখছে এখন। ব্যবধান যোজনবিস্তৃত। আরও বেশি। একটুও অগ্রসর হতে পারেনি সে। কথার সুর কথা বলার ভঙ্গি! তবু বিষ্ণুপুরের মাঠে অসহায়তা ছিল কান্না ছিল কাতর মিনতি ছিল এবং ভয়। সুন্দর একটা ভয়। শ্বাপদের জ্বলন্ত চোখ দেখে হরিণী এমন ভয় পেয়েছে। এখন শুধু কাঠিন্য বিরক্তি ভ্রূকুঞ্চন, আর স্তূপ স্তূপ ঔদাসীন্য। হাতের আঙুলগুলি মটকাতে লাগল পরিমল।

'শোন!' ধরা গলায় সে ডাকল।

'বলুন।'

'এদিকে তাকাও।'

'আপনি বলুন আমি শুনছি।'

'তুমি কি চোখ তুলে তাকাবে না!' আর্ত ক্ষুব্ধ গলায় পরিমল চেঁচিয়ে উঠল।

'না।'

আর একটা ধাক্কা খেল সে। আরও খানিকটা নীচে গড়িয়ে পড়ল। চুপ করে রইল। চাল ডাল নিয়ে অমূল্য ঘরে ঢুকল।

॥ ৫৩ ॥

হাতের জিনিস মাটিতে নামিয়ে রেখে অমূল্য সোজা হয়ে দাঁড়াল। ক্লান্ত, কিন্তু মুখে সুন্দর হাসিটি লেগে আছে। বুলা কিন্তু মুখ তুলছিল না। চুপ করে বসে আছে। পরিমল ভেবেছিল, অমূল্যকে দেখামাত্র বুলা উঠে দাঁড়াবে। ভোরের আলো চোখে লাগার সঙ্গে সঙ্গে পাখি চঞ্চল হয়, পুলকিত হয়, পাখা নেড়ে নীড় থেকে বেরিয়ে আসে, গান গায়, শিস দেয়। তেমনি বুলার চোখে মুখে খুশি ঝলক দিয়ে উঠবে। হাত-পা ঝেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অমূল্য কী কী নিয়ে এল, উৎসুক হয়ে দেখবে, তার শরীর ঘেঁষে দাঁড়াবে আর কলকল কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে দেবে।

সে-সব কিছুই হল না। আবহাওয়া থমথমে হয়ে রইল। পরিমলও চুপ করে রইল। বরং বুলার এই আচরণ দেখে পরিমল অস্বস্তিবোধ করল। তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করছিল, 'তুমি কথা বলো, প্রাণের রঙটি ফিরিয়ে আন, তোমার কালো চোখ থেকে আলো ঠিকরে পড়ুক। আমিও হাল্কা হই—আবার কতক্ষণ যন্ত্রণাটা ভুলে থাকব।'

'কী হল, আপনারা এমন চুপচাপ!' অমূল্য প্রথম কথা বলল।

'তোমার দেরি দেখে দুশ্চিন্তা করছিলাম।' পরিমল হাসতে চেষ্টা করল। 'বুলা বার বার বলছিল, কত দূর গেছে অমূল্য, কে জানে!'

অমূল্য আড়চোখে বুলাকে দেখল।

'আশ্চর্য মেয়ে! বার বার বলে গেলাম, সব জোগাড় করে ফিরতে হয়তো একটু দেরিই হবে—আর অমনি ভাবনা শুরু হল। বুলা কথা বলছ না যে?'

নখ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে আরম্ভ করল বুলা।

'ও কী! আমার দিকে তাকাও।' অমূল্য চেঁচিয়ে উঠল। বুলার সামনে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। 'কী হয়েছে তোমার।'

কথা বলবে না, তাকাবে না, এমন একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে বুলা অধোবদন হয়ে আছে বোঝা যাচ্ছিল। অমূল্য তার চিবুক ধরে নাড়া দিল। এবার বুলা চোখ তুলল। ছলছল করছে চোখ।

'কী হয়েছে তোমার, ভূতের মতন চুপ করে আছ কেন। অমূল্য তার চোখের ভিতর তাকাল।

'আমার ভয় করছিল।' কথা বলতে গিয়ে বুলার ঠোঁট কাঁপল।

অমূল্য অবাক হল। হঠাৎ কথা বলল না। তারপর হাসল। 'সে কী কথা, পরিমলদা বসে আছেন এখানে, তবু তোমার ভয়, আমি আরো ভাবলাম, একলা থাকলে তাঁর মন খারাপ লাগবে, হ্যাঁ, একলা থাকলে তাঁরও ভয় করা অস্বাভাবিক ছিল না, অপরিচিত জায়গা, তা-ছাড়া, এমন একটা ঘর, কাজেই দুজন আছ যখন, মনে করলাম গল্পটল্প করে সময়টা কাটিয়ে দেবে—'

'আমার খুব খারাপ লাগছিল, বিচ্ছিরি লাগছিল এখানে বসে থাকতে।' ভয়ের কথা অমূল্য বিশ্বাস করছে না, তাই যেন বুলা অন্য কথা বলল। তারপর উল্টোদিকের বেড়ার গায়ে অমূল্যর লম্বা ছায়াটা দেখল। বাতির শিখাটা এতক্ষণ পর স্থির হয়েছে। অমূল্যর ছায়াটা একটুও নড়ছে না, কাঁপছে না। কেমন একটু অসহায়ের মতন বুলার দিকে তাকিয়ে থেকে অমূল্য পরে পরিমলের দিকে চোখ ফেরাল। 'দাদা—'

অস্পষ্ট একটা হাসি ঝুলছিল পরিমলের ঠোঁটে। অমূল্যর তাকানো দেখে এবং 'দাদা' ডাক শুনে পরিমল বুঝতে পারল, বুলার এত খারাপ লাগছিল কেন, বিচ্ছিরি লাগছিল কেন, অমূল্য এবার তার কাছে জানতে চাইছে। উত্তরটা মনে-মনে তৈরি করে রেখেছিল পরিমল। 'তুমি ছিলে না, সেই জন্য বুলার মন ছটফট করছিল, এসে গেছ, এখন তার মন ভালো হয়ে যাবে।'

'কী মুশকিল!' অমূল্য আবার বুলাকে দেখল। বুলার এই জিনিসটা যে সে পছন্দ করছিল না তার চোখ দেখে, গলার স্বর শুনে পরিষ্কার বোঝা গেল। 'আমাকে যে আবার এখনি বেরোতে হবে। চাল ডাল এনেছি—কিন্তু তেল নুন মসলা এখানে চাষিদের ঘরে পেলাম না। কাঞ্চনপুর যেতে হবে—শুনেছি, সেখানে একটা ছোটোখাটো মুদি দোকান খুলেছে।'

'আবার তুমি বাইরে যাচ্ছ!' বুলা আর্তনাদ করে উঠল। 'না, না, তোমার পায়ে ধরি, ঘর ছেড়ে এখন যাবে না।'

'আশ্চর্য ছেলেমানুষ তো!' অমূল্য পরিমলের দিকে তাকাল। 'শুধু চাল ডাল দিয়ে কী হবে—খিচুড়ি? তা-ও তো তেল নুন না হলে চলবে না—আর, একটু হলুদ লঙ্কা না দিলে এ-জিনিস মুখে তোলা যাবে! বলুন দাদা, আপনি বলুন।'

বলবার আগে পরিমল বুঝি চোয়াল দুটো শক্ত করে চেপে ধরল। একটা গরম নিশ্বাস ফেলল। তারপর ক্ষীণ হাসিটা ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে দিল। 'বেশ তো, ও যখন চাইছে না, আর তোমার বাইরে গিয়ে কাজ নেই। বরং—'

'আপনিও এ-কথা বলছেন!'

পরিমল চুপ করে রইল।

'তা-ছাড়া, আরো কাজ আছে আমার। অমূল্য ঘাড় ঘুরিয়ে বুলাকে দেখল। 'কাঠ আনতে হবে। ধারেকাছে জল নেই, জল ছাড়া কিছুই হবে না। ওদিকে একটা দিঘি দেখে এসেছি। পরিষ্কার জল টলটল করছে। চাষিদের কাছ থেকে একটা কুঁজো-কলসি, যা হোক জোগাড় করে জল আর কাঠ একসঙ্গে নিয়ে আসব ভেবেছি।'

'তোমাকে যে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।'

'আমি এটাকে পরিশ্রম মনে করি না, দাদা। কাজে নেমে একটুখানি করে সেটা ফেলে রাখা আমার ধাতে সয় না। এই কুঁড়েমি কেন। সারাদিন ভাত খাওয়া হয়নি। হাত-পা থাকতে দুটো ভাত ফুটিয়ে খেতে পারব না!'

'চিড়ে-মুড়ি যা আছে, তাই দিয়ে চলে যাবে—একটা রাত তো—' বুলা বলতে আরম্ভ করেছিল। অমূল্য রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলল।

'চিড়ে-মুড়ি তুমি খেও—আমাদের ওই খেয়ে পোষাবে না, দাদা রাত খাবেন, আমি ভাত খাব। ভাত না খেয়ে আমরা পারব না।' অমূল্য হঠাৎ নেমে গেল। বুলা কেমন নিথর নিস্পন্দ হয়ে আছে। যেন আর কিছু তার বলার নেই। অমূল্য তার দিকে একবারও তাকাবে না, কেবল রান্না-খাওয়ার কথা চিন্তা করবে, জেদী একরোখা মানুষের মতন নিজের কর্তব্যের কথাই ভাববে, বুলা বুঝি এটা আশা করতে পারেনি। তাই বিমূঢ় অসহায় চোখ দুটো মেলে সমবয়সী ছেলেটিকে দেখছে—তার ছায়া তার শরীর থেকে, মন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, দূরে সরে যাচ্ছে, তাই কি? জিনিসটা লক্ষ্য করল পরিমল। সে-ও কথা বলতে পারছিল না। চুপ থেকে ভাবছিল। পায়চারি করছিল। একবার দরজার কাছে সরে গেল সে। উঁকি দিয়ে বাইরেটা দেখল।

'কোথায় যাচ্ছেন!' অমূল্য পিছন থেকে হেঁকে উঠল।

'কোথাও যাচ্ছি না, রাত দেখছি।' পরিমল ঘাড় ফেরাল। অমূল্য কি সন্দেহ করছে, কোথাও সে চলে যাবে, চলে যেতে চাইছে? কোথায় সে যাবে—অপরিচিত জায়গা, পথঘাট জানা নেই, অমূল্যকে ছাড়া যে এক পা-ও আর কোনো দিকে এগোতে পারবে না সে। 'অনেক রাত হয়েছে মনে হয় অমূল্য?'

অমূল্য মাথা নাড়ল।

'মানুষজন নেই—চারদিক চুপচাপ, মাঠের ওপর একটু রাত হলেই মনে হয় নিশুতি নেমেছে।'

'বাতাসটাও হঠাৎ কেমন থেমে গেল না!' বিড়বিড় করে উঠল পরিমল।

'তা হতে পারে, বাতাসের মর্জি বোঝা শক্ত।'

'মনে হয় ঝড় উঠবে—আকাশের রঙটা ভালো দেখছি না।'

'ঝড় উঠলেও আমাকে যেতে হবে।' পরিমলের চোখে চোখ রেখে অমূল্য হাসল। 'ঝড়জল হচ্ছে বলে আজ ফেলে রাখব, সে-ছেলে আমি নই।' দৃপ্ত কঠিন ভঙ্গি নিয়ে দরজার দিকে সে এগোতে লাগল। 'তাছাড়া, কতক্ষণ লাগবে—ছুটে যাব, ছুটে চলে আসব।'

'তুমি যেও না অমূল্য, আমায় এভাবে ফেলে রেখে তুমি যেও না।' বুলা কেঁদে উঠল। দরজার দিকে ছুটে গেল। যেন অমূল্যর সঙ্গে সে-ও বাইরে ছুটে যাবে।

আশ্চর্য, তখনও অমূল্য মিটিমিটি হাসছিল। দরজার বাইরে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পরিমলের দিকে আর একবার তাকাল।

'ওকে ধরুন দাদা, এত রাত করে কাঁটাবনের ভেতর দিয়ে আমার সঙ্গে কোথায় হাঁটবে।'

'কান্নাকাটি করছে যখন, তুমি না-ই-বা গেলে।' ছেলেটিকে আর একবার বোঝাতে চেষ্টা করল পরিমল। এবার যেন তার গলায়ও একটা অনুরোধ, একটু কাতরতা ফুটে উঠল। অমূল্য শুনল না।

'আপনার কাছে আছে যখন, তার ভয়টা কোথায়, ভাবনাটা কীসের।' বলে হনহন করে সে হাঁটতে আরম্ভ করল।

অমূল্য নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে, পরিমল চিন্তা করল। বুলা যে এখানে থাকতে ভয় পাচ্ছে এবং পরিমলও যে একলা একটা ঘরে তাকে নিয়ে ভয়ংকর অস্বস্তিবোধ করছে, অমূল্য পরিষ্কার টের পেয়ে গেল। তাই বিধাতার মতন এমন হাসতে হাসতে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল : যেন বিধাতার মতন অদৃশ্য থেকে সে পরীক্ষা করবে, মাঠের এই নির্জন ঘরে তারপর দুজন কী করে!

পরিমলের দু কান গরম হয়ে উঠল। তার মনে হল, বাতাসটা যেন আরও জমাট বেঁধে গেছে, সীসার মতন ভারি হয়ে এখন আকাশের নীচে ঝুলছে, আর কী বিদঘুটে চেহারা হয়েছে আকাশের! আকাশের এমন একটা রঙ হতে পারে তার ধারণা ছিল না। মেঘ থাকলে ভালো হত, ঘুটঘুটে অন্ধকার ভালো ছিল। কিন্তু এমন ফ্যাকাশে হলুদ ছোপ ধরা জ্যোৎস্না! নরকের অন্ধকারের কথা সে শুনেছে। কিন্তু নরকে যদি কোনো আলো থেকে থাকে তো এই সেই আলো। প্রতিমুহূর্তে প্রলয়ের কথা, ধ্বংসের কথা মনে করিয়ে দেয়, মৃত্যুকে মনে করিয়ে দেয়। অথচ প্রলয় বা মৃত্যুর দেখা নেই। তার অর্থ তোমার আতঙ্ক কখনও শেষ হবার নয়। ধ্বংসের মধ্যে আতঙ্কের পরিসমাপ্তি, মৃত্যুর মধ্যে যন্ত্রণার অবসান! কিন্তু তা হলে আর নরক যন্ত্রণা হল কি। হৃৎপিণ্ডের রক্ত হিম হয়ে থাকবে আর প্রতিনিয়ত তুমি চোখের সামনে বিভীষিকা দেখবে, মৃত্যুর পায়ের শব্দ শুনবে। অনন্তকাল ধরে এই চলবে। এর নাম অনন্ত যন্ত্রণা।

খুব খারাপ লাগছিল তার বাইরের চেহারাটা। এমন একটা মরা জ্যোৎস্না আর মাঠের পর মাঠ জুড়ে কালো থোকা থোকা কাঁটার ঝোপ। ঝড় উঠবে এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ছিল না। কখন উঠবে সেটাই প্রশ্ন। এত গুমোট, এমন নিঃশব্দ হয়ে আছে পৃথিবী। পরিমলের মনে হচ্ছিল চতুর্দিকের এই গুমোট ও স্তব্ধতা যেন তার রক্তের মধ্যে ঢুকে পড়ছিল। তার মাথা ঝিমঝিম করছিল। তাড়াতাড়ি সে ঘরের ভিতর চলে এল।

কিন্তু তা হলেও কি যন্ত্রণা থেকে সে নিস্তার পেল! সেই মুহূর্তে কথাটা তার মনে পড়ল। বিষ্ণুপুরের মাঠের নির্জনতা ও স্তব্ধতা একান্ত করে তার ছিল। তার এবং মানুষটির। মাটির ওপর উবু হয়ে বসে যে আর এখন নির্নিমেষ চোখে বাতির শিখাটা দেখছে না, কালিঝুল মাখা বেড়াটা ধরে চুপ করে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। বেণী খুলে গিয়ে চুলটা কোমরের নীচে ঝুলছে। আঁচলটা মাটিতে লুটোচ্ছে। অমূল্যর সঙ্গে বাইরে ছুটে যাবার জন্য কতখানি উত্তাল অস্থির হয়ে উঠেছিল বোঝা যায়।

হ্যাঁ, বিষ্ণুপুরের সেই কড়িগাছতলার নির্জন জগতে তারা দুজন ছাড়া আর কেউ ছিল

না যে। কিন্তু এখন আর একজন এসেছে, তৃতীয় ব্যক্তি, অমূল্য। পরিমলই তাকে টেনে এনেছে। নিয়তির মতন দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অমূল্য এখন হাসছে। তাই আজকের এই একাকীত্ব এত ভয়ংকর এত দুঃসহ মনে হচ্ছে।

'শোন!'

'বলুন।'

'আমার দিকে তাকাও।'

'আপনার কী বলবার আছে বলুন।'

'অবাধ্য মেয়ে।' গর্জন করে উঠতে চেয়েছিল পরিমল। পারল না। দাঁতে দাঁত ঘষতে গিয়ে টের পেল তার চোয়াল শিথিল হয়ে গেছে, হাতের মুঠ দুটো বজ্রের মতন কঠিন করতে চেষ্টা করল সে, দেখল স্নায়ুর জোর চলে গেছে। কেবল বিধ্বস্ত করুণ গলায় বলতে পারল, 'তুমি কি আমার দিকে তাকাবে না।'

'এখানেই তো দাঁড়িয়ে আমি, পালিয়ে যাইনি, বলুন শুনছি।' উত্তপ্ত কঠিন কণ্ঠস্বর বুলার।

তাই তো, স্তব্ধ হয়ে রইল পরিমল। কী বলবে সে, কিছু বলতে গেলে যে সেই প্রাণচঞ্চল দীপ্ত কিশোর মূর্তি তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। হাসে। বড়ো বড়ো চোখ, টিকলো নাক, মাথাভর্তি কালো কোঁকড়া চুল, তরুণ দেবদারুর মতন ঋজু সুঠাম দেহ।

মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছিল পরিমলের।

তা হলে কি সত্যি অমূল্যকে ছাড়া চলবে না! এই ফুল অস্ফুট থাকবে অসম্পূর্ণ থাকবে? পাপড়ি খুলবে না, গন্ধ বিলোবে না, লাবণ্য ছড়াবে না?

পরিমলের কাঁদতে ইচ্ছা করছিল।

'তুমি কি বাড়ি ফিরে যাবে?'

'কেন?' বুলা চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল। ভ্রূকুটি করল।

'তাই তো কথা ছিল।' পরিমল একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল। 'হৃদয়পুর দেখা শেষ করে আমরা বাড়ি ফিরে যাব।'

বুলা মাথা নাড়ল।

'এখন আর ফেরা হয় না।'

'কেন!' রুক্ষ হতে গিয়ে পরিমল হাসল। 'ও, অমূল্য এসেছে বলে?'

'মোটেই না।' বুলা বেড়ার দিকে চোখ ফেরাল। 'অমূল্যর সঙ্গে তো পথে দেখা।'

'হুঁ, তারপর?'

'আপনি আমাকে বেড়াতে নিয়ে এসেছিলেন।'

'তা এনেছিলাম, বেড়ানো শেষ হয়েছে, মাধবপুরেই শেষ হয়েছিল, নিলয় ফিরে গেছে, তোমাকে ফিরে যেতে বলেছিলাম।'

বুলা চুপ করে রইল।

'কথা বলো।' পরিমল তার হাত ধরল। কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। হাত ছাড়িয়ে নিল বুলা। আর একটা বেড়ার কাছে সরে গেল সে। পরিমল সেখানে ছুটে গেল। ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছিল তার।

'বুলা, আমার কথার উত্তর দাও, আমার মুখের দিকে তাকাও।'

'উঃ, আবার আপনি সে রকম আরম্ভ করলেন, সেদিনের মতন!' পরিমল তার কাঁধ দুটো চেপে ধরেছে, বুলা কেঁপে উঠল, কেঁদে উঠল। 'আপনি সরে দাঁড়ান, আমার কাঁধ ছেড়ে দিন।'

'কী হয়েছে, এমন করছ কেন, আমাকে দিয়ে এত ভয়!' পরিমল হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসির পরিবর্তে গলা দিয়ে একটা বিকৃত আওয়াজ বেরোল। বুলা চিৎকার করে উঠল।

'আমার ভয়, আপনারও ভয়—আপনি কোন্ সাহসে অমূল্যকে যেতে দিলেন, বিষ্ণুপুরের সেই গাছতলার কথা ভুলে গেছেন? এই জন্যই তো অমূল্যর সঙ্গে আমি যেতে চেয়েছিলাম।'

'অমূল্য আসবে, এখনি এসে যাবে, সে তো চলে যায়নি, তেল নুন মশলা আনতে কাঞ্চনপুর গেছে—'

'তবে ততক্ষণ আপনি বাইরে গিয়ে বসুন, মাঠে চলে যান—এখানে থাকবেন না।'

'এখনি ঝড় উঠবে যে।' পরিমল বলল, 'আকাশের চেহারা ভালো না।'

'তবে আমায় যেতে দিন, আমি ঝড়ের ভয় করি না, আমি মাঠে বসে থাকব। ঝড়-ভূমিকম্প অনেক ভালো—'

'শুধু আমাকে ভয়, আমি ঝড়ের চেয়েও সাংঘাতিক, ভূমিকম্পের চেয়েও ভয়ংকর—' বিড়বিড় করে উঠল পরিমল, তেতো মতন একটা ঢোক গিলল। 'অমূল্য ফিরে এলে আর ভয় করবে না তোমার, আবার তখন তুমি এখানে, এ-ঘরে আমার সামনে দাঁড়াতে পারবে—তাই না বুলা?'

'তাই তাই'—যেন অতি দ্রুত শীর্ণ সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছিল বুলা, মুখ থেকে শেষ রক্তবিন্দুটি সরে যাচ্ছিল। 'এইজন্যই তো অমূল্যকে সঙ্গে আনা, আপনাকে দিয়ে আমার ভয়, আমাকে দিয়ে আপনার ভয়—সেদিন দুজনকে একলা ফেলে রেখে নিলয় পানকৌড়ি শিকার করতে চলে গেল, আর তখন কী ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে চলেছিল, আমি কেঁদেছিলাম, ভয় পেয়ে আপনিও শেষটায় কাঁদতে আরম্ভ করেছিলেন।'

'না, না, আজ আর ভয় নেই বুলা, আমি ভয় জয় করেছি, আমার কাছে এসো, আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ, বুঝতে পারবে আমি কী চাইছি, সেদিন বুঝতে পারনি বলে তোমার এত ভয় করছিল, আমিও ভয় পেয়েছিলাম, আমিও বুঝতে পারিনি কী চেয়েছিলাম।'

প্রবল আকর্ষণে পরিমল তাকে বুকের ওপর টেনে নিল। বেত-লতার মতন বুলা কাঁপতে লাগল।

'উঃ, আপনি এত নিষ্ঠুর, এত শয়তান!'

'ভুল করছ বুলা, আমি অমূল্য হতে পেরেছি, অমূল্যর মতন সুন্দর পবিত্র, আমি বুলা হতে পেরেছি, বুলার মতন কোমল পরিচ্ছন্ন—আমিও অমূল্যর আর-একটি ছায়া, বুলার আর-একটি ছায়া, দুজনের কত কাছে এসেছি দেখ। আমার এতদিনের সাধনা সফল হল, আমি সিদ্ধ হলাম—'

'আপনার পায়ে ধরি আমায় ছেড়ে দিন, আমি বাইরে ছুটে যাই, এখানে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, আমি মরে যাব......আমি.....' শরবিদ্ধ পাখির মতন বুলা ছটফট করছিল। কাঁদছিল।

পরিমল আরও জোরে তাকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরল। বার বার তার কপালে চিবুকে চুমু খেল।

[illegible] হতে পেরেছি, আমি ফুল হতে পেরেছি—ঐ তো তোমার চোখের তারায় আমার মুখ ভাসছে, আমাকে দেখছি সেখানে, অমূল্য যেমন ওই [illegible] চোখের ভেতর বার বার তার মুখ দেখে—তাকাও ভালো করে আমার দিকে, তাকাও—' বুলার মুখটা শক্ত করে চেপে ধরল পরিমল, তারপর সেই মুখ নিজের মুখের সামনে তুলে ধরল। 'কী দেখছ এখানে, আমার চোখে? বুলাকে দেখতে পাচ্ছ না, বুলার সুন্দর মুখ? তাকাও—'

'না, না, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, শুধু রক্ত, উঃ, ভয় করছে লাল টকটকে চোখ দুটোর দিকে তাকাতে, আমায় ছেড়ে দিন, আপনার পায়ে ধরছি.......' যেন শেষ পর্যন্ত চিৎকার করার, কাঁদবারও আর শক্তি রইল না বুলার; গোঁ গোঁ একটা শব্দ বেরোতে লাগল গলা দিয়ে, আর সবল কঠিন হাতে পরিমল একটা একটা করে তার গায়ের কাপড় খুলে ফেলল।

'না, কোনো আবরণ থাকবে না ফুলের, কোনো আচ্ছাদন থাকবে না, তোমার পরিপূর্ণ রূপ, তোমার নগ্ন সৌন্দর্য আমাকে দেখতে হবে, এই রূপ আমার স্বপ্ন, এই সৌন্দর্য আমার ধ্যান, আমি ফুলের অঙ্গে অঙ্গে মিশে থাকব—' যেন গুনগুন করে মন্ত্র উচ্চারণ করছিল পরিমল, স্তব করছিল। 'আমি ফুলের গন্ধে ভরে উঠেছি, আমি ফুল হতে পেরেছি—'

আর ঠিক সেই মুহূর্তে হা-হা করে একটা ঝড়ো হাওয়া দরজার কাছে ছুটে এল। কিন্তু ঘরে ঢুকল না। হাওয়াটা যেন দরজার কাছে এসে থমকে রইল। তাই। অমূল্য বুদ্ধিমান, সুবিবেচক, উদার, সুন্দর। খোলা দরজা দিয়ে ভিতরের দৃশ্যটা কি সে দেখতে পেয়েছিল, হয়তো পেয়েছিল, হয়তো পায়নি, তা হলেও সঙ্গে সঙ্গে ঘরে না ঢুকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল সে, তারপর গলার একটু শব্দ করে ডাকল, 'বুলা!' ডাকল, 'দাদা!'

পরিমল শব্দ করার আগে বুলা শব্দ করল, সাড়া দিল। যেন অমূল্যর ডাক শুনে ঘুম থেকে জেগে উঠল বুলা, না, তারও বেশি, মরে গিয়েছিল—অমূল্য ডাকতে আচমকা সে প্রাণ ফিরে পেল। ত্রস্তহাতে কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে নিল, বস্তুত কত দ্রুত কত অল্প সময়ের মধ্যে তার শীর্ণ ফ্যাকাশে মুখ উজ্জ্বল জীবন্ত সুন্দর হয়ে উঠল, মুখের স্বাভাবিক রঙ ফিরে এল, আনন্দে চোখ দুটো টলটল করে উঠল, বিশ্বাস করতে বাধছিল পরিমলের। স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে গেল সে। যেন একটা মানুষের পায়ে শব্দ, গলার আওয়াজ ওই মেয়ের সমস্ত লজ্জা, গ্লানি, ঘৃণা, বিদ্বেষ, অপমান, দুঃখ ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল, বসন্তের নূতন পাতার মতন ঝলমল করে উঠল সে। 'অমূল্য তুমি ফিরে এসেছ!' বলতে বলতে দরজার কাছে ছুটে গেল বুলা। আর পরিমলের মনে হল, সব লজ্জা, ঘৃণা, ক্রোধ, বিদ্বেষ, অপমান, গ্লানি তার মাথায় এসে ঠাঁই নিয়েছে। যেন নিজে হাল্কা হয়ে একটা ভারি বোঝা বুলা তার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেল। কিছুতেই মাথাটা তুলতে পারছিল না পরিমল।

'দাদা আপনি এমন চুপ করে আছেন কেন, আমি এসেছি।' অমূল্য ঘরে ঢুকল, পরিমলের সামনে দাঁড়াল।

পরিমল তখনও নীরব। অমূল্যকে দেখছিল। রামধনুর উজ্জ্বলতা ছেলের চোখে, সকালের রৌদ্রের নির্মল হাসি তার সারা মুখে।

'সব জিনিস নিয়ে এসেছি, আর বাইরে যেতে হবে না। তেল নুন মসলা কাঠ।' অমূল্য

বলল, 'এক কুঁজো জলও নিয়ে এলাম।'

তার হাতে কিছু জিনিস। জলের কুঁজো ও কাঠের বোঝা বুঝি দরজার বাইরে রেখেছিল। বুলা টেনে টেনে সেগুলি ততক্ষণে ঘরে এনে ঢোকাচ্ছিল।

'তুমি অসাধ্য সাধন করতে পার।' পরিমল বিড়বিড় করে বলল।

'কিন্তু আপনি এমন গম্ভীর হয়ে থাকলে তো চলবে না দাদা।' অমূল্য অভিযোগ করল। 'আপনি হাসুন—না হলে আমাদের সব আনন্দ মাটি হবে'

কি উত্তর দেবে পরিমল ভাবছিল। আবার মাটির দিকে তাকাল সে। কুঁজো ও কাঠ একপাশে সরিয়ে রেখে বুলা এসে অমূল্যর পাশে দাঁড়াল। পরিমল তখন চোখ তুলল।

'আমি যে শয়তান, আমি যে নিষ্ঠুর অমূল্য।'

'মোটেই না, মিথ্যা কথা।' অমূল্য সবেগে মাথা নাড়ল। 'আপনি রূপের পূজারী, আপনি সুন্দরের সাধনা করেন, আপনি কবি—শিল্পী।'

'কি করে বুঝলে তুমি?' কাতর গলায় পরিমল প্রশ্ন করল।

'তা না হলে প্রথম দিন আমাকে দেখেই আপনার ভালো লাগবে কেন, আমাকে ভালোবাসবেন কেন—তখনই আমি বুঝে গেলাম।' অমূল্য তার চোখে চোখ রেখে হাসল।

পরিমল স্তম্ভিত হল। তার মনে হল, এক দেবদূত তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে কথা বলছে। সেই পবিত্রতা তার চোখে, সেই ক্ষমা মাধুর্য সারল্য স্নিগ্ধতা তার কথায় হাসিতে।

পরিমলের দু চোখ জলে ভরে উঠল। বুলাও হাসছিল। পরিমলের বুকের ভার নেমে গেল। চোখে জল নিয়ে সে এতক্ষণ পর হাসতে পারল।

'কিন্তু আমরা আর দেরি করব না, এখনি রান্না চাপিয়ে দিতে হবে।' অমূল্য বলল।

'তাই দাও।' পরিমল সম্মতি দিল।

'কিন্তু আপনাকে কোনো কাজে হাত লাগাতে দেব না।' অমূল্য বলল, আপনি শুধু চুপ করে বসে থেকে দেখবেন। আমি ও বুলা রান্না করব।'

'কিন্তু তার আগে পরিমলদাকে এক কাপ চা করে দিতে হবে।' বুলা বলল।

অমূল্য বলল, 'নিশ্চয়—আমি চা, চিনি ও গুঁড়ো দুধ নিয়ে এসেছি।'

রান্না খাওয়া শেষ হতে একটু রাত হল। ঝড় কিন্তু আর এল না। আকাশের ঘোলাটে ভাবটা কেটে গেল। চাঁদ আবার চকচকে হয়ে উঠল। জ্যোৎস্নার ধার উঠল। প্রখর চাঁদের আলোয় কাঁটাগুল্মে আচ্ছাদিত বিশাল প্রান্তরের চেহারাটা খুব একটা খারাপ লাগছিল না যেন। দৃশ্যটা দেখতে তিনজন ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। 'সিরসিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। অন্যদিকে ঝড়বৃষ্টি হয়েছে মনে হয়।' অমূল্যর কথা শুনে বুলা বলছিল, 'এখানে ঝড় উঠলে হয়েছিল আর কি—যেমন ভাঙা নড়বড়ে টিনের ঘর।' পরিমল বলছিল, 'না, দু একটা ঝাপ্‌টা এলেই যে এ-ঘর পড়ে যেত আমার মনে হয় না, চালের এখানে ওখানে টিন সরে গেছে, দু এক জায়গায় বেড়া ভেঙে গেছে, তা না হলে ঘর এখনো শক্ত আছে, খুঁটিগুলো বেশ মজবুত, আমি তখন ভেতরে পা দিয়েই লক্ষ্য করেছিলাম।'

'তা হলেও বিচ্ছিরি সেকেলে ঘর, আর এমন বাজে জায়গা হৃদয়পুর। আমার ইচ্ছা করছে এখনি বেরিয়ে পড়ি।'

'ইস্, কী আস্থির মেয়ে রে বাবা!' অমূল্য বুলার দিকে তাকাল না, পরিমলের দিকে মুখ ফেরাল। 'বার বার বলছি রাত করে আমরা কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে হাঁটব না। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব। তা ছাড়া একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার, শরীরের বিশ্রাম প্রয়োজন, তারপর যে আবার অনেকটা হাঁট-পথ, সে কথাটা ও একবার চিন্তা করছে না। পরিমলদা, আপনি ওকে বুঝিয়ে বলুন তো।'

'তাই তো।' পরিমল বুলার দিকে তাকাল না, অমূল্যর দিকেও না, মাঠের দিকে চোখটা ধরে রাখল। 'আমি তো তবু নফরগঞ্জের বাজারে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম—তোমাদের একটুও রেস্ট্ নেওয়া হয়নি, সারাদিন হাঁটাহাঁটি চলেছে, তারপরও যখন অনেকটা হাঁটতে হবে, এখন একটু বিশ্রামের দরকার।'

'কিন্তু তারপর আমরা কোন্‌দিকে যাব তাই তো এখন পর্যন্ত ঠিক হল না।' আকাশের দিকে চোখ রেখে বুলা বিড়বিড় করে উঠেছিল।

'সব ঠিক করা আছে,' অমূল্য হেসে উঠেছিল, 'অন্তত আমি তো আমারটা ঠিক করে ফেলেছি, বাকিটা তোমরা ঠিক করবে।'

'কী রকম!' বুলা চমকে উঠেছিল।

পরিমল তার দৃষ্টি মাঠ থেকে তুলে এনে অমূল্যর মুখের ওপব মেলে ধরেছিল। কেননা কথাটা বলেই অমূল্য ঘুরে দাঁড়িয়ে দুজনকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। চাঁদের আলো তাব হাসিটাকে আরও স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত করে তুলেছিল। মনে হচ্ছিল কোন রহস্যলোক থেকে নেমে এসে কৌতূহলী চোখ দুটো নিয়ে সে দুজনকে দেখছে আর মিটিমিটি হাসছে।

'কী ঠিক করলে শুনি?' পরিমলও প্রশ্ন না করে পারল না।

'আপনারা পূব দিকে যাবেন কি পশ্চিমে?' দু হাত দু দিকে প্রসারিত কবে দিল অমূল্য।

'পশ্চিমে কী আছে শুনি?' বুলা প্রশ্ন করল।

'সমুদ্র।'

'আর পূবে?' পরিমল প্রশ্ন করল।

'আশ্রম। ব্রজবল্লভপুরের বিখ্যাত আশ্রম।'

পরিমল স্তব্ধ হয়ে রইল। এই আশ্রমেই সুকোমল থাকে না? এই আশ্রমে যাবার জন্য জগমোহন বার বার তাকে বলতেন না? আবার পরিমলের মনে হল কথাটা। তার নিয়তি হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ঐ ছেলে। অমূল্য। তাকে পরীক্ষা করছে। সমুদ্র দেখতে ভালো লাগবে পরিমলের, না কি আশ্রম দেখতে যাবে সে। তাই তো দুটোই তার কাছে নূতন। সমুদ্রও দেখেনি সে, আশ্রমও দেখেনি। এখনি যদি অমূল্য তাকে প্রশ্ন করে কোন্‌দিকে যেতে পরিমলের ভালো লাগবে, কী উত্তর দেবে সে? না কি এই জন্য সে অপেক্ষা করবে। আর একজন কী উত্তর দেয় শুনে পরিমল মনস্থির করবে?

আড়চোখে সে বুলাকে দেখল। যেন তার ভুরু দুটো কুঁচকে উঠেছে।

'আমি আশ্রম দেখতে যেতে চাই না অমূল্য— সমুদ্র দেখব।' বুলা বলে ফেলল।

'দাদা, আপনি?' অমূল্য পরিমলের দিকে তাকাল।

'তুমি যেদিকে নিয়ে যাবে আমি সেদিকে যাব। আশ্রম সমুদ্র—দুটোই আমার দেখতে ভালো লাগবে।'

'তোমার কোন্‌টা ভালো লাগবে, অমূল্য?' বুলা পাল্টা প্রশ্ন করল। অমূল্য হাসল।

'আমার ভালো লাগা না-লাগার তো কথা ওঠে না এখানে। তোমরা বেড়াতে এসেছ, তোমরা ঠিক করবে কোন্‌দিকে যাবে, তুমি পরিমলদা, আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।'

বুলা হঠাৎ কথা বলল না। মাঠের কাঁটাঝোপের দিকে চোখ নামিয়ে পরিমলও ভাবতে লাগল।

অমূল্য বলল, 'বেশ, আপনারা শুয়ে শুয়ে চিন্তা করুন। তারপর ঘুম থেকে উঠে আমাকে বলবেন, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনজন বেরিয়ে পড়ব।'

'মনে হয় তুমি আমাকে পরীক্ষা করছ অমূল্য।' বুলার গলায় অভিমান থমথম করছিল। 'আমি সমুদ্র ছাড়া অন্য কিছু দেখতে চাই না—পরিমলদা যদি মনে মনে ব্রজবল্লভপুর যাওয়া ঠিক করে ফেলেন তো তখন তুমি কার মন রাখবে—আমার না ওঁর?'

'না, না, তুমি ঠিক করে দেবে অমূল্য।' পরিমল ব্যস্ত হয়ে বলল, 'তুমি যেদিকে যেতে বলবে আমি সেদিকে যাব—তোমার ইচ্ছার কাছে আমার সব ইচ্ছা, সব সঙ্কল্প ছেড়ে দিলাম।'

'আমার মনে হয়, ঘুমিয়ে উঠলে সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে।' অমূল্যর মুখে আবার সেই আশ্চর্য অপার্থিব হাসি ফুটে উঠেছিল। যেন দিব্য দৃষ্টি দিয়ে সমাধানটা তখনই সে দেখতে পাচ্ছিল। বলছিল, 'পিছুটান না থাকলে দুটোই দেখতে সুন্দর, সন্ন্যাসীর আশ্রম অথবা দিক্‌চিহ্নহীন ধু-ধু সমুদ্র--চলুন এখন শুয়ে পড়া যাক।'

তিনজন ঘরে চলে এসেছিল। শোয়ার ব্যবস্থাটাও অমূল্য ভালোই করেছিল। তখন উনুনে ভাত চাপিয়ে দিয়ে বুলাকে নিয়ে সে বাস্তুহারা চাষিদের পাড়ায় চলে গিয়েছিল। তখন অবশ্য বুলাকে সঙ্গে নিতে সে আর আপত্তি করেনি। এবং ভাত ফুটবার আগেই দুজনে দু আঁটি খড় নিয়ে ফিরে এসেছিল। শুধু মাটির ওপব শোয়া যেত না। খড় বিছিয়ে চমৎকার বিছানা করা হল। অমূল্যর শোবার জায়গা করা হল দরজাটার ঠিক মুখে, তারপর পরিমলের জায়গা, আর একেবারে ভিতরের দিকে বেড়া ঘেঁষে বুলার বিছানা। আলো নিবিয়ে দিয়ে তিনজন শুয়ে পড়ল।

॥ ৫৪ ॥

রাত তখন ক'টা? না, ভোর হয়নি। ভোর হবার কিছু বাকি ছিল যেন। পাখি ডাকছিল না। ঘুমের গাঢ়তা—অসীম স্তব্ধতা নিয়ে পৃথিবী তখনও থমথম করছিল।

পরিমল জেগে গেল। যেন হঠাৎ তার ঘুমটা ভেঙে গেল। যেন তার মনে হল তার শরীর ধরে কেউ জোরে নাড়া দিয়েছে, যার ফলে অসময়ে সে জেগে উঠল। কেননা সে পরিষ্কার বুঝতে পারছিল তার চোখে প্রচুর ঘুম রয়েছে, শরীরের আলস্য জড়তা একটুও কাটেনি—এ জাগরণ কিছুতেই স্বাভাবিক বলে সে মেনে নিতে পারছিল না। তাই চোখের পাতা দুটো খুলে যাওয়ার পরও প্রায় মিনিট দুই কেমন বিমূঢ় বিহ্বলের মতন শুয়ে থাকল সে, শুয়ে থেকে চোখের সামনের পাতলা অন্ধকারটা দেখতে লাগল। অন্ধকার থিরথির করে কাঁপছিল, যেন কাঁপতে কাঁপতে ক্রমশ তা ফিকে হয়ে যাচ্ছিল। অবাক হল সে, তখন শোবার আগে কেরাসিনের ডিবিটি নিবিয়ে দেওয়ার পর ঘরের ভিতরটা কেমন গাঢ় জমাট অন্ধকারে

ভরে উঠেছিল। এখন অন্ধকারের মধ্যেও ঘরের চাল, বেড়ার কিছু কিছু অংশ, খুঁটির অস্পষ্ট আবছা রেখাগুলি সে দেখতে পাচ্ছিল। এবং অনুভূতিটা একটু স্বচ্ছ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে এ-ও বুঝল, কেউ তার শরীর ধরে নাড়া দেয়নি, জোর করে তাকে জাগিয়ে দেয়নি। নিজে থেকে সে জেগে উঠেছে। তার আশে-পাশে যে কোনো মানুষ দাঁড়িয়ে বসে বা জেগে ছিল না ততক্ষণে সে নিশ্চিন্ত হতে পারল। বরং ঘুমন্ত মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ তার কানে আসছিল। আর চালের বাতা বেয়ে টিপ টিপ শিশির ঝরছিল। কার্তিকের শিশির পড়ার শব্দ। এ ছাড়া আর কোনো শব্দ সে শুনতে পাচ্ছিল না। একটা ক্লান্তির হাই তুলে সে উঠে বসল। হাতের তেলো দিয়ে চোখ রগড়াল। হাত দুটো চোখ থেকে সরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা মনোহর দৃশ্য সে দেখতে পেল। চাঁদ ঢলে পড়েছিল। দরজার কাছে—দরজার ঠিক মুখে এতটা জ্যোৎস্না এসে হ্রদের জলের মতন টলটল করছিল। এই জন্যই ছবিটা এত উজ্জ্বল পরিষ্কার হয়ে তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। কোন আবরণ ছিল না তাদের গায়ে। ঘুমন্ত নিঃশঙ্ক দুটি মানুষ। মুখের সঙ্গে মুখ ঠেকানো, শরীরে শরীর জড়ানো। না, যেন তারও কিছু বেশি। অঙ্গের অভ্যন্তরে অঙ্গ প্রবেশ করতে চেয়েছিল। এখন স্তিমিত ক্লান্ত নীরব। তা হলেও মাধুর্যের শেষ ছিল না, দীপ্তির অল্পতা ছিল না। আশ্চর্য দুটি ফুল। যেন মহাকালের বেদীর নীচে অনন্তকাল ধরে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে। চোখের পলক পড়ছিল না পরিমলের। নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে তাকিয়ে সে দেখছিল। গ্রীবা নিতম্ব জঙ্ঘা উরু স্তন। একটু আগের নগ্নতা আর এই নগ্নতায় কী আকাশ-পাতাল ব্যবধান! তাই তো, পরিমল চিন্তা করল, তখন লজ্জা ও ক্রোধের বাষ্প, অসন্তোষ ও অনীহার মেঘ, বিরক্তির বিষণ্ণতার কুয়াশা এই দেহকে ঘিরে রেখেছিল, দেহের সৌন্দর্য ম্লান করে রেখেছিল, যেন শতাংশের একাংশও পরিমল দেখতে পায়নি, এখন দেখল; চাঁদ এখন মেঘমুক্ত অলজ্জ প্রখর প্রগল্‌ভ—অত্যধিক আনন্দের সঙ্গে একটা ঈর্ষার কাঁটা পরিমলের বুকের ভিতর খচখচ করে উঠল। তা হলেও বিমুগ্ধ চোখ দুটো এক মুহূর্তের জন্য অন্যদিকে সরিয়ে নিতে পারল না সে, বরং আর একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। এবার সে যৌবনোদগত পুরুষদেহ দেখতে লাগল। অমূল্যর সবল বাহু, সুগঠিত স্কন্ধ, দৃঢ় মসৃণ দুটি জানু, পরিচ্ছন্ন নাভি। বুলার নিম্নাঙ্গ স্থূল বঙ্কিম। সেই তুলনায় অমূল্যর দেহের এই অংশ ঋজু হাল্কা অপরিসর। স্বাভাবিক, বুলা যে একদিন সন্তান ধারণ করবে, সেভাবে তার শরীর গড়ে উঠছে। অমূল্যর সেই দায় নেই, তার কাজ সন্তানের জন্ম দেওয়া, তারপর সে মুক্ত লঘু স্বাভাবিক। সে শুধু আনন্দের সঙ্গী। তাই তার দেহের এমন প্রফুল্ল স্বচ্ছন্দ গড়ন। যেন বুলার মধ্যে এখন থেকেই কিছু জটিলতা মন্থরতা, একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দুজনকেই দেখছিল পরিমল। বস্তুত কোন্ দেহটি বেশি সুন্দর বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল তার। বুলাকে মনে হচ্ছিল একটি ধনু, আর অমূল্যর শরীর যেন সূক্ষ্মাগ্র তীর। তাই তো হবে। পরিমল মনে মনে হাসল। শর শরাসন দুটোরই প্রয়োজন কন্দর্পের। একটি ছাড়া আর একটি তার কাছে অর্থহীন। তা হলেও পরিমল যেন অমূল্যকেই বেশি মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। কেননা হঠাৎ তার মনে পড়েছে, একদিন সে-ও এমন দিব্যকান্তি কিশোর ছিল। মাঠে খেলাধুলা সেরে বাড়ির বাথরুমে ঢুকে কতদিন উলঙ্গ হয়ে স্নান করত, কই, আজ যেমন নিষ্ঠা নিয়ে দুরন্ত কৌতূহল নিয়ে

অমূল্যর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখছে, নিজের শরীরের দিকে তেমন করে একদিনও সে তাকায়নি। প্রয়োজনবোধ করেনি। আজ যে একটি দেহ আর একটি দেহে আশ্লিষ্ট। তাই দেহের এত সৌন্দর্য এত বিস্ময়। একটা হতাশার ব্যথা অনুভব করল পরিমল। নিজের নিঃসঙ্গতার কথা চিন্তা করল। কিন্তু সংযম হারাল না। স্থির হয়ে ঘুমন্ত মানুষ দুটিকে দেখতে লাগল। তার মনে হল বাইরে আকাশ একটু একটু করে ফরসা হয়ে আসছে, জ্যোৎস্নার উজ্জ্বলতা কমে যাচ্ছে। এখনি পাখিরা গান গেয়ে উঠবে। এটাও অস্বস্তিকর। পরিমল চাইছিল না, এখনি তারা জেগে উঠুক, আর একটু ঘুমোক। এমন সুন্দর জিনিস আবার সে কবে দেখবে! একটু দূরে বসে গলা বাড়িয়ে দিয়ে দুজনকে সে দেখছিল; এবার, এতটুকু শব্দ না হয়, এমন সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে অমূল্যর বিছানাটার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। বেশ পুরু করে খড় বিছানো হয়েছে জায়গাটায়। পরিমল অনুমান করল, বুলা যখন মাঝরাত্রে নিজের বিছানা ছেড়ে চলে আসে তখন আরও কিছু খড় বিছিয়ে দুজনের শোবার মতন বেশ বড় করে উঁচু করে শয্যা তৈরি করা হয়েছিল। হয়তো বুলার বিছানার খড়গুলিও তুলে এনে এখানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অবাক হল পরিমল, তার ঘুমের মধ্যে এত সব কাণ্ড ঘটে গেল, একটু টের পায়নি সে। তার যেন জানতে ইচ্ছা করছিল বুলা ঠিক কখন কত রাত্রে অমূল্যর কাছে চলে এসেছিল। অমূল্য তাকে ডেকেছিল? না, বুলা নিজে থেকে এসেছিল. পরিমলের যেন মনে হল, বুলাই এসেছিল, অমূল্য ঘুমোচ্ছিল, বুলা এসে তাকে জাগিয়ে দিয়েছিল। অমূল্য প্রথমটায় চমকে উঠেছিল, তারপর খুশি হয়ে বুলার গলা জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু অমূল্য কি বুলার কানের কাছে মুখ দিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল, 'তুমি আসবে আমি জানতাম?' নাকি বুলা বলেছিল, 'আমি মনে করেছিলাম তুমি আমার কাছে যাবে—একলা শুয়ে শুয়ে ছটফট করছিলাম, তারপর যখন কিছুতেই গেলে না, আমিই উঠে চলে এলাম?'

তাইতো, অন্ধকারে চাপা গলায় দুজনের কী কথা হয়েছিল কিছুই সে শুনল না জানল না। একটা কঠিন শীতল ঘুম তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মধ্য রাত্রে দুজন কী করছিল না করছিল এই নিয়ে একটা স্বপ্ন পর্যন্ত দেখল না সে। তবু তো দুপুরে নফরগঞ্জের বাজারে চায়ের দোকানে ঘুমিয়ে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিল। হৃদয়পুরের এই ঘরে কিছুই হল না। অথচ এখানেই অনেক কিছু স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা ছিল। অল্প সময়ের জন্য সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এই ঘুম মৃত্যু হয়ে তাকে চেপে ধরেছিল। দুটি কিশোর কিশোরীর জীবনের প্রথম রাত্রির প্রগাঢ় রোমাঞ্চ গভীর চুম্বন, আলিঙ্গন আসঙ্গ নিঃশব্দে সম্পন্ন হল, ধরতে গেলে তার শিয়রের কাছে। অমূল্যর বিছানা ও তার বিছানার মধ্যে এক হাতের বেশি ব্যবধান ছিল না, অথচ কিছুই সে টের পেল না। ভয়ংকর অনুশোচনা হতে লাগল তার, বুকের ভিতর নূতন করে খোঁচাতে আরম্ভ করল। পুষ্পের লীলা সুগন্ধ লাবণ্য তার অহোরাত্রির চিন্তা, আর ঠিক এই জিনিসগুলির পূর্ণ বিকাশ চূড়ান্ত বিকিরণ ঘটল কিনা তার ঘুমের মধ্যে!

খুব দুঃখ হল তার। হামাগুড়ি দিয়ে দুজনের শিয়রের কাছে পৌঁছে ফুলের মতন সুন্দর মুখ দুটি আবার মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। বুলার মাথার চুল এলোমেলো হয়ে আছে। হবারই কথা। অমূল্যর একটা হাত বুলার থুতনির নীচে, বুকের ওপর বিন্যস্ত। বুলার একটা হাত অমূল্যর কোমরে জড়ানো। ঘুমের মধ্যেও অমূল্যকে ধরে রেখেছে। মিলনের সময়

পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই যেন বেশি সতর্ক সচেতন থাকে; ঘুমিয়ে পড়লে অমূল্যর আলিঙ্গন শিথিল হবে, পাশ ফিরে শোবে সে আশঙ্কা করে যেন নিজে ঘুমিয়ে পড়েও বুলা তাকে বেষ্টন করে রয়েছে। অমূল্যর ঠোঁট দুটো দৃঢ়বদ্ধ। বোঝা যায় পরিতৃপ্ত পুরুষের এখন নিবিড় ঘুম ছাড়া অন্য কিছু কামনা নাই, কিন্তু বুলার অধরোষ্ঠ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত—ফুলের গর্ভের মতন ছোটো একটা হাঁ জেগে আছে মুখে। হয়তো ঘুমের মধ্যে মুখ দিয়ে শ্বাস ফেলছে সে, হয়তো বাড়িতে ছোটো ভাইকে নিয়ে অথবা মার কাছে যখন ঘুমোয় তখনও তার ঠোঁট এমন ফাঁক হয়ে থাকে—নাকি ঘুমের আগে অমূল্যর কাছে তৃপ্তি পেয়েছিল, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার পর নূতন করে সে তৃপ্তি খুঁজছে, তৃষিত উন্মুখ ঠোঁট দুটো বাড়িয়ে দিয়েছে পুরুষকে আবার চুম্বন করবে বলে! কে জানে, পরিমল চিন্তা করল, জাগ্রত অবস্থায় পরিতৃপ্ত হবার পর তখনই আবার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নের মধ্যে একটি মেয়ে কামার্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে কিনা! পরিমলের মনে হল, বুলা যেন স্বপ্ন দেখছিল, স্বপ্নের মধ্যে অমূল্যকে খুঁজছিল। অসম্ভব না, বুকের কাছে মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, স্বপ্নের মধ্যে সে হারিয়ে যায়, তার জন্য কেঁদে দুচোখ অন্ধ হয়।

একভাবে বসে থেকে পা দুটো ধরে গিয়েছিল বলে এবার মাটির ওপর হাঁটু ও হাতের ভর রেখে উপুড় হয়ে পরিমল দুজনকে দেখছিল, হঠাৎ অমূল্যর শিয়রের কাছে শক্ত একটা কিছু তার হাতে ঠেকল, যেন খড়ের নীচে ইট কাঠ যাহোক কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে মাথার বালিশটা শক্ত করা হয়েছে। করিৎকর্মা ছেলে অমূল্য, পরিমল মনে মনে হাসল, শয্যার আরামের জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি সে। বুলার মাথার নীচে সেরকম কিছু ছিল না যেন, সেখানে হাত রেখে পরিমল টের পেল। জায়গাটা নরম। তাইতো, বুলার মাথা নরম, কাজেই খড়ের বালিশ ছাড়া আর কিছু তার চলত না যে। পুরুষের মাথা শক্ত, তাই অমূল্যর শক্ত বালিশ। পরিমল আবার অমূল্যর শিয়রের নীচে হাত রাখল, শক্ত জিনিসটা এবারও তার হাতে ঠেকল, কিন্তু ক্রমেই তার মনে হচ্ছিল জিনিসটা বেশ মসৃণ ও গোল। কৌতূহল হতে শেষ পর্যন্ত খড়ের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিল সে, তারপর অত্যন্ত সাবধানে সেটা টেনে বার করল। খড়ের সামান্য খসখস শব্দ হল, কিন্তু অমূল্যর ঘুম ভাঙল না। জিনিসটা হাতে নিয়ে পরিমল স্তম্ভিত হয়ে গেল। গোল মসৃণ বাঁট লাগানো, ছুরি বলা যায় না এটাকে, পেন্সিল কাটার ছুরি তো নয়ই, যেন ফল কাটার পক্ষেও বড় ও বেমানান মনে হবে—হাঁস মুরগি কাটার জন্য এ জিনিস ব্যবহৃত হয় কিনা পরিমল চিন্তা করল। ফলাটা বেশ চওড়া, দুদিকে ধার আছে, আর দুদিক থেকে ক্রমশ সরু হয়ে মাথাটা বল্লমের আগার মতন সূক্ষ্ম হয়ে শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ কাটাকুটি ছাড়াও কিছু বিঁধবার জন্য খোঁচাবার জন্য অস্ত্রটা চমৎকার কাজ দিতে পারে। কিন্তু এই অস্ত্র এখানে কেন, অমূল্য এটা কোথায় পেল, এবং এ জিনিস মাথার নিচে রেখে ঘুমোবার উদ্দেশ্য কী পরিমল ঠিক বুঝতে পারল না। বাড়ি থেকে অমূল্য যখন বেরোয়, তখন তার সঙ্গে এটা ছিল না। পরিমলের চোখের সামনেই অমূল্য, পথে দরকার হবে বলে অতিরিক্ত একটা জামা ও পায়জামার পুঁটলি বেঁধে নিয়েছিল। আর কিছু সে সঙ্গে আনেনি। তবে কি তখন যে নুন মশলা কিনতে কাঞ্চনপুর গিয়েছিল সেখান থেকে জিনিসটা সে জোগাড় করে এনেছে? কিন্তু পরিমলের যতদূর মনে পড়ল, অমূল্য যখন ফিরে এল তখন কটা চোঙা ছাড়া তার হাতে কিছু ছিল না। কিন্তু যদি কোমরে গুঁজে এনে থাকে! পরিমলের যেন মনে

হল তাও নয়—কারণ মশলার ঠোঙাগুলি নামিয়ে রেখে অমূল্য গায়ের জামা খুলে ফেলেছিল। কোমরে গোঁজা থাকলে এতবড়ো ছোরাটা তার চোখে পড়ত, বুলার চোখে পড়ত। বুলা তৎক্ষণাৎ অমূল্যকে প্রশ্ন করত, ওটা এনেছ কেন, ওটা তোমার কোন্ কাজে লাগবে। তাইতো, পরিমলও তখন চিন্তা করত, ডালভাতের আয়োজন হচ্ছে, মাছ মাংস রান্না হচ্ছে না যে সেসব কুটতে অমূল্য এতবড়ো একটা ছোরা নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, অমূল্য জামা খুলে ফেলেছিল, পরিমলের পরিষ্কার মনে আছে খালি গা হয়ে তখনই সে উনুন ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তারপর উনুনের সামনে বুলার পাশে বসে রাঁধতে আরম্ভ করেছিল। হ্যাঁ, তারপর, তখন খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে, আর একবার অমূল্য বাইরে যায়। বুলাকে সঙ্গে নিয়ে বাস্তুহারা চাষিদের পাড়ায় খড় আনতে গিয়েছিল। এই পর্যন্ত চিন্তা করে পরিমল হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল, যেন থমকে দাঁড়াল। চিন্তার খেই ধরে আর সে অগ্রসর হতে সাহস পেল না। তার ভুরু কুঁচকে রইল। হাতের ছোরাটা চোখের সামনে তুলে আবার একটু সময় মনোযোগ দিয়ে দেখল। পুরোনো জিনিস। অনেকদিন ব্যবহার করা হয়েছে। বোঝা যায়। সুতরাং কোনো কামারের দোকান থেকে এ জিনিস কিনে আনা হয়নি। চাষিদের ঘরে ছিল। পরিমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অমূল্যর কাছে টাকা আছে। তাদের কাছ থেকে কিনে আনতে পারে। অথবা চেয়েও আনতে পারে। কাজ শেষ হলে ফিরিয়ে দেবে, বলেছে হয়তো। জলের কুঁজোটাও যেন চাষিদের ঘর থেকে চেয়ে এনেছিল, অমূল্য তখন বলছিল। সে যাই হোক, কথা হচ্ছে—সেখান থেকে জিনিসটা সে লুকিয়ে আনল কেমন করে। তখনও তার গায়ে জামা ছিল না। কোমরে গুঁজে আনলে পরিমলের চোখে পড়ত, বুলার চোখে পড়ত। বুলা হয়তো সেখানেই তাকে প্রশ্ন করত, এটা নিয়ে যাচ্ছ কেন, এটা তোমার কোন্ কাজে লাগবে।

না, বুলার চোখে পড়েনি, বুলা এ অস্ত্র দেখতে পায়নি। খড়ের গাদার ভিতর লুকিয়ে নিয়ে এসেছে অমূল্য। বুলা হয়তো অন্যমনস্ক ছিল, আর সেই ফাঁকে—

এতক্ষণ পরিমল মনে মনে যে-প্রশ্ন করছিল তার উত্তরটা বিদ্যুচ্চমকের মতন চোখের সামনে ঝলসে উঠতে দেখল সে। খড়ের গাদার ভিতর লুকিয়ে অমূল্য ছোরাটা নিয়ে এসেছে। বুলা দেখেনি।

—কে বলেছে বুলা দেখেনি, পরিমলের কানের কাছে কেউ যেন গর্জন করে উঠল : বুলা দেখেছিল। বুলার সঙ্গে পরামর্শ করে অমূল্য এ জিনিস এখানে এনেছে। বুলা সব জানে।

ভয়ার্ত বিহ্বল চোখ দুটো ঘরের চালের দিকে মেলে ধরে পরিমল আবার কেমন স্তব্ধ হয়ে রইল। তার যেন মনে হল, তার ভিতর থেকে একটা মানুষ গর্জন করছে। এবং তার ভিতরের এই মানুষই যেন তখন তাকে জোরে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিল। চোখে ঘুম ছিল তার। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষটা আঙুল দিয়ে দরজার কাছটা দেখিয়ে দিয়ে বারবার তাকে সেদিকে তাকাতে বলছিল। তাকিয়ে কিন্তু পরিমল মুগ্ধ হয়েছিল। হ্রদের জলের মতন চাঁদের আলো টলটল করছিল। চাঁদের আলো মুখে নিয়ে ফুলের মতন সুন্দর মানুষ দুটি অকাতরে ঘুমোচ্ছিল। চোখ ফেরাতে পারছিল না সে। কিন্তু তখনই সেই মানুষ তার কানের কাছে আবার চিৎকার করে উঠেছিল : সময় নষ্ট করো না, ইট পাথর কাঠ বাঁশ যাহোক একটা কিছু কুড়িয়ে নাও—ঘরের এখানে ওখানে অনেক ভাঙাচোরা জিনিস ছড়িয়ে আছে—যে কোনো একটা চমৎকার অস্ত্রের কাজ দেবে—

নিশ্বাসের সঙ্গে প্রচণ্ড উত্তেজনা ও ঈর্ষার বিষ ছড়াচ্ছিল মানুষটা। কিন্তু পরিমল এতটুকু

বিচলিত হয়নি। তদগতচিত্ত হয়ে রূপ দেখছিল সে, তার সাধনার জগতে সে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে কোনো কুচক্রী তাকে ফিরিয়ে আনবে সেই সাধ্য ছিল কি। কাজেই হিংসার বিষ ঈর্ষার জ্বালা আক্রোশের ধারালো অস্ত্র হাতে নিয়েও তার ভিতরের সেই অপবিত্র শয়তান কেমন যেন চুপ করে গেল, নির্জীব হয়ে রইল, পরিমলের অনমনীয়তার কাছে হেরে গিয়ে লজ্জায় আর মাথা তুলতে পারছিল না।

হ্যাঁ, তখন। কিন্তু এখন?

সুযোগ বুঝে শয়তান আবার মুখ তুলেছে। পরিমলটা হাতের ছোরাটা বার বার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। এবার আর সে গর্জন করছে না, ঠোঁট টিপে হাসছে, পরিমলের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলছে—সব ফুল ফুল না, সব আলো আলো না—সব শিশুই কিছু দেবশিশু নয়। কুসুমে কীট আছে তুমি কি জানতে না!

তাই তো, পরিমল আর প্রতিবাদ করতে পারছিল না। তার যেন মনে হল, যে-মুহূর্তে স্বর্গের আলো দেখে যে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল সেই মুহূর্তে নরকের অন্ধকার তার চোখের সামনে মুখব্যাদান করে হাসতে আরম্ভ করল।

তাই, পরিমলের এখন মনে পড়ল, এই জন্যই অমূল্য তখন শুয়ে পড়ার কথা বলছিল, ঘুমিয়ে উঠলে সব সমস্যার সমাধান হবে। কথাটা বলার সময় দেবদূতের স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠেছিল অমূল্যর মুখে।

হ্যাঁ, একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল বইকি—তারা পুবে যাবে কি পশ্চিম দিক্ ধরে হাঁটবে। বুলা সমুদ্র দেখতে চাইছে, কিন্তু পরিমল? না কি আশ্রমে যাবার ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত বুলা ও অমূল্যর সঙ্গে সমুদ্র দেখতে সে রওয়ানা হত। তাই, এখানে পরিমলই যে একটা সমস্যা—দুর্লঙ্ঘ্য বাধা।

আর এই জন্যই সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন। ভিতরের মানুষটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে পরিমল এবার চমৎকার হাসতে পারল। তার সন্দেহ নিরসন হল, শঙ্কা দূর হল। আর দ্বিধা করল না সে। ছোরাটা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরল। দশ বছর আগের এক বৃষ্টি-টিপটিপ সন্ধ্যার কথা তার মনে পড়ল।

—কিন্তু সেদিন অস্ত্রটা আরও ছোট ছিল, হাতলটা সরু ছিল, ফলাটাও নরম ছিল যে। যেন পরিমল ইতস্তত করছিল।

—তা তো হবেই, তার বুকের ভিতর কুচক্রী ফিসফিস করে উঠল। সামান্য পেন্সিল-কাটা ছুরি ছিল ওটা। সেই তুলনায় এই অস্ত্র অনেক বড়ো, ধারালো, শক্তিশালী।

—সেদিন জখম হওয়ার পর মলয় হাসপাতালে কয়েক ঘণ্টা বেঁচে ছিল, সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়নি।

—সেইজন্যই তো আজ আর ছুরি দিয়ে কাজ হচ্ছে না, ছোরার দরকার। সেদিন একজন ছিল—একটি মলয়, আজ দুজন। শয়তান সুন্দরভাবে পরিমলকে বুঝিয়ে দিল, এক সঙ্গে দুটো দেহে আঘাত করতে হবে, সুতরাং অস্ত্র যত বড়ো হবে ধারালো হবে তত সুবিধা। উঁহু, মলয়ের মতন কয়েকঘণ্টা কারো বেঁচে থাকা এখানে চলবে না, বিপদ আছে, এক সঙ্গে দুটো প্রাণ শেষ হওয়া চাই।

—তাই তো, একজনের মৃত্যু আর একজন সহ্য করতে পারবে না, ভয়ানক ছটফট করবে,

যন্ত্রণা পাবে। পরিমল গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। আকাশের আলোর সঙ্গে বাতাস যেমন মিশে থাকে তেমনি এরা দুজন একসঙ্গে মিশে আছে, দুটিকে পৃথক করার বিচ্ছিন্ন করার বিপদ আছে।

—তা নয়, তা নয়, শয়তান মাথা নাড়ল। মৃত্যু ভালো, গুরুতর আঘাতের পর মৃত্যুই তো শান্তি, একজনের মৃত্যু আর একজনের চোখে তখন ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে হবে। মৃত্যুর মধ্যে সব যন্ত্রণার অবসান। মুশকিল হবে রক্তপাত নিয়ে, এতবড়ো ছোরার আঘাতে প্রচুর রক্ত ঝরবে এক একটি শরীর থেকে বুঝতে পারছ—আর তখন পরস্পরের রক্ত দেখে তারা ভয়ানক ছটফট করবে, যন্ত্রণা পাবে, চিৎকার করবে—না, মলয়ের রক্ত দেখে চায়ের দোকানের মানুষ বালিগঞ্জের মানুষ এত চিৎকার করেনি সোরগোল তোলেনি।

—তা আর কী করে হবে, এখানে একজনের রক্তের মধ্যে যে আর একজনের ভালোবাসার গন্ধ ছড়িয়ে আছে—পরিমল আবার একটি গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। তাছাড়া দুজন দুজনের রক্তের স্বাদ পেয়েছিল, এই জন্য একজনের রক্ত আর একজনের কাছে এত মূল্যবান—যত্ন করে কৌটোয় তুলে রাখার মতন—আর সেই রক্তে পিঠের নীচে খড় ভিজে যাচ্ছে, ঘরের মেঝে ভেসে যাচ্ছে দেখে আর একজন তো কাঁদবেই—তার বুকফাটা কান্না অনেকদূর থেকে শোনা যাবে।

'চমৎকার! পরিমলের দূরদর্শিতার প্রশংসা করল শয়তান। খুশি গলায় বলল, কাজেই বুঝতে পারছ খুনের পর চিৎকার হৈ-হল্লাটা কাজের কথা নয়, বিপদ বলতে আমি তাই বোঝাচ্ছিলাম. কেউ কারো রক্ত দেখে যাতে চেঁচাতে না পারে কাঁদতে না পারে এমনভাবে এক সঙ্গে দুটিকে সাবাড় করতে হবে—হুঁ, ঘুমের মধ্যে........

—কাকে আগে আঘাত করব?

—যাকে খুশি? পরিমলের গলার স্বর হঠাৎ একটু নীরস শুকনো শোনাচ্ছিল। শয়তান তাকে উৎসাহ দিল। খুনের হাতেখড়ি হয়ে গেছে তোমার, তুমি নতুন নও—একটি শরীরে ছোরা বসিয়ে তৎক্ষণাৎ সেটা টেনে বার করে ক্ষিপ্র হাতে আর একটি শরীরে তা বিঁধিয়ে দিতে হবে—সেকেণ্ডের মধ্যে দুটো কাজ সেরে ফেলতে হবে। হুঁ, একবার নিশ্বাস ফেলে আর একবার নিশ্বাস ফেলতে যতটা সময় নেয়। অবিশ্যি দু হাতে দুটো ছোরা থাকলেই তোমার সুবিধা হত—আগে পরের আর প্রশ্ন উঠত না, তাই না? কথা শেষ করে শয়তান ঈষৎ হাসল।

পরিমল চুপ করে রইল।

—নাও, আর দেরি করো না। এখনি ফরসা হয়ে যাচ্ছে, পাখি ডাকতে আরম্ভ করেছে।

—কোথায় আঘাত করব? যেন অমূল্যর শরীরে আগে ছোরা বসাবে পরিমল, তার দিকে সে ঝুঁকে পড়ল।

উঁহু, এখানে নয় এখানে নয়। অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠল শয়তান। মলয়ের পেটে ছুরি মেরে ভুল করেছিলে. সঙ্গে সঙ্গে তাকে মারতে পারনি। ছুরি বা ছোরা বসাতে হয় ওখানে। শয়তান তার কালো রোমশ আঙুলে অমূল্যর বুক দেখিয়ে দিল। —হুঁ ওটাই মনুষ্যদেহের সবচেয়ে মারাত্মক অংশ। হৃৎপিণ্ড ধুকধুক করছে ওখানটায়, তোমরা প্রেমিকরা যাকে বলো হৃদয়—দেখছ না বুলা ঠিক ওই জায়গায় গাল ঠেকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

পরিমলের চোখের পলক পড়ছিল না। হাতে ছোরা নিয়ে নূতন করে অমূল্যর পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে শরীর দেখতে লাগল। এখন যেন আরও তাজা সুন্দর দেখাচ্ছে কিশোরকে। সারারাত শিশির ভেজার পর ফুল ফল ও ঘাসের শিষের এমন সতেজ সুশ্রী চেহারা হয়।

—আশ্চর্য, তুমি দেরি করছ কেন! শয়তান গজগজ করে উঠল। যত দেরি করবে যত ভাববে তুমি নার্ভাস হয়ে পড়বে। উহুঁ, এসব কাজে দেরি করতে নেই। সেরে ফেল।

—আর যদি একে আগে আঘাত করি? পরিমল বুলার দিকে চোখ ফেরাল।

শয়তান তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করল। —হ্যাঁ, তা-ও পার, একই কথা। বলছি তো, একবার নিশ্বাস ফেলে আর একবার নিশ্বাস ফেলার মাঝখানে যতটা সময়ের ব্যবধান—হুঁ, তারও কম সময়ের মধ্যে দুটো কাজ শেষ করতে হবে—কাজেই......

—একে কোথায় আঘাত করব?

—কেন, অতিরিক্ত নরম শরীর বলে জায়গাটা ঠিক করতে পারছ না বুঝি!

একটা খোঁচা দিল কুচক্রী, পরিমল বুঝতে পারল, তা হলেও সে চুপ করে রইল, কেননা ছোরা হাতে নিয়ে এবার বুলার শরীরের নরম অংশগুলি খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে সত্যি সে বিমূঢ় হয়ে পড়ছিল।

—তা বলে এরও কোমরে পায়ে উরুতে তলপেটে ছোরা বসাতে যেও না, ভুল হয়ে যাবে —এই শরীরেও হৃৎপিণ্ড আছে, হুঁ, হৃদয়, দেখছ তো ঘুমের মধ্যেও অমূল্য স্তনের কাছটা কেমন হাত দিয়ে যত্ন করে ঢেকে রেখেছে। ঠিক ওই জায়গাটায় তোমাকে ছোরা বসাতে হবে।

পরিমল শিউরে উঠল। কদর্য শব্দ করে শয়তান গলার নীচে হাসল।

—কী হল, দেরি করছ তুমি!

—দেখছি, বিড়বিড় করে বলল পরিমল।

—আশ্চর্য, অনেকক্ষণ তো দেখছ, তোমার দেখা কি শেষ হবে না। শয়তানের গলার স্বরে এবার ঝাঁঝ ফুটে উঠল। এদিকে একেবারে দিন করে ফেললে যে, পুব দিক লাল হয়ে গেছে। পাকা খুনী তুমি, অন্ধকার থাকতে থাকতে খুন করা আর দিনের আলোয় খুন করার মধ্যে কী আকাশ-পাতাল ব্যবধান তা কি বুঝতে পারছ না।

পরিমল কথা বলল না। এতক্ষণ ঘরের ভিতর ধোঁয়ার মতন অস্পষ্ট ঝাপসা অন্ধকারের পর্দা ঝুলছিল। হঠাৎ যেন পর্দাটা সরে গেল। তাই ঘরের প্রত্যেকটা জিনিস পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু অন্য কোনো কিছুর দিকে পরিমলের চোখ ফেরাবার সময় ছিল না, অবাক হয়ে সে দেখছিল পুবদিকের কপাট-ভাঙা একটা জানালা দিয়ে আলতার মতন টুকটুকে লাল খানিকটা আলো এসে ভিতরে ঢুকেছে, আলোটা সরাসরি ওদের বিছানায় পড়েছে, আর সেই আলোর আভায় নগ্ন শুভ্র দুটি দেহ—যা এতক্ষণ অস্বচ্ছ আলো-অন্ধকারে জমানো দুধের মতন, কখনও নবনীর মতন দেখাচ্ছিল, এখন প্রকাণ্ড দুটো গোলাপ স্তবক হয়ে তার চোখের সামনে ঝলমল করছে। তাই তো হবে, পরিমল চিন্তা করল, দুধের মতন ধব্‌ধবে চামড়া লাল আলোর ছটায় এমন আশ্চর্য গোলাপি রঙ ধরে। যেন এই জন্যই দুটিকে আর পৃথিবীর মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না, তারা যে বুলা ও অমূল্য বিশ্বাস করতে পরিমলের বাধছিল। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সে। তার ভিতরে একটা নূতন আবেগ সৃষ্টি হল। হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে দুজনকে চাঁদের আলো মুখে নিয়ে খড়ের ওপর জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকতে দেখে সে কিন্তু এতটা.বিস্মিত অভিভূত হয়নি। ভাঙা জানালা দিয়ে রক্তের মতন এক আঁজলা আলো ঢুকে দৃশ্যটা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে, সমস্ত ছবিটাই কেমন অপরূপ অপার্থিব মনে হচ্ছিল। কিছুতেই পরিমল সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না, তাই কখন জানি

তার মুঠ শিথিল হল, ছোরাটা হাত থেকে পড়ে গেল, টের পেল না সে। টের পেল তার ভিতরের সেই কুচক্রীর ধমক শুনে।

—কী হল, পারলে না, কাজটা আরম্ভ করেও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেলে!

কথা না বলে পরিমল শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—অস্ত্রটা রেখে দিলে কেন, অদ্ভুত লোক বটে তুমি। শয়তান রুষ্ট হয়ে উঠল। ওটা তুলে নাও, এক সেকেণ্ডও লাগবে না। তাই তো বলছিলাম দেরি করো না, যত দেরি করবে তত মন খারাপ লাগবে ভয় পাবে—এ-সব কাজে দেরি করতে আছে! ইস্ রোদ উঠে যাবে এখনি, এইবার সেরে ফেল।

—আমি পারব না। পরিমলের গলার স্বর দৃঢ় হয়ে উঠল।

—কেন পারবে না! চোখ দুটো ছোট করে ফেলল শয়তান। না পারার আছে কী, খুব কঠিন কাজ তো নয়। সামান্য একটা পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়ে মলয়কে যদি তুমি......

—তা হোক, এমন সুন্দর দুটি প্রাণ আমি নষ্ট করতে পারি না! কঠিন গলায় পরিমল উত্তর করল।

—সুন্দর! কোথায় তুমি সৌন্দর্য দেখছ! বেশ একটু হতভম্ব হয়ে গেল শয়তান, বিড়বিড় করে বলল, ষড়যন্ত্র করে খড়ের গাদার মধ্যে পুরে এত বড়ো একটা ছোরা নিয়ে আসতে পারে যারা তাদের যে কী করে সুন্দর বলা যেতে পারে......

অপবিত্রের কথার উত্তর দিতে পরিমলের ইচ্ছা করছিল না। দুষ্টের সঙ্গে কথা বলতেই তার কেমন ঘেন্না করছিল। সংক্ষেপে সে শুধু বলল—ওরা এ জিনিস এখানে এনেছে আমি বিশ্বাস করি না, ওটা খড়ের গাদার মধ্যে ছিল।

—এ তোমার মনগড়া কথা—নিছক কল্পনা, এতক্ষণ ভেবে ভেবে এটা আবিষ্কার করলে। ক্রোধ চাপতে গিয়ে শয়তান হেসে ফেলল। তা না হয় গাদার মধ্যে ছিল, যখন নিয়ে আসে তারা টের পায়নি, কিন্তু তারপর খড়ের আঁটি খুলে অমূল্য যখন বিছানা করে তখন কি ছোরাটা তার চোখে পড়েনি বলতে চাও, নিশ্চয় পড়েছিল, মেয়েটিও দেখেছিল—কাজেই—

—তুমি চুপ কর, চুপ কর। পরিমল ক্রুদ্ধস্বরে বলল, অমূল্য যখন খড় বিছিয়ে বিছানা করে তখন আমিও ঘরে ছিলাম, তা হলে আমিও ওটা দেখতে পেতাম—

—আহা, সব খড়ই কিছু তখন কাজে লাগেনি—ঘরের কোণায় কিছু জমা ছিল তোমার মনে আছে—ছোরাটা ওই গাদার মধ্যে লুকোনো ছিল। তারপর মাঝরাতে উঠে তারা যখন দুজনের শোবার মতন বড়ো করে পুরু করে বিছানা করে তখন অতিরিক্ত খড়ের আঁটিটা কাজে লাগিয়েছিল—

—হুঁ, তা লাগিয়েছিল অস্বীকার করছি না। গম্ভীর হয়ে পরিমল বলল, ওই গাদার মধ্যে ছিল বলেই তো তখন ওটা আমাদের কারো চোখেই পড়ল না। তারপর রাত্রে উঠে সেই খড় টেনে এনে অমূল্য যদি নতুন করে বিছানা করে থাকে তো তখন আলো নেভানো ছিল, ঘর অন্ধকার ছিল—অন্ধকারে জিনিসটা চোখে পড়ার কথা নয়! তারও নয় বুলারও নয়।

—তাহলে তুমি বলতে চাইছ তোমার অমূল্য ও বুলা কোনো সময়েই এই ছোরার কথা জানত না?

—হ্যাঁ, তাই। পরিমল তার বিশ্বাস নিয়ে অটল হয়ে রইল।

—অবাক লাগছে তোমার মতিগতি দেখে। এবার শয়তান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অথচ খানিকক্ষণ আগেও তোমার ধারণা অন্যরকম ছিল। এবং সেই ধারণাই খাঁটি ছিল, স্বাভাবিক ছিল। তার পাশে নারী, শিয়রে অস্ত্র—আর ঘরে একমাত্র তৃতীয় পুরুষ তুমি। তুমি তাদের শয়নে বাধা নিদ্রায় বাধা ভ্রমণে বাধা—কিছুতেই তাদের সঙ্গ ছাড়ছিলে না, কাজেই তোমার ঐ দেবদূত অমূল্য যদি যথাসময়ে ছোরাটা—

—চুপ কর তুমি। পরিমল চিৎকার করে উঠল। যদি আমি এমন ধারণা করে থাকি তো তোমার প্ররোচনায় করেছিলাম, তুমি আমায় এমন করে ভাবিয়েছিল—তখন অন্ধকারে ভালো বুঝতে পারিনি, প্রত্যূষের প্রথম আলোয় এখন আবার আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ সরল হয়ে গেছে। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তারা ফুলের মতন সুন্দর পবিত্র, এই ফুলে কীট থাকতে পারে না, পাপ থাকতে পারে না, যেখানে এত দীপ্তি এত রূপ এত কোমলতা—

তাকে শেষ করতে দিল না শয়তান, তেমনি কদর্য শব্দ করে গলার নীচে হেসে উঠল। —তাই বলো, রূপ লাবণ্য তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে—হুঁ, নগ্ন দেহের যৌবনশ্রী তোমার লোভ, সেখানে তোমার মায়া সেখানে বন্ধন—তার অর্থ তুমি আমার চেয়েও জঘন্য আমার চেয়েও অপদার্থ। দরকার হলে আমি রূপের মাথায় পদাঘাত করি, লাবণ্যের ঘরে আগুন জ্বেলে দি—যৌবন, তা যতই জ্বলন্ত হোক, আমায় লালায়িত উল্লসিত করতে পারে না, অর্থাৎ আমাকে বাঁধতে পারে—মোহগ্রস্ত করে রাখতে পারে পৃথিবীতে এমন জিনিস নেই। এখানেই আমার মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব—এই জন্যই শয়তানের এত নামডাক।

—এই জন্যই তুমি পতিত, নারকীয়। পরিমল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিল, এই জন্যই তুমি এত কুৎসিত—সকল মানুষের আতঙ্ক। তোমার ক্ষমতা ঐ পর্যন্ত। যৌবনকে ধ্বংস করতে পার—রূপের মুখে চুণ-কালি মেখে তাকে বিকৃত বীভৎস করতে পার—কিন্তু তারপর আর কিছু করতে পার না।

—কীরকম? শয়তানের চোখ দুটো আবার ছোটো হয়ে গেল, ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল। আর কী করার থাকে, আর কী রয়ে গেল শুনি? দেহ শেষ হলে তো সবই শেষ হল, রূপ যৌবন লাবণ্য বলতে তো এই দেহকেই বোঝায়। মিলন, বলো আসঙ্গ বলো, সবই তোমার এই দেহের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটানো—ফুটফুটে দুটো নরম বুকে ছোরাটা বসিয়ে দাও, দেখবে সব শেষ হবে, একজনের কোলে আর একজন ঘুমিয়ে আছে, এই সুখের ঘুম আর কোনোদিন ভাঙবে না।

—কিন্তু তার পরও একটা জিনিস থেকে যায়, দেহ শেষ হবার পরও একটা জিনিস বেঁচে থাকে, তাকে তুমি কোনোদিনই ধ্বংস করতে পার না, সহস্র ছোরার আঘাতেও সে-জিনিস নষ্ট হবার নয়।

—কী সেই জিনিস শুনি? ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ গলায় শয়তান প্রশ্ন করল।

পরিমল আর উত্তেজিত হল না, তার কণ্ঠস্বরে এতটুকু উষ্ণতা ফুটল না, শান্ত নির্ভীক গলায় বলল—প্রেম।

হাঁ করে পরিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল দুঃশীল, কথাটা তার কাছে হেঁয়ালির মতন ঠেকল। তারপর হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল, যেন জিনিসটা তখন বুঝতে পেরেছে

সে। বলল, ভারী মজা তো! দেহ শেষ হল, তার অর্থ তোমার ওই ফুলের মতন মানুষ দুটি চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে সরে গেল, কিন্তু তারপরও তাদের প্রেম কেমন করে বেঁচে থাকে—কাকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকবে শুনি?

—আকাশের জ্বলন্ত তারায় তারায় সেই প্রেম বেঁচে থাকবে বসন্ত বাতাসের সঙ্গে মিশে থেকে তা সুগন্ধ ছড়াবে, নদীর ঢেউ হয়ে নাচতে নাচতে সমুদ্রের দিকে ছুটবে—আর বেঁচে থাকবে আমার মগজে —আমার স্মৃতিতে, কোটিবার ছোরা মেরেও আমি তাকে হত্যা করতে পারব না।

শয়তান চুপ করে রইল, তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোচ্ছিল না। পরিমল বুঝতে পারল দুষ্ট হেরে গেছে। হঠাৎ কড়া আলো চোখে লাগলে বনের হিংস্র বাঘ এমন থমকে দাঁড়ায়, ভয় পায়, বিস্মিত হয়, তারপর একটু একটু করে পিছোতে আরম্ভ করে। পরিমল তার উপলব্ধির তীব্র তীক্ষ্ণ আলো নিক্ষেপ করে অন্ধকারের জীবকে থামিয়ে দিয়েছে। ভয় পেয়ে শয়তান এখন পিছিয়ে যাচ্ছে। এই চেয়েছিল পরিমল। খুশি হল সে, নিশ্চিন্ত হল । এবং আর একবার, এই শেষ বারের মতন নুয়ে পড়ে অনিন্দ্যসুন্দর দুটি দেহ দেখল, মুখ দেখল। আলতার মতন টলটলে আলো ইতিমধ্যে সোনার রঙ ধরে ঝিক্‌মিক করছিল। তাই যেন মনে হচ্ছিল কোনো এক সোনালি নদীতে স্নান করে উঠে বেলাভূমিতে খেলা করতে করতে দুটি শিশু কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সত্যি, এত বেশি নিষ্পাপ নিরীহ নিরপরাধ মনে হচ্ছিল ঘুমন্ত মানুষ দুটিকে—আর সেই মুহূর্তে ছোরাটার দিকে চোখ পড়তে পরিমল নূতন করে শিউরে উঠল। এই অস্ত্র এখানে অত্যন্ত বিসদৃশ অবাস্তব, পরিমল চিন্তা করল, এ জিনিস দিয়ে তারা কী করত! বুলাকে দিয়ে তো নয়ই, মেয়ে সে, অমূল্যর হাতেও ছোরাটা দেখলে পরিমল হেসে ফেলত, যেমন সেদিন, জেঠুর ঘরে ঢুকেই দীপু টেবিলে হাত বাড়িয়ে পরিমলের সেফ্‌টি রেজারটা তুলে নিয়েছিল, তারপর সেটা গালের কাছে বাগিয়ে ধরেছিল, যেন কত দাড়ি গোঁফের অরণ্য গজিয়েছিল শিশুর মুখে, দেখে পরিমলের হেসে মরে যাওয়ার মতন অবস্থা, ধমক দেবে কী, ভাইপোকে কোলে তুলে নিয়ে ছোটো মুখটা চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিয়েছিল সে, স্নেহে আবেগে তার চোখে জল এসেছিল। ফুটফুটে কিশোর অমূল্যর হাতে এতবড়ো একটা ছোরা কল্পনা করতে পরিমলের কষ্ট হচ্ছিল।

আর দেরি করল না সে। উঠে দাঁড়াল। পূবের জানালা দিয়ে ঠিকরে পড়া আলোটা মুহূর্তে মুহূর্তে রঙ বদলাচ্ছে। এখন আর ঠিক সোনালি না, সোনার সঙ্গে একটা আগুনের আভা মিশে রংটা আরও গাঢ় হয়েছে দ্যুতিমান হয়েছে। এবার মনে হচ্ছিল রাশি রাশি স্বর্ণচাঁপা বুলা ও অমূল্যর দেহের ওপর লুটিয়ে পড়ে থরথর করে কাঁপছে। পৃথিবী জেগে উঠেছে। প্রভাতী জাগরণের সমস্ত লক্ষণ পরিমল টের পাচ্ছিল। কিন্তু এদের জাগতে দেরি হবে, সে বুঝতে পারল, হয়তো ঘুমোতে ঘুমোতে অনেক রাত করে ফেলেছিল, হয়তো রাত যখন অল্প বাকি তখন দুজনের চোখে ঘুম এসেছিল। যেন এই মাত্র বুলা নূতন করে পাশ ফিরে শুতে চেয়েছে। অমূল্য অল্প অল্প হাসছে। তার হাত আর বুলার বুকের ওপর নেই—কটিদেশে চলে গেছে। গাঢ় ঘুমের মধ্যেও যে একটা দুটো সূক্ষ্ম অনুভূতি জেগে থেকে নিজের মতন কাজ করে চলে, এ তার চিহ্ন। বুলাকে একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে। কেমন যেন একটা দার্শনিকের ভাব ফুটে উঠেছে মুখটার মধ্যে। একটু আগের তৃষ্ণা ও আকুলতার ভাবটা কেটে গেছে।

কে জানে, এখন হয়তো কিছু একটা গম্ভীর স্বপ্ন দেখছে ও, হয়তো নিলয়কে দেখছে মাকে দেখছে—বাবাকেও স্বপ্ন দেখতে পারে—প্রলয়কে দেখতে পারে—কিছুই বলা যায় না, না কি আমাকে—পরিমলদাকে—

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পরিমল মাথা নাড়ল—একটা অবিশ্বাসের হাসি তার মুখে ফুটে উঠল। না, তা দেখবে না বুলা, যদি পরিমলদাকে সে স্বপ্ন দেখত তো চেহারাটা একেবারে বদলে যেত, এমন বিষণ্ণ গম্ভীর স্থির সমাহিত দেখাত না, ঘৃণা আতঙ্ক অস্থিরতা যন্ত্রণা—অনেক কিছু ফুটে উঠত ঐ সুন্দর মুখে, হয়তো ভয় পেয়ে বুলা চিৎকার করে উঠত, কেঁদে উঠত, অমূল্যকে জড়িয়ে ধরত—দুঃস্বপ্ন দেখে তার এমন প্রগাঢ় তৃপ্তির ঘুম ভেঙে যেত হয়তো......

আর অপেক্ষা করল না পরিমল। আর তার পিছুটান রইল না। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আকাশ ও মাটির রং দেখে সে চমকে উঠল। পৃথিবী যে সময় সময় এমন আশ্চর্য রূপ ধারণ করতে পারে তার যেন ধারণা ছিল না। পূব আকাশের সোনার পর্দাটা টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। পদ্মপাপড়ির মতন, অবিকল পদ্মের রঙ, অসংখ্য ছোটো ছোটো মেঘের টুকরো সেখানে জমতে আরম্ভ করেছে। আর সেখান থেকে সরাসরি আলো এসে পড়েছে কাঁটাগুল্ম ভরা বিশাল প্রান্তরের বুকে। তাই কালো ধূসর কাঁটাবনও গাঢ় সবুজ সোনালি হয়ে উঠেছে। কে বলে হৃদয়পুর অসুন্দর, শ্মশানের মতন রিক্ত শূন্য। মনোলোভা আলোর ইসারা পেয়ে কোথা থেকে রঙিন প্রজাপতির ঝাঁক ছুটে এসে ঘাসগুল্মের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে নাচতে আরম্ভ করেছে। সিরসিরে ঠান্ডা বাতাস বইছিল। বাতাসে প্রচুর ফুলের গন্ধ ছিল আর পাখির অক্লান্ত কিচিরমিচির। এমন আশ্চর্য প্রত্যূষ পরিমল বুঝি জীবনে কোনোদিন দেখেনি। ভাঙা টিনের ঘরটার দিকে আর একবার চোখ পড়তে তার মনে হল এই পরম ক্ষণে, এই নিভৃত ঊষাকালে বিশ্বপ্রকৃতিকে দুটি উৎকৃষ্ট জিনিস উপহার দিয়ে যেতে পারল সে, দুটি সুন্দর ফুল। যেন যতটুকু রেখে গেল, যতটুকু দিয়ে গেল তার চেয়ে ফিরে পেল সে অনেক বেশি। অনির্বচনীয় আনন্দে সার্থকতায় তার প্রাণ ভরে উঠল। চোখে জল নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল সে। এবার সবচেয়ে প্রিয় মুখটি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সুকোমলকে মনে পড়ল। তাই সোজা পুবদিক ধরে সে হাঁটতে লাগল।

॥ ৫৫ ॥

জগমোহন শুনে বিস্মিত হলেন। সুকোমল খবরটা নিয়ে এল। শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী ছেলের মুখে পরিমলের খবর শুনবেন, তিনি অবশ্য আশা করেননি। না, পরিমলকে কলকাতায় আনা হয়েছে, এখন সে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছে, তার আঘাত গুরুতর, অজ্ঞাতপরিচয় দুটি যুবক জগৎবল্লভপুর রেল স্টেশনের কাছে তাকে আক্রমণ করে এবং খুব মারধর করে —এই খবর শুনে জগমোহন মোটেই বিস্মিত হতেন না, বরং এর চেয়ে অনেক বেশি খারাপ সংবাদ—সুকোমল যদি এসে বলত, পরিমলকে কে বা কারা খুন করেছে, তো জগমোহন যেন তাতেও বিন্দুমাত্র বিস্মিত বিচলিত হতেন না। যেন আজ দুদিন ধরে প্রতি মুহূর্তে এমন একটা দুঃসংবাদই তিনি প্রত্যাশা করছিলেন। তাঁর বিস্ময়ের কারণ, পরিমল শেষটায় ব্রজবল্লভপুরের আশ্রমের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। ব্যাপার কী! তার হঠাৎ এই মতি হয়েছিল কেন।

জগমোহনের প্রশ্ন শুনে সুকোমল হেসেছিল। তার চোখ দুটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।